বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
কলিকাতা : নিউ দিল্লী

দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৯৬০

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩ হইতে
শ্রীবিমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার,
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

'স্বর্গে হানা দেওয়া'—১৮৭০-৭১-এর প্যারিসের 'কমিউনার্ড' বা সাম্যবাদী বিপ্লবী নাগরিকদের অসমসাহসিক প্রচেষ্টাকে কার্ল মার্কস সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা ও মমতা দিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা যেন 'স্টর্মিং দি হেভেন্স' বা 'স্বর্গে হানা দেওয়া'। বাংলার ও ভারতের বিংশ শতকের সংগ্রামী বিপ্লবীদের প্রয়াসকে সেরূপ একটি নামে বর্ণনা করলে অন্যায় হবে না।

দুই ভিন্ন দেশের ভিন্ন কালের ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ধরনের চেষ্টাকে তুলনা করা যায় না। কথাটা উপমা মাত্র, এবং উপমা মোটামুটি দুই যুগের অনিবার্য ব্যর্থতার সত্ত্বেও বিপ্লবী স্পর্ধার, বিপ্লবী সাহসের, সংকল্পের জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়। ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী স্থিরবুদ্ধির রাজনৈতিক নেতারা যখন ব্রিটিশ শাসকদের নিকট আবেদন-নিবেদন এবং তৎসহ শান্ত 'এজিটেশন' বা আন্দোলন করাই মনে করতেন রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের একমাত্র পথ, তখন নগণ্য দু'-দশটি অর্ধশিক্ষিত যুবকের পক্ষে স্বাধীনতার সংকল্প ও বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়াস বিংশ শতকের সূচনাকালেও অধিকাংশ নেতাদের চক্ষে ছিল দুর্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম, দু'-একজন সহৃদয়ের মমতাভরা দৃষ্টিতে দেশ-প্রীতির দুঃসাহসিক অপচয়। বিপ্লব তো দূরের কথা, প্রকাশ্যে 'স্বাধীনতা' শব্দটা উচ্চারণ করাও অনেকেই তখন সুবুদ্ধির কাজ বলে মনে করতেন না।

তথাপি স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ থেকে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও বিপ্লবী আয়োজনের কল্পনাও দেশের মানুষের মনের কোণে দেখা দিয়েছিল। অনেকাংশে তা **wishful thinking**, স্বপ্নবিলাস ও কল্পনার ছলনা। তাই বলে সে স্বপ্নকে সত্য করার ও সে-কল্পনাকে রূপদানের আগ্রহও যে দেখা না দিয়েছিল তা নয়। ১৯৪৭-এর পূর্বেকার ঐতিহাসিকেরা এই স্বপ্নের প্রকাশ সগৌরবে বিবৃত করেছেন, সেই বিপ্লবী চেতনার ক্রমস্ফুরণও অবিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা শ্রদ্ধাভাজন। তবু অনুভব না করে উপায় থাকে না যে, তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক বা স্বদেশভক্ত ঐতিহাসিক যে আখ্যাতেই তাঁরা অভিনন্দিত হোন, তাঁরা স্বাধীনতার সকল ধারার প্রয়াসকে সমুচিত গুরুত্বদানে সচেষ্ট হন নি। আরও কথা আছে, প্রেমিকের ধ্যানদৃষ্টি ও প্রাজ্ঞের অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ই স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় আবশ্যক। না হ'লে ওরূপ ইতিহাসে পাঠকের অভাববোধ থেকে যায়।

এই অভাববোধের সঙ্গেই মনে করতে হয়—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুধাবনের সুযোগ এক সময় তো ঐতিহাসিকদের ছিলই না, এখনো সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নি। ১৯৪৭-এর পরে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাতে ক্ষমতাপন্ন অনেকের নিকট এ কথাটাই যেন এখন প্রমাণ করা প্রয়োজন, ভারতের স্বাধীনতা আয়ত্ত হয়েছে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনেরই বলে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও অবিস্মরণীয় যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্ট যে 'স্বাধীনতা' লাভ হয়েছে, গান্ধীজী তাকে স্বাধীনতা বলে স্বীকার করেন নি এবং সে 'স্বাধীনতা'য় গ্রাহ্য

হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভাগ—'ভারত' খণ্ডে ও পাকিস্তানে (এবং আরও শ' দুই আড়াই দেশীয় রাজ্যের অবস্থিতি)। অবশ্য এ কথা মানতে বাধা নেই—জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ছিল প্রধান ধারার বাহক ও **mainstream**।

১৯৪৭-এর ব্যবস্থা কতটা 'অসমাপ্ত বিপ্লব' বা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা—তা বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু এ-কথা সুনিশ্চিত, যে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সাধারণের বিভিন্ন আন্দোলনের স্রোত সেই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্মিলিত ছিল। তা'ছাড়াও ছিল—স্বাধীনতার বিপ্লবী আন্দোলন—সে ধারাও নিষ্ক্রিয় বা অর্বাচীন নয়। কংগ্রেসের নেতাদের মুখে যখন স্বায়ত্তশাসনের 'স্ব' ছাড়া কিছুই ফুটত না তখনও দেশে স্বাধীনতাবাদী সক্রিয় প্রয়াস, সশস্ত্র বিপ্লবী বা 'মিলিটেন্ট' ন্যাশনালিজমের দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা, কলিকাতার 'সঞ্জীবনী সভা' (১৮৭৬), লণ্ডনের লোটাস অ্যান্ড ড্যাগার্স সোসাইটি (১৮৯২), মৈত্রী মেলা (১৯০০), অভিনব ভারত (১৯০৪) প্রভৃতি দু'-এক ক্ষেত্রে যা বিচ্ছিন্ন চিন্তায় ও ঘটনায় দেখা দিয়েছিল, তা যে বিংশ শতকের প্রথম দু'দশকেই ভারতের বহু প্রদেশেই ব্যাপ্ত হয়ে উঠছিল—দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায়ও বিপ্লবকেন্দ্র গঠন করেছিল, রাউলাট কমিশনের রিপোর্টেও সে তথ্য বিবৃত রয়েছে,···সময়ে তার ব্যাপ্তি ও শক্তি বৃদ্ধিই হয়েছিল। সে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য হতে পারে, কিন্তু আদর্শের সুস্পষ্ট চেতনায় ও সংকল্পের সাহসিক উদ্‌যাপনায়, তেজবীর্যে—তা দেশের লোকের নিকট কম শ্রদ্ধেয় ছিল না। শাসক শক্তির পক্ষেও কম দুর্ভাবনার কারণ ঘটায় নি।

১৯৪৭-এর ব্যবস্থাকে স্বাধীনতার চরম পর্ব মনে করলেও মানতে হবে, তা শুধু অহিংস বা সশস্ত্র জাতীয়তাবাদের শক্তিতে আয়ত্ত হয় নি। তবে প্রধান কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং আরও অনেক সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত রকমের বল হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে; বাধ্য হয়ে ক্ষমতার অর্ধাংশ ত্যাগ করেও মূল অংশ রক্ষার পথ ধরে ভারতবর্ষের পূর্বেই ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয়, নিশ্চয়ই তা অহিংস আন্দোলনের দৌলতে নয়।

আন্তর্জাতিক সেই যুগাবর্তনের সঙ্গে আই. এন.এ-র অভিযান, নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ, ভারতীয় সৈন্যদলের অজ্ঞাতপূর্ব অভ্যুত্থান, এ-সব স্ফুরণে ১৯৪৭-এর পিছনকার মূল কারণ। বহু আন্দোলনের সমবায়ে তখন ভারতের মুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের বা অন্য কোন একটি আন্দোলনের ফলে নয়—হিংসা-অহিংসায় উদ্দীপ্ত বহু মানুষের ও দলের সমবেত সক্রিয়তার ফলে।

ইতিহাসে এ সত্য চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। শাসকগোষ্ঠী যতই চেষ্টা করুক, এই সরকারি মহাফেজখানায় আইন-আদালতের গুদামে যে তথ্য জমা হয়ে আছে, সে তথ্যের সাক্ষ্যও কম নয়। শ্রদ্ধেয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের 'রোল অব্ অনার', 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'-এর মত দু'একটি তথ্যপঞ্জি তা সাধারণের নিকট তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি সুহৃদ্বর চিন্মোহন সেহানবীশের আহৃত 'স্বাধীনতার সপ্তধারা' শীর্ষক ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন ধারায় যে বিচিত্র তথ্যরাশি সংকলিত হয়েছে (ম্যাজিক-ল্যান্টার্নের

প্লেটে ও টেপ-করা প্রায় ছ'সাতটি বক্তৃতায় যা এখন দেশের বহুস্থলে কীর্তিত হচ্ছে) তাতে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করা যায়—স্বাধীনতার উদ্যোগ শুধু দেশের কোন একটি বিশেষ দলের সৃষ্টি নয়, ভারতের কত স্থানে, কত দিক থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও বৈপ্লবিক উদ্যোগে দেশের মানুষ অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল. খ্যাত অখ্যাত সেই সমস্ত প্রয়াস অন্তত আট বা ওরূপ ধারায় কখনো মিশ্রিত, কখনো সূত্রহীনতায় আবর্তিত, কিন্তু সবই সমগ্র প্রবাহের গতিসঞ্চারী। তাদের মূল লক্ষ্য এক ছিল, দৃষ্টিতে নতুনত্ব ছিল, ব্যাপকতাও ছিল, নানা বাধায় খণ্ডিত হয়েও ছিল আন্তরিক সততা। সাধ্য কি ঐতিহাসিকরা তথ্যের অভাব দেখছেন বা স্থির কর্মাদর্শের। এ কথা সত্য বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এমন কি ঘটনা পরম্পরার সূত্রে নিজেদের সাধনার বিশ্লেষণ করতে সমর্থ বিপ্লবীদের এমন বিবরণ ঐতিহাসিকদের উপকরণ হতে পারে। মনে হয় আজকের দিনে তাঁদের সে বিবরণের বিশেষ প্রাসঙ্গিক সার্থকতাও আছে। বিপ্লববাদের সকল তথ্যই সাধারণকে জানানো প্রয়োজন।

অবশ্য অভিনন্দনযোগ্য বিপ্লবী-স্মৃতিকথা বাঙলায় কিছু এখন পাওয়া যায়; বাঙালীর লেখা ইংরেজীতেও তা যৎসামান্য কিছু আছে, আরও বেশি থাকা উচিত। কারণ ভারতের সকল প্রান্তের মানুষই অল্পাধিক বিপ্লব-প্রয়াসে যুক্ত ছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—শাসকগোষ্ঠীর নীতি ও কৌশলের জন্য হোক বা বাঙালীর নিজের ত্রুটির জন্য হোক, বাংলার বিপ্লববাদের অধ্যায় সকল রকমেই ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রায় অগোচর। ইংরেজীতে লিখিত না হলে তা অন্যভাষীদের জানবার অবকাশ হবে না। পশ্চিম বাঙলায় এখন সে সুবিধা বাঙালী সাধারণের হয়েছে—কিন্তু সুযোগ হলেই যে তা কাজে লাগে তাও জোর করে বলা যায় না।

আর একটি কথা, বিপ্লব-প্রয়াসের কথায় আমরা চমকপ্রদ গল্প খুঁজি, বিপ্লব-কথা যেন রহস্য সিরিজের বিকল্প। 'মেকি' মুদ্রা বাজারে খাঁটি মুদ্রাকে টিকতে দেয় না, এ ব্যাপারে এ দেশেও তা ঘট্‌ছে। আশ্চর্য এই যে তবু আসল মুদ্রা পাওয়া যায়। এমন কি, সম্প্রতিকালে নতুন খাঁটি মুদ্রাও বাজারে বেরোয়। আশা করি মেকির মৌতাত সত্ত্বেও সে-সব লেখা পাঠকের গ্রাহ্য হবে। কারণ, সব 'বিপ্লব স্মৃতিকথা' দোষ-ত্রুটিশূন্য না হলেও তথ্যগুণে অধিকাংশই মূল্যবান,—কিছু না কিছু জিজ্ঞাসুদের দাবি মেটায়। যেমন, অনন্ত সিং-এর চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বিশদ বিবরণ। ওরূপ নাম না বাড়িয়েও বলতে পারি—দু'একখানি বই সেই সঙ্গে সাহিত্যগুণান্বিতও। আর অধিকাংশই অভিনন্দন-যোগ্য। তথাপি সবশুদ্ধ দাবি সম্পূর্ণ মিটেছে এমন নয়। কারণ আমাদের দাবি শুধু তথ্যাহরণের দাবি নয়, দাবি জিজ্ঞাসা-সঞ্চারেরও। দেখি নানা অস্পষ্ট ধারণাই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেককে পোষণ করতে হয়—যথা 'স্বর্গে হানা দেওয়া' নয় বরং শূন্যে কামান দাগানোই। বারীন্দ্র ঘোষের কথা থেকে মনে হয় ওরকমই ছিল তাঁদের চেষ্টা। অন্ততঃ তাঁরা নিজেরা তাই বুঝেছিলেন। পাঠক সাধারণ কী বুঝবে তা থেকে? তার পরবর্তীদের না ছিল কোনো বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ, না বাস্তববুদ্ধি—না দেশের জনসাধারণের সমর্থন-সংগ্রহের জন্য মাথাব্যথা, না বিপ্লবের প্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা। অর্থাৎ বিপ্লববাদের না 'ইডিয়লজি', না 'প্রোগ্রাম', এরূপ ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়।

এমন কি বিপ্লবী দলগুলির পরস্পরের যে মিল ছিল, তাও বলা যায় না। "কঃ পন্থা ?" —প্রথম থেকেই এ প্রশ্ন উঠেছে। আর শেষ অবধি প্রায় সকলেই যেন বোমা-পিস্তল সংগ্রহ, অর্থাভাবে ডাকাতি, গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতক হত্যা, কিম্বা শ্বেতাঙ্গ শাসক সাহেবদের নিধন করে, শাসকগোষ্ঠীতে ত্রাস সঞ্চার—এতেই দেখেছেন পন্থা, এরূপ অন্ধগলিতেই দলগুলি মাথা ঠুকে মরেছে। এইসব ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়। তাই বিপ্লববাদকে একসময় **Anarchism** এবং পরে **Terrorism** বলাটা চালু হয়। যদিও **Militant Nationalism** বলাই যথার্থ, যাই বলা হোক সব মিলিয়ে এ সম্বন্ধে জানা-বোঝার প্রয়োজন এখনো রয়ে গিয়েছে। বিপ্লবী প্রচেষ্টার জটিল আন্দোলনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক, পজিটিভ ও নেগেটিভ তরঙ্গ-সংঘাত থাকবারই কথা, তথাপি তার নিগূঢ় প্রভাবে জাতীয় চরিত্রও আলোড়িত ও বিবর্তিত না হয়েছে, তা নয়। দুর্বল দেহ, দুর্বল চিত্ত, ভীরু বাক্‌সর্বস্ব বাঙালী চরিত্রের মধ্যে এই একটি কারণেও সাহসের, আত্মত্যাগের ও আত্মপ্রত্যয়ের আগুন জ্বলে উঠেছিল, এখনো নিভছে কিনা জানি না। বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের দান যেরূপ, ক্ষুদিরাম থেকে সুভাষ বসুদেরও দান সেরূপ বাঙালী চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাঙালী বিপ্লববাদ ইতিবাচক ও নেতিবাচক সমস্ত গুণে-দোষে একটা বিশিষ্ট প্রকাশ (**feature**)। আর সে বিপ্লবপন্থাকে বুঝবার পক্ষে প্রধান উপকরণ এখন সেই বিপ্লববাদীদের স্মৃতিকথা। ঘটনার বিবরণ অপেক্ষাও তার ভাবনা ও কর্মনীতি এখনো আমাদের স্থিরচিত্তে বিবেচ্য ও বিচার্য।

ভাগ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থের অভাব ক্রমে কমছে—ঐতিহাসিকদের কাছে তাই বৈপ্লবিক কর্মধারার উৎস-গ্রন্থের অভাব কমে আসবে। অনেক বই-ই জনসাধারণেরও পাঠ করা উচিত, তবে ফলাও-করা সত্যমিথ্যা রং চড়ানো আবেগ সৃষ্টির কাহিনী না পড়াই ভাল। আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনায় অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অন্ততঃ খানকয়েক বই: হেমচন্দ্র কানুনগোর, ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর, বাংলার বাইরে যোগেশ চ্যাটার্জির, (বারাণসীর) শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ও আদিপর্বের ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিগ্রন্থ। এই বইগুলির গুরুত্ব এই যে, হেমচন্দ্র কানুনগো ও ডঃ ভূপেন দত্ত মহাশয়দের বই থেকে পাই বিপ্লববাদের প্রথম যুগের কথা। তীব্র ভাষায় এই বাস্তববাদী পুরুষ সেই অরবিন্দ-বারীন্দ্র যুগের বিপ্লবী নেতাদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কতটা ঠিক, কতটা বেঠিক, জানি না। কিন্তু সে যুগেও কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁর সে সমালোচনা অগ্রাহ্য করার মত নয়। ত্রৈলোক্যমহারাজ ও ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনকথায় আছে সুস্থচিত্ত, অসামান্য একজন মানুষের জীবনাংশ হিসাবে বিপ্লববাদের দ্বিতীয় বা মধ্যপর্বের বিবরণ ও আলোচনা, শচীন্দ্র সান্যালের কথায় আছে অসামান্য এক কর্মীপুরুষের কর্ম, চিন্তা ও বিপ্লব-ভাবনার কথা। এছাড়াও উৎকৃষ্ট বই আরও আছে, তা স্মরণীয়। তবে পূর্বেকার ও পরেকার আরও গ্রন্থের সঙ্গে এসব বই মিলিয়ে পড়লেও, বিপ্লবের মোটামুটি তিন পর্বের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হতে পারে, এই আমাদের বিশ্বাস। তাই এসব গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ আমরা কামনা করি।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' উপস্থাপিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই যাঁরা পাঠ করবেন তাঁদের নিকট আর বাক্যব্যয় নিরর্থক এমন কি অশোভন; তবু তা করতে হল, এ কার্যে পূর্বাহ্নে লেখক প্রতিশ্রুত। আর লেখকের উদ্দেশ্য পাঠকদের সঙ্গে এ বইয়ের যথাসম্ভব তাৎপর্য স্মরণ।

বাঙলার বিপ্লবীদের মধ্যে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় আর অল্প দু'একজনার মতই 'প্রবাদ-পুরুষ', তাঁদের অনেকের মতই 'প্রচার' কেন, প্রকাশ-বিমুখ; অথচ সহৃদয় এবং নামকরা বিপ্লবী হলেও, স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিত্বের মানুষ, অমায়িক এবং আকর্ষণীয়। জানা সত্ত্বেও এই লেখককে তিনি প্রথম সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন অনেক পরে, ১৯৩৮-এর একটি রাজনৈতিক সভায় এবং তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কালে রাজনৈতিক কর্মনীতির অঙ্গ ছিল গোপনচারিতা; এখন কাল পরিবর্তনে তার নীতি হল প্রকাশ-ধর্মিতা,' তখন বাংলায় তাঁর বাস নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য বাংলার বাইরের সে সভায় তিনি কথা বলেন নি। তবে সেখানে তাঁর উপস্থিতিই ছিল যথেষ্ট। অর্থাৎ তখনো তিনি রাজনীতিতে আগ্রহশীল, তবে পরিচালক অপেক্ষা পরিদর্শক। তখন তিনি সপরিবারে রাঁচীবাসী, সুচিকিৎসকরূপে, বিশেষ করে যক্ষ্মারোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে, বাঙলায় বিহারে প্রসিদ্ধ। রাজনৈতিক সহযোগীদের অনুরোধে এ সময়ে তিনি তাঁর জীবনকথা ব্যক্ত করেন; সম্ভবতঃ সময়াভাবেই তা মুখোমুখি বলে যান; রাঁচীতে তাঁর চিকিৎসাধীন একজন তরুণ ও মুক্ত রাজবন্দী নারায়ণ লাহিড়ী তা লিখেছেন, এবং তাই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থে বিপ্লব-প্রসঙ্গে তথ্য ও ঘটনাংশ যা আছে পাঠকের নিকট তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে বিশেষ দু'একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করতে পারি, তার তাৎপর্য আমরা যা বুঝেছি সংক্ষেপে তাও নিবেদন করছি।

বিপ্লবের ভাবাদর্শে, ধ্যান-ধারণা বিষয়ে বিশেষ কথা নেই এ-গ্রন্থেও। লক্ষ্য হিসেবে মনে হয় তাঁদের আশা ছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে, এই ধারণা তাঁদের ছিল, আর এই ছিল তখনকার কর্মযজ্ঞের পক্ষে যথেষ্ট। ভাবী কন্‌স্টিটিউশন নিয়ে তর্ক ছিলো তখন নিষ্প্রয়োজন।

বিপ্লবের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জানতে পারি, চতুরঙ্গ বাহিনীর গোপন সংগঠন ছিল বিপ্লবের প্রথম পাদ। ছাত্র, যুবক, কৃষক-শ্রমিক ও ভারতীয় বিপ্লব-দীক্ষিত ফৌজ— এই চার শাখা নিয়ে সেই চতুরঙ্গ। একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক নিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠন তিনি চান নি। চেয়েছেন দেশের জনশক্তিকে নিয়ে। পরবর্তী সময়ে আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন—কার্যতঃ তা হয়ে ওঠে নি। চেষ্টা সাধারণ ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে আবদ্ধ থেকে গিয়েছে। দু'একজন তদতিরিক্ত সাধারণ মানুষকেও সংগ্রহ করেছেন। তাতে প্রথম মহাযুদ্ধকালে ফৌজের সঙ্গে গোপনে বিপ্লব প্রস্তুতির চেষ্টা হয়েছিল। ফৌজের লোক ও কিছু বিপ্লবী কর্মী ঐ সূত্রে প্রাণ দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ও ব্রহ্মদেশস্থ ভারতীয় ফৌজের মধ্যে তখনকার সে আয়োজনের কথা সকলেই এখন জানে।

কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে যাদুগোপালবাবুর নিজস্ব মত ছিল। পিস্তল প্রভৃতি

দু'দশটা অস্ত্র-সংগ্রহ, ত্রাসসূচক গুপ্তহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি পদ্ধতি এসবে তাঁর মূলতঃ সম্মতি ছিল না। তাঁর অভিপ্রায় ছিল গুপ্তসমিতি ও সংগঠন বাড়িয়ে যাওয়া। গ্রামে গ্রামে সে-সব শক্তিকেন্দ্র আশানুরূপ বৃদ্ধি পেলে গেরিলা পদ্ধতিতে থানাগুলি দখল করা কঠিন হবে না। এভাবে শহরকে গ্রামাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সহজ হবে; শাসকশক্তি শহরে প্রবল থাকলেও, গ্রাম থেকে উৎখাত হবে। গ্রামে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে শাসক-শক্তিকে পযুর্দস্ত ও নিষ্ক্রিয় করাই আসল সংগ্রাম-কৌশল। বর্তমানের নকশালপন্থী কোনো কোনো দল অনুরূপ চীনা-বিপ্লবী (লিনপিয়াও ?) নীতি এই 'গ্রাম থেকে শহর দখলে'র কৌশল গ্রাহ্য করেছে। কৌশলটা নতুন নয়, মূল গেরিলা-সংগ্রাম তো এরূপই। ভারতের ক্ষেত্রে ডাঃ যাদুগোপাল এ কৌশলই অবলম্বনীয় মনে করতেন*। কার্যতঃ প্রথম মহাযুদ্ধকালে এ কৌশল অবলম্বনের সুযোগ ও সময় পাওয়া যায়, কিন্তু পরেও যায় নি। ফলে কার্যতঃ ঘটেছে **terrorism**; বা তার অপেক্ষাও ব্যর্থ ডাকাতি প্রভৃতি **action**; তা যাদুগোপালের অভিপ্রেত ছিল না।

বিপ্লবী দলগুলির ঐক্য ছিল যাদুগোপালের প্রধান এক কার্য। বাংলার গুপ্ত-সমিতিগুলি প্রথমাবধি পৃথক পৃথক ভাবে কাজে লাগে—একথা ঠিক। বাংলায় 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এই দু'দল শুধু প্রতিযোগী নয়, অনেক সময়েই পরস্পর প্রতিকূল হয়ে পড়ত, বহু রকমে নিজেদের উদ্দেশ্যও খণ্ডিত করেছে। মাত্র দু'বার দলাদলি ছেড়ে তারা কিছুদিন মিলিতভাবে কাজ করতে পেরেছিল বলে জানা যায়—প্রথম মহাযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৮), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে। দ্বিতীয়বার (১৯২৬-২৯-এ) কারাবাসকালীন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ও মদন ভৌমিক প্রভৃতির আগ্রহে ও পরামর্শে, কিন্তু এই শেষ ঐক্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ১৯২৯-এর পরে পরস্পর-বিরোধ আবার আরম্ভ হয়। 'বিপ্লবপন্থীদের ঐক্য' যাদুগোপালের কর্মকাণ্ডে অপরিহার্য বলে গণ্য। সম্ভবতঃ সে দলাদলি তাঁকে মর্মাহত করে থাকবে। বিষণ্ণ ও ক্লিষ্ট করেছে। এ কথাও স্মরণীয়—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধুরা ছিলেন মূল কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্য। কর্মসূত্রে পরে 'যুগান্তর' নামে পরিচিত দলগুলির তিনি হন প্রধান পরিচালক—কিন্তু দু'দলের ঐক্য ছিল তাঁর প্রধান উদ্দিষ্ট।

এইরূপ ছিল ডাঃ যাদুগোপালের বৈপ্লবিক ভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্য, সর্বশ্রেণীর জনশক্তির সংগঠন, গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি এবং বিপ্লবী ঐক্য—তাঁর ইতিবাচক দিক; আর নেতিবাচক দিক জনবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত যুবসংগঠন, সন্ত্রাসপন্থা ও তদানুষঙ্গিক পথভ্রান্তি এবং খণ্ডখণ্ড বিপ্লবী দল উপদলের দলাদলি, বিরোধ-বিভেদ—এইসব তাঁর অনভিপ্রেত। কিন্তু বাঙলার ও ভারতীয় সশস্ত্র স্বাধীনতার আন্দোলন ডাঃ যাদুগোপালের ভাবনায় সর্বাংশে পরিচালিত হয়েছে তা বলা যায় না। একে গুপ্ত-

* 'ভারতে সমর সংকট'—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সমিতি, তাতে পূর্বেকার পূর্বাবধি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দল, বারেবারে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, নানা মত ও নানা কর্মাদর্শে চালিত হয়েছে। তথাপি সকলের আদর্শ, নিয়ম-নীতি, কর্মপ্রণালী অনুসন্ধান ও অনুধাবন না করলে যেমন ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ধারা সম্পূর্ণ জানা হয় না, আমাদের ধারণা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট ভাবনাকে ও দানকে অনুধাবন না করেও বিপ্লব আন্দোলনের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করা যায় না।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ কিছুটা তাঁর হাতে-লেখা নোট, অনেকটা মুখেমুখে কথিত ও তদনুযায়ী অনুলিখিত, এ কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ছিল। সেভাবেই প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতিতে তাঁর ইচ্ছা ছিল—পুনরুক্তি বর্জিত হয়, কিছু নোট নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রাসঙ্গিক, আর কিছু কথা বাহুল্য—তা পরিত্যক্ত হয়। নোটের ভাষায় ও কথনকালীন ভাষায় যে শিথিলতা থাকা সম্ভব তাও মার্জিত হয়—এও তিনি বলেছিলেন। এসব বিষয়ে তিনি তাঁর অনুজ সহকর্মীদের সঙ্গে অনেক সময় খোলাখুলিভাবে পরামর্শ করেছেন, নিজের কথিত প্রসঙ্গাদি সম্পর্কেও তিনি তাদের সঙ্গে বহুদিন ধরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আলাপ করেছেন। দু-এক সময়ে দু-একজনকে পত্রদ্বারাও আপন বক্তব্য জ্ঞাপন করেছেন—সেরূপ পত্রও কিছু কিছু পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং তাঁর বক্তব্য সংস্কার করে যেতে পারবেন না—স্বাস্থ্যে কুলাবে না, সময় হবে না—বলেই ছিল তাঁর এসব প্রয়াস। শেষ অবধি তিনি এই সংস্করণ উল্লিখিতরূপে প্রস্তুত ও প্রকাশের ভার অর্পণ করেন আমাদের (গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, শান্তিময় রায়কে)—বোধহয় স্নেহবশে,—আমাদের যোগ্যতার জন্য নয়। শুনেছি তাঁর সহযোগী ও আত্মীয়দেরও তাতে সম্মতি ছিল। অবশ্য তাঁর সহযোগীদের কার কার সঙ্গে প্রয়োজন মত পরামর্শাদি করতে হবে, তাও জানিয়ে কতকটা এই সম্পাদকের দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা লাঘব করেছিলেন। আমাদের দ্বিধা ও দুশ্চিন্তার কারণ এই—আমরা (সম্পাদকত্রয়) তিনজনই রাজনীতিতে তখন পৃথক পার্টি ও পৃথক মতবাদের সঙ্গে যুক্ত। অবশ্য তিনি তা জানতেন। আমাদের মতামত নিয়েও তাঁর সঙ্গে সুস্থ মনে আলোচনা হয়েছে। তাতে অনেকটা বুঝেছিলাম—আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তিনি সামাজিক মুক্তি, জাতীয় ঐতিহ্য এবং সুস্থ মানবতাবাদে আস্থাশীল ছিলেন। আমাদের কোনো কোনো নীতি ও পদ্ধতিকে তিনি তেমনি 'উগ্র' ও ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করতেন। সে বিষয়ে আমরা যে তাঁর মত ও ধারণা মানতাম না, তাও ভালো করেই জানতেন। তথাপি শুধু আন্তরিক স্নেহভাজনদের সততায় বিশ্বাসী ও নিজের বিচারবুদ্ধিতে দৃঢ়মত হয়ে এই দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁর আলাপ-আলোচনা ও উপদেশ অনুযায়ী প্রস্তুত করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করেন। তাঁর পত্নী-পুত্রেরা সর্বান্তকরণে তা অনুমোদন করেন। সবশেষে সস্নেহ পরিহাসে বলেছিলেন, "ওহে দেখো, আমাকে একেবারে কমিউনিস্ট করে দিও না," জানাতে পারি, জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা মত—আমরা তাঁর আস্থার মর্যাদা রাখতে চেয়েছি। হয়তো একটু বেশিই সতর্ক হয়েছি যেন তাঁর মতামত কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয়—পুনরুক্তি

দূর করেছি, যতটা তা দূর করা সম্ভব তাও করি নি। অতি সামান্যই পরিবর্তন করেছি, যা তিনি সংশোধনার্থে বলে গিয়েছিলেন তার অতিরিক্ত কিছুই যোগ করি নি। আক্ষরিক ও মুখের ভাষার শিথিলতা মার্জিত করতে গিয়েও বারেবারে থেমে গিয়েছি—মনে হয়েছে তাঁর কথার বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হবে, সম্পাদনায় তথাপি যথেষ্ট ত্রুটি থাকবার সম্ভাবনা—সে আমাদের যোগ্যতার অভাব। যাদুদার বক্তব্যকে অবিকৃত রাখবার ব্যাপারে ত্রুটি ঘটে নি—এই আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে আরও একটু বলার আছে। সম্পাদনা ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন সুহৃদ্বয় চিন্মোহন সেহানবীশ ও শান্তিময় রায়। আমার পক্ষে তা অতি সামান্যই সাধ্য হয়েছে—যদিও আমার উপরই এই নিবেদন লেখার ভার তাঁরা অর্পণ করেছেন। আশানুরূপ দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি নি।

যাঁদের শুভেচ্ছা লাভ করেছি তাঁদের সকলের নাম করা সম্ভব হল না। গ্রন্থে যাঁদের নামোল্লেখ হয় নি যাদুগোপালের ব্যক্তিগত আত্মীয়-পরিজনদের ও রাজনৈতিক অসংখ্য সহকর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের চিরস্মরণীয়। এর মধ্যে অরবিন্দ ভবনের পাঠাগার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে অরবিন্দের দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রটি পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাহায্য ভিন্ন ওকাকুরা ও অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির আলোকচিত্র পাওয়া সম্ভব ছিল না।

আমাদের বিবেচনা মত ও স্বর্গীয় লেখকের অনুমতিক্রমে যা প্রাসঙ্গিক হিসাবে যোগ করেছি তা কয়েকটি পরিশিষ্ট পর্যায়ে সংযোগ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—যাদুবাবুর স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীকালীচরণ ঘোষ মহাশয়কে লিখিত কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ পত্র। ১৯৭৪ সালে শ্রীমান শান্তিময় রায়কে প্রদত্ত পুস্তকে লেখকের স্বহস্তলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তারিখের ব্যাখ্যা, ১৯৪৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বর দিবসের বক্তৃতা এবং আরও কিছু কিছু লেখা ও আলোচনা যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবিতকালেই আবিষ্কৃত ও আলোচিত হয়েছিল—যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথের খসড়া প্রস্তাব ও তার উপর লেনিনের সংশোধন। এ বিষয়ে যাদুবাবুর মতামত ও চিঠি-এগুলি প্রাসঙ্গিক মনে করে সংযোজিত হল।

এ কথা তো স্পষ্ট যে আমাদের উদ্যোগ বা চেষ্টায় আমরা কিছুতেই এ গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যবস্থা করে উঠতে পারছিলাম না। হয়তো এদিনে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না যদি না পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশ-ব্যয়ের অনেকখানি ভার (১৫০০০ টাকা) বহন না করতেন এবং প্রকাশক হিসাবে অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স-এর পক্ষে শ্রীমান বিমল কুমার ধর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুদ্রণ ও প্রকাশ ভার গ্রহণে অগ্রসর হয়ে না আসতেন। এই সংস্করণের জন্য আমরা তো নিশ্চয়ই, পাঠকসমাজ ও এই দুই পক্ষের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। যাদুবাবুর অন্যতম স্নেহভাজন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট হতেও কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতার ব্লক তৈরীর মারফৎ অকুণ্ঠ সাহায্যও উল্লেখযোগ্য। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মী শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে নতুন করে গ্রন্থপঞ্জি তৈরী করে দিয়ে অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

আর যাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য অন্ততঃ আমাদের পক্ষে—যাঁরা পূর্বাপর সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব করেছেন তাঁরা হলেন মাননীয় সুহৃদ্দ্বয় শ্রীনয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়—যাঁদের অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ ভিন্ন এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবই হোত না।

সি-আই-টি রোড
ব্লক—এইচ্, ফ্ল্যাট-১৯
কলিকাতা-৭০০০১৪
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০

Dr. JADUGOPAL MUKHERJEE

CIRCULAR ROAD
RANCHI

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান গোপাল,

তোমার চিঠি আমার ছেলে অমলের পড়ে শোনাল। তুমি আমার বই-এর দ্বিতীয় সং-এর ভার নিচ্ছ জেনে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করছি। গত দশ বছর যাবৎ অনেকেই আমাকে বই টির দ্বিতীয় সং প্রকাশের জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন কিন্তু প্রথম সং-এর একটি ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ এবং অনেক নূতন ও অপ্রকাশিত তথ্য পরিবেশনের লোভ দুটো কারণে সম্বরণ করতে হয়েছিল, প্রথমতঃ আমার একার পক্ষে অত পরিশ্রম করা সম্ভব ছিলনা, দ্বিতীয়তঃ বই টির সম্পাদনার জন্য এমন কেউ এগিয়ে আসেননি যাঁর আমাদের সে যুগের বিপ্লবের প্রচেষ্টা এবং দর্শন জানা ছিল ও এভার নিতে পারতেন। কিন্তু তুমি আমাদের বিপ্লবী দলের অন্তরঙ্গোষ্ঠীর লোক; আমাদের খুব কাছ থেকে দেখেছ ও জেনেছ স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বকীয় ভূমিকা নিয়েছ এবং তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য আমাদের গর্বের বিষয়, সুতরাং তোমার চেয়ে যোগ্য আর কে আছে। যখন শুনলাম যে তুমি এ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী, এবং কল্যাণীয় শ্রী চিন্মোহন সেহানবীশ ও শ্রী শান্তিময় রায় তোমাকে এব্যাপারে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন, তখন আমার আনন্দ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে জানিয়ে এবং তোমাদের আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আমার এখানে আরও অনেক তথ্য প্রতিলিপি আলোকচিত্র এবং বই রয়েছে। আশা করি এগুলি তোমাদের কাজে লাগবে। আমার অনেক বন্ধু, সহকর্মী ও সহযোগীর নাম রয়েছে যাঁদের মধ্যে বই প্রকাশের আগে সাহায্য ও আলোচনা করলে আমি খুব খুশী হব। এঁদের মতামত একটা বক্তব্য খুবই মূল্যবান হবে। এঁদের নাম যথাক্রমে

সর্বশ্রী নীলমণি সাহু রায় -
" শালীবাহন ঘোষ
" মনোরঞ্জন গুপ্ত
" ভূপেশ দত্ত
" ইন্দ্রধর মজুমদার
ড. নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী
শ্রীমতী কমলা মুখার্জী
শ্রী নবনারায়ণ দাসগুপ্ত
শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস
শ্রী অলোক দাস

তুমি আমার বিশেষ স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি -

শ্রীগোপাল হালদার

শ্রীগোপাল হালদার
কলকাতা।

ভূমিকা

সৃষ্টি একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। আবার সেই সৃষ্টির মধ্যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব, তাও কম আশ্চর্য নয়। আমরা সমাজবদ্ধ মানুষের যুগে বাস করছি। তাই মানুষের সমাজকে বুঝতে চাই মানুষের চিন্তাধারা ও কার্য-পদ্ধতির বিচার করে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে আর মনের টানে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হয়ে বাস করছে। দুঃখ থেকে, অভাব থেকে সে অব্যাহতি পেতে চায়। পৌরাণিক যুগেও দেখা যায় মানুষ দুঃখ-পীড়ন থেকে বাঁচবার জন্য প্রয়াস করছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড মানুষকে শুধু সাম্প্রতিক মুক্তির পথ নয়, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির পথেরও নির্দেশ দিচ্ছে। লোকসংখ্যা যত বর্ধিত হচ্ছে, জীবনযাত্রা সহজ ও অনাড়ম্বর ক্ষেত্র থেকে ততই সাড়ম্বর ও জটিল ক্ষেত্রে পৌঁছুচ্ছে। তাই মানুষ নূতন করে প্রকৃতির কাছ থেকে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা নূতন ভাবে বাধা বিঘ্ন দূর করবার উপায় বার করছে। কোন কোন সময়ে দেখা যায় কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি পারিপার্শ্বিকের অভাব ও বিশৃঙ্খলা ঘুচিয়ে নূতন ও বৃহত্তর জীবন উপভোগ করবার সন্ধান বার করতে চাইছে। এই চিন্তা ব্যষ্টি মানুষে মানুষে ও সমাজে সমাজে নূতন ছাঁদে সম্পর্ক নির্ণয় করতে চায়। যখন সমাজে রাজ্য গঠিত হল তখন রাজ্যের সঙ্গে সমাজের কি রকম সম্পর্ক হলে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ হয় সেই উদ্দেশ্যে চিন্তা করতে করতে অদূর ভবিষ্যতে তার বাস্তবরূপ যেন দেখতে পেল। তখন সে চারিদিকে শোনাতে লাগল তার নিজের চিন্তার কথা। যারা এই নব চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হল তাদের একত্র করে সে দল গঠন করল এবং ভবিষ্যতের বুকে ব্যষ্টি মানুষ, সমাজ ও রাজ্যের যে কল্যাণকর পারস্পরিক পরিপূরক সম্পর্কের রূপ দেখেছে, তাকেই স্থির লক্ষ্য করে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছবার পথ বা কর্মসূচী প্রস্তুত করতে লাগল। যুগে যুগে মানুষের এই চেষ্টা মানুষকে অগ্রগতির পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, লক্ষ্যের দিকে যখন কর্মসূচী ধরে এগিয়ে যাওয়া যায় তখন দেখা যায় কিছুকাল পরে নূতন পারিপার্শ্বিকে নূতন বহুপ্রকারের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং লক্ষ্যও যেখানে ছিল সেখানে আর নেই। কালের বুকে সেও পিছিয়ে গেছে, আর যেন তেমন স্পষ্ট নেই। যাত্রাপথের নূতন সমস্যা লক্ষ্যকে ম্লান করে দিয়েছে। নূতন সমস্যার নূতন করে নিষ্পত্তি করতে গিয়ে নূতন আর এক চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্ব লক্ষ্যের রদবদল করে নূতন করে পথ বা কর্মসূচী রচনা করতে লাগল আর এক অভিনব লক্ষ্যে দৃষ্টি রেখে। এই মতপ্রচার, দলগঠন আর পথ কেটে লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা হল মানুষের সমাজের অগ্রগতির ইতিহাস। এই পথের শেষ নেই, শুধু পথে চলবার গতিটাই সত্য। কোনও সমস্যার নিঃশেষে সমাধান কখনও হয় না, তাই নিরন্তর আগন্তুক সকল দুঃখ-অভাবের, সকল সমস্যার সমাধান করবার প্রয়াসই চলে চিরদিন। সকল আদর্শবাদ, সকল তত্ত্ব এই একই নিয়মে চলছে। শেষ কথা কোথাও নেই। যে বাদ বা তত্ত্ব বর্তমানে অভ্রান্ত এবং কাম্য বলে মনে হয়, সমাজের অগ্রগতির পথে কিছুকাল

পরেই তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা প্রত্যাহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত হল সাময়িক আর সমস্যা পূরণের চেষ্টা হল সকল কালের। আবার যদি দৈহিক প্রয়োজন মেটে তখন দেখা যায় যে, মনের প্রয়োজন মিটছে না। আধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো কালের বুকে দুলছে, একদিক থেকে ঠেলে উঠে হয়ত সে জড়বাদের দিকে এগুতে লাগল। অনেকটা এগিয়ে দেখা গেল যে সব অভাব মিটল না, অনেক দুঃখই রয়ে গেছে। তখন সে দুলে বিপরীত দিকে উঠতে লাগল। যদি সেটা অধ্যাত্ম দিকে হয়, সে পথেও অনেক দূর উঠে দেখল যে, জীবনের সব প্রয়োজন সেখানে মিটছে না—তখন আবার সে বিপরীতমুখী হল। দু'তিন শতাব্দী বা তারও কমবেশী সময়ে এই পেণ্ডুলামের গতিবেগ বিভিন্নমুখী হচ্ছে। এর সাক্ষ্য প্রত্যেক দেশ বা জাতির ইতিহাসে মিলবে।

স্রষ্টার ইচ্ছায় বা নৈসর্গিক নিয়মে ধাক্কাধাক্কি না করে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা চলছে, আবার সেই নিয়মেই বজ্রপাত, ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যার উৎপত্তি হচ্ছে। শুধু সময়ের গুণেও বড় বড় পরিবর্তন সমাজে এসেছে। ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে তাই জানতে পারা যায় না। আবার কখনও কখনও বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘটা করে ধ্বংসের ভিতর দিয়ে নূতন করে সমাজের ও রাজ্যের দ্রুত পরিবর্তন এনেছে। বিপ্লব অনেক সময়ে তীব্র আলোড়ন বা বিস্ফোরণের ভিতর দিয়ে আসে না। পৃথিবীর মানবসমাজে সময়মতো সুষ্ঠু মত প্রচারে, কেবল এক সময়ের গুণেই বহু পরিবর্তন ঘটেছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, ভাঙাগড়ার দ্রুত অভিব্যক্তিতে সকল সময়ে একটা বৃহত্তর জীবনের কল্পিত স্বাদের আকাঙ্ক্ষা আছে—তা এ আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষাই হোক, আর নাই মিটুক।

কিছুকাল ধরে আমাদের দেশে বিরোধী দুটো শক্তি পরস্পর সংগ্রাম করছে। এটাকে এক ভাবে বলা যায় যে, মন্থরতা আর দ্রুত-গতিবেগের লড়াই। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে সর্বাঙ্গীণ বিস্তারের আগ্রহ হারিয়ে কৃষিপ্রধান-ব্যবস্থাজাত হওয়ায় তার গতি মন্থর আর পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি শিল্পপ্রধান ও যন্ত্র-সর্বস্ব হওয়ায় তার গতি দ্রুত। এই দুই সভ্যতার ভালো-মন্দ বিচারের এখানে প্রয়োজন নাই। অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের প্রকৃত রূপ। এ আমরা জানি যে, শুধু দৈহিক ক্ষুৎপিপাসা মিটিয়ে দ্রুত চললেই সব কিছু পাওয়া যায় না। অন্তরের অন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণাও মেটাতে হবে। অগ্রগতি ঠিক হচ্ছে কিনা—এই দু'রকমের ক্ষুৎপিপাসা মেটানর যোগ্যতার কষ্টিপাথরে তার যাচাই হবে। এই পুরাতন দেশ কয়েক সহস্র বৎসরের চলার পথে অনেক রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। বার বার এই দেশ তার অন্তরের আলোকে পারিপার্শ্বিকের গভীর অন্ধকারকে দূর করতে সমর্থ হয়েছে। সে রাজনৈতিক পরাধীনতাকে কোনদিনই শেষ কথা বলে মেনে নেয় নি। গ্রীক, শক, হূন, তাতার পাঠান, মোগল—রাজ্য গড়েছে, সাম্রাজ্য গড়েছে কিন্তু এই প্রাচীন জাতির অন্তরের শক্তিকে নষ্ট করতে পারে নি। এই দেশ কর্ম-ধর্মী হয়ে বাহিরের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছে। ইতিহাসে দেখি আক্রমণকারীরা নিজেরাই ক্রমে ক্রমে ভেঙেচুরে

এই দেশেরই ধূলিতে মিশিয়ে গেছে। আজ আলাদা আলাদা করে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। পরাধীন ভারত তার বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে পারে নি। মদগর্বী পাশ্চাত্ত্য নূতন দেশগুলি তাদের অভিজ্ঞতার উপঢৌকন ভারতে পৌঁছে দিয়েছে। এখন স্বাধীন, প্রাচীন ভারত তার জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার উপঢৌকন বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবে, এই যেন যুগের ইঙ্গিত। ভারতের সামগ্রিক প্রাণশক্তির পরিচয়ে ভারতের সত্যকারের ইতিহাস ফুটে উঠবে। পৃথিবীর ইতিহাসের বিজ্ঞানে ভারতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অনেক নূতন তথ্য যুগিয়ে দেবে। দলগত বা 'বাদ'-গত অতিরঞ্জনের ব্যাপার ইতিহাস নয়। ইতিহাস একটা বিজ্ঞান এবং সেখানে শুধু তথ্যের উপরেই নির্ভর, কাহিনীর স্থান সেখানে নেই। মানুষ ইতিহাসের প্রয়োজনে সৃষ্ট; আবার ইতিহাস-সৃষ্টির উপাদান এই মানুষই যুগিয়ে দেয়। কোন এক প্রকারের দার্শনিক মতের উপর এ দেশের বিপ্লব আন্দোলন গড়ে ওঠে নি; তার কারণ, বিদ্রোহের ও বিপ্লবের প্রস্তুতিতেও ক্রমবিকাশ আছে। এই ছোট ভূমিকার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'র কথাগুলি যেন এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকরা গ্রহণ করেন।

সূচীপত্র

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

[চুম্বক]

প্রকাশের পিছনে অপ্রকাশ, ব্যক্তের আড়ালে একটা অব্যক্ত আছেই। বর্ষার ঘোরঘটা সাজগোজের অন্তরালে নিদাঘের বাষ্পসঞ্চয়ের অদৃশ্য প্রয়াসকে অস্বীকার করবে কে? বিপ্লবকে বুঝতে হলে বিপ্লবীদেরও বুঝতে হবে। কেন তারা বিপ্লবী হয়? এরা তো মঞ্চের অভিনেতা। অভিনয়ের সময় তারা প্রকট, নৈলে অপ্রকট। তবু জিজ্ঞাসা থেকে যায়—মঞ্চ সাজাল কে? কি করে নাটকীয় বিষয়বস্তু ফুটে উঠল? ব্যক্তিগত জীবনে এ প্রশ্ন ও তার উত্তর যেমন প্রাসঙ্গিক, সমাজগতভাবেও তাই। বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় উপাদান কোন কোন পর্যায়ে ফুটে উঠেছে তার একটা লক্ষণীয় বিজ্ঞপ্তি এখানে দেওয়া যাক। প্রথম দেখা যাবে **বৈদেশিক শক্তিকে পদে পদে বাধা দান**—Resistance at every step—**যেন সে গুছিয়ে বসতে না পারে। তারপরের ধাপে যখন যেখানে পারা যায় উৎখাতের প্রচেষ্টা**—Regional dissolution। সর্বশেষে তাকে **সবসুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে তার জায়গায় আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রয়াস।**

জীবদেহে রোগের কারণ বীজাণু প্রবেশ করলে আত্মরক্ষার্থে দেহে নানাবিধ শক্তির ক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে যেমন লোক-অর্থ-রসদ-অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ডাক পড়ে—ফলে নানারূপ প্রস্তুতি, দেহেও তেমনি সর্বস্ব-পণ-করা সাড়া আসে। রোগ-প্রতিষেধক শক্তির সঙ্গে রোগ-বীজাণুর সংঘর্ষ হয়! তার ফলে বহু লক্ষণ—যাকে রোগলক্ষণ বলে—বিকাশ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত আত্মশক্তি প্রবল থাকলে সংঘর্ষে জয় হয়। তার নাম আরোগ্য। কিন্তু রোগলক্ষণের ক্রমবিকাশ বা আকস্মিক বিকাশ, দুইই সম্ভব।

সমাজদেহে পরিবর্তনের কারণ ঘটলে, সমাজদেহে আভ্যন্তরীণ দোষ বা বিষের উদয় হলে—সেও মাপাজোখা নিয়মের পথ বদলাতে বাধ্য হয়। সেই গতিবেগে **বিবর্তন** (Evolution) বা **উদ্বর্তন** (Revolution) দুইই লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের প্রয়োজনে সমাজ গড়ে উঠেছে। পরস্পর নির্ভরশীলতা আছে বলেই মানুষ সমাজ-বদ্ধ জীব। দেহের প্রয়োজন এবং মনের প্রয়োজন, দু'রকম চাহিদা মেটাতে পারস্পরিক সম্পর্ক মানুষে মানুষে দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যষ্টির মতো সমষ্টির অর্থাৎ মানুষের সমাজেও জন্ম, বৃদ্ধি, গঠন-কাঠামো, জরা, মৃত্যু আছে। সেও অচল নয়, গতিসম্পন্ন।

মানুষের চলতি পথে নানা অন্তরায়। সেজন্য সমাজকেও বহু পরখ করে সামনে পা বাড়াতে হয়। সংসার মানে যা সরে সরে যায়, অচলায়তন নয়। জগৎ কথার অর্থ যা গতিসম্পন্ন। সমাজও বদলায়। সমাজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, *এক পরিস্থিতি থেকে নূতন কোন পরিস্থিতিতে পেঁছাবার আগে আট-ঘাট* বেঁধে, চারদিক বেশ ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে তবে পা বাড়ায়। নূতন পথের পথিক হয়। সন্দেহ পদে পদে। প্রথমটা অগ্রণীরা অন্যদের চক্ষে বেতালা প্রতিভাত হয়। তবুও তারা এগোয়। নূতন স্থানে নূতন যাত্রীরা পেঁছে লাভবান হয়েছে দেখলে কিম্বা তাদের অভিনবত্বে কল্যাণ বা ঐশ্বর্য আছে প্রতিভাত হলে, তারপর দলে দলে লোকে তাদের অনুসরণ করে। সেজন্য অধিক সংখ্যকের চলার গতি সাধারণত ধীর, মন্থর। এর নাম বিবর্তন (Evolution) বা ক্রমবিকাশ। ঘটনা-পরম্পরায় যদি অতি আবশ্যকীয় গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ক্রমে ঘনীভূত গতিবেগ একদিন সব বাধা অতিক্রম করে উচ্ছ্বসিত শক্তিতে ছুটে নিজ পথ করে নেয়। সেদিন যখন আসে, সে হয় ভীম ভয়ংকর। তারই নাম সাধারণত বিপ্লব।

প্রকৃতিতে নিয়ম-শৃঙ্খলায় সব চলছে। তবু মাঝে মাঝে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণ আত্মপ্রকাশ করে। দুই-ই তাহলে নিয়মাধীন। একটা সাধারণ নিয়মের, অন্যটা অসাধারণ নিয়মের।

ভারতে বৃটিশ আধিপত্য-কালে মুক্তির প্রচেষ্টা বিবর্তন ও উদ্বর্তনের পথ (Evolution and Revolution) নিয়েছে নিজ প্রয়োজনবশে। বহু দ্রষ্টা দুটোকে আলাদা আলাদা আন্দোলন বা সমাজ-গতি মনে করেন। আন্দোলনগুলির ভিতরে ও বাইরে অবস্থান করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার থেকে বলতে পারি দুটোকে অবলম্বন করেই সম্যক্ একটা আন্দোলন গজিয়ে উঠেছে। এ-দুটি পরস্পরের অনুপূরক।

অনেক কিছু দেখেছি, শুনেছি, ভেবেছি, বুঝেছি। সমস্ত বিচার করে এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, স্বাধীনতা আন্দোলন দেশে দেশে শান্ত ও অশান্ত ভঙ্গিমায় ঢেউয়ের মতো চলে। সবটাকে জড়িয়ে যদি বলি বিপ্লব, তাহলে এই সূত্র আবিষ্কৃত হয় যে, বিপ্লব নিজ প্রয়োজনে শান্ত ও অশান্ত ভঙ্গিতে চলতে থাকে, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটায়। যখন যে ব্যক্তি ঢেউয়ের মাথায় অবস্থান করে আমরা চারপাশের লোক তাকে তখন অসাধারণ মনে করি। সে যেন সেই আন্দোলনের বিশেষ ব্যক্তি। অনেকে তাকে সেই আন্দোলনের স্রষ্টা বা জনক মনে করে। বিপ্লব তার নিজ পরিণতির তাড়নায় সময়মতো রূপান্তর গ্রহণ করে। কারুর ইচ্ছার অপেক্ষা সে রাখে না। বিপ্লব সত্যই চলতি পথের ক্রমবিকাশে একটা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম গতি-সম্পন্ন অবস্থার আবির্ভাব।

বিপ্লব বলতে কি বুঝি? এই প্রশ্ন অতি প্রাসঙ্গিক। বিপ্লব একটা অন্ধশক্তির স্ফুরণ মাত্র নয়। বিপ্লব উদ্দেশ্যমূলক। বিপ্লব মানে প্রগতি বা অগ্রগতি। এ গতি সমাজের দ্বন্দ্ব-সংযুক্ত অবস্থার ফলে ঘটে। যে অবস্থা বর্তমান তাকে বলা যাক 'বাদ'। তা সংসারে, অর্থাৎ যা চলমান বা সরে সরে যাচ্ছে তার ভিতরে, সৃষ্টি করে তার বিরোধের ভাব বা 'বিসম্বাদ'। দুটোর সংঘর্ষে হয় অগ্রগতি। কিন্তু প্রত্যেক গতির লক্ষ্য হচ্ছে একটা স্থিতি। সেই স্থিতি অবশ্য আপেক্ষিক, চিরস্থায়ী নয়। তবু তাকে বলা যায় 'সম্বাদ', অর্থাৎ বাদ-বিসম্বাদের সংঘর্ষে উৎপন্ন একটা সাম্য অবস্থা। এইভাবে চলতে চলতে প্রথম প্রচেষ্টার ফল বা সংগঠন আত্মলোপী হয়। কিন্তু তার থেকে উৎপন্ন প্রেরণাযুক্ত তার সন্তানস্থানীয় রূপান্তরিত গতি-সম্পন্ন আর একটা সংস্থা গড়ে ওঠে। কিছুকাল পরে তার অবদান দিয়ে সেও লোপ পায়। এই দৃষ্টি দিয়ে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে দেখা উচিত। তবেই দেখা যাবে ১৯০৩ সাল থেকে কলকাতায় প্রধান কেন্দ্র যার সেই 'অনুশীলন সমিতি' সারা বাংলার একমাত্র ব্যাপক বিপ্লবী সংস্থা। তারপর এল 'যুগান্তর' কাগজকে অবলম্বন করে—আর একটা নামহীন বিপ্লবী সংস্থা। তাও সময়ে গেল ভেঙে বা লোপ পেয়ে। তারপর ঢাকায় অনুশীলনের কেন্দ্র। এবারও আর একটা নামহীন সংস্থা গড়ে উঠল সারা বাংলা ও তার বাইরে। পরে এটির নাম হয় 'যুগান্তর'—বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী দল। অগ্রগতির দাবি মেটাতে এ-দুটো থেকে এল মার্ক্সবাদীয় দল। কিন্তু 'মার্ক্সবাদ' উদরান্নের সংস্থানে বিশেষভাবে উপযোগী। গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন মিটলে—তারপর কি? মানুষের মনের চাহিদা মেটাবার প্রয়োজন। এখানে সাংস্কৃতিক প্রয়াসের আবির্ভাব। এইখানে আসছে সম্বাদের নূতন দর্শনের, সমাজ-সেবার কথা।

ভারতের বিপ্লবের কথা ভাবতে গেলে অতীতকে বাদ দিতে পারা যায় না। বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় চল্লিশ কোটি লোক দেশে থাকতে কতকগুলি লোক কেন মুক্তিযুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাহলে বিচার করতে করতে নিকট ও দূর অতীতে গিয়ে পড়তে হয়। আমরা কয়েকজন এমন আলোচনাও করেছি। তাতে দেখা গেল দূর অতীত কেন, সুদূর অতীতও আমাদের উদ্বোধনে সাহায্য করেছে—আত্মিক আহার্য যুগিয়েছে।

কি কি আমাদের মানস চক্ষে পড়েছিল? পৃথিবী যখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তখন এদেশে সমাজ-বিবর্তনে অদ্ভুত সব সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অদ্ভুত বলছি এই কারণে যে, তখন মানব সভ্যতার বয়স অতি কম। অন্য দেশগুলির তুলনায় কথাগুলি বলছি।

ভারত দিয়েছে উপনিষদের অতি গৌরবময় আদর্শ। সর্বপ্রথম ভারত দিয়েছে

সংঘজীবনের নির্দেশ। ভারত জগতে দিয়েছে সর্বপ্রথম জাতীয়তার সন্ধান। এতবড় গৌরবের উত্তরাধিকারী আমরা।

জগতে সংঘের আদর্শ, শুধু আদর্শ নয় সংঘজীবন-যাপন ভারতেই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। আবিষ্কর্তা স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ। বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি ভিক্ষা করতে করতে কপিলাবস্তুতে যান। সেখানেও ভিক্ষা করেছিলেন। রাজার কুমার ফিরেছেন। পুরবাসীর কত আনন্দ! উল্লাসে লোক ছুটল রাজবাড়িতে। রাজা সংবাদ পেয়ে আনন্দে আটখানা। যখন শুনলেন কুমার রাজধানীতে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত, তাঁর মনোবেদনার অবধি রইল না। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়লেন। বললেন—কুমার এস, প্রাসাদে এস। তুমি একি করছ? বুদ্ধ উত্তর করলেন—যা আমার পূর্বপুরুষরা বরাবর করে এসেছেন তাই করছি।

আঁতকিয়ে উঠে রাজা বললেন—কি! ভিক্ষা? আমার পূর্বপুরুষরা কখনও ভিক্ষা করেন নি। বিনয়ের সঙ্গে পুনরপি বুদ্ধ নিবেদন করলেন—মহারাজ, আপনার পূর্বপুরুষরা নন। আমার পূর্বগামীরা সবাই ভিক্ষা করে গেছেন।

রাজা বুঝলেন, কুমার অন্য অবস্থার কথা বলছেন। তিনি প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

তারপর তাঁর পালিকা-মাতা গৌতমী বা মহাপ্রজাপতি এলেন। বললেন—পুত্র, তোমার জন্য আমি নিজহাতে বোনা এই বস্ত্রখণ্ড এনেছি। তোমায় দিতে চাই।

বুদ্ধ বিনীতভাবে বললেন—মা, কোন ব্যক্তিই দান নেবার উপযুক্ত নয়। তা সে ব্যক্তি স্বয়ং বুদ্ধই বা হলেন। দান দেবেন সংঘকে। সংঘ প্রয়োজন বোধে ব্যক্তিবিশেষকে দেবে।

ভারত বৌদ্ধযুগে কত বড় সামাজিক পরীক্ষাই না করেছিল! প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য, রাজ্য ও প্রজাতন্ত্র একই কালে বিরাজিত ছিল। নিরীশ্বরবাদিতা চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ও লোকায়ত্রিকরা দীর্ঘকাল চালিয়েছিলেন। সম-সমাজবাদ ছাপিয়ে বৌদ্ধরা সংঘের ধারণা এনেছিলেন। অথচ তখন কলের সভ্যতার কোন ইঙ্গিতই নেই।

আবার চাণক্য জাতীয়তার ধারণা এদেশে আনেন। চন্দ্রগুপ্তকে এক-রাষ্ট্র ও এক-পতাকার শিক্ষা দেন। ভারতেই তাই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।

পৃথিবী বয়সে তখনও শিশু। সে ভাব জগৎ সেজন্য সে সময়ে নিতে পারে নি।

এতবড় দুটো ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে কাজ করেছে। মনোরাজ্যের কথা বলছি। তাছাড়া ভারত পরাধীনতা কখনই মেনে নিতে পারে নি। বাইরে থেকে বহু জাতি এসেছে, লড়াইয়ে জিতেছে, রাজ্য করেছে; কিন্তু ভারতের বিপ্লবী আত্মা শেষ পর্যন্ত তাদের ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ইংরেজ কাদের কাছ থেকে ভারতকে নেয়? শিখ, মারাঠা ও রাজপুতদের কাছ থেকে।

ইংরেজ আমলে যে আন্দোলন হয় তার বিকাশ তিন ধাপে দেখা দিয়েছে।

প্রথম প্রচেষ্টায় সর্বত্র বাধা দিয়ে আসা হয়েছে। তাকে সহজে কোথাও বসতে দেওয়া হয় নি। ১৭৭২-১৮৫৪ সাল এইভাবে যায়। তারপর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। ১৮৫৫ থেকে ১৯০৪ সাল অবধি। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে বা নূতন আপদকে যেখানে পারা যায় সেখানে স্থানভ্রষ্ট করে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। তারপর এল তৃতীয় স্তর। ইংরেজ রাজ্যকে হস্তগত করে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ১৯০৫-১৯৪৪ অবধি তার সময়।

১৭৫৭ সালে আসা যাক কারণ ইংরেজ আমলই আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। ঐ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের দোকানদারির দাঁড়িপাল্লা রাজ্যপাটের পথ করে দেয়।

১৭৬৫ সালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East-India Company) মির্জাফরপুত্র নজিমুদ্দৌলা, বাংলার শেষ নবাবের সময়, বাদশা শা-আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পায়! এতদিন ব্যবসা করে আমদানির নামে লুট করছিল। এখন থেকে রাজস্ব আদায়ের মোটা অংশে ফুলতে লাগল।

বাংলার দেওয়ানি নেবার সময় সর্ত হয় যে, কোম্পানী বাদশাকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা এবং বাংলার নবাবকে ৫৩ লক্ষ টাকা দিয়ে যাবেন। এর ফলে রাজস্ব আদায় ও দেশরক্ষার খরচ বাদ দিয়ে বাদশাহ ও নবাবকে তাদের প্রাপ্য প্রদানান্তর বছরে পুরো এক কোটি টাকা কোম্পানীর বিলাতের তহবিলে যেতে লাগল। তাছাড়া এখানকার ইংরেজ কর্মচারীরা নিজেরা ঘুষ নিয়ে লুট করেও মোটা মোটা টাকা পকেটে পুরতে লাগল।

ইংরেজের ভারতগ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশী-বিদেশীর সংঘর্ষ হয়। কারণ একটা শিল্পপ্রধান সভ্যতা এসে একটা কৃষিপ্রধান সভ্যতার ঘাড় মটকাতে আরম্ভ করে। সমাজ-দেহে মারাত্মক রোগের আক্রমণ; সুতরাং সমাজ-দেহ ডাক দিল তার অন্তর্নিহিত প্রতিষেধক শক্তিকে লড়বার জন্য।

এইটিই প্রকৃত ভারতীয় বিপ্লবের রূপ। সমাজ-দেহের দিক থেকে পাল্টা আক্রমণ হল চতুর্ধারায়। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক ধারায় আত্মরক্ষার প্রেরণা কাজ আরম্ভ করেছিল। নিদ্রিত জনগণের মধ্যে জাগ্রত হল যারা, তারা প্রভাবান্বিত হল কেউ চতুর্ধারায়, কেউ ত্রি-ধারায়, কেউ দ্বি-ধারায়, কেউ-বা একধারায়। কখনও মনন, কখনও কার্যে তাদের ভাব ক্রমবিকাশ লাভ করল।

এইবার ঘটনা-পরম্পরা, অবস্থা এবং কার্য-কারণ সম্পর্কগুলো অনুধাবন করা যাক।

যদি কোন একটা দেশ শুধু কাঁচামাল তৈরী করে এবং অপর একটা দেশের কলে তৈরী মাল খরিদ করতে বাধ্য হয়, তবে ঐ ব্যাপারে প্রথমোক্ত দেশ লোকসান দেবে। কাঁচামাল রূপান্তরিত করে অপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেসাতিকার খুবই লাভবান হবে। কাঁচামালের ওপর ব্যবসায়ীরা যা লাভ রাখে, রূপান্তরিত মালে তার বহুগুণ বেশী

লাভ রাখা হয়। ভারত কাঁচামাল উৎপাদন করতে থাকল। ইংলণ্ড কলে সেই উৎপাদনকে রূপান্তরিত করে যেমন ইচ্ছা লাভ করতে লাগল। কাজেই ইংলণ্ড হয়ে যেতে লাগল ধনাঢ্য। ভারত ক্রমাগত চলল ক্ষয়ের পথে। গুণের কৌলীন্যের জায়গায় কাঞ্চন কৌলীন্যের উদ্ভব ও বাড়াবাড়ি হল। কালকের সমাজের মাথা আজ হল নত, ধূলি-লুণ্ঠিত। ইংরেজের চাকর-নফর উন্নতশির সমাজের শীর্ষে পেল আসন।

সমাজ-শ্রেষ্ঠের মান যাদের ছিল তাদের মান লুটিয়ে পড়ল ধূলায়। রাষ্ট্রের যারা ছিল কর্ণধার তাদের মূল্য আর রইল না। নবাগতের গলায় মাল্য দিলে তবে বাড়ে নিজেদের মূল্য। সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র এমনকি সংস্কৃতি বা ধর্মের দিক দিয়ে নিজেদের পদ ও মর্যাদা-হারা হতে লাগল এ দেশের লোকেরা। ভারতীয়দের অসভ্য, বর্বর বলে প্রচার করা হল। এই ছিল তখনকার দিনের পটভূমিকা।

১৭৬৪ সালে ইংলণ্ডে 'Steam Engine' বা বাষ্প-শক্তি আবিষ্কৃত হয়। মূল্যবান আবিষ্কার। কিন্তু আবিষ্কার হলেই তো হয় না, তাকে ব্যাপকভাবে উৎপাদনে কাজে লাগালেই তো তার সার্থকতা। কাজে লাগাতে হলে চাই সেরূপ মূলধন। ইংলণ্ড সে মূলধন পেল কোথায় ? ভারতের টাকা লুটে সে দেশে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হল। হস্ত-শিল্পের জায়গায় কলের শিল্প জন্মগ্রহণ করল। ভারতের লুট-করা টাকা ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবকে বহুগুণ এগিয়ে দিল।*

এদেশে ইংরেজরা এসে এদেশের শিল্প নাশ করতে লাগল। চরকা-তকলি, কাপড়ের ব্যবসা ডুবল। জমি যে চাষ করে জমি তার—এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে লোকের দিন কেটেছে। হিন্দুরাজার সময়ে কৃষক মোটমাট জমিতে উৎপন্ন শস্যের অষ্টমাংশ বা ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে দিত। মুসলমান আমলে চতুর্থাংশ বা তৃতীয়াংশ দিতে হত। কিন্তু জমির মালিক থাকত কৃষক। ইংরেজ এসে সে ব্যবস্থা উল্টে দিল। রাজশক্তি হল জমির মালিক। কৃষক হয়ে গেল প্রজা। রাজস্ব আদায় হতে লাগল টাকায়। তার অসুবিধা এই যে—শুখো, হাজা বা অজন্মার সময় কৃষক উৎপীড়িত হয় খাজনার বাঁধাধরা অর্থ দিতে। অথচ পূর্বকালে শস্যের কম উৎপাদনে সে কম শস্য দিত। তাতে বহু রেহাই ছিল। এইরূপে জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব

* At the beginning of the capitalist era, some three or four hundred years ago, the then foremost European countries (Spain, Portugal, Holland and England) had developed a wide overseas trade..., discovered routes to distant and rich countries of the East-India and China ....the robbing of the richest overseas countries was one of the most important sources of primitive accumulation of European capital, specially English.

Political Economy—A. Leontiev

পরিবর্তনে সামাজিক ওলটপালট আসতে বাধ্য হল। কর্নওয়ালিসের সময় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমাজে নূতন প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকের উদ্ভব হল। এই জমিদাররা মধ্যস্বত্বভোগী হল। তারপর ১৮৩৩ সালে ইংরেজদের জমিজিরাৎ খরিদ করে সম্পত্তির মালিকানির অধিকার দেওয়া হয়। তাতে আরও গোলযোগ সৃষ্টি হল। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর পর শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের তারতম্য সমাজে এল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবার প্রকৃত সুবিস্তৃত প্রতিপত্তি দাঁড়িয়ে গেল। পরে অবশ্য এর ফলে দেশে এল নবজাগরণ। ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে তাদের তৈরী বুদ্ধিজীবীদের মতান্তর, মনান্তর ও সংঘর্ষ ক্রমেই বেড়ে চলল।

কতকগুলি তারিখ অবলম্বনে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হয়ে আসবে। ১৭৬৪: শেষ শক্তিশালী নবাব মীরকাশীম। রাজস্ব আদায়ঃ ৮,১৭,০০০ পাউন্ড। ১৭৬৫-৬৬ঃ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম বছর। রাজস্ব আদায় ১৪,৭০,০০০ পাউন্ড।

১৭৭০ সালে ভীষণ মন্বন্তর। তিন কোটির মধ্যে এক কোটি লোক মারা যায়। তবু খাজনা আদায় সমান ভাবেই চলল। কোন করুণা দেখান হল না। বরং খাজনার হার বাড়ান হতে লাগল ক্রমেই।

১৭৭৫ঃ মহারাজ নন্দকুমার ইংরেজের ভারতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রথমে ভুল ধারণা পোষণ করেন। ভেবেছিলেন ইংরেজের অধিকারে ভারতের কল্যাণ হবে। কিন্তু যখন বুঝলেন ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো ঘটতে বসেছে, তিনি ইংরেজকে অংকুরেই বিনাশ করতে ব্রতী হলেন। এই সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার চৌথ আদায়ে মহারাট্টারা বঞ্চিত থাকায় তারাও ক্ষেপেছিল ইংরেজের ওপর। ফরাসী অধিকার-ভুক্ত চন্দননগরে 'মহারাজার' প্রতিনিধি জগমোহন দত্ত পেশোয়ার প্রতিনিধির সঙ্গে ইংরেজ বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নবকৃষ্ণ এ সংবাদ হেস্টিংস্‌কে জানিয়ে দেয়। ফলে জগমোহন কয়েদ হন এবং জাল করার মিথ্যা অজুহাতে ফাঁসী হয় 'মহারাজার'। ১৭৭৫ সালে প্রথম মৃত্যুঞ্জয়ীর রক্তের প্রথম টিকা ভারতজননী ললাটে পরেন।

অবশেষে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। রাজস্বের পরিমাণ—৩৪,০০,০০০ পাউন্ড। ১৮০৬ সালে এক হাজার পঁচাশী কোটি টাকা খাজনা আদায় হয়। এর আগের ত্রিশ বছরে ঐ পরিমাণ টাকা বিলাতে গিয়েছিল।

এর ফল এই দাঁড়াল যে, ভারতের লোক শিল্পচ্যুত হয়ে ক্রমেই জমিতে চাষীর সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হল।

এর ওপর ১৭৯২ সালে কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী চার্লস গ্রাণ্ট বিলাতে ফিরে গিয়ে ভারতবাসীদের অত্যন্ত কুৎসিত চরিত্রের লোক বলে বর্ণনা করে।

বিলাতে কলের শিল্পের আগে ব্যবসায়ীরা এদেশে সোনারূপা দিয়ে এদেশের

রেশম ও কার্পাসের কাপড়, মশলা প্রভৃতি নিয়ে যেত। ফলে এদেশ তাতে হত লাভবান। কলের শিল্প ওদেশে হওয়ায় ওরা ওদের তৈরী কাপড়, পরে লোহা ও অন্য ধাতুর জিনিষপত্রে এদেশের বাজার ছেয়ে ফেলতে লাগল। এখানকার রুধিরে ওরা হতে লাগল লাল—বলিষ্ঠ ও লাভবান! ওদের কলের শিল্পের জন্ম, বৃদ্ধি এবং পুষ্টির যুগ ধরা যেতে পারে ১৭৫৪-১৮৪০ পর্যন্ত।

আর্থিক ক্ষতি, সমাজে অসম্মান, রাজনীতির আসনে অনাদর, কৃষ্টি বা ধর্মের আসনে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য বর্ষণ—জনমনকে চঞ্চল, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও মত্ত করে তুলল। জন্ম হল বিপ্লবের সংকল্পের।

এবার আন্দোলনের তরঙ্গ লক্ষ্য করা যাক। পলাশী যুদ্ধের পর মন্বন্তর, কুশাসন, ভূমি-বণ্টনের অসঙ্গত ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে সমাজে ওলটপালট আসে।

১৭৭২ সালে রংপুরে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ খুব জোর বাধে। বঙ্কিমবাবু একেই উপজীব্য করে আনন্দমঠ লেখেন। (বন্দেমাতরম্ গান লেখেন বই লেখার সাত-আট বছর পূর্বে।) তাই ওই তারিখটা স্মরণীয় হল। নচেৎ তাদের কার্যতৎপরতার খবর ১৭৬৩ সালেও পাওয়া যায়। ঐ সালে তারা ঢাকা শহরে প্রথম আবির্ভূত হয়। পরে কুচবিহারে যায়। ইংরেজরা সম্মুখ-সমরে পরাজিত হয়। ১৭৬৮ সালের কথা বলি। বিহারে সারন জেলায় বৃটিশের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। তারা ১৭৭০ সালে দিনাজপুরে আসে, ১৭৭১ সালে আবার ঢাকা ও রাজসাহীর উত্তরাংশে তাদের দেখা যায়। ১৭৭২ সালে রংপুরে সরকার পক্ষের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ হয়। সরকার বরাবর হেরে আসছিল, এখানেও তাই হল। স্থানীয় লোকেরা সন্ন্যাসীদের সাহায্য করে। ক্যাপটেন টমাস হত হন। বগুড়া, দিনাজপুরে তারা আসে। বগুড়ার কালেক্টর তাদের টাকা দিয়ে জেলা রক্ষা করেন। ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস (Edwards) দিনাজপুরে পেঁছে বিপন্ন হন। তিনিও নিহত হন।

সন্ন্যাসীরা ময়মনসিংহ, সেরপুর, ভাওয়াল, কলকাতা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জায়গায় এসেছিল। এই বিদ্রোহকে অবলম্বন করে ১৮৮২ সালে বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীরা গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগী। তারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াল, সাধারণে তাদের রক্ষক ভাবল। সন্ন্যাসীদের ধরিয়ে দেবার জন্যে কঠোর আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেউ তাদের ধরিয়ে দিত না। এমনকি তাদের সম্বন্ধে সরকারকে খবর পর্যন্ত দিত না। ১৩ই মার্চ ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখছেন—'সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও গ্রামাঞ্চলে হঠাৎ এসে হাজির হয়। যেন অকস্মাৎ আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা এত অধিক শক্ত, সাহসী এবং উৎসাহী যে সহসা বিশ্বাস করতে পারা যায় না।" এরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (বর্তমানে

উত্তরপ্রদেশ) লোক। বাঙালী নয়। সন্ন্যাসীরা বাংলার বহু জেলায় এসে পড়ত। এরা ইংরেজকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। সংস্কৃতি বা ধর্মের প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে ইংরেজের বৈরিতা করার এটি একটি মস্তবড় দৃষ্টান্ত। পরাধীন ভারতের দিক থেকে এরা অশান্তভাবে বা সশস্ত্র উপায়ে ইংরেজকে প্রথম আঘাত হানে। ইংরেজ এই প্রথম চোট খেল। ইংরেজের সঙ্গে কৃষ্টিগত একটা দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত চলে এসেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। এ কথা Lord Ronaldsay (পরে Lord Zetland) তাঁর 'Into the Heart of Aryavarta' পুস্তকেও স্বীকার করেছেন।

আমরা এখানে বাংলার সশস্ত্র ও নিরস্ত্র আন্দোলনকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করছি। ১৭৮২ সালে তমলুকের রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার বিদ্রোহ। কোম্পানী এঁর এক জ্ঞাতিকে সাহায্য করতে যায়। ফলে রাণীর সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। অবশ্য রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া পরাভূত এবং রাজ্যচ্যুত হন।

ঘটনাটি খুব সামান্য। তাহলেও এর থেকে সে সময়ে এক ভারত ললনার তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ থেকেই বিশাল তরঙ্গের উৎপত্তি হতে থাকে।

১৭৯২ সালে চার্লস গ্রান্ট (ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক বড় কর্মচারী) বিলাতে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছেন, "ইউরোপের নিকৃষ্টতম অঞ্চলে বহু লোক এমন আছে যারা সরল, সৎ, বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন। কিন্তু বাংলাদেশে এরকম লোক বিরল। সদ্‌বুদ্ধি-চালিত হয়ে কাজ করবার লোক একটিও মেলা মুস্কিল। সব কর্মচারী অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত। বিচারের কাজ অর্থ অর্জনের একটি বিশিষ্ট উপায়। মোকদ্দমায় যার জয় নিশ্চিত, তাকেও টাকা দিয়ে সাফল্য অর্জন করতে হয়। যার জয়লাভের কোন আশা নাই, অর্থের কৌশলে সে'ও অনায়াসে জিততে পারে। দেশাত্মবোধ কাকে বলে হিন্দুস্থানের লোকেরা তা জানে না।"

ইংরেজ-সাধারণের এবং পাদরীদের কুধারণা ক্রমে বেড়েই চলল। বিজেতা উৎকৃষ্টতম, বিজিত নিকৃষ্টতম—ইংরেজদের মনে তখন বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল এই ধারণা।

১৮০৯ সালে রাজা রামমোহন রায় এই ভাবের প্রথম প্রতিবাদ করেন। ঐ সময়ে ভাগলপুরের কালেক্টর তাঁর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে। তিনি প্রতিবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে এক পত্র লেখেন। ফল ভালোই হয়—মিণ্টো কর্মচারীটিকে সতর্ক করে দেন।

১৮১৩ সালে বিলাতের পার্লামেণ্ট ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতের সঙ্গে ব্যবসার একচেটিয়াত্ব বন্ধ করে দেয়। ফলে ইংরেজের কলের কাপড়ের ব্যবসা বাড়ে। বিলাত থেকে রপ্তানী কাপড়ের উপর শতকরা দু-টাকা শুল্ক ধার্য হয়। কিন্তু ভারত থেকে সেদেশে আমদানী কাপড়ের উপর শতকরা আটাত্তর টাকা শুল্ক বসে। ১৮১৩ সালে

পাদরীরা এদেশে অবাধ গতিবিধির অনুমতি লাভ করে। তারা হিন্দুধর্মকে বিকৃত করে ব্যাখ্যা করে বেড়াতে থাকে। বিলাতে পাদরীদের প্রচারে বলা হত হিন্দুরা নাকি মনুষ্যরূপী চতুষ্পদ বিশেষ! এদেশবাসীর জীবন, শিক্ষা, চরিত্র, সংস্কৃতি সব বিষয়কেই দেখান হত হীন করে।

১৮১৫ সালে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮১৮ সাল থেকে তিনি সংবাদপত্রের মারফত লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন: "কোম্পানীর আমলের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শেষের কুড়িবছর পাদরীদের এই দৌরাত্ম্য চলেছে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা নয়শ' বছর ধরে পরাধীন। আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ আমাদের অতিরিক্ত সভ্যতা। এমন কি পশুপক্ষী হত্যায়ও আমাদের পরাঙ্মুখতা। জাতিবিভাগ আমাদের ঐক্যবন্ধতার বেজায় পরিপন্থী। কিন্তু হিন্দুদের মতো পরমত-সহিষ্ণু ও উদার জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাঁরা সব জাতি ও সম্প্রদায়কে ঈশ্বরানুগ্রহ-লাভের সমান অধিকারী মনে করেন।"

১৮১৯ এবং ১৮৩০ সালে 'নীল আইন' বিধিবন্ধ হয়। চাষীদের বাধ্য করা হয় ভালো জমিতে ধানের বদলে নীল চাষ করতে।

১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণের সরকারী আদেশ হয়। বহু বন্ধুর স্বাক্ষর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এর বিরুদ্ধে আবেদন করেন রামমোহন।

১৮২৬ সালে জুরীর বিচারের আইন প্রণয়ন হয়। এটি জেতা ও বিজেতার মধ্যে ভেদ বৈষম্য খুব বাড়িয়ে দেয়। ইংরেজ, এমন কি দেশী খ্রীষ্টানরা হিন্দু-মুসলমানের বিচারে জুরী হতে পারত। হিন্দু-মুসলমান তাদের বিচারে কিন্তু জুরী হতে পারত না।

১৮৩১ সালে বিলাতের পার্লামেন্টে সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় রামমোহনকে প্রশ্ন করা হয়, "ভারতবাসীদের নৈতিক চরিত্র কেমন?" রাজা উত্তরে বলেন—"ভারতীয়দের তিন ভাগে ভাগ করা চলে। (১) যারা পল্লীগ্রামে থাকে; (২) যারা শহরে বিভিন্ন কাজের জন্য থাকে; (৩) যারা শহরে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার সাহায্যে জীবিকার সংস্থান করে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা চরিত্রবান, মিতাচারী, সরল। তারা সদ্‌গুণে যে কোন দেশের লোকের সমকক্ষ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা আইন-আদালতের সংস্রবে এসে এবং বিদেশীর প্রলোভনে পড়ে ধর্মজ্ঞান-বিবর্জিত হয়। জাল-জুয়াচুরি বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়।"

১৮২৮ সালে বাংলাদেশে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে 'ভূম্যধিকারী সভা'র জন্ম হয়।

১৮৩৩ সালে ইংরেজরা এদেশে জায়গা-জমির মালিক হতে থাকে। তারা নীল

চাষে মন দেয়। অথচ বিলাতে এই বছর কোম্পানীকে যে নূতন সনদ দেওয়া হয় তাতে ভারতবাসীদের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যয় সম্বন্ধে একটি কথাও লেখা হয় নি। রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যে সব ঋণ ক'রে কোম্পানী নিজ দেশবাসীদের উপকার করেছিল, তার সমস্ত ভার ভারতবাসীদের ঘাড়ে চাপানো হল।

১৮৩৬ সালে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' স্থাপিত হয়। এখানেও রাজনীতি চলতে থাকে। স্বদেশের ভালো-মন্দের আলোচনা হত। অনিষ্টকর যা কিছু তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান হত। এর কর্তৃপক্ষরা ছিলেন সকলেই ভারতবাসী। নিষ্কর ভূমিতে কর বসানর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ এখান থেকে হয়।

এ সময় চব্বিশ পরগনায় যে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় হত তা কেবল ভারতীয়রা দিত। কোন ইংরেজকে ঐ ট্যাক্স দিতে হত না।

১৮৩৮ সালে হয় 'জমিদার সভা'। যাদের ভূমিতে কোনরূপ স্বার্থ আছে, তারাই এর সভ্য হতে পারত। এখান থেকেও ইংরেজের জমি-সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হয়।

১৮৩৯ সালে নিরাপদভাবে প্রতিবাদের জন্য এবং ইংরেজ জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার পাবার আশায় বিলাতে স্থাপিত হল—বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। দাসপ্রথা-বিরোধী টমসনের সহায়তা এতে পাওয়া গেল।

১৮৪৩ সালে কলকাতায় **'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'** স্থাপনা হয়। এই প্রথম সংঘবদ্ধভাবে ভারতে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়া হল। এই হিসেবে এই সালটির গুরুত্ব আছে।

১৮৪৯ঃ বীটন আইন। এ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিচার মফস্বল আদালতে হতে পারত না। কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে হত। তাতে মফস্বলের লোকের মামলা করার বহু অসুবিধা হতে থাকে। এইবার 'বীটন বিল' অনুযায়ী মফস্বলে ইংরেজদের বিচারের ব্যবস্থা হয়। ইংরেজরা এর নাম দেয় 'কালা আইন' এবং তুমুল আন্দোলন করে। এতে কালা আদমিদের প্রতি জঘন্য ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। যাই হোক আইন গড়া বন্ধ রইল। এর ফলে দেশীয়রা অত্যন্ত মর্মাহত হল। নতুন করে স্বাধিকারের স্বমর্যাদার সাড়া জাগল। মন্দের ভিতর দিয়ে ভালোর পথ পড়ল।

১৮৫১ঃ জমিদার সভা ও বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মিলে গিয়ে হল 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'।

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। সশস্ত্র বিদ্রোহ। বীরভূম ও রাণীগঞ্জে এর প্রকোপ যথেষ্ট পড়ে। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ বাদ যায় নি। নেতা—সিধু ও কানু দুই ভাই। এক জনসভা করে এরা সরকারের কাছে নিজেদের দাবি জানায়। ইংরেজের কুঠী, ঘরবাড়ি এবং রেল লাইন আক্রান্ত হয়।

ইংরেজরা রাজ্যপাটে দুবার দুটো নীতি বিস্তার করে। প্রথমটার কাল ১৮৩৪-৩৮। ইংরেজ ও দেশীয় লোকের মিলে-জুলে সুখে থাকার অলীক স্বপ্নাবলী। বেণ্টিঙ্কের আমলে চাকরির মোহ সৃষ্টি হল। মুন্সেফ, আমিন ও ডেপুটিগিরির লোভ। তারপর অক্‌ল্যাণ্ড সে লোভ আরও বাড়ান। বলেন, 'যে যত ইংরেজী জানবে সে তত বড় পদ পাবে।' চাকরির জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। চাকুরে মনোবৃত্তি উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। কথায় বলে গোলামী মনোভাব যায় তো চাকুরে মনোভাব যায় না।

১৮৪৪-৪৮ সালে অপমানে জর্জরিত হয়ে চৈতন্যোদয়ের সময়। লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশী-বিদেশীতে সংঘাত বাধালেন। প্রচার করা হতে লাগল ইংরেজ ভাগবত জন—ভারতীয়রা পতিত, অকিঞ্চন। সুতরাং সমাজ-দেহে প্রতিবাদ সুরু হল। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক যুদ্ধ হয়। একে মিথ্যাই বলা হয় সিপাহী বিদ্রোহ। এর নেতারা—নানা সাহেব, তান্তিয়া টোপী, ঝাঁসীর রাণী, কুমারসিংহ প্রভৃতি সিপাহী ছিলেন না। এটি ছিল সশস্ত্র প্রয়াস বা অশান্ত আন্দোলন। ১৮৬০ সালে আসে নীল আন্দোলন। পঞ্চাশ লক্ষ লোক (কৃষক) একজোট হয়ে নীল চাষ করতে অরাজী হল। দেশব্যাপী কৃষকদের ধর্মঘট। এই আন্দোলন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে হয়। এরা তখন আবার মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকার পেয়েছিল। এরা সে সময় প্রজাদের দুঃখ ও দুর্গতির চরম করেছিল। ধর্মঘটীদের নেতারা গ্রামের লোক ছিলেন।

এই শান্ত আন্দোলন ফলপ্রসূ হল।

১৮৬৩ সালে ওহাবী আন্দোলনের ইংরেজ-বিদ্বেষী রূপ বিশেষভাবে দেখা যায়। ওহাবী মুসলমানরা ঠিক জাতীয়তাবাদী ছিল না। তারা ভারতে মুশলিম-রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছিল। তাদের প্রয়াস সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট ছিল। যতদিন তারা শিখদের সঙ্গে শত্রুতা করছিল এবং পাঞ্জাব স্বাধীন ছিল, ইংরেজরা বরং তাদের সহায়তা করত। ১৮৪৯ সালে শিখ-শক্তির পতন হয়। ইংরেজ পাঞ্জাব দখল করে। তারপর তারা ওহাবীদের রাজ্যপাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে থাকতে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। সুতরাং বাধল সংঘর্ষ। যদিও দেশ-স্বাধীনকারী আন্দোলন তাকে বলা যায় না, তথাপি ইংরেজ তাড়ানর কথা আসে বলে এখানে ওটির উল্লেখ করা গেল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এদের মামলা শেষ হয়। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের জজ নর্ম্যান নিহত হন এবং আন্দামানে লর্ড মেও-কেও একজন ওহাবী কয়েদি শের আলি হত্যা করেন।

১৮৬৫ সালে পাঞ্জাবে 'কুকা আন্দোলন'। নিরস্ত্র আন্দোলন। নেতা বাবা রামসিং। অসহযোগ ছিল এটির প্রাণ।

১৮৬৮ সালে বীটন সভায় (ইংরেজ ও দেশীয়দের মিলিত সভা) তারাচাঁদ চক্রবর্তী ইংরেজকে ভারত ছাড়ার কথা বলেন। তারাচাঁদ বলেন—'যতদিন পর্যন্ত ইংরেজরা আপোসে ভারত ছেড়ে স্বদেশে ফিরে না যাবে, ততদিন আমাদের মন প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করতে পারবে না এবং আমাদের স্থায়ী ও প্রকৃত মঙ্গল হবে না।' সে সময় এটি কত বড় সাহসের কথা !

১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বনের ভাব স্বদেশবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বিশেষ চেষ্টা। রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা এইবারে নবগোপাল মিত্র কার্যকরী করলেন। এও শান্ত আন্দোলন।

১৮৭১-১৮৭৫ সুরেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের যুগ। সুরেন্দ্রনাথের চাকুরি গেল। ম্যাজিস্ট্রেটি ছেড়ে তিনি দেশসেবক হলেন এবং সমগ্র ভারত-জোড়া মুক্তির সাড়া তুললেন। বঙ্কিমবাবু বহরমপুর আদালত থেকে ফেরার পথে কর্নেল ডাফিন নামে এক মিলিটারী অফিসার কর্তৃক প্রহৃত হন। তার প্রতিবাদ নিয়মতান্ত্রিকভাবেই করেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে পরিবর্তন এল। তিনি ইংরেজ আমলে বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার কথা লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে, রাজশক্তি আন্তরিকভাবে চাইলে কি কৃষকদের দুর্দশা ঘোচে না ? আসলে আন্তরিকতারই অভাব ছিল।

১৮৭২-৭৩ জমিদাররা অতিরিক্ত কর বসায় এবং প্রজাদের জর্জরিত করে। তার ফলে পাবনায় ভীষণ প্রজা-বিদ্রোহ হয়। একদিনে প্রায় নব্বইটি জমিদারী কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এরই ফলে Bengal Tenancy Act বা বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ১৮৮৫ সালে লর্ড রিপন প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। এর পর মারাঠাদেশে ফাড়কে সশস্ত্র প্রজা-বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন।

১৮৭৪ সালে ভোলানাথ চন্দ্র বিলাতী জিনিষ বর্জনের প্রস্তাব করেন। ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে এসে ছাত্র-আন্দোলন সুরু করেন। ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'ছাত্রসভা'। এই ছাত্র আন্দোলনের অঙ্কুর।

সর্বসাধারণের জন্য সারা ভারত-জোড়া প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ইণ্ডিয়া লীগ করেন ১৮৭৫ সালে। এতে সুবিধা না হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এটির শাখা স্থাপিত হয়।

১৮৭৬ সালে 'রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন' হয়। রঙ্গমঞ্চ স্বাদেশিকতার ভাব প্রচার করছিল। তাই এই আইন। রসরাজ অমৃত বসু ও উপেন দাসের এক মাস করে কারাদণ্ড হয়। অবশ্য হাইকোর্টে আপিলের ফলে তাঁরা ছাড়া পান।

১৮৭৮ সালে দেশী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের আইন হল। ১৮৭৯ সালে 'অস্ত্র আইন' বিধিবদ্ধ হয়। ভারতীয়দের বিনা সরকারী অনুমতিতে ঘরে অস্ত্র রাখা

অপরাধ গণ্য হল। ক্লীবে পরিণত করা হল এতবড় জাতিটাকে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হল বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'।

১৮৮২ সালে ভারত সরকার বিলাতী কাপড় আমদানির ওপর বসানো শুল্ক প্রত্যাহার করেন। কারণ ১৮৭৪ সালে বোম্বাইয়ে কতকগুলি কাপড়ের কল হয়েছিল এবং ৮৮,০০০ শ্রমিক সে সব কলে কাজ করে পেটের ভাত সংগ্রহ করত।

১৮৮৩ সালে 'ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ইংরেজদের দেশী ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার করতে পারবে, এইরূপ আইন হতে যাচ্ছিল। ব্যবস্থা-সচিব ইলবার্ট সাহেব ঐ আইনের প্রণেতা। তখন বড়লাট লর্ড রিপন। ইংরেজরা খোলাখুলি বিদ্রোহের হুমকি দিল। আইন পাস ঠিকমতো হল না। হাইকোর্টের এক বিচারপতি এবং বাংলার ছোটলাট প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারীরা সাহায্য করেন ঐ বিদ্রোহী ইংরেজদের।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম। কংগ্রেস তখন দোভাষীর কাজ করত। ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ ইংরেজ সরকারকে জানাত। অত্যন্ত নিরামিষ প্রতিষ্ঠান। কিছুদিন এটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং বড়লাট লর্ড ডাফরিন। সুতরাং এর প্রাণশক্তি সত্যিই না-থাকার মধ্যে। এর গূঢ়মর্ম অনুধাবন করা উচিত। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় নিখিল ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক বসে। সভাপতি হন আনন্দমোহন বসু। তিনি বলেন, This is the beginning of a Parliament (আমাদের দেশে পার্লামেণ্ট স্থাপনের প্রথম সোপান হচ্ছে এটি)। চতুর লর্ড ডাফরিন এটির অন্তর্নিহিত শক্তি নাশ করার জন্য হিউম-এর মাধ্যমে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি গড়ার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে এর প্রথম অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনকে এর জন্য নিমন্ত্রণ করা হয় নি।

এই ১৮৮৩ সালে সাধারণের কল্যাণের জন্য হাইকোর্টের অবমাননার অছিলায় সুরেন্দ্রনাথের দু মাস কারাদণ্ড হয়। দেশের জন্য কারাদণ্ড হল এই প্রথম। ছাত্রমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্র বিক্ষোভের নেতা হন। পি. মিত্তির সুরেন্দ্রনাথকে জেল ভেঙে মুক্ত করে আনার কথা ভাবেন, কিন্তু কার্যতঃ তা সম্ভব হয় নি।

১৮৯০ সালে আসাম প্রদেশের মণিপুরে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। রাজার আদেশে মন্ত্রী টিকেন্দ্রজিৎ আসামের চিফ কমিশনার ও অন্যান্য ইংরেজদের হত্যা করেন। কুচক্রী ইংরেজ এবার অছিলা পেয়ে রাজ্যলোভে স্বাধীন মণিপুরকে কুক্ষিগত করে। হত্যার অজুহাতে রাজাকে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়। রাজার নাবালক পুত্রকে রাজা করা হয়। তাদের সেনাপতি বৃদ্ধ থঙ্গল এবং টিকেন্দ্রজিৎ বীরোচিত গর্বে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেন। তাতে ভারতে সাড়া জাগে।

১৮৯৩ সাল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই সালে মারাঠারা গুপ্ত-সমিতির বীজ নিহিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় জগৎজয়ী হন। আবার ঐ সালে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফেরেন। ইনি বরোদার মহারাজার অধীনে কর্ম নিয়ে আসেন। 'ইন্দু প্রকাশে' সংগ্রামী রাজনীতির প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। ঐ সময় থেকেই তিনি ১৯০৩ সালে বাংলায় গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করেন।

১৮৯৪-১৮৯৫ সাল থেকে মহারাষ্ট্র আবার সশস্ত্র অভিযানের পথ নিল। ভারতের পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুস্থানীয় হল মহারাষ্ট্র। ১৮৯৪ সালে তিলকের অধিনায়কত্বে 'গণপতি উৎসব' লাঠি-সোঁটা-তলোয়ার নিয়ে আরম্ভ। ১৮৯৫ সালে তিলক 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেন। গৌরবের অতীতকে স্মরণ করে মত ও পথ ঠিক করে সামনে শুভদিন আনবার আমন্ত্রণ ছড়িয়ে দেওয়া হল। এ যেন শুষ্ক মালঞ্চে নব বসন্তের আবাহন।

চাপেকার ভাইরা গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার গ্রেপ্তার হন। তাঁরা বীরের মরণ বরণ করে ফাঁসী যান। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর দিন 'র‍্যাণ্ড' ও 'আয়ার্স্টকে' হত্যা করার ফলে এই দণ্ড।

ঐ সালে রাজদ্রোহিতার জন্য তিলকের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঘনঘোর অন্ধকারের বুক চিরে এক ঝলক আলো বেরিয়ে এল। দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথ ও পাথেয় দেখিয়ে দেওয়া হল। দেখান হল সংকল্পকে বুকের রক্তে পুষ্ট করতে হবে।

এইখানকার অনুপ্রাণনা বাংলাকে প্রাণবন্ত করল। বাংলায় ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে গুপ্ত-সমিতি জন্ম নিল ও চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। নিরস্ত্র, শান্ত ভঙ্গিমার আন্দোলন। এতে ছিল স্বদেশী গ্রহণ, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অসহযোগ, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সরকারী আদালত বর্জন ও সালিশী আদালত স্থাপন। বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী বিপিন পাল প্রচারিত কার্য-তালিকার এক বর্ধিত সংস্করণ প্রচার করেন।

১৯০৫ সালের শেষে ইংরেজ যুবরাজ (পরে পঞ্চম জর্জ) এলে স্বদেশী মণ্ডলী থেকে তাঁর অভ্যর্থনা বয়কট করা হয়। এটিও অহিংস বা শান্তিপূর্ণ চেষ্টা। ১৯০৬ সালে বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে (Conference) প্রথম আইন অমান্য করা হয়। ইংরেজ শোভাযাত্রা ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বন্ধ করার হুকুম দেয়। নেতারা অগ্রাহ্য করেন। এটি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

এই আন্দোলনে বহু লোক নিগৃহীত হয়, লাঞ্ছিত হয়। নির্যাতিতকে সর্বসমক্ষে সম্মানদানও এখন থেকে আরম্ভ হল।

১৯০৭ সালে কংগ্রেসে নরমপন্থী দলকে নিষ্প্রভ করে চরমপন্থী দল আবেদন-

নিবেদনের পথকে লজ্জা দিয়ে উঠলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার বার্তা দিলেন।

বিপ্লবী বর্ত্মের আগুন মহারাষ্ট্র থেকে আসে বাংলায়, বাংলা থেকে যায় পাঞ্জাবে। এই তিনটি প্রদেশ প্রথমটা এই পথের পথিক হয়। পুনায় ঠাকুরসাহেব এর প্রতিষ্ঠাতা। অরবিন্দ তাঁর কাছে দীক্ষিত হন।

১৯০৭ থেকে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা দেখা দেয়—বাংলার লাটের প্রাণহানির চেষ্টা, কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি। রাজনৈতিক ডাকাতিও আরম্ভ হয়। ১৯১০ সালের পর সুরু হয় আর এক অধ্যায়।

১৯১২ সালে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ফল্গু নদীর মতো লোক-নয়নের অন্তরালে আর একটা বিরাট প্রচেষ্টা গড়ে উঠছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই অবসরে—অর্থাৎ ইংরেজদের দুর্দিনে ভারতের সুদিন ভেবে—বাংলার বিপ্লবী আত্মা সারা ভারত ও তার বাইরে যে যুদ্ধপ্রচেষ্টা গড়েছিল তা অতি লোমহর্ষণকারী। সেটি আমরা পরে লক্ষ্য করব।

১৯১৪ সালে ২৬শে অগস্ট অস্ত্র-আমদানিকারক রডা কোম্পানীর কিছু অস্ত্র জাহাজে আসে। শোনা যায় তিব্বত অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের অস্ত্র-সজ্জিত করার জন্য কিছু মশার পিস্তল আমদানি হয়। সেগুলি পিস্তলের মতো ছোট অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আবার তাতে বাঁট লাগাবার ব্যবস্থা থাকায় সেগুলি রাইফেলের ন্যায় দূরপাল্লা যন্ত্রের মতো ব্যবহৃত হতে পারে। এই অস্ত্রের কিছু ভাগ গোপনে বিপ্লবীরা হস্তগত করে এবং প্রায় সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেয়। ৫০টি মশার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ কার্তুজ বিপ্লবীদের হাতে এসে পড়ে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যবস্থা হয়। রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এই ব্যাপারে অগ্রণী হন। কিন্তু এক দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে দেওয়ায় সব বন্দোবস্ত পণ্ড হয়ে যায়।

এ ছাড়া ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র হয়। বার্লিনে একটি স্বাধীন ভারত কমিটি গড়ে ওঠে। জার্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগ ও সামরিক প্রধান কেন্দ্রের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। এই ব্যবস্থায় আমেরিকা থেকে জাহাজপূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্যাম ও জাভায় দুটি বিপ্লবী কেন্দ্র গড়া হয়। এরূপ নির্ধারিত হয় যে, শ্যাম থেকে ভারতের বর্মা প্রদেশ আক্রমণ করা হবে, বর্মার দেশী সৈন্য ও মিলিটারী পুলিশ বিপ্লবে যোগ দেবে এবং বর্মা স্বাধীন হবে। তারপর বিপ্লবীরা বর্মা থেকে প্রবেশ করবে ভারতে।

তাছাড়া জাহাজে অস্ত্র এসে হাতিয়া, কলকাতা ও বালেশ্বরে পরিবেশিত হবে।

কলকাতা দখল হবে। বিপ্লবীদের কাছে খবর ছিল মাত্র বারো হাজার বৃটিশ সৈন্য সে সময় ভারতে ছিল। তখন ভারতে ইংরেজের যে সামান্যসংখ্যক সৈন্য ছিল তাদের হারান কঠিন হত না। অধিকাংশ সৈন্য ভারতের বাইরে জার্মানীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য পাঠিয়েছিল ইংরেজ।

জার্মানীতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে 'আজাদ ভারত সৈন্য' I. N. F. ('Indian National Force') গড়া হয় এবং কাবুলে অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করা হয়। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ হন প্রথম গণতন্ত্রের সভাপতি। বরকৎউল্লা প্রধান মন্ত্রী এবং ওবেদুল্লা সিন্ধী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকায় এ সব চেষ্টাই সেবার ব্যর্থ হয়।

১৯১৮ সালে দ্বিতীয় পর্ব শেষ হল। যথাস্থানে এটির বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে। এদিকে ১৯১৪ সালে এনি বেসান্ট ও তিলক 'হোম রুল' বা আত্মকর্তৃত্বের আন্দোলন সুরু করেন। ১৯১৭ সালে বেসান্ট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। তিনি সারা দেশ প্রদক্ষিণ করার রেওয়াজ দেখালেন।

১৯১৯ সালে বিনাবিচারে বন্দী ও বিশেষ আইনে বিচারের ব্যবস্থা দিয়ে রাউলাট আইন পাস হলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রদর্শনের জন্য মহাত্মা গান্ধী দেশজোড়া হরতালের নির্দেশ দেন। তখন যুদ্ধের আবহাওয়া বজায় ছিল। পাঞ্জাবে কোনরূপ রাজনৈতিক হৈ-চৈ হতে না দেওয়া হয়—এই ছিল কর্তৃপক্ষের মত। জালিয়ানওয়ালা-বাগে লোকেরা সত্যাগ্রহ করার মনোভাব দেখায়। তার ফলে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরে ঘটে নৃশংস হত্যাকান্ড। দেশসুদ্ধ লোকের অন্তরাত্মা প্রতিকারপরায়ণ হয়ে ক্ষেপে উঠল। তারই ফলে শেষ অবধি ১৯২১ সালে মহাত্মাজী কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করেন।

শান্ত ভঙ্গিমার আন্দোলন ছিল এটি। কিন্তু চৌরিচৌরার থানা জ্বালানো ও পুলিশ দারোগা নিহত হলে গান্ধীজী এ পর্ব সমাপ্ত করেন।

আবার ১৯৩০ সালে মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করেন। এদিকে বিপ্লবীরাও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে সাময়িকভাবে চাটগাঁ শহরকে ইংরেজ-কবলমুক্ত করে। ইংরেজকে ঠাঁই ছাড়াবার আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়। এই প্রথম বিপ্লবীরা ভারতীয় ভূখণ্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করে। দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার পতাকা ওড়ে কোহিমায় নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজের হাতে।

সেবার বিপ্লবী আন্দোলন ১৯৩৪ সাল অবধি চলেছিল। এর ফলে কলকাতায় ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়িতে বোমা মারা হয়। পুলিশ কমিশনার ভাগ্যগুণে বেঁচে যায়। বিপ্লবী চেষ্টায় বহু ঘটনা ঘটে—দুই একটি আপাততঃ উল্লেখ করা হচ্ছে। আলিপুরের জজ গার্লিক আদালতগৃহে কানাইলাল ভট্টাচার্য কর্তৃক

নিহত হয়। কানাই পটাসিয়াম সাইয়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে। ঢাকায় পুলিশের কর্তা লোম্যান বিনয় বসুর হাতে মারা পড়ে। কুমিল্লায় ম্যাজিস্ট্রেট স্টিফেন্স নিহত হয়। মেদিনীপুরে নিহত হয় তিন ম্যাজিস্ট্রেট পেডি, ডগলাস ও বার্জ। জেলবিভাগের বড়সাহেব কর্ণেল সিম্পসনও মারা পড়ে। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামদের অসফল প্রচেষ্টার পরে এইবার বিপ্লবীরা বহু ইংরেজকে শমন সদনে পাঠায়।

১৯৪২ সালে মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। এবারকার মতো এমন শক্তিশালী আন্দোলন ইতিপূর্বে আর হয় নি। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রামের লোকেরা এতে যথেষ্ট বেশী অংশগ্রহণ করেছে। বিপ্লবী আন্দোলন আর বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীতে ও ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না।

মহাত্মাজী অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে বিশেষ বিচার করে রায় দিলেন—"এ আন্দোলন আমার নয়। এটি সহিংস আন্দোলন।"

তবেই দেখা যাচ্ছে, ভারত স্বাধীন করার আন্দোলন সুরু হয়েছে পলাশী যুদ্ধের বারো-চোদ্দ বছর পরেই। এর আরম্ভ ১৭৭২ সালের সন্ন্যাসী বিদ্রোহে এবং শেষ ১৯৪২ সালের আন্দোলনে। তবুও কথাটা পরিষ্কার হল না। ১৯৪৬ সালে নেতাজীর আজাদ-হিন্দ সৈন্যদের বিচারের সময় যে দেশজোড়া আন্দোলন হয়, ইংরেজের নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহ হয় এবং হাওয়াই সৈন্যদের মধ্যে ধর্মঘট হয়—সেইখানেই আসলে মুক্তি-আন্দোলনের শেষ।

দেখা যাচ্ছে আন্দোলনের সুরু অশান্ত ভঙ্গিমায় বা সশস্ত্র উপায়ে এবং শেষও তাই।

ঢেউয়ের মতো অশান্ত ও শান্ত ভঙ্গিমায় সেই মুক্তিসাধনের প্রচেষ্টা চলে এসেছে।

এখানে আর একটি বিষয়ে মন নিয়োগ করা উচিত। ভারতের ভিতরকার আন্দোলনের কথাই আমরা এপর্যন্ত উল্লেখ করে এসেছি। কিন্তু বিপ্লবী-কুলতিলক মহাবিপ্লবী রাসবিহারী ও ভারতমাতার প্রিয়তম দুলাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যুগলের ভারতের বাইরের চেষ্টাকে বাইরের আন্দোলন ভাবলে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিচার করা হবে।

ঐ প্রচেষ্টা ভারতের বাইরে থেকে ভারতকে মুক্ত করার মহাপ্রয়াস। আজাদ-হিন্দ ফৌজের ক্রিয়াকলাপ ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টারই মহিমোজ্জ্বল অনুপূরক অঙ্গ।

আমাদের দেশাত্মবোধ জাগার দিক থেকে এইসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য যে, দুর্ভিক্ষের দানও বেশ যথেষ্ট। এর ফলেও সারা ভারতে একাত্মবোধ জাগে।

দুর্ভিক্ষ : ১৭৭০, ১৭৭৭, ১৮০৩, ১৮৩৭, ১৮৬১। এই শেষ সালে যুক্তপ্রদেশে (আজকাল উত্তরপ্রদেশে) দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। এইবারে ভারত-জোড়া ব্যথার অনুভব ও সহানুভূতির সাড়া পড়ে।

তারপর আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়—১৮৬২, ১৮৭২, ১৮৭৬ সালে। ১৮৭৭ সালে একদিকে দুর্ভিক্ষ, অপরদিকে ধুমধাম করে দিল্লীর দরবার। "কার গোয়াল, কেবা দেয় ধোঁয়া ?" লোক মরুক সেদিকে কর্তাদের দৃষ্টিপাত নেই। এই দরবারে ভিক্টোরিয়াকে ভারতের মহারাণী ঘোষণা করা হয়। ১৯০৩ সালে আবার দুর্ভিক্ষ। এই সালে আর একবার দিল্লীর দরবার। লর্ড কার্জন এর অনুষ্ঠাতা। সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণের সমারোহ ব্যাপার।

মোটের ওপর ভারতে বহুবার দুর্ভিক্ষ হয় এবং সব মিলিয়ে তিন কোটির ওপর লোক মরে।

আমি কলকাতার 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দিই ১৯০৫ সালের মে মাসে। তখনও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হয় নি। বাড়িতে আলোচনার ফলে আমার যে শিক্ষা হয়েছিল তাতে জানতাম বিপ্লব চতুরঙ্গ। চতুর্বঙ্গের সমন্বয় বা মিলন না হলে প্রকৃত রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভব নয়। এই চতুঃশক্তি হচ্ছে ছাত্র বা যুব জাগরণ এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদলের ভূমিকা গ্রহণ। এই কার্যতালিকা গ্রহণ করলে, সংগঠন গড়ে তুলতে কিছু সময় অবশ্য লাগবে।

১৯০৬ সালে অনুশীলনের একদল কর্মী খোলাখুলিভাবে বিপ্লবের প্রচারপত্র স্থাপনের প্রয়াসী হন। এই কাগজের নাম হয় 'যুগান্তর'। বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে ডাক্তার) এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য এই কাগজের প্রকাশ ও প্রচার করেন। শক্তিশালী লেখকের মধ্যে দেবব্রত বসু ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়।

১৯০৭ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রশ্ন ওঠে। বারীনবাবুরা কাগজটি অপর একদল কর্মীর হাতে ছেড়ে দিয়ে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহে মন দেন। মনে রাখতে হবে, এই অগ্রণী দল অনুশীলন সমিতির সঞ্চালক মিত্তিরসাহেবের সঙ্গে মত না মেলায় ক্রমে কর্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হন।

এই সময় সমিতির মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। অর্থসংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি এবং বাছা বাছা দুষ্ট রাজপুরুষদের চরম দণ্ডদানের কর্মতালিকা অতি সঙ্গোপনে আলোচিত হতে লাগল। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সতীশবাবু আমায় ঐ পথে টানার চেষ্টা করেন। আমার বন্ধু প্রভাস দেব বারীনবাবুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সে দ্বিতীয় আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হয়। মহেন্দ্র দাস নামে আর এক বন্ধু আমাদের ঐ পথে টানতে চায়। সেও প্রভাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত।

আমার মন এতে সায় দেয় না। আমি ঠিক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি অন্য একটি কর্মতালিকা দিই। তাতে বলি বিপ্লব চাই এবং তা আনতে হলে একসঙ্গে চতুর্ধারায় কাজ করতে হবে। নইলে শুধু সন্ত্রাসবাদ এসে পড়বে। রুশ নিহিলিস্টদের সন্ত্রাসবাদ আমাদের জানা ছিল। যুবমনের ওপর তার প্রভাবও অতি প্রবল ছিল।

সমিতিস্থ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলেন—কতদিনে আমার প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে। আমি বলি—দশ-এগার বছর খাটতে হবে। নইলে ১৮৫৭ সালের দশা আমাদের হবে। দু-একটা পিস্তল গোপনপথে যোগাড় করায় কি-ই বা হবে? সারা সৈন্যশক্তি (১৮৫৭) জেগে উঠেছিল, তবু ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার অতবড় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। কেন? জনসাধারণ সে আন্দোলনকে সমর্থন করে নি। তাদের মনে সাড়া জাগে নি। অতএব ঐ ভুলটা আমাদের শুধরে নিতে হবে। জনসাধারণের মনোভাব ছিল—যেই রাজা হোক, সে খাজনা দেবে আর বসবাস করবে, তার কোন মাথাব্যথার কারণ নেই। কিন্তু আমাদের আনতে হবে রাজনৈতিক ওলট-পালটের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তনও। এতে জনসাধারণের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত। অতএব তারা সাড়া দেবে।

তখন প্রশ্ন হল—কবে আসবে সেদিন? আমি বলি—যা-তা করে কাজ সারলে হবে না। জাতীয় স্বার্থপরতার জন্য ইংরেজ ও জার্মানীতে একটা লড়াই অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজের সেদিন হবে দুর্দিন। আর ওদের দুর্দিনে আমাদের সুদিন। ভারতের স্বাধীনতা, এইরকম সংকট সময়ের সুবিধা নিতে পারলে, তবে আসবে। অন্য পথ নেই।

তখন আবার প্রশ্ন হল—কবে হতে পারে সেই যুদ্ধ? সন তারিখ ঠিক বলতে পারলাম না। ফলটা হল ঠিক যেন ফুটবলের ম্যাচ ও ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতার চিত্তাকর্ষণের তারতম্যের মতো। ফুটবলে এক ঘণ্টার প্রতীক্ষা। এর প্রতিটি মুহূর্ত উত্তেজনাপূর্ণ। ক্রিকেটে ছয় ঘণ্টার প্রতীক্ষা। কবে একটা বাউণ্ডারি বা ওভার-বাউণ্ডারি হবে—তার উত্তেজনা প্রাপ্তির উৎসাহ ক'জনের হয়? ফুটবলের ম্যাচে কি বিপুল ভিড়! ক্রিকেটে সেরকম হয় না।

এর ফলে আমি সংখ্যালঘিষ্ঠয় পরিণত হলাম। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন আশু দাস (পরে ডাক্তার), বিনয় দত্ত, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, লাডুলিমোহন মিত্র (পরে প্রফেসার) এবং সতীশ সেন। আমার চেয়ে ছোট বয়সের ছিল—হরিপদ রায়চৌধুরী, ফণী শেঠ, অন্নদা মজুমদার, অমর ঘোষ প্রভৃতি।

সত্যই বারীনবাবুদের কাজ তরুণ মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। পুলিন দাসের পরিচালিত কার্যগুলিরও প্রভাব সেদিন হয়েছিল অনন্যসাধারণ। এতে যুবক বন্ধুরা

মেতে উঠেছিলেন। কোন কোন বন্ধু আমায় বললেন—তুমি বিপ্লবী কাজের কায়দা বোঝ না। আমি ডাকাতির ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। যদিও দেখতাম যে, একদল দুর্ধর্ষ সৈনিক এই পথের আকর্ষণে তৈরি হয় এবং বুঝতাম যে, অসমসাহসিকতায় যে-কোনও কার্যে দল বাড়াবার উপায় সহজ হয়। তবু নিজের দেশের লোকের বাড়িতে ডাকাতি করার ফলে বিপ্লব প্রচেষ্টা জনগণের সহানুভূতি হারাবে, এই ছিল আমার ভয়। কারণ আমি চাই জনসাধারণের সমর্থন। যারা যতীন্দ্রনাথকে কলকাতায় ঐ সময়—১৯১৪ সালে—ডেকে এনেছিলেন তাঁরাও প্রথমে আর কিছু বুঝতে চান নি। পরে নরেন মানবেন্দ্রনাথ রায় হয়ে মেক্সিকো গিয়ে ১৯১৭ সালে সত্য সত্য বুঝলেন বিপ্লবের কর্মতালিকায় জনসাধারণের স্থান কত উচ্চে। কৃষক-মজুরকে বাদ দিয়ে সমাজে বিপ্লব আনা যায় না। তাই আমার কর্মতালিকায় ছিল—বিপ্লব চতুরঙ্গ। নরেন আমার কার্যসূচী শুনে বলেছিলেন—'তুমি ওসব কি বলছ? তোমার ওপর আমরা কত আশা রাখি?' এ কথা ১৯১৪ সালে যখন একটা অতি গোপন বৈঠক বসে, সেই সময়ে হয়। গঙ্গাবক্ষে নৌকার ওপর অথবা উত্তরপাড়ায় হবার কথা ছিল সে বৈঠক। যতীন্দ্রনাথ তাতে থাকবেন এমন কথাও আমায় বলা হয়। বহু পরে ডাকাতিতে কেন তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা উত্তর আমি মনের কাছে পেয়েছিলাম। বাঙালীকে সৈন্যদলে নেওয়া হত না। হৃতশ্রদ্ধ-বীরভাব অভিমানে দুঃসাহসিক কার্যের একটা রাস্তা খুঁজছিল। সে পথ তারা এই কাজে পায়। তাছাড়া দুষ্ট রাজপুরুষকে হত্যা, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে challenge বা আক্রমণের নামান্তর। মোট কথা এরা বলতে চেয়েছিল—তোমায় মানি না।

আমেরিকা ফরাসীর সাহায্যে ইংরেজের অধীনতা পাশ নাশ করে। ইটালীর স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ইতিহাসও অনেকটা অনুরূপ। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ট্রিয়া বেজায় শক্তিহীন হয়ে যায়। সেই তো ইটালীর সুবিধা।

বৈদেশিক সাহায্যের দিকে আমার মন ছোটে। ছাত্র বা যুবক তো আমরা ছিলামই। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ সুরু করলাম। সৈন্যরা শুকনো বারুদের স্তূপ। ওরা মন্ত্রগুপ্তি বেশিদিন রাখতে পারে না। সেজন্য অন্য আয়োজন সারা হলে ওদের মধ্যে কাজ সুরু করার মতলব আমাদের থাকে।

আশু দাস ও আমার মেডিকেল কলেজে যাবার উদ্দেশ্য ছিল যে, পাঞ্জাবে, ইংরেজ সৈন্যসংগ্রহের ভূমিতে, আমরা ডাক্তারির ছলে গিয়ে পাঞ্জাবী ভাইদের দেশের কাজে টানব। তাই পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায় বা কাঙালদাকে কম্পাউন্ডারি পাস করালাম।

বন্ধুবর্গের পরামর্শে বিদেশে লোক পাঠানোয় মন দেওয়া হল। আমার ঠিক ওপরের ভাই ক্ষীরোদগোপাল ১৯০৮ সালে গেলেন বর্মায়। ওখানে সাহিত্য-মহারথী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। শরৎবাবু ক্রমে এঁর কাছ থেকে

বিপ্লবীদের খবর কিছু পান। মার্সিদি আফগানের সঙ্গে জুটে অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টায় ১৯১৫ সালে ক্ষীরোদগোপাল অন্তরীণ হন। পরে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

ধনগোপাল ১৯০৮ সালে জাপান হয়ে আমেরিকায় যায়। কপালগুণে ধনগোপাল অ্যানার্কিস্টদের প্রভাবে পড়ে। তার সঙ্গে পত্রে বহু বাদানুবাদের পর সে ঐ দল ছাড়ে। তখন তার অন্য একটা শক্তি প্রকাশ পায়। সে লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা ভারতকে পাশ্চাত্যদেশীয়দের কাছে জনপ্রিয় করার নিপুণতা লাভ করে। আমরা তাকে আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য ঐ পথ অবলম্বন করতে বলি। ওদেশের শুভেচ্ছা পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। মিস ম্যাকলাউড—স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ভক্ত এবং যিনি জাপানী কাউন্ট ওকাকুরাকে ১৯০২ সালে ভারতে আনেন, আমায় বলেন—After Swamiji, Dhan is the proper person to interpret India to the West—স্বামীজীর পর ধনগোপালই পাশ্চাত্ত্যের কাছে ভারতকে পরিচিত করার উপযুক্ত মানুষ। মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র প্রথম উত্তর সে দেয়—A Son of Mother India Answers—ভারতমাতার একটি সন্তানের উত্তর। অপর বই Visit India with Me—আমার সঙ্গে ভারতে চলুন। মনীষী আর্ল ব্রুস্টার ও তাঁর পত্নী ধনের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার Face of Silence বইটির কাহিনী শুনে রোম্যা রোল্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লেখায় মন দেন।

১৯১০-১১ সালে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় যায় পিনাঙে। আমাদের পরিচিত বীরেন দাশগুপ্ত বোধ হয় ১৯১২-১৩ সালে আমেরিকা হয়ে জার্মানী ও সুইটজারল্যাণ্ডে যান। ইনি আমাদের উত্তরবঙ্গের কর্মী। এর সঙ্গে যোগ ছিল সতীশ সেনের। এঁকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার অবকাশ খুঁজতে বলা হয়েছিল। ১৯১২ সালে সত্যেন সেন আমেরিকা যান ও যোগাযোগ করেন তারকনাথ দাসের সঙ্গে।

১৯১২ সালে ভূপতি মজুমদারকে ইউরোপ ঘুরে আমেরিকা পাঠানো হয়। ইউরোপে যোগাযোগ রক্ষিত না হওয়ায় অর্থসংকটে পড়ে তাঁকে ফিরতে হয় দেশে।

১৯১৩ সালে সুরেন কর বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয় ছেড়ে জাপান হয়ে আমেরিকায় যান, তারপর ১৯১৪ সালে জার্মানীতে। অবনী মুখার্জীর এঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে পরিচয় ঘটে। অবনীও ১৯১৫ সালে জাপানে যান। ১৯১৩ সালে জিতেন লাহিড়ী যান আমেরিকায়। তারকনাথ দাস ১৯০৬ সালের শেষে অধর লস্করকে নিয়ে জাপান যান। সেখান থেকে তারকনাথ যান আমেরিকায়।

১৯১৩ সালে ভোলানাথকে পুনরায় বাইরে পাঠান হয়। সে এর মধ্যে পিনাঙ থেকে একবার কলকাতায় এসেছিল। এবার ভোলানাথ ও ননী বোস চট্টগ্রাম, বর্মা হয়ে শ্যামদেশে যায়। ননী মহারাজ নামে সাধু সেজে ননী ভোলানাথের সঙ্গে থাকে। সেখানে একটি কেন্দ্র গড়ে তোলে। তার ধর্মের আবরণ পাঞ্জাবীদের

আকর্ষণ করতে খুব সহায়ক হয়।

ঐ সময় শ্যামদেশ থেকে বর্মা পর্যন্ত একটি রেল লাইন প্রস্তুত হচ্ছিল। জার্মান ইঞ্জিনিয়াররা কাজ চালাতেন। পাঞ্জাবীরা তাঁদের অধীনে কাজ করত।

ভোলানাথ শ্যামে একটি কেন্দ্র গড়ে তোলে। তাতে থাকে উকিল কুমুদ মুখার্জী, ইঞ্জিনিয়ার অমর সিং এবং রেলকর্মচারী নারায়ণ সিং।

১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নাম হয় নিরালম্ব স্বামী) পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিপ্লব প্রচারে বের হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অজিত সিং ও তাঁর ভাই কিষণ সিং-এর (শহিদ ভগৎ সিং-এর পিতা) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লালা হরদয়াল খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি সরকারী বৃত্তি নিয়ে ১৯০৫ সালে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। সেখানে তাঁর সরকারী বৃত্তিতে বিতৃষ্ণা জন্মে। ১৯০৮ সালে তিনি ঐ বৃত্তি ত্যাগ করেন এবং পাঞ্জাবে ফিরে আসেন। কিষণ সিং প্রভৃতির সংস্পর্শে তিনি বাংলার যুগান্তর-পত্রিকাবলম্বী বিপ্লবীদের অনুকূলে মত পোষণ করতে লাগলেন। তিনি লোকসংগ্রহার্থে ক্লাস (পাঠচক্র) সুরু করলেন। তিনি থাকতেন লালা লজপৎ রায়ের বাড়িতে। সে সময় তিনি বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive resistance) কর্মতালিকায় এনে ইংরেজকে তাড়াবার স্বপ্ন দেখতেন। এই পন্থা স্বদেশী আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র পাল বাংলাকে দিয়েছিলেন।

১৯১০ সালে আমেরিকায়, পোর্টল্যাণ্ডে কর্মক্ষেত্র খোলা হয়। নেতা তখন কাশীরাম। সোহন সিং গ্রন্থী যোগ দেন ১৯১১-১২ সালে। কেন্দ্র তাতে খুবই শক্তিশালী হয়। হরদয়াল ১৯১১ সালে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে গদর (বা বিদ্রোহ) দল গড়তে মনস্থ করেন। হরদয়াল সানফ্রান্সিস্কোতে দল গড়তে লাগলেন। দলের কাজের জন্য একটি প্রচার-পত্রিকার প্রয়োজন বোধ হল। পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হল। নাম হল গদর। গদর মানে বিদ্রোহ। একটি আড্ডা করলেন কাগজ চালানো ও দলগড়ার জন্য। তার নাম দিলেন 'যুগান্তর আশ্রম'। ভারত ও আমেরিকায় এই কাগজের বহুল প্রচার হয়। ভারতের সমসাময়িক প্রত্যেক মৃত্যুঞ্জয়ীর ও রাজদ্রোহীর স্তুতিতে কাগজ ভরপুর থাকত। হরদয়াল প্রচার বিভাগের মাথা ছিলেন। কর্মবিভাগ (Military Department) খানাখোজের অধীন ছিল। হরদয়ালের উপযুক্ত সহকারী কয়েকজন জুটেছিল। ১৯১৪ সালে পণ্ডিত রামচন্দ্র সানফ্রান্সিস্কোতে আসেন। দলে এলেন পেশোয়ারের ঐ রামচন্দ্র, ভূপালের বরকৎউল্লা, পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ (কেউ কেউ বলেন পরমানন্দ দলের সভ্য হন নি)। বরকৎউল্লা ইংলণ্ড, আমেরিকা ঘুরে জাপানে আসেন—সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক হন। বৃটিশবিরোধী লেখা বা ক্রিয়াকলাপের জন্য টোকিও

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর চাকুরি যায় এবং তিনি আমেরিকায় চলে যান। গদর দলে একজন মুসলমান প্রতিনিধির দরকার ছিল। বরকৎউল্লা সেই স্থান দখল করেন ১৯১৪ সালে।

হরদয়ালের রাজনৈতিক বক্তৃতার ফলে মার্কিন সরকার তাঁকে ১৬ই মার্চ, ১৯১৪ সালে অ্যানার্কিস্ট বলে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে ওদেশ থেকে বিতাড়নের মতলব ছিল। তিনি এক শিখের সাহায্যে জামিনে খালাস হন এবং গোপনে আমেরিকা থেকে পালিয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডে আসেন।

রামচন্দ্র তখন যুগান্তর আশ্রম ও গদর পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। গদর-ই-গুঞ্জ বা বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি নামক একটি ছোট কবিতার বই প্রকাশিত হয়। তাতে ইংরেজ বিদ্বেষীদের প্রশস্তি ছিল। এতে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন—তিলক, সুফী অম্বাপ্রসাদ, অজিত সিং, লিয়াকৎ হোসেন, বরকৎউল্লা, সাভারকর, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, হরদয়াল প্রভৃতি।

পিংলে ও সত্যেন সেন এসে গদর দলে যোগ দেন।

এই ভূমিকা করার পর আমাদের আসল বিপ্লবী মতলব বা প্ল্যানের কথায় আসতে চাই।

যা বলেছি তার থেকে সহজে সিদ্ধান্ত হয় যে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে জার্মানীর সাহচর্যে ইংরেজ তাড়ানর প্রচেষ্টায় জার্মানী পররাষ্ট্র এবং যুদ্ধ বিভাগের প্রধান কেন্দ্রের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছিল।

১৯১৪ সালের শেষের দিকে সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসে বার্লিনে ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটি (Indian Independence Committee) গড়ে ওঠে। যুদ্ধ বেধে ওঠার পরই জার্মান-প্রবাসী ভারতীয়রা জার্মানীর প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন ক'রে সংবাদপত্রে লিখতে আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত ব্যারন ওপেনহাইমের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ হয়। এই দলে ছিলেন ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, ধীরেন সরকার, বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং বোম্বাই অঞ্চলের কয়েকজন অধ্যাপক। ওপেনহাইম খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন।

পরাঞ্জপে, মারাঠে, সুক্তাঙ্কর, শোভান, সিদ্ধিকি, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত এই দলে যোগ দেন। এদিকে সুইট্জারল্যাণ্ডের জুরিখ নিবাসী চম্পকরমন পিলাই —যিনি জুরিখে 'প্রো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' (Pro-Indian Society) স্থাপন করেছিলেন—জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগে দরখাস্ত করেন, যেন তিনি বার্লিনে এসে বৃটিশ-বিরোধী একটি সমিতি স্থাপন করতে পারেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ও পিলাই উভয়ে স্বাধীনভাবে বিপ্লব ঘটাবার জন্য সাহায্য চান। এঁরা অনুমতি পান। বার্লিনে ব্যারন ওপেনহাইমের পরামর্শ-মতো একটি কমিটি হয়। নাম হল 'ভারত-বন্ধু জার্মান

সমিতি'। এটি জার্মান ও ভারতীয়দের মিশ্র সমিতি। প্রেসিডেণ্ট হের আলবার্ট বলেন, সহকারী সভাপতি ওপেনহাইম ও সুক্তাংকর এবং প্রথম সম্পাদক হন ধীরেন সরকার। এরপর সুক্তাংকর ভারতে ফিরে আসেন। তখন তার জায়গায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি হন। এমন সময় ধীরেন সরকার ও মারাঠেকে আমেরিকায় ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তখন সম্পাদক হন একজন জার্মান—ডাঃ মুলোর। তাঁরা আমেরিকা থেকে নিম্নলিখিতদের জার্মানীতে পাঠান—জিতেন লাহিড়ী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দাস। হরদয়াল ১৯১৪ সালে আমেরিকা থেকে সুইট্জারল্যাণ্ডে আসেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বার্লিনের কমিটিতে আনেন। এর পর বার্লিন কমিটি বিদেশী সম্পর্কশূন্য হয়। নাম হয় Indian Independence Committee। প্রথমে একজন সভাপতি হন—মনসুর। তারপর এই পদ উঠিয়ে দেওয়া হয়। সর্বমিলিত দায়িত্বে কমিটি কাজ করত। ১৯১৫-১৬—এক বছর বীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক থাকেন। তারপর ১৯১৬-১৮ অবধি ভূপেন দত্ত সচিব হন। বরকৎউল্লা, হেরম্ব গুপ্ত, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী এই কমিটির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ইটালী, সুইট্জারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স পরিভ্রমণের ছাড়পত্র নিয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডে পৌঁছেন। তিনি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। ভারতে থাকতেই রাজার জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পাওয়ায় মিরাটের কমিশনার তাঁর প্রতি বিরূপ হন। যাই হোক শ্যামজীর নির্দেশে তিনি হরদয়ালের সঙ্গে পরিচিত হন। হরদয়াল তাঁকে জার্মান কন্সাল জেনারলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন এবং বার্লিনে যেতে বলেন। পরে বীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বার্লিনে নিয়ে যান। এর ফলে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘে প্রবেশ করেন এবং কৈসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। কৈসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। বার্লিনের এই কেন্দ্রটি বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগাবার জন্য ভারতীয় নানাভাষায় প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। বরকৎউল্লা বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের বিগড়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-দল তৈরি করেন। নাম হল I. N. F. (Indian National Force)—ভারতীয় জাতীয় ফৌজ। ভারতীয় জাতীয় ফৌজ গঠনের চেষ্টা বার্লিনে, কুটেল আমারায়, বাগদাদে ও কেরমানে জার্মান-তুর্কি হস্তে বন্দী ভারতীয় সিপাইদের নিয়ে আরম্ভ হয়। কেরমান থেকে বেলুচ-সর্দার জিহান খাঁর সহায়তায় বেলুচিস্তানের যে অংশ পারস্য সীমানার কাছে ছিল সেখানে মুক্তি-সৈন্য হানা দিয়ে জয়লাভ করে এবং তথায় একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকার স্থাপিত হয়। কিছুদিন বাদে অবশ্য ঐ স্থান ছাড়তে হয়।

একটা খেদের কথা আছে। কুটেল আমারার অধিকাংশ সৈন্যদের কন্স্টাণ্টিনোপলে

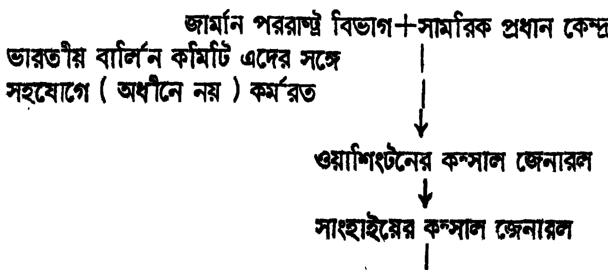
আনলে সুবিধার পরিবর্তে কাজে বাধা সৃষ্টি হল। একদল গোঁড়া ভারতীয় মুসলমান তুর্কি সরকারকে কুপথে চালিত করে। সিপাইদের হিন্দু ও মুসলমান হিসাবে পৃথক করে দেওয়া হয়। মুসলমানদের আরামে রাখা হয় এবং হিন্দুদের কষ্ট দেওয়া হয়। জাতীয় মুক্তি-সৈন্য গঠন প্রচেষ্টার যবনিকাপাত হয় ঐখানে।

পিলাই বার্লিন কোড বা সাঙ্কেতিক ভাষায় জার্মান সরকারের বদান্যতায় শ্যামরাজ্যের ব্যাংককে একটি ছাপাখানা স্থাপন ক'রে তার মাধ্যমে যুদ্ধের খবর প্রাচ্যে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। হেরম্বলাল আমেরিকায় কাজের ভার নিয়ে চলে আসেন এবং বোয়েম (Boehm) নামক এক জার্মানকে শ্যামে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য—তিনি শ্যামে ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা দেবেন। তার ফলে ভারতীয়রা সদলবলে বর্মা (তৎকালে ভারতের একটি প্রদেশ) আক্রমণ করবেন। সেই সময় বর্মাস্থিত ভারতের কর্মীরা সৈন্য ও মিলিটারী পুলিশ দলকে বিদ্রোহী করে তুলবেন। তারপর শ্যাম-বর্মার জাতীয় সৈন্যরা মূল ভারত আক্রমণ করবে।

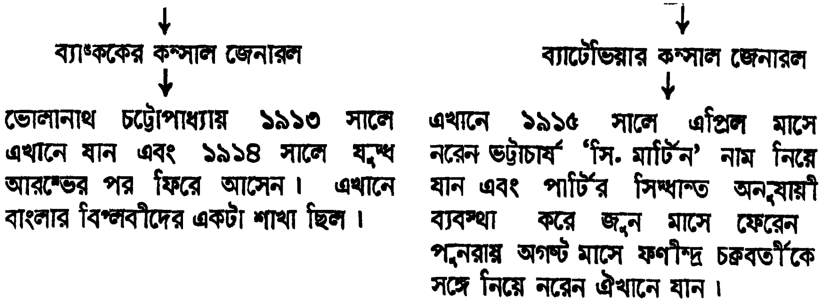
ওদিকে গদর পার্টির লোকেরাও দলে দলে দেশে ফিরে পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে ও সৈন্যবিভাগের মধ্যে অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করবেন। জার্মানীর জেনারল স্টাফ বা সৈনিক বিভাগের প্রধান কেন্দ্র বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যেসব কার্য-পদ্ধতি অবলম্বিত হবে সে বিষয়ে মাথা দেবে। অসন্তুষ্ট মুসলমানেরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাদের হানা কেন্দ্রীভূত করবে এবং বাকিরা সাংহাইয়ের কন্সালের (Consul of Shanghai) সঙ্গে সংযুক্ত থেকে ব্যাঙ্কক, জাভা, ব্যাটেভিয়ার কেন্দ্র থেকে ভারত আক্রমণ করবে। ব্যাংককে পাঞ্জাবী ও বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে যোগ ছিল। ব্যাটেভিয়ায় ক্রিয়াস্থল ছিল শুধু বাঙালী বিপ্লবীদের।

আমেরিকাস্থ ওয়াসিংটনের কন্সাল জেনারলের অধীনে সমস্ত ব্যাপারটা জার্মানরা রেখেছিল। নিউইয়র্কের কন্সাল জেনারল খবর দিয়ে বিপ্লবীদের বার্লিনে পাঠিয়েছিলেন।

তাহলে ব্যবস্থাটা ঘটেছিল এই রকম ঃ



সাংহাইয়ের কন্সাল জেনারেল



এখান থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার বিলি-বন্দোবস্ত এইভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অস্ত্রসম্ভার তিনভাগে বিভক্ত হবে—

(১) নোয়াখালিতে বা হাতিয়ায় একভাগ পাঠান হবে। পূর্ববঙ্গে এর ফলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে। এ কাজের ভার ছিল নরেন ঘোষচৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ বরিশালের বন্ধুদের উপর।*

(২) সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে কলকাতা ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের জন্য একভাগ আসবে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও নরেন ভট্টাচার্য এগুলির ভার পাবেন। কলকাতা কেল্লার দেশী সৈন্যেরা বিদ্রোহ করতে প্রতিশ্রুত ছিল। কলকাতার সব অস্ত্রাগার বা অস্ত্রের দোকান লুট করা হবে। কলকাতা দখল করা হবে। প্রয়োজনমতো ডিনামাইটে উড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত ফণী চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার ও ব্রজেন দত্তর উপর ন্যস্ত হয়।

* যাদুগোপাল ১৯৫০।৬০এ নোয়াখালির চিত্তরঞ্জন দাস ও রসময় মিত্রকে বলেছিলেন, 'হাতিয়া'র কথা পূর্বে তোমরা জানতে না। কারণ, তোমরা তখনো শিশু। তবে নোয়াখালিতে আমাদের শাখাটা তখন শক্ত-সবল ছিল। নোয়াখালি নরেন ঘোষচৌধুরীর নিজের জেলা—সত্যেন্দ্র মিত্রেরও জেলা। প্রথম যুদ্ধের ঐ সময়ে সেখানকার প্রধান কর্মী ছিলেন নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি। তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী হাতিয়াতে অস্ত্রাদি নামানোর জন্য আয়োজন করেছিল। সমুদ্রের উপকূলে কুঁড়ে তুলে কর্মীরা অপেক্ষা করে। অস্ত্র নামানো হলে তা নৌকোয় পাঠানো হবে শহরের উপকণ্ঠে নদীর পাড়ের একটি গ্রামে। সেখান থেকে শহর হয়ে চলে যাবে—দেশের অন্যত্র, এসব কাজের জন্য নোয়াখালিতে দলের কর্মীরা ট্রেনিংও পেয়েছিল। কিন্তু জাহাজও এল না, অস্ত্রও এল না। তখনকার কর্মীদের মধ্যে অসিত ঘোষ থাকবার কথা। তবে সে তখনো খুবই তরুণ। যুদ্ধের শেষে কংগ্রেস আন্দোলনে যখন নগেন্দ্রবাবু, ক্ষিতীশ প্রভৃতি খুব ব্যস্ত, অসিতই তখন নোয়াখালির সেই শাখাকে সজীব রেখেছিল সে পর্বে। তার থেকেই তোমাদের (চিত্তরঞ্জন, রসময় প্রভৃতির) পর্বের সূচনা—সে অধ্যায় তোমাদের জানা।"—সম্পাদক

(৩) আর একভাগ যাবে বালেশ্বরে। উড়িষ্যার সংলগ্ন হচ্ছে মেদিনীপুর। বালেশ্বর জেলা থেকে সিংভূমের ভিতর দিয়ে মেদিনীপুর যাওয়া যাবে। সিংভূমে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয় চক্রবর্তী প্রভৃতি আর বালেশ্বরে স্বয়ং বীর-কেশরী যতীন্দ্রনাথ নিজেই অপেক্ষা করছিলেন।

তবেই পূর্ববঙ্গ, মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ সশস্ত্র অভিযানে এসে পড়ে।

বলা বাহুল্য উত্তরবঙ্গ মধ্য ও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে জড়িত ধরা হয়েছিল। ময়মনসিংহে হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী প্রমুখ বন্ধুরা ওদিককার ভার পেয়েছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে রংপুর দিয়ে উত্তরবঙ্গের পথ পড়েছিল। বালেশ্বরের কাছে সমুদ্রের ধারে ১৯০৫ সাল থেকে চন্ডীপুরে কামানের গোলার জোর পরীক্ষার জন্য বৃটিশের একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। এখানে যার-তার প্রবেশ নিষেধ। এমন কি I. C. S. সাহেবদেরও ঢুকতে দেওয়া হত না। এই সংবাদ আমরা জানতাম। অতর্কিত আক্রমণে এদের পরাভূত ও বিধ্বস্ত করা আমাদের কার্যতালিকায় ছিল। নচেৎ বালেশ্বরে অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ থেকে নামান অসম্ভব ব্যাপার ছিল। একজন ইংরেজ সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট ও কমান্ডিং অফিসার এখানে সর্বেসর্বা ছিল।

আমাদের আন্দাজ ছিল যে, বিশ্বযুদ্ধ বাধবে ১৯১৮ সাল নাগাদ। আমরা সেইভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু আকস্মিকভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হল ১৯১৪ সালে। সেজন্য অনেক ত্রুটি দেখা গেল আমাদের প্রস্তুতিতে।

কিন্তু আগে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ফেলেছি বলে পেছুনো চলল না। যতীন্দ্রনাথ বার বার বলেছিলেন—আমাদের আর পেছুনো চলে না। সেজন্য যা তোড়জোড় করতে পেরেছিলাম তাই নিয়ে এগুনো হল।

১৯১৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা ভারতে সৈন্যবিদ্রোহের কথা হয়। রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতার কেল্লার দেশী সিপাহীরা রাজী থাকে। পাঞ্জাবে কৃপাল সিং নামক এক বিশ্বাসঘাতকের দরুন এই বন্দোবস্ত পন্ড হয়। তারপর আত্মারাম নামে এক পাঞ্জাবী আমেরিকা থেকে সাংহাই ও ব্যাঙ্কক হয়ে পাঞ্জাবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আসেন। সম্ভবতঃ মার্চ মাসে তিনি আমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করেন। যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন যতটা মনে হচ্ছে আমেরিকা-ফেরত সত্যেন সেন অথবা তাঁর মামা কবিরাজ বিজয় রায়। আলাপ আলোচনার পর আত্মারাম আমায় সমুদ্রপথে অস্ত্র ও অর্থ পাবার ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে ব'লে ব্যাঙ্ককে চলে যান। তিনি ব্যাংককের জার্মান কন্সাল জেনারলের সাহায্যপ্রাপ্তি কিরূপে ঘটবে সেই বার্তা কুমুদ মুখার্জিকে দিয়ে পাঠান।

ম্যাভারিকের কথা কিছু প্রকাশ থাকা উচিত। 'মার্টিন' এপ্রিল মাসে ব্যাটেভিয়ায় যান। ওখানকার-জার্মান বাণিজ্যদূত তাঁকে বিশেষ কর্মচারী হেলফেরিকের সঙ্গে

পরিচিত করে দেন। হেলফেরিক রাজী হন যে, একটি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নদীতে পৌঁছে দেবে। তাতে ৩০,০০০ রাইফেল, প্রত্যেকটির জন্য ৪০০টি করে কার্টিজ এবং দু-লক্ষ টাকা থাকবে। মার্টিন কলকাতায় 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সকে' তারে জানান ব্যবস্থা ভালোই হয়েছে। এরপর মার্টিন ফিরে আসেন। আমরা যে কর্মতালিকা প্রস্তুত করেছিলাম জার্মান কর্তৃপক্ষ তা সমর্থন করে। মার্টিন জুন মাসে ফিরে আসেন। যখন আমি কোন্ জায়গায় কি কাজ হবে সেই নক্সা তৈরি করেছিলাম, ভোলানাথ সেই সময়ে সুন্দরবনটা কাজে লাগানো হোক এই পরামর্শ দেয়। পরে দেখা গেল তার পরামর্শ খুবই মূল্যবান।

জাহাজ থেকে মাল খালাসের ব্যবস্থা হয়। জাহাজ রাত্রে পৌঁছবে। তার একটা মাস্তুলে সারি সারি কতকগুলি আলো থাকবে। তাই দিয়ে জাহাজ চিনতে হবে। আর যাঁরা মাল নামাবেন তাঁরা সবুজ আলো দোলাবেন। তাহলে জাহাজ থামবে।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে জাহাজ ম্যাভারিক ছাড়ল। তাতে ২৫ জন নাবিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। তাছাড়া পাঁচজন পারস্যদেশীয় চাকর সেজেছিল। ঐ পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ভারতবাসী। গদর পার্টির লোক। একজনের নাম হরি সিং। 'অ্যানি লার্সেন' নামে আর একটি জাহাজ অস্ত্র নিয়ে এসে পথে ম্যাভারিকে সব তুলে দেবে এমন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোন অজানা কারণে 'অ্যানি লার্সেন' ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারে নি। ম্যাভারিক একাই হনলুলু হয়ে জাভায় আসতে লাগল। জাভায় পৌঁছলে ডাচ সরকার তল্লাশ করে কিছু পায় নি। 'গদর কাগজপত্র' ইতিমধ্যে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের একটি সংবাদপত্র বলে, জাহাজে যে-সব অস্ত্র ছিল তাও নাকি কাগজপত্রের সঙ্গে সলিল সমাধি লাভ করে।

হেলফেরিক ব্যাটেভিয়ায় ম্যাভারিকের ভার নেন এবং জাহাজটি আমেরিকায় ফিরে চলল। শুধু মার্টিন, যিনি অগষ্ট মাসে আবার ব্যাটেভিয়ায় যান, তাঁকে ম্যাভারিকে চড়িয়ে আমেরিকা পাঠান হয়। হরি সিং-এর জায়গায় মার্টিনের স্থান করা হয়েছিল।

মার্চ মাসে জিতেন লাহিড়ী আমেরিকা থেকে এসে জাভার সঙ্গে সংযোগ রাখার খবর দেন। তখন তিনি দুটি সাংকেতিক বাণীও আমাদের জানিয়ে দেন—(১) হোসেন-বিন্-সুলেমান, (২) বি. চট্টোয় (B. Chattoi)। বার্লিন কর্তৃপক্ষের কাছে বীরেন চট্টোর খুব প্রতিপত্তি ছিল। এরই জোরে নরেন ভট্টাচার্য ওরফে মার্টিন জার্মান বাণিজ্যদূত ও হেলফেরিকের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে পারেন।

আত্মারামের প্রস্তাবে ছিল ৫০,০০০ রাইফেল, তার মতো কার্টিজ এবং একলক্ষ টাকা। এটি শ্যামের জার্মান দূতের নূতন প্রস্তাব। এ জিনিষগুলি রায়মঙ্গল নদীতে (বঙ্গোপসাগর থেকে সুন্দরবনের পথে) পৌঁছে দেওয়া হবে। ম্যাভারিক

জাহাজে যে-সব সরঞ্জাম আসার কথা, এগুলি তার থেকে স্বতন্ত্র। আমরা এ-দুটো ব্যবস্থাই বজায় রাখতে ব্যাটেভিয়ার হেলফেরিককে অনুরোধ জানাই। এত অস্ত্রশস্ত্র যদি পাওয়া যায় তাহলে একভাগ আমরা কচ্ছদেশের কারোয়ারের দক্ষিণে গোকর্ণী অঞ্চলে পাঠাবার ব্যবস্থা দিই। গোয়ায় আমাদের যে শাখা ছিল তার সভ্যরা ঐ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবেন।

এখানে আর একটা কথা প্রকাশ থাকা উচিত। দুটো জাহাজ ম্যাভারিক ও অ্যানি লার্সেন আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রধান অংশ আনছিল। যে যে অস্ত্রশস্ত্রের আসার কথা ছিল (ব্যাটেভিয়ায়), দুর্ভাগ্যক্রমে তা এসে পৌঁছায় নি। অ্যানি লার্সেন অস্ত্র এনে ম্যাভারিকে পৌঁছে দিতে পারে নি। অবশেষে ফিরে ওয়াশিংটনের হোকিয়ামে পৌঁছায়। আমেরিকার কর্তৃপক্ষ অস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করে। তখন ওয়াশিংটনের রাজদূত কাউন্ট বার্নসডর্ফ সেগুলি জার্মানীর সম্পত্তি বলে দাবি করেন। কিন্তু মার্কিন সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি।

এরপর 'হেনরি এস' নামে আর এক জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র ম্যানিলা থেকে সাংহাই পাঠান হয়। এই জাহাজে Wehde এবং Boehm নামে দু'জন ছিলেন। Wehde-এর ওপর ভার ছিল ব্যাংককে টাকা পৌঁছে দেওয়ার। বোয়েম-এর ওপর আদেশ ছিল ব্যাংককে সশস্ত্র সৈন্য গড়ে তোলার। শ্যাম-বর্মার সীমান্তে প্যাকো নামক স্থানে বেশ কিছু অস্ত্র লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য ছিল। বর্মা আক্রমণের সময় এইসব অস্ত্র কাজে ব্যবহার হতে পারবে এরূপ আশা করা গিয়েছিল। হেরম্ব গুপ্তের আদেশে বোয়েম কাজ করছিল। ম্যানিলার জার্মান কন্সাল বলে দিয়েছিলেন, ৫০০ রিভলভার ব্যাংককে নামিয়ে বাকী ৫,০০০ চট্টগ্রামে পৌঁছে দিতে। অবশ্য এগুলি মশার পিস্তল ছিল।

ম্যাভারিক অস্ত্র নিয়ে পৌঁছাতে না পারায় সাংহাইয়ের কন্সাল জেনারল বা বাণিজ্যদূত অপর উপায় অবলম্বন করেন। তিনি আর দুটি জাহাজে রায়মঙ্গলে ও বালেশ্বরে ২০,০০০ এবং ৮০,০০০ কার্টিজ সহ রাইফেল, ২,০০০ মশার পিস্তল, হাতবোমা ও দু-লক্ষ টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। মার্টিন জানিয়ে দেয় রায়মঙ্গল আর নিরাপদ নয়; তার স্থলে অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ায় পাঠান হোক।

এবার প্ল্যান এরূপ থাকে—সাংহাই থেকে সোজাসুজি একটি জাহাজ হাতিয়া যাবে। আর একটি জার্মান জাহাজ ডাচদের এক বন্দর থেকে বালেশ্বরে যাত্রা করবে। অপর একটি জাহাজ আন্দামান দখল করে রাজবন্দীদের মুক্ত করে দেবে। সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহী সিপাইদের মুক্ত করা হবে। তারপর ঐ জাহাজ রেঙ্গুনে হানা দেবে।

বাংলার বিপ্লবীদের দেবার জন্য—সন্দেহ এড়াতে—এক চীনার হাতে বহু টাকা দেওয়া হয় এবং পিনাঙের এক বাঙালীকে অথবা কলকাতার কোন এক নির্দিষ্ট ঠিকানায় (শ্রমজীবী সমবায়ে, অমর চ্যাটার্জিকে) সেটি পৌঁছে দিতে বলা হয়।

কিন্তু এই ব্যক্তি সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে। এই সময়ে মার্টিনের সাথী ফণী চক্রবর্তীও সাংহাইয়ে গ্রেপ্তার হয়। সাংহাইয়ে নিলুসেন প্রভৃতি ধরা পড়ে। রাসবিহারী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের যে চেষ্টা করেন তা নষ্ট হয় সিঙ্গাপুরে অবনী মুখার্জির গ্রেপ্তারে। তার নোটবুকে বহু লোকের নাম ছিল। রাসবিহারী অবনীর হাতে খবর পাঠিয়েছিলেন। শ্যামের প্যাকোর ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংহেরও নাম পাওয়া যায়। বেচারি গ্রেপ্তার হয় এবং বর্মার মন্দালয় জেলে তার ফাঁসী হয়।

বলা উচিত, স্থির ছিল অভ্যুত্থান কালে কি বাংলা, কি পাঞ্জাবে গ্রামগুলিতে স্বাধীন সরকার ঘোষিত হবে। স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করা হবে, রেল ও টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট করা হবে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আমরা জানতাম শহরের চেয়ে গ্রামে স্বাধীনতা বেশিদিন রাখা সম্ভব হবে।

একটা স্বাধীন দেশে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তার প্রেরণায় আফগানিস্তানে স্বাধীন-ভারত প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাষ্ট্রপতি, বরকৎউল্লা পররাষ্ট্র সচিব এবং ওবেদুল্লা স্বরাষ্ট্র সচিব হন। তুর্কি ও রুশের সঙ্গে মৈত্রী প্রস্তাব করা হয়। অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান দেওয়া হয় দেশীয় নৃপতিদের।

বর্মায় ক্ষেত্র প্রস্তুতির কথা কিছু বর্ণনা করা উচিত। এখানে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায় কাজ করছিল। গুজরাটী, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় হরদয়ালের 'গদর পত্রিকা' আসত। তুরস্কের নব্য তুর্কের নেতা আনোয়ার পাশার আবেদন প্রচার হত। নব্য তুর্কিদলের বিখ্যাত নেতা তেওফিক পাশা রেঙ্গুনে ১৯২৩ সালে আসেন। দল গড়ে যান। আহম্মদ মুল্লা দাউদকে তুর্কি বাণিজ্যদূতের পদে বসিয়ে দেন। সিঙ্গাপুরের এক গুজরাটী ব্যবসায়ী মুসলমান রেঙ্গুনস্থ পুত্রের সঙ্গে পত্রে বিদ্রোহের সমাচার দেওয়া-নেওয়া করতেন। গদর পার্টির দূতের চেষ্টায় যে যে সৈন্যদল বিদ্রোহ করতে রাজী হয় তাদের নাম—বেলুচি, ম্যালেয়া স্টেট্‌স্ গাইডস্ পঞ্চম পদাতিক বাহিনী (সিঙ্গাপুরস্থ)। সিঙ্গাপুরের শেষোক্ত দল এবং একদল ম্যালেয়া গাইডস্ সত্যই বিদ্রোহ করে।

গোপনে আমদানিকারী বিখ্যাত মাসিদি আফগান চুপে চুপে অস্ত্র আমদানির কাজে নিযুক্ত হয়। এর সঙ্গে অস্ত্র আনয়নে সংযুক্ত থাকায় ক্ষীরোদগোপাল গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হন।

গদর দলের হাসান খাঁন এবং সোহন পাঠক ব্যাঙ্কক থেকে রেঙ্গুনে এসে বাসা করেন এবং কাজ চালাতে থাকেন। বর্মার মিলিটারী পুলিশের রাজভক্তি ভাঙাবার চেষ্টা চলতে থাকে।

গদর দলের সোহনলাল পাঠক মেমিও-তে সৈন্যদের বিদ্রোহে নিযুক্ত করতে গিয়ে

ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসী হয়।

এরই পাঁচ দিন পরে সোহনলালের সঙ্গী শ্যামের নারায়ণ সিংও মেমিও-তে ধরা পড়ে। শ্যামের সীমান্ত থেকে বর্মা আক্রমণ কাজেই আর হয়ে উঠল না।

শিবদয়াল কাপুর আমেরিকা থেকে সাংহাইয়ের পর ব্যাঙ্ককে আসেন। শিখদের শ্যাম সীমান্ত হয়ে বর্মা আক্রমণের কাজে ইনিও খেটেছিলেন। তিনি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন বাংলার সঙ্গে। কুমুদ মুখার্জি'র কলকাতা আসার ব্যাপারেও এঁ'র সাহায্য ছিল।

এই তো ছিল বিপ্লবের সাজ-সরঞ্জাম। ওদিকে অগষ্ট মাসে যুদ্ধ বাধতেই ভারত থেকে দলে দলে সৈন্য বিদেশে চালান দেওয়া হতে লাগল। সমগ্র ভারত রক্ষার জন্য মাত্র বারো হাজার সৈন্য দেশে ছিল। এই সামান্য সৈন্য। তার মধ্যে অনেকে আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে জুটে যেত। সুতরাং ইংরেজকে সশস্ত্র আঘাত হানার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। বিপ্লবীরা এই সংবাদটা জানত। কিন্তু ভাগ্যদেবী তখনও প্রসন্ন নন। কাজেই সব প্রচেষ্টা পন্ড হয়ে গেল। ইংরেজ যখন আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানলো তখন তাড়াতাড়ি তারা বিলাত থেকে টেরিটোরিয়াল ফোর্স পাঠাতে লাগল।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তখনও সময় হয় নি। ১৯১৫-১৬ সালে যা হল না, ১৯৪৪ সালে তা আর এক বিশ্বযুদ্ধের আবছায়ায় হতে পেরেছিল। সেবারে জাপান ইংরেজের বন্ধু। এবার সে ইংরেজের শত্রু এবং বর্মা থেকে তাকে তাড়ায়। বর্মা দিয়ে নেতাজীর আজাদ-ফৌজ বাহিনী ভারতে কিছুক্ষণের জন্য পা রাখতে যে পেরেছিল তা সম্ভব হল জাপান সাহায্য করেছিল বলে। আর ১৯১৫ সালে জাপান সরকার আশ্রয়প্রার্থী হেরম্ব গুপ্ত ও রাসবিহারীকে দেশ থেকে বহিষ্করণের আদেশ দিয়েছিল।

রাসবিহারী ও হেরম্ব গুপ্তকে ব্ল্যাক ড্রাগন নামক শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষী গুপ্ত সমিতির নায়ক তোয়ামা আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখেন। একজন বিশিষ্ট জাপানী বলেন—"Such talents are international assets and should not be ruined like this"। হেরম্ব গোপনে আমেরিকা ফিরে যান। রাসবিহারী বসু থেকে যান ওখানেই।

এই সময় লালা লজপৎ রায় ও চীনের সান-ইয়েট-সেনও জাপানে ছিলেন। সান চেয়েছিলেন জাপান যেন ইংরেজের বিরুদ্ধে যায়—তাতে চীন ও ভারতের উপকার হবে। জাপানের সংবাদপত্রসমূহ গণমত এই দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে। ফলে ইংরেজবন্ধু প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা-র ওপর গুপ্ত সমিতির জাপানীরা বোমা নিক্ষেপ করে। ওকুমা আহত হন। তাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়। এর পর জেনারল

টেরুচি প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর আদেশে রাসবিহারীকে দেশান্তরী করার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। সান চেয়েছিলেন এশিয়ার সমন্বয়। লালা লজপতেরও এতে সহানুভূতি ছিল। তাই তিনি ইংরেজের বিষ নজরে পড়েন। এইজন্য অনেক দিন তাঁকে ইংরেজরা দেশে ফেরার অনুমতি দেয় নাই। আবার বলি, ১৯১৫ সালে জাপান ছিল ইংরেজের পক্ষে। আর ১৯৪২ সালে তারা প্রাচী থেকে ইংরেজকে তাড়িয়ে বর্মা অধিকার করে বসেছিল। এশিয়া থেকে শ্বেতাঙ্গকে তাড়াবার মনোভাব জাপান গড়ে তুলেছিল বড়ই জোরের সঙ্গে। এবার জাপানই ভারতকে সাহায্য করেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির হেরফের ভারতকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছে। ভারতের ভাগ্য ফিরেছে বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে হিটলার ও তোজোর আবির্ভাবের কারণে। অথচ এরা 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালং'।

প্রারম্ভিক কয়েকটি কথা

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস লেখার কথা আমাদের দিক থেকে উঠেছে অনেকদিন থেকে। কোন একজনের পক্ষে এ কাজ পুরোপুরি করা সম্ভব নয়। গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে সকলের সব কথা জানা অসম্ভব। কয়েকজনের সমবেত চেষ্টায় সে কার্য সম্পন্ন হতে পারে। তবে মালমসলা যদি দিয়ে যাই, পরবর্তীকালে কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক তা যথোপযুক্ত কাজে লাগাতে পারবেন। আমার তিনটি বিশিষ্ট বন্ধুর অনুরোধে তাই কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন স্বর্গীয় সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। চব্বিশ পরগণার মাহিনগরে তাঁর বাড়ি। দেশহিতব্রত, আত্মগোপনকারী, বিপ্লবী কাজে অনন্যমনা, সর্বাবস্থায় সমচিত্ত আমার পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সাতকড়ি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমাদের গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগতে পারে যত প্রকারের ম্যাপ বা নক্সা তার প্রায় সকলগুলিই তিনি সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিলেন। জেলে যতবার গেছেন তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। অসাধারণ গঠন-প্রতিভা দেখা গিয়েছিল তাঁর ভিতর। নিভে গেছে দীপ, কিন্তু আত্মদান তাঁর অসার্থক হয় নি।

১৯৩৭ সালে দেউলি বন্দীনিবাসে গেছে তাঁর নশ্বর দেহ। তাঁর অমর স্মৃতি চিরদিন আমাদের মনে জাগরূক থাকবে।

১৯২২-২৩ সালে সাতকড়ির অনুরোধে লেখার একটা সংক্ষিপ্ত কাঠামো তৈরি করেছিলাম। আজ সে কাঠামো আর কাজে লাগাতে পারা গেল না। লেখক ও লিখিতব্যের স্মারকের মধ্যে ইংরেজের জেলের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘনীয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার সোদরোপম শ্রীমান ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। (জেলে তার নাম ছিল 'বাঘা'। সরকারপক্ষীয় বড়কর্তারা নিজেদের অন্যায়ের কারণে স্বভাবতঃ মিষ্ট-স্বভাব ভূপেনের ব্যাঘ্রাচরণে স্তম্ভিত ও কম্পিত হয়ে উঠত।) ১৯২৩-২৪ সালে বাংলার বহু কর্মীকে ধৃত করে বিশেষ আইনে বিনা বিচারে দীর্ঘ আটক রাখা কালে বর্মা জেল থেকে সে ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় যে বিবৃতি গুপ্ত উপায়ে দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলালজীর নিকট পাঠাতে পেরেছিল, তাই পড়ে মহাত্মা গান্ধী নিঃসন্দেহ হয়ে যান যে, শুধু স্বরাজ্যদলকে পঙ্গু করার মতলবেই বৃটিশ সরকার ঐ গর্হিত নীতির অনুসরণ করে। ভূপেনের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়ান আমার পক্ষে দুষ্কর ছিল। তবু লেখার সময় আসে নি মনে করে লিখতে গড়িমসি করছিলাম।

আর একজন যে আমার হাতে কলম গুঁজে লিখিয়ে ছেড়েছে, সে হচ্ছে আমার অনুজের মতো শ্রীমান নারায়ণচন্দ্র লাহিড়ী। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে ছাত্রশক্তির

একজন সঞ্চালক রূপে কাজ করায় নারায়ণ আটবছর জেল-বাস করে। ঘানি-টানা কয়েদী থেকে বিশেষ পর্যায়ের কয়েদীরূপে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে বহুবিধ জটিল রোগে তার সুন্দর স্বাস্থ্য ভঙ্গ ক'রে সে রাঁচি আসে। এখানে আমাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাইরের রোগী-ডাক্তার সম্পর্ক ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত বিহারের জেলেও বজায় রাখতে আমরা পেরেছি। এরই জোরে নারায়ণের জিভ। তারই কলমে বইখানি আদ্যোপান্ত লেখার অনুরোধ মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছি। সেও এই লেখার এক অভূতপূর্ব আনন্দ।

লেখার ত্রুটি অনেক। নিজেদের কথা মন্ত্রের মতো গোপন রাখবার চেষ্টায় মেধা প্রায় রঘুনাথ শিরোমণিকে হার মানাবার যোগাড় করছিল। দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসে, জেল জীবনে, স্বাস্থ্যভঙ্গে ও জীবনের সায়াহ্ন এসে পড়ায় সে মেধা ম্লান হয়ে পড়েছে। স্মৃতিশক্তির আগের দিনের সে প্রাখর্য আর নেই। চর্চার অভাবে অনেক কথা ভুলে গেছি। জীবনে এত বৈপরীত্য বিরাজ করেছে যে, আগের সঙ্গে শেষের অনুভূতি-গুলিকে মিলিয়ে বলতে পারা দুরূহ হয়েছে। যখন বলবার অনেক কিছু ছিল তখন বলার দিন পাই নি। যখন বলার দিন পেলাম তখন বলার অনেক কিছু হারিয়েছি। লিখতে বসে দেখি পূর্বের শক্তিতেও ভাঁটা ধরেছে। কলম আর তেমন তরতর করে এগোয় না।

এই একই কারণে বক্তব্যগুলি কোথাও কোথাও ধারাবাহিক পারম্পর্য রক্ষা করে প্রকাশ লাভ করল না। তবে উপাদান রেখে যাচ্ছি—এই ভরসায় লিখতে সাহসী হলাম।

কয়েকটি ব্যক্তি ও বিষয় যা স্মৃতির ভাণ্ডার ঠেলে উপরের স্তরে এসে চিন্তা-স্রোতকে তরঙ্গায়িত করছে সেগুলিকে এইখানে লিপিবদ্ধ করে রাখছি। এখানে পূর্বাপর সঙ্গতির কোন নিয়মপালন হয়ত হচ্ছে না। তবু "যে আসছে তাকে আসতে দাও" এই প্রবাদ বাক্যকে অনুসরণ করছি।

আমার রাজনৈতিক জীবনে কিছু বড়রকমের আগন্তুক ঘটনার আভাস আমি কেমন পূর্বাহ্নেই ধরতে পারতাম। শুনেছি ভবিষ্যতের ছায়া কারও কারও ভিতরের দর্পণে পড়ে। ভবিষ্যদ্বাণীর মতো আমার কথাগুলি কয়েকবার খেটে গেছে। এই দূরপাল্লার দর্শন নিয়ে আমি কর্মতালিকার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে ভালোবাসতাম। ফলে হত সাময়িক অসুবিধা বা অন্য কিছু বাধা।

আমি যখন যে নব-নীতি অনুসরণ করতে বলতাম সে সময় আমার সমর্থক জুটত কম। যখন আমার কথা ঠিক প্রমাণ হত ততক্ষণে আমাদের প্রস্তুতির আবশ্যকতা ও সুসময় চলে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মন আমাকে ঠিক ঠিক কথাই বলেছিল কিন্তু সে ইঙ্গিতে কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াত। গোড়ায় আমাদের অভিজ্ঞতা নেই বলে একটা সুযোগ হয়ত ধরা গেল না। আবার অভিজ্ঞতা যখন হল তখন তার প্রয়োগের সুবিধা রইল না। এইরূপ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলে এসেছি। কিন্তু জাতির ভাগ্যবিধাতা একজন আছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জেদই বজায় রইল। তিনি বুঝিয়ে ছাড়লেন বিচিত্র আমাদের চলার রাস্তা। ভুল-ভ্রান্তি, ভাগ্যবিপর্যয় প্রায় পুরো সর্বনাশের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের অগ্রগতির পথ পড়েছে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ জয় অবশ্যম্ভাবী।

এরকমভাবে জীবনস্রোত চলে এলেও 'বহুভাগ্য মানি' এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। সেই কথাই বলছি।

যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কথা। যুগান্তর নাম কি করে এল? কবে হতে এল? এই এক মহা সমস্যা। আবার, ১৯৩৮ সালে খবরের কাগজে ইস্তাহার দিয়ে দল তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ যুগান্তর নামটা কালসমুদ্রে বিলীন করা হয়। কোন কোন ভাই সেজন্য আমার কৈফিয়ত তলব করেছেন। তাঁদের সেরকম অধিকার আছে স্বীকার করি। আমাদের ছিল ভালোবাসার সংসার। কর্তৃত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি ছিল না। কর্তৃত্বের জন্য লালায়িত কাউকে বিশেষ দেখি নি। সেটা ছিল সর্বত্যাগের যুগ। যোগ্যতাকে বরাবর আসন ছেড়ে দেওয়া হত।

১৯১০ সালে সরকারী দপ্তরে সর্বপ্রথম 'যুগান্তর গ্রুপ' নামটা পাওয়া যায়। হাওড়া-ষড়যন্ত্র মামলায় এই নাম প্রকট হয়। এই মোকদ্দমায় সরকারী মতলবে আসামীদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বা দলে ভাগ করা হয়। যথা—'কৃষ্ণনগর গ্রুপ', 'হলুদবাড়ি গ্রুপ', 'রাজসাহী গ্রুপ', 'শিবপুর গ্রুপ', 'খিদিরপুর গ্রুপ', 'মজিলপুর গ্রুপ', 'যুগান্তর গ্রুপ', 'ছাত্রভাণ্ডার গ্রুপ'।

কর্তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেমন করে হোক কিছু না কিছু লোককে জেল খাটানো—অনেকে যদি ফস্কায়, কেউ না কেউ যেন আটকে পড়ে। সত্যই এরকম 'গ্রুপ'-ভাবে দল ছিল না। বলেছি ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' কাগজ প্রকাশিত হয়। বারীনবাবু, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি তা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালে তাঁদের কাগজ থেকে বিদায় নিতে হয়। তারপর যাঁরা 'যুগান্তর' কাগজ নিয়ে থাকতেন তাঁদের সংহতিটা 'যুগান্তর গ্রুপ' নামে অভিহিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। সত্যি বোমা-পিস্তলের ব্যাপার নিয়ে ডুবে থাকার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার জন্য গোড়ায় 'যুগান্তরে'র স্থাপয়িতা ও পরিচালকরা ১৯০৮ সালে যে বড় মামলায় পড়লেন তার নাম ছিল 'আলিপুর বোমার মামলা'। সে সময় 'যুগান্তর গ্রুপ' নামে কাউকে আদালতের কাঠগড়ায় দেখা যায় না। কিন্তু ১৯১০ সালে হাওড়া-ষড়যন্ত্র মামলার সময়—আসামীদের মধ্যে ছিলেন তারানাথ রায়চৌধুরী, কেশব দে—এঁরা সরাসরি যুগান্তর কাগজের শেষদিককার

লোক। ইতিপূর্বে এক সময় তারানাথ যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন। আসলে যুগান্তর দলের স্থাপয়িতা অরবিন্দ-বারীন্দ্র প্রমুখ—অবশ্য এই নামে দল তাঁরাও করেন নি। ইতিহাসের গতিতে ১৯১৫ সালের পর এই নাম এসে যায়।

তবেই দেখা যাচ্ছে 'যুগান্তর'কে দলীয় প্রচারপত্র করার জন্য সরকার তাদের হিসাব ঠিক রাখতে একশ্রেণীর দেশকর্মীকে 'যুগান্তর দল' আখ্যা দেয়। এই বিবেচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের সমবেত সংঘশক্তিকে ঐ আখ্যা তারা দিয়েছিল, ঢাকার 'অনুশীলন' থেকে পৃথক করে দেখার প্রয়োজন থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে আমরা আমাদের প্রচারপত্রের নাম 'যুগান্তর' রেখেছিলাম। হিন্দু নামের মতো যুগান্তর দল নামটা অপরের দেওয়া। কর্মীরা নিজেরা ওরকম নামকরণটা গোড়া থেকে করেন নি। কিন্তু সংঘের গৌরবময় ইতিহাসে পরবর্তীকালে নামের ওপর সংঘের সভ্যদের মায়া পড়ে যায়। তা তো স্বাভাবিক। যথার্থ বিচার করতে গেলে বলতে হবে 'যুগান্তর' সদাই একটা আন্দোলন ছিল জড়পদার্থ নয়। দল বিলীন হয়ে যায় যাক, দুঃখ নাই, সার্থক হোক বিপ্লব—এই ছিল দলীয় লোকদের মনোভাব।

বর্তমানে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস লেখার সরকারী সংসদের সম্পাদক এবং যুগান্তর দলের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আমায় ১৯৫৩ সালে জানিয়েছেন যে, ১৯১০ সালে পুলিন দাস মহাশয় নির্বাসন থেকে ফিরে এসে ময়মনসিংহের যুক্তদল থেকে নিজের গ্রুপকে মুক্ত করে নেন। তখন থেকে পুলিনবাবুর দল 'অনুশীলন' নামে চলতে থাকে। হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীর দল নিজেদের 'যুগান্তর' আখ্যা দেন। এটি কিন্তু শুধু ময়মনসিংহের ঘটনা ও বৃত্তান্ত।

কথায় বলে নামীর চেয়ে নাম বড়। কিন্তু এ দলে কিছু কিছু লোক দেখা গেছে যাঁরা নামের চেয়ে ঢের বড় ছিলেন। গোড়া থেকেই এই দলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট বেশী। এই দলের একটি বিশিষ্টতা, এঁরা শিক্ষাবিরাগী তো মোটেই নন, বরং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বরাবর।

শারদীয়া সংখ্যা 'স্বাধীনতা' (১৩৫৪ সাল, ইং ১৯৪৭, পৃ. ৫১-৪২) একটি চিঠি প্রকাশ করে। সে চিঠিখানি ১৯৪৫ সালে বাংলার গভর্নর কেসি (Cassey) গোপনীয়ভাবে তদানীন্তন বড়লাট ওয়েভেলকে লিখেছিলেন। চিঠিখানির বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ এখানে দেওয়া হল:

"বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও আরও জনকয়েক মিলিত হয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন—গুপ্ত-সমিতি গঠন ক'রে হিন্দু যুবকদের আধুনিক মারণাস্ত্র তৈরী ও ব্যবহার শেখাতে থাকেন। তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন—বৃটিশ এদেশ শাসন করছে ছল আর বলের সাহায্যে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই যুগান্তর

দল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সংগঠনশীল সমিতিতে পরিণত হয়। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে এরূপ বাছা বাছা তীক্ষ্ণধী যুবক দেখা যায় না। এই দলের মধ্যেই ছিলেন বৃটেনের সত্যকার দুর্জয় শত্রু।"

আগেই বলেছি হাওড়া-ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার এতগুলি গ্রুপের বা দলের নাম করেছিল, কিছু না কিছু লোককে যেন শাস্তি দেওয়াতে পারে এই মতলবে। অর্থাৎ কারও না কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হবে, এই ভেবে। সত্যকথা বলতে গেলে এর মধ্যে অধিকাংশ লোক ছিলেন কলকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য এবং 'যুগান্তর' ছিল সকলের ঈপ্সিত প্রচারপত্র।

ঐতিহাসিক তথ্য বলে, সর্বাগ্রে একটি মাত্র বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। তার নাম 'অনুশীলন সমিতি'। সকলে তার সভ্য ছিলেন বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তার আভ্যন্তরীণ কর্তৃমণ্ডলীতে ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (বা পি. মিত্র বা মিত্তির সাহেব) ও শ্রীঅরবিন্দ।

১৯০৬ সালে সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদকল্পে উপায় নিয়ে মতান্তর হয়। তখন সারা বাংলায় একটিমাত্র অনুশীলন সমিতি ছিল। তার প্রধান কেন্দ্র কলকাতায়। মিত্তির সাহেব (ব্যারিস্টার পি. মিত্র) ছিলেন সঞ্চালক বা ডিরেক্টর। অরবিন্দবাবু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সহকারী সভাপতি, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পর পুলিনবাবু (পুলিন দাস) পূর্ববঙ্গে এই সমিতির সংগঠন ও সংকল্প এমনভাবে সফল করে তোলেন যে তার তুলনা হয় না।

এখনই "রণং দেহি" নিয়ে বারীনবাবুদের সঙ্গে মিত্তির সাহেব একমত হতে পারেন নি। তিনি আরও ভালো করে সংগঠন গড়ে তোলা ও সুদূর-বিস্তারী করার পক্ষে ছিলেন। বারীনবাবু আলাদা করে নিজের একটি গ্রুপ বা দল গড়ে তোলেন।

১৯০৭ সাল থেকে 'যুগান্তর গ্রুপ' বা যুগান্তরের ঝাঁক আলাদা করে নজরে আসে। ঝাঁক কথাটি বললাম এইজন্য যে, কিছুদিন বাদে ১৯০৭ সালের অগস্টে বন্দেমাতরম্ কাগজে বিবৃতি দিয়ে বারীনবাবুরা মুরারিপুকুর বাগানে মারণাস্ত্র তৈরির জন্য আলাদা হয়ে রইলেন। তাঁরা এই সময় যুগান্তর কাগজ চালানর জন্য বিশেষ কিছু করতেন না। কবিরাজ অনাথ রায়, অতীন বসু, নরেন শেঠ প্রভৃতির সাহায্যে এবং কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিখিল রায়মৌলিক, কার্তিক দত্ত প্রভৃতির কর্মশক্তিতে কাগজ চলতে লাগল। এঁদের তখন কোন কোন লোকে বলত 'যুগান্তরওয়ালা বা যুগান্তরের লোক। অবশ্য এতে দল না বুঝিয়ে কি কাজে তাঁরা লিপ্ত তাই বোঝাত।

১৯১০ সালে বাংলার দেশসেবীদের ইতিহাসে কয়েকটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ বছরে 'যুগান্তর গ্রুপ' সরকারী নামকরণের মাঝে পাকাপোক্তভাবে দেখা যায়। এদের অনুশীলন সমিতি থেকে—সারা বাংলার একমাত্র অনুশীলন সমিতি থেকে—

বিচ্ছিন্ন করে দেখান হয়। ঐ বছরে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিনবাবুরা গ্রেপ্তার হন। বজ্রের মতো আঘাত পেয়ে জনপ্রিয় সঞ্চালক মিত্তির সাহেব মাথার শির ছিঁড়ে (সন্ন্যাস রোগে) পরমধামে গমন করেন। তিনি চলে গেলেন। পুলিনবাবু কারাকক্ষে। সমিতি তো ইতিপূর্বে ১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে বে-আইনী ঘোষিত হয়ে প্রকাশ্য জীবন থেকে উঠে গিয়েছিল। মিত্তির সাহেবের অন্তর্ধানে দুই বঙ্গের যোগসূত্র নষ্ট হয়ে গেল। এর কিছু পর 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' নামটা বেজে উঠল। বিশেষ করে ১৯১১ সাল থেকে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা কোন নাম না নিয়ে নানা উপায়ে নিজেদের কাজ বজায় রাখছিল।*

জেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুলিনবাবু, আশুতোষ দাশগুপ্ত ও ভূপেশ নাগের সহযোগিতায় যে গঠনশক্তি, নেতৃত্ব এবং যুদ্ধ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করলেও যথেষ্ট হয় না।

১৯১১ সাল থেকে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের অবসাদ ও অন্ধকারের দুর্দিনে আলো জেলে রেখেছিলেন বলে আমি নূতন-গড়া অনুশীলনের প্রশংসাবাদ আরও বেশী করি। ১৮-২৪ বছর বয়স্ক কয়েকজন যুবক হলেন এর সারথি। তাঁরা বিদ্বান ছিলেন না, অর্থসম্পন্ন ছিলেন না, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন নি, জনসমাজে তাঁরা অপরিচিত। কিন্তু কি প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁদের! সশস্ত্র বিপ্লব দিয়ে দেশ স্বাধীন করার নেশায় মশগুল। কি নির্ভীকচেতা ছিলেন তাঁরা! নিজেরা তো ঝাঁপিয়ে পড়লেনই, তাছাড়া আস্তে আস্তে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মনের সেই আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। এই জন্যে অনুশীলনের নব-ঋত্বিক্‌ নরেন সেনকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। নবহোতা ও উদ্গাতা 'মহারাজ' (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী), রবি সেন ও অমৃত হাজরা প্রভৃতিকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাই। নূতন সাধনার নবীন তাপসদের মধ্যে এঁদের আসন রয়ে গেছে অটল। আবারও বলি, নরেন সেনের মাথা ও 'মহারাজের' উদার হৃদয় একত্র না হলে আমরা অনুশীলনকে এমন করে পেতাম না। বাংলার লাট কেসি সাহেবের সেই চিঠিখানা থেকে অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করছি—

"এ ছাড়া আরও দল আছে, তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিও অনুরূপ। এদের মধ্যে অনুশীলন সমিতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রধান ঘাঁটি ঢাকায় এবং এই সমিতি প্রদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠন। এঁদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। এঁদের সভ্যও অনেক, বিভিন্ন প্রদেশে এঁদের শাখা-প্রশাখা আছে। এই দলের বহু সভ্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া বিশেষ

* তখন ঢাকা ছিল এই নব অনুশীলনের কেন্দ্র এবং 'অনুশীলন সমিতি' বলতে ক্রমে ঢাকার নেতৃত্বে চালিত 'অনুশীলন সমিতি'ই বোঝাতে থাকে, কলকাতার আদি সমিতি ও তার সভ্যদের কথা লোকে প্রায় ভুলেই যায়। (সম্পাদক)

আইনের বলে এঁদের অনেককে আটক করে রাখা হয়েছিল।”

নব অনুশীলন আলাদাভাবে পরিচিত হয় তাঁদের নতুন প্রচারপত্র দিয়ে। ‘যুগান্তর’ নাম না রেখে তাঁরা কাগজের নাম রাখলেন ‘স্বাধীন ভারত’।

১৯১৩ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি মেডিকেল্ ছাত্রদের মেসে। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মেডিকেল ছাত্র ছিলেন। তাঁর একটি ‘ছেলে-ধরা’র আড্ডা ছিল। উদ্দেশ্য মহৎ। ভবিষ্যৎ দেশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো। সুরেশবাবু সুভাষচন্দ্রকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নেতাজী তখন সবে কটক থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন।

১৯১৬ সালে, বোধ হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি গা-ঢাকা অবস্থায় কলকাতায় ছিলাম। সে সময় ইংরেজ সরকার আমাদের নামে চতুর্দিকে হুলিয়া লটকে দিয়েছেন এবং আমাদের ধরে দিলে পুরস্কার দেবেন জানিয়েছেন।

ঐ রকম সময়ে একদিন শুনলাম ছাত্রদের প্রতি অসভ্য ব্যবহারের জন্য অনঙ্গ দাম সহ কয়েকটি ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর ওটেনকে উত্তম-মধ্যম লাগিয়ে দিয়েছেন। নেতাজী এই দলে ছিলেন।* ইচ্ছা হল নিজে গিয়ে এঁদের অভিনন্দিত করে আসি। কিন্তু অবস্থায় পড়ে কোন একটি লোক মারফত অভিনন্দন পাঠাই। তারপর আমি কলকাতা থেকে চলে যাই।

পরে নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অসহযোগ আন্দোলনের সময়। আমার তখন মনে হত এই যুবক, দেশবন্ধুর পরে, একদিন বাংলার প্রকাশ্য আন্দোলনের নেতা হবেন। এঁর ভিতর অনেক গুণ ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হয়েও সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের মতো ইনি চলতেন। ঠিক এই গুণটিতে জাতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ১৯৪৩-৪৪ সালে তিনি সকলের ‘মনোহরণ’ করতে পেরেছিলেন।

তাঁর সাহস, এগিয়ে চলার রোখ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল অসাধারণ রকমের।

১৯২৩ সালে তিনি দেশবন্ধুর প্রতিনিধিরূপে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে এলে আমি তাঁকে বিপ্লবী ও অ-বিপ্লবী দুটো পথের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলেন, ‘দেশবন্ধুকে সাহায্য করুন। তারপর আমি আপনাদের পথে আসব।’ দেশবন্ধুকে আমরা সাহায্য করেছিলাম। ভূপতি মজুমদারকে দেশবন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক করেন। স্বরাজ্য পার্টি জয়ী হয় আমাদের সহায়তায়।

* যতদূর জানা যায় সুভাষচন্দ্র নিজে এ কাজে লিপ্ত ছিলেন না। তবে সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটা তিনি ঘটতে দেখেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আক্রমণকারী ছাত্রদের নাম যখন জানতে চান, তখন সুভাষচন্দ্র কারও নাম বলতে বা কোনো কথা বলতে অস্বীকৃত হন। এ জন্যই তিনি এক বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত হন। (সম্পাদক)

দেশবন্ধুর ছিল অসামান্য প্রতিভা। তিনি বাংলা কংগ্রেসে স্থান করে নিয়ে সারা ভারতে জয়ী হলেন তিন মাসের মধ্যে।

এদিকে বহুবাজার স্ট্রীটে চেরী প্রেসে আমাদের আড্ডায় সুভাষবাবুর যাতায়াত বাড়তে লাগল। বিপ্লব যে চতুরঙ্গ—ছাত্র, কৃষক, মজুর ও সৈন্য নিয়ে, এই তত্ত্বটি তাঁর এখানেই অধিগম্য হয়। ভূপতি মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চেরী প্রেসের আলোচনায় বেশী অংশ গ্রহণ করতেন। উপেনবাবু ছিলেন তখন আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক। তিনি যা লিখতেন তা পড়ে অনেকে বলতেন কমিউনিজম্ প্রচার হচ্ছে। উপেনবাবু কংগ্রেসকে সংস্কারপন্থী প্রতিষ্ঠান বলে কটাক্ষ করতেন। এ ছাড়া সুভাষবাবু সুরেন ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, জীবন চট্টো'র সঙ্গেও খুব আলোচনা চালাতেন। ঢাকার প্রতিষ্ঠান (নব) অনুশীলনের প্রধান কর্মীদের সঙ্গেও তাঁর বেশ পরিচয় ঘটেছিল। 'যুগান্তর' দলের ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন সুভাষবাবুর সহপাঠী ছিলেন। এই সুবাদে দুজনের মধ্যে আলোচনা চলত।

তিনি অহিংসাকে ধর্মমতের মতো গ্রহণ না করে কাজ-চালানো নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন—Not creed but policy.

কোন কোন প্রদেশে কথা ওঠে যে নেতাজী দুই-দুইবার রাষ্ট্রপতি হন—কংগ্রেসের মূলনীতি অহিংসা। তবে তিনি বিদেশে গিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের কল্পনা করেন কি করে? তাহলে কোন্‌টি তাঁর আসল রূপ?

এরূপ বিচারে ভুল সিদ্ধান্ত আসে। সুভাষচন্দ্র দেশের বিপ্লববাহী আত্মশক্তির ফল। পথের দাবি কে করতে পারে? প্রকৃত স্বাধীনতা পথের বাচবিচার রাখে না। শান্ত-অশান্ত গতিভঙ্গিমায় তার পূর্ণ প্রকাশ। ভারতের দুলাল সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী বাংলার মানসপুত্র। তিনি বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। বিপ্লবীকুলে তিনি মানুষ। দেশবন্ধুর উপযুক্ত শিষ্য ও উত্তরাধিকারী।

জয়তু সুভাষচন্দ্র। নেতাজী জিন্দাবাদ।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যেদিন ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আসাম-বেঙ্গল রেলে ধর্মঘট করিয়ে দেন। এর পূর্বে ঠিক এতবড় ধর্মঘট কম হয়েছে। শ্রমিকশক্তি বিপ্লববাহিনীর একটি প্রধান অঙ্গ। তার জাগরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই কারণে দেশপ্রিয়কে সেদিন পরম আত্মীয় মনে হয়েছিল। তিনিও দেশবন্ধুর অপর যোগ্য শিষ্য ও সহচর। তাঁর মাথা বেশ ঠাণ্ডা, বিচার বিচক্ষণতাপূর্ণ। তিনি ছিলেন ত্যাগী, সাহসী, ছাত্র ও যুবকগণের প্রিয়। তিনিও ভালোবাসার মতো লোক ছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্য তিনি ও সুভাষ একযোগে কাজ করতে পারেন নি। দেশবন্ধুর পর তিনি স্বরাজ্য

পার্টির বাংলাদেশের নেতা হন। পাঁচবার কলকাতা করপোরেশনের মেয়র হন। এ সম্মান আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। বাংলার স্বরাজ্যদল, বিধান পরিষদের দল ও করপোরেশন দলের নেতা দেশবন্ধুর অবিসম্বাদী উত্তরাধিকারী হিসাবে একা তিনিই হতে পেরেছিলেন। দেশবন্ধুর পর এতবড় গৌরব আর কেউ লাভ করেন নি।

রাঁচিতে ১৯৩২ সালে তিনি রাজবন্দী হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে কাউকে মিশতে দেওয়া হত না। কারও সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেওয়া হত না। তিনি ডাক্তার-রূপে আমায় পেতে চান। কিন্তু সরকার সর্ত দিল যে, আমি যখন দেশপ্রিয়কে দেখতে যাব তখন একজন উচ্চশ্রেণীর পুলিশ কর্মচারী সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অথচ শ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্জেন যখন ইচ্ছা যেতে পারেন। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা আমায় পরিস্থিতির কথা জানালে আমি উত্তর দিই যে, দেশপ্রিয় যেন এই সর্ত মেনে না নেন—আমিও এই সর্তে ডাক্তারি করতে অস্বীকার করব। তবে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকে একথাও জানিয়ে দিই, যখন তাঁরা আমার উপস্থিতি অপরিহার্য বিবেচনা করবেন তখন আমি সর্তের তর্ক না তুলে দেশপ্রিয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হবো।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! কি গভীর পরিতাপের বিষয়! তিনি হঠাৎ এমনই হৃদ্‌শূলে (Angina Pectoris) আক্রান্ত হলেন যে আমায় খবর দেবার সময়ও হল না। অল্পক্ষণেই সব শেষ। সর্বজনমান্য ভারতের অভিনব নেতা ১৭ই জুন, ৩৩ সালে সকলকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে বন্দী অবস্থাতেই চলে গেলেন।

প্রাতঃকাল হতে-না-হতে রাঁচির সারা শহরে গভীর দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বাসস্থলে আমরা ছুটে চললাম। দক্ষিণ কলকাতার সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রাঁচিতে দেশান্তরী হয়ে বাস করছিলেন। তাঁকেও সঙ্গে নিলাম। সাধারণের পক্ষে জীবন্তকে সম্মান দেখাতে দেয় নি সরকার; মৃতকে সম্মান প্রদর্শনে বাধা তুলে নিল। কলকাতা থেকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের তার পেয়ে আমার দুটি বন্ধু ডাক্তার শিশিরকুমার বসু ও ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে শবকে তাজা রাখার জন্য যথোপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগাদি করলাম। ব্রাহ্ম ও হিন্দু মতে শেষ কর্তব্যগুলি করে সসম্মানে বিরাট শোভাযাত্রা সহ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করে স্টেশনে শবদেহ পৌঁছে দিলাম। শ্রীমতী সেনগুপ্তার শেষ অনুরোধ, যেন তাঁর অনুপস্থিত সন্তানদের স্বর্গত পিতৃদেবের নশ্বর দেহ দেখার সুযোগের আগে কোনরূপ বিকৃতি না দেখা দেয়। এই অনুরোধ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। রাঁচির আবালবৃদ্ধবনিতা আকুল অন্তরে দেখতে ছুটেছিল মহানিদ্রামগ্ন মহাপ্রাণকে। তাদের চিরপ্রিয় দেশপ্রিয়কে উপযুক্ত সম্মান তারা দেখাতে পেরেছিল। রাঁচিতে তাঁর আসার দিন মুরী জংশন থেকে সাদরে আমার গাড়িতে তাঁকে আনিয়েছিলাম। যাবার দিন তাঁকে এমন ভাবে বিদায় দিতে হবে কে ভাবতে পেরেছিল!

তাঁর শেষ স্পর্শে রাঁচি দেশসেবীদের কাছে পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।

এবার একটা কৈফিয়ত। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় মহানামীদের চেয়ে কেউ কি বড়? আমি বিনা দ্বিধায় অম্লানভাবে বলব—হ্যাঁ, অনামী। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কেন? কেমন করে? অকপটে উত্তর দেব—তাদের মহত্ত্ব এত উচ্চ ভূমিতে তারা নিয়ে যেতে পেরেছে যে, হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবার জো নেই। শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, জনসেবা, দেশসেবা, অধ্যবসায়, স্বার্থবলি, ক্লেশসহন, বিপদবরণ, দুশ্চর তপস্যা—কোথাও তারা এতটুকু খুঁত রেখে যায় নি। নাম-যশের কাঙালপনা তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি। রাষ্ট্রপিতা বহু বড় লোককে বলা হয়েছে। বলা যে বেঠিক তাও হয়ত নয়। একথা মেনে নিলেও বলতে হবে অনামীরা রাষ্ট্রের পিতামহ। তারাই রাষ্ট্রপিতাদের এনেছে ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদের মুক্তি-যজ্ঞের ঋত্বিক্, হোতা, উদ্গাতা—বাছা বাছা বিশেষণে বিশোভিত করা হয়ে গেছে। তাদের তাই রইল হাড়ের মালা, বিভূতিলেপ ও বাঘাম্বর। তাদের হাতে ডম্বরু—যার গুরুগুরু নিনাদ শ্মশানভূমিতে জীবনের নিশ্বাস হয়ে রয়েছে। তাই তো দেখা গেছে সময় এলে বার বার মরা হাড়ে প্রাণের স্পন্দন—বিপ্লবী আত্মার নর্তন। তাদের কথা কইতে, তাদের গাথা শুনতে, তাদের গান গাইতে ভালো লাগে। আমার অন্তরের অন্তস্তলে আছে যে সুষমায়িত অর্ঘ্য তাই তাদের স্মরণার্থে নিবেদন করি।

আগেই বলেছি, যুগান্তর উঠিয়ে দেওয়ার কৈফিয়ত তলব করেছেন আমার কয়েকটি ভাই। যে একটা সাময়িক যন্ত্র বা কাঠামো নিয়ে যুগান্তরী আত্মা বা বিপ্লবশক্তি দাঁড়িয়ে ছিল, কালের প্রভাবে জীর্ণ সে কাঠামো আজ আর নেই। মাত্র সেইটুকু বদলানো হয়েছে। যুগান্তর তো শুধু খোলস নয়। যুগান্তর যে একটা আত্মিক শক্তি। যুগ পালটে দেবার ঐচ্ছিক সামর্থ্য কি কোনদিন মরে বা নষ্ট হয়? তাকে উঠিয়ে দেবার কল্পনা কোন্ পাগলে করবে? অগ্নিযুগের যুগান্তর কাগজ পড়ে যে বিপ্লবী ভাবধারা দেশে শত শত জন পেয়েছিল, প্রকৃত যুগান্তর না আসা পর্যন্ত সে চিৎশক্তি কোথায় অদৃশ্য হবে? যা স্বপ্নের মধ্যে ছিল তা আজ বহুব্যাপক হয়ে পড়েছে। যুগান্তরী কাঠামো বদলে বদলে যায়, কিন্তু তার প্রেরণাশক্তি ঠিক বজায় থাকে। যুগান্তর চেয়েছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মুক্তি। ১৯০৬ সালে মার্চ মাসে যুগান্তরের প্রথম আবির্ভাব। তার দ্বিতীয় সংখ্যায় সম-সমাজবাদের একটি ইস্তাহার ও কর্মতালিকা প্রকাশিত হয়। এর নাম বিপ্লব। যেদিন তার সে ব্রত সাঙ্গ হবে সেদিন না নিরঞ্জনের অবকাশ?

বিপ্লবের জয় হোক। যুগান্তর সাফল্যমণ্ডিত হয়ে আসুক। ধন্য হোক তার প্রথম দিনের আকৃতি।

বিপ্লবের ক্রমবিকাশ যে স্বীকার করে না, সে নিজের ওপর অবিচার করে, নিজের

বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করে। প্রস্তুতির প্রয়োজনকে যে মানে না—সে অজ্ঞ, অনির্ভরযোগ্য।

আবেদন-নিবেদনের দিনগুলি এনেছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এনেছে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান। সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টা এনেছে মহাত্মাজীকে তাঁর সত্যাগ্রহের আবেদন সহ। ১৯১৯ সালের সত্যাগ্রহ এনেছে ১৯২১ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। সে আবার এনেছে আইন অমান্য আন্দোলন। তাই এনেছে ১৯৪২ সালের সারা ভারতব্যাপী অতুলনীয় 'ভারত ছাড়'র গণ-আন্দোলন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এরূপ একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। গ্রামের লোকে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং হিংসা-অহিংসার চুলচেরা তর্কের বালাই রাখে নি।

আবার শুধু পুরুষের অবদান নিয়ে এসেছে নর ও নারীর মিলিত অবদান—সহিংস ও অহিংস—দুই পথেই।

১৯১৪-১৮ সালের বিপ্লব-প্রচেষ্টা এনেছিল—সন্দেহবশে, কিছুদিনের জন্য দুজন আটক বন্দী—সিন্ধুবালা।* প্রথম নারী রাজবন্দী ননীবালা দেবী ও প্রথম দণ্ডপ্রাপ্তা নারী কয়েদী দুকড়িবালা দেবী। তাদের শুভ আরম্ভ এনেছে ১৯৩০-৩৪ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় প্রীতি ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, পারুল মুখার্জী, লীলা রায়, কমলা দাশগুপ্ত, প্রতিভা ভদ্র এবং আরও বহু মহিলা বীরাঙ্গনা—কারও নাম হয়তো বলবার সময় মনে পড়ল না, কারও নাম হয়তো জানিও না। এঁরাই সম্ভব করেছেন নেতাজীর ঝাঁসীর-রানী বাহিনী।

বোমার কথা। বোমার কি বিমোহিনী শক্তি! রুশদেশের নিহিলিস্টদের কর্মতৎপরতার অনুকরণে এদেশে বোমা আমদানি হয়। আইনের নিগড়ে আবদ্ধ পরাধীন জাতির পক্ষে অস্ত্র সংগ্রহ করা বড় শক্ত ছিল।

এদেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু বোমা-নিক্ষেপে বোমার শিকার প্রায়ই অক্ষত থেকে গেছে। শিকারী স্বয়ং বা অপর নিরপরাধী লোক শাস্তি ভোগ করেছে।

এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমাদের বিপ্লবী অভিযানে এটিকে বর্জন করা হবে। এই সিদ্ধান্তে আমরা দৃঢ়ভাবে স্থির ছিলাম। কিন্তু বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিরা বোমা পাওয়া যাবে না জেনে বিমর্ষ হন।

* 'সিন্ধুবালা'—বিপ্লবীদের কারও কাগজপত্রে এই নামটি পেয়ে পুলিশ দুই সিন্ধুবালাকে (দুজন পরস্পরের আত্মীয়াও) গ্রেফতার করে গ্রাম থেকে হাঁটিয়ে দূরে শহরে চালান দেয়। পরে অবশ্য তদের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তৎপূর্বে দেশে বিক্ষোভ যথেষ্ট দেখা দেয়। তৎকালীন বঙ্গীয় কাউনসিলে অখিলচন্দ্র দত্ত ও মোঃ ফজলুল হক্ সাহেব এই গ্রেফতারের নিন্দায় যে ক্ষুব্ধ বক্তৃতা করেন, তখনকার দিনে তা উল্লেখযোগ্য সাহসিক কাজ। (সম্পাদক)

কারণটা জানিয়ে দেওয়ায় তাঁদের মন তখনই ভরল না। তাঁরা প্রতিবাদে জানালেন—বাংলার বোমার নামে এত আকর্ষণী শক্তি যে, বাংলায় আমরা তা আন্দাজ করতে পারি না বা পারছি না। আমরা তাঁদের 'মশার পিস্তল' দিতে চাইলেও রডার লুণ্ঠিত মালের আকাশ-ফাটা নাম তাঁদের মনে রেখাপাত করতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা আমরা রক্ষা করেছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় (আমাদের চালিত) ১৯১৪-১৭ সালের বিপ্লবী কার্যে বোমার চিহ্নটিও দেখা যায় নি।

কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য না করে যদি শত্রুর ঝাঁককে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য থাকত তাহলে বোমা ব্যবহারের ক্ষেত্র হয়ত থাকত।

প্রত্যূষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের বিপ্লবী জীবন গড়ে ওঠার উপায় ও উপাদান রূপে সে সময়কার সমাজের চিত্র কিছু দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম।

তমলুক। মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা। রূপনারায়ণ নদের উপর অবস্থিত। রূপনারায়ণ আয়তনে বেশ বড়। ওপারে মণ্ডলঘাট, হাওড়া জিলায়। একবার জোয়ার-ভাটায় নদ পরাক্রান্ত, আবার পুষ্ট অবয়ব ও ক্ষীণ, জীর্ণ দেহ প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিত—এই রকম অভ্যুত্থান ও পতন নিয়ে জীবন—জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল জীবনই। কিন্তু একটা বিষয় খুব ঠিক—এর চেয়েও ঠিক—সেটা হচ্ছে এই যে, যদি একটা বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে নিয়ত যোগ রাখা যায় তবে সাময়িক পরিবর্তন যা কিছু ঘটে তাকে অতিক্রম করেও মহত্ত্ব ও গৌরবের বাঁচন বাঁচা যেতে পারে। রূপনারায়ণ সাগরের সঙ্গে যোগ রেখে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

তমলুক নিজেই একটা উদাহরণ, ছোটখাটো হিসাবে। তমলুকের পুরানো নাম তাম্রলিপ্ত।* মহাভারতের যুগে এর প্রসিদ্ধি যথেষ্ট ছিল। তাম্রধ্বজ রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের চক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে পাণ্ডবদের সঙ্গে এঁর যুদ্ধ হয়। প্রখ্যাত, অনন্যসাধারণ বীর অর্জুন তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধে বেকায়দা হয়ে ঘেমে উঠেছিলেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত, রণাবসন্ন ধনঞ্জয় বার বার কপাল মুছতে বাধ্য হয়েছিলেন। রূপনারায়ণের উৎপত্তির ঐ এক কারণ। এটা অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী। এজন্য তমলুকের অপর এক নাম কপাল-মোচন তীর্থ। আর একটি সেরূপ কাহিনী এই—মহাদেব দক্ষকে নিপাত করে বিপন্ন হন। দক্ষের মাথা তাঁর হাতে লেগে থাকে। তমলুকের এক কুণ্ডে স্নানে মহাদেবের হাত থেকে মুণ্ডটি খসে গেল। তাই নাম কপাল-মোচন তীর্থ।

এর পর এল বৌদ্ধ যুগ। এদেশের সাচ্চা সওদা দেশ-বিদেশে বিতরণ করতে যেত "কত প্রার্থী সার্থবাহী দল"। আর যেত নির্লিপ্ত, ত্যাগী, মহতের পথানুসারী

* এখনকার গবেষণায় মনে হয়-তমলুকই পুরানো নাম–সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর সঙ্গে এখানকার স্থানীয় আদিম অধিবাসীরাও এই গোষ্ঠীরই মানুষ ছিলেন। তারপর দেশে আর্য সভ্যতার প্রভাবে পুরানো 'তমলুক' (বা ঐ ধরনের নামটি) আর্যীকৃত হয়ে হয়েছিল 'তাম্রলিপ্ত।' অনেক প্রাচীন স্থানের নাম এভাবে ইতিহাসের পরিবর্তনে দেশজ নাম থেকে সংস্কৃত নাম পেয়েছে, পরে মুসলমানী নামও পেয়েছে। অবশ্য সচরাচর সেই পুরানো নাম ও ইতিহাসের কথা সাধারণ মানুষ জানে না। (সম্পাদক)

শ্রমণ ও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা। আর কত লোক। তাম্রলিপ্ত ছিল বিশাল বন্দর। সাগরগামী পোত এখানে প্রস্তুত হত। এখান থেকে ছাড়ত, আবার ফিরতি পথে এইখানেই এসে আশ্রয় নিত। সেদিন ভারত ছিল সংস্কৃতির দাতা। গ্রহীতা ছিল অন্যেরা—পূব ও পশ্চিমের লোকেরা। যাবার সময় যাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে, ভাবাপ্লুত হৃদয়ে উদাত্তসুরে বলে যেত—"তবে চলিলাম, তাম্রলিকা! চির স্নেহময়ী, সুখময়ী মা আমার। মহিমা-আবাস জন্মভূমি।" তীরের লোকেরা উত্তর দিত—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ। পথটা তোমাদের ভালোয়-ভালোয় কাটুক।" ঝড়-ঝাপটায় পড়ে সাগরদোলা উদ্বেগ ও উত্তেজনা জাগালে যাত্রীরা গাইত—

"গাহি জনমভূমি অতুল নাম তোমার।"

দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, অবসন্ন দিনগুলি ভার হয়ে মনে বসতে চাইলে তারা গাইত—

"আমি তো জননী, দিবস রজনী
তোমারই নাম গাহিব।
যখন যেখানে যে ভাবে মা থাকি
তব প্রেমসুধা বিতরিব।
জীবনে খেলেছি তোমারই বুকে,
মরণে ঘুমাব তোমারই কোলে,
আবার আসিব আবার খেলিব,
তব জয়ধ্বজা গৌরবে উড়াব।"

এইরকম গল্প শুনতে শুনতে আমি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তাম। সাথী থাকত আমার ভাইবোনেরা। সাথী থাকত আমার প্রিয় বন্ধু সুরেন রক্ষিত।

মাহিষ্য রাজারা শক্তিশালী সাম্রাজ্য বাংলায় গড়ে তুলেছিলেন। তমলুকের রাজারা নাকি তাঁদের বংশধর—উড়িষ্যা হয়ে ঘুরে এসেছেন মাত্র। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রাজা হয়ে গেছেন। কাবুলের যে রাজার সঙ্গে সর্বপ্রথম পাঠান-রাজা মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ হয়, সেই রাজা জয়পাল ছিলেন ব্রাহ্মণ। সিন্ধুর রাজা দাহির, যাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথম জলপথে এসে আরবের সৈন্য মহম্মদ বিন্ কাশিমের অধীনে যুদ্ধ করে, তিনিও ছিলেন ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় রাজাদের কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। তাঁদের এই ছিল বিশেষ বৃত্তি। ভারত ও ভারতের বাইরে অবধি বিস্তৃত সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য যাঁর ছিল, সেই সম্রাট হর্ষবর্ধন ছিলেন বৈশ্য। বাংলার মাহিষ্যদের সেকালে শূদ্র বলে গণ্য করা হত। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রে সব সময় একটা বর্ণের বা একটা বিশেষ দলের কায়েমী স্বত্ব ছিল না।

আমি গল্প শুনতে শুনতে কখনও বা প্রশ্ন করতাম—'তাহলে এরা আমাদের কে

হল ?' মা বলতেন—'ভাই।' জিজ্ঞেস করতাম, কেননা একটু অবাক বোধ করতাম, 'এরা সবাই ? হিন্দু-মুসলমান ?' মা বলতেন—'হ্যাঁ। সবাই যে এক মায়ের সন্তান।' 'এক মায়ের ছেলে ? সবাই ? হিন্দু-মুসলমান ?' মা ছেলের চিবুকে ডান হাতটি ঠেকিয়ে বলতেন—'হ্যাঁগো বাবু।' আরও বিস্ময়ে জানতে চাইতাম, 'বল না, আমাদের ভেতর কে কি ?' মা সাদরে জবাব দিতেন—'কে কি নয় ? সবাই সব।' বালকের মন এতে উঠত না। সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠত—'এর নাম তোমার গল্প ? ছাই গল্প !' মা বুঝিয়ে বলতেন—'বহুরূপী, যে আমাদের বাড়ি এসে কত কি সেজে দেখিয়ে যায়—এমনি তো সে রোজ আসে যেন এক এক জন নতুন লোক। কিন্তু সত্যি তো তা নয়। ঐ সাজগুলো ফেলে দিলে বেরিয়ে পড়বে একটাই লোক।' আমি বলতাম—'কি যে বল ঠিক বুঝতে পারছি না। বহুরূপী তো একটা লোক। সেজে সেজে নতুন নতুন হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানরা তো আলাদা লোক ?'

মা বলতেন—'বড় হলে ভালো করে বুঝতে পারবে। বাইরের পোশাক, কিম্বা কে কি কাজ করে তাই দিয়ে মানুষ চিনতে নেই। ও তো বাইরের জিনিষ, মুখোশ। ভিতরে যে চেহারা আছে তাই হচ্ছে আসল পরিচয়। সেখানে সব এক। তাকে বলে মানুষ। মানুষ হিসাবে সব এক।'

আমি আলো-আঁধারে রইলাম। না-ই বা বুঝলাম আজ ? মা যখন বলেছেন তখন একথা সত্যি। বড় হলে বুঝতে পারব।

এর পর শুনি 'কোম্পানী'র কথা। সেটা হবে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাপার। আফ্রিদী জাতির সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারত সরকারের লড়াই হচ্ছিল। একজন কাবুলী একদিন এসে আমার বড় ভাইকে বলল—'বাবু, এই মনিঅর্ডারটা লিখে দিন তো!' তিনি বললেন—'কাকে পাঠাবে ?' উত্তরে জানা গেল খান্ মহম্মদের ছেলেকে। খান্ মহম্মদ এখানে ব্যবসা করত। মোটা মোটা জামার কাপড় বিক্রি করত, আর লোককে টাকা ধার দিত। কিন্তু অন্য কাবুলী সদাগরদের মতো মরসুমী ব্যবসায়ী সে ছিল না। তাদের দেখা পাওয়া যেত শীতকালে। গরমের সময় তারা চলে যেত। খান্ মহম্মদ বারো মাস থাকত এই শহরে।

খান্ মহম্মদকে যখন বলা হল যে সেটা লড়াইয়ের সময়, নিয়ম শৃঙ্খলা সে দেশে নেই, আফ্রিদীরা লুঠতরাজ করে সর্বনাশ করছে, কার টাকা কার হাতে গিয়ে পড়বে কে জানে ? কথা কয়টি শুনে খান্ মহম্মদ খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে দৃঢ়তার সঙ্গে অনুরোধ জানাল যেন মনিঅর্ডারটা লেখা হয়ে যায়।—'আমার ছেলের হাতে পড়লে, টাকা নিয়ে সে কি করত ? খেত আর লড়ত। অন্য লোকের হাতে পড়লে তারাও খাবে আর লড়বে। দিন টাকা পাঠিয়ে।' এই সময়ে একজন সীমান্ত

এজেন্ট আক্রান্ত হল। মালাকান্দ দুর্গ অবরুদ্ধ এবং পেশোয়ার পর্যন্ত পৌঁছায় গোলযোগের ঢেউ। আলি মসজিদ ও লান্ডিকোটাল দুর্গ বৃটিশের হস্তচ্যুত হয়।

ভাই-বোনদের আসরে সে কথা ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। তারা তাদের খেলুড়িদের কাছে সোজাসুজি গল্প করে বেড়াতে লাগল। ছোটদের মুখে লড়াইয়ের কথা যথেষ্ট ব্যক্ত হচ্ছে শুনে একজন মুরুব্বি গোছের গ্রাম্য বৃদ্ধ আমাদের সাবধান করতে লাগল—'এসব কথা মুখে এনো না। যুদ্ধের কথা কইতে নেই। কোম্পানীর লোক ধরে নিয়ে যাবে।'

'কোম্পানীর লোক ধরে নিয়ে যাবে।'—এ এক কৌতূহল জাগাবার ব্যাপার হল। 'বল না রামচাঁদ কাকা, কোম্পানীর লোক কেন ধরে নিয়ে যাবে?' সে বেচারি মিষ্টি কথায় সাবধান করা গেল না দেখে ধমকে উঠল। বলল, 'যখন ধরে নিয়ে গিয়ে শ্রীঘর দেখাবে, টের পাবে।'

'শ্রীঘর কি কাকা?' 'মামার বাড়ি। ভারী মজার জায়গা। খালি ওখানে বুড়ী দিদিমা নেই, এই যা তফাত।' এবার তাৎপর্য ও তফাতটা কি জলের মতো বোঝা হয়ে গেল। মামার বাড়ি, বিযুক্ত দিদিমা=যমালয়ের ছোট ভাই। এতটা অংকশাস্ত্রের জ্ঞান ছেলেদের ঐ সময় হয়েছিল। অঙ্কশাস্ত্রে যা সিদ্ধ, তা স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীঘরসম্বন্ধীয় কৌতূহল আর রইল না। বরং এখন মনে করি কী মাহেন্দ্রক্ষণেই রামচাঁদ খুড়ো শ্রীঘরের নাম উচ্চারণ করেছিল! শ্রীঘর জীবনের একটা অবশ্যম্ভাবী বিভাগ হয়ে দাঁড়ালো। শ্রীঘর দেখতে মামার বাড়ি তো নয়ই, শ্বশুরবাড়িও নয়। ওটা নিছক জেলখানা। ঝড়ের মধ্যে যে কোন বন্দর অভিপ্রেত হতে পারে, এটা জাহাজবাসীদের কাম্য। কিন্তু রাজনৈতিক ঝোড়ো জীবনে অত্যন্ত অনভিপ্রেত বন্দর হচ্ছে এই জেলখানাটা। অনভিপ্রেত হলেও ঐ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই জায়গাটি।

শ্রীঘর তো গেল। কোম্পানীর লোক কে? কি? কোথায় থাকে? কি করে? কেন ধরে নিয়ে যায়? ছেলে-ধরা বুঝি বা হবে? এইসব প্রশ্ন মনে জাগতে লাগল। রামচাঁদ কাকা বড় কড়া মেজাজী লোক। ওর কাছে সুবিধা হবে না। শীতুমামাকে ধরা গেল। শীতল মাইতি সুরেনদের পুরানো চাকর। তাদের মামা-বাড়ি থেকে এসেছে। সুরেনের মা তাকে ডাকেন শীতুদাদা। তাই সে সুরেন ও তার সঙ্গীদের মামা। সুরেন রক্ষিত ছিল তমলুকের ইতিহাস-লেখক ত্রৈলোক্য রক্ষিতের বড় ছেলে।

শীতুমামা ভারী সুন্দর লোক। তালপাতার ভেঁপু বানিয়ে দেয়, আমের কষি ঘষে বাঁশী করে দেয়। ছোট ছোট পুতুল তৈরি করে—মাটি দিয়ে বা ন্যাকড়া দিয়ে, বিনা পয়সায় অমনি অমনি, ভালোবেসে সবাইকে দেয়। ধরে বসলে গল্প বলে।

শীতুমামা কোম্পানীর কথা শোনাতে বসল। বলল—'ঐ যে তোমরা 'রনে' খেলতে যাও, ওটা হচ্ছে ওয়াট্‌সন কোম্পানীর হাতা।' (ছেলেরা যে মাঠে খেলতে যেত সেটা ছিল আদালত পার হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে বাণপুকুরের ধারে একটা বড় মাঠ। তাকে লোকে বলত ওয়াট্‌সন সাহেবের হাতা বা 'লন'। ইংরাজী Lawn।) শীতুমামা বলে চলল—'ঐ হাতায় সেই যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি ভেঙে পড়ে আছে, ওটা ছিল ওদের কাছারি। ওয়াট্‌সনের নীলের ব্যবসা ছিল। সেই রং তৈরি করানোর জন্য লোককে জবরদস্তি করত। নীলের চাষ করতে লোকের ধানের চাষে ক্ষতি হত। সস্তায় নীল ক'রে দিতে হত বলে লোকে ঐ চাষ করতে রাজী হত না। কোম্পানী জোর করে প্রজাদের ধরে আনবার জন্যে পাইক, বরকন্দাজ পাঠাত। মারধোর, ভারী অত্যাচার করত। বেঁধে রোদে বা জলে ফেলে রাখত। যারা প্রজাদের ধরে-বেঁধে আনত তাদের বলত কোম্পানীর লোক।'

এক কথায় বেরুল আর এক কথা। শীতুমামা কোম্পানীর লোক বোঝাতে গিয়ে আরও নতুন এক প্রশ্ন তুলে বসল।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, শীতুমামা, তারপর কি হল?' স্বভাবতই ছেলেমেয়েরা পরের দুঃখকষ্টের কাহিনীতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

শীতুমামা বলল—'লোকে ধর্মঘট করল।' এ আবার আর এক ফ্যাসাদ। ধর্ম মানে পুজো-পাট। ঘট মানে কলসী। কিন্তু ধর্মঘট করাটা কি? শীতুমামাকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হল। অনেক কথা কাটাকাটির পর এই সাব্যস্ত হল যে, লোকে ধর্মের নামে এক ঘট পেতে তার সামনে দিব্যি করেছিল যে যত কিছু দুর্গতি কোম্পানী করুক, এই হাতে আর নীল বুনবে না। প্রজাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ও বিদ্রোহে কোম্পানী চমকে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নীলের চাষ তুলে দিয়ে রেশমের চাষ প্রবর্তন করেছিল। তাছাড়া পরে আসামে চায়ের ব্যবসা ফেঁদেছিল। এই অবধি কথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোম্পানী একদিন ছিল। তার লোক না হয় তখন যাকে-তাকে ধরে আনত। কিন্তু এ কি? সে ওয়াট্‌সন কোম্পানী তো আর নেই, উঠে গেছে। আজও তবে কোম্পানীর লোক কোথা থেকে এসে ধরে নিয়ে যায়?

শীতুমামা এ সমস্যার ওপর বিশেষ আলোক-সম্পাত করতে পারল না। কচি-কাঁচাদের সমস্যা তারও সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যখন চারদিক অন্ধকার, আমি জানতাম মায়ের কাছে গেলে সব সন্দেহের নিরসন হবে। সে দিন মাকে জিজ্ঞেস করতে মা বুঝিয়ে দিলেন যে, পুলিশের লোককে কোম্পানীর লোক আজও বলে। পূর্বে ইংরেজরা এদেশে ব্যবসা করতে এসেছিল। ব্যবসা থেকে পেল বাদশাগিরি। তাদের বলত কোম্পানী। সেই থেকে কোম্পানী কথাটা চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর ইতিহাস যতটুকু জানা ছিল বলে দিলেন। বাবার কাছে গল্প শুনে মা দেশ-বিদেশের

ইতিহাস বেশ কিছু জেনেছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাইরা ক্ষেপে, বিগড়ে গিয়েছিল। ব্যারাকপুর, বহরমপুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। অনেক করে সে হাঙ্গামা থামে। তারপর থেকে কোম্পানীর রাজ্য গিয়ে কুঈনের রাজ্য আরম্ভ হয়। কুঈন ভিক্টোরিয়া বড় গুণের রাণী। আমি সব শুনেলাম। কুঈনের কথা পথে-ঘাটে লোকে বলত। এমন সুখ্যাতি কম শোনা যায়। শুনতে শুনতে মনে হত কুঈন বুঝি আমাদের আপনার জন—একদম আপন। এক ডাক-হরকরা একদিন বলছে—এক জঙ্গল দিয়ে ডাক নিয়ে সে যাচ্ছিল। পথে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বাঘ শুয়ে। তার ঝমঝম আওয়াজ ভয়ের চোটে থেমে গেল। কি করে? মহা ভাবনায় পড়ল। আগে গেলে বাঘে ধরবে। পিছু ফিরলেও নিস্তার নেই। এইরূপ উভয়-সংকটে পড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল—'দোহাই মহারাণী কুঈন ভিক্টোরিয়া!' বাঘ অমনি উঠে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সুড়সুড় করে অন্যদিকে চলে গেল।

যুবায় যুবায় ঝগড়া, মারামারি বেধে ওঠায় যদি কেউ রাগের মাথায় বলত, 'মেরে খুন করে ফেলব'; অমনি আক্রান্ত ব্যক্তি বলে উঠত, 'মেরে খুন করবে! এটা কুঈনের রাজ্য।'

বৃদ্ধরা বলতেন রামচন্দ্রকে হার মানিয়েছে এই মহিমাময়ী রাণী। শূদ্র তপস্বীর মাথা কেটেছিলেন রাম। কিন্তু পায়রাটুঙির ভোলা ক্ষ্যাপা, জাতে ডোম, নির্ভাবনায় সাধুগিরি করছে।

ছেলেরা শুনে শুনে অনুকরণে কম রইল না। বাঁশী কিম্বা ঘুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি হলে বলত—'কেড়ে নেবে! এটা কি মগের মুল্লুক? মশাই, মনে থাকে যেন এটা কুঈনের রাজত্ব।'

মাস্টারমশায় বার বার মনে করিয়ে দিতেন—'দি কুঈন ইজ্ গুড; ঐ রাণী হন উত্তম।' ধন্য প্যারীচাঁদ সরকার, আর চিরজীবী তাঁর 'ফাস্ট্ বুক'। তাতে ঐ পাঠ আছে।

কিন্তু অতি পুরাতন বাসিন্দা ও বৃদ্ধ নগেনবাবু রেল-স্টীমারের স্টেশন মাস্টার বলতেন—'ছেলেরা ভালো করে লাঠি ভাঁজো—

কোম্পানীর হাতে যবে ছিল রাজ্যভার,
না করিত দেবী সিংহ কোন অত্যাচার,
জঘন্য স্বভাব দুষ্ট দুর্বৃত্ত প্রধান,
লাঠির ভয়েতে সেও ছিল কম্পমান।
লাঠি-হাতে বঙ্গ-মল্ল দাঁড়াইত যবে,
বীরশূন্য বঙ্গভূমি কে বলিত তবে?'

লাঠি ভাঁজা বলার কারণ ছিল। আমার পিতা সুশিক্ষিত, পাকা লাঠিয়াল রেখে

ছেলেদের লাঠি, তলোয়ার খেলা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর অন্য বন্ধুরা নাক সিঁটকে বলতেন, 'ভদ্রলোকের মাথায় পোকা ঢুকেছে। ভগবান ভদ্র ঘরে জন্ম দিয়েছেন। সেই ছেলেগুলোকে কিনা ছোটলোক তৈরি করছেন। বলি, ও কিশোরবাবু, ছেলেগুলো কি দারোয়ানী করবে ?'

কেবল একা এই নগেনবাবু উৎসাহের সুরে কথা বলতেন; তিনি দুঃখ করে বলতেন—

'নির্বংশ লাঠির বংশ বহুদিন হায়,
সে আসনে সূক্ষ্ম যষ্টি এবে শোভা পায়।
পোষ্যপুত্র সম সেই বিদেশ আনীত,
বাবু-কর বাঙ্গালীর করিছে শোভিত।'

আমার মাথায় কোম্পানীর চিন্তা দৃঢ়ভাবে বসে গেল। আমি ও আমার বন্ধু সুরেন ভাবতাম কোম্পানীর রাজ্য আর মহারাণীর রাজ্য—এ দুটো পৃথক, না, এক ? কখনও মনে হত পৃথক, আবার কখনও এক। পৃথক এইজন্য যে, নামই তো আলাদা আলাদা; এক এইজন্য যে, দুজনের সেপাই-সান্ত্রীকে তো বলছে কোম্পানীর লোক। অনেক গবেষণার পর স্থির হল কোম্পানী অমর। সুরেন বলেছিল, 'বাপ মরে গিয়ে যেমন বেটাকে দিয়ে বংশরক্ষা হয়, এও তেমনি। কোম্পানী চলে গেছে কিন্তু তার বংশ বেঁচে আছে।'

রামচাঁদ কাকার কথা মনে হল—'যুদ্ধের কথা বোলো না, কোম্পানীর লোকে ধরে নিয়ে যাবে।' সুরেন ও আমি তখন বছর দশেকের হব। আফ্রিদী কে, তা আমাদের জানা ছিল না। সাপ্তাহিক হিতবাদী বা বঙ্গবাসী কাগজ পড়ে বড়রা যুদ্ধের কথা আলোচনা করতেন। তোচি উপত্যকায় যুদ্ধ। কোথায় তোচি তা এই ছেলেরা জানত না। ইংরেজদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ বিরোধিতা কিছু ছিল না। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিচারশক্তি তখনও তাদের জাগে নি। কিন্তু কেন কে জানে আফ্রিদীদের ভাঙা-ছন্দের আক্রমণে বৃটিশ শিবির বিব্রত হবার খবরে তারা আনন্দিত হত। গোরা সৈন্যের হাতে আফ্রিদীদের হার তারা চাইত না। আবার ভারতীয় সৈন্য আফ্রিদীদের হাতে পযুর্দস্ত না হয় এটা তারা কামনা করত। বৃটিশ সেনানায়ক জেনারেল লক্‌হার্ট নাকি কোন সময়ে রিপোর্ট করেছিলেন যে, আফ্রিদীরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বন্দুকের দাম সংগ্রহ করতে নিজেদের গৃহ ও গৃহিণী পর্যন্ত বন্ধক দিতে প্রস্তুত থাকত। আমাদের এ খবরটা খুব ভালো লাগত। ঐ পার্বত্য জাতিদের প্রতি এইজন্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিলাম। দেশের প্রতি কি অকৃত্রিম ভালোবাসা! কি অপূর্ব স্বাধীনতাস্পৃহা! এই আফ্রিদীদের গৃহিণী-বন্ধক মানে সে বেচারির স্ত্রী কারও বাড়িতে কাজ করতে যেত।

রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, প্রতাপসিংহ, রণজিৎসিংহ, শিবাজীর কাহিনী শুনে-শুনে আমরা একপ্রকার অভিভূত ও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা সঙ্গীদের মধ্যে প্রবর্তিত হল। ছেলেরা মাটির ঘর যেখানে পায় সেখানে বানায় কেল্লা। লন্ বা খেলার মাঠে ওয়াট্সনের ভাঙা বাড়ি হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সীমান্তবাসীদের কেল্লা। কারণ ভাঙা বাড়িটা উঁচু ছিল। পাহাড়ের উচ্চতা এই দিয়ে কল্পনায় গড়ে তুলল। তার ওপর ভাঙা ইঁট, খোয়া হল পার্বত্য কেল্লার গোলা-গুলি। আফ্রিদীদের যে কামানের গোলা ছিল না, সে কথা এরা শুনেছিল। কিন্তু বড় বড় পাথরের চাঙড় উপর থেকে গড়িয়ে দিয়ে উঠন্ত শত্রু-সৈন্যকে তারা গুঁড়িয়ে দিত। এককথায় তারা তাদের উপযুক্ত অস্ত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিল। পথের মাঝে মাঝে গাছের ঝোপে লাঠি লুকান থাকত। কোথাও কোথাও ছোট ছোট ধুতিও লুকিয়ে রাখা হত। মতলব? যুদ্ধ ঘোষণা না করে যদি অতর্কিতে কেউ আক্রমণ করে তাহলে এই লাঠি সম্বল।…কেল্লা কাছে থাকলে তার মাটির ডেলাগুলিও সম্বল। কেল্লার দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে যুদ্ধ চালানো তাদের একটা রণ-কৌশল। প্রয়োজন হলে মারের মার দিয়ে সাঁতরে পুকুর পার হয়ে ঐ লুকানো শুকনো কাপড় পরে ভালো ছেলেটির মতো বাড়ি চলে যেতে পারবে। এদের দলবন্দীর মূল সূত্র ছিল অতর্কিত আক্রমণের আরও প্রচণ্ডতর অতর্কিত উত্তর দেওয়া। হঠাৎ দেখা দিয়ে, হঠাৎ অন্তর্ধান। অল্প শক্তিতে প্রবল শক্তিকে বেগতিক করা।

বর্গী হাঙ্গামার কথা কোন্ বাঙালী শিশুর না জানা ছিল? এই পন্থায় শক্তিমান হওয়া এদের মনের মাঝে বাসা বাঁধল। কম শক্তি দিয়ে বেশী শক্তিকে হয়রান করা উদ্দেশ্য। সঙ্গীদের নিয়ে এর জন্য প্রয়োজনীয় কুচকাওয়াজ আরম্ভ হল। দল বেঁধে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়ল হয়ত কলাইশুঁটির মাঠে। কচি কচি তাজা মটরশুঁটি খেতে ভারী সুন্দর। বিনা বাক্যে তোলে—তাড়া খেলে পালায়। একদিন এক ক্ষেতের স্বামী যে চাষী, সে দেখতে পেয়ে দূর থেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। তার মৌখিক তাড়ায় কেউ ভয় খেল না। ক্রমশঃ চিৎকার বাড়ছে শুনে তার বাড়ির ও পাড়ার লোকেরাও এসে জুটল। এবার তুমুল সংগ্রামের সম্মুখীন। বিপক্ষ সৈন্যরা দুই দলে বিভক্ত। একদিকে কয়েকটি কিশোর। অপর দিকে সাজোয়ান জন-কতক। তারপর চাষীরা গাল দিতে আরম্ভ করল। এই দলে বুড়ো একজন ছিল। ব্যাপার গুরুতর। সুবুদ্ধি সাহসের সার। এই পন্থায় ছেলেদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিল—'ভাগি, এসো।' অর্থাৎ যে পালায় সে চিরজীবী হয়। পালাবে কি পালাবে না ছেলেরা ভাবছে, ঠিক এমনি সময় অপর পক্ষীয় এক যুবক একটি ঠেঙা তুলে তেড়ে এল। দলপতির হুকুম এল—"ফিরে দাঁড়াও।' শত্রুকে ভয় পাইয়ে তবে

পালাতে হয়। এই হল বর্গীর নিয়ম। ভেকু ছেলেদের মধ্যে বয়সে ছিল একটু বড়। বছর চোদ্দ-পনেরো হবে। ঢিল ছুঁড়ে মারায় পাকা হাত। কত আম, আমড়া, কামরাঙা, তেঁতুল, কুল তার সেই টিপে আত্মহারা হয়েছে। সে বলত—'মাথায় ঝাড়ো ইঁট, অর্ধেক লড়াই জিত।' প্রথমে যে আক্রমণ করে তার জয় হয়। সে আক্রমণের আহ্বান দিলে সবাই ভরসা পেল। ইতিমধ্যে ভেকু তাক করে এক ঢিল ঝেড়ে বসেছে। অব্যর্থ সন্ধান। কৌরব শিবিরে হাহাকার! কৃষক-নন্দরা চকিত হয়ে গেল। লাঠি নিয়ে বাকীরা তেড়ে এল। লাঠি সংগ্রহ প্রয়োজন। বালক-চমূ এক আখ ক্ষেতে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল। আখ উপড়ে বা ভেঙে করতে লাগল লাঠি। বোঁ-বোঁ শব্দে লাঠি চালাতে চালাতে নদীর ধারের দিকে এসে পড়ছিল। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও লোক এসে জমা হচ্ছিল। আমি না দেখেই একজনের ওপর জোরসে লাঠি চালিয়েছি; লাঠি চকিতে রুখে গেল একজনের একটা 'ডাং'-এ। 'ডাং' খুব ছোট লাঠিকে বলে।

চেয়ে দেখি আমাদের লাঠির ওস্তাদ সামনে। আর কওয়া-কওয়ি নেই। সদলবলে ছেলেরা দৌড়ে রূপনারায়ণে গিয়ে ঝাঁপ দিল। সেই যে বুড়ো লোকটি গ্রামের ভিড়ে ছিল সে চেঁচাতে লাগল—'ওরে, তোরা উঠে আয়। কিছু বলব না। ভালোমানুষের ছেলেদের হাঙর-কুমীরে খাবে। আয়, আয়, ফিরে আয়।' ছেলেরা ততক্ষণে গা-ভাসান দিয়েছে।

আর একদিন। বাংলা ইস্কুলের পেছনে একটি বড়গোছের আম বাগান। অপরিচ্ছন্ন বাগানে কচুবন দেখা দিয়েছে। ইস্কুলের পশ্চিমে রাস্তার ওপারে একটি চালাহীন, পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ি। হাত দুই তিন উঁচু মাটির দেওয়াল পরিসীমা জাগিয়ে আছে। ভাঙা দেওয়ালের মাথায় সুসজ্জিত, মাটির বড় বড় ডেলা। সংকেত—ভারী প্রয়োজনীয় সামরিক সংকেত। বর্গীরা দেখলেই বুঝতে পারে—সামনে ঝড়। যদি একটি কি দুটি তোপ পড়ে তবে দলপতির সঙ্গে শীঘ্র এসে মিলতে হবে। তোপ মানে মাটির চাঙড় রাস্তায় নিক্ষেপ। আমার কাছে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে সঙ্গীরা এসে জুটল। কারণ সেদিন তোপ পড়েছিল। রাস্তার লাল সুরকির ওপর মাটি রঙের ধুলো বিরাজিত। ব্যাপার কি? আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম ছুটন্ত কেল্লা ঠিক আছে কিনা? বন্ধুরা জবাব দিল—'আছে'। ছুটন্ত কেল্লাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। বাংলা ইস্কুলের ঠিক সামনেই রাস্তার ওপারে হ্যামিল্টন হাইস্কুল। এটাকে বলা হত ইংরেজী ইস্কুল। জনাদৃত হেডমাস্টার রাজেন্দ্র গুপ্ত খুব সৌখিন লোক ছিলেন। ইস্কুলের মাঠে নানারকম লতা, ফুলগাছ ও গাছের ঝাড় লাগিয়ে রেখেছিলেন। পেছনে ছিল পুকুর, ব্যায়ামশালা, গোলাপ বাগান। গোলাপ বাগান পার হয়ে খানিকটা জায়গায় শশা, কাঁকুড়, লাউ-কুমড়োর ক্ষেত। ঠাকুমা ছিলেন

ছেলেদের, ছোট-বড় সবাইয়ের, আপনার ঠাকুমা। ঠাকুমার কথা পরে বলছি। এই সব ঝাড়ে ঝাড়ে লাঠি লুকান থাকত। ব্যায়ামভূমির পূর্বে যে সীমানার উঁচু দেওয়াল ছিল, তার মাথার খানকতক ইঁট খোলা রাখা হত। কারণ এইখান দিয়ে একটা সরু রাস্তা ভীমার বাজার অবধি গেছে। সেটা 'লম্বা' দেওয়ার পক্ষে যেন খোলা থাকে। ইস্কুলের সামনে দিয়ে যে ভালো রাস্তাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সেইটাই সদর রাস্তা। সবাই সেখান দিয়ে যাতায়াত করে। যুদ্ধ বাধলে শত্রুপক্ষ তো সে পথটা জানবেই। সেজন্য 'রণচাতুর্যের পশ্চাদপসরণের' পথ একটা আগে থেকে সুগম রাখা দরকার। এই লাঠির আড়ত আর এই পথ ছিল ছুটন্ত কেল্লা। সঙ্গীরা জানাল সব ঠিক আছে। তাদের পরদিন বেলা তিনটায় আসতে বললাম। ইস্কুলের মাঠে বিকেলে খেলার পর সন্ধ্যা-সমাগমে ঠাকুরমার কাছে অর্থাৎ রাজেনবাবুর মায়ের কাছে, ছেলেরা গিয়ে বসত। তিনি নানারকম রূপকথা, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প বলতেন। প্রত্যেক ছেলের জন্য একটি করে পিঁড়ে থাকত। ছেলেরা তাতে বসত। তাঁর নিজের নাতি সিধু ও নিধু ছিল ছেলেদের পরম প্রিয়। আমরা নিধুর সমবয়সী। তাকে বলতাম সন্দার—চলতি কথায় ছিল নিধিরাম সন্দার। শুধু গল্প শোনা নয়, ঠাকুমা প্রায়ই মিষ্টিমুখ করাতেন। এমন ঠাকুমা কি আর হবে?

ক্ষেতে বেশ কচি কচি শশা দেখা দিয়েছে। তমলুকে বড় হনুমানের উৎপাত ছিল। এদের দৌরাত্ম্যে ফল-পাকুড় রাখা দুষ্কর। শশায় ঠাকুমার কড়া পাহারা ছিল। দু-একজন মালী প্রায়ই ঐ দিকটায় থাকত। ছেলেরা ঐ দিকে যেতে পেত না। একদিন সৌভাগ্যক্রমে মালীদের অনুপস্থিতিতে একটা হনুমান ইংরেজী ইস্কুলের মাঠে এসে পড়ে। সুরেনরা ঠাকুমার সুয়ো হবার জন্য খেলা ছেড়ে অনুমতি নিতে ছুটল—'ঠাকুমা হনুমান এসেছে? ওটাকে তাড়িয়ে দেব?' বাংলা ইস্কুলের দিকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম হল। ঠাকুমার ভয় ছিল শশা ক্ষেতের দিকে যেন না আসে। হনুমানের চেয়ে ছেলেদের ভয় তাঁর বেশি ছিল। কি রকম দৈব-দুর্বিপাক। তাড়া করবামাত্র ভয় খেয়ে হনুমান পুকুর পাড়ের দিকে হুপ করে লাফ দিয়ে এসে পড়ল। এক ঢিলে হনুমান দেশ-ছাড়া। কিন্তু আমার বন্ধুরা ক্ষেত-ছাড়া আর হতেই চায় না। ঠাকুমা আর নিশ্চিন্ত থাকতে না পেরে বাড়ির চাকর কৈলাসকে পাঠালেন। হতচ্ছাড়া কৈলাস এসেই উচ্চৈস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও ঠাকুমা, এরাই যে সব শশা শেষ করে দিলে!' ঠাকুমা ওদিকে কাকীমাকে (রাজেনবাবুর স্ত্রীকে) বললেন—'দেখলে বৌমা, এদের মাহাত্ম্য? শশার ক্ষিদে তাড়াবার জন্যই এত তাড়া। নইলে কি আর হনুমান তাড়ানর জন্য এতটা?' বামুনঠাকুর খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুমা বলছেন, ওদের ধরে নিয়ে আয় কৈলাস।' হেঁড়ে গলা চাকরটির। নাম জিজ্ঞেস করলে বলত—কোকিল। সে-ই ছুটছে। বাপ রে!

আর কথা আছে, বন্ধুরা সব দৌড় মেরে পাঁচিল পার।

ঐ পথে পড়ে দানবীর টি. এন. পালিতের পুত্র ব্যারিস্টার যদু পালিতের বাসা। উমেশ কোটাল মশায়ের বাড়িতে ইনি ভাড়া থাকতেন। তাঁর ছেলে ছিল আমাদের সমবয়সী। তার একটা ছিল স্টীমে চলা খেলার রেলগাড়ি। গাড়িতে জল দিয়ে একটু স্পিরিট জ্বালিয়ে দিলে ভাপ হয়ে গাড়ি চলত। বাঁশীও আপনা হতে বাজত। ভারী তাজ্জব ব্যাপার। এরকম খেলার গাড়ি তমলুকে কিনতে পাওয়া যেত না। সুতরাং এইটার জন্য সবাইকে এদের বাড়ি আসতে হত। সে রেলগাড়ি চালাত, অপরে দেখত। ক্রমে দেখার কৌতূহল মিটলে, চালাবার কৌতূহল বাড়ল। সে কিছুতেই কাউকে চালাতে দেবে না। কিন্তু গোপনে দু-একজনকে চালাতে দিয়ে বর্গীর দল সে ভাঙছিল এবং আপনার একটা দল গড়ছিল। অবশ্য বর্গীর দল বলে এদের নাম-টাম কিছু ছিল না। শিবাজী সবচেয়ে এদের কাছে ভালো লাগতেন। তাঁর ভাব, আফ্রিদীদের ভাব, রামায়ণ-মহাভারত থেকে অনুপ্রেরণা—এইসবকে মিলিয়ে একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড এরা অজ্ঞানে ঘটিয়ে বসেছিল। আমি আদর করে এদের বর্গী নামে সম্ভাষিত করতাম। বর্গীদের আপোসে মন-কষাকষি এখন এতদূর উচ্চে উঠেছিল যে একটা খোলাখুলি বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। আজ পালিত-পুত্রের দলের তিনজনে শেষ প্রশ্নের শেষ উত্তর দিতে এসেছিল। বর্গীদল ভাঙা সে ছাড়বে কিনা এবং রেলগাড়ি চালাতে দেবে কিনা? মাস্টার পালিত স্পষ্ট 'না' বলে দিল। এই নিয়ে বাধল যুদ্ধ। যুদ্ধের নিয়ম এদের এই ছিল, ঘোষণা করে যুদ্ধ করতে হবে। চোরের মতো অতর্কিত আক্রমণ বীরধর্ম-বিরুদ্ধ। যুদ্ধের সময় ও স্থান নির্দেশ করা থাকবে। যুদ্ধান্তে বিজিতরা বিজেতাদের জলযোগ করিয়ে শান্তি বা সন্ধিপ্রার্থী হবে। মিটমাটও হয়ে যাবে। একদম নিষ্কাম ধর্ম!

আমি সঙ্গীদের আমার সঙ্গে মিলিত হতে সঙ্কেত করেছিলাম এইজন্য। বড় গুরুতর সমস্যা। পালিতপুত্রের একটি বন্দুক ছিল। এয়ার-গান। সেরকম অস্ত্র আমাদের ছিল না। তার ছিল একটা ঘোড়া। আমাদের তা-ও ছিল না। যাই হোক, যুদ্ধ যখন অনিবার্য এবং ঘোষিত হয়ে গেছে, তখন কোন বীর তা থেকে পশ্চাৎপদ হবে? বাইরের কেউ জানবেন না, শুনবেন না; অথচ যুদ্ধ হবে। ব্যবস্থামতো ধার্য করা দিনে বীরগণ যে যার স্থির-করা দিক নিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হল। বন্দুকের বদলে আমরা করলাম বাঁটুল বা গুলতির ব্যবস্থা। বাংলা ইস্কুলের ধারের কেল্লায় আমি রইলাম গুলতি নিয়ে। সঙ্গে কয়েকটি গোলন্দাজ ও ঢিলন্দাজ। বাংলা ইস্কুলের পিছনের আমবাগানে, পোস্ট অফিসের দিকে এগিয়ে ঢিল নিয়ে কচুবনে লুকিয়ে রইল অব্যর্থ-লক্ষ্য ভেকু। সুরেন বলতে লাগল, 'গুলতির মার বড় মার। বন্দুকের গুলী বরং ফস্কাতে পারে, কিন্তু গুলতির বাঁটুল গিয়ে ব্লগ

ফাটিয়ে দেবে নিশ্চিত।' ভরসার কথা। 'ভরত গুলতি নিয়ে রাম-ধনুর্ধরের চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখাতে পারত।' আরও ভরসার কথা। 'দ্রোণাচার্যের তীরের চেয়ে ছিল পরশুরামের টাঙ্গী আরও ধারালো।' খুব বুকে বল দেবার যুক্তি। এসব তো হল। রণ-সরঞ্জাম বা কৌশলাত্মক ব্যবস্থা ঠিক করা চাই। আর চাতুর্যের সঙ্গে সৈন্যদের সঞ্চালন। কৌশলাত্মক ব্যবস্থা এই হল যে গুপ্তচর পাঠিয়ে ওপক্ষের ঠাট-বাট, বিন্যাস, সংখ্যা, স্থিতি জেনে নিতে হবে। আমাদের এপক্ষ থেকে একজনকে ভাঙিয়ে নিয়েছে। তাকে আগেই ঠাঁই-ছাড়া করাতে হবে, ভাগাতে হবে। কারণ সে এদিকে ছিল, এদিককার লড়াইয়ের কায়দা অনেকটা অবগত। সৈন্যসঞ্চালনে রণচাতুর্যের ব্যাপার দাঁড়াল এই রকম—কিছু গোলন্দাজ গিয়ে পালিতের বাড়িতে (মাটির) গোলা নিক্ষেপ করবে। তাহলে সে উত্ত্যক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে। সে বেরুলেই গোলন্দাজরা পালাবার ভান করবে। সুতরাং এদের বিধ্বস্ত করার জন্য নিয়মমতো সৈন্যবিন্যাস না করেই ওরা ছুটে আসবে। তখন আমাদের পক্ষ থেকে কিছু লোক ছুটন্ত কেল্লার পাঁচিল টপকে পিছনে গিয়েও আক্রমণ করবে। পথে আবার গোলা-পাত করে ধুলোর ধোঁয়া হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হবে। তাতে ঘোড়া ভড়কাবে এবং পালিত ভালো দেখতে পাবে না। সেই সময় গুলতির আঘাতে তাকে পরাস্ত করা যাবে। হয় সে পড়ে যাবে, নয়তো ঘোড়া নিয়ে পালাবে।

আলি বলে একটা আধপাগলা লোক ছিল। তাকে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হল। কারণ কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। সে সব দেখেশুনে এসে খবর দিল—পালিতের বাড়িতে তখন চা চলছে। গোলন্দাজরা গিয়ে ধপাধপ বড় বড় মাটির ঢেলা তাদের বাড়িতে ছুঁড়ে যুগপৎ আওয়াজ ও ধুলো সৃষ্টি করল। যুদ্ধের আমেজ বেশ জমে উঠেছে।

এমন সময় গ্রহবৈগুণ্যে স্বয়ং গৃহকর্তা পালিত সাহেব বেরিয়ে এলেন। তাঁর এখন তো বাড়ি থাকার কথা নয়! তাঁর তখন আদালতে থাকার সময়। বেলা তিনটে এইজন্য সময় ধার্য করা হয়েছিল। তিনি কয়েকটি ছোকরাকে এইরকম ইঁট ছোঁড়া, ধুলো ও নোংরা করতে দেখায় রেগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'কে রে হতভাগারা, বাপীর সঙ্গে লাগতে এসেছিস? ঈশ্বুরে, চাবুকটা নিয়ে আয় তো। হারামজাদাদের ঘা-কতক লাগিয়ে দিই।'

মাথার ওপর এরূপ অপ্রত্যাশিত বজ্রাঘাত দেখে 'গোলন্দাজরা' বা সৈনিক অগ্রদূতরা 'টেনে লম্বা'। খানিকটা এসে পিছু ফিরে দেখল ঈশ্বুরে চাকর বা মনিব পিছু ধাওয়া করে নি। তখন দাঁড়িয়ে 'হেরে গেলো, বাপী পালিত হেরে গেলো' বলে চেঁচাতে লাগল।

এরকম ভাবে লজ্জা দেওয়া কোন বীর সইতে পারে? ত্রিদিব তো অল্পদিন

ওদিকে গেছে। সে পারল না। দলবল নিয়ে ধাওয়া করল। বাপীও পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বন্দুক-হাতে ঘোড়সোয়ার হয়ে পড়ল। ফট্ ফট্ দু-চারটে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। কেল্লার পাঁচিলের গোড়ায় আমরা বসে গুলীর ধাক্কা কাটিয়ে নিলাম। এখান থেকে ধমাধম মাটির গোলা পথে পড়ে আওয়াজ করতে লাগল। ইংরেজী ইস্কুল হয়ে পাঁচিল পার হয়ে, শত্রুদের পেছন থেকেও মাটির গোলার আক্রমণ করা হল। চতুর্দিক ধুলোয় ধুলো হয়ে গেল। বাপী পালিতের ঘোড়া গেল ভড়কে এবং তার নিজের চোখ গেল জলে ও ধুলোয় ঝাপসা হয়ে। ওদের গুলিতির পাল্লার ভেতর হিসেব মতো এগুতে দেওয়া হয়েছিল। সুরেনের কথা সত্যি হল। বন্দুকের গুলি ফস্কাল। কিন্তু বাঁটুল নির্ঘাত মার মারল। বাপী পড়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে পালাল। ভেকুর অকাট্য ঢিলে ত্রিদিবের মাথা ফাটল। ভেকু চেঁচিয়ে উঠল—'লালে লাল গো লাল।' সবাই দেখল লাল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে রক্তপাত এরা এর আগে দেখে নি। রক্তের দৃশ্যে উভয় পক্ষ ঘাবড়ে গিয়ে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল। সেদিন যুদ্ধ এই অবধি হয়ে ক্ষান্ত রইল।

সময়মতো দূতমুখে সন্ধি-ভিক্ষার প্রস্তাব এল। কাঁচা সন্ধি সেদিন হয়ে গেল। বাপী পালিত চিনি-মাখা ফুলদার বিস্কুট সবাইকে খাইয়ে দিল। কাঁচা সন্ধি এইজন্য যে, বাপীর বাপ যুদ্ধে ভাগ নেবেন এই কথা তো ছিল না। সেজন্য সন্ধি হলেও শান্তি আসছিল না। তারা মিটমাট করতে রাজী, কিন্তু অদৃষ্ট কি বলছে সেটা দেখার জন্য আর একটা যুদ্ধের দরকার। উভয় পক্ষ সম্মত হল। আমরা হলাম আফ্রিদী এবং বাপীরা হল ইংরেজ। ওয়াট্সনের হাতায় হল সে যুদ্ধ। ইংরেজ তাড়া করায় আফ্রিদীরা তাদের পার্বত্য কেল্লায় আশ্রয় নিল। ইংরেজ সৈন্য তাদের ঘেরাও করে পরাস্ত করতে মনস্থ করল। পাহাড়ের ওপর ও নিচে থেকে ঢেলা ও চিৎকার চলতে লাগল। দৈবক্রমে নিচের ছোঁড়া একটা ইঁটে ওপরের মারা আর একটা ইঁট এসে ঠকাস করে লাগল। যুদ্ধ সমানে সমানে মিটে গেল। অদৃষ্টের ইঙ্গিত বোঝা গেল কিনা! এবার পাকা সন্ধি হয়ে গেল।

খেলাঘরের ইংরেজ ও আফ্রিদীর মিল হল বটে, কিন্তু প্রকৃত ইংরেজ ও আফ্রিদী কোনদিন মিলতে পারে নি। মনের অভাব।

কি রকমে কে জানে এইসব বৃত্তান্ত নগেনবাবুর কানে পৌঁছাল। তিনি আমাদের সবাইকে ডেকে হাসিমুখে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'বেশ খেলা বার করেছ। চমৎকার। বাঙালীর মাথায় খুব ভারী কলঙ্কের ডালি। সে কলঙ্ক কি কেউ দূর করতে পারবে? তোমাদের দেখে মনে হয় আমিও যেন অমনি হয়ে যাই। ভগবানের কাছে, মা বর্গভীমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমরা বাঙালীর ভীরু অপবাদটা দূর করে দিতে পার। তোমাদের ভিতর দিয়ে যেন নতুন বাঙালী

গড়ে ওঠে।' তারপর আওড়ালেন—

'শিশুপ্রায় বাঙ্গালী ডরিবে ? পশুপ্রায় বাঙ্গালী মরিবে ?
হেন শিশু নহে বাঙ্গালীর, হেন পশু নাহি বাঙ্গালায়।

—পারবে ? পারবে এমনটা করতে তোমরা ?'

আগেই বলেছি, ১৮৯৭-৯৮ সালে বাবা ছেলেদের লাঠি ও তলোয়ার খেলা শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ওস্তাদ বাড়ি এসে শিখিয়ে যেত। সে ছিল হিন্দু। তার সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায়। তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গেও চেনা-শোনা হয়ে গেল। বৃদ্ধ একদিন বললেন, 'বাবুরা, লড়াই দু-রকমে হয়। ধারে কাটা আর ভারে কাটা। তোমরা যা শিখছ সেটা ধারে কাটা—লাঠি, তলোয়ারে। ভারে কাটা হয় ধর্মঘটে। ধর্মঘট করে ওয়াট্‌সন কোম্পানীর নীলকরের অত্যাচার তারা দূর করেছিল। সব লোক দলবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল—সাহেব, এ হাত কেটে ফেলে দাও, তবু এ হাতে আর নীল বুনব না—এবং তারা এই উপায়ে সফলকাম হয়েছিল।' সহিংস ও অহিংস—দুটি অস্ত্র। আমরা প্রয়োজন মতো যেন ব্যবহার করি—এই ছিল বৃদ্ধের উপদেশের উদ্দেশ্য। ধর্মঘট দলে সফল হয়, অর্থাৎ ভারে কাটে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের বাড়িতে যেসব আলোচনা হত তার থেকে কিছু লোকের নাম ও তাদের কীর্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু আমি শিখেছিলাম। দুজনের নাম আমাদের খুব ভালো লাগত। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন দেশপূজ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। জিতেন্দ্রনাথের দেশ-বিদেশের কীর্তিকথা আমরা শুনেছিলাম। বিলাতে থাকাকালে কালা আদমি বলে তাঁকে বিদ্রূপ ও ঘৃণা করার প্রতিশোধ তিনি যেভাবে নিয়েছিলেন তা স্মরণীয়। ঘুষোঘুষিতে উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ যুবকদের ধরাশায়ী ও ক্ষমাপ্রার্থী করে ছাড়তেন। সাহসী বীর বলে তাঁর খ্যাতি ওদেশে খুব রটে। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে উদ্ধত শ্বেতাঙ্গদের তিনি মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে ছাড়তেন। কলকাতার তালতলা বা বৌবাজার এলাকায় নীচশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গদের দুর্দান্তপনায় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। মানে মানে চলাফেরা করতে ভয় পেত। যাকে-তাকে ধরে তারা মারত। কালা আদমি যেন তাদের হাত-সাফাইয়ের মাল ছিল। এক ফুটপাত দিয়ে উভয়পক্ষের চলা দায় ছিল। সামনে পড়লে বুটের ঠোক্কর বা ছড়ির আঘাতে কালাদের পথ ছাড়তে হুকুম করা হত। জিতেন্দ্রনাথ এর সম্যক প্রতিকার করে সবার ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন। আমাদের কাছে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন উপাস্য বীর। নেপোলিয়নের তো কথাই নেই। সর্ববাদিসম্মত অদ্বিতীয় সেনানায়ক তো ছিলেনই, তাছাড়া তাঁর মনের সুকুমার বৃত্তির পরিচায়ক অনেক গল্পে আমাদের আরও বিশেষ করে অভিভূত করেছিল। কথিত আছে, কোন এক বন্দী ইংরেজ যুবক-সৈন্য ফ্রান্সের বন্দীশালা থেকে পালাচ্ছিল। পথে সে ধরা পড়ে। বিচার যখন হয়, সে বলে যে তার মাকে দেখবার জন্য সে এত অধীর হয়ে উঠেছিল যে, তার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা অসম্ভব হওয়ায় সে এই অপ্রিয় কাজ করে ফেলে। নেপোলিয়ানের কাছে এই রিপোর্ট পেঁছালে তিনি তাকে মুক্ত করে বিলাতে চলে যেতে দেন। নেলসনের গল্পও বেশ ভালো লাগত। নেলসন ইংরেজের যুদ্ধের জাহাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তাঁর সেই মৃত্যুহীন কথা-ক'টি—"ইংল্যাণ্ড তার প্রত্যেক সন্তানের কাছে তার প্রতি কর্তব্য আশা করে।" এই বাণী তিনি তাঁর অধীনস্থ নৌ-সেনাদের দিয়েছিলেন ট্রাফালগারে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধকালে।

আমার বাবা ওকালতি করতেন। সমুদ্রের ধারে বা বড় নদীর ধারে শরীর ভালো থাকবে বলে তমলুকে আসেন। পরে মেদিনীপুর চলে যান। বাড়ির বাহির মহলে আমি অনেক কিছু শুনতাম। অন্দর মহলেও শিক্ষা কম হত না। বাহির

মহলে পিতা ও তাঁর বন্ধুদের কথোপকথনের টুকরো-টাকরা সংগ্রহ করতে পারতাম। অন্দর মহলে বেশিটা পাওয়া যেত মায়ের কাছে। আর খানিকটা পেতাম আমার মধ্যম ভ্রাতা ও পিতার কথোপকথন থেকে। এঁদের আলোচনায় যোগ দেবার বয়স তখনও আমার হয় নি। আমার এই ভাইটি অনেক ভাষা জানতেন। ফরাসী, জার্মানী, ল্যাটিন, ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী। আমি ছিলাম স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, নীরব, লাজুক। যা করার, একেবারে কাজে করে দেওয়া ধাত। কোন কিছু করতে হলে দীর্ঘ বিচারের পর করতাম সিদ্ধান্ত। কিন্তু একবার সিদ্ধান্তে এসে পেঁছালে বিদ্যুৎবেগে সেটা করে ফেলা চাই। চটপট বিচার এবং তড়িৎগতিতে কাজ করে বসা আমার ধাতের বিপরীত।

মায়ের কাছে যাঁদের নাম বেশী বেশী শুনতাম বা যাঁদের বিষয়ে আলোচনা শুনতাম, বিশেষ করে তাঁদের নাম হচ্ছে—বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র, হরিশ মুখুজ্যে। মায়ের কাছ থেকে এঁদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর শুধু মোলায়েম হৃদয়ের মানুষ ছিলেন না। তিনি ভারী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন। নিজের জাতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতিতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। একবার লাটসাহেবের নিমন্ত্রণে যান। পায়ে তালতলার চটি ও গায়ে চাদর। দরবারী পোশাকের লোকেদের সাদর অভিবাদনে স্বাগতকারী কর্মচারী এঁকে দরবারের ভিতরে যেতে দেয় নি। ইনিও নিজ জাতীয় পোশাকের ইজ্জৎ রক্ষায় নাছোড়বান্দা। দরবার অগ্রাহ্য করে চলে আসেন। সকলে সমাসীন। বিদ্যাসাগর অনুপস্থিত দেখে খোঁজ পড়ল। লাট অনুসন্ধান করেন এবং ব্যাপারটা জেনে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। লাটের প্রয়োজনে যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু গরজ তাঁর নয়। তাঁর ঐ বেশকে সম্মান না দেখালে তিনি ওদিক মাড়াবেন না। অবশেষে দরবারী পোশাক তাঁর জন্য ধার্য রইল না। মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর দেশ ছিল মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। কাজ করতেন কলকাতায়, মা ডেকেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই রওনা হলেন। পথে পেলেন বন্যায় এপার-ওপার-ভাসা দামোদর। মাঝি ভয়ে নৌকায় খেয়া দিতে অস্বীকার করল। বিদ্যাসাগর মশাই মায়ের ডাক ফেরাতে অপারগ। সাঁতরে পার হলেন। মাতৃ-আজ্ঞা পালনে তিনি বেপরোয়া। মা 'পরমহংস' বলে আখ্যাত করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে। এমনভাবে তাঁর কথা কইতেন যে, আমার মনে হত পরমহংসদেব বোধ হয় আমাদের কেউ আত্মীয় হবেন। মুহুর্মুহুঃ সমাধি। মানুষ মানুষকে যেমন দেখে তেমনি তিনি ভগবানকে দেখতে পেতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন। ভগবানকে 'মা' বলে ডাকতেন। পরমহংস কি করতেন না করতেন সেটা যতটা না আমার মনে বসেছিল তার চাইতে বেশি বসল—মা নন সামান্য ধন—এই

ভাবটা, মুখে কিছু বলতাম না। কিন্তু মনে মনে ভাবতাম মায়ের সামনে কোন দেবতা-টেবতা নেই। সব মা এক। এক মায়ের ভিতর সব মা রয়েছেন। মা কারো মরে না, মরতে পারে না। মা চিরজীবী, সর্বত্র বিরাজমান। মাঝে মাঝে আমার দুঃখ হত, যদি আমি আর দু-চার বছর আগে জন্মাতাম তাহলে হয়তো পরমহংসদেবকে দেখতে পেতাম। এরকম একটি অদ্ভুত লোককে দেখার ভারী সাধ। কিন্তু সে সাধ মেটানোর উপায় ছিল না।

মা বলতেন, 'যারা পৃথিবীতে এখানকার ব্যাপার নিয়ে বড় হয়েছে তাদের লোকে ভুলে যায়। আর যারা এখানে থেকেও মনের রাজ্যে বড় হয়েছে তারা অমর হয়ে থাকে। নেপোলিয়ন, নেলসনকে লোকে ভুলে গেছে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু এঁদের লোকে ভুলছে না। রোজ স্মরণ করে।' বলা বাহুল্য, বাবার কাছে নেপোলিয়ন ও নেলসনের কীর্তি-কাহিনী শুনেছিলেন মা।

বঙ্কিমচন্দ্র কত কি গল্পের বই লিখে লোকের কাছে খুব প্রিয়। কিন্তু 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। মায়ের অবশ্য শোনা গল্প থেকে নিজের মত গড়ে উঠেছিল। তিনি বলতেন বেশির ভাগ লোকের বেশী দুঃখ। কম ভাগ লোকের অতিরিক্ত সুখ। সমাজের এটা ভালো নয়। হওয়া উচিত বেশির ভাগ লোকের সুখ, কম ভাগ লোকের সবচেয়ে কমেরও কম দুঃখ। সে অবস্থা আনতে গেলে ভাবতে হবে—কি করতে হবে? কে সে কাজ করবে? আর কি করে তা করা যাবে? বঙ্কিম চাটুজ্যে সেরকম ভাবনা ভেবে লিখে রেখে গেলেন। বন্দে-মাতরম্ যখন উনি মূলমন্ত্র ধরেছেন তখন দেখবে ওঁর কথাই একদিন খাটবে। আমি এই কথা কয়টি অমূল্য রতনের মতো অন্তরের মণিকোঠায় তুলে রেখে দিয়েছিলাম।

হরিশ মুখুজ্যে প্রণম্য। বাংলার উৎপীড়িত, অকথ্যভাবে লাঞ্ছিত প্রজারা নীলকর কোম্পানীর বিরুদ্ধে যখন সর্বস্ব পণ করে বিদ্রোহ করে তখন বাংলা-মায়ের এই কৃতী সুসন্তান তাদের পক্ষ অবলম্বন করে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনকার দিনে তাদের অন্ধকারের একমাত্র আলো ছিলেন ইনি। এঁর সঙ্গে ছিলেন লং সাহেব। এঁর অকাল মৃত্যুতে প্রজারা আফসোস করে গেয়েছিল—"অসময়ে হরিশ ম'লো, লং-এর হল কারাবাস।" লাঞ্ছনা, অবিচার, উৎপীড়ন ভোগ করে সুবিচারের আশায় আশায় থেকে যখন সমাজ-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের নিকট সুবিচার পাওয়া যায় না, তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লোকেদের অন্তর্নিহিত শক্তিই বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেয়। এটা প্রকৃতির নিয়ম। কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে হরিশের কর্মশক্তি সেদিন অপেক্ষাকৃত ছোট রঙ্গমঞ্চে যে নাট্যের অভিনয় দেখিয়ে গেল তা-ই যে কয়েক বছর বাদে ভারতের বিশাল রঙ্গমঞ্চে কায়া গ্রহণ করবে, কে সে কথা ভেবেছিল? মা বুঝিয়েছিলেন—-উৎপীড়করা ততটা শত্রু নয়, যতটা উৎপীড়িতেরা নিজেরা নিজেদের শত্রু। নিজেদের

মধ্যে যে লোকেরা উৎপাতের শিকড়সুদ্ধ গাছকে উৎখাত করতে আসে এবং মধ্যপথে নিজেদের দিন কিনে নেয়, তারাই উন্নতির পরম শত্রু। শোধরাবার শক্তিকে তারা ক্ষীণ ও দুর্বল করে এবং বিপক্ষের সঙ্গে বেহায়ার মতো আপোস করে। অন্যায়ের সঙ্গে কোনরূপ রফা-আপোসের একদম বিরোধী ছিলেন মা।

দুর্গত, দলিত, দরিদ্র, আতুর, কাতর পীড়িতের প্রতি তাঁর অনুকম্পা ও সহানুভূতির সীমা ছিল না। চিত্তের প্রসার, মহত্ত্ব ও বদান্যতার দিকে তাঁর খুব লক্ষ্য থাকত। পরকে সহজভাবে আপনার করে নেওয়ায় তিনি খুব কুশলী ছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সাহায্য নিয়ে গোপনে বিপন্নদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। অর্থ কারো সঙ্গে আসে নি, কারো সঙ্গে যাবে না। একে সৎভাবে ব্যয় করে যাওয়ায়—অর্থসম্পন্ন হওয়ার সার্থকতা। তিনি বলতেন, 'দুঃখ-দারিদ্র্যের মহিমা বুঝতে পারা, দুর্দিনের দুর্গতির সম্মুখীন হওয়া, দৈন্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যার-তার কর্ম নয়। প্রাণ চাই।

আমার পিতা ছিলেন বিদ্যা ও সত্যানুরাগী। বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, দর্শন, জ্যোতিষ, দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সঙ্গীতের পরমানুরাগী। ছেলেদের ধনী হওয়া তিনি চাইতেন না। তারা যেন দেশহিতৈষী, সুশীল ও ভদ্র হয়, এই ছিল তাঁর কামনা। পাশ্চাত্ত্যের যা কিছু ভালো তা নিতে হবে।

ভারতবর্ষটা একটা মহাদেশ। কিন্তু এখানে চিরদিন সংস্কৃতির সমন্বয় হয়ে আসছে। এই ধারা বুঝে এর সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যা-কিছু এই দেশী, একমাত্র তা-ই ভালো, আর সব মন্দ—এই বিচার ভুল। এর উল্টোটা আরও ভ্রান্তিপূর্ণ। দেশের সেবা করা পরম কর্তব্য। দেশের সংস্কৃতি থেকে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে এই মহামন্ত্র। এই শিক্ষা জীবনে ফলিয়ে তুলতে হবে। পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, কৌরবরা একশো ভাই। যখন তারা আপোসে লড়ে তখন তাই বটে। কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে লাগবার বেলা তারা একশো পাঁচ ভাই। এই শিক্ষা ভুলে ভারত পরপদানত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় পরস্পরে যুযুধান থাকতে ভারতের মুক্তি নেই। পাঁচ ফুলের সাজি হচ্ছে ভারত। ফুলে ফুলে লড়াই করে আত্মঘাতী হলে সাজি সাজান হবে কি দিয়ে? এখানকার মূল শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনার ধারাকে সর্বপ্রযত্নে পুষ্ট করে নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে। শুধু রাষ্ট্রিক মুক্তির দিকে চোখ থাকার কিছু মানে হবে না, যদি না অর্থনৈতিক অরাজকতা, একচেটিয়াত্ব বা পরাধীনতার পাশ না কাটা হয়। এইরকম ছিল তাঁর রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির মতবাদ।

তিনি কাবুলীদের স্বাধীনতাস্পৃহাকে বড় পছন্দ করতেন। সমকালীন ভারতের পক্ষে এটা একটা আদর্শের মতো তিনি মনে করতেন। ইংরেজ কাবুল জয় করেছে, কিন্তু কাবুলীদের ওপর রাজত্ব করতে পারে নি। এইখানেই কাবুলীদের গুণপনা।

একটা কুমীরের বাচ্ছা ধরে এনেছিলেন। সেটাকে পোষার চেষ্টা করেন। দুধ, মাছ, ডিম, মাংস কিছুই সে স্পর্শ করত না। কয়েকদিন বাদে মরে গেল। তাকে দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের বলতেন—এর নাম স্বাধীনতাস্পৃহা। মরে গেল তবু পরাধীন জীবনকে শ্লাঘ্য করল না। ঘৃণা করে গেল।

দারিদ্র্যব্রত নিয়ে দেশসেবা করতে পারলে হয়তো তাদের চেষ্টায় পরাধীনতা একদিন ঘুচবে। পরের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া, পরের দুঃখ বুক পেতে নেওয়া, পরের কষ্টকে আপন বোধ করা তাদেরই কর্ম যাদের দিনমজুরি করে বাঁচারই সময় কুলোয় না। বাবুভাইদের দিয়ে তা হয় না। কেন না আলস্য-বিলাসে, কারণে-অকারণে তাদের প্রায়ই গা ম্যাজম্যাজ করছে। ভাবার সময় নেই পরের কথা। মাথার একটা চুলে পাক ধরলে তারা মনে করে ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেছে। নিজের চিন্তা করবে, না পরের জন্য মাথায় ব্যথা ধরাবে? ব্রতী গরীবদের আমরণ যৌবন রাখতেই হয় বাধ্য হয়ে। পরের জন্যে ভোগা ও মরা অমৃতত্ব এনে দেয়। যারা মরতে পারে তারাই প্রকৃত বাঁচে। বাবুয়ানিও করব এবং দেশসেবাও করব, এতে সখের যাত্রা বা থিয়েটার হতে পারবে, আসলে কিছু হবে না। এই লোকগুলো খেতাব, চাকরি বা উচ্চপদ নিয়ে ইংরেজের অধীনে থাকাকেই স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করে দেবে এবং জনসাধারণকে তাই বোঝাতে থাকবে। এদের নেতৃত্ব মেনে কোনদিন ছেলেরা যেন মাতামাতি না করে। এটা বিশেষ করে তদানীন্তন রাজনীতি-চর্চাকে লক্ষ্য করে বলতেন (১৮৯৭-১৯০০ সালের কথা হচ্ছে)। সরকারি চাকরি কেউ যেন না করে। তাঁর বংশে যেন কেউ কোন চাকরি না করে।

বোম্বাইয়ে নতুন কাপড়ের কল হয়েছিল। ভারী মোটা মোটা কাপড়। সেই কাপড় পরিবারে ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামপুর ও বালির কাগজ ব্যবহার করতেন, বিলাতী কাপড় বা কাগজ বাড়ি ঢোকা বন্ধ। মা দেশী কলের ও জোলার বোনা কাপড় পরতেন। কিন্তু নুলী ঝি ভারী আপত্তি করতে লাগল।

খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে পড়ত দুটো স্টীমার স্টেশন। গভর্নমেণ্টের ও হোর-মিলার কোম্পানীর। হোর-মিলারের জাহাজ—পেছনে চাকা, সামনে দুটো চিমনি, দোতলা। নাম উর্বশী, কিন্নরী প্রভৃতি। গভর্নমেণ্টের জাহাজে মাঝে চিমনি, দুধারে চাকা, নাম রব্ রয়, ডগলাস প্রভৃতি। এগুলো একতালা। সরকারী দোতালা জাহাজও ছিল। চেহারা ঐ রকম, কিন্তু আকারে আরও বড়। নাম—ফক্স্, লিংক্স্ (Fox, Links)। কুশী নামে ছোট্ট একটা জাহাজ ছিল। তার পাখা পেছনে। হোর-মিলারের জাহাজের আর এক নাম ঘাঁটালের জাহাজ। একদম কলকাতায় এসে গঙ্গার ধারে আর্মানি ঘাটে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিত। সরকারী জাহাজ ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত যেত। সেখান থেকে

রেলে চড়ে শিয়ালদহে নামতে হত। আমরা কলকাতা যেতে রেল-জাহাজ ব্যবহার করতাম। লোকে এই লাইনকে বলত 'রেলের জাহাজ'। সকালে জাহাজ আসত। বিকেলে জাহাজ ছাড়ত। জেলে বাস করতে করতে যেমন রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যেও জেল-স্বাদেশিকতা (Jail Patriotism) বা ওয়ার্ড-পেট্রিয়টিজম্ জন্মাতে দেখা যায়, তখন তমলুকের ছেলেদের মধ্যে জাহাজ-প্রেম জন্মাতে দেখা গিয়েছিল। 'কোন জাহাজ ভালো ?' 'হোর-মিলার।' 'না ; কিছুতেই না। রেলের জাহাজ ভালো।' হোর-মিলারী বলল, 'গেঁয়োখালি, কুঁকড়োহাটির পরই তোমার রেলের জাহাজ ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাল। মা-গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে পারে ? হোর-মিলার গঙ্গায় গা ভাসিয়ে হেলতে-দুলতে সটান কলকাতায় পেঁছে যায়। পুণ্যিও হয়, কলকাতা যাওয়াও হয়। পাপীরা যায় রেল-স্টীমারে।' প্রতিপক্ষ উত্তর করত, 'হোর-মিলার পাপীদের জাহাজ। পুণ্যাত্মাদের গঙ্গাকে দরকার হয় না। সমুদ্রের হাওয়া খেতে পাবে ও জাহাজে গেলে ? ডায়মণ্ড হারবার আর গঙ্গাসাগর ত যমজ ভাই (twin brothers)। তা ছাড়া রেলে চড়ার মজা কোথায় পাবে ওতে ? বারুইপুরের ডাব, গোলাপ-জাম চোখে দেখেছ বাবুরা ? সোনারপুরের সিঙাড়া ?'

এইরকম হাস্য-পরিহাস থেকে বক্রোক্তির সৃষ্টি হত। কেউ বলত, 'কি দুর্দশা ! শেষে আর্মানি ঘাটে ? ওরই তো কাছাকাছি আদ্যশ্রাদ্ধ ঘাট, নিমতলার ঘাট। ওটুকু এগুতে আর বাকী কেন ?' প্রতিপক্ষ বলত, 'শেয়াল পোড়ার গন্ধ শুঁকতে যায় কেন রেল-স্টীমারওয়ালা। শেয়াল খাবার মতলব তো, তমলুকে কি শেয়াল পাওয়া যায় না ? ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন। দুবার গন্ধ শুঁকলে পূর্ণ ভোজন।'

এবার যা বলছিলাম। ছেলেরা ম্যাচ খেলে আনন্দ-মত্ত হয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছিল। কলকাতা থেকে একটা নতুন ছেলে এসেছিল। সে ধুয়া ধরাল 'হিপ্ হিপ্ হুররে ! ক্ল্যাপ, ক্ল্যাপ অল টুগেদার হিপ্ হিপ্ হুররে !' সঙ্গে সঙ্গে জোর হাততালিও চলছিল। নগেনবাবু করতেন রেল-স্টীমারের স্টেশন-মাস্টারি। তিনি বেরিয়ে এসে থামালেন ছেলেদের ; থামালেন তাদের হৈ-হল্লা। বললেন, 'একে তো বিলেতী খেলা খেলে অপকর্ম করছ। তার ওপর মনের উল্লাস প্রকাশ করছ বিদেশী ভাষায়, বিদেশী ভঙ্গীতে ? এসব ছাড়তে হবে। এতে লজ্জা বোধ করতে হয়। ভাষাও যে আমাদের মা হন। কথায় বলে, মাতৃভাষা জান ? সৎমা তো কেউ চায় না ? তবে নিজের মা বেঁচে থাকতে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা কিরকম ছেলের কাজ ?'

এমনভাবে এই কয়টি কথা কইলেন নগেনবাবু যে ছেলেদের মনে কল্পনায় ভেসে উঠল যেন তারা আপনার মাকে ঐরকমে অমর্যাদা করছে। লজ্জায় কণ্ঠরোধ। তারা চুপ করে রইল, ঘোরতর অপরাধীর মতো। মনে মনে সংকল্প করল আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গী আর কোনদিন এ পথে, এ রকমে নয়। নগেনবাবু বললেন, 'দেশী খেলায়

প্রভৃত আনন্দ ও শরীর ভালো হয়। পয়সা লাগে না। সব জায়গায় খেলা যায়। কপাটি, চোরবন্দী, ডাংগুলি, ঝুল-ঝপাটি প্রভৃতি। এতে দেশের জিনিষগুলো বাঁচে, আর বিদেশে টাকাগুলো যায় না। দেশের টাকা বিদেশে পাঠানোয় সাহায্য করাও পাপ।'

নগেনবাবুর কথার ফল আংশিকভাবে ফলল। দেশী খেলা বজায় রইল। মরসুম বুঝে ক্রিকেট ও ফুটবল চলল। আনন্দ প্রকাশ ইংরেজীতে একদম বন্ধ হয়ে গেল।

সমের, ইউসুফ, ওসমান, জামালুদ্দিন ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার সাথী ছিল। মোহিনী, বসন্ত, নেংচা কৃশ্চান ছেলে। এরা কলকাতা থেকে নতুন নতুন এসেছিল। ফুটবল খেলায় এরা ছিল সেরা। সেসময় সে বয়সে ছেলেদের মধ্যে মমত্ববোধ এতটা ফুটেছিল যে, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কেউ কাউকে দেখত না। তেমন কুশিক্ষা তখনও এদের মধ্যে আসে নি। একসঙ্গে ফলমূল, জলখাবার, সরবৎ প্রভৃতি চলে যেত। জামালুদ্দিন ফিল্ডিং-এ চমৎকার। 'ক্যাচ' ধরায় ওস্তাদ। বলের সামনে থেকে সবাই ধরে, বলের পিছন দিক থেকে খপাস করে ধরত জামাল।

শহর থেকে গ্রামে যাওয়া এবং চাষাভুষোদের সঙ্গে মেলামেশা ছেলেদের একটা বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। মঙ্গলঘাটের মেলায়, কুলবেড়ের জাতে, ধল্লা-মথরীর আথমাড়াই উপলক্ষ্যে এরা খুব যাওয়া-আসা করত। পৌষ সংক্রান্তিতে মকরের মেলা তমলুক শহরেই লাগত। কপালমোচন তীর্থে স্নান করতে হাজারে হাজারে নানাদিক থেকে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়েরা আসত। সেদিন মনে হত—তাম্রলিপ্ত বুঝি বা আবার বেঁচে উঠল! ভিড়ে ভিড় সব দিক। বিশ্রামের দিন ফুরিয়েছে। বন্দরে বুঝি যাত্রীরা এসে নেমেছে। রাস্তার দুপাশে দোকানপাট সব রকমের জমকে উঠত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রহৃষ্ট অন্তরে বলতে থাকত—

"অশথগাছে, বটগাছে যুদ্ধ লেগেছে,
তেল-তামলীর মেয়েগুলি দেখতে লেগেছে।"

যাত্রীরা কত দিক থেকে কত কিছু দিতে এসেছিল। কত কিছু নিয়েও যাবে এইসব লোকেরা। আবার কি ভারত ও ভারতের বাইরের সঙ্গে ভাব ও লাভের আদানপ্রদান সুরু হল? কল্পনা পাখা মেলে সুদূর দিগন্তে ছুটত।

একদিন অতি সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মোরাদালি খাঁ এসে উপস্থিত। তিনি আমার পিতার সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। আমার পিতা খুব বিখ্যাত গাইয়ে ছিলেন। বাড়িতে খুব পান সাজার ধুম। তরিতরকারি কোটাও খুব চলছে। বুঝলাম আজ বাড়িতে বহু লোকের সমাগম হবে। বাড়িতে লোকজন আসা বালকবালিকারা স্বভাবতঃ ভালোবাসে। তারপর কি হবে না-হবে সেটা ধারণা করা তাদের শক্তির অতীত। অনেক লোক এলে মাসীমা, পিসীমা, কাকীমা, ঠাকুমা, অমুক বৌদি, অমুক দিদি, অমুক অমুক দাদা, জামাইবাবুরা নিশ্চয় আসবেন। 'খোকা, জল নিয়ে এস, পান

নিয়ে এস, পাল্কীর বেহারাদের খাইয়ে দাও, নুন পরিবেশন কর'—প্রভৃতি ফরমাস খেটে নিজেদের কৃতিত্ব ও দায়িত্ব মালুম করে হৃষ্ট হবে। সবচেয়ে আহ্লাদ, নতুন নতুন অনেক খেলুড়ী মিলে একসঙ্গে খেলা ও চিৎকার করার সুবিধা হবে। আমি এদিক থেকে সরে একেবারে গানের আসরে গিয়ে পেঁছালাম। খুব গান জমেছে। ওস্তাদজি ডান হাতে তানপুরা ধরে 'ন্যাও ন্যাও' ধ্বনি তুলছেন। মুখে গান ও তান চলছে। বাঁ হাত মাঝে মাঝে নাড়ছেন, সঙ্গে মাথাও। যে পাখোয়াজ বাজাচ্ছিল সে ঘাড় হেঁট করে দু-হাতে নানারকম বোল তুলতে তুলতে মাথা খুব বেশিই নাড়ছিল। খানিক খানিক অবসরে আসরসুদ্ধ সবাই মাথা নাড়াচ্ছে। ওস্তাদজি যেমন হাত নেড়ে বলে উঠছেন, 'হাঁঃ', তখন তো আর কথাই নেই। সব শ্রোতা নির্বিশেষে মাথা ঝুঁকিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন আমি জানতাম না যে মহৎ আসরে এলে সবাই তার কাছে মাথা হেঁট করে। তাল বা সম্ হচ্ছে সেই মহৎ। তাই এতজনের অভিবাদন।

আমি খানিকক্ষণ বসে দেখে রস না পেয়ে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। সুবিধা হল না—বসেও না, দাঁড়িয়েও না। কথা ও সুর, কিছুই বুঝছিলাম না। হিন্দী ভাষায় গান—ওস্তাদী সুরে গাওয়া। দুটোর কোনটাই বোঝার মতো বয়স বা অধিকার তখনও আমার হয় নি। আমার মনে হল সব যেন কেমন-কেমন। ভাবছিলাম, সবাই খালি খালি এত মাথা নাড়ছে কেন? গান শুনবে, শোন। বাজনার আওয়াজ কানে পুরবে, পোর। কিন্তু মাথা নাড়ানাড়ি কেন? ওস্তাদজি গাইছেন। তিনি মাথা না হয় নাড়তে পারেন। পাখোয়াজি গানের সঙ্গে বাজাচ্ছে। আচ্ছা, না হয়, সেও মাথা দোলালো। কিন্তু বাকিদের তো কোন কৈফিয়ত নেই। হাসি থামাতে না পেরে অবশেষে অন্দর বাড়িতে চলে গেলাম এবং খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙতে পূর্বরাত্রের কথা মনে পড়ায় আবার খানিক হেসে গড়াগড়ি দিলাম। বাউল সুরে গাওয়া 'মন তোতাপাখি, একবার রাধাকৃষ্ণ বল দেখি' শুনে বুঝতে পারতাম। সুখও হত। ওস্তাদজি কী এক অপরূপ সুরে কী এক অবোধ্য ভাষায় গাইছিলেন, 'উমড়ি ঘুমড়ি ঘন গরজে'। মোরাদালি খাঁ মালকোষ রাগের অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নুলোগোপাল, আমার পিতা, ময়ূরভঞ্জের রাজগায়ক যদু রায় প্রভৃতির যশ দেশে ছেয়ে গিয়েছিল। তা হোক আমি 'মন' কথাটা বুঝতে পারতাম। তোতাপাখিও দেখেছি। রাধাকৃষ্ণের নাম ও চেহারা আমার পরিচিত ছিল। সুতরাং যে সুর শুনে আনন্দ জাগে, যে গানের কথা বোঝা যায় এবং যা শুনে স্রোতের সঙ্গে চলা যায়, তাই তখন আমার মতে সঙ্গীত। এই কষ্টিপাথরে কষে ওস্তাদজির গান নীরস, বিস্বাদ পেলাম। খানিক বেলা হতে বৈঠকখানায় দেখতে গেলাম—আবার গানবাজনার ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? দেখলাম সে সবের এখন কিছু নয়। খাঁ সাহেব একলা বসে আছেন। সাগরেদের ছেলে, নাতির

তুল্য। আদর করে হিন্দুস্থানী বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল কেমন গান হোলো ?'

আমি বিনা দ্বিধায় রায় জাহির করে দিলাম—কাল গান ভালো লাগে নি। শুনে ওস্তাদজি হেসে কুটোকুটি। প্রবীণ লোক—বুঝলেন গলদটা আমার কোথায়। তখন আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা বাংলায় হালকা সুরে গাইলেন—

'সে কেনো বোলে গেলো
আসি বোলে, আশা দিয়ে, আর নাহি ফিরে এলো।'

পরে প্রশ্ন করলেন—'এবার কেমন হোলো ?' এবার আমার আপত্তি করার মতো কিছু ছিল না। সবই এবার বুঝেছি। বরং আমায় বিশেষ করে আলাদা একটা গান শুনিয়েছেন ওস্তাদজি। এই গরিমায় আহ্লাদে আটখানা হয়ে মায়ের কাছে স্বর্গের চাঁদ পাওয়ার কথা বলতে ছুটলাম। যাবার আগে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে গেলাম, 'কাল কেন এমন গান গান নি ? সবাই সুখ্যাত করত। ভালো বলত ?'

পূর্বদিন বেশী রাত্রে ওস্তাদজির মালকোষ নাকি এমন উতরেছিল এবং জমেছিল যে, তেমন গান ক্বচিৎ-কদাচিৎ লোকে শুনে থাকবে। শ্রোতাদের মুখে বাহবার অন্ত ছিল না। হাসির মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে ওস্তাদজি আমার পিতাকে না বলে পারেন নি—'তুম্‌হারা বেটা মেরা আচ্ছা তারিফ কিয়া।' অর্থাৎ তোমরা তো ধন্য-ধন্য করছ ; কিন্তু তোমার ছেলে আমার কেমন প্রশংসা করেছে জান ? বুঝেছে—'আমি ভাল গান গাইতে পারি না।' আমার সমঝদারিতে দুজনে খুব খানিকটা হাসলেন।

তমলুকে আনন্দের হাটে ভাঙ্গন ধরল। ভেকু একদিন এসে বলল, 'হোর-মিলারে'র স্টেশনমাস্টার স্মরণ করেছে। 'কেন ?'—জিজ্ঞাসা করলাম। ভেকু উত্তর করল, 'তাও বুঝি জান না ? শহরে 'চলোরে' এসেছে। হরিসভা জাঁকাতে হবে। সংকীর্তনের দল বার করতে হবে।' বুঝলাম কলেরা আরম্ভ হয়েছে এবং খুব লোক মরছে। স্টেশনমাস্টার হরিসভা-বিশ্বাসী। ভেকুর কথার ঢং-ই ছিল ঐরকমের। আমাদের কিছু ওপরের থাকের ছেলেরা একটা নীতিসভা করেছিল। ইংরেজী স্কুলের পুকুরঘাটে রবিবার তার অধিবেশন হত। নতুন কিছু হলে তার সম্বন্ধে ছেলেদের কৌতূহল জাগে। আমাদের অধিবেশনে যাবার হুকুম ছিল না। বন্ধুদের কাছে প্রস্তাব করলাম যেমন করে হোক একবার নীতিসভায় যেতে হবে। যদি ওটা ভালো জিনিষ, তবে বড় ভাইরা ছোট ভাইদের যেতে দেবে না কেন ? ভেকু প্রস্তাবটি মাঠে মেরে দিল। সে বলল, 'দূর, দূর। কতকগুলো অসভ্য মিলে করেছে নীতিসভা। ওখানে না যাওয়াই ভালো।'

হঠাৎ আর একদিন খবর এল জামালুদ্দিন কলেরায় মারা গেছে। সব ছেলের মন শোকে, বিষাদে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। জামালুদ্দিন যে তাদেরই একজন। ছেলেদের জাত নেই ; ধর্ম নিয়ে গোল নেই। খেলা আর ভালো লাগে না।

আপনা-আপনি খেলা বন্ধ হয়ে গেল। আমার একটি স্নেহময়ী ভগ্নী মারা গেল। শোকে আমার মা-বাপ খুবই কষ্ট পেলেন। হেডমাষ্টার রাজেনবাবু দার্জিলিঙে বদলি হয়ে গেলেন। ঠাকুমা, সিধু-নিধুও সঙ্গে গেলেন। তখন ছেলেরা ইস্কুলবাড়ি ও খেলার মাঠের দিকে তাকাতে পারত না। যেন পাখিগুলোও স্ফূর্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। বুলবুল, কোকিল, দোয়েল, শ্যামা, ভরতপাখিও আর তেমন মিষ্টি ডাকে না। প্রজাপতি, রঙ-বেরঙের ফড়িং, টুনটুনি, বাবুইপাখি তেমন আর মন আকর্ষণ করে না। গাছের ফুলগুলোও যেন ম্লান, শ্রীহীন, শোভাহীন হয়ে গিয়েছিল। এই সময় অনেকগুলি পরিবার তমলুক ছেড়ে মেদিনীপুর বা কলকাতা চলে গেল। আমরাও। যারা মরে গেছে তাদের কথা জিজ্ঞেস করলে এবং তারা কি আর আমাদের কাছে আসবে না জানতে চাইলে মা বলতেন, 'তারাও আছে, আর এক জায়গায় আছে। জান না? তারা প্রভাত সূর্যের কিরণ দিয়ে হাসে, রাত্রের বৃষ্টিতে কানে-কানে কথা কয়, ফুলের চোখ দিয়ে চেয়ে দেখে। পরিষ্কার নীল আকাশ থেকে উঁকি মারে।'

আমার এক কাকা এসে আমার মা ও ভাই-বোনদের নিয়ে কলকাতার বাড়িতে চলে গেলেন। বাবা আমাকে বললেন, 'তুমি যাবে, না থাকবে? যেতে চাও তো যেতে পার। যদি থাক তবে নতুন ব্যাট্-বল কিনে দেব।' আমি একটা দিক দেখেছিলাম, সেটা আমার নিজের দিক। আমার বাপেরও যে একটা দিক আছে সেটা আমি ধরতে পারি নি। মা, ভাই-বোনেদের ছেড়ে থাকা একটা শক্ত কাজ। শক্ত বলেই ওটা করতে হবে। এই কথা জাগল আমার প্রাণে। ব্যাট্-বল অত বড় ঘুষ নয়। আমার বাপও একজন মানুষ। সবাইকে একসঙ্গে বিদায় দিয়ে একলা থাকায় মনের যে উৎকট উপবাস চলবে তার একটা উপায় উদ্ভাবনের ফিকির ঠাউরে আমাকে ব্যাট্-বলের কথা বলেছিলেন। বীরের মতো মা, ভাই-বোনেদের জাহাজে চড়িয়ে ফিরে এলাম। কেন একলা থাকতে পারব না? একলা থাকা এমনই বা কি? বাবা তো আছেন। আর আছে বন্ধু, সোদরোপম দোসর—সুরেন।

বাবা চলে গেলেন আদালতে। তাঁর পেশা যে ওকালতি। তখন ওপরে দোতলায় গিয়ে আমার হল এক নতুন অনুভূতি। গোটা বাড়িটা যেন গিলতে আসছে। খানিকটা এঘর-ওঘর করলাম। তারপর নদীর দিকে চেয়ে জানলার কাছে বসে রইলাম। জানলার ছিটকানির উপর হাত আপনা-আপনি চলে গেল। সারেঙের মতো এইটে ঘুরিয়ে মনে মনে জাহাজ চালাতাম। দূরে যতদূর চাই—রূপনারায়ণের জল—খালি জল। ওপার চোখে ঠেকত না।

তিনদিন হয়ে গেছে। মায়ের জন্য মন-কেমন-করা বাড়ছে বই কমছে না। আপনা-আপনি বুকের কাছটা কেঁপে কেঁপে উঠত। একটা অব্যক্ত বেদনা বা যন্ত্রণা

হৃৎপিণ্ডটাকে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইত। থেকে থেকে অকারণে চোখ উপচে জল বেরিয়ে আসবার উপক্রম হত। অনেক করে সেটাকে চাপতাম। চোখকে তিরস্কার করতাম, এমন করে আমাকে বাপের সামনে খেলো করে দেওয়ার চেষ্টার জন্যে। অবশেষে একদিন বাবার অনুপস্থিতিতে খালি ঘরে জানলার ধারে বসে হাপুস নয়নে নদীর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম, ঐ-যে অনেক দূরে কালো মেঘের মতো আকাশে কি একটা ভাসছে। ওটা বোধ হয় 'ডগলাস' জাহাজের ধোঁয়া। এই হতভাগা জাহাজটাই আমার যত দুঃখের মূল। এটাই তো আমার মা, ভাই-বোনেদের নিয়ে চলে গিয়েছিল। ছোট ছেলের মনে কষ্ট দিয়েছে বলে হয়তো তার অনুতাপ হয়েছে। আজ বুঝি সেইজন্য মা, ভাই-বোনেদের ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। যদি অমন করে আসছে, তবে আসুক তাড়াতাড়ি যতটা পারে। এই ভেবে খুব জোরে জানলার ছিটকানি ঘোরাতে লাগলাম। আকাশে যা অল্প কালো ছিল সেটা গাঢ়তর কালো রূপ ধারণ করল। আগে মনে মনে বলছিলাম, পরে মুখেও বলতে লাগলাম—ফুল্ ফোর্স। তাতে বোঝাচ্ছিল যেন ডগলাস কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। হাওয়ায় ক্রমশঃ সোজা ধোঁয়ার লাইন বেঁকে হেলে পড়ল। একটা আয়তনে ছিল, হয়ে গেল টুকরো-টুকরো, খণ্ড-খণ্ড। অবশেষে ফিকে হতে হতে দৃষ্টিরেখা থেকে অপসৃত হয়ে গেল। অমনি ঝর্ ঝর্—চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। ক্ষণিকেই কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে ফেললাম। নাঃ, আমি তো কাঁদি নি। কান্না আপনি আসছিল। বাবার কাছে কি করে মুখ দেখাব—যদি কাঁদি? ভাবছি কি করব, হঠাৎ মনে পড়ে গেল বালগঙ্গাধর তিলকের কথা। বাবার কাছে শুনেছিলাম মহারাষ্ট্র দেশে একজন খুব পণ্ডিত, তেজস্বী এবং ভালো লোক জন্মেছিলেন। নাম তাঁর বালগঙ্গাধর তিলক। বোম্বাইয়ে ১৮৯৭ সালে প্লেগ হয়। সে সময় কি একটা কড়া আইন চালাতে গিয়ে র‍্যাণ্ড নামে এক ইংরেজ ভারতীয় গরীব জনসাধারণের উপর খুব জবরদস্তি করেছিলেন। অত্যাচারিতদের কাতর অনুনয় ও চোখের জলের বনমালী ও দামোদর চাপেকার, দু-ভাই প্রতিশোধ নিয়েছিল। সেই সম্পর্কে চাপেকারদের প্রতি সহানুভূতি করায় তিলকের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বাবা মাকে এই কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন। ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পরে মা পূজার সময় ঠাকুর-প্রণাম করতে করতে বলছিলেন, 'দেখো দয়াময়, আমাদের সাধের তিলক যেন অকালে অন্ধকারে না মুছে যায়।' প্রণত মাথা তুলতে দেখতে পেয়েছিলাম মার চোখে জল। 'মা তুমি কাঁদছ কেন?' প্রশ্ন করায় তাড়াতাড়ি জল মুছে তিনি বলেছিলেন, 'তুমিও ভগবানকে ডেকে এই কথা বোলো। কি জানি, আমাদের চেয়ে ছোট ছেলেদের কথা হয়তো তিনি তাড়াতাড়ি শুনতে পারেন।' আমি সাল-তারিখ ভুলে গেছি। মনে হচ্ছিল তিলক আজ জেলে। একা। আবদ্ধ। যাদের তিনি ভালোবাসতেন, যাদের

ছেড়ে একা থাকতে পারতেন না, তাদের কাছ-ছাড়া হয়ে রয়েছেন! কি খাচ্ছেন? কোথায় শুচ্ছেন? পরতে কি দিয়েছে? যদি মন-কেমন করে, কে তাঁকে বোঝাবে? তিনি কি কাঁদছেন? বোধ হয় না। অনেক বড় যে তিনি। আজ আমি যে তাঁর মতো আবদ্ধ। বাড়িটাই হয়ে গেছে জেলখানা। মনে হল—তিলক মহারাজ, তুমিও একা, আমিও একা। দুজনেরই এক দুর্দশা। তোমার ছেলেপুলের জন্য হয়ত তুমি ভাবছ? আমার জন্য কি ভাবছ না? আমিও যে একটি ছোট ছেলে। আমারও যে আজ সব থেকে কেউ নেই! তাদের আশীর্বাদের সঙ্গে কি আমায়ও আশীর্বাদ করছ না? তারপরই মায়ের উপদেশ মনে হল। করজোড়ে প্রার্থনা করলাম—ভগবান, আমার মতো আর যেন কেউ কষ্ট না পায়। আমাদের তিলক যেন অকালে মুছে না যায়। এই কোরো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলকাতায় এলাম। আসার আগে বাবার সঙ্গে মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলগুলো খুব ঘুরে এসেছি। শিখে এলাম সাঁওতালী ভাষা আর তিরন্দাজী। পরে আর একবার গেলাম স্কুল ছেড়ে নানা দেশে। এবার ছোটনাগপুর ও ছত্রিশগড় ঘুরে আসা হল। আসা হল আমার পিতামহীর নির্বন্ধাতিশয্যে। তিনি পণ করে বসলেন, 'আমার বংশে জ'ন্মে লেখাপড়া না শিখে, পুজারী বামুন, রাঁধুনী বামুন হয়ে থাকবে?' অমনটা তাঁর প্রাণে সইবে না। তাঁর ঘেন্না বাঁচাতে তিনি নাতিকে ধরে আনলেন এবং ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তিনি অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। সংস্কৃত ভাগবত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষা নিন্দনীয় থাকায় ভাইয়ের বই লুকিয়ে পড়ে পড়ে বিদ্যালাভ করেন।

এবার একরকম পাকাপাকিভাবে কলকাতাবাসী হতে হবে। উড়োপাখিকে খাঁচার পাখি করলে তার যে দশা হয়, আমারও তাই হল। ১৮৯৯ সালে কয়েক মাস 'ডাফ কলেজিয়েট স্কুলে' পড়লাম। ১৯০০ সালে কিছুদিন পড়ে আবার অন্তর্ধান হই। আবার আমাকে ১৯০২ সালে স্কুলে দেখা গেল।

এই ক'বছরের অভিজ্ঞতা ভারী দামী। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব হল। কোথায় তমলুকের সুরেন, অন্নদা, ভেকু, সিধু, নিধু, জানকী সিং আর কোথায় যতে, ভীমরাজ, গোকুলে, ট্যারা, বেঁটো, গোবে, পিকে ইত্যাদি! তারা তো প্রথমটা আমাকে আমলই দেয় না। 'হংসমধ্যে বকঃ যথা' নয়; দেখলাম, আমি বকমধ্যে কাকঃ যথা। ভীমরাজ বলল, 'ধেৎ, তোকে মোটেই মানায় না। বড্ড পাড়াগেঁয়ে চেহারা। গানটান জানিস?' যা জানতাম তাই বললাম, 'ঐ সিংহপৃষ্ঠে মহামায়া' —বন্ধুরা পাস করল না। কথা ও সুর দুই-ই অচল। তারপর হল, 'বল, মন্থরা কিসের তরে ধরায় প্রেয়সী'। এটা মজাদার বটে। তবে পাড়াগাঁয়ে চললেও এখানে চলবে না। 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই' শুনে বলল—এটা বুড়োদের গান। গঙ্গাপানে পা হলে চলবে। তারপর হল—'ওহে দয়াময়, আর এ সময়'। 'দূর দূর, এও একটা গান? বজ্রসংহারের রাখাল বালকের গান, কিম্বা 'এবে লেটুয়া' জানিস?' আমি বললাম, 'না'। তারপর প্রশ্ন—'দুর্বাসার পারণের কোন গান?' উত্তর দিলাম 'না'। 'আলিবাবার?' বললাম, 'ওর নাম কোনোদিন শুনি নি।' বিরক্ত হয়ে বন্ধুরা বললে, 'দূর, ঘোড়ার ডিম! এ ছোঁড়া একদম অচল।' ভীমরাজ করুণাপূর্ণ হল। দু-চারদিন আড়ালে-আবডালে আমাকে শেখালে—'ফোটে ফুল শুকনো ডালে'। পরে একদিন গাইলাম এ গানটি। শুনে বন্ধুরা মাৎ। তারিফ করে বলল,

'এই তো রাজা, আঁধার মাণিক ! দর বাড়াচ্ছিলে বুঝি ?'

তারপর কামাবার জন্য রমানাথ নাপিত আসতে তাকে নির্দেশ দিল, 'মাথার চুল দশ-আনা ছ-আনা, বুঝেছ পরামাণিক ? এর চেয়ে ছোট-বড় করলে বাড়িতে বকবে। হাড়ীখাঁর দোকানের জুতোয় চলবে না। চাই ডসন্, অভাবে ল্যাটিমার ক্রিক্।'

সতে বলল, 'কিছুই ভাবনা নেই। দিনকতক বালাম চাল পেটে পড়ুক, তারপর গ্যাসের আলো আর কলের জল বাকিটা করে নেবে।' তখনও কলকাতায় সর্বসাধারণের জন্য ইলেকট্রিক লাইট হয় নি। সন্ধ্যের সময় হাওড়ার পোল, হ্যারিসন রোড এবং ইডেন গার্ডেনে বিজলি-বাতি জ্বলত। কেউ জ্বালাচ্ছে না, আলোওলা মই ঘাড়ে করে ছুটছে না। আপনা-আপনি পটপট করে আলো জ্বলে যাচ্ছে। এক অভিনব ব্যাপার। এই সন্ধ্যার আলো-জ্বলা দেখতে কত ছেলেবুড়ো উপরোক্ত তিন জায়গায় গিয়ে হাজির হত। হাওড়ার পোলে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ অবাক হয়ে গাইত—'কি কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানী'। কেউ বা ধরত—'ইংরেজের কি বুদ্ধি বল্ ? পোলের নিচে বইছে জল'।

অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের তরফ থেকে কিছু সতর্কবাণী এল, 'হতভাগা, বকাটে, ইয়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না। পায়রা ওড়ানোতে যোগ দেবে না। বার্ডসাই কেউ খেতে বললে খাবে না। রাস্তার দুদিক না দেখে পার হবে না। ফুটপাথ বই চলবে না। কোনও অচেনা লোক কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে যাবে না। ওরা ছেলেধরা। ধ'রে মরিচ শহরে চালান করে দেবে।' পরে জানা গিয়েছিল 'মরিচ শহর' হচ্ছে—মরিশাস দ্বীপ।

ভয়ে, ভক্তিতে, ভাবনায় আমার শহুরে জীবন আরম্ভ হল। আরম্ভটার আরম্ভ বড় মধুর ভাবের। তমলুকে থাকতে সকালে ঘুম ভাঙতে না-ভাঙতে দুজন লোক এসে সদরে দাঁড়িয়ে থাকত। তারা দোকানদার। আমায় নিয়ে গিয়ে একবার করে নিজের নিজের দোকানে বসাবে। এই থাকত তাদের অভিপ্রায়। আমার এমন পয় যে বসলেই ভালো বউনি হয়। শশী মালের খাবারের দোকান। শিবু বেনের মনিহারী দোকান। এক এক দিন মালেতে এবং বেনেতে লেগে যেত লড়াই—আমাকে কে আগে নিয়ে যাবে। আমি তমলুক থেকে কলকাতায় যখন আসি শিবু আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে অঙ্গীকার করে সঙ্গে নিয়ে আসে। তার শ্বশুরবাড়ি ছিল কলকাতায়। কিন্তু যে চারদিন সে কলকাতায় ছিল সে-চারদিন সে আমাকে নিজের শ্বশুরবাড়িতে রেখে দেয়। আমাদের বাড়িতে দিয়ে আসে নি। শিবুর শাশুড়ী ও স্ত্রী আমাকে এত যত্ন করতেন যে আজও সে কথা ভুলতে পারি নি। পরবর্তী জীবনে অনেক উত্থান পতন হয়েছে। যখন চারিদিকে বিপদ, ধর্ষণ ও উদ্দণ্ড রাজরোষ ছাড়া কিছু ছিল না, তখনও কোথা হতে এই 'মা ও বোনের'

সহানুভূতির পরশ অযাচিতভাবে এত পেয়েছি যে তার ইয়ত্তা হয় না। মনে মনে, অবসর কালে যখনই জীবনের পাওয়া আর খোয়ানোর কথা সবিস্তারে দেখি বা ভাবি, সবচেয়ে উঁচু হয়ে ওঠে একটা কথা—সেটা হচ্ছে বাংলা, তথা ভারতের মা-বোনদের অকাতর অবদান। জীবনে যদি ভারতকে নিয়ে গৌরব করার কিছু পেয়ে থাকি তবে তার অধিকাংশই হচ্ছে মাতৃজাতির দান। মনের জগতে এঁদের তুলনা নেই। কারণ তাঁদেরই বেষ্টনীতে সে জিনিষটা গড়ে উঠেছে। আজ শিবু নেই। তার স্ত্রী ও শাশুড়ীর সংবাদ জানি না। কিন্তু তাদের মাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বাড়ির কাছে ছেলে এসে যদি বাড়ির কথা মনে করতে না পারে, তবে তা এই দুজনের কতবড় গুণপনা? বাইরের মা ঘরের মাকে প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিল। বাইরের বোন ঘরের বোনকে ছায়া দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। এ দুটি যেন ছিল নমুনা। পরে যেখানে যখন মা-বোনের স্পর্শ প্রাণে পেয়েছি, এঁদেরই যেন তাদের ভিতর দেখেছি। অথবা বিরাটই যেন মা এবং বোন হয়ে আমার সামনে বার বার উপনীত হয়েছেন। তাঁদের ঋণ শোধ হবার নয়। ঋণের বোঝা যদি কিছু লাঘব হয় এইজন্যে তাঁদের কথা উল্লেখ করা। আমার বাবা মেয়েদের সম্মান করার এই মন্ত্র আমায় শিখিয়েছিলেন—

'পুংরূপাং বা স্মরেৎ দেবীং,
স্ত্রীরূপাং বা বিচিন্তয়েৎ,
অথবা নিষ্কলাং ধ্যায়েৎ
সচ্চিদানন্দ লক্ষণাম্।'

মহাদেবীকে পুরুষই ভাব, স্ত্রীরূপেই বা চিন্তা কর, অথবা স্ত্রী-পুরুষের অতিরিক্ত বলেই ভাব—তিনি সচ্চিদানন্দরূপিণী।

কলকাতায় প্রথম-প্রথম শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। কেউ বলত জায়গা-বদল, কেউ বা বলত নতুন জল, কেউ বলত বাড়ন্ত বয়স, কেউ বলত বুনো পাখিকে পোষ মানাবার ফল। পাড়াতে আমাদের নাম, যশ, খাতির-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। কলকাতার ছেলের মতো চালচলন নয়, নিতান্ত সাদাসিধে বলে পাড়াপড়শীদের সহানুভূতি খুব পেতাম।

শরীরটা খুব শীর্ণ হয়ে পড়েছে, রঙ ফ্যাকাসে, মনে স্ফূর্তি নেই, দেহ ক্লান্ত। একলা একদিন রাস্তার ধারে পাড়াতেই একজনের বাড়ির রোয়াকে বসে ছিলাম। বুল্টু নামে একটি ছেলে আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কি মাস্টার, এমন বিরস বদনে বসে যে?' বললাম, 'অসুখ।' বুল্টু হেসে বলল, 'আজকের বাজারে কার মনে সুখ আছে, রাজা? রোগ কি গায়ে মেখে থাকতে আছে? একে নেচে-গেয়ে ভাসিয়ে দিতে হয়।' আমি একটু শুকনো হাসি হাসলাম।

এ ধাঁচের ছেলে আমি পূর্বে কখনও দেখি নি। 'বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্ নব পুরুষরতন' গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে বুল্টু চলে গেল। সে নতুন নতুন সখের থিয়েটারে যোগ দিয়েছিল। গোবিন পাল আমাকে নতুন দেখে বুল্টুকে দূর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছেলেটি ঝুরো লসেই বা কোথায়? কুপোকাৎ করেই বা কোথায়?' কি রাক্ষুসে ভাষা! বুল্টু উত্তর করল, 'মাস্টারমশাইদের বাড়িতে। এ মাস্টারমশাইয়ের ভাইপো।

খানিক পরে পাড়ার পাক-সাঁড়াশী মশায় পথে যেতে যেতে এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে কাছে এসে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'কি গো বাবু এমন মিইয়ে গেছ কেন বল তো? কি হয়েছে?'

বিনীতভাবে আপনার অসুস্থতার কথা জানালাম। একটুতেই সর্দি লেগে যায়, এই হচ্ছে আসল দোষ।

পাক-সাঁড়াশীমশাই বললেন, 'ওঃ, ব্যাপারখানা এই? তা এর জন্য মনখারাপ করার কি আছে? আমি দেখছ না শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার পরোয়া করি? রোজ ন-আনার ধান্যেশ্বরী উদরস্থ করি। তুমি ন-পয়সা খরচ কর না?'

পাক-সাঁড়াশী বা পাকড়াশীমশায় বিখ্যাত মাতাল ছিলেন। একদিন তিনি মৌজের মাথায় কলকাতার কোন এক বিজ্ঞ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে বসেছিলেন, 'বল তো ডাক্তার, আমার ছাগল কি ঘাস খায়?' ডাক্তার হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, মাটি খায়।' সেইদিনই তাঁর উড়বার সখ হয়। ছাতের আলসে থেকে— 'আমি উড়ছি বাবা' বলে পাখির ডানা নাড়ার অনুকরণে দুটি হাত নাড়তে নাড়তে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। উড়েছিলেন। তবে ওপরদিকে না গিয়ে মাটিতে এসে পড়েছিলেন।

তমলুকে থাকাকালীন এ ধরনের উপদেশ কেউ কোনোদিন আমাকে দেয় নি। সেও একটা শহর। কলকাতাও একটা শহর। কিন্তু কি পরিবর্তন দুটো জায়গায়। সেখানে ইয়ার ছেলে, বকাটে ছোঁড়া, বার্ডসাই খাওয়া শুনি নি। এখানে দাঁ-দের মেজকাকী যখন বলছিলেন, 'শেঠদের হেবোটা কী হলো গো! বাদসাই খায়, ইস্কুল পালায়।' প্রথমে কথাটা ধরতে পারি নি। পরে বুঝেছিলাম বার্ডসাই খাওয়া মানে সিগারেটের মসলা পাতলা কাগজে ঢেলে সেজে খাওয়া। বার্ডসাই নামে পেটেন্ট কুচো তামকূট বা সিগারেটের মসলা বাজারে মিলত। তৈরী সিগারেট, এখনকার মতো তখনও, মোটা কাগজের বাক্সের মধ্যে বিক্রি হত। বার্ডসাই সস্তা হত। তমলুকে ছাত্রদের এ কু-অভ্যাস জানতাম না। অবশ্য কৃষকশ্রেণীর ছাত্ররা অনেকেই তামাক খেত।

মনটা অতীতের সুখস্মৃতির দিকে ঝুঁকল। রূপনারায়ণের ধারে, ঝুমঝুমির কথা মনে পড়ল। সেখানকার সেই চড়াটা। যেখানে কাশফুল, শরের জঙ্গল, হোগলার বন হাওয়ায় হেলে-দুলে কত আনন্দ দিত। আকাশে মাথার উপর কত চিল চক্র দিত। শংকর চিল—লাল গা, সাদা গলায় টাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে ডাকত। নৌকা ঢেউয়ে দুলে-দুলে উঠত। সাদা পালগুলি হাওয়ায় ফুলে উঠে টান ধরলে মন্থর গতিতে নৌকাগুলো চলত। তা দেখে গল্পে-পড়া পেটুক গণেশের চেহারা মনে উদয় হত। চিত্ত হৃষ্ট হ'ত। 'ভোজনেতে বড় পটু, ডাগর উদর', এইটাই যেন উদাহরণ দিয়ে দেখাবার জন্য, পালে-বাওয়া নৌকা আমার সামনে কেউ চালাত। আপন মনে কত হাসতাম। নৌকাটা বেজায় খেয়েছে তাই চলতে পারছে না। ধীরে চলেছে। ভাটায়-জাগা বালুর চরে কতরকম পাখি তাদের প্রাত্যহিক গুলতানি করত। আবার জলে-ভাসা অপর বহুরকমের পাখিরা তাদের দৈনন্দিন মেলামেশা ও কলরবে দিঙ্মণ্ডল মধুময় করত। খড়হাঁস, বালিহাঁস, গাঙচিল, শামখোল, বেগড়ী, খঞ্জন, চকাচকি, পানকৌড়ি, মাছরাঙা—আরও কত কি! আমার পিতা কোন একটা ছুটিছাটায় অবকাশ করতে পারলেই সপরিবারে বনভোজনে আসতেন। পাড়াপড়শীরাও অনেকে সঙ্গে আসতেন। সে যেন এক নতুন সৃষ্টি, নতুন আনন্দ নিয়ে সদ্যস্নাত জলোদ্গত চড়ায় আপনার বিকাশ প্রকট করত। মন্ত্রজালে যেন বরুণের পুরী থেকে লোকজন এসে এখানে হাসি-খেলা, গান-গল্পের মেলা লাগিয়েছে। দিনভর্তি এখানে আমোদ-প্রমোদে আকাশ-বাতাসসুদ্ধ উজ্জ্বল। সন্ধ্যায় দীপ নির্বাণ। মন্ত্রের মতো সব কিছু মিলিয়ে যাবে। নিরানন্দ ও অন্ধকার সব জায়গাটাকে দখল ও গ্রাস করবে। আজকার যা কিছু সব লয়প্রাপ্ত হবে। কাল আর কিছু থাকবে না।

ষষ্ঠীকাকা বলেছিলেন, 'যাদের নদীর ধারে চাষ, তাদের ভাবনা বারো মাস। হয়তো ভালো, নয়তো মন্দ, নয়তো সর্বনাশ।' কিন্তু সত্যই কি তাই? পুনরায় একদিন মানুষের হাত এসে কি নবজাগরণের সব দিককে উদ্ভাসিত করবে না?

মনে হল লক্ষ্মীদি, উলাদি. অনিলা, প্রমীলা, বসনের কথা। মনে হল রক্ষিতদের সেই বৌটি, যে একলা ছাতের ঘরে থাকত। বাড়িতে সবাই আমোদ-আহ্লাদ করত। কিন্তু সে থাকত সব থেকে বিরত হয়ে। তার কথা বিশেষ করে মনে হল। কারণ আমার মা তাকে মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে আসতেন। এখানে তারও মুখে হাসি দেখা দিত। আমি পরে বুঝেছিলাম, সে ছিল বিধবা। অনিলা, প্রমীলা মা-মরা মেয়ে। নিজেদের মাকে শৈশবে হারিয়েছে। আমার মায়ের মধ্যে তারা নিজেদের মা পেয়েছিল। তারা যে আমার বোন নয় এ কথা ভাবতেই পারতাম না।

বসন সুরেনের বোন। সে অনেক সময় সুরেন ও আমার খেলাধুলায় গোঁয়াতুর্মির কথা জানতে পারলেও দুই পরিবারের অভিভাবকদের কাছে প্রকাশ করে

দিত না। একদিন বোলতার চাক ভাঙতে গিয়ে সুরেন ও আমি কিছু গুনাগারি করেছিলাম। বোলতার চাক ভেঙে নিয়ে আমরা বড়দের অনুকরণে মাছ ধরতে চলে গিয়েছিলাম। বসন আমাদের অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যেখানে চাক ভাঙা হয়েছিল সেদিক সে পার হচ্ছিল, এমন সময় ক্রুদ্ধ একটা বোলতা তাকে কামড়ায়। জ্বলুনিতে সে অস্থির হয়ে আমার মায়ের কাছে আসে। তিনি ওষুধ লাগিয়ে তার কষ্ট নিবারণ করেন। রূপো বলে ছোঁড়া চাকরটা বসনকে চাক ভাঙার কথা বলে দেয়। সে এ ব্যাপারটা জানত। বসনের রাগ হল দু'কারণে। প্রথমটা, তাকে না জানিয়ে আমরা এতবড় একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার করেছি। দ্বিতীয়তঃ, পরের দোষে বোলতারা তাকে শাস্তি দিল। দুটো ওজন করে প্রথমটাই তাকে বেশী ব্যথিত এবং বিদ্রোহী করেছিল। অনেক কথা সে জানত। কত দোষ সে লুকিয়ে রেখেছিল। তার কাছে এটা গোপন করা কেন? রুষ্ট মনে ঘুরতে ঘুরতে সে খবর পেল তার ভাই-দুটি রূপনারায়ণের ধারে তাদেরই খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসেছে। এক দণ্ডে ছুটে গেল। তাদের অপকর্মে লিপ্ত দেখে রুদ্রমূর্তিতে ভয় দেখিয়ে বলল, এখনই সব কথা তার মা ও জ্যাঠাইমাকে বলে দিতে যাচ্ছে। আমার মাকে সে জ্যাঠাইমা বলত। বসন বিদ্যুতের মতো ছুটে বাড়ির দিকে চলে গেল। তাকে কথাগুলো সামলে নিতে বলবার অবকাশ আমরা পেলাম না। অপকর্মটা কি? মাছধরা তো একটা বটেই। তার চেয়ে দুর্জয় অন্যায় আরও দুটো এইসঙ্গে হয়ে গেছে। বোলতার চাক ভাঙা—এক নম্বর। দু নম্বর—সম্প্রতি রূপনারায়ণে জোয়ারের জোর অত্যধিক হয়েছে। অনেকদিন তীর উপচে এসে এ পুকুরটাও ডুবে যায় সেই জলে। লোকে ভয় পায়, কুমীর জোয়ারে এসে ভাটায় বেরিয়ে না গিয়ে এইরকম স্থানে থেকে যেতে পারে। কুমীরের আড্ডা অতটা জোর জোয়ারের মধ্যে থাকে না। কুমীর যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে সে রসগোল্লার মতো স্বোয়াদী মানবসন্তানকে পেলে সে কি ছেড়ে কথা কইবে? বসন গিয়ে মায়েদের কাছে বলে দিল—তাঁদের দুটি গুণের ছেলে কুমীর শিকার করছে মাছধরা ছিপ, বঁড়শী ও ফাৎনা নিয়ে, রূপনারায়ণের ধারে। এর পরে আর কিছু কি বলতে হবে? যমের মুখ থেকে আচমকা ছেলে ফিরে-পাওয়া ভয়াতুর মায়েরা যা করে থাকেন, আমার ও সুরেনের সম্বন্ধে আমাদের মায়েদের তরফ থেকে তার অন্যথা হল না।

বসনের সঙ্গে কথা বন্ধ হল। কুমীর যদি আমাদের খেয়ে ফেলত তো তাতে তার কি? তার মতো ভীতু আমরা হব না।

বসন নত হল, মাফ চাইল। ভাইফোঁটায় বেশী খাওয়াবে বলল। তবু আমরা তাকে ঠেলে সরিয়ে, 'নিজেরা ভীতু, অন্যদেরও ভীতু বানাতে চায়'—বলে সেখান থেকে চলে গেলাম। অদূরদর্শী আমি তখন কি জানি যে পরে ১৯০৯ সালে মেদিনীপুর

ষড়যন্ত্র মামলায় বসনকে কত সাহসী হতে হয়েছিল ? বসনের স্বামী, জমিদার যামিনী মল্লিক এতে একজন আসামী ছিলেন। তাঁকে জেলে অনেকদিন থাকতে হয়। মেদিনীপুরে এলে আমাকে বাড়িতে ডাকিয়ে একথা-সেকথার পর সেদিনের সেই লক্ষ্মী-ছাড়া ঘটনার উল্লেখ বসন করেছিল। পূর্বেকার সেই কথা সে ভুলতে পারে নি।

কলকাতার নতুন সঙ্গীদের তুলনায়, মনে পড়ল পূর্ণ, সুরেন প্রভৃতিকে। আমি আসার সময়-সময় বা একটু পরে ক্ষুদিরাম তমলুকে আসে। পূর্ণ সেন এক-সঙ্গেই পড়ত। পূর্ণের মা মারা যান। তাই তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসতাম আমাদের বাড়িতে। সে আমার মাতৃস্নেহের ভাগী হয়েছিল। পরবর্তী যুগে এরা নিজেদের মাকে দেশমাতৃকায় রূপান্তরিত করেছিল। দেশসেবার যজ্ঞবেদীতে স্বার্থলেশহীন আত্মবলিতে যে প্রোজ্জ্বল হোমাগ্নি আজও দেদীপ্যমান তাতে সবিশেষ সমিধ ও শহিদ হয়েছিল বীর বালক ক্ষুদিরাম। পূর্ণ, সুরেন ও যোগজীবন আপন আপন শক্তি অনুসারে মায়ের বোধনে 'নৈবেদ্য' যুগিয়েছে। পূর্ণ আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হয়, যোগজীবন মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পড়ে। সুরেন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় সন্দেহ-দাগী (suspect) হয়েছিল।

তমলুকে থাকতে একটা চলতি লোকসঙ্গীত আমার মনের ভাবরাজ্যে একটু নাড়া দিয়েছিল। গানটি ছিল এই—

'জয় জগ-বন্দন, জগতকারণ, জগন্নাথ তারো জী।
মাটিকাটার ভয়ে পাঁচসিকে দিয়ে, বষ্টুম হয়ে বেরিয়েছি।'

এদেশে ধর্মের অতিরিক্ত ঝোঁক সামলাতে গিয়ে কর্তব্যময় সংসার ছেড়ে পালানটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেইটিকে উপলক্ষ্য করে কোন পরিহাসরসিক টিপ্পনী কেটে এই গানটি রচনা করে থাকবে। সংসারটা শয়তানের রাজ্য—ভগবানের রাজ্য এখানে নয়—এই ভাবের তীব্র সমালোচনা এই গানে ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার মা কি করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন, কলকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করতে এসে আমার তা মনে পড়ল। তমলুকে থাকতে একদিন স্কুল থেকে দেড়টার সময় বাড়ি এসে দেখি এক সমারোহ ব্যাপার। খুব ধুমধাম করে রান্নাবান্না হচ্ছে। লুচি, পোলাও, মাছ ইত্যাদি। নানারকম ফল, মিষ্টি এসেছে। আমার দিদি একটা পিঁড়েয় আলপনা দিয়ে শুকিয়ে রেখেছেন। একখানা নতুন আসন এক জায়গায় রাখা হয়েছে। তাতে কাউকে হাত দিতে দেওয়া হচ্ছে না। অনেক বাড়ি থেকে মেয়েরা পাল্কি করে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছেন। সরোজদিদি, লক্ষ্মীদিদি, উল্লাদিদি, রমণীদিদি, শরৎদিদি, যত মাসীমারা ছিলেন, বৌদিদিরা ছিলেন, কাকীমা, পিসীমা এবং স্কুলের ঠাকুমা—একে একে সব এসে পড়লেন। ব্যাপার কি আগে কেউ জানতেন না। এসে যা জানলেন তাতে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন এবং খুব হাসলেন। কিন্তু মায়ের এই সৎপ্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে যোগ দিলেন। সেইদিনের অনুষ্ঠান বা উৎসবের কারণ হচ্ছে আমাদের চিন্তাদার বউয়ের 'সাধ'। চিন্তাদাদা লোকটা কে? সে ছিল বাড়ির মেথর।* তার বউ সন্তানসম্ভবা। এই প্রথম সন্তানের মা হবে, তাই আজ আমাদের বাড়িতে এত আনন্দ-কোলাহল। সময় মতো চিন্তাদাদার বউকে একখানি অতিসুন্দর ফুলদার ঢাকাই শাড়ী পরিয়ে, নতুন আসন ও আলপনাদার পিঁড়িতে বসিয়ে দীপ-ধূপ জেলে, শাঁখ বাজিয়ে যথারীতি সাধভক্ষণ করানো হল। তাকে বাড়ির ভিতরের উঠানে বসানো হয়েছিল। বাকিরা বসেছিলেন খাওয়ার ঘরে। আমি ও আমার ছোট ভাইবোনেরা জোড়হাত করে চিন্তাদার বউয়ের দিকে মুখ করে স্তব পাঠ করছিলাম—'পুংরূপাং বা স্মরেৎ দেবীং, স্ত্রীরূপাং বা বিচিন্তয়েৎ, অথবা নিষ্কলাং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দ লক্ষণাম্।'

বেশ আমোদ-আহ্লাদ জমে উঠেছে, এমন সময় আর একটি পাল্কি এসে খিড়কিতে লাগল। কোন্ বাড়ির মেয়েরা বাকি ছিলেন তা আর হিসেব করে দেখার অবকাশ কারো ছিল না। কুমারী মেয়েরা ছুটে গেল আগ-বাড়িয়ে নিয়ে আসতে। সানন্দ অভ্যর্থনা করে 'আসুন আসুন' বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু কেউ বেরুচ্ছেন না

* আমার পিতাঠাকুর সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। আগেই বলেছি তাঁর ওস্তাদ মোরাদালি খাঁ একবার আমাদের সময়ে তমলুকে এসেছিলেন। তাঁর এঁটো বাসন হিন্দু চাকর-চাকরানী সাফ করতে অস্বীকার করে। তখন মা মুসলমানের এঁটো পরিষ্কার করেন। এতে আমাদের মন উজ্জ্বল হয়।

দেখে পালকির দরজা খুলতেই, ঘোমটার ভিতর থেকে চোখে পড়ে গেল একজোড়া মস্ত গোঁফওয়ালা মূর্তি। মেয়েরা সব 'ওগো মাগো, কে গো' বলে ছুটে বাড়ির ভিতর দড়দাড়িয়ে পালিয়ে এল। কোলাহলে আমরা ক'ভাই ও সুরেন এগিয়ে গেলাম দুর্বৃত্তকে উচিত শিক্ষা দিতে। গিয়ে দেখি সে এক অদ্ভুত আনন্দদায়ক বিস্ময়। আনন্দঘন মূর্তি। দুর্গারামবাবুর জামাই বসন্তবাবু পালকি থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তিনি ছিলেন সরোজদিদির স্বামী, উকিল। সম্পর্কে এ বাড়িরও জামাই।

এই মিষ্টি রহস্য-পরিহাসে বাড়িসুদ্ধ সবাই খুব প্রহৃষ্ট হলেন। খাতির করে তাঁকে বাড়ির বৈঠকখানায় বসান হল। তাঁর আহারের সময় শালী-সম্পর্কের সকলে ঠাট্টার চোটে বসন্তবাবুকে বিপন্ন করে তুললেন।

নবীন মেটা ছিল সুরেনদের চাকর। শিবু মাইতি ছিল আমাদের চাকর। এ দুজনের সম্মান ছিল অসাধারণ। নবীনকে উঠতে-বসতে দাদা বলতে হত। শিবুকে কখনও দাদা, কখনও শিবনারাণ বললেও চলত। আমাদের বাড়ি চাকরি করতে এসে শিবু 'প্রথমভাগ' পড়ে নিরক্ষর দোষ কাটায়। আমাকে সে শেখায় অ-আ-ক-খ। দিদির কাছে 'দ্বিতীয়ভাগ' প'ড়ে আমি আবার শিবুকে পড়াই ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য। শিবু পরে কাশীখণ্ড, মহাভারত, রামায়ণ, ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি পড়ে ফেলেছিল। শিবুর মাস্টারির সময় আমি কিছু অন্যমনস্ক হওয়ায় সাঁড়াশী দিয়ে পায়ের আঙুল একদিন চিপে দেয়। বাবার কাছে নালিশ করেও সুবিচার পাই নি।

শিবনারাণের বিয়ে। আমার মায়ের এ বিষয়ে যা করণীয় সব করেছিলেন। আমি ও আমার ছোট ভাই ধনগোপালের ওপর হুকুম হল গ্রামে শিবুর বাড়ি নেমন্তন্নে যেতে। গরুর গাড়ি চড়ে নবীনদাদার অভিভাবকতায় আমরা সেথা যাই। আমাদের বসতে বিশেষ আসন দিলে মায়ের উপদেশমতো তা আমরা প্রত্যাখ্যান করে শিবুর জ্ঞাতি-কুটুম্বদের সঙ্গে মাদুরে একসঙ্গে বসেছিলাম। সেখানে একটা নতুন অনুষ্ঠান আমরা দেখেছিলাম। রূপার শীতলা-মা ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবী। সকলে স্নান সেরে, শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে মায়ের পালকি বয়ে নিয়ে এল। ব্রাহ্মণ যথাবিহিত উপচারে পুজা আরম্ভ করলেন। ফুলটুল সব নিলেন। কিন্তু পুজারীঠাকুর যতবার মাথায় বেলপাতা দেন, থোকাকে থোকা বেলপাতা মায়ের মাথা থেকে পড়ে-পড়ে যায়। ব্রাহ্মণ হিমসিম খেয়ে গেলেন। আসল কাঁচা-খেকো দেবতা। এঁর সঙ্গে চালাকি! কে কি মানসিক ক'রে মাকে দেবো বলে দেয় নি, তাই মা মাথা নেড়ে বেলপাতা ফেলে দিচ্ছিলেন। ভয়ে-ভয়ে সকলে মনের কথা স্মরণ করতে লাগল। এক বুড়ো মুরুব্বী বলছিল—'মা জানে বাপ, মন জানে পাপ। যে যার অপরাধ স্বীকার কর বাপু।' অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ও অন্বেষণের পর অপরাধী ধরা পড়ল। একটি বউ দেড় বছর

আগে মাকে একটি 'সোনার বেলপাতা' মানসিক করেছিল। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে সেটি দেওয়া হয় নি। এইবার সে বিয়ে বাড়িতে ধার করে মূল্য ধরে দিল। মা সানন্দে পুজোর বেলপাতা মাথা পেতে নিলেন। সে কি বেলপাতার গাদা চড়ান হল! একটিও ভুঁয়ে পড়ল না। ভয়ে ও ভক্তিতে লোকেরা গড় হয়ে মাকে প্রণাম করতে লাগল ও নাক কান মলতে লাগল। পুজারীঠাকুর বললেন, 'মানুষের অহংকার-টহংকার সব মিছে। বাহুবল-টাহুবল কিছু নয়। বলং বলং দৈববলং।'

শিবনারাণের মতো এমন সততাপরায়ণ, বিশ্বাসী, সত্যাগ্রয়ী লোক বিরল। আমার জীবনের নানারঙে রঞ্জিত অনুভূতির দীর্ঘ তালিকার মধ্যে তেমন লোক খুব কম। উপ্‌রি আয়ের নেশা তার কোনদিন ছিল না। উপকারীর উপকার সে প্রাণ দিয়ে করত। কৃতজ্ঞতা তার স্বাভাবিক গুণের মধ্যে। তাছাড়া সে ছিল পরদুঃখকাতর। আমার মা লুকিয়ে যাদের টাকা-পয়সা, আহার্য, বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করতেন, তাদের কাছে যাবার সময় নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিবুও ছিল একজন দূত। দুঃস্থ, মানী লোকদের মান না যায়, সেজন্য কেউ না জানে, না টের পায়—সাহায্যবাহীদের কাজের সময় এই সতর্কতা আমার মা সর্বদা অবলম্বন করতেন। 'হাতে কাজ করবে, চোখে পথ ঠিক দেখে যাবে। মুখ থাকবে একদম বন্ধ।'—এই ছিল তাঁর অনুশাসন।

তমলুক ছেড়ে আসায় অনেক কিছু হারিয়ে গেছে যার জন্য দুঃখ যাবার নয়। কৌতুকের জিনিষ হারানোও একরকম দুঃখ। তেমন অন্ততঃ দুটি গেছে—'গুড্-মর্নিং কালীবাবু' এবং 'গুডনাইট ড্রিংকেল ওয়াটার'। তাদের জন্যও আমার প্রাণটা মাঝে মাঝে হায়-হায় করে। বিনোদন জীবনের এক অপরিহার্য প্রয়োজন। সেটা কোন্ পথ দিয়ে আসে তা অবশ্য বিচার্য বিষয়। এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এক আত্মীয় ছোকরা এসে উদয় হল তমলুকে। ইস্কুলের ছাত্র, কিন্তু অনর্গল ইংলিশ ঝাড়ে। লোকে বলতে লাগল, এ যে ইংরেজী-ঝাড়া বাল-শঙ্কর। বাংলা ভুলেও সে উচ্চারণ করত না। তার সঙ্গে সব ছেলে বাংলায় কথা বলে। সে উত্তর দেয় অপরিশুদ্ধ ইংরেজীতে। তাই তার ব্যঙ্গের নাম হয়ে গেল 'গুডমর্নিং কালীবাবু'। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যে, রাত্রি—সব সময় তার গুডমর্নিং। (আমাদের এমন মালটি হারিয়েছি! দুঃখ হবে না?) দ্বিতীয় ব্যক্তি হল 'ড্রিঙ্কেল ওয়াটার'। তার সঙ্গে শহরে সব সময় দেখা হত না। সে ছিল গোপী জমাদার। তমলুক সাবজেলের সর্বেসর্বা মালিক। সে জানত দুটি ইংরেজী কথা। তাই সে ঝাড়ত। একটি ছিল 'গুডনাইট'। তার সঙ্গে দেখার কালাকাল ছিল না। সব সময় তার 'গুডনাইট'! অপরটি কোথা থেকে সে আহরণ করেছিল, 'ড্রিঙ্ক কুল ওয়াটার।' তাকেই বেঁকিয়ে ফেলেছিল মুখ বা জিভের দোষে। তার সঙ্গে দেখা হলেই ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠত, 'গুডনাইট', বা 'গুডনাইট, ড্রিঙ্কেল ওয়াটার'। আমরা মনে করতাম তার নামই বুঝি 'গুডনাইট'।

পূর্বাহ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলকাতায় আমি ডাফ স্কুলে ভর্তি হলাম, তা বলেছি। এইসময় থেকে আমার জীবনে যুগসন্ধির লক্ষণ দেখা দিল। একদিকে কতকগুলি জাতির স্বাধীনতা-হরণের যুদ্ধ, আর একদিকে আহতদের, পদানতদের মাথা তোলার প্রচেষ্টা। বুয়ার যুদ্ধ হল দক্ষিণ আফ্রিকায়, বক্সার যুদ্ধ হল চীনে, প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ চীনে, আমেরিকার স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ ও কিউবা অধিকার এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ মাঞ্চুরিয়ায়। রুশিয়ার প্রথম বিপ্লব-চেষ্টা। আকাশে-বাতাসে কেমন যেন একটা শেকল-ছেঁড়ার গর্জমান ভাব দরদী প্রাণকে আহ্বান জানাচ্ছিল।

বৃদ্ধরা পরস্পরে দেখা হলে বলেন, 'আর আমাদের থাকা কেন? এখন গেলেই হয়! চারদিকে যত অবিচার, অনাচার। ছত্রিশ জাতে একাকার এসে পড়ল।

প্রৌঢ়রা বলেন, 'সব একাকার হবার কথা। তা যেন হয়েও এল। 'ভবিষ্যৎ পুরাণে'র কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে আসছে। জাত-বর্ণের বিচার তো রইল না, তাছাড়া যৌন-সম্বন্ধেও সম্পর্কের বাছবিচার বুঝি আর থাকে না!'

যুবারা বলে, 'লেখাপড়া করতেই যদি জীবন শেষ হয়, তবে আর ভোগজাত করব কবে?' কেউ বলে, 'রোজ যেন 'মধুবার' হয় ও রোজ যেন শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যায়।' কেউ বলে, 'যেন রোজ মাসকাবার হয়, রোজ রবিবার হয় এবং রোজ মাইনে পাওয়া যায়। অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যার আদর্শ কার্যকারী হলেই ভালো হয়।'

কিশোররাও ভাবে। তারা ভাবে, সুন্দর পৃথিবী—সুন্দর হোক তার ব্যবস্থা। কম পড়া, বেশী ছুটি। খাওয়াপরা যেমনটি চলছে তেমনটি যেন আজীবন বজায় থাকে। কেবল তাদের মা-বোনেদের সম্বন্ধে যখন কেউ বলে যে, তারা জ্যান্ত লগেজ, মরা লগেজের অধম। সেগুলোকে তো যেখানে সেখানে যখন ইচ্ছে ফেলা বা রাখা যায়। এদের তা করা চলে না। তখন অপারিসীম লজ্জায় তাদের মাথা কাটা যায়। 'ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ'।

ছাত্ররা চায় ছাত্রজীবন। কিন্তু তার থেকে বিযুক্ত হবে পরীক্ষাগুলো। পরীক্ষা-বিযুক্ত বা বিমুক্ত ছাত্রজীবনই মানবজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এই তাদের সর্ববাদিসম্মত, অবিসংবাদিত মত। অর্থাৎ একটি জমিদারির বাঁধা আয় এবং নির্ঝঞ্ঝাটের জীবন।

'অন্নদামঙ্গলে' অন্নপূর্ণা দয়া করে বর দিতে চাওয়ায় ঈশ্বরী পাটনি চট্ করে

বলে ফেলল, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। পেটের এবং পরার সমস্যাই জীবনের সব সমস্যার সেরা রয়েই গিয়েছে। খালি সুরেন বাঁড়ুজ্যেরা চান সরকারী মসনদে খানিকটা হাত। কংগ্রেসকে রঙ্গরসের আসর ও আড্ডা বলে লোকে ঠাট্টা করত।

সন্ন্যাসী বলেন, 'দিনমে ডাকিনী, রাতমে বাঘিনী, ঘন ঘন লহু চোষে যে রমণীরত্নরা তাদের নিয়ে ঘরকন্না করা কি মহাভ্রম!' অথচ সবাইকার বাপ-দাদারা তাই করে আসছে। উপদেশের বদলে সংসারী পুরুষ ও স্ত্রীদের সহায়তা ও সাহায্য নিয়ে সাধু সন্তুষ্ট। উপদিষ্টরা বলছেন, 'সাধুর কথা কানে ভরি অবতারের গীতা ধরি। তবু স্বপন-ছোঁয়া মেঘের মায়া সে মুখখানি হৃদে জাগে।'

মেয়েরা বলেন, 'ভারতবর্ষে নারীজন্ম যেন আর না হয়। কত বড় অভিশাপ থাকলে মানুষ এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মায়!'

কৃষক বলে, 'চাষ-আবাদে কুলাচ্ছে না। শহরে যাও ছেলে-মেয়েরা। চাকরি-বাকরি, মজুরি দেখ—যদি কিছু একটা পাও। আয় না বাড়ালে চলছে না।'

মজুর বলছে, 'খেটেখুটে প্রাণ গেল। কোনরকম সুবিধা হচ্ছে না।'

মিস্ত্রী, কারিগর, যন্ত্রধর, তাঁতী, পোটো—সবাই বলছে, 'বাপ-ঠাকুর্দা দু'টাকা মাসে এনে দোল-দুর্গোৎসব করে গেছে। কিন্তু আমাদের কিছুতেই পেটটাও চলছে না।'

সমাজচিত্রের এই গেল একদিকের ছাপ। অন্য একটা দিকও আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় দু রকম মানব মন। একটা মন আশপাশের ভাবধারণার অতি স্বচ্ছ মুকুর। শুধু মুকুরই নয়। অতি সহজে নড়া কলের কাঁটার মতো ঐ ভাবধারা ধরে। আগন্তুকের আগমন-নির্দেশক। বাদ্যযন্ত্রের তাল প্রদর্শনের 'অনাহত' বলা যেতে পারে এমন মনকে। অপর রকম যে মন আছে তা তালমাত্রার 'আঘাত' প্রতিপাদক। যে বোল বাজছে শুধু তার ধ্বনি তাতে আসে। যে বোল এখনও বাকি আছে, আসরে তার কিছু ইঙ্গিত এতে নেই। যেগুলি সাধারণ মন তার ছাপ শেষোক্ত মনের ছবিতে পাওয়া যায়। এর থেকে শুধু একটা অসন্তুষ্টির সংকেত মেলে, কিন্তু পূর্বোক্ত বা অপর রকম মনের ছাপে পাওয়া যায় জীবনে নতুন সন্ধানের ইঙ্গিত।

আমি কয়েকটি ছাত্রবন্ধু এবং সর্বোপরি একজন উচ্চাঙ্গের শিক্ষক ভাগ্যক্রমে পেয়েছিলাম স্কুলে। এদের অবলম্বন করে 'অনাহত'র সন্ধান পেয়েছিলাম। একদিকে আমাদের বাড়ির মজলিস। সেখানে আমার বাবা, কাকা ও ভাইদের আলাপ-আলোচনা আমাকে নতুন দিগ্‌দর্শন ও তার পাথেয় দান করত; অপরদিকে এই শিক্ষকটি তাঁর অভিনব শিক্ষাপ্রণালীতে আমাকে নতুন পথের পথিক গড়ে তুলেছিলেন।

মাস্টার মহাশয়ের নাম প্যারীমোহন দাস। কড়ি ও কোমল দিয়ে তাঁর ধাতু গড়া। ছাত্রবন্ধুদের নাম অক্ষয় ও শরৎ।

বাড়িতে শুনতাম একটা নতুন যুগ আসতে বাধ্য। চর্মচক্ষুতে তার টিকি কেউ না দেখলেও মনের চোখে সে ধরা দিয়েছে। এদেশের সর্বাঙ্গীণ ইহলৌকিক অভ্যুদয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। এদেশের একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। এদেশের সংস্কৃতি ও ভাগ্য মাঝে মাঝে ম্লান হয়। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করে নতুন আশা। নতুন আলো জাগিয়ে তোলে। পাঠান এল, মোগল এল, ইংরেজ এল। এবার ওঠবার পালা। ওজনের পাল্লা নীচের দিকে নামতে নামতে একদম জমিতে এসে ঠেকেছে। আর নামবার জায়গা নেই। এবার উঠতে হবে। একভাবে থাকার জো নেই।

ওঠা সম্বন্ধে সবাই একমত হলেও, কি উপায় অবলম্বন করে ওঠা ঠিক হবে তাই নিয়ে এঁদের ছিল কিছু মতান্তর। আমার পিতা কেবল বিজ্ঞানের ওপর বেশী ঝোঁক দেবার পক্ষে। আমার এক কাকা ছিলেন বিজ্ঞান ও দেশের সাংস্কৃতিকে জড়িয়ে ওঠার পক্ষে। আমার মেজদা বলতেন—এ বিষয়ে আমাদের কোন মীমাংসাই টিকতে পারে না। যুগ আসছে যুগধর্ম নিয়ে। সে নিজের কাজ নিজেই করিয়ে নেবে। আকাশ-ভাঙা মেঘ যখন আসে—তরল জলধারায় গ'লে, কেউ কি বলতে পারে সে সরু বা মোটা ফোঁটায় আসবে? আমাদের 'হাঁ'-'না' নিরপেক্ষ হবে সেযুগের অভিযান। এই পরিবর্তনটা আসছে রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার একটা ওলটপালট করতে। ভারতের অন্তঃশক্তি বাইরের প্রবল আক্রমণে প্রথমটা মুষড়ে পড়ে। কিন্তু আবার তার জীবনীশক্তি চাগান দেয়। আবহমান কাল এইটে হয়ে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

আমার কাকা বলতেন—সে যাই হোক, প্রত্যেকের এই কর্তব্য স্থির থাকা উচিত যে, জন্মানর সময়ের চেয়ে মরণের সময়ে দেশকে যেন উন্নত দেখে যেতে পারি। জীবনকে সেই ঝোঁক দিয়ে গড়তে হবে এবং চালাতে হবে। মাতৃদ্রোহী ছেলের মতো, দেশদ্রোহী না হয়ে যেন ফিরি।

পৃথিবীর সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের অধ্যায়গুলি বার বার আলোচিত হত। ওদিকে মাস্টার মহাশয়। তিনি ইতিহাস পড়াতে পড়াতে এক একবার আপসোস করে বই বন্ধ করে দিতেন। বলতেন, 'এতে যা লেখা আছে তা না বললে বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের পাস করাবে না। পাসের জন্য তা না লিখে উপায় নেই। কিন্তু যেখানে যেখানে এবং যা যা মিথ্যে আছে, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। পরে মন থেকে বইয়ের শিক্ষা মুছে ফেলে দেবে। মুখে মুখে যা বলছি তাই ঠিক বলে জেনে রেখো। বড় হয়ে আরও পড়ে, আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা, যা সঠিক হয় নির্ণয়

কোরো। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশিক্ষা থেকে বাঁচতে হলে একটা বাণী অন্তরে স্থির করে রাখবে, তবে আত্মরক্ষা হবে। সেটা হচ্ছে, Unlearn mostly what you learn here—এখানে যা শিখছ তার অনেক কিছু ভুলে যেয়ো। পরাধীনতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ কি জান? Cultural conquest—নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা।'

আমি বাড়ির মজলিস থেকে যা সঞ্চয় করেছি তার সঙ্গে মাস্টারমশায়ের উপদেশের হুবহু মিল হয়ে যাচ্ছিল। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তারে লাভ যে কিছু হয় নি তাও নয়। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে। কতকগুলি লোকের জঠরানল নিবৃত্তির হয়ত সুবিধা হয়েছে। কিন্তু তারা আত্মশক্তিকে হারিয়েছে। আত্মাকে বেচে অনাত্মাকে সঞ্চয় করার মতো। শোনা যায় মেকলে সাহেব নাকি ইংরেজী শিক্ষার মারফত এমন ভারতের কল্পনা করেছিলেন, যে ভারত ইংলণ্ডের শাসনকে ধাক্কা একদিন দেবে। কিন্তু তাঁর চালের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলে, সে ধাক্কাটার স্বরূপ ধরা পড়বে। শিক্ষা-বিভাগটা হবে কেরানী-গড়ার কারখানা। শিক্ষিতরা উচ্চ কোলাহল করবে, আন্দোলন জনমণ্ডলীকে বিক্ষুব্ধ করবে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টার পাহাড় মূষিক প্রসব করলেই তারা তুষ্ট হবে। খালি সংস্কারের জোড়াতালি ছাড়া কখনই ভারতে বৃটিশ শাসনের মূলোৎপাটন ভাবতে পারবে না, কোনদিন কামনা করবে না। জীবনসমুদ্রের বিপন্ন জাহাজগুলি নির্ভয়, নিরাপদ পোতাশ্রয় পাবে এদের ছত্রছায়াতলে।

ইংরেজী শিক্ষিতরা দেখবে তাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব বজায় থাকবে ভারতে ইংরেজ শাসনের স্বার্থ ও স্থায়িত্বের কায়েমী অস্তিত্বে।

এইসময় স্কুলের সুপারিনটেন্ডেণ্ট ছিলেন টর্মরি সাহেব। সাড়ে দশটায় প্রার্থনার পর স্কুল বসলেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল বেত হাতে ক্লাসে ক্লাসে ঘোরা এবং তখন যে মাস্টার ক্লাসে থাকতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা—Any bad boy in the class?—এই ক্লাসে কোন দুষ্টু বালক আছে? তখন যোগেন সরকার মহাশয়ের 'হাসিখুশি'র এই বিশেষ পদটি ছেলেদের মনে পড়ে যেত—"আর সকলে ভয়ে ভয়ে মিটির মিটির চায়। কার কপালে কি আছে বলা নাহি যায়।" মাস্টারমশায়রা ঊর্ধ্বতন প্রভুর আদেশ মান্য না করে পারতেন না। দেখিয়ে দেখিয়ে দিতেন। সাহেব ছেলেদের প্রার্থনা-হলে নিয়ে গিয়ে সপাসপ কয়েক ঘা বেত লাগিয়ে ছাড়তেন। যে প্রার্থনা-হলে কিঞ্চিৎ পূর্বেই মুক্তির বাণী প্রচারিত হয়েছিল, সেইখানেই নির্যাতন আচরিত হত। অদৃষ্টের পরিহাস!

প্যারীবাবুর আত্মসম্মানী প্রাণ এই ব্যবস্থাকে সহ্য করতে পারল না। সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বরাবর বলে দিতেন—No—না, এ ক্লাসে খারাপ ছেলে কেউ নেই।

সাহেব চলে গেলে তিনি ছেলেদের বলতেন—দেখো, তোমাদের মধ্যে পরস্পরে যদি কোন বদচাল বা ঝগড়া মারামারি হয়, আমায় জানিয়ো। সাহেবের কাছে নালিশ কোরো না। আমাদের মামলা আমরা ঘরোয়াভাবে নিষ্পত্তি করবো। বিদেশীদের এতে হাত দিতে দেওয়া উচিত হবে না। যদি এ ব্যবস্থা না মানো, তোমাদের এমন একটা বদ অভ্যাস গড়ে উঠবে যা এদের শিক্ষাব্যবস্থা চায়। তিল থেকে তাল হয়—এ কথাটা বোধ হয় শুনেছ। আত্মনির্ভরতা আমাদের এমনি করে চলে গিয়েছে। তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। দোষী আমরা, বিচারকও হব আমরা। বাইরের কেউ কখনও নয়।

ছেলেরা এই সৎশিক্ষায় লাভবান হল। 'আমাদের ঘরোয়া গণ্ডগোলের জন্য পরের স্বারস্থ হব না'—ছোট প্রারম্ভ থেকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে প্রযুক্ত হবার উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা এটা। ঠিক উল্টো ব্যাপার হওয়ায় বার বার বাইরে থেকে আমন্ত্রিত হয়ে বিদেশীরা লাভবান হয়েছে এবং ভারতবাসী তাদের গোলামি করেছে।

কিছুদিন এইভাবে চললে সাহেব বিরক্ত হলেন। তিনি প্যারীবাবুকে বললেন—Are you dealing with angels in your class? সব ক্লাস থেকে বদ ছেলেদের নাম পাচ্ছি; তুমি কি সুধু দেবদূতদের নিয়ে ক্লাস করছ?

প্যারীবাবুর সৎসাহসের অন্ত ছিল না। তিনি বললেন—হ্যাঁ। সাহেব তাঁর কথা মানতে পারলেন না। তিনি নতুন প্রথা সুরু করলেন। প্রতি ক্লাসে একজন করে 'মনিটার' নিযুক্ত করলেন। তার কাজ হবে সরাসরি সাহেবের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়া।

প্যারীবাবু আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—দেখো, 'মনিটার' যেন 'ম্যান-ইটার' হয়ে যেয়ো না। মানুষের রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়ে বসো না। মহেন্দ্র আমাদের ক্লাসের মনিটার হয়েছিল বটে, কিন্তু প্যারীবাবুর প্রস্তাব সে এড়াতে পারে নি।

একদিন অপর একটি ক্লাসের ছাত্র প্যারীবাবুর এই ক্লাসের এক ছাত্রের নামে টমরি সাহেবের কাছে নালিশ করে। স্কুলের পরে, বাড়ি যেতে যেতে রাস্তায় তাদের ঝগড়া এবং পরে মারামারি হয়। টমরি সাহেব শিকারী বেড়ালের মতো লম্বা ওৎ পেতে দীর্ঘদিন বাদে শিকার পেয়ে সে যে কী উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা যায় না। শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে, তিনি তাঁর স্কুলের বাইরের একটা ঘটনা টেনে এনে প্যারীবাবুকে অপ্রতিভ যে করতে পারছেন তাতেই যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিলেন। প্যারীবাবু সব সময় আমাদের ক্লাসে পড়াতেন না। শুধু প্রথম ঘণ্টাটি পড়াতেন। তারপর আরও চারজন শিক্ষক চার ঘণ্টা পড়াতেন। প্যারীবাবু অন্য ক্লাসেও পড়াতেন। সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ প্রত্যহ হত এই ক্লাসে। সাহেব ছিলেন দেখনহাসি। সর্বদা মুখে হাসি লেগে থাকত। এমন

হাসিমুখ লোকও যে জল্লাদ হতে পারে, তা কল্পনাও করা যেত না।

সাহেব প্রথামতো প্রার্থনার পর ক্লাসে এসে প্যারীবাবুকে বললেন—At last you have got a devil amongst your angels—তোমার দেবদূতদের মধ্যে একজন অন্ততঃ শয়তান বেরিয়েছে। প্যারীবাবু রোজের মতো সপ্রতিভ ভাবেই বললেন—I shall be surprised if he turns out not to be an angel—সে ছেলেটি যদি দেবদূত না থেকে থাকে তবেই আমি বিস্মিত হব। সাহেব প্যারীবাবুর কথায় কান না দিয়ে ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে চললেন। সে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে সাহেবের অনুসরণ করল। প্যারীবাবু বললেন—তুমি সাহেবকে বোলো যে তুমি পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচার চাও। প্রার্থনা-হলঘরে সাহেব উভয় পক্ষের কথা শুনে দুদিকের সাক্ষীদের ডাকলেন। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি নির্দোষ সাব্যস্ত হল। ছেলেটি তো বেত খেলই না, উল্টে সাহেব ক্লাসে পুনরাগমন করে প্যারীবাবুকে অভিনন্দিত করে বললেন—In fact your angel has cleared his conduct—তোমার দেবদূত নিজনামের কলঙ্ক নিষ্কাশিত করতে সমর্থ হয়েছে।

প্যারীবাবুর মুখ-চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসসুদ্ধ সকলে এক অনির্বচনীয় জয়োল্লাসে উচ্ছ্বসিত বোধ করল।

তিনি বললেন—আমাদের বাস্তবিক আনন্দের কারণ ঘটেছে। শুধু আনন্দ নয়, জ্ঞানও আমরা লাভ করলাম। ভাত রাঁধার সময় ভাত ঠিক সিদ্ধ হয়েছে কিনা নামাবার আগে রাঁধুনীরা দেখে নেয়। দু-একটা ভাত টিপে আন্দাজ করে নেয় কখন নামাবে। দু-একটা দানা, খুব ক্ষুদ্র সংখ্যা। কিন্তু তাই দিয়ে সময় সময় বৃহৎ পরিমাণের খবর বোঝা যায়। আমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের ব্যবহার দিয়ে বৃটিশ শাসনের ভিতরের অবস্থা বোঝা যেতে পারে। সাহেব লোকটি কেমন মিষ্টি! "করিতেছে বেত্রাঘাত তবু মুখে হাসি"—এই এঁর পরিচয়। মুখেতে হাসি কিন্তু কাজে কি? সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলার নামে যে শাসন চলেছে তাও অন্তঃসারশূন্য। সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের এক দেশের লোকের পেট ভরাতে এখানকার লোকদের গরীব ও বুভুক্ষু করে রাখা হচ্ছে। ওদেশের গরীব মানে, যাদের রুটির দুদিকে মাখন না লেগে একদিকে লাগছে। আর হেথাকার গরীবদের রুটি-ই নেই। এদেশের মানুষ মানুষের মধ্যে ধর্তব্য নয়। তাদের হক্ হক্-ই নয়।

আমরা তিন বছর প্যারীবাবুকে পেয়েছিলাম। বাকী দুটো ওপরের ক্লাসে তিনি পড়াতেন না। যে সম্পর্ক গুরু-শিষ্যে গড়ে উঠেছিল তা ইস্কুল-কলেজের বাইরেও বজায় ছিল যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। প্যারীবাবু সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বাগ্মী ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল এবং দেশসেবী সুবিখ্যাত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দবাবু এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

ক্রমে প্যারীবাবু ছাত্রদের বললেন, 'আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা কোথায় জেনে সেটা দূর করতে হবে। ইংরেজদের একটা মস্ত গুণ হচ্ছে যে ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও অন্যের সামনে, দেশের স্বার্থে একজোট হতে পারে। আমরা তা পারি না। সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে বা পরম স্বার্থে, একজনের নেতৃত্ব মেনে চলতে ওরা অভ্যস্ত। আমরা তা মোটেই পারি না। এইটাই আমাদের সবচেয়ে বড় এবং জঘন্য ত্রুটি। এ মারাত্মক দোষ যেমন করে হোক আমাদের তাড়াতে হবে। এর জন্য চাই নতুন আরাধনা, নতুন তপস্যা।

দুটো জিনিষ চাই। একতা এবং স্বেচ্ছায় নিজেদের অনুষ্ঠিত নিয়মানুবর্তিতা। প্রতি পদে ভক্তির শক্তিতে, জ্ঞানের আলোয় এগিয়ে চলতে হবে। পথ চলতে গেলে দিগ্‌ভ্রষ্ট না হও সেজন্য একটা কম্পাস থাকা অবশ্য দরকার। সে কম্পাস হবে সেই সংকল্প, যার বলে অসাধ্য সাধন করেও দেশকে বড় করতে পারা যায়। সেটা হবে—'যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্—শুনিয়ে চলিনু তোমার ডাক।'

তারপর তিনি স্থির করে দিলেন একটা পুস্তক-তালিকা। যা স্কুলের ঘণ্টার পর একটা সময় করে সবাই মিলে পড়া হবে। তাতে ছিল অক্ষয় মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা', সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ঝান্সীর রাণী', 'বাজীরাও' এবং পরে 'দেশের কথা'। এইরকম বাছা বাছা আরও কতকগুলি বই ছিল। Seely-র 'Expansion of British Empire', Ruskin-এর 'Crown of the Wild Olive' ও 'Life of Mazzini', রজনী গুপ্তের 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস', হেমচন্দ্রের, মাইকেলের, রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা রচনা। বৃটিশ লেবার-পার্টির Keir Hardie ও MacDonald-এর কিছু লেখা। 'Failures of Lord Curzon', রামমোহন রায়ের জীবনী, বিদ্যাসাগরের জীবনী, বিবেকানন্দের পত্রাবলী ইত্যাদি।

পরের জন্য মন না কাঁদলে মানুষই হওয়া হল না। সেজন্য ছাত্রদের তদানীন্তন অবস্থানুযায়ী ক্ষমতায় যা কুলাত তেমন চাঁদা সংগ্রহ করে আতুরের সেবায় ওষুধ, পথ্য, কাপড় কিনে দিয়ে আসা হত। তিনি থাকতেন অগ্রণী। আমার মনে পড়ে, একবার কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে আমাদের কয়েকজনকে তিনি সঙ্গে করে এক বিধবা-আশ্রমে নিয়ে যান। পথে ছেলেরা জিজ্ঞাসা করে, আশ্রমের অধ্যক্ষাকে কি ভাবে সম্মান দেখাতে হবে? তিনি বললেন—আমি যেমন ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করব, তোমরাও তাই করবে। বলেছিলেন যে, সে মহিয়সী মহিলা কোন নামী নাগরিকের বিধবা ভগ্নী। নিজের ব্যথায় ব্যথাতুরদের ব্যথা দূর করার

প্রেরণা পেয়েছিলেন। মাস্টারমশায় তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন। ছাত্রেরাও তাঁর অনুগমন করল।

এইভাবে ক্রমে বাছাবাছি হয়ে কয়েকটি সতীর্থে মিলে আমরা পরোপকারের কাজে লেগে রইলাম। ভাবী জীবনে কাজের যোগ্যতা লাভের জন্য এইভাবে মন-গড়া চলতে লাগল।

১৯০২ সাল। প্যারীবাবু আমাদের ক্লাসের বোর্ডে একটি গান লিখে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্ররা লিখে নিল, কণ্ঠস্থ করল ও গাইতে লাগল। গানটি রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবন-মনমোহিনী"। এ হল এক পরম বিস্ত। দেশপ্রেম-জাগানো গানের চলন তখন সাধারণ্যে ছিল না। তখন পথেঘাটে, রেলে, স্টীমারে, ট্রামে, গয়নার নৌকায় দেশের বা দশের দেশপ্রেমী লোকের কথা বা আলোচনা শোনা যেত না। একসঙ্গে কিছু লোক জমা হলে আলোচনা উঠত—কার বাপের শ্রাদ্ধে ক' মণ দই হয়েছিল। নেমন্তন্ন বাড়িতে মাছের তেমন প্রাচুর্য ছিল কিনা? কর্মবাড়ির শামিয়ানার নীচে অমন বেনিয়ম ঠিক হয় নি। অথবা, খেঁদীর বিয়েতে খেঁদীর বাপের কাছে এত ভরি সোনা চাওয়া কি ঠিক হয়েছে ইত্যাদি? আমাদের একটি দেশ আছে, তার প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে—তা নিয়ে তখন কখনও কথা হত না। 'উঠে-পড়ে লাগতে হবে'—এ ভাবের আলাপ-আলোচনা ছিল না বললেই হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"রাজা ক'ন লেখাপড়া কি হইল তব ?" প্রহ্লাদ কহেন—"লেখাপড়া শ্রীমাধব"। প্যারীবাবু ছাত্রদের মনে তথাকথিত ভালো-ছেলে হওয়ার বদলে একটা স্বদেশপ্রেমের বীজ বুনে দিয়েছিলেন। প্যারীবাবু আমাদের দেশের ভালো-ছেলেদের ধারাবাহিক ভাবে ইংরেজের পোষ্যপুত্র হয়ে দেশের বিরুদ্ধে গোত্রান্তর লাভ করায় বিশেষ বিচলিত ছিলেন। তিনি বলতেন—দেখ, যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতী ছাত্রত্বের ছাপ নিয়ে বেরোয় তারা প্রায়ই আমাদের পর হয়ে যায়। তারা বেশির ভাগ সরকারী চাকরি গ্রহণ করে। তার ফল শোচনীয়। তারা বিদেশীদের গোত্রত্বে ঢুকে পড়ে। দেশমাতা কত বহু-কৃতী সন্তানের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এইভাবে ? স্বাধীন দেশে লোকে লেখাপড়া শেখে মানুষ হবার জন্য। এদেশে শেখে চাকরি পাবার জন্য। এটা বড় দুর্ভাগ্য।

প্যারীবাবু চেষ্টা করতেন একটা স্বাধীন চিত্ত যেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

আমি ক্লাসে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বিশেষ করে মিশে পড়লাম। তখনকার দিনে অনেক ছেলে বাংলা-স্কুলে পড়ে ছাত্রবৃত্তি পাস করে ইংরেজী স্কুলে পড়তে আসত। স্বভাবতঃই তারা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে ইংরেজী স্কুলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হত। আমার সঙ্গে যাদের আলাপ হয়েছিল তার মধ্যে দুজন ছিল এইরকম বড় ছেলে। পঞ্চম শ্রেণীতে (এখনকার ষষ্ঠ ক্লাসে) যখন পড়ে তখন তাদের গোঁফ-দাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল। এরা পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। তাদের অভিভাবকরা কলকাতায় বিষয়কর্ম করতেন।

একদিন তারা আমাদের বাড়িতে আসে দেখাশুনা করতে। ছাত্রবন্ধুরা বাড়িতে এলে একটু জলযোগের ব্যবস্থা করতে হয়। আলাপ-সংলাপের মধ্যে যোগেন কর্মকার বলল, 'এখন থেকে একটু লেখা-টেখা অভ্যাস করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় লিখে ভারী নাম করে এসেছেন।' মহেন্দ্রও তাতে সায় দিল। এসে গেল খাতা-পেন্সিল। তিন বন্ধু লিখতে আরম্ভ করলাম। চিন্তার নেতা হয়েছিল কর্মকার। আমি বললাম, 'লেখা তো আসছে না। কি ক'রে লেখা যায় ?' মহেন্দ্র বলল, 'আগে ভাব আন।' উত্তর দিলাম, 'ভাব যেন এল, ভাষা জুটবে কি করে ?' মহেন্দ্র জবাব দিল, 'ভাব তো আগে আন।' যোগেন সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো ঠিক। ভাব এলেই ভাষা এসে যাবে। ভাব রাজা, ভাষা তার দাসী। পিছনে পিছনে ছুটতে বাধ্য।'

এখন সমস্যা হল ভাব কি করে আনা যায় ? যোগেনের পরামর্শ হল কোন

একটা বিষয়ে মন সন্নিবেশ করতে হবে। তা হলেই ভাবের বন্যা বইবে। ধরা যাক, শীতকালে সকালে জলে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কল্পনা করা গেল—গঙ্গায় আগুন লেগেছে। মাছের কি হবে? চিন্তা করতে এল, ভাব। মহেন্দ্রও এই যুক্তি সমীচীন বোধ করল। এরপর প্রশ্ন হল, কি লেখা যাবে। পদ্য না গদ্য? আমি বয়সে ছোট বলে যোগেন স্থির করে দিল যে কবিতা লেখা সবচেয়ে সোজা। কবিতাই লেখা হোক। খানিক চেষ্টা ও মানসিক কসরত করে কেউ কিছু লিখতে পারলাম না।

কর্মকার বলল—গম্ভীর হয়ে ভাব। সবাই মুখ গম্ভীর করে বসা গেল। ফল হল না কিছুই। চোখাচোখি হলে হাসি আসে। মুখ ফিরিয়ে বসার হুকুম হল। তাও হল খানিকক্ষণ। কিন্তু চোরা-চোখ ঘাড়ের মুণ্ডু ধরে ঘুরিয়ে এক কোণ দিয়ে দেখে ফেলতে লাগল। তাতেও এল হাসি। এক লাইনও লেখা হল না।

এমন সময়ে চাকর খাবার ও জলের গ্লাসগুলি রেখে গেল। বাঁচা গেল! কাগজ-পেন্সিলও রেহাই পেল। খাবারগুলির সদ্‌ব্যবহার করে বন্ধুদ্বয় যে যার বাড়ি চলে গেল।

আমার দাদা এদের দেখেছিলেন। তারা চলে গেলে আমার কাছে খোঁজ নিলেন, তারা কে? আমি যখন বললাম—আমার সহপাঠী, তখন তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলে উঠলেন, 'তোমার সহপাঠী? বল কি? একজন হচ্ছেন পিতামহ ব্রহ্মা, আর একজন দক্ষ প্রজাপতি!'

কয়েকদিন যায়। আমার মনে একটা ভ্রম উপস্থিত হয়েছিল। সেটার সঙ্গে মানসিক সংঘর্ষ চলছিল। কিছুতেই গোলযোগ মিটছিল না। তমলুকে যে দিকটা পূব ছিল, কলকাতায় সেটা হয়ে গেছে পশ্চিম। আর তমলুকের পশ্চিমটা হয়ে গেছে কলকাতার পূব। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই রকমে। তমলুকে ঘুম থেকে উঠলে গাঙের ওপারে দেখা যেত উঠন্ত সূর্য। কলকাতায় সন্ধ্যার সময় সূর্য দেখা যায় গঙ্গার ওপারে। ঠিক তমলুকের বিপরীত। সেখানে ছিল বাড়ির সামনে। এখানে হচ্ছে পেছনে। বাড়ির সঙ্গে নদীর সম্পর্ক উল্টে গেছে। এইটা হচ্ছে আদত কথা। নদী, শোবার ঘরের জানালা, রাস্তার ওপর বাড়ির দরজা যে-মুখো—এইরকম কয়েকটা স্থির ব্যবস্থান দিয়ে মানুষের মন দিক্-বোধ সম্পর্কিত হয়ে যায়। ঠাঁইনাড়া ও ব্যবস্থানগুলির পরিবর্তন ঘটলে দিক্-বোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। নতুন জায়গায় কিছুদিন বসবাস করতে করতে মন অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং ভুল ভেঙে যায়। তমলুক ও কলকাতা দু-জায়গায়ই বাড়ির সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ছিল। কলকাতা নদীর পূর্বে অবস্থিত। তমলুক নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং রবির উদয় ও অস্ত প্রথমটা মনে ভুল ধারণার উৎপাদন করে। তমলুকের বাড়ির

রাস্তার ওপরের দরজা ছিল পশ্চিমমুখো। কলকাতায় সেটা উত্তরমুখো। আপেক্ষিক সম্পর্কগুলি মনের দাগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে একটু সময় লাগে। মন চঞ্চল, গতিশীল ; আবার কিছু কিছু বিষয়ে নোঙর ফেলে স্থিতিসম্পন্ন হয়ে যায়।

সে যাই হোক, কর্মকার এই দিক্‌ভুলের কথা শুনে সাব্যস্ত করলে, গঙ্গাতীরে এসে গঙ্গাস্নান না করে যে পাপ সঞ্চয় হচ্ছে তাতে আমাকে ভ্রান্ত করে রাখছেন ধর্ম। কলি হলে কি হবে ? তবু 'এক পো' ধর্ম তো বিরাজ করছেন ? কর্মকারের যুক্তি এইরূপ—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রয়াগে মিলে হয়েছেন 'যুক্তবেণী'। তারপর স্রোত বইতে বইতে হুগলির ত্রিবেণীতে এসে হয়েছেন 'মুক্তবেণী'। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী আবার আলাদা আলাদা হয়ে গেছেন। কলকাতার পার দিয়ে গেছেন যমুনা, মাঝে আছেন সরস্বতী। আর হাওড়ার ধার দিয়ে যাচ্ছেন মা-গঙ্গা নিজে। সুতরাং এপারের লোকেরা ভস্মে ঘি ঢালছে। গঙ্গা নেয়ে গঙ্গাহীন থেকেই যাচ্ছে।

সুতরাং এ ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্ততঃ একদিনের জন্য দূর করতে হবে। একদিন গঙ্গা নেয়ে এলে সারা জন্মের কাজ হয়ে যাবে।

এর ওপর আর কথা আছে ? আগামী শনিবার ছুটি আছে। স্কুলে, রবিবার ছাড়াও মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার ছুটি থাকত। এটা ছিল তৃতীয় সপ্তাহের শনিবার। ঐ দিন দুই বন্ধু পুণ্যি করে আসব ঠিক হল।

পরদিন গঙ্গাস্নানের পালা। দুই বন্ধু, পুণ্য অর্জনের জন্য, তৈলমর্দনে বিরত থেকে শুধু একটি করে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। গঙ্গার ঘাটে এসে লাগল গণ্ডগোল। প্রথম ডুবটা কোথায় দেওয়া যাবে ? গঙ্গায় ? যমুনায় ? অথবা সরস্বতীতে ? বেশ খানিকক্ষণ ভাবনা-চিন্তা তর্ক-বিতর্ক হল। নদীর ধারে এসে—উপস্থিত গঙ্গা-নাম উঠিয়ে দেওয়া গেল। স্নান করা মানে নদীতে স্নান, সর্বাঙ্গীন স্নান। কোন একটা অংশে তো স্নান নয়। সুতরাং একঘাটে ডুব দিয়ে যা কাজ হয় তা তো করতেই হবে। কিন্তু ভাগ্যবশতঃ এখানে তিনটি নদী পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই, কাকে বাদ দিয়ে কাকে খাতির দেখান হবে ? অবশেষে স্থির হল তিন জায়গার আলাদা আলাদা স্নানের ফল নিতে হবে। প্রথম কোথায় ? কর্মকার সূত্রধর। সে যা বলেছে ঠিক, তাই হচ্ছে ঠিক। এপারে তো স্নান সহজেই হয়, সবার হয়। এতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। তাছাড়া শাস্ত্র-বিগর্হিত। শাস্ত্রে বলেছে—"গঙ্গা যমুনাচৈব"। কে আগে, কে পরে এতেই বলে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সরস্বতীকে স্তোত্রানুযায়ী শেষে পাওয়া যাচ্ছে না, মাঝে পাচ্ছি, সেহেতু সরস্বতীতে আগে ডুবটা দিয়ে নেওয়া যাবে। তারপর ওপারে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে অশুচি ও পাপের বোঝা নামিয়ে দিয়ে এপারে চলে আসা হবে। সবশেষে যমুনায় ডুব দিয়ে বাড়ি যাওয়া হবে। কর্মকার বড় জবরদস্ত নিয়মানুগ। শাস্ত্রের (কমা,

সেমিকোলন) প্রথম ছেদ, দ্বিতীয় ছেদটি না মানিয়ে ছাড়বে না। সে তার দিদিমার কাছে শুনেছে ত্রিবেণীতে স্নান করলে নেড়া হতে হয়। "প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, যা রে পাপী যেথা-সেথা"। এও আমাদের প্রয়াগে স্নানের চেয়ে কিছু কম ফল হবে না। আমার নেড়া হতে আপত্তি ছিল। কর্মকারও নাছোড়বান্দা। অবশেষে এক ধর্মসঙ্কট উপস্থিত হল। বাপ-মার অকল্যাণ ক'রে পুণ্য হয় কি না? এখানে জেগে গেল এই প্রশ্ন। দুজনেরই বাপ-মা জীবিত। তাঁদের বর্তমানে গঙ্গা নেয়ে নেড়া হওয়া চলে কি না? সে মীমাংসা কি করে হবে? কে করবে? দায়ে পড়ে ঘাটের উড়ে-ঠাকুরকে একটি পয়সা দিতে হল। সে তাড়াতাড়ি তেলের শিশি এগিয়ে দিল। 'উঁহু', আমরা তেল মেখে পাপ করতে পারব না।' 'তেবে ক'ড় মাঙ্গুচি?' ভক্তিভরে কর্মকার অমাদের বিপদের কথা জ্ঞাপন করল। তখন উড়ে-ঠাকুর বলল, 'সে কিমতি হব? সে হই পারি না।' যাক, বাঁচা গেল। বিধান নেওয়া গেল। পুণ্যও হবে, নেড়াও হতে হবে না। আমার প্রাণটা আনন্দে লাফাতে লাগল।

পারের নৌকায় দুই বন্ধু চেপে বসলাম। প্রয়োজনমতো লোকজন জমা হতে নৌকা ছাড়ল। মাঝিরা সামনের দিকে, দুজন দুপাশে বসে দাঁড় টানতে লাগল। একজন মাঝি হাল ধ'রে মাঝে মাঝে ঠেলা দিতে লাগল। একটা মাল-টানা জাহাজ ভোঁ-ও-ও করে বাঁশী বাজিয়ে দিল। কর্মকার বন্ধু গা টিপে শুভলক্ষণের সূচনা বুঝিয়ে দিল—'কর্মারম্ভে শঙ্খ-নিনাদ প্রশস্ত। আমাদের সেটার বন্দোবস্তের ত্রুটি সত্ত্বেও কেমন যোগাযোগ ঘটে গেল! দেবতারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন।' হবে না বা কেন? শুদ্ধ সংকল্প কর্মকারের তো বটেই। মাথার ওপরের হালকা মেঘ থেকে দু-চার ফোঁটা জল গায়ে পড়ল। কর্মকার আস্তে আস্তে বলল, 'দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে সাধু সংকল্পকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন'।

নির্ঝঞ্ঝাটে নৌকা চলতে লাগল। গঙ্গার মাঝামাঝি জাহাজটা সামনে দিয়ে ঢেউ তুলে চলে গেল। নিস্তব্ধ কলকাতার গঙ্গার পক্ষে তাকে 'উত্তাল তরঙ্গমালা' বললে অপরাধ হবে না। গঙ্গাবক্ষে চঞ্চল, চপল ঢেউ নৌকাকে কিছু ব্যতিব্যস্ত করতে, হালের মাঝি 'হেই হুঁশিয়ার' বলে চিল্লিয়ে উঠল। সবাই সাবধান। এমন সময়, কথা নেই বার্তা নেই—দুই বন্ধু, আমি ও কর্মকার ঝপাঝপ করে ঝাঁপিয়ে জলে পড়লাম। হাঁ, হাঁ, হাঁ—কি হল? কি হল? আরে, আস্ত দুটো লোক ঘটির মত টপ্ করে ডুবে গেল! গ্রহের ফের। যার যা কপাল! আধ মিনিট পূর্বেও নিঃশ্বাস পড়ছিল ছেলে দুটোর। স্ত্রী-যাত্রীরা বলে উঠল—ওই যা! কি পোড়া-কপালি মা গো এদের!

মাঝিরা ঘাবড়ে গেল। 'হামাদের কোন কসুর নেই', বলল মাঝিরা। সবাই

সন্ত্রস্ত, সন্তপ্ত। হঠাৎ কালো হাঁড়ির মতো কী দুটো অদূরে ভেসে উঠল। ভেসেই আবার ডুবল। 'আরে—তোল, তোল' করে সবাই চেঁচাতে লাগল। মাঝিরা নৌকা কাছাকাছি নিয়ে চলল। এদিকে তো এই। ওদিকে হচ্ছিল—'এক ডুবে শুচি, দু-ডুবে মুচি' ইত্যাদি। কর্মকার মন্ত্র পড়াচ্ছে এবং দুজনে টপাটপ ডুব মারছি। চার ডুবের পর আমরা ভেসে নৌকার দিকে আসতে লাগলাম। কর্মকার উদ্বেগগ্রস্ত মাঝি ও পারের যাত্রীদের এক হাত তুলে প্রবোধ দিতে লাগল—'ভয় নেই, ভয় নেই—আমরা এখুনি নৌকায় উঠছি।' ডুবিয়ে মারার অপবাদ ও গঞ্জনা থেকে রেহাই পেয়ে মাঝিদের ভয়-ভাবটা পাল্টে গিয়ে দাঁড়াল ক্রোধে ও আক্রোশে। 'বদমাস সব পারের পয়সা দেবার ভয়ে ভাগছিল। মার লগির গুঁতো। দেব জলপুলিশের হাতে ধরিয়ে। শয়তান দুটো এখনই আমাদের হাতে দড়ি দিইয়েছিল।' এইরকম গালিগালাজ করতে করতে কর্মকারকে কাছে পেয়ে পাঁজরায় দিল লাগিয়ে লগির দুই গুঁতো। পুণ্য করে আত্মা যতটা ওপরে উঠেছিল, তার চাইতে বেশী উচুঁতে তোলার উপক্রম হল এই অপঘাতের ব্যবস্থায়। 'আত্মারাম খাঁচা ছাড়া রে—' বলে কর্মকার চিত হয়ে ভেসে উঠল। 'আহা, মারা গেল রে ছোঁড়াটা—' বলে চেঁচিয়ে উঠল শাক-সব্জী বেচে ফিরে যাচ্ছিল যে স্ত্রীলোকেরা। তারা মাঝিদের খুব বকতে লাগল। তখন ভয় পেয়ে মাঝিরা ঠাণ্ডা হল এবং একে একে দুজনকে নৌকায় তুলে নিল। যখন সবাই জানল যে তারা মাঝিদের পাওনা-গণ্ডা ঠকাবার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপ দেয় নি, সরস্বতীতে ডুবে পবিত্র হচ্ছিল, তখন মাঝিদের ঐ দুর্নাম এদের ঘাড়ে চাপাবার জন্য নিন্দা করতে লাগল। তবু এদের না বলে ঝাঁপ দেওয়া ঠিক হয় নি, একথাও বলল। সেই স্ত্রীলোকেরা এদের মহৎ উদ্দেশ্য জেনে গলে জল হয়ে গিয়েছিল এবং ভদ্রমহোদয়দের লজ্জা দিয়ে বলল, 'নিজেদের নাই ধর্ম, পরকে দেয় উপদেশ!' পুরুষরা জড়সড় হয়ে গেল। মাঝি মাপ চাইল গালি ও গুঁতা দেবার জন্য। পাছে খুনের দায়ে পড়তে হয় এই ভয়ে তারা বেখাপ্পা কাজ করে ফেলেছিল। বলা বাহুল্য, মাতৃজাতির মায়া, মমতা, সহানুভূতি এমন অযাচিত-ভাবে ভীষণ ভয় ও উপদ্রবের হাত থেকে আশ্চর্যরকমে নিস্তার করে আমার ও কর্মকারের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

নৌকা অপর পারে গিয়ে সালখে বাঁধাঘাটে লাগল। সবাই পয়সা দিয়ে দিয়ে নেমে গেল। আমরা দুটি ছেলেও। জলপুলিশ ডেকে মাঝিরা আমাদের বিড়ম্বিত করে নি। সেজন্য তারাও হল ধন্যবাদার্হ।

এবার গঙ্গা নাইবার পালা। কর্মকার আহত পাঁজরায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'জগন্নাথ থাকেন বিষ্ণুপঞ্জরে। বেটারা সেইখানটায় করেছে আঘাত। নিশ্চয় পাপ হবে। পাপ সঞ্চয় করল এই পুণ্য-পবিত্র দিনে। এইজন্য মাঝে মাঝে

মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে।' মার খেয়ে যে পরের কল্যাণ চিন্তা করতে পারে, সে না জানি কত বড় ? এই ভেবে আমি এক থাবড়া গঙ্গা-মৃত্তিকা তুলে নিয়ে কর্মকারের বেদনাস্থানে রগড়ে দিতে লাগলাম। প'য়তাল্লিশ মিনিট বাদে ব্যথা একটু নরম হলে আসল উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে মন গেল। এখন আবার নতুন তাজা সমস্যার উদ্ভব হল। এ সংসারটা কি ! সর্বদা উৎকণ্ঠায় কণ্টকাকীর্ণ। রাধা যখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করলেন, তখন কৃষ্ণ থাকলেন বাঁকা হয়ে। আবার রাধা যখন থাকলেন শক্ত হয়ে, তখন কৃষ্ণের পাগলামি দেখে কে !

কর্মকার মীমাংসা করে বলল, 'ভগবানের রাজ্যে সবই আছে। কিছুরই অভাব নেই। দুঃখ এই যে, সময়ে জুটে ওঠে না।' এ তো হল সাধারণ সমস্যার সাধারণ সমাধান। নির্বিশেষ থেকে বিশেষে এলেই না বাড়ে মুশ্কিল ? প্রশ্ন উঠল—গঙ্গায় তো স্নান করা হবে ; কিন্তু কোনমুখো দাঁড়িয়ে নাওয়া বিধিসঙ্গত ? কলকাতার ঘাটে নামলে এইদিকে মুখ করে লোকে নায়। এপারে এসে সেইটাই বজায় রাখা হবে ? কি, 'যত্র দেশে যদাচার' করা হবে ? যতই হোক, হাওড়া-সালখের লোক নিজেদের কলকাতার লোক বলার গৌরব হতে বঞ্চিত। এক-নদী বিশ ক্রোশ যে কথায় বলে, তা খুব ঠিক। গঙ্গা কতটুকুই বা চওড়া ? আধ মাইল বা তার চাইতে একটু বেশী। কিন্তু এপার-ওপারে কী ব্যবধান ! কলকাতা শহর। সে তুলনায় এপারটা পাড়াগাঁ। সুতরাং পাড়াগাঁয়ে এসে পাড়াগেঁয়ে হয়ে যাওয়াটা কি বুদ্ধির কাজ ? কর্মকারের এই যুক্তি শুনে আমার মনে আমাদের পাড়ার স'ত্তের কথা ভেসে উঠল। সে বলেছিল—দিনকতক বালাম চাল পেটে পড়ুক, তারপর কলের জল ও গ্যাসের আলো বাকী সব করিয়ে নেবে। কর্মকার নিজেই পাড়াগেঁয়ে ছেলে। সে কী চমৎকার নাগরিকতার দাবি গজিয়ে ফেলেছে !

অনেক বচসার পর ঠিক হল কর্মকারের মতে একবার এবং আমার মতে আর একবার স্নান সারতে হবে। একবার পশ্চিমমুখো হয়ে ডুব দিতে হবে, আর একবার পূর্বমুখো হয়ে। এরপর যথাবিহিত কর্ম হল। বেলা ন'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে, প্রায় বারোটা বাজানো হয়ে গেছে। ক্ষিদে খুবই পেয়েছিল। কর্মকার বলল—যমুনা-স্নান না করে মুখে কিছু দেওয়া চলবে না। আমি বললাম—তবে নৌকায় চড়ে কলকাতার ঘাটে যমুনা-স্নানটা সেরে ফেলা যাক। কর্মকার মাথা নাড়ল। সেদিনকার ত্রিবেণী-স্নান, প্রয়াগে তীর্থ করতে যাওয়ার সমান। তীর্থ পায়ে হেঁটে করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। তাই-ই সই। দুজনে হাঁটিতে হাঁটিতে হাওড়ায় পেঁছালাম। সেখান থেকে হাওড়ার পোল পার হয়ে কলকাতায় এলাম। পায়ে পায়ে চলতে-চলতে আবার নিজেদের ঘাটে এসে স্নান সমাধা করে বাড়িমুখো ফেরা গেল।

এদিকে বেলা প্রায় দুটো বাজে। আমার বাড়িতে খোঁজ পড়েছে। ছেলে গঙ্গা-নাইতে গেছে এখনও ফেরে নি। ভাবনায় অভিভাবকদের পেটের ভাত চাল হয়ে গেল। আমার মা-দিদি, পিতামহী-পিতামহ খেলেন না। চারদিকে লোক ছোটানো হল। এ ঘাট, ও ঘাট, সে ঘাট—কোনো ঘাট খুঁজতে বাকী রইল না। কোথাও কোন হদিস পাওয়া গেল না। ডুবে যাওয়ার ভয় বেশী। মরিচ শহরে (Mauritious Islands) চালান যাওয়ার ভয়ও কম নয়। পুলিশে খবর দেবার প্রস্তাব আলোচনা হচ্ছিল। কর্মকারের বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ।

পথে যেতে যেতে আমাকে ভয় জড়সড় করে ফেলল। আমাদের বাড়িতে সব সময়মতো হওয়ার রেওয়াজ। বেঢপ, বেনিয়ম কিছু হবার উপায় নেই। দশটার মধ্যে আমাকে খেয়ে নিতে হয়। কুড়ি মিনিট 'গ্রেস'—দয়ার দান। সে জায়গায় হয়ে গেছে দুটো! আমি ভয়ে-ভাবনায় আধখানা হয়ে গেলাম। অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম, এ অবেলায় বাড়ি না গিয়ে মামার বাড়ি চলে যাওয়া ভালো। সেখান থেকে দিদিমাকে উকিল ধরে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর আশ্রয়ে বাড়ি ফিরব। দিদিমাকে এই বিপন্ন অবস্থায় ধরা যে কতটা বুদ্ধির কাজ তা যাদের দিদিমা আছেন তারা বুঝবে।

জলে ডুবে-ডুবে চোখ লাল, মাথার চুল তৈলহীনতায় এবং রোদ লেগে রুক্ষ ও উস্কখুস্ক, ভিজে কাপড়, কাঁধে গামছা—অনাহারে চোপসানো চেহারা—দিদিমা দেখবামাত্র চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে কর্তা এলেন, আমার অন্ত্যেষ্টি করে! ঠিক মড়াপোড়ানো চেহারা হয়েছে।' তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়ে বললেন, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? তোদের বাড়ি থেকে তিনবার লোক খুঁজে গেল। তোর মা, ঠাকুমা, দিদি পাগল হয়ে গিয়েছে! ঠাকুর্দার তো কথাই নেই।' আমি দিদিমাকে চিনতাম। কোন্ নাতি না চেনে? দিদিমা আমাকে জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়াতে বসলেন এবং একে একে সব কথা শুনে গালে হাতের চেটোর উল্টো দিকটা ঠেকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'মাগো কি হবে! ঠিক দাদামশাইটি ফিরে এসেছে! তিনিও নাইতে গিয়ে সবাইয়ের নাওয়া-খাওয়া বন্ধের যোগাড় করতেন। শীতের দিনে ফিরতেন অবেলায়। গায়ের শাল অদৃশ্য, গরদের কাপড় চুলোয় গেছে। খালি গা—গামছা-পরা। পথেঘাটে যার কষ্ট দেখেছেন টাকা-পয়সা, শাল-দোশালা, মায় পরনের কাপড়টুকু বিলিয়ে দিয়ে আসতেন। বললে, বলতেন—'সবই শিব। যত জীব, তত শিব। কার কষ্ট দেখব?' আমি অপ্রতিভ হয়ে আত্মরক্ষার্থে বললাম, 'আমি কেন দাদামশাই হতে যাব? আমি তো কাপড় পরেই এসেছি।' দিদিমা অমনি আদর করে বললেন, 'না ভাই, না। তোমার কোন্ শত্রু বলবে তুমি ন্যাংটো হয়ে ফিরেছ? শুধু পাপ অন্ত করতে ওপার অবধি ছুটেছিলে!'

পরে দিদিমার দৌলতে আমি ভালোয় ভালোয় বাড়িতে ঢুকতে পেরেছিলাম।

দশম সংস্কারের জায়গায় একাদশ সংস্কারে আমার গাল ও পিঠ লাল বা দাগগ্রস্ত হয় নি বা হতে পারে নি। নিশ্চয় ধর্মের জয়। বিশ্রী অবস্থাটিকে মিষ্টি করতে দিদিমার প্রণালী বেশ মধুর ও মোলায়েম। তিনি আমাকে আমাদের বাড়িতে নতুন পরিচয়ে পরিচিত-করে দুঃসহ চাপা বাতাসটিকে বেশ হালকা করে দিলেন। বাড়িতে ঢুকেই আমার পিতামহীকে সম্বোধন করে বললেন, 'আজ আমরা জোড়ে এসেছি, বেয়ান! আমার নতুন বরটিকে কেউ কিছু বলতে পারবে না কিন্তু।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলকাতায় এসময় কয়েকটা লক্ষ্য করার জিনিষ ছিল। গায়ের জোর ও সাহসের খেলায় লোকেদের খুব ঝোঁক দেখা যেত। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তি ও জিমনাস্টিকের আখড়া ছিল। এ বিষয়ে দুটি লোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দর্জিপাড়ায় অম্বু গুহের আখড়া কুস্তি বিষয়ে অগ্রণী ছিল। আমার ছোটকাকা গৌরবাবুর জিমনাস্টিকের আখড়া শুধু কলকাতা ও শহরতলি ছাড়া হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত ছিল। এঁর ছাত্ররা কয়েকটি সার্কাস খুলেছিলেন। তার মধ্যে প্রোফেসর বোসের সার্কাস ছিল বিখ্যাত। গৌরবাবু সঙ্গীত-বিদ্যাতেও ছিলেন অসাধারণ। যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর অধিকার খুব বেশী ছিল। সাহসী ও বলিষ্ঠ না হলে দেশের কাজ এগুবে না, এই তাঁর ধারণা। অনেক স্কুল-কলেজে ছিল তাঁর জিমনাস্টিকের ক্লাব।

গায়ের শক্তি দিয়ে দেশ বড় করবার কথায় তিনটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। প্যারিস মহামেলায় শারীরিক শক্তিতে গোলাম পালোয়ান ভারতের নাম আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় করে দিয়ে আসেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতে বসেই ভারতকে বড় সাব্যস্ত করিয়েছিলেন। তাঁর নাম পালোয়ান করিম বক্স। টম ক্যানন্ নামে বিশ্ববিজয়ী মল্ল ঘুরতে ঘুরতে ভারতে আসেন। এখানকার বাজিটা মেরে গেলে সর্বত্র তিনি অপরাজেয় প্রতিপন্ন হতেন। এ অবস্থায় করিম বক্সের সঙ্গে হয় কুস্তি। করিমের বয়স তখন বেশী নয়। ছোকরা বললেই হয়। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ছিলেন বিচারক। টম ক্যানন্ অতি সহজেই পরাস্ত হন।

তৃতীয় বীর স্বনামধন্য পালোয়ান গামা। ইনি আমেরিকায় বিশ্ববিশ্রুত বলী জেবিস্কোর সঙ্গে কুস্তি করেন। সেখানে বাজি অমীমাংসিত থেকে যায়। পরে জেবিস্কো ভারতে আসেন লড়তে। এখানে গামা অবলীলাক্রমে তাঁকে পরাস্ত করেন। বিদেশে না গিয়েও নাম করেছিলেন কিক্কড় সিং। ইনি ছিলেন গোলাম পালোয়ানের সমকক্ষ।

জিমনাস্টিক বা সার্কাসে দু-একটা উল্লেখযোগ্য কথা আছে। হরাইজণ্ট্যাল বার ও ফ্লাইং-ট্র্যাপিজের খেলা খুব শক্ত ও সাহসের। এ বিষয়ে কৃষ্ণ বসাক ও রমন মুখার্জী বিলাতী সার্কাসে সাদরে গৃহীত হন ও পৃথিবীর নানা দেশে খেলা দেখিয়ে যশস্বী হন।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরবাবু দুজনেই বাঘের সঙ্গে লড়তেন। বুকে পাথর-ভাঙা ও বাঘের সঙ্গে লড়ায় শ্যামাকান্ত খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে ইনি

সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং 'সোঽহং স্বামী' নামে সুবিদিত হন। ভারতীয় সার্কাসের জন্মদাতা এঁরা দুজনে। গৌরবাবুর শিষ্য প্রোফেসর মতিলাল বসু নিজ নামে একটি সার্কাস (প্রোফেসর বোসের সার্কাস) খুলে বেশ সুনাম অর্জন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ খুব খুশী হয়ে উৎসাহ দেবার জন্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বলেন, 'মতি দেখিয়ে দিয়েছে, বাঙালীর দৈহিক বল কি করতে পারে।'

'বন্দোমাতা' আর একটা জিনিষ। এটি একেবারে যাকে বলে 'মাস মুভমেণ্ট (mass movement)'—জনসাধারণের বিনোদনের জিনিষ। এদেশে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে যখন শোয়া-বসা চলে, তখন পাল-পরব বাদ যাবে কেন? এইজন্যই তো এদের উদ্ভব। পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তির দিন বিভিন্ন জাতের লোক দল বার করত। তারা গান গাইতে গাইতে যেত। নানারকম সেজে বেরুত—নাচত ও গাইত। ঠাকুরবাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছড়া কাটত। নিমতলার আনন্দময়ী (কালীবাড়ি), বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে খুব ভিড় এইদিন দেখা যেত। ছড়ায় সর্বজনীন দোষগুণের উল্লেখ থাকত। সমাজের কল্যাণার্থে কী কী দোষ ত্যাগ করা উচিত তাও বলে দেওয়া হত। তাছাড়া এর মন্দ দিকও ছিল। পাড়ায় পাড়ায় নাচ, গান, কবিতার প্রতিযোগিতা অনেক সময় ব্যক্তিগত কুৎসাদি রটনায় নেমে এসে খুব মারপিট সৃষ্টি করত।

তৃতীয় যে জিনিষটি আমার চোখে পড়েছিল সেটি হচ্ছে এই। স্কুল ছুটির সময় স্কুলে স্কুলে মারামারি অনেক সময় লেগে যেত। তার মূলে ছিল নিজ নিজ পাড়ার প্রতি অতিরিক্ত টান। 'লোক্যাল পেট্রিয়টিস্‌ম (local patriotism)' তাকে বলা যেতে পারে। বৌবাজারের একটি ছেলেকে যদি মারে শাঁখারীটোলার ছেলে, তাহলে বৌবাজারের ছেলেরা গিয়ে শাঁখারীটোলার ছেলেকে মেরে শোধ নেবে। এই ধরনের ছাত্র-হিংসা আমি কখনও কল্পনা করতে পারতাম না।

আমি ছাত্র-অবস্থায় শারীরিক বলবৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম-শিক্ষা করতে লাগলাম। বাকী দুটোতে ভাগ নিতাম না। দ্বিতীয়টি ছাত্রদের জিনিষই ছিল না।

এরূপ মারামারি 'দর্জিপাড়ার ছেলে'-'বাগবাজারের ছেলে' ক্ষুদ্রতাজনক। তাই আমার মন এসবে সায় দিত না। অন্যায় ক'রে কেউ কাউকে না মারে, আপোসে নিষ্পত্তির জন্য, ছেলেদের মধ্যে একটি বৈঠক গড়ায় মন দিলাম। অনেকটা কৃতকার্যও হলাম।

তবে যা তমলুকে দেখি নি, এখানে দেখেছিলাম তা হচ্ছে—সখের যাত্রা, সখের থিয়েটার, পেশাদারী থিয়েটার ও কনসার্ট পার্টি। অভিভাবকরা এইসব 'শিল্পীদের' সঙ্গে ছেলেদের মিশতে দিতে চাইতেন না। এদের সঙ্গে মেলামেশা করলে ছেলে 'বোখে' যাবার সম্ভাবনা খুবই। 'লেখাপড়ার দফা 'গয়া' এবং স্বভাবচরিত্র 'মা-গঙ্গা'

হয়ে যাবে। কোটেশনের উদ্ধৃত কথাকয়টি খাস কলকাতার বুলি। এ আন্দাজে মারবার জো নেই। কষ্ট করে শিখতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি দক্ষিণাচরণ সেন, গৌরহরি মুখার্জি ও তাঁর ছাত্র বটকৃষ্ণ বসাক প্রভৃতি এসবের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের সখের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটা সংস্কার আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।

এসময় গীতাভিনয়গুলিতে বীরভাবাদর্শে যে ক্ষুণ্নতা প্রকটিত হত তা অবধানযোগ্য। 'অভিমন্যু-বধ' খুব একটা জনাদৃত পালা। অভিমন্যু লড়তে যেতে চায় কিন্তু তার আত্মীয়দের মধ্যে সে কী আগে থেকে মড়াকান্না, কাতরতা!—"দাদা, অভি, কেন যাবি সেখানে। সে তো রণক্ষেত্র নয়, যমেরই আলয়—কত হত হয় সেখানে"। আগে থেকেই মন খারাপ করে দেয়। এই গান শুনে কেউ কেউ বিমর্ষ হতেন, কেউ কেউ গালি দিতেন—'এই জাত আবার বীর হবে, অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করবে?'

বাগবাজারের একটি বাবুর সখের-যাত্রার দল ছিল। তিনি অভিমন্যু-বধের এ কলঙ্ক দূর করিয়ে পালা লেখালেন। নিজে সাজতেন ভীম। একটু তোতলা ছিলেন। কথা আরম্ভ করতে তোত্‌লে ফেলতেন। তারপর বেশ চালিয়ে যেতে পারতেন। অভিমন্যুকে কেমন বীর সাজিয়েছিলেন দেখা যাক। চোদ্দ বছরের ছেলের সঙ্গে মহারথীরা—ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কৃপ, অশ্বত্থামা—দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করলেন। বীরোচিত কার্য বটে। বললেন—'তুমি শিশু, তোমার সঙ্গে কি লড়ব?' এখন প্রণিধান করা হোক অভিমন্যু কী জবাব দিল—

"বিশাল বারিধি-বক্ষে বীচি বিঘূর্ণিত
আস্ফালে ভেলকে যথা—
রে মূঢ়, শিশু বলি, উপেক্ষিলি মোরে?"

—এরূপ জ্বালাময়ী ভাষা অনর্গল উদ্‌গীরণ করা চোদ্দ বছরের ছেলের পক্ষে তারিফের বিষয় অবশ্য। অভিধানখানি সঙ্গে না নিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়ে অনেককে হয়ত পস্তাতে হয়েছে। তা হোক। কিন্তু অভিমন্যুর বীরোচিত, তেজোদৃপ্ত, আগুন-ছোটানো ভাষা শ্রোতাদের কাউকে কাউকে কেমন আত্মভোলা করে দিত তা হৃদয়ঙ্গম হবে, শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে যখন কেউ ভাবাবেগে আপনহারা হয়ে বলে উঠতেন, 'বাঃ রে বাচ্চা, গঙ্গারাম!' অধিকারী মশায় ধন্য হয়ে যেতেন।

একদিন 'অভিমন্যু বধ' শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার ও কর্মকারের। যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হয়ে যখন কাতরোক্তি করলেন—

"কি হবে বল না ভীম আজিকার রণে?
জয়দ্রথ হের আসি, নাশিতেছে সৈন্যগণে।"

ভীম ভীমোচিত উত্তরে বললেন—

"ভেবো না, ভেবো না তুমি,
শশী ধরে দিব আমি।"

সে কি হাততালির ধূম! দর্শকের মধ্যে থেকে শোনা গেল—ক্যা কহ্না, বহুত তোফা! ভীম আসর গ্রহণ করলেন সেই জায়গাটায়, যেখানে আমাদের দুটিকে দেখার সুবিধার জন্য দয়া করে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কর্মকার খুব উৎফুল্ল। সে নিজেই একটু বীরভাবের লোক ছিল। প্রয়াগতীর্থকে কলকাতায় টেনে আনার শক্তি ইতিপূর্বেই সে দেখিয়ে দিয়েছিল। সে আস্তে আস্তে আমাকে বলছিল, 'এর নাম যাকে বলে "পালা"। আগাগোড়া বীররস, রক্ত গরম করে দেয়!' ভীম এই কথা কয়টি শুনতে পেয়ে হাসি-হাসি মুখে কর্মকারের দিকে চেয়ে বললেন, 'কার পার্ট ভালো হয়েছে?' কর্মকার উত্তর দিল, 'সবারই।' ভীম পুনরপি প্রশ্ন করলেন, 'ভীমের পার্ট?' কর্মকার সরল অন্তরে জবাব দিল, 'ভালো হয়েছে, তবে কথাগুলো একটু একটু তোত্‌লে যাচ্ছিল।' হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রাঘাত যাত্রার আসরে! 'বে-বে-বে-বেটাচ্ছেলে, তো-তো-তোর বাবা কখনও যাত্রা করেছে?'—হুংকার দিলেন ভীম। বীররসের জায়গায় বিনা কারণে, অকস্মাৎ এইরকম বীভৎস রসের আপ্যায়ন শুনেই আক্কেলগুড়ুম কর্মকারের। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। পাঁচজনে ব্যাপারটা আর বাড়তে না দিয়ে, ভীমমশায়কে অনেক ব'লে-বুঝিয়ে থামিয়ে দিল। যাত্রা চলতে লাগল। সুভদ্রা কৃষ্ণের বোন এবং অর্জুনের স্ত্রীর মান রেখে বিদায়-পর্ব সারলেন। বেরুলেন এবার উত্তরা। তরুণী স্ত্রী, তরুণ স্বামীকে যে বিদায় দিচ্ছেন তা চিরবিদায়েও পরিণত হতে পারে! স্বভাবতঃ করুণ রস এখানে দেখান হল। যথোপযুক্ত ভাব ও ভাষায় বিদায় দেওয়া ও নেওয়া হল।

'অরাতি দলিয়ে আসিব ফিরে, শারদ-শশী-বদনী' বলে বীরের মতো অভিমন্যু গটগট করে চলে গেলেন। মনে হল, রঙ্গমঞ্চের সেকালের অভিমন্যু ও একালের অভিমন্যুতে যে তফাত ধরা পড়েছে, তাতে বোধহয় জাতটা বীরধর্মের দিকে এগুচ্ছে।

এরপর অভিমন্যুকে সপ্তরথীর ঘেরাও। ভীম বিপন্ন বালকের কণ্ঠস্বর পেয়ে সাহায্যে যাচ্ছেন আর জয়দ্রথের কাছে হেরে-হেরে ফিরে আসছেন। শেষে বংশের বাতিটিকে বাঁচান ঠিক করলেন। স্থির করে ফেললেন, দীনহীনভাবে দাঁতে তৃণ দিয়ে জয়দ্রথের কাছে শিশুর প্রাণভিক্ষা চাইবেন। সেইভাবে তিনি এলেনও। জুড়িরা 'সিন্ধুপতি, পদে মিনতি' সমস্বরে গেয়ে উঠল। ভীমের অনুনয়-বিনয়-সূচক ভাবভঙ্গি প্রদর্শনে দুরদৃষ্টহত মহতের এমন অবস্থা বিপর্যয়ে বহু শ্রোতার চোখ সজল হল। ভীম আবার কর্মকার ও আমার কাছে বসলেন। ভয়ের ব্যাপার! বড় বড় চোখে, নিষ্পলক কঠোর দৃষ্টিতে এবার আমার দিকে তাকালেন। আমি

'এবারে গেছি' ভেবে সচকিতে তাঁর মুখের দিকে একবার তাকাই, একবার দৃষ্টিদাহ থেকে বাঁচার জন্য আসরে যে-দিকটায় গান হচ্ছিল সেদিকে তাকাই। ভীম সহসা আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'এবার কেমন লাগছে?' ভয়ে ভীত হয়ে আমি শুকনো গলা ভেজাতে ভেজাতে বললাম, 'ভীমের পার্টের তুলনা হয় না' অমনি পিছু ফিরে ভীম একজনকে আঙুলের ইশারায় কাছে ডেকে বললেন, 'এই, এই ছেলেটিকে নবীন ময়রার দোকান থেকে এখুনি একসের রসগোল্লা এনে দে।'

আমি ফাঁসির হুকুম হবে ভেবে মনে মনে ইষ্টনাম জপছিলাম। এখন রায় শুনে মরাদেহে প্রাণ ফিরে এল বোধ করতে লাগলাম।

বলতে হবে না, রসগোল্লা এলে কর্মকার তার অধিকাংশের সদ্ব্যবহার করেছিল। তার দরকারও ছিল বেশী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের দু'রকম মন। একরকম মন এই ধাঁজের গতানুগতিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছিল। তাদের সংখ্যা যথেষ্ট। আর একরকম মন আগামীর আগমন-ধ্বনি মনের কানে শুনছিল। "শুনি ময় হরি আওন কি আওয়াজ"। তাদের সংখ্যা কম। স্বপ্ন দেখছিল আর তাতে বিভোর থাকছিল। জেগে, ঘুমিয়ে সব সময় প্রত্যাদিষ্টের মতো শুনছিল—সে আসবে, আবার আসবে।

মানুষের ভবিষ্যতে আস্থা, মানুষে বিশ্বাস, আদর্শে নির্ভর, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, বাঁচার-মতো-বাঁচার জীবনব্যাপী ব্যগ্রতা সে-পথের পথিকের পরম বিত্ত। মহার্ঘ পাথেয়—একমাত্র পাথেয়।

দিগন্তে এক জায়গায় একটু রং পালটেছে। ছুটুক না মনের হরিণ ঐ মরীচিকার সবুজ ক্ষেতে। তার হারানো সুরটি হয়তো ঐ অন্তহীনে সে পেয়ে যেতে পারে! এমনি প্রতিবিম্বিত মুকুর ছিল যাঁদের মন, তাঁরা হঠাৎ ভবিতব্যতার অন্ধকার গর্ভ হতে একে একে দেখা দিতে লাগলেন। এলেন বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ। এলেন তিলক, গান্ধী। এলেন আবুল কালাম আজাদ। সহসা বিশ্ব দেখল—নব সৃজনীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এর অগ্রগতিকে বাধা দেয় এমন কোন শক্তি জগতে জন্মগ্রহণ করে নি। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষায় নিজ নিজ বিভাগে এক এক জন অপরাজেয় দিক্‌পালরূপে ভারতের ভাগ্যপটে দেখা দিয়েছেন। শুধু এইটাতেই এঁরা বড় থাকতে পারতেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়েছেন দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমী ব'লে। নিজেরা বড় হয়ে দেশকে বড় করেছেন। একজন সঞ্জীবনী-বাণী প্রচারক বুদ্ধের অন্তরালে কত নীরব বুদ্ধ ছিলেন। লোকলোচনের আড়ালের তাঁদের খবর ক'জন পেল? এখানেও তার প্রত্যবায় হয় নি। হতে পারে না। বিভিন্ন স্থানে প্রযুক্ত ক্ষুদ্র শক্তির সমবায়ে এক বিরাট বা বিশাল শক্তির উদ্ভব হয়। জড় জগতেও হয়। মনোজগতেও হয়। মহাপুরুষদের আবির্ভাবের এই নিয়ম। যে অজ্ঞাত বীররা এঁদের এনেছেন তাঁরাও আমাদের নমস্য। স্কুলের দিনেও তাঁদের আগমনীর পদধ্বনি কানে এসে পৌঁছত, একথাটাও স্মরণীয়।

বিবেকানন্দ এলেন। ধর্মের নামে নিষ্ক্রিয়তার বড়াই তিনি দিলেন একদম ভেঙে। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে সেবা করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" তাঁর ভিতর ছিল জাগ্রত অনুভূতি, হিমালয়-পরাজয়কারী কল্পনার দৌড়, বহু পূর্বাহ্নে আগন্তুকের দর্শনলাভ শক্তি। কবিচিত্ত। সর্বোপরি ত্যাগ ও বীর্য। দেশের দুর্দশা, সমাজের পতন রোগ, মনুষ্যত্বের দুরপনেয় অবমাননা,

পরাধীনতার হীনতা তাঁর অন্তঃসত্তাকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল, তেমনি হয়তো খুব কম লোককেই দিয়ে থাকবে। তিনি ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী কিম্বা আদর্শ সম-সমাজবাদী, এ বিচার করা দুষ্কর। তাঁর প্রাণের ব্যথা তাদের জন্য বেশী নয় কি—যারা দুঃস্থ, দুর্গত, দরিদ্র, পিষ্ট, বঞ্চিত, ন্যায় অধিকারের বাইরে অচ্ছুৎ? অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা সমস্যার সমাধান আগে রাখতেন। তারপর ধর্ম। তিনি নিজে রাজনীতি করেন নি। কিন্তু রাজনীতির আত্মদানমূলক আন্দোলনকে গোড়ার দিকটায় তিনি ছেয়ে ছিলেন। কৃষিপ্রধান সভ্যতা থেকে শিল্পপ্রধান সভ্যতায় যে সংঘর্ষের পথ মাড়িয়ে যেতে হয় তার প্রথমটা হয় ধর্মাবৃত রাষ্ট্রনীতি। বহুদিন পর্যন্ত স্বামীজীর প্রভাব বাংলার রাজনীতিতে ছিল। গান্ধীজী বলেন, তাঁরও জীবনে স্বামীজীর প্রভাব পড়েছিল।

জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র এযুগে সর্বপ্রথম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক। তাঁদের স্বাধ্যায়, গবেষণা, আবিষ্কার বিদেশীদের মনে প্রথম রেখাপাত করল যে, তন্ত্র-মন্ত্র ও কুসংস্কার সমাচ্ছন্ন ভারতীয় মগজে বিজ্ঞানের প্রতিভা ফুটতে পারে। এটা তো পাশ্চাত্ত্যরা অসম্ভব বলে ধরে রেখেছিল। এঁরা শুধু এই দিক দিয়ে আমাদের কাছে বড় নন। সবচেয়ে দামী হচ্ছে সেই দিকটা, যাতে তাঁরা ভারতকে নিজেদের ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ে ভোলেন নি। 'পোষ্যপুত্র' হয়ে যান নি। 'গোত্রান্তর'-এর মোহিনী শক্তিকে কাটিয়ে বহু উচ্চে উঠতে পেরেছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে যেসব পত্র লিখতেন তার প্রতিটি ছত্র দিয়ে তাঁর দেশপ্রেম ফুটে বেরুত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন অতি অসাধারণ। বিজ্ঞান-বিভাগ ছাড়াও শিল্প-প্রতিষ্ঠায় তিনি বাংলাদেশে অগ্রণী। যে আসছে সেই শিল্পসভ্যতার অসামান্য আগমন-ধ্বনি নির্ভুলভাবে কত আগে তিনি মনের মাঝে ধরতে পেরেছিলেন এবং তার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার নিরোধ করার জন্য তিনি যা করেছেন তার তুলনা হয় না। বাংলার বিপ্লবী রাজনীতিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও অর্থ-সাহায্যের কথা কয়জন জানে? কিন্তু এ কথা অবিসম্বাদী সত্য।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ এই দিক দিয়ে। যেমন কবি, তেমনি দ্রষ্টা—কত-কিছুর স্রষ্টা। তিনি শুধু সুন্দরের উপাসক নন, রুদ্রেরও পূজারী ছিলেন। বিশ্বজয়ী বিশ্বমানব। জগৎ কত দিক দিয়ে তাঁর কাছে ঋণী তার খতিয়ান শেষ হতে বহু বছর লাগবে। আমেরিকা হতে বহু লোক ভারত-দর্শনে আসত। গ্রন্থকার নিজের কানে কয়েকটি মার্কিনবাসীর মুখে শুনেছেন তাদের পরিক্রমা-সূচীর তালিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকত—টেগোর, তাজ, গান্ধী। এই তিনটি দেখলেই তারা মনে করত, ভারত দেখা শেষ হয়েছে।

বলা ভালো, এইখানে কারো জীবনের তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে না বা কারো পুরো জীবনের আলেখ্য দেখান হচ্ছে না। শুধু যাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন

এবং অসাধারণ দেশসেবী ও স্বাধীনতার অগ্রদূত, প্রয়োজনবোধে তাঁদের কয়েকজনের জীবনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। বিশেষ কারণ হচ্ছে যে, এঁদের জীবনে জেগে উঠে, নবজীবন লাভ করে দেশ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঘটনার কূটজালে আচ্ছন্ন পটভূমিকার ওপর আলোকসম্পাত করবে। তাই উল্লেখ করা হল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জগতের মুসলমান সমাজে বহুপূর্ব হতেই সমাদৃত ও সুপরিচিত। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের মর্মকথা অল্প বয়সেই ধরতে পেরেছিলেন। ধর্মান্ধ স্বসম্প্রদায়ের কাছে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ন্যায় আপন গন্তব্য পথে চলেছেন। কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি।

তিলক লাঞ্ছনা, ত্যাগ ও ক্লেশের পথে স্বরাজ-সাধনা নিয়ে আসেন। তাঁকে প্রকৃত রাষ্ট্রপিতা বলা যায়। তিনি বহু পূর্বে ধরতে পেরেছিলেন, এই পথেই প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে। এ ছাড়া পথ নেই। তিনিও আন্তর্জাতিক চরিত্র ছিলেন। অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও মেধায় জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুসন্ধান ও অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণার বই লেখাতে তিনি প্রচুর যশস্বী হয়েছিলেন। বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে তিনি গণ্যমান্য হয়েছিলেন।

গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার অবতার—জগতে একটা নতুন যুগ ও উন্নততর সভ্যতা আনার স্বপ্নে ভরপুর। নিজের জীবদ্দশায় তিনি যা পূজা পেয়ে গেলেন তেমনটি আর কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে ঘটে নি। ভবিষ্যতে এঁর প্রতি লোকের সম্মান, শ্রদ্ধা আরও বাড়বে বই কমবে না। এঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিতুল্য। এঁদের মনে মন্ত্র এল কেন তার মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ সমাজ ও রাষ্ট্রের পারিপার্শ্বিক যোগায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে ক্লাস বদলে গেছে। এবার একজন মাস্টার এসেছেন যিনি খিঁচুনি, চেঁচানো, বকুনি ছাড়া কথা কইতে পারেন না। কয়েকটি ছেলে এ ক্লাসে ছিল, যারা দোষ করলে বকুনি সইবে। কিন্তু বিনা দোষে ধমক-ধামক মানতে রাজী নয়। কর্মকার ও আমি ছিলাম তাদের ঝাঁকে।

কলকাতায় খুব প্লেগ হচ্ছিল। বহু লোক মারা যাচ্ছিল। একটি ছেলে টমরি সাহেবের বেত খেয়ে বাড়ি যায়। সেইদিনই জ্বরে পড়ে। তিনদিনের মধ্যে মারা যায়। তার বাড়ির লোক, ছেলে প্লেগে মারা গেছে না-ভেবে ধরে বসেছিল যে, মার খেয়ে যদি জ্বর না হত তবে তার প্লেগ-ই হত না। যাই হোক, এই ব্যাপারের পর প্রিন্সিপাল হেক্টর সাহেবের জায়গায় অস্থায়ী প্রিন্সিপাল ঋষিকল্প স্টিফেন্স সাহেব ছাত্রদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার একদম বন্ধ করে দিলেন। বেত শিকেয় তোলা রইল। প্রাণভরে ছেলেরা স্টিফেন্স সাহেবের যশোগান করতে লাগল এবং তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করতে লাগল। সবদিক দিয়ে ব্যবস্থা ভালো হল। কিন্তু এই নতুন মাস্টার নিজের মুদ্রাদোষ ছাড়তে পারলেন না। তিনি তেমন মনোরম বা ভালো করে পড়াতে পারতেন না। কয়েকটি ছাত্র শিক্ষককে শিক্ষা দিতে মনস্থ করল। অবশেষে প্যারীবাবু খবর জানতে পেরে, অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সৎ উপদেশ দিয়ে ছেলেদের থামিয়ে দেন। প্যারীবাবুকে ভয় করত না এমন ছেলে স্কুলে ছিল না। আবার তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাও করত সকলে। স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা তিনি না থাকলে রক্ষা করা সুকঠিন হত।

স্কুল কেন তখন মন কেড়ে নিতে পারল না, তা এ থেকে বোঝা যায়।

মনে সুখ নেই। শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো স্কুলে কতকটা বীতস্পৃহা এসেছে ছাত্রদের মধ্যে। ক্লাসের ঘর থেকে রাস্তা দেখা যেত। যখন ছেলেরা অপ্রিয় আবহাওয়ায় বন্ধ, সেই সময় দেখতে পেত বুকে চাদর বেঁধে কত লোক আপিসে যাচ্ছে। তাদের পড়া তৈরি করা, পড়া দেওয়া বা মাস্টারের কাছে অযথা দাঁতখিঁচুনি খাওয়ার বালাই নেই। শুধু তা নয়, সকালে-সন্ধ্যায় আড্ডা, দুপুরে আপিসে গল্প করতে করতে কাজ, বিকেলে বাড়ি আসা—হেঁটে বা ট্রামে এবং সেজন্য আবার মাইনে পাওয়া। বাড়িতে বেশী সমাদর। এই আলোর সঙ্গে ছাত্র-জীবনের ছায়ার তুলনা আপনার থেকে মনে আসে। ছেলেরা কেউ কেউ আপোসে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে। কর্মকার, সুরেশ এদের চাঁই। তারা আমাকেও বোঝাতে বোঝাতে দলে টানল। মায়ের হাতে মাসে মাসে টাকা দিতে পারব এই আনন্দপ্রদ চিন্তা হল আমার কাল।

কয়েকদিনের মধ্যে সুরেশ স্কুল ছেড়ে একটা কাজে লেগে গেল। তার আপিস হল পোলক স্ট্রীটে। সে এবার বেপরোয়াভাবে বন্ধুদের দেখিয়ে-দেখিয়ে এই পথ দিয়ে আপিস যেতে লাগল। অন্য পথ তার ছিল। সেদিক দিয়ে গেলেই পারত এবং সেটা হত স্বাভাবিক। কিন্তু 'ক্লাসফ্রেন্ড'দের বুকে জ্বালা দিতে সে এই রাস্তাটা নির্বাচন করেছিল। ফল যা হবার হল। সাধুদের দোষ নেই। কিন্তু বেওয়ারিস পুঁটুলি হাতের গোড়ায় ছড়িয়ে থাকলে তারা কি করবে? কর্মকারের মনে লাগল কাতুকুতু। সেই সুড়সুড়িতে সে হল বেসামাল। আমাকে স্বমতে আনল স্বাধীন জীবনের রংচঙে ছক এঁকে। আমি বললাম—চাকরি তো করা উচিত হবে না। কর্মকার বোঝাল, স্কুলে পড়ে যেমন বিদ্যা-অর্জন হয়, তেমন আপিসে কাজ করে ব্যবসার জ্ঞান অর্জিত হবে। সেই জ্ঞান খাটিয়ে তারা স্বাধীন ব্যবসায়ের ফার্ম খুলবে। বাড়ির ওপর পেটের ভাতের জন্য নির্ভর করা লজ্জাজনক নয়? এপথে বরং নিজের খাওয়া-পরা মিটিয়ে আরও দশজনকে প্রতিপালন করা যাবে। চিরকাল দাসত্ব করতে থোড়াই তারা যাচ্ছে। আর বেশী লেখাপড়া শেখার মানে? সেই তো চাকরিতে ঢোকা।

অনেক বিচার-বিবেচনা করে যখন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তখন আমি দিলাম তাড়া। সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করতে হবে।

একদিন দুই বন্ধু বেরুলাম স্কুলের কি একটা ছুটির দিনে। কেউ জানল না আমাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। বয়ঃবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ কর্মকারই এতাবৎ পথ-প্রদর্শক। কর্মকারের উদ্ভাবনী বুদ্ধির নিকট, বয়সে ছোট আমি, মাথা হেঁট করে থাকতাম। কর্মকার স্থির করল কোন আপিসে কাজ নেওয়া হবে। সে বলল—যে আপিসের পথে স্কুল চোখেই পড়ে না, সেই আপিসে যাবে। স্কুলের ছায়া আর মাড়ানো হবে না। সেই হতভাগা মাস্টারটার কথা যেন খুব শীঘ্র চিরতরে ভুলতে পারি। সে কিনা কর্মকারকে বলত—কামারের ছেলে হাতুড়ি পেটা গে না? কামারশালা ছেড়ে পাঠশালায় কেন? হাপর টানো-গে যাও।

পথে বেরিয়ে মনে পড়ল দরখাস্ত চাই। নইলে কেউ চাকরি দেবে না। মহা বিপদ! আমরা তেমন ইংরেজী তখনও আয়ত্ত করি নি যে, দরখাস্ত লিখে নিয়ে যেতে পারব। অনাগত-বিধাতা কর্মকার লঘুহাস্যে সে বিপদ উড়িয়ে দিল। তাদের বাইরের ঘরে গিয়ে 'রাজভাষা' কেতাবের শেষের দিকের নমুনা থেকে "Understanding that a vacancy has occurred' নকল করে দুটো দরখাস্ত ঠিক করে নিল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চিৎপুরে পোর্টট্রাস্ট রেলের (Port-Trust Rly.) একটা আড্ডায় পৌঁছান গেল। সেখানে এক দারোয়ানকে পান খাইয়ে গল্পে গল্পে জানা গেল যে, নারাণবাবু 'জুট' বিভাগের বড়বাবু। এখানকার মালগুদোম শুধু পাটের কাজ করত। পাটের গাঁট গাড়ি-বোঝাই হয়ে চালান যেত খিদিরপুর। সেখান থেকে জাহাজে উঠত

এবং বিলাত যেত। বড় কারবার, তাতে সন্দেহ নেই। এ সময়টা বর্ষা সবে আরম্ভ হয়েছে। নারাণবাবুর কাছে যাবার পথে একটা ভিজে শালিক পাখি নজরে পড়ল। সেটা ভালো উড়তে পারছিল না। চাকরির কথা ভুলে, ছোটাছুটি করে দুজনে সেটাকে ধরলাম। কর্মকার বলল, 'পাখি-যাত্রা খুব ভালো। জটায়ুপক্ষীকে পথে দেখেছিলেন বলে মা-জানকী উদ্ধার হলেন। স্কুল-জীবনই হচ্ছে রাবণের অশোক বনে বন্দীজীবন। এক একটা পরীক্ষায় দশবছর করে পরমায়ু ক্ষয় হয়। এবার আমাদের বন্দীজীবন উদ্ধার হবে। রাবণের চেড়ী মরে ঐ নতুন মাস্টারটা জন্মেছে।' শেষে এই মন্তর পাঠ করল, 'পাখি, পাখি, পাখি! তুমি আমাদের রাখ, আমরা তোমায় রাখি।' এই বলে পাখিটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। চুমকুড়ি দিয়ে ডাকতে বলল। পাখি ডাকল না। অবশেষে তার ঠোঁটে চুমু খেয়ে পাখিটাকে দারোয়ানজির কাছে রেখে নারাণবাবুর কাছে চলল। গোড়াতেই যাত্রা শুভ হওয়ায় দুজনের মনে খুব আনন্দ হল।

কর্মকার অতি ভক্তিভাবে নারাণবাবুকে প্রণাম করল। আমি তার অনুসরণ করলাম। কথাবার্তা সব কর্মকারই কইল। প্রথমে নারাণবাবু আমল দিচ্ছিলেন না। বললেন—তোমরা ছেলেমানুষ, কাজ সামলাতে পারবে না। তারপর বললেন—কাজ বললেই কি হয়? একগলা মাটি খুঁড়লে একটা কড়ি পাবে না। কাজ এখন খালি নেই। কর্মকারের জবাবগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হতে হতে শেষে নারাণবাবুর কর্ণকুহরে ফুসমন্ত্র নিবেদিত হল। অবশেষে শুনতে পেলাম, নারাণবাবু সদয় হয়ে বললেন—দু-মাসের মাইনে তাঁকে দিতে হবে। তাহলে তিনি দশটাকা বেতনে দুজনকে 'টালিক্লার্ক' নিযুক্ত করবেন। ভালো কাজ দেখালে পরে পনেরো টাকা মাইনের আপিসে অন্য কাজ দেবেন। 'টালিক্লার্ক' যতকিছু মাল গুদামে আসবে অর্থাৎ পাটের গাঁট দেখে দেখে, গুনে গুনে একটা কাগজে ঢেরা দিয়ে দিয়ে হিসেব রাখবে। বসতে হবে বাইরে। বৃষ্টি বা কড়া রোদ হলে কাঠের ছোট, গোল খাঁচায় আশ্রয় নিতে পারবে। অবশ্য কাজ করে যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আপিসে নিযুক্ত না হওয়ায় বন্ধু-দুটির মনে একটু বিষাদ যে না এসেছিল তা নয়। কবে রাম রাজা হবে, তবে আমি তার মন্ত্রী হব—এই লোভানিতে কি মন মানে? মন্দের মধ্যে যা ভালো তাই নিতে হয়। সে জিনিষটি হচ্ছে নিরাশার আশা।

ফেরার সময় গতি কেমন মন্থর হয়ে গেল। আসার বেলা বেশ স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্র গতি ছিল।

কর্মকারের কাছে সুরেশ পরে আমাদের 'অভিসার'-এর কথা জানতে পারে। আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করে বলল, 'দুর দুর, টালিক্লার্ক হতে যাবে! আর,

মাইনে মাত্র দশ টাকা। আমার দাদার মামাশ্বশুর আমাদেব আপিসের বড়বাবু। আমার চাকরি তিনি করে দিয়েছেন। আমি বলে তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারব।'

পরদিন সে আমাকে ধরে পাকড়ে নিয়ে গেল। তার দাদার মামাশ্বশুর জেটি-ক্লার্কের কাজ দেবেন আশা দিলেন। মাইনে পনেরো টাকায় আরম্ভ।

আর পড়তে হবে না। বন্দী থাকতে হবে না। ট্রামে চাপার জন্য বাড়িতে পয়সা চাইতে হবে না। নিজের জুতো, জামা, কাপড় নিজের পয়সায় কেনা যাবে। মাকে প্রতি মাসে অনেক টাকা দেওয়া যাবে। মাসে পনেরো টাকা কি কম? ছেলেবেলার একপয়সা বড়বেলার এক মোহর। বেশিদিন নয়, মাসকয়েক চাকরির অভিজ্ঞতায় মস্ত এক মুচ্ছুদ্দীর আপিস খোলা যাবে। কত গরীবকে প্রতিপালন করতে পারা যাবে। সেই বিধবা-আশ্রমটিতে প্রথম মাসের মাইনের পুরো টাকাটা দেওয়া হবে। বাড়িতে যাঁরা চাঁদা নিতে আসেন, কাকাদের কাছ থেকে নিতে না দিয়ে আমি সবাইকে দেব। টাকা বড় পাজী জিনিষ। নিজেকে খারাপ করে। লোকেও ঠকায়। শিবু মাইতিকে এনে তার হাতে টাকা-পয়সার ভার দেওয়া হবে। অমন বিশ্বাসী, খাঁটি লোক ত্রিভুবনে নেই। একটি পয়সাও সে এদিক-ওদিক হতে দেবে না। সে উভয়পক্ষকে সামলাতে পারবে। 'ভালো খবরে আনন্দে উন্মত্ত হতে নেই', মা বলেছেন। এ ভালো খবরটা আজকের রাতটা চেপে রাখতে হবে। কাল মাকে বললে তিনি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবেন। তাতে খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে। কর্মকার বলেছে—বিলেতের সঙ্গে 'ব্যাপার' চলবে। ব্যবসার জাহাজে এদেশের সাধু-মহন্তদের পাঠিয়ে দিয়ে কর্মবিস্তারের সঙ্গে ওদেশে প্রকৃত ধর্মবিস্তার করতে পারা যাবে। ওদের মাথা খেলে কল-কবজায় শুধু। ওরা কলের বেড়ালকে দিয়ে হয়তো ইঁদুর ধরাতে পারে। কিন্তু, মানুষগুলোর মনকে মেরে ইঁট-পাথর করে রাখছে। কর্মকার আবার স্বাধীনতার গুঁড়ো-গুঁড়ো স্বপ্ন দেখত। ও বলল—ওদেশে খোল, করতাল, নামাবলী চালান দিয়ে বেটাদের 'বষ্টুম' করে ছাড়বে।

রাতটা কোনরকমে কাটালাম। ঘুমের মধ্যেও কেমন যেন আনন্দ অধীর করে তুলছিল। স্বপন দেখলাম—আবার তমলুক থেকে বড় বড় জাহাজ যাচ্ছে নানা দেশে। বহু জ্ঞানী, গুণী ও সাধুসন্তরা যাচ্ছেন। বড় আদরে তাঁদের অপর দেশের লোকেরা ডাকছে। মনের সম্পদ ওদেশে দিতে ভারত আবার যাচ্ছে। মনে হল দূরে থেকে গান ভেসে আসছে। হাঁ, গানই তো। সুস্পষ্ট শোনা গেল—

'গাহি জনমভূম, অতুল নাম তোমার।
গাহি দুর্গে অচলমালিনী,
গাহি গঙ্গে রতনপ্লাবিনী,

'...হে লক্ষ্মী সাগরশোভিনী,
সকল ভুবন সার।'...

সকালে ঘুম ভাঙতে চুপি চুপি মাকে সকল কথা খুলে বললাম। মা শুনে হাসলেন। পরে আমার মুখের ওপর তাঁর করুণ-কোমল চোখদুটি রেখে বললেন, 'ছি! তুমি কার সন্তান ভুলে গিয়েছ কি? তাঁর মুখে কালি দেওয়া হবে যে? চাকরির কথা মন থেকে মুছে ফেল। তোমার পয়সা আমরা চাই না। আর এবয়সে তোমার এসব চিন্তা কেন? আমাদের সংসার তো তোমার জন্যে আটকে নেই।'

মায়ের কথার পরে আর কথা চলতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার বাবা লেখাপড়ার জন্য কোনদিন আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন না বা চাপ দিতেন না। ইচ্ছা হলে পড়বে, না ইচ্ছা হলে পড়বে না। আমার এখন পড়ায় মন নেই। কেউ আমাকে সেজন্য চাপাচাপি করল না। আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন যিনি প্রবাসে মাঝে মাঝে যেতেন তাঁর শিষ্যদের কাছে। সম্প্রতি তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গ নিলাম।

প্রথমে আমরা গেলাম বর্ধমানে। ছেলেবেলায় খেলার ছড়ায় শুনেছিলাম 'বর্ধমানের রাঙামাটি'। সেটি দেখার খুব সাধ ছিল। মেদিনীপুরে 'চন্দন বৃষ্টি' কখনও কখনও হয়। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার বটে! কিন্তু বর্ধমানেও দেখার জিনিষ কিছু ছিল—গোলাপবাগ, চিড়িয়াখানা, বিদ্যাসুন্দরের সুড়ঙ্গ, রাজ-বাড়ি। তাছাড়া সেটা হল 'সীতাভোগের দেশ'। ওরকম মিহিদানা কলকাতায় পাওয়া যায়। কিন্তু 'সীতাভোগ' সেইখানে গিয়ে না খেলে নাকি তার প্রকৃত আস্বাদ বোঝা যায় না। বর্ধমান স্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক বাবুর মোট বয়ে দিয়েছিলেন গল্পে শুনেছিলাম। বর্ধমান নানা কারণে দেখবার জায়গা বটে।

বর্ধমানে পেঁাছে মহাজনটুলিতে একজনদের বাড়িতে আমরা উঠলাম। তারা খুব আদর-আপ্যায়ন করল। দুপুরে আহারের পর সবাই শুয়েছে। আমি ভাবলাম —দেশ দেখতে এসেছি, শুয়ে শুয়ে কি সময় নষ্ট করতে আছে? খুট্ করে একসময় বেরিয়ে পড়লাম। খানিক এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক বাগান-বেষ্টিত পুকুরধারে উপস্থিত হলাম। কী একটা পাখি অতি মধুর স্বরে ডাকছিল। পথে দাঁড়িয়ে দু-তিনটি ডাক শুনলাম। তাতে মন ভরল না। কি পাখি? কেমন দেখতে? কি রকম রং? এইসব নির্ণয় করতে পুকুরের দিকে চললাম। পুকুরটিতে একটা শান-বাঁধান ঘাট ছিল। সেখানে গিয়ে পাখিটির ডাক শুনতে শুনতে বসে পড়লাম। পাখিটির হলদে গা। বুকের কাছে একটু লাল। কী পাখি চিনতে পারলাম না। তারপর কোকিল ডেকে উঠল—কু-উ, কু-উ—কু, কু, কু··· । ভারী মিষ্টি ডাক। একটা ফিঙে নানারকম কায়দা দেখাতে দেখাতে উড়তে লাগল। অবশেষে টেলিগ্রাফের তারের ওপর গিয়ে বসল। পথে টেলিগ্রাফের থাম ছিল। সেখানে বসে বসে কেমন সুন্দর ঢঙে লেজ নাড়ছিল। কয়েকটা হাঁড়িচাঁচা চেঁচাতে লাগল। 'পিক্ পিক্লু, পিক্ পিক্লু' করে দুটো বুলবুলি একটা নারকেল গাছের মাথায় বসে ডাক সুরু করল। সবুজ চকচকে পাতার ওপর রোদ যেন ঠিকরে যাচ্ছিল। কী চমৎকার শোভা! পেছনে একটা আমড়া গাছে একটা কাক উড়ে এসে বসল। তার বোধহয় মনে হল এই

মানবশিশু সবাইয়ের সব গুণগান সংগ্রহ করছিল। অতএব সেই-বা কেন বাদ যায়? 'কা, কা, কা' করে ডেকে একটু থেমে ঘাড় বেঁকিয়ে তার যে নিজস্ব একটা কায়দা আছে সেটা আমায় অবহিত করিয়ে দিল। তার দিকে ফিরে চাইলাম। মুখ দেখে মনে হল কাকটা বুঝেছিল যে, এ লোকটা ঠিক সমঝদার নয়। তাই বোধহয় কাকটা আমাকে হেলার পাত্র বুঝিয়ে দিতে, ডাক ছেড়ে একটা শুকনো ডালে ঠক্ ঠক্ করে কয়েকটা ঠোকর মেরে আমার দিকে আর একবার বঙ্কিম গ্রীবায় তাকিয়ে তাচ্ছিল্য করে উড়ে গেল।

আমি স্বভাবের শোভার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, এমন সময় পেছন থেকে কার স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর কানে এল, 'কাদের ছেলে বাবা তুমি?' মুখ ফিরিয়ে দেখি একটি স্ত্রীলোক কলসী-কাঁখে দাঁড়িয়ে। 'কারুদের ছেলে নয়' বলে মুহূর্তমধ্যে আমি আবার সেই হলদে পাখিটি যে গাছে বসে ছিল সেই দিকে চাইলাম। আমার বলার উদ্দেশ্য যে, বর্ধমানের কোন বাড়ির ছেলে আমি নই। পাখিটা তখনই উড়ে গেল। সেই স্ত্রীলোকটি আবার বলল, 'কোন্ বাড়িতে থাক?' স্বল্পে জবাব দিলাম, 'জানি না।' বাস্তবিক সে যে কাদের বাড়ি এসেছি, এ পর্যন্ত তা জানতাম না। শুধু মহাজনটুলি নামটা শুনেছিলাম বলে মনে ছিল। স্ত্রীলোকটি বড্ড মোলায়েম ভাবে বলল, 'আমার কলসীটা এইখানে রইল, একটু দেখো তো, বাবা—' বলেই পিতলের কলসীটা সেইখানে রেখে চলে গেল। আমি আবার দেখছিলাম, বাতাসে নড়ে নড়ে নারকেল পাতা রোদের সঙ্গে ধরা-ছোঁয়া খেলছিল। যেমন দোলা থামে, সূর্যরশ্মি তাকে স্পর্শ করে। আবার যেমন দুলে ওঠে, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আলো-আঁধার, আঁধার-আলো—এইরকম ঘুরে ফিরে হতে লাগল। একটা কাঠঠোকরা, 'কুক্, কুক্' কুক্' আওয়াজ করতে লাগল। একটা কাঠবেড়ালী তর্‌তর্ করে কদম গাছটায় উঠে গেল।

সেই স্ত্রীলোকটি ফিরল। হাতে তার কিছু খাবার। সে এসে আমার সামনে খাবারের ঠোঙাটি ধরে অতি অনুনয়ের সঙ্গে বলল, 'একটু মুখে দাও তো, গোপাল আমার।' মুশকিলে পড়ে গেলাম। যেখানে-সেখানে আমি খাই না। অপরিচিতের কাছ থেকে কিছু নেওয়া আমার অন্তরপ্রকৃতিতে বাধে। প্রত্যাখ্যান করলাম। স্ত্রীলোকটির দু'চোখ দিয়ে এবার দরবিগলিত ধারা বইতে লাগল। সাশ্রুনয়নে উপরোধ জানাতে লাগল, 'খেতে হয় মাণিক। আমি যে তোমার মা হই।' 'মা? আমার মা! তুমি?'—বলে হতভম্বের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্ত্রীলোকটি এবার আমার পাশে বসে গায়ে, পিঠে, মুখে হাত বুলাতে লাগল। মাঝে একবার কাপড়ে চোখ মুছে বলল, 'কেন তুমি অমন করে আমার কথা ঠেলছ? ঠিক তোমার মতো সে যে ছিল! আজ বছর-দিন ঘুরে এল, তাকে খাওয়াতে পাই নি। তুমি না-

হয় খেয়ো না। আমার হাত থেকে নিয়ে না-হয় ফেলে দাও। কিন্তু 'না' বোলো না।'—বলে আরও কেঁদে কেঁদে কাঁপতে লাগল। বন্ধনে পড়লাম। কারু কান্না দেখলে, বিশেষ করে মাতৃজাতির, আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারতাম না। এদিকে অপরিচিতা রমণী, জানা নেই শোনা নেই। কি যে বলছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যার-তার কাছে আহার্য নিয়ে মুখে দেওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কি করে তাকে বাধিত করব ঠিক করতে পারছিলাম না। স্ত্রীলোকটি আমাকে আদর করতে লাগল। অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কি যে করা উচিত আর কি-ই বা অনুচিত স্থির করতে পারছিলাম না। এমন সময় একটি বৃদ্ধা জল নিতে সেই ঘাটে এল। স্ত্রীলোকটির ঐ অবস্থা দেখে সে সহানুভূতির স্বরে বলল, 'পরেশের মা, অমন করে কেঁদে কেঁদে বেড়ালে পাগলী হয়ে যাবি। থির হ।' আমাকে আজ সে দেখেছিল মহাজনটুলির বাড়িতে। সে পরেশের মাকে চিনিয়ে দিলে যে, এ ছেলেটি কলকাতা থেকে এসেছে। রাধাকান্তদের বাড়িতে উঠেছে। 'কাল যাস না-হয় সেখানে?' পরে আমাকে বলল, 'এ খাবার ভালো। খেতে পার।' আমি ঘাড় নাড়লাম। স্ত্রীলোকটি যখন হতাশ হয়ে গেল তখন বলল, 'এই খাবার রইল। এর সঙ্গে আরও খাবার নিয়ে আমি রাধাকান্তদের বাড়ি যাব, গিয়ে তোমায় খাইয়ে আসব। ভয় নেই। আমি ডাইনী নই। না খেলে নেই-নেই। একবার আমায় মা বলে ডাকো।' এতে 'না' বলার কিছু ছিল না। বিমুগ্ধ হয়ে বার দু-তিন 'মা মা' বলে ডেকে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম—মাকে ছেড়ে এসেছিলাম কলকাতায়। অথচ দেখছি 'মা' এখানে আগে থেকে এসে রয়েছেন। মা সর্বত্র বিরাজমান। প্রকৃতই মায়ের অভাব বুঝতে পারলাম না। কোথা থেকে মায়ের স্নেহ, মায়া ও মমতা এমন করে দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে! এদের অতিক্রম করে যাবার উপায় নেই।

ক্রমে বর্ধমান ও বাঁকুড়ার অনেক গ্রাম ঘুরলাম। রইলাম গিয়ে অতি সাধারণ লোকেদের মধ্যে, মিশলাম তাদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে। ধোবা, বাগদী, নাপিত, তাঁতী, গোয়ালা, কামার, আগুরী, ডোম, দুলে, বাউরী, কৈবর্তদের সঙ্গ খুব ক'রে নিলাম। তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে যতটা সম্ভব পরিচিত হলাম। দুটি চরিত্র আমাকে বিশেষ করে স্পর্শ করেছিল।

ঝড়ু বৈরাগী ও শচী তাঁতিনী। ঝড়ু বলত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এঁরাও জন্মমৃত্যুর অধীন। এঁদের ধরে মুক্তি হয় না। মুক্তি হয় তখন, যখন মানুষ মানুষকে চিনতে পারে, মানুষের নাগাল পেয়ে মানুষকে ছুঁতে পারে। তখনই মানুষ তাদের মাঝে ধরা দেয়। মানুষজন্ম তখন সার্থক হয়। সে ভাবাবেশে 'আনন্দলহরী' বগলে নিয়ে কাঠিতে ঝঙ্কার তুলে সন্ধ্যার সময় গাইত; আশপাশের

লোকেরা জমা হয়ে শুনত—

"বেদ বিধির পর, গোলক-উপর, নিত্য মানুষ আছে।
তার নাই চলাচল, সদাই অচল, দেদীপ্যমান রয়েছে।"

আবার গাইত— "আমি একদিনও না হেরিলাম তারে।
বাড়ির কাছে আর্সি নগর, তাতে পড়শী বসত করে।"...

ঝড়ু দুঃখ করে বলত যে-দেশটা পুণ্যক্ষেত্র ছিল সে হয়েছে মনুষ্য ক্ষেত্র। মানুষে মানুষে সম্ভাবের জায়গায় হয়েছে মানুষে মানুষে খাওয়াখায়ি। কুরুক্ষেত্রের পর মহাশ্মশান হয়ে পড়ে আছে। এখানে মানুষ নেই। শুধু কুকুর-শিয়ালে কলরব করছে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত—এর কি উপায় নেই? সে বলত—আছে বৈকি। মানুষ আবার জাগবে।

"মানুষ হলে ধরবি মানুষ, ঘুচবে মনের ব্যথা"—বলে সুরের একটা লম্বা টান দিত। তারপর খানিক চুপচাপ। পরে নীরবতা ভেঙে বলত, 'দীর্ঘকাল বাদে কোন একটা বছর আসবে, যখন এদেশে মড়ার হাড়ে প্রাণ নাচবে।' কিন্তু সেদিন নিশ্চয় আসবে। কোন এক ক্ষ্যাপা তাকে বলেছে। ঝড়ু বলত তার কথা মিথ্যে হবার নয়। তার লক্ষণ সে বলেছিল, 'এখন যেমন দেখছ, যে মরছে চষে সে রইছে বসে। সুখে আছে যারা, এদের মাথায় পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন হবে এর উল্টোটা। রাজা-উজীর মিছে কথা, চাষীর পায়ে বামুনের মাথা।' দলিত মানবের উত্থান সম্বন্ধে ঝড়ুর মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। মানুষকে মানুষ অবহেলা করে, এটা মহামানুষ চিরদিন সইবে না।

শচীর কথা। কোতলপুরের কাছে একটি গ্রামে আমাকে সে দেখতে পায়। সৎজাতের ছেলে ধোবাদের বাড়িতে আছে। সীতারাম বুড়ো মানুষ। প্রতি কথায় সে 'হরিবোলের' মাত্রা দিত। বিনা হরিবোলে সে কোন কথা আরম্ভ করতে পারত না। একদিন আমাকে হরি ব'লে ধরে নিয়ে গেল। মুড়ি, কাঁকুড়, গুড় রেখেছিল জলখাবারের জন্য। খাবার আগে হাত-পা ধোয়ার দরকার। সীতারাম বলল, 'হরিবোলে এইখানে বোসো, ঠাকুর।' আমি দাওয়ায় বসলাম। মেয়েদের উদ্দেশে সীতারাম হেঁকে বলল, 'হরিবোলে, ঠাকুরের পা-ধোয়ার জল আন।' মেয়েরা শুধু ঘটিতে জল আনে নি, একটা বড় গামলাও সঙ্গে এনেছিল। আমার হাতে ঘটি কিছুতে তারা দিল না। গামলার ওপর পা রেখে, ঘটির জল ঢেলে পা ধুইয়ে দিল। তারপর গামছার বদলে মাথার চুল দিয়ে পা মোছাতে এল। আমার মনে হল, আমার মা যেন নিজের চুল দিয়ে আমার পা মোছাতে এসেছেন। চমক উঠি। বুকের ভিতর কামারের হাতুড়ি-ঠোকা আরম্ভ হয়ে গেল। কিছুতে পা মোছাতে দেব না। মেয়েরাও ছাড়বে না। বড় গোলমাল হতে লাগল। সীতারাম বলল, 'হরিবোলে, আমাদের কৃপা

কর বাবা। বারে বারে কত ছলবে? কি ছলে এই বেশে এসেছ কে জানে! হরিবোলে, অনুমতি কর। হরিবোলে, তোমরা নিজের কাজ করে নাও।' 'না গো, আমায় অপরাধী কোরো না। তোমরা যে আমার মা', বলে আমি পা গুটিয়ে নিয়ে জোড়হাত করে বসলাম। সহসা বাড়িসুদ্ধ লোক কান্নাকাটি সুরু করে দিল। আজ সকালেই অমঙ্গলের সূচনা হল! সাপের বাচ্চা আর বড় সাপে কোন তফাত নেই। বরং বাচ্চা সাপের বিষের তেজ আরও বেশী। হায় হায়, কি হবে? বিধি বাম, ইত্যাদি। চেঁচামেচি শুনে শচী এসে জুটল। সব কথা শুনে সে সহাস্যমুখে বলল, 'তার লেগে এত ভাবনা কেনে? কিন্ট বোড়ো ঝঞ্ঝাটি। উয়ার মতো জবাব আমরাও জানি। যশোদা দড়ি দিয়ে বান্ধতে লেরেছিল। কিন্তু মায়ার বাঁধনে বাছাকে বেশটি করে জড়াই রেখেছিল। লে, জোর করে খাবা দেখি? দে উয়ার মুখে অল্প মুড়ি-গুড়।' আমি এবার আত্মসমর্পণ করলাম। তাদের হাতে খেতে হল। অনেক কষ্টে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে শচীর ডাকে শচীর বাড়ি যাই। রাত-প্রভাত বোধহয় হয়ে এসেছিল। আমার ঘুম ভাঙল কার গলার মিষ্টি আওয়াজে—'বাপ গৌরগোবিন্দ, ও বাপ রাধাগোবিন্দ, উঠরে বাপ। দুখিনীর ধন, দুখ না করলে চলবে কেনে বাপ?' শচীর দুই ছেলে উঠল। কি করব ভাবছি, এমন সময় ঘরের মধ্যে পা টিপে টিপে শচী এল। একটু দরজা ফাঁক করে ঘরে আলো আসতে দিয়ে আমার কাছে বসল। ধড়মড়িয়ে উঠতে গেলে শচী ধরে শুইয়ে রাখল। বলল, 'না, তুমার উঠার মতো বেলা হয় নাই। ই জন্মে তো আর গরু চরাবে নাই। তুমি শুয়।' গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে লাগল। তারপর প্রশ্ন করে বসল, 'তুমার মাকে বলিহারি! এমন অল্পবয়সে একলা তুমায় ছাঁড়ে রইতে পারলেক?' তারপর আপনমনে গাইতে লাগল, 'অল্প বয়স, তুমার অল্প বয়স—এখন তুমার সন্ন্যাসের সময় লয় রে।' গানটি শেষ অবধি গাইতে বুঝলাম গৌরাঙ্গকে উপলক্ষ্য করে শচীমাতা এইকথা বলেছিলেন। বাঁচা গেল। এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার মার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল সেটা ভালো লাগে নি। আমার দেশ বেড়াতে আসায় মায়ের তো কোন দোষ ছিল না! উঠে পড়লাম। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে চলে যেতে চাইলাম। শচী পথ আগলাল। কেন এমনভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ার কথা মনে এল? কি হল? সরলভাবে মনের কথা ব্যক্ত করলাম। শচী আমাকে কোলের ওপর বসিয়ে আমার হাত-দুটোকে জব্দ করে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখে বলল, 'কার উপর রাগ কচ্ছ? কি রকমে জানলে আমি তুমার মা লই। যেথা কাড়বে রা, সেথায় পাবে মা। মায়ে মায়ে কুনো তফাত আছে? মা কি এতটুকু সাড়ে তিন হাত খাঁচায় আটকা থাকে? মায়ের প্রাণের কাছে শরীলটা বোতলের পারা। আলো ইপার ফুঁড়ে ভিতরকে যাবেক৷ ফের উপার ফুঁড়ে বোতলের বাহিরকে যাবেক। কে তাকে আটক করবেক?' অবাক

হয়ে এই মহিমাময়ীর মধুমাখা মাতৃভাষা শুনেছিলাম। আবারও মনে হল—অপার মাতৃনামের শক্তি! কে শচী, কেই-বা আমি তার? অথচ কেমন সহজে সে করে নিল আমাদের সম্পর্ক। তারপর শচী বলল—যদি তার মত না নিয়ে, না-বলে আজ চলে যাই তাহলে আমার মাতৃদ্রোহিতার পাতক হবে। সাহস থাকে তো যাও। সে আর বাধা দেবে না। কথা-কয়টি বলে সে তার হাত খুলে নিল। কিন্তু অভিভূত আমার সাধ্য হল না তাকে ছেড়ে এক-পা যাই। এবার আমার দৃঢ় প্রতীতি হল—যত মা সব এক। মা কোনদিন তিরোহিত হন না। সবার মায়ের ভিতর নিজের মাকে পাওয়া যায়। মরার জগতে একমাত্র মা-ই চিরজীবী।

শচী ঠিক বলেছে—মা দেহবিশেষে নিবন্ধ নন; মা সর্বব্যাপী মহাপ্রাণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার বাবার ডাক এল—আমায় মেদিনীপুর যেতে হবে। বাবার ডাক আমার কাছে চিরদিনই মিষ্টি। তিনি জীবনকে গতিসম্পন্ন করেন। এদেশে চল, ওদেশে চল—মানুষ দেখ, দেশ দেখ। মাঠ, শস্যক্ষেত্র, মানুষের জীবন, তাদের পাল-পার্বণ, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখ। পাহাড়, বন-জঙ্গল, নদী দেখ। আশপাশে চোখ বুলিয়ে নাও। এসবের মাঝে যে নির্বাক বাণী ছড়ান আছে তা পেলে কিনা? যদি পেয়ে থাক তো, কি পেলে? সূত্রটি ধরে চিন্তা কর, ধ্যান কর, অনুধাবন কর।

লক্ষ্য করলাম কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পাঁচজন একত্র হলে আলোচনা হচ্ছিল—'এসব কি! ব্যারাকপুরে সুরেশ ডাক্তারকে গোরারা এমন মারল যে সে মরে গেল। চা-বাগানের কুলীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী নানা দিক থেকে শোনা যায়। পিলে ফেটে যে কত লোক মরছিল তা আর কে গুনে দেখছে? এদেশে মানুষের মর্যাদা ব'লে বোধ হয় কিছু আর রইল না। নিজেদের দেশে যেন আমরা পরবাসী। মানুষের মতো নয়, কুকুর-মরা হয়ে শেষটা আমাদের মরতে হবে! সাহেবের বুটের ঠোক্করে প্রাণ দেওয়াই কি বিধিলিপি হয়ে দাঁড়াল? আইন-আদালতে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করা যায় না!' মানুষের মন ভেঙে পড়তে লাগল। ভিক্টোরিয়ার ওপর যে বাস্তবিক শ্রদ্ধাভক্তি, ভালোবাসা ও টান ছিল সেটা প্রতিদিন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসতে লাগল। রাষ্ট্রের হাল যাদের হাতে, তাদের সংকীর্ণতা, ঝাপসা দৃষ্টি, অ-সহানুভূতি, ভাব-কল্পনার অভাব একটা অনভিপ্রেত অনাসৃষ্টি টেনে আনছিল। দেখেও কেউ দেখছিল না। একটা ছাগল-ভেড়ার যা দাম আছে, সাদা আদমির হাতে কালা আদমির তাও থাকছে না। 'ইলবার্ট-বিল আন্দোলন'-এর কবছর আগে (১৮৮৩।৮৪) হয়ে গেছে। কালা আদমির কাছে ধলা আদমির বিচার শ্বেতাঙ্গরা কিছুতেই সহ্য করবে না। বড়লাট রিপনকে ধলার কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছে।

একদিকে এই অপমান, অবিচার, অনাচার, লাঞ্ছনা ভারতবাসীর বুক ভেঙে দিচ্ছিল। পাশ্চাত্ত্যবাসীদের কাছে ভারতবাসী মনুষ্যপঙ্‌ক্তির বাইরে পড়ে যাচ্ছিল। পল্লীগ্রামের লোকেরা বলত—ষাঁড়ের গোবর ক'রে দিচ্ছে। আমাদের পতনের চূড়ান্ত হয়েছিল। শুধু পশুবলের প্রাবল্যে এরকম একটা স্থায়ী হীনতার ছাপ দুঃসহ।

'গোলা ধরে খা ডাঁলা'র গল্প ছেলেরা বৃদ্ধদের মুখে শুনত। কলকাতা হতে অল্পদূরে বারাসতে বাঁশের-কেল্লা বানিয়ে তিতুমীর ইংরেজের দর্পচূর্ণ করতে ব্রতী হয়েছিল। বেরিলীর এক মুসলমান মক্কায় যান হজ করতে। সেখান থেকে তিনি

বয়ে আনেন স্বাধীনতার এক নতুন সন্দেশ। তার থেকে দল গড়ে উঠল। তাদের বলত ওহাবী। ওহাবীরা মোস্লেম স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব কামনা করত। তাদের সরাসরি দেশপ্রেমিক বলা যায় না। তবু ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ এসে পড়েছিল। বাংলায় সে ভাব এসে দাঁড়াবার জায়গা পেল। বাঙালী মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়ে গুপ্তভাবে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কাজ চালাতে লাগল। তাছাড়া চামড়ার ব্যবসার আড়ালে ওহাবীদের সংবাদাদির আদান-প্রদান চলত। ক্রমে বৃটিশের দলন-নীতি অনুসৃত হল। কর্তৃপক্ষ বহু লোককে ধরে ধরে জেলে দিতে লাগলেন। তাদের জায়গা-জমি বেদখল ও বাজেয়াপ্ত করা হতে লাগল। সরকার পেছনে লাগায় বহু চাষী জমিহীন অবস্থায় ফৌত ও ফেরার হতে বাধ্য হয়। তিতুমীর এইরকম চাষীদের সর্দার ছিল। সে একটা কিষাণ-বিদ্রোহ জাগাল।* ধর্মান্ধতায় হিন্দুদের ওপর বিজাতীয় ও বিসদৃশ অত্যাচার চলল। পরে ইংরেজের সঙ্গে লাগে সংঘর্ষ। সে বাঁশের-কেল্লা বানাল। বাঁশের-কেল্লাগুলি গোলার কাছে দাঁড়াতে পারবে। সাধারণ মুসলমান চাষী তিতুমীরের অলৌকিক ক্ষমতা কল্পনা করত। তিতু ইংরেজের গুলী ধরে খেয়ে হজম করে দেবে; তাদের তিলার্ধ অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না।—এরকম বিশ্বাস তার অনুচরদের ছিল। কার্যতঃ কিন্তু তা টিকল না। তিতুমীর গ্রেপ্তার হয়ে গেল। বহু লোক হতাহত হল। বহু লোকের ফাঁসি ও দ্বীপান্তর হল। এই ওহাবী আন্দোলনের ফলে দুটো অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের জজ নরম্যানকে এক মুসলমান ছোরার আঘাতে হত্যা করে। ওহাবী সর্দার চামড়া-ব্যবসায়ী আমীর আলির বিচার ভারী রোমাঞ্চকর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বিচারে মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে গুপ্ত-সমিতির অনেক অজানা কথা লোকেদের প্রথম জানা হয়ে যায়। এই মোকদ্দমার আসামী-পক্ষ সমর্থনের জন্য বোম্বাই থেকে মহানামী ব্যারিস্টার আনা হয়। তাঁর নাম অ্যানস্টি। তাঁর আইনের জ্ঞানের কাছে ও নির্ভীক সওয়াল জবাবে হাইকোর্টের জজ ও অ্যাডভোকেট-জেনারেল ঘাবড়ে যান। আমীর আলির শেষ পর্যন্ত সাজা হয়ে যায়। সাজাপ্রাপ্ত ওহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি শের আলি বড়লাট মেয়ো আন্দামান পরিদর্শন করতে গেলে তাঁকে হত্যা করে। মুসলমানদের প্রতি সরকার বিরূপ হন। তাদের খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখতে থাকেন।

---

*অবশ্য কৃষকবিদ্রোহ করতে যেতেই বসিরহাট অঞ্চলের হিন্দু জমিদার মহাজনরাও তিতুমীরের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করছিল। ব্রিটিশ শাসকদের কাছেও ওহাবীদের বিরুদ্ধে নালিশ করছিল। একেই তো তিতুমীর ছিলেন গোঁড়া মুসলমান,—হিন্দুধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এখন হিন্দু জমিদারদের বিরোধিতায় কৃষক বিদ্রোহটা হিন্দুর বিরুদ্ধে শত্রুতা হয়ে দাঁড়াল।

(সম্পাদক)

গল্পে গল্পে ছেলেরা এসব কথা শুনত। গোঁড়া ধর্মান্ধ হলেও ওহাবীদের সাহসের জন্য বাহবাও দিত।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের মণিপুর জয়ের ইতিহাস ও বৃদ্ধ থাঙ্গল এবং টিকেন্দ্র সিং-এর বীরত্ব এবং ফাঁসির কাহিনীতে লোকের মন সমবেদনায় ভরে উঠত।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। প্রায় দশ বছর প্লেগ থাকে। প্রত্যহ বহু লোক মরত। কলকাতায়ও প্লেগের টিকা এবং কোয়ারান্‌টাইন আইনজারি হয়। অজ্ঞ সাধারণ লোকেরা ভাবল, প্লেগের বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল। লর্ড এলগিন, তখনকার বড়লাট, নিপুণভাবে এই অবস্থা প্রশমিত করেন। বোম্বাই-এর মত বিক্ষোভ এখানে ঘটল না।

অবশ্য এরই অল্পপূর্বে কলকাতার বুকের ওপর অরাজকতা দেখা দেয়। টালার এক মসজিদ ভাঙা উপলক্ষ্যে মুসলমানরা ক্ষেপে ওঠে। পুলিশ ও সশস্ত্র সৈন্যপ্রয়োগে মুসলমানদের দমন করা হয়। তখন অনেক মুসলমান হিন্দু সেজে পুলিশের নজর এড়াবার চেষ্টা করে।

মোটের ওপর জাতীয় অভিমানে নানামুখী আঘাত পেয়ে দেশের ভিতর একটা প্রতিকারাকাঙ্ক্ষী প্রতিক্রিয়ার ভাব সঞ্চারিত হচ্ছিল। এদেশের লোক কৃশ্চান নয়, অথচ এখানে খ্রীষ্টধর্ম পরিচালনার জন্য একটা ধর্মবিভাগ করে অ-খ্রীষ্টান প্রজার দেওয়া যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হচ্ছিল। বড় বড় ব্যবসা এদেশের লোকের হাত থেকে চলে গিয়েছিল। কুটিরশিল্পকে ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্প গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। লোকেরা বেকার হয়ে কৃষক বনে যেতে লাগল। জমির উপর যত বেশী লোক নির্ভর করতে লাগল, দারিদ্র্য তত বাড়তে লাগল। এদেশের কথা—বাণিজ্যে বা শিল্পে লক্ষ্মীর নিবাস; কৃষিকার্যে তার চাইতে কম। আগে এদেশের কাপড় পৃথিবীতে সরবরাহ হত। এখন বিলাতী-কলের কাপড় না এলে এদেশের লোক নগ্ন থাকবে। ফরাসী ডাক্তার বুর্নিয়ের তাঁর "হিন্দুস্থান-ভ্রমণে" লিখে গেছেন—ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারত খুব লাভবান ছিল। জগতের ভাণ্ডার থেকে বহু টাকা এখানে চলে আসত। ইনি আওরঙ্গজেবের সময়কার ভারতের অবস্থা দেখেছেন। বাংলাদেশকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। (তাঁর সময়ে শতকরা ছয়জন ভারতবাসী মুসলমান ছিল।) কিন্তু এখন ঠিক এর বিপরীত দশা। ভারতে সরু সুতার কাপড় কলে বোনা ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ হয়েছিল। সরু বিলাতী সুতা কিনে তাঁতী হাতে কাপড় বুনতে পারত। তার ফলে দেশী কাপড় বিলাতী কলের কাপড়ের চেয়ে দুর্মূল্য হত এবং বিক্রির বাজার ক্রমশঃ হারাত। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশের ভার নেয় তখন পাঠশালা, টোল ও মক্তবের সাহায্যে সাক্ষর লোকসংখ্যা ছিল শতকরা ৭০ জন। তাদের শাসনে হয়ে গেল পাঁচজন। বিলাত ও ইউরোপে প্রতিষেধনীয় রোগ দমিত হয়ে মানুষ সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হচ্ছিল। ভারতে

তার কিছুই হয় না। বসন্ত, কলেরা ওদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। এখানে কে তা চিন্তা করে? মফস্বলে ভালো জলাশয়ের অভাবে অস্বাস্থ্যকর জল পান করে লোকেরা রোগের কবলে পড়ে। তারও ব্যবস্থা হয় না। রেলে, ট্রামে, স্টীমারে, হোটেলে, আমোদ-প্রমোদ স্থলে—যেমন ইডেনগার্ডেনে, ধলার পাশে কালার স্থান ছিল না। অনেক জায়গায় কালা আদমি ঢুকতেও পেত না। বর্ণ-পার্থক্য ও তার জন্য হীনতার ছাপ এদেশের লোকের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এ জ্বালা শিক্ষিত-সমাজের কাছে দিনের পর দিন উগ্র ও উৎকট প্রতিভাত হচ্ছিল। সরকারী প্রতিটি বিভাগ শ্বেতাঙ্গদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল। যে-কোন শ্বেতাঙ্গ প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গের, তা সে যত জ্ঞানী বা গুণী হোক না কেন, মাননীয় গুরু। তাঁকে তেমন সম্মান দিতে হবে! বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই নতুন উদ্বুদ্ধ জাতীয় সম্মানবোধের সঙ্গে এর লাগল ঠোক্কর। সেটা ক্রমশঃ আপনাকে খুলে-মেলে প্রকাশ সুরু করে দিচ্ছিল।

এরই পাল্টা জবাব হিসেবে, দেশাত্মবোধক হিন্দুমেলা, আর্যসমাজ, দেশী শিল্পপ্রদর্শনী বা 'মোহন মেলা', দেশী ব্যাংক, আর্যমিশন ইতিমধ্যে দেশে মাথা তুলছিল। ক্রমে মেয়েদের মধ্যে জাতীয় আত্মাভিমান বাড়াবার জন্য 'মহাকালী পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা হয়। মাতাজী মহারানী তপস্বিনী ছিলেন এর অধিনায়িকা। ইনি ছিলেন মারাঠী সন্ন্যাসিনী। রাজবংশের মেয়ে। কিন্তু নিজের ব্রহ্মলাভ ও মোক্ষ নিয়ে চুপচাপ না থেকে কর্মের পথ বেছে নেন।

সামাজিক পরিস্থিতি থেকে দেখলে ধরা পড়বে—(১) পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চোখ-ধাঁধান নব বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রচণ্ড আঘাত। এটা যেন হল ন্যায়শাস্ত্রের বাদ। (২) 'বিসম্বাদ' হল ভারতের সুপ্ত আত্মাভিমান। পুরাকালে আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্কৃতি। সে শেখাত জগতকে গণিত, জ্যোতিষ, রসায়নশাস্ত্র, আয়ুর্বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, চারুকলা, সমাজবিন্যাস, সভ্যতা। এই আত্মরক্ষী বা বিসম্বাদ শক্তি অস্ফুট, প্রচ্ছন্ন, নীরব অবস্থা থেকে ক্রমে সরব, পরিস্ফুট ও প্রকাশমান হয়ে আসছিল। স্বভাবতই হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু অভিমান তাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। (৩) একটা 'সম্বাদ'-এর আগমনের সম্ভাবনা কোথাও কোথাও মনীষীদের মানসপটে ক্রমবিকাশের ছন্দে ধরা দিচ্ছিল। ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনায় একটা রূপান্তর আগন্তুকের আকারে বেদনাবোধ জাগিয়ে তুলছিল। এ পরিবর্তন-যুগের চিত্র কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষিত সম্প্রদায়, কৃষ্টির অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, নারী ও পুরুষ বিশেষের মধ্যে রূপায়িত হতে আরম্ভ হয়েছিল। কেউ এক জায়গায় থাকছিল না। মনোভাব দিনের দিন বদলে যাচ্ছিল। প্রারম্ভে কে বলবে এটা একটা বিশাল বিপ্লবের সূচনা? সব আমূল পরিবর্তনের স্বল্পে আরম্ভ, শেষ বিশালতায়।

ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় বিসম্বাদের দু-একটা ক্ষুদ্র মজার নমুনা প্রেক্ষণ করা যেতে পারে। কলকাতার 'বিডন উদ্যানে' প্রতি সপ্তাহে পাদরী সাহেবেরা ধর্মপ্রচার করতেন। দেশী ও বিলাতী উভয় প্রকারের প্রচারক সেখানে জড় হত। প্রথমে বিলাতী বাঁশী ও বেহালা বাজিয়ে মধুর তান ছড়ান হত। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া বিলাতী বাঁশী বিলাতী রাগ-রাগিণী আলাপ করছে! একটা অভিনবত্ব বটেই। কৌতূহলী লোকেরা একে একে চারপাশে জড় হয়ে গেলে, দু-একখানা গান গেয়ে বাদ্য বন্ধ করা হত। ছাত্ররা বিকেলে এখানে খেলতে বা বেড়াতে আসত। জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্বিশেষে জনগণও সেখানে জুটত। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছাত্র-অছাত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোক থাকত। ভিড় দেখে কাবুলী-মটরওলা, চানাচুরওলা, টানামেঠাইওলা এবং ফেরিওলারাও এসে যেত। ভিড় জমলে এক সময়ে কোন এক পাদরীসাহেব উচ্চ বেদীর উপর উঠে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। তারপর দেশী খ্রীষ্টানরা বাংলায় বলতেন। ইংরেজী ও বাংলায় ছাপা ছোট ছোট কাগজ (হ্যাণ্ডবিল) শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করা হত। তার মোদ্দা কথাটা থাকত—সব ধর্ম বেঠিক, একমাত্র খ্রীষ্টীয় ধর্মই ঠিক। এক এক দিন তর্ক লেগে যেত।

ক্রমে সাহেবদের মত খণ্ডন করে তাদের প্রতিপক্ষরূপে সাহেবদের কলেজী ছাত্ররা মাত্র কয়েক গজ দূরে বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করল। যত ভিড় সেখানে জমা হতে লাগল। বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিশনারীদের অসুস্থ অন্ধ মনের তীব্র প্রতিবাদ করে বক্তৃতা দিতেন। ফলে মিশনারী সাহেবদের বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়—হেদো এবং বিডন উদ্যান দু'জায়গাতেই।

ধর্মের কথা যেমন-তেমন ; দেশের মানুষ সাহেবদের 'উত্তর' দিতে চায়।

* তখন বুয়ার যুদ্ধ চলছিল—তাতে এ মনোভাব আরও বাড়তে থাকে। ইংরেজ সেনাপতি রেড্‌ভার্স বুলার সুবিধা করতে পারছিলেন না। লেডি স্মিথ অবরুদ্ধ। সেনাপতি হোয়াইট্ আটক পড়েছিলেন। ইংরেজের পরাজয়ে ভারতীয়দের মনে আনন্দ হচ্ছিল। বুয়ার সেনাপতি ডিওয়েট্ চকিতে আক্রমণ ও হঠাৎ নিরাপদ জায়গায় সরে পড়ার যুদ্ধকৌশলে নিজেকে অসাধারণ নিপুণ প্রমাণ করেছিলেন। কৌশলটা দেশের লোকের পক্ষে একটা শিক্ষাও। লর্ড রবার্টস প্রধান সেনাপতি পদে গিয়ে যুদ্ধের অবস্থা বদলাতে সমর্থ হন। বিষের জ্বালায় যে ভুগেছে, সে চায় না আর কেউ সে জ্বালায় ভোগে। পরাধীনতার খোঁচা ভারতবাসীরা বোধ করছিল বলেই তাদের সহানুভূতি ছিল দুর্বলের দিকে। ইংরেজকে জয়টিকা দিতে এদের মন চাইত না।

*এখান থেকে 'অষ্টম পরিচ্ছেদ' আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু অংশটি 'সপ্তম পরিচ্ছেদে'র অনুবর্তন বলে আমরা এ সংস্করণে তা 'সপ্তম পরিচ্ছেদে' অন্তর্ভুক্ত করেছি। (সম্পাদক)

বুয়ার যুদ্ধ মিটতে না-মিটতে চীনে বক্সার যুদ্ধ সুরু হয়। জোর করে চীনকে 'আফিম-খাওয়ানো'র যে যুদ্ধ আগে হয়েছিল, এটা ছিল একরকম তারই জের। চীনকে যেন সপ্তরথী ঘিরল। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, রুশ, মার্কিন, ওলন্দাজ সবাই তার ওপর হাত-সাফ করল। চীনেরা উপদ্রুত হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। শ্বেতাঙ্গরা একযোগে বেচারির টুঁটি টিপে জব্দ করে দিল। তার মাথায় চাপাল পর্বতপরিমাণ জরিমানা। চীনের আরও জায়গা কেড়ে নিল। ১৯০২ সালে জাপানী ও চীনেদের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। তাতেও চীন হারে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের কড়া চাপে জাপান বেশী জায়গা নিতে পারল না। শুধু ফরমোসা নিয়ে নিল। পোর্ট আর্থার ফেরত দিল।

এই যেসব যুদ্ধ এধার-ওধার হচ্ছিল, তারও একটা প্রভাব ভারতবাসীর মনে পড়ছিল। সূক্ষ্মভাবে তার আরম্ভ, স্থূলত্বে ও বিশালতায় ক্রমশঃ তার প্রকাশ। তা যেন অভিনয়ের পূর্বে সাজঘরের সাড়াশব্দ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমি মেদিনীপুর রওনা হলাম। মেদিনীপুর পর্যন্ত রেল তখনও খোলে নি। স্টীমার কলকাতা থেকে মেদিনীপুর যেত। আমি আগে আগে নৌকায় মেদিনীপুর গেছি। এবার গেলাম স্টীমারে। কলকাতার আর্মানীঘাট থেকে একটি স্টীমার উলুবেড়ে অবধি গিয়ে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিত। সেচ-বিভাগের লক্‌গেট-ওলা খালে অন্য স্টীমারে চড়তে হত।

উলুবেড়েতে নেমে স্টীমার পরিবর্তন করে বসতে না-বসতে খাবারওয়ালারা খাবার বেচতে এল। লোকে কিনে কিনে খেতে লাগল। এরপর এল একটি লোক। সে আমাকে বলল, 'বাবু, কলকাতা থেকে এসেছেন, বড্ড গরম হয়েছে—একটি ডাব খান।' আমি ডাব নিলাম। ভাবলাম স্টীমার-কোম্পানি কত ভদ্র! গরমে প্যাসেঞ্জারের কষ্ট নিবারণের জন্য ডাবের বন্দোবস্ত রেখেছে। যে লোকটি ডাব বিতরণ করছিল সে বেছে বেছে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কয়েকজনকে ডাব বিলিয়ে চলে গেল।

তারপর একটি অন্ধ এল। সে গান ধরল—'কত রঙ্গ জানো তুমি কালী গো! কারো দুধে চিনি দাও মা, কারো শাকে বালি গো॥' লোকে দয়ার্দ্র হয়ে এক-আধটা পয়সা দিয়ে তাকে বিদায় করল।

'হাপুর হাপুর' করে ইঞ্জিন আওয়াজ করতে লাগল। এমন সময় সেই ডাবওয়ালাটি এসে হাত পাততে আরম্ভ করল। ডাবের দাম। আমি দাম দিলাম। বোধ হয় বিরক্ত হয়ে দাম লোকে দিল!

জাহাজ চলল। এটা এক্সপ্রেস। তাড়াতাড়ি যায়। আর একটা ছাড়ে, অর্ডিনারি। দেরিতে পৌঁছায়। এটার ভাড়া একটু বেশী। কুলবেড়ের লক্‌গেট পৌঁছাবার আগে দামোদর নদী পার হওয়া গেল।

কুলবেড়ের লক্‌গেট থেকে রূপনারায়ণ পার হওয়া গেল। বি. এন. রেল সম্প্রতি পোল বেঁধেছে। ওপারে রেল-স্টেশনের নাম কোলাঘাট। লক্‌গেটের নাম দেনান। আমার অনেক পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল এই দিকটায় এসে। তমলুক সাবডিভিসনে এগুলি অবস্থিত। রূপনারায়ণের পূর্ব পার হাওড়া জেলার সীমানা, পশ্চিম পার মেদিনীপুরে পড়ে। স্টীমার ক্রমশঃ পাঁশকুড়ায় এল। এখানেও একটা লক্‌গেট। এইটা পার হয়ে কাঁসাই নদী। কাঁসাই পার হয়ে আবার লক্‌গেট ও ক্যানাল বা সেচ-বিভাগের খাল। এই খালের জলে দু-কাজ হচ্ছে। দু-ধারের শস্যক্ষেত্রে চাষের সুবিধা এবং এদেশ-ওদেশ যাতায়াতের পথ। গয়লাগেড়ে, বড়োমুলো, বালিচক, মোহনপুর—এগুলি লক্‌গেট। মোহনপুর্ শেষ গেট। এরপর আবার

কাঁসাই নদী। অপর পারে মেদিনীপুর শহর। মোহনপুরে পেঁছতে সকাল হয়ে যায়। এইখানে এলেই মানুষ অস্থির-চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাড়ির দোরে এসে গেল কিনা? এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রিয়জনের মুখ দেখার তাড়া। এখন এই প্রিয়জনের মানে যে যা করে নিতে পারে। এনিকাট্, জলবাঁধার পাথরের ব্যবস্থা, এপারে ওপারকে ধরে এনে দিয়েছে। কী মনভুলানো ভাব সে জাগাত! মেদিনীপুরে পেঁছে আমি একখানি পোস্টকার্ড কলকাতার ঠিকানায় পাঠালাম—'আমি ভালোয় ভালোয় এসে পেঁছেছি।' মনে মনে এও ভাবলাম, কাগজের বাঁধন কি ভালোবাসার বাঁধনের চেয়ে শক্ত? চিঠি লোকে লেখে কেন? দূরকে কাছে কি চিঠি এনে দিতে পারে? প্রাণের টানে মানুষ দ্রুত ছুটতে চায়। পাখা থাকলে উড়ে যেত। এই আকাঙ্ক্ষা যত দ্রুতগামী যান আবিষ্কারের কারণ। গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে মানুষ বিধাতার দূরত্ব ও কালকে জয় করে ফেলল। এ দুটোকে একরকম উড়িয়ে দিয়েছে বললেই হয়। তবু একথা মানতে হবে যে, চিঠিলেখার প্রয়োজনকে উড়াতে পারে নি। কাছে কাছে থেকেও চিঠিকে ছাড়া চলে না।

নবম পরিচ্ছেদ

আমি নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এলাম। বাড়িতে আমি ও আমার পিতা ছাড়া ছিল বামুন ও চাকর। প্রথম প্রথম কয়েকদিন বর্ধমান ও বাঁকুড়ার কথা খুব মনে পড়ত। প্রায়ই সীতারামের বাড়ির ঘটনা, ঝড়ু বৈরাগী, শচী এবং পুকুরধারের সেই ঘটনাটির কথা ভাবতাম। কর্মকারকে ভাবতাম। কর্মকার আসার সময় কয়েকটা বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিল। সে বলে দিয়েছিল কিরকম লোকের সঙ্গে মিশতে হবে এবং কেমন লোকের ত্রিসীমানায় যাওয়া হবে না। সে বলেছিল বদ লোক বলে জানবে তাদের, যারা ছোট ছেলেদের 'খেলা' দেখতে পারে না। খেলা থেকে ডেকে বলে—বানান কর—প্রতিদ্বন্দ্বী, মুহূর্তাপ্তিক, etiquette। যারা বলবে বানান কর character, জানবে তাদের চরিত্র ভালো নয়। একটা-না-একটা কিছু দোষ আছেই। অথবা যারা সেরেস্তায় বসে লেখাপড়া করতে করতে খাতা বা বই থেকে চোখ তুলে চুপিসাড়ে চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে দেখে। কিম্বা যাকে দেখবে ঐ নতুন মাস্টারটার মতো সদাই সপ্তমে চড়ে আছে, মুখ দেখলে মনে হয় আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটবে না। কানের পরদার বাইরে যে উপদেশ থেকে যায়, তার দশা পরহস্তগত পুঁথির মতো হয়। চোখের ওপর দৃষ্টি হয়ে এগুলি বিরাজ করলে, তবে না কাজের হবে? সে অবস্থায় কি করে আসা যায় হল সমস্যা।

লেখাপড়ার চাপ এখানে ছিল না। আমার বাবা বিজ্ঞান-চর্চা করতেন। আমাকে তাঁর সহায়ক বললে ঠিক হবে না, খেলার সাথী করে নিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়ামের মতো সোজা কিছু না থাকায় সঙ্গীতপ্রচারে বাধা হচ্ছিল। অথচ হারমোনিয়ামে ভারতীয় সঙ্গীত ঠিক ঠিক ভাবে তোলা যায় না। বাইশটি শ্রুতি সাতটি সুরের মধ্যে ছড়ান আছে। তা তারের যন্ত্রে ওঠে, কিন্তু হারমোনিয়ামে নয়। সেই অভাব দূর করার জন্য তিনি একটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন; যা পিয়ানোর থেকে তফাত, হারমোনিয়ামের থেকে একদম তফাত। বাজত তারে। কিন্তু বাজান ছিল সহজ। সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেটিকে পরীক্ষা করেন এবং পরে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সেটি উপহার দেওয়া হয়। তারপর বাবা পরীক্ষা করেছিলেন এমন কিছু একটা উপায় উদ্ভাবন করতে যাতে এক জায়গায় থাকবে গায়ক বা গানবাজনার ব্যবস্থা, অন্য জায়গায় দূরে থাকবে শ্রোতারা। সঙ্গীত সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে যন্ত্রের সাহায্যে। তখনও গ্রামোফোন বা রেডিও-র নাম পর্যন্ত এখানে শোনা যায় নি। তাঁর পরীক্ষা-প্রণালী এইরকমের ছিল। একটা ছাওয়া পরদা বা ডুগির (বাঁয়াতবলার বাঁয়া) ওপর কয়েক সাইজের তারের ঘোড়া

(বন্দুকের ঘোড়ার মতো কতকটা দেখতে) বসান থাকত। ইলেক্‌ট্রিকের তার সেই ড্রাগ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হত। সেই তার একটা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো লোহার ম্যাগনেট-এর চারদিকে জড়ান হত। সেইখান থেকে তারটি ফিরে এসে কাঁড়ির জারের ব্যাটারির কার্বনেটের পোলে লাগত। ব্যাটারির জিঙ্ক-পোলের তারটি আর এক দিক দিয়ে এসে ড্রাগের আর-এক জায়গায় লাগান থাকত। ড্রাগের ওপর 'আ-আ' করে গাইলে সেই স্বরে পরদাটি কেঁপে উঠত। তার ফলে তারের ঘোড়াগুলি নড়ে নড়ে ওঠা-নামা করত। ইলেক্‌ট্রিক সার্কিটে 'make and break' বা গড়া-ভাঙা ঘটত। এইরূপে ঘোড়াগুলি ইলেক্‌ট্রিক চক্রে সংলগ্ন ও অসংলগ্ন হওয়ায় লোহার টুকরোটি প্রকৃত ম্যাগনেটে পরিণত হত। সেই ম্যাগনেটের সামনে একটি টিনের ক্যানেস্তারা রাখা থাকত। ইলেক্‌ট্রিক চক্র সংলগ্ন অবস্থায় টিনকে ম্যাগনেটের দিকে টানত এবং অসংলগ্ন হলে আকর্ষণ ছেড়ে দিত। তার ফলে টিনের গায়ে কম্পন আরম্ভ হত। তার থেকে টিনের অন্তর্বর্তী বায়ুমণ্ডলে কম্পন চালিত হত। ফলে গায়কের গলার আওয়াজ এখানে পুনরাবৃত্ত হত। শ্রোতারা বাড়ির এক ঘর থেকে অন্য ঘরে বসে গাওয়া-গান শুনে আনন্দ পেতেন। এটা তিনি অনেক আগে থেকে সুরু করেছিলেন।

বাবা আর একটা পরখ এই সময়ে করেছিলেন। এটা ১৯০০ সালের গোড়াকার কথা। এদেশে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান তখনও প্রচলিত হয় নি। ইলেক্‌ট্রিসিটিতে পাখা চালানর পরিকল্পনা নিয়ে তিনি খাটতেন। একটা চৌপল কাঠের দুই প্রান্তে লোহার গর্ভখিল ছিল। তার ওপর কাঠটা ঘুরতে পারত। কাঠটার চারটে পলে চারটে লোহার টুকরো লাগান ছিল। এই কাঠের একপ্রান্তে চরখি বা ক্রুশের মতো করে পাতলা চারটে কাঠের টুকরো লাগান ছিল। বাকিটা সেই ম্যাগনেটের কাজ। (তখনকার দিনে ইলেক্‌ট্রিসিটি নিজের ঘরে তৈরি করে নিতে হত। কারেণ্ট বিক্রয়কারী কোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।) কারেণ্ট চললে কাঠটা ঘুরত। চরখি বা ক্রুশটি কাজে কাজেই ঘুরত। সেইজন্যে হাওয়া হত।

সস্তায় কারেণ্ট ও ইনসুলেটেড্ তার তৈরি করার জন্য কিছু সময় বাবা দিয়েছিলেন। এই কাজে আমার পরিশ্রম তিনি নিয়েছিলেন। আমার বুদ্ধি খাটাবার মতো কিছু ছিল না। শুধু কথামতো খেটে যেতাম।

বাবা ধূমহীন কেরোসিনের লম্ফ (ল্যাম্প) আবিষ্কার করার পেছনে কিছুদিন লেগেছিলেন। বহুবিধ পরীক্ষার পর এটিতে কৃতকার্য হন। মেদিনীপুর শিল্প-প্রদর্শনীতে লম্ফটি দেখান হয়। তিনি একটা সার্টিফিকেটও পেয়েছিলেন।

এইসব কাজে আমার খানিকটা সময় বেশ কাটত। বাকী সময়টা স্নান, আহার, ব্যায়াম, ভ্রমণ ও মানসিক জাবরকাটায় যেত।

সকালে শচী কেমন মিষ্টিভাবে ছেলেদের ঘুম থেকে ডেকে দিত। তারা তৈরি

হয়ে এসে তাঁত বুনতে বসে যেত। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে আবার তাঁতে বসত। সন্ধ্যায় একটু হরিনাম করত। তারপর আবার তাঁত চালাত। রাত্রে আহার করে শুত।

সকালে বৌরা উঠে ঘরবাড়ি নেপা-পোঁছা করে তকতকে করে রাখত। বাসনগুলি ঘাটে নিয়ে গিয়ে মেজে নিয়ে আসত। শচী মুড়ি ভেজে সবাইকে জলযোগ করাত। বৌয়েরা রান্নায় লাগত। শচী আহ্নিক সেরে গিয়ে বউদের ছেড়ে দিত। নিজে রান্নার কাজে লেগে যেত। কেমন চমৎকার শচীর কথাগুলি!

সীতারামের বাড়িতে মেয়েরা নিজেদের মাথার চুল দিয়ে পরের পা মোছাতে দ্বিধা করে না। সীতারাম বলে—কিভাবে কখন ভগবান আসেন তা কে বলতে পারে? শ্রদ্ধায় সব অতিথির সেবা করে গেলে ঠকতে হবে না। ভগবানের দেখা কি অমনি পাওয়া যায়? ভাগ্য চাই। অতিথির ছেলে-বুড়ো বাছতে নেই। তিনি কোন্ রূপ না ধারণ করতে পারেন? রাধা-মাধব! রাধা-মাধব!

গোপালনগরের রজনীর কথাও আমার মনে পড়ত। সে একটু অন্য ধরনের। আমি মাংস, ডিম এসব তখনও পর্যন্ত ছুঁতাম না। মায়ের কাছ থেকে ভাতে-ভাত রাঁধা শিখে নিয়েছিলাম। সেই ভরসায় বিদেশে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। রজনীর বউ আমাকে সব সময় কাছে কাছে রাখত। সকাল থেকে রাত্রে, যে পর্যন্ত না আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, বউটি আমাকে নিয়ে একটা-না-একটা কিছু করত। সকালে মুখ ধোবার জল ও ঘুঁটের ছাই দিয়ে যেত। মুখ ধোয়া হলেই গুড়-মুড়ি ও দুধ এনে দিত। বউটির যত্ন অতি অমায়িক। ওদিকে রান্নাবান্নার কাজ তাকে নিজেকে করতে হত। রজনীও সকালে উঠে গরু ও লাঙল নিয়ে মাঠে চলে যেত। বেলা আন্দাজ আটটার সময় তাকে মাঠেই সদ্যভাজা মুড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। রজনী দুপুরে বাড়ি এসে তেল মেখে স্নান করে আসত। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করত। বিকেলে তার কিছু কাজ থাকত না। সে মাঠ দেখতে যেত কিম্বা অপর কারুর বাড়ি চলে যেত। রজনী অপুত্রক।

বৌটি আমায় রান্নাঘরে বসিয়ে গল্প করত। আমাদের বাড়িতে কে কে আছে? ক'টি ভাই, ক'টি বোন, বোনেদের কার কার বিবাহ হয়েছে, কোথায় হয়েছে, তাদের ছেলেপুলে কি…ইত্যাদি। রাঁধতে রাঁধতে কোন-কোন দিন গুনগুনিয়ে গাইত—'আমার মনসাধ মনে রহিল—'

পুকুরে আমায় স্নান করতে সঙ্গে নিয়ে যেত। একা ছেড়ে দিত না। নিজ হাতে গাত্রমার্জনা করে দিত। সে আমায় সাঁতারজলে যেতে দিত না। আমার শালুক বা পদ্ম তোলার ইচ্ছা পূর্ণ হতে বাধা দিত। আমি সাঁতার জানতাম। তবু তার স্নেহের শাসন আমায় গলা পর্যন্ত জলের ওধারে যেতে দিত না। সে নিজে সাঁতরে ফুল আনত।

কত যত্ন, কত স্নেহ সে আমায় দিয়েছে! বৌটি রান্নাঘরে আর আমি যদি কোনদিন বাইরে থাকতাম, রজনী দূরে থেকে 'হাঁসের ডিম' দেখিয়ে আমায় রাগাত। চুপিচুপি বলত, 'এই জিনিষটি কি বল দেখি? একে বলে ব্রজের আলু। গয়লার বাড়িতে এটি না জোটায়, শেষে কৃষ্ণ মথুরায় যান। বুঝলে?'

আমি বিরক্ত হয়ে 'যাও এখান থেকে' বলে চেঁচিয়ে উঠলে রজনীর বৌ ছুটে আসত, আর তাড়াতাড়ি রজনী সেখান থেকে সরে পড়ত।

'যেমন কপাল! ঘরে বালকের রব নেই। যদি বা ভগবান দিলেন একজনকে এনে, তো তাকেও উত্ত্যক্ত করছে। লজ্জা লাগে না? এস—' বলে আমার হাতটি ধরে রান্নাঘরে নিয়ে যেত। একটা চট কিম্বা গামছা বিছিয়ে দিত বসতে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলত, 'বল, থাকবে আমার কাছে। চলে যাবে না?'

একদিন রজনী আমাকে বলল, 'ওঁয়াড়িতে থিয়েটার হবে। যাবে?' আমি থিয়েটার জিনিষটা এপর্যন্ত দেখি নি। যেতে রাজী হলাম। ওঁয়াড়ি গ্রাম এখন খ্যাতিলাভ করেছে। বটুকেশ্বর দত্ত (যিনি ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দিল্লী দরবারগৃহে ১৯২৯ সালে বোমা ছোঁড়েন) এই গ্রামের লোক।

নির্দিষ্ট রাতে আহারাদির পর কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে আমিও ওঁয়াড়ি গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম মাঠে কয়েকটা খোঁটা পুঁতে তার মাথায় একটা চটের চাঁদোয়া করা হয়েছে। আলো বা আসরের তখন কিছু নেই। খানিক বসে বসে ঢুলতে লাগলাম। লোকেরা বলাবলি করছিল, 'গতবার ধান ভালো হয় নি।' জনকতক মাহাতো-জাতের লোক—এদের পূর্বপুরুষরা পশ্চিম দেশের লোক ছিল—কথায় যোগ দিল। তারা বলল—হস্তা, না, কি একটা নক্ষত্রের জল মোটেই পাওয়া যায় নি। রোহিণীর জলই হয়েছিল কম। রোপণের কাজ তেমন যুৎমতো হতে পারে নি। "রোহিণীর জল, মৃগশিরার তাপ, আর্দ্রার ভিজে মাটি। তবে ধান হয় পরিপাটি।" এ বছর ভগবান করেন যেন সুবৃষ্টি পাওয়া যায়। আউশের আশা রাখতেই হবে। ভাতটা হলে, তরকারি কোনরকমে জুটে যাবে। "নোটে খেটে আড়ায়ে সজনে বারোমাস।" কিছু না হোক, সজনে শাক দিয়ে ভাত উঠে যাবে। তারপর হল খাজনা সম্বন্ধে নানারকম কথা। ধার-কর্জের কথা। চাষীর দেনায় জন্ম, দেনায় মৃত্যু। এঁষো রোগে (একরকম মড়ক) হালদারদের গোয়াল খালি হয়ে গেল। কি করে কি হবে!

ঘুমে আমার ঘাড় লটকে আসছিল। রজনী আমায় জাগিয়ে রাখার জন্য বলল, 'শুধু ভাত খাও, তাই এত ঘুম। এখনি থিয়েটার আরম্ভ হবে। ঘুমালে দেখবে কি করে?' এ ওষুধে বেশী কাজ হল না। আরও তীব্র ওষুধের প্রয়োজন। সে বলল, 'কত বলছি ঠাকুর, ব্রজের আলু খাও। তা কিছুতেই রা কাড়বে না। যদি গোলআলু খাও তো, ব্রজের আলু কি দোষ করলে?'

এবার ওষুধে কাজ করল। কিন্তু সেও ক্ষণিক। বেগতিক দেখে রজনী নিজের গামছাখানি পেতে তাতে আমাকে শোয়াল। অনুরোধ করলাম, থিয়েটার আরম্ভ হলে যেন আমায় জাগিয়ে দেওয়া হয়। রজনী রাজী হল।

কত রাত হয়ে গেছে জানি না। রজনী আমায় ডেকে তুলল। অতি লোভনীয় থিয়েটার দেখতে কতখানি এসেছি। মাঠের মাঝখানে গামছা পেতে শুয়েছি। সমস্ত মনপ্রাণ আমার চোখ আর কানে এসে মজুত হল। চোখে দেখলাম মশাল জ্বলছে। একজন, বোধ হয় রাধিকা হবে, রাখালবালক সেজে একটি নেকড়ার বাছুর কোলে নিয়ে পায়ে পায়ে ত্রিভঙ্গ হতে হতে চলছে। কানে শুনলাম 'সুবল সুবল' ডাক। 'সুবল রে, সুবল রে' বলে নেচে নেচে শামিয়ানার তলাটায় সে ঘুরছে।

রাগে ও আশাভঙ্গে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। এ তো থিয়েটার নয়, এ-যে কেষ্টযাত্রা, তাও নিরেস রকমের। এরকম অভিনয় ছেলেবয়সে ভালো লাগে না। এতে না আছে হুঙ্কার, না আছে টঙ্কার—মনোমদ হবে কি করে ?

রজনীকে 'বাড়ি চল' বলে তাড়া দিলাম। একটু পরেই ভোর হয়ে গেল। সবাই যে যার বাড়ি চলল। সারাটা পথ আমি নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে রজনীকে ধিক্কার দিতে দিতে এসেছি। রাগ হবে না ? একে তো ব্রজের আলু দেখিয়ে ক্ষেপায়। তার ওপর থিয়েটারের নাম করে ঠকিয়েছে।

মেদিনীপুর চলে এলাম।

মেদিনীপুরে এসে আমার মন বেঁচে থাকত সুবিখ্যাত গায়ক তস্দিক হোসেন ও আমার পিতার বন্ধু ডাক্তার রূপনারায়ণ দত্তকে নিয়ে। তস্দিক হোসেন তাজ খাঁ নামক তানসেন বংশের সুবিখ্যাত গায়কের ভাগ্নে। ১৮৫৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজেদ আলীকে কলকাতার নিকট মেটেবুরুজে নজরবন্দী করে রাখে ইংরেজ। তাঁর সঙ্গে একশো দশজন গায়ক-গায়িকা আসেন। যার ফলে কলকাতা ও বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রচলন বৃদ্ধি পায়। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বমান্য গায়ক তাজ খাঁ এঁদের মধ্যে ছিলেন। তিনি সভায় এলে অন্য গুণীরা 'ওস্তাদকা আওলাদ (গুরুবংশ)' বলে উঠে দাঁড়াতেন। নবাবের মৃত্যুর পর ইনি নেপাল দরবারে গায়ক হয়ে সেদেশে চলে যান। তস্দিক হোসেনকে তিনি গান শিখিয়েছিলেন। এঁদের গানের ঢঙকে বলত 'সেনী ঘরানা'।

আমাদের বাসায় প্রায়ই গানবাজনা লেগে থাকত। কত লোক আসতেন শুনতে। ময়ূরভঞ্জের রাজার সভাগায়ক যদু রায় মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁর ভাইপো আশু রায় আসতেন আমার পিতার কাছে দেখিয়ে-শুনিয়ে নিতে। যদু রায় এবং আমার পিতা ছিলেন গুরুভাই।

সুবিখ্যাত গায়ক ভাগলপুরের বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

ছিলেন। তিনি তমলুক এবং মেদিনীপুরে বাবার কাছে গান শিখতেন। অবশ্য তাঁর ওস্তাদ অন্য লোক ছিলেন।

মেদিনীপুরে এসে আমি বিষ্ণুপুরের নামী সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর পিতা অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনি এবং অনন্ত মুখুজ্যের পাখোয়াজ বাজানো শুনি। রাধিকা গোঁসাই আমাদের কলকাতার বাড়িতে অনেকবার গেয়েছেন। মেটেবুরুজের আর এক বিখ্যাত গায়ক আলিবক্সের শিষ্য অঘোর চক্রবর্তী মশায় গাইয়ে-মহলে খুব নাম করেছিলেন। তাঁর গানও বাড়িতে শুনেছি। অবাঙালীদের মধ্যে গোয়ালিয়রের বিখ্যাত ধ্রুপদী গুরুজি বালাজি, কলকাতার বিশ্বনাথ রাও, জোয়ালাপ্রসাদের গান বহুবার শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এঁরা সবাই আমাদের বাড়িতে আসতেন।

বিষ্ণুপুরের গানের ধাঁচকে বিষ্ণুপুরী ঢঙ বলতেন পশ্চিমের গাইয়েরা যদিও দিল্লীর বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের আদি গায়ক। আমি গানের চেয়ে তস্‌দিক হোসেনের কাছে নেপালের গল্প শুনতে ভালোবাসতাম।

তিনি বলতেন—নেপাল স্বাধীন রাজ্য। সেখানে ইংরেজের পুলিশ, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নেই। ইংরেজের আইন সেখানে চলে না। নেপালকে জয় করতে ইংরেজকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দখল করতে পারে নি। প্রথমটাতে কিছুই করতে পারে নি। পরে সেনাপতি অক্টার্লোনি গিয়ে নেপালীদের পানীয় জল সৈন্য দিয়ে আটকে ফেলে। নেপালী মেয়েরা কি অদ্ভুত সাহসী! নেপালীদের কেল্লার প্রাচীর ইংরেজের তোপে ভেঙে যায়। মেয়েরা কাতারে কাতারে এসে দাঁড়াল জীবন্ত-প্রাচীর হয়ে। পুরুষরা প্রাচীরের আড়াল থেকে যুদ্ধ চালাতে লাগল। নৃশংস তোপে মাতৃজাতির কোমল অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যেতে লাগল। রক্তের নদী বইতে আরম্ভ করল। তবু নেপালী স্ত্রী-পুরুষেরা স্বাধীনতা-সমর ছাড়ে নি। অবশেষে তৃষ্ণার জলের অভাবে নেপালীদের হার স্বীকার করতে হয়। তাদের কাছ থেকে মুসুরির পাহাড়, দার্জিলিং প্রভৃতি কেড়ে নেওয়া হয়। কলকাতার গড়ের মাঠে যাকে 'মনুমেন্ট' বলে, সেটি হচ্ছে এই অক্টার্লোনির স্মৃতিস্তম্ভ। পরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' নামক পুস্তকে মহিয়সী নেপালী মহিলাদের দেশার্থে আত্মদানের এই অতুলনীয় কীর্তির কথা পড়েছি।

তস্‌দিক হোসেন আরও বলতেন—বাঁচতে হলে মরদের মতো বাঁচা দরকার। সর্বস্ব গিয়ে যদি একটুখানি কুঁড়ে-বাঁধার জায়গা স্বাধীন স্থানে থাকে, তাহলে সেইটুকুই স্বর্গের চেয়ে মহত্তর।

ডাক্তার রূপনারায়ণবাবু অনেক সদুপদেশ দিতেন। একদিন আমায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে আমায় বুঝিয়ে বলেন—রকম-সকম দেখে তাঁর মনে

হয় আমার লেখাপড়া 'শ্রীমাধব'। আমার নিজের নেই পড়ার চাড়। বাপের দিক থেকেও ছিল না কোন তাগাদা। তার জন্য দুঃখ নেই। এদেশের বিদ্যা জাত-ভ্রষ্ট হয়ে জ্ঞানকরী থেকে অর্থকরীর পর্যায়ে নেমে গেছে। কেরানী হওয়ার চেয়ে মূর্খ হয়ে থাকা অহিতকর নয়। ইংরেজরা হচ্ছে দোকানদারের জাত। ওরা তৈরি করছে ওদের খাতাপত্র-লেখার লোক। তার মানে "সর্বশাস্ত্র প'ড়ে বেটা হও হতমূর্খ"। অর্থাৎ আমাদের দেহ-মন ওদের গোলাম হয়ে থাক্। যদি ভগবান কোনদিন এই দেশটার প্রতি মুখ তুলে চান, তাহলে দেখা যাবে যারা ওদের পায়ে মন-প্রাণ বিকিয়ে দেয় নি, ওদের লেখাপড়া নেয় নি বা শিখেও শেখে নি—এদেরই সাহায্যে স্বাধীনতা আসবে। অবশ্য শিক্ষিতরা তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে।

রূপনারায়ণবাবু ডাক্তারির প্রথম জীবনে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। কোন উপরওলা শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বেচাল হয়ে গরীব গৃহস্থঘরের মেয়েদের প্রতি কুনজর দিতে আরম্ভ করে। রূপনারায়ণবাবু একথা জ্ঞাত হলে, সইতে না পেরে সাহেবকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। তাঁর কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে আর বাধত না। তিনি স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য অনেক সুপরামর্শ দিলেন। তিনি গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতা বরদাস্ত করতে পারতেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'বুকটা মজবুত রাখতে হবে—রোজ একটা করে কাঁচা ডিম খেতে হবে। হাঁস-মুরগির বিচার করবি না। সব ডিম-ই ডিম।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন একথা বলছেন?'

তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'বাঁচার মতো বাঁচতে চাস্, কি আধমরার মতো?'

দ্বিরুক্তি না করে বললাম, 'বাঁচার মতো।'

তাঁর উত্তর হল, 'তাহলে জীবনকে করতে হবে গতিশীল।'

বললাম, 'বুঝতে পারলাম না।'

রূপনারায়ণবাবু বোঝাতে আরম্ভ করলেন—যখন এদেশটা স্বাধীন ও জীবন্ত ছিল, এদেশের লোক কালাপানি এক-আধবার নয়, বহুবার পার হত। এখন মরা জাত। বলে, কালাপানি পার হলে জাত যায়। এটা অপশিক্ষা। তখনকার লোক কোথায় যায় নি? পূব-পশ্চিম ছিল তাদের রঙ্গভূমি। জ্যান্ত জাতের প্রাণ ছটফট করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। অসম সাহসিকতায় গা ভাসিয়ে দিতে চায়। প্রাণের ভাণ্ডারে তাদের এত জমা যে, তারা প্রাণটাকে নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে পারে না। মরা জাতরা গলা-পচা দেহটাকে আঁকড়ে অনন্তকাল পার করে দেবার ভ্রান্ত আশা পোষণ করে।

এই কথাগুলি আমার বেশ ভালো লাগছিল। ক্ষুধাতুর যেন অকস্মাৎ ভাণ্ডার

লোটার আদেশ ও সুযোগ পেয়েছে। আমি তত্ত্বটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে চাইলাম। এই প্রসঙ্গ চলল কয়েকদিন। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-বিস্তারের ইতিহাস বেশ মনোরম করেই তিনি বলতে লাগলেন। এদেশের শিক্ষা-সভ্যতা-কৃষ্টি পারস্য-মিশর-গ্রীসে গেছে একদিক দিয়ে, আবার অপর দিক দিয়ে গেছে বর্মা-শ্যাম-জাভা-সুমাত্রা-চীন ও আমেরিকায়। সম্ভ্রান্ত ঘর পড়ে গেছে। হাতিকে কুঁড়েতে বাঁধবার হাস্যকর চেষ্টা চলেছে কয়েকশো বছর ধরে।

ওস্তাদজি ও রূপনারায়ণবাবু আমার শ্রদ্ধা এতখানি আকর্ষণ করেছিলেন যে, তা বর্ণনা করা যায় না। কোন কোন দিন চাকর বাসায় উপস্থিত না থাকলে আমি নিজহাতে তাঁদের তামাক সেজে দিতাম। একদিন খাঁসাহেব তামাক খেয়ে চলে গেছেন। তারপর এলেন রূপনারায়ণবাবু। তামাক খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর হুঁকোটা পাওয়া যাচ্ছিল না। চাকরও বাসায় ছিল না। তামাক সেজে মুশকিলে পড়া গেল। তাঁকে বিষয়টা জানান হল। তিনি সামনে একটা হুঁকো দেখে বললেন, 'ঐ যে রে রয়েছে—'

আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম, 'ওটা তো ওস্তাদজির হুঁকো। একটু আগে তামাক খেয়ে গেছেন।'

বিনা কালবিলম্বে তিনি আদেশ দিলেন, 'ঐটেই দে না—'

আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। আমার সংকোচের কারণ অনুমান করে বললেন, 'হুঁকোর কি জাত যায় রে? মানুষেরই জাত যায়। দে জল ফেলে, জল বদলে।'

আমি কি করব ভাবছি, এমন সময় চাকর বাজার থেকে এসে পড়ল। অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি অন্য একটা ঘরে, যেখানে হুঁকো থাকত না, ঢুকে ডাক্তারবাবুর হুঁকোটা এনে দিল। আর কেউ ওতে না খায় এইজন্য সে হুঁকোটা ঐখানে লুকিয়ে রেখেছিল।

তামাক টানতে টানতে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'দেখ্ যারা বাড়ি থেকে কোথাও বেরোয় না কুনো হয়ে যায় তাদের যত বাছবিচার। যারা পাঁচ দেশ বা পাঁচ জায়গায় যায় তাদের কোন বাড়াবাড়ি থাকে না। আমি যখন সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম যাই, সে দেশের ভালো-মন্দ কিছু জানতাম না। নৌকোতে যাচ্ছিলাম। তেষ্টা পেয়েছে, নদীর জল মুখে দিয়ে কুলকুচো করে ফেলে দিতে হল। নুনে-নুন। মাঝিদের বললাম তাদের কলসী থেকে একটু জল দিতে। তারাও দেবে না। তারা কেওট—তাদের জল তো আমাদের চলে না! আমার না-জানা থাকায় নিজের জন্য আলাদা এক কলসী ভালো জল নিয়ে যাওয়া হয় নি। জোর করে তাদের জল আদায় করে খেলাম। কি করব? প্রাণ দেব? এই দেখ্ কী করে অবথা গোঁড়ামি ভাঙে।'

আমি দেখলাম লাখ কথার চেয়ে একটা দৃষ্টান্ত কত বেশী মর্মস্পর্শী। ক্রমে রূপনারায়ণবাবু আরও অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, সে যদি চাকরিজীবী হতে চায় হতে পারে; কিন্তু তাহলে তিনি তাকে নিজ সম্পত্তির একটি কপর্দকও দেবেন না। বরং টিনের লক্ষ গড়ে সে খাবে তবু চাকরি করবে না। ছেলেটি তখন কলেজে পড়ছিল। আমাকে আর-একদিন ডেকে বললেন, 'তোর লেখাপড়া তো আর হবার আশা নেই। গান শেখ। আমি কিছু সংস্কৃত শিখিয়ে দেব। বামুনের ছেলে আছিস ভাগবৎ পাঠ ও কথকতা করে খাবি। খবরদার চাকরির দরজা কখনও মাড়াবি না।'

১৯০১ সালে কলাইকুণ্ডার রাজা একবার ডেকেছিলেন। তিনি বড্ড ভালোবাসতেন আমাদের। তাঁর মেদিনীপুর শহরের বল্লভপুরের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। আমাদের নিজেদের বাসা ছিল কোতয়ালী বাজারে।

কলকাতা থেকে গেলাম। স্কুলের ছাত্র। লটবহর বেশী কিছু সঙ্গে ছিল না। স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিলাম। তাঁর বাড়িতে এসে নামলাম। আমার থাকার জন্য একটা ঘর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। আমি আমার বিছানা এবং কাপড়-জামার বাক্সটি ঘরে রেখে শহর ঘুরতে বেরুচ্ছিলাম। ছোটবাবু, রাজার ছোট ভাই, নাম উপেন্দ্রনাথ পাল আমায় বললেন, 'বেরিয়ে তো যাচ্ছিস, ঘরে তালা দিয়েছিস?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়িতে এসেছি, ঘরে জিনিষপত্র রেখে বেড়াতে যাচ্ছি। তালা দেবার কথা কেন বলছেন?' ছোটবাবুর উত্তর হল, 'বড্ড চোরের উপদ্রব রে আজকাল।' আরও বিস্ময় হল। বললাম, 'চাকররা তো আছে। তারাই তো দেখাশোনা করবে।' মিষ্টি-হাসি হেসে ছোটবাবু জবাব দিলেন, 'ওরাই তো চোর'।

কী আশ্চর্য, বাড়ির চাকর চোর! চোরদের জায়গা তো জেলখানায়। বললাম, 'চোর যদি তবে বাড়িতে রেখেছেন কেন?' অনাঘ্রাত ফুলের মতো বেদাগী তরুণ-হৃদয় আমার এ প্রহেলিকা বুঝতে পারছিল না। তাই ওই প্রশ্ন। আগের মতো মিষ্টি মিষ্টি হাসতে-হাসতে ছোটবাবু বললেন, 'তাই তো! ওরা যাবে কোথায়?' এ কি রে বাবা! চোরের প্রতি সহানুভূতি! বিহ্বল নেত্রে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম তাঁর পানে। তালা দিতে গেলেই-বা তালা পাব কোথায়? আমি তো সঙ্গে করে নিয়ে আসি নি। ছোটবাবু সব ব্যবস্থা করলেন।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। সেই সময় শহরের যেখান-সেখান থেকে বেরিয়ে একটা গান নিজের জনপ্রিয়তা জাহির করত—'আগুন লাগিয়ে বসে আছি—'; গানটি থিয়েটারের কোন পালায় ছিল। ছোটবাবু থিয়েটারের দল করেছিলেন। শিল্পী হিসাবে সেখানে বারবনিতার স্থান ছিল। ছোটবাবুকে আমার সেজন্য ভালো লাগত না।

তখন শহরে কলেরা হচ্ছিল। ছোটবাবু তাঁর থিয়েটারের দল নিয়ে পরের মড়া

পোড়াতে যেতেন। কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করতেন। গরীবের চিকিৎসা, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন।

তাঁর মধ্যে দুটি বিরুদ্ধ ব্যাপার আমায় মুশকিলে ফেলেছিল। 'ভালো' তাহলে কাকে বলে? এর মানদণ্ড কি তবে দুটো? একজন তিলক-কাটা লোক ছিলেন। স্বভাবচরিত্র খুব ভালো। খুব সম্মান তাঁকে করতাম। পরে জানা গেল তিনি ছিলেন পরস্বাপহারী। কে ভালো? যে সমাজকে ঠকায়—সে, অথবা যে সমাজের সেবা করে—সে?

আর একটা ঘটনা বড় মজার হয়েছিল। মাথায় জটওয়ালা সাধু অনেক দেখা যায়, কিন্তু দাড়িতেও জটা খুব কম চোখে পড়ে। তেমনি একটি সাধু এসে উপস্থিত রূপনারায়ণবাবুর বাড়িতে। একথা-সেকথার পর সাধু সন্তবাণী শোনাতে শোনাতে বললেন, 'মিছার সংসার। একমাত্র হরি-পাদপদ্মই সার। কামিনী-কাঞ্চনে সব বয়ে গেল! কত কত অবতার, মহাপুরুষ সৎশিক্ষা দিয়ে পথ বাতলে গেলেন কিন্তু সংসার অসারই রয়ে গেল। বেচারারা আফসোস নিয়ে ফিরে গেছেন। রমণীর কমনীয় তনু ক'দিনের? তাতেই মোহ?'

রূপনারায়ণবাবু বেশ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। শেষের মন্তব্যে বিচলিত হয়ে উঠলেন—'দেখ সাধু, তোমরা আসবে আমাদের গালাগালি দিতে আর নেবে তার পুরস্কার। এ বাঁদরামি আমি অন্ততঃ বরদাস্ত করব না। গালাগালি খাবার জন্য পয়সা খরচ করতে রাজী নই। তুমি অন্যত্র দেখ—' বলে খবরের কাগজটা নিয়ে পড়তে বসে গেলেন। সাধু দমবার পাত্র নন, আরম্ভ করলেন শঙ্করের মোহমুদ্গর—"কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ..."

রূপনারায়ণবাবু খবরের কাগজটা রেখে গুছিয়ে বসলেন। প্রত্যুত্তরে বললেন, 'ওর মানে জান? ওর মানে হচ্ছে—ওরে মুখ্যু বেটা, তোর কান্তে কই, খন্তা কই? ওটা সংসারীদের উদ্দেশ্য করে বলা নয়। পঞ্চাশ লাখ কুঁড়ের-বাদশাদের উপলক্ষ্য করে লেখা। সমাজ তোমাদের খোরাক যোগাচ্ছে। তার বদলে কী সেবা তাদের দিচ্ছ? যারা ধন উৎপাদন করে, তারা খাঁটি মানুষের পরিচয় দেয়। তোমরা অলস। শুধু তাদের আয়ে ভাগ বসাও।'

সাধু বললেন, 'সাধুরা সংসার-বিরাগী। তাদের কাছে কী কাজ আশা করেন?'

রূপনারায়ণবাবু জবাব দিলেন, 'ঘুরে ঘুরে তো বেড়াচ্ছ। যদি লোকদের সত্যিকার শিক্ষার ভারটা নিতে কত ভালো হত। আজ শতকরা পাঁচজন লেখাপড়া জানে। তোমরা খাটলে নিরক্ষরতা কত কমে যায়। আর কিছু না করে যদি শুধু এই কথা বলে বেড়াতে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?"—তাহলে যে দেশে সোনা ফলে যেত? এইটাই হত জনশিক্ষা। সকল শিক্ষার সার।'

সাধু বললেন, 'আমরা তো প্রকৃত শিক্ষাই দিই—বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য—'

রূপনারায়ণবাবু বললেন, 'সে অতি উত্তম। খুব ভালোভাবে সময় কাটাতে চাও তো একটা কাজ বলে দিতে পারি।'

সাধু বললেন, 'কি?'

রূপনারায়ণবাবু বললেন, 'মুরগি জাতটাকে একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম শেখাতে পার? 'মনোগ্যামি'? তাহলে বরং একটা কাজের মতো কাজ হয়। আর তোমার সময়ও কাটে ভালো।'

সাধু বললেন, 'ও তো পরিহাস। কামিনী-কাঞ্চন সত্যি মানুষকে নীচের দিকে টেনে রেখেছে।'

রূপনারায়ণবাবু উত্তর দিলেন, 'কামিনী-কাঞ্চন না হলে সত্যিই সংসার চলে? সংসারটা ভগবানের সৃজন। কামিনী-কাঞ্চন কি শয়তানের সৃষ্টি? কামিনী না হলে অবতাররা আসতেন কি করে? কোন্ অবতারই বা বিয়ে করেন নি? রাম, কৃষ্ণ, মুনি-ঋষিরা কে গৃহী ছিলেন না? অর্থের প্রয়োজন চিরদিনই আছে। প্রয়োজনকে অস্বীকার করে কিছুই সংসারে নেই। যে মায়ের কাছে এত-কিছু পেয়েছ, আজ তারই দুর্নাম করে সাধুগিরির পরিচয় দিতে লজ্জা করে না? মাতৃদ্রোহী কোথাকার!'

সাধু এবার আর কথা কইতে পারলেন না।

রূপনারায়ণবাবু বললেন, 'মেয়েরা খারাপ হবার জন্যে মুখিয়ে নেই। তারা তোমাদের কুপথে নিয়ে যায় না। তোমরা এত কুপথগামী যে মেয়েরা তোমাদের সামলাতে পারে না। এই হচ্ছে তত্ত্ব।'

আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। হীরেনবাবুকে একজন সাধু 'বিবেক-বৈরাগ্য' বোঝাচ্ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সাধু। সাধু-লক্ষণ কি করে চেনা যায়, সেই প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন—'যথার্থ প্রেমিক সে, যাকে দেখলে মনে আসে গোবিন্দের নাম।' হীরেনবাবু বলেছিলেন উত্তরে—'আর, তাকে কি বলা যাবে, যে বলে তারে দেখলে আমি আপনহারা হই?'

দশম পরিচ্ছেদ

শীতকালে কতকগুলি মুসলমান সওদাগর আসে মেদিনীপুরে। তারা গরম কাপড়ের বেসাতি নিয়ে আসত। গরম পড়লে দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেশে চলে যেত। বিহারে সাহাবাদ জেলার সাসারাম থেকে একদল সদাগর এবছর এল। আমাদের বাসার কাছেই তারা দোকান খুলল। বড়মিঞার নাম ছিল মহম্মদ জান। বড়মিঞার আর এক ভাই ছিল। এরা মালিক। রসিদ বলে একটা ছোকরাও সঙ্গে ছিল। মেদিনীপুরকে কেন্দ্র করে এই দোকান থেকে মাল নিয়ে এদের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় বেচতে বেরুত। প্রয়োজনমতো এই বড় দোকানে আসা-যাওয়া রাখত।

ছেলেয়-ছেলেয় মনে-মনে ভাব করার আমন্ত্রণ আপনার থেকে আসে। ভাষার দুরূহতা এতে অন্তরায় হতে পারে না। হাড়মা ছিল সাঁওতাল ছেলে। আমি ছিলাম বাঙালী। কিন্তু অবলীলাক্রমে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

রসিদ ছিল বিহারী মুসলমান। তার সঙ্গেও আমার হয়ে গেল ভাব। আমাদের বাসার বাইরের কুয়া থেকে ছেলেটি জল নিয়ে আসত। তাই থেকে হয় আলাপ। কয়েকদিন বাদে দেখা গেল, কুয়ার পাশের একটুখানি জমিতে লেগে গেছে রসুন-পিঁয়াজের গাছ। আমি তাতে জল দিতাম। ছেলেটিও দিত। মাটি ফুঁড়ে বেরুল অঙ্কুর। ক্রমে হল সুন্দর কলি। তারপর হল চমৎকার ফুল। এমনিভাবে দুটি ছেলের মধ্যে ভালোবাসা বেড়ে উঠল।

যা ক্বচিৎ কখনও দেখাশোনায় তৃপ্তি পেত, তা বেশী সময় দাবি করতে লাগল। কুয়ার ধারে অপেক্ষা করে যতটুকু রসিদের সঙ্গসুখ পেতাম, এখন আর তাতে তৃপ্তি হয় না। বেশী বেশী মেলামেশা করতে ইচ্ছা হয়। নানারকম খরিদ্দারদের সম্পর্কে এসে রসিদও কিছু কিছু বাংলা শিখে ফেলেছিল।

যে-কোন ভাষা শেখার সহজ উপায় হচ্ছে ঐ ভাষাভাষী ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশা। ভাষাশিক্ষার গদ্য সহজে আয়ত্ত হয়। পদ্য বোঝা আরও একটু শক্ত। গান বোঝা তার চাইতেও শক্ত। বলা-গানের চেয়ে গাওয়া-গান বোঝা আরও শক্ত। সুরে অনর্থ ঘটায়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কথা বোঝাও বেশ কঠিন। টান-টোনে কেমন একটা তফাত থাকে। নিজের ভাষা শেখার পদ্ধতিতে এর উল্টোটা অনেক জায়গায় দেখা যায়। পদ্য থেকে গদ্যের দিকে এ পথটি গেছে। প্রথম আসে সুর। সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের কান্নার ভিতর দিয়ে তার বিকাশ। হাসির ভিতরেও তার প্রকাশ। পিঠ চাপড়ে-চাপড়ে ঘুমপাড়ানোয় গানের তালের মতো

ছন্দের আবির্ভাব। ঘুম-পাড়ানো বা ছেলে-ভোলানো গানে পদ্য ও সুরের বিন্যাস। "খোকা কেন কেঁদেছে, ভিজে কাঠে রেঁধেছে", "খোকা আমাদের ঘুমাল, পাড়াসুদ্ধ জুড়াল", "খোকা এল নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে"—মা, মাসি-পিসি, বোনেদের গোড়াতেই জানা যায়, বাবাকে দেখা যায় যেন এদের ফাঁকে ফাঁকে। কতরকম ছড়া রূপকথার ভিতর তারা উঁকি মারে! জীবনে পাওয়া যায় দুটো শিক্ষা—(ক) মা হচ্ছেন স্নেহের রূপমূর্তি। (খ) বাবা গবর্নমেণ্ট—শাসন-তন্ত্রের রূপমূর্তি। কেউ কেউ বলে—মা স্নেহময়ী, বাবা ডাণ্ডাধর। খেলুড়িরা বাল্যজীবনে সংসাররূপ মরুভূমিতে ওয়েসিস্—সজল সরস ভূমি।

রসিদ এখন পিন্দনের কাপড়, পিয়াসের পানি, চোখে নিদ্, পেটে ভুখ্ বলতে শিখেছে। "ফুল তুলব, হার গাঁথব—পিন্দবো দুজনে" গাইতে পারে। আমিও কম যাচ্ছি না; বলি—খামোকা কষ্ট কেন কর্‌তা হ্যায়? বগলমে সুড়সুড়ি লাগতা হ্যায়। তোমকো ব্যতিব্যস্ত কাহে দেখছি। পা ফুলকে পাঁউরুটি।...

পরস্পরে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে একটা সত্য আবিষ্কার হয়ে গেল। এতে আপোসনামা—একটা বোঝাপড়া দেখা যাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে বোঝাপড়া বা আপোস-নিষ্পত্তি অনেকখানি কাজ করে। সংসার সাধারণতঃ এই পথে চলে। এই বুদ্ধের মধ্যম নিকয় বা মধ্যপথ, খুব ঠিক। চরম পথ বহু দেরি-দেরিতে এক-আধবার দরকার হয়। সাধারণতঃ সর্বদা খর্পচণ্ডাভাব প্রায়ই অনিষ্টকর।

রসিদের সঙ্গে মেশা ও কথাবার্তা বলার সুবিধার জন্য ক্রমশঃ বড়মিঞার দোকানে আসতে লাগলাম। এই উপলক্ষ্যে বড়মিঞা আমার পরিচয় পেয়ে গেল। খুব খাতির-যত্ন করে দোকানে বসাত। নানারকম গল্প শোনাত। সাহাবাদ জেলায় জগদীশপুরে বাবু কুমার সিং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গল্প করত। বাবু কুমার সিং আশি বছর বয়সে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে সেপাইদের সঙ্গে ১৮৫৭ সালে যোগ দেন। সাহাবাদ বা আরার ধারে গঙ্গা। অপর পারে কাশী। বেনারস, গাজিপুর, বালিয়া, গোরখপুর, ছাপরা জিতে ফেরার সময় তিনি ইংরেজের সৈন্যেরা গুলীতে আহত হন। তিনি আহত হাতটা কেটে উড়িয়ে দিয়ে পটি বেঁধে ফেরেন। জগদীশপুরে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন। প্রায় তিনমাস পরে মারা পড়েন। তাঁর ভাই অমর সিং কোনদিন ধরা পড়েন নি। ফুলসাঁই একজন মুসলমান ফকির। তিনি কুমার সিং-এর ডানহাত ছিলেন। তিনি যুদ্ধে মারা যান। অমর সিং নেপালে চলে যান। এঁদের নামে ওদেশের লোকেদের আজও ভারী শ্রদ্ধা। শেরশাহেরও গল্প বলত। সাসারামে তাঁর কবর আছে। বহু লোক দেখতে যায়।

দিন যত যেতে লাগল, বড়মিঞা গল্পের মোড় তত ধর্মের দিকে ফেরাতে লাগল। সে বলত—জগতের মধ্যে মুসলমান ধর্ম শ্রেষ্ঠ। একমাত্র এই ধর্মই সত্য। মানুষ

যতবার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, তাদের ফেরার জন্য ভগবান ততবার পয়গম্বর বা তাঁর আদেশবাহী মহাপুরুষদের পাঠিয়েছেন। তিনি বিরক্ত হয়ে শেষবারের মতো হজরত মহম্মদকে পাঠিয়েছেন। এর পরে আর কাউকে পাঠাবেন না বলেছেন। পুরানো আইনের দোষত্রুটি দেখে, বদলে নতুন আইনজারি হতে, পুরানো আইনে আর কাজ হয় না। কারণ তা বলবৎ নয়। সেইজন্য সবচেয়ে নতুন ধর্ম ইসলামই এখন জগতের পক্ষে খুব ভালো ধর্ম।

ক্রমশঃ কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত কী—তা আমাকে সে বুঝিয়েছিল। এ পাঁচটি গ্রহণ ও পালন না হলে ধার্মিক হওয়া যায় না। চারটি দেওয়াল ও একটি ছাত না হলে যেমন বাড়ি হয় না, তেমনি এই পাঁচটি অবলম্বন না-হলে ধর্ম হয় না। কলেমাতে বলা হয়—আল্লাহ্ বা ভগবান এক। মহম্মদ তাঁর রসুল বা প্রেরিত বন্ধু। তৌরিত্, জব্বুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি যে-সব শাস্ত্র তাতে বিশ্বাস এবং কোরাণে বিশ্বাস। এইসবের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের নাম 'ইমান'। বিনা-ইমানে মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলমান এই ভাবেও অন্যেরা বুঝতে পারে—মুসলমে ইমান যার আছে সে-ই মুসলমান। অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী-ই মুসলমান। ধর্মহীন মুসলমান-জীবন হয় না। ইসলাম সেই ধর্মের নাম। ইসলাম মানে শান্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করার উপদেশ আছে ইসলামে। হিন্দুরা যেমন চার বেদ মানে, মুসলমানরা তেমনি চার কিতাব মানে। হজরত দায়ুদের কাছে আল্লাহ্ প্রকাশ করেছিলেন তৌরিত্, হজরত মুসার (মশি) কাছে জব্বুর, হজরত ঈশার কাছে ইঞ্জিল (বাইবেল); হজরত মহম্মদ পেয়েছিলেন কোরান। ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের শাস্ত্র এগুলি।

মহম্মদজান আরও বলেছিল, মুসলমান ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় কোরান, হদিস ও ফেকা শাস্ত্র দিয়ে। কোরান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মহম্মদের মনে নেমে আসে। মহম্মদ সাহেব যা উপদেশ দেন তা আছে হদিসে। মহম্মদের পরে জ্ঞানীরা একত্র হয়ে কোরান, হদিস ও মহম্মদের জীবন ও বাণী থেকে 'ফেকা শাস্ত্র' নির্ধারিত করেন। ছাতে যেতে যেমন সিঁড়ির দরকার, তেমনি একটি মারফত বা উপলক্ষ্য ধরে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছাতে হয়। সেই মারফত হচ্ছেন রসুল বা মহম্মদ। ফেকা শাস্ত্রের অপর দুটি নাম—তঞ্জীর শরিফ বা সহি বোখারী।

মুসলমানদের সাধনায় জ্ঞান ও ভক্তি মার্গ আছে। জ্ঞানীরা কাদেরী খানদান বা বড়পীরের (আব্দুল কাদের জিলানির) আধ্যাত্মিক বংশ। ইনি বাগদাদে ছিলেন। এঁর মতে গান-বাজনা হারাম বা নিষিদ্ধ। এঁর মাসতুতো ভাই খাজা মহম্মদ চিস্তি ভক্তি-পন্থের গুরু বা পীর। ইনি ভারতে আসেন। আজমীঢ়ে এঁর কবর আছে। 'চিস্তিয়া খানদান' হচ্ছে এঁর আধ্যাত্মিক বংশ। গানবাজনা এদের পক্ষে হারাম বা

নিষিদ্ধ নয়। গানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগে ; গওস্ বা সমাধি পর্যন্ত পেঁছান যায়। এদের গানের একটা নমুনা—

আঁখে তুঝ্কো দেখ রহি হ্যায়,
দিল তো গিরিপ্তার হ্যায়।
সবকি সুরত দিদা হ্যায়, তুঝ্কি—
সুরত না দিদা হ্যায়।
ইস্ক্ কি লহর যব উঠ্তা হ্যায়।
রুহ জিসম্ সে খাক্ হোতা হ্যায়।
ইঁসি ইস্ক্ কা ক্যায়া বুরা হ্যায়,
লাখো আদমি বিগাড় গিয়া হ্যায়।

—মন চুরি করেছ কে গো মনহরণ! মন চুরি হয়ে যাবার পর চোখদুটি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। সবাই-এর রূপ পরিদৃশ্যমান। কিন্তু তুমি থাক দৃষ্টির অন্তরালে। যখন প্রেমের জ্বালা জ্বলে ওঠে, দেহ তো সামান্য, অন্তরাত্মা পর্যন্ত ছাই হয়ে যেতে চায়। তবে এ প্রেম করে লাভ কি ? এতই যদি খুইয়ে ফেলা! লক্ষ লক্ষ লোক এই পথে নষ্ট হয়েছে। আমিও না-হয় মুছে গেলাম ?

মুরিদ বা সাধককে চার অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। পীর, মুরশেদ বা গুরু পথ বলে দেন। শরিয়ত বা আনুষ্ঠানিক অঙ্গ, তরিকত বা নিত্যকর্মপদ্ধতি, হকিকত বা গূঢ়ার্থ। তারপর মারফত বা তাসাউফ বা 'ইল্মে লা দুন্নি' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা অপর জগতের বিদ্যা।

এই তাসাউফে পেঁছালে আর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। সব আল্লামর দেখে। শুধু তাসাউফ নিয়ে যারা কারবার করে তারা 'সুফী'।

এতসব আমাকে বোঝাতে অনেকদিন লেগেছিল। শেষে আমাকে বলল, 'তুমি যা কিছু করবে, বিসমিল্লা বলে আরম্ভ কোরো। খুব শুভ ফল পাবে।'

আমার এরকম ঘনিষ্ঠ নতুন আড্ডার কথা পিতৃদেবের কানে পেঁছাল। তিনি কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর একদিন আমাকে বললেন, 'আমি চাই তুমি মানুষ হও। তোমাদের ধনাঢ্য হওয়া আমি কামনা করি না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

পিতা বললেন, 'আমি মনে করি, খোলসের মতো করে একটা ধর্ম রাখার কিছু মানে হয় না। ধর্মজীবন হওয়া চাই। চিন্তা, কথা ও কাজে সৎ হওয়াই "ধর্ম"। মানুষে-মানুষে ব্যবহারে যা আসবে—সেখানে সৎ হতে হবে।'

আমার মনে বেশ একটা নাড়া লাগল। চিন্তা করতে লাগলাম। আমার ভাব হচ্ছে—পরকে ভালো হতে বলার চেয়ে নিজে ভালো হওয়া বেশী দরকার।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৯০০ সালের শেষ দিক। শীত কাল। রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রাজ-গাংপুর থেকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন আমার পিতাকে যেতেই হবে সেখানে। এদিকে লালগড়ের ভাবী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহস রায় এসে উপস্থিত। তাঁদের সেখানে যেতে হবে। যোগেনবাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। যোগেনবাবু পরে রাজা হন এবং লোকহিতে যথেষ্ট দানশীলতার পরিচয় দেন। 'রামকৃষ্ণ মিশন'কে প্রভূত টাকা দিয়েছিলেন; কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁর দেহান্ত হয়।

প্রথমে সুরেনবাবুর কাছে যাওয়া স্থির হল। তখন বি. এন. আর. লাইন সিনি থেকে নাগপুর ও বোম্বাই পর্যন্ত চলতে আরম্ভ করেছিল। সিনি থেকে কলকাতা ভালোমতো চলে নি। লাইন-তৈরি-হওয়া অবস্থায় আমি অনেকবার গার্ডকে বলে ব্যালাস্ট ট্রেনে (রাস্তা-তৈরির জন্য পাথরনুড়ি-বাহী গাড়ি) কম্বল পেতে যাতায়াত করেছি। মালগাড়ির ওয়াগনেও চড়েছি। কলকাতার পথে খড়গপুর থেকে সাঁকরাইল পর্যন্ত রেল যেত। বাকিটা স্টীমারে চড়ে আর্মানীঘাটে গিয়ে নামতে হত।

মেদিনীপুর থেকে রেলে চড়ে খড়গপুর গিয়ে, বোম্বাই-এর গাড়ি ধরে ঘাটশিলা যাওয়া হল। ঘাটশিলায় মাত্র একঘর বাঙালী ছিলেন। কেউ কোথাও নেই—সুবর্ণরেখা গলার হারের মতো সুন্দর। ওপারের কাপড়গাদির পাহাড় মাথার মুকুট সেজে রয়েছে। সুবর্ণরেখা আর পাহাড় দুইয়ে মিলে ছেলেবেলাকার মন ভোলাবার ছড়াকে যেন রূপ দিয়ে রেখেছে। ঘাটশিলা ভারী সুন্দর—নির্মেঘ নীল আকাশ যেন সাদর আহ্বানের জন্য আসার পথে অপেক্ষা করে রয়েছে। বনমল্লিকার সারি দেখে মনে হল যেন তারা আহ্লাদে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার সুরথ মিত্রের একটি খালি বাঙলো ছিল, সেখানে আমরা রইলাম। রামপ্রসাদ সিং বলে এক বলিষ্ঠ রাজপুত দারোয়ানকে সঙ্গে নেওয়া হল। এখানে খাবার কিছু পাওয়া যেত না। শুধু কুমড়ো মিলত। স্টেশনমাস্টার জোৎদারমশাই পাস-এর ব্যবস্থা করলেন। তাঁর বাড়িতে সত্যনারাণ করার ইচ্ছে। তাঁর ও নিজেদের বাজারের জন্য আমি মেদিনীপুরে ফিরে গেলাম; আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করে ফিরে এলাম। জোৎদারমশায়ের বাসার মেয়েরা অনেক আশীর্বাদ করলেন।

তারপর সিনি হয়ে কুমারকিল্লা স্টেশনে গিয়ে নামা হল। পথে গালুডি, কালিমাটি, আশনবনি প্রভৃতি স্টেশন পড়ল। কালিমাটি যে টাটানগর হবে, তখন কে জানত? সত্যই বন কেটে এক পরীভূমি তৈরি হয়েছে।

কুমারকিল্লার নাম পরে বদলে হয়েছে রাজ-গাংপুরে। চক্রধরপুর গেলেই বোঝা গেল দেশের চেহারা বদলে গেছে। মনোহরপুর পেরিয়ে পাহাড় ছিদ্র করে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে রেল চলতে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ও আনন্দ আমাকে ছেয়ে ফেলল। মনে হল মানুষ কী না করতে পারে? শিলাভেদী পথ যে নির্মাণ করতে পারে, সে তার এগিয়ে যাবার পথে যাবতীয় বাধার বুক চিরে রাস্তা করে নিতে নিশ্চয়ই তো পারে। গ্রামে ঘরে-বসে-থাকা মানুষ আর প্রকৃতিজয়ী মানুষ—দুইয়ে কত তফাত!

আমার কাছে প্রকৃতিজয়ীদের যাত্রার নব চিহ্নগুলি খুব বেশী করে মনোমদ হয়ে উঠল। গোয়েলকিরা জঙ্গলের বিপুল অন্ধকার আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। বাবা বললেন—নাগপুর থেকে মারহাট্টী বর্গীরা এইসব পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে উড়িষ্যা ও বাংলায় আসত। তারা যদি আসত তবে বাঙালীরা কেন এই পথে তাদের দেশে আসতে পারবে না?—আমি ভাবতে লাগলাম।

'রাজ-গাংপুর'টা কি? এটি একটি করদ রাজ্য। রাজার নিজের জেল ও পুলিস আছে। রাজা ইংরেজকে বৎসরান্তে কিছু খাজনা দেন, অন্যথা তিনি স্বাধীন। রাজ্যটি মেদিনীপুর জেলার মতো বড়। নেহাত কম জায়গা নয়। বাংলায় মৈমনসিং সবচেয়ে বড় জেলা। তারপরই মেদিনীপুর। বাংলা ও উড়িষ্যার মাঝে মেদিনীপুর, বাংলা ও ছোটনাগপুরের মাঝেও মেদিনীপুর। সিংভূম জেলা এর পর আরম্ভ। সিংভূম ছোটনাগপুরে। সিংভূমে 'হো' বা 'লাড়কা কোলেদের' বাস। তাদের ইতিহাস রোমাঞ্চকর। আগে ছোটনাগপুরের কমিশনার ছোটনাগপুর ও বর্তমান ঈস্টার্ন স্টেট্স এজেন্সির অধীনস্থ যত করদ রাজ্য আছে সকলের উপরিস্তন ভারত-সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন। (ভারত স্বাধীন হবার পর ওগুলির অস্তিত্ব মুছে গেছে।) ওই করদ রাজ্যগুলির অনেককে রাঁচি জেলার এলাকায় ধরা হত। কমিশনার রাঁচিতে থাকতেন কিনা। সে হিসাবে মধ্যপ্রদেশের কতকগুলি করদরাজ্যও রাঁচির এলাকায় পড়ত। এদিক থেকে আমি রাঁচি জেলায় এসেছিলাম। গাংপুর ছিল সম্বলপুরের কাছে। লোকে উড়িয়া-ভাষাভাষী। রাজধানী এখান থেকে অনেক দূরে। ঝাড়ছোকড়া (ঝাড়সাগুড়া) স্টেশন হয়ে শঙ্খ নদী পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। নাম সুন্দরগড়।

সুরেনবাবু এখানে কি করে এলেন? করদ রাজ্য। তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এক প্রদেশ। একটা লাটের অধীনে থাকত এতবড় প্রদেশটা। সারা ভারতের কর্তাকে তখন বলা হত বড়লাট। প্রাদেশিক শাসককে বলত ছোটলাট বা লেফটেনান্ট গভর্নর। ছোটলাট সফরে বেরিয়ে দেশীয় রাজ্যগুলি পরিদর্শন করতে করতে গাংপুরে আসেন। রাজা খুব খাতির-সম্মান দেখালেন। ধুমধাম, আতসবাজি,

নাচগান, খানাপিনার ব্যবস্থাও হয়েছিল। রাজার সঙ্গে ছোটলাট 'কর-কম্পন' করতে হাত বাড়ালেন। রাজা নিজের হাত সরিয়ে রাখলেন। যারা গরু খায় তাদের সঙ্গে ছত্রী (ক্ষত্রিয়) হয়ে কি করে হাতে হাত মেলাবেন? ধর্মসংস্কারে গেল আট্‌কে। লাট সেটাকে অপমান মনে করলেন। তার ফলে ভারত সরকারের কাছ থেকে আদেশ এল এঁর শাসনপ্রণালী পরীক্ষা করতে। অমনি সুশাসনের অভাব প্রমাণিত হল। রাজার সব আমলা যেমন ছিল তেমন রইল। অধিকন্তু ভারত সরকার একজন দেওয়ান নিযুক্ত করলেন সরকারী তরফ থেকে। প্রথম দেওয়ান ছিলেন সুরেনবাবু। রাজার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার ছিল সুরেনবাবুর। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন। যতদূর সম্ভব একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতেন।

এখানে আমরা পৌঁছে খবর পেলাম রাঁচিতে মুন্ডা-বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। জেলায় তখন তুলকালাম ব্যাপার। মুন্ডাদের ইতিহাস খুব লম্বা। মহাভারতে এদের নাম পাওয়া যায়। এরা যদুপতি কৃষ্ণের শত্রু ছিল। কারণ কৃষ্ণের নেতৃত্বে যে-সব আর্য রাজশক্তি ছিল, তারা এদের পরাস্ত করতে করতে উত্তর ও পশ্চিম থেকে ক্রমশঃ পূর্ব-দক্ষিণে তাড়িয়ে আনছিল। এরা ছিল ভারতের আদিবাসী, অনার্য; ক্রমশঃ এরা মগধের এলাকা যাকে বলত, সেদিকে এসে পড়ে। জরাসন্ধের সঙ্গে এই জংলী জাত করেছিল সখ্যতা। কারণ শত্রুর শত্রু হিসাবে জরাসন্ধ হয়েছিল এদের মিত্র। কৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে নষ্ট করেছিলেন কংসের সাম্রাজ্য, শিশুপালের রাজ্য, জরাসন্ধের সাম্রাজ্য, কৌরব সাম্রাজ্য। কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাই। 'মুন্ডা' কথা হয়েছে মাথা বা মুন্ড থেকে। এরা দলের সর্দারকে 'মুন্ডা' বলত। তার থেকে জাতটার নাম হয় মুন্ডা। ছোটনাগপুর এখন যাকে বলে, তার নাম ছিল ঝাড়খন্ড বা জঙ্গলমহল। পাঠান রাজত্বকালে মুন্ডারা স্বাধীন ছিল। মুঘল আমলে আকবরের সময় পর্যন্তও তারা স্বাধীন ছিল। জাহাঙ্গীরের সময় প্রথম তাদের কাছ থেকে কর আদায় হয়। মুন্ডারা সাধারণতঃ ছিল সাধারণতন্ত্রী। পরে তাদের মধ্যে রাজার আবির্ভাব হল। একটা গ্রামের মাথাকে বলত মুন্ডা। কয়েকজন মুন্ডার ওপর থাকত 'মান্‌কি' বা মাথার মানিক। বন কেটে বাস করতে করতে যখন তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল ও বহু 'মান্‌কি'র ওপর একজন সর্দারের দরকার বোধ হল তখন এল রাজা। ইনি হলেন নির্বাচিত। ক্রমে নির্বাচন উঠে গিয়ে হল বংশগত রাজা। এঁদের বলে নাগবংশী রাজা। প্রথমে এঁরা কোন বাঁধাধরা কর আদায় করতেন না। উপহার বা উপঢৌকনে যা পেতেন তাই দিয়ে এঁদের চলত। মুঘলরা এঁদের সম্পূর্ণ অধীনে আনে নি। এরা করদ রাজ্য হয়ে রইল। এদের মধ্যে একটা সভ্যতার অভিমান আছে। প্রথম যারা কৃষিকার্য আবিষ্কার করে, তার মধ্যে ছিল এরা; প্রথম আগুন যারা আবিষ্কার করে, তার মধ্যে

ছিল এরা, প্রথমে নারীদের স্বাধীনতা যারা দেয়, তার মধ্যেও ছিল এরা। কৃষি ও আগুন আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ ছিল বর্বর। কৃষি, আগুন ও লোহার ব্যবহার নিয়ে হল সভ্য। লোহার ব্যবহার এরা তীর ও লাঙলের ফলার জন্য করত। এরা আদিম সভ্যতার দাবিতে অভিমানী।

মুঘলের পর এল ইংরেজ। ইংরেজদের সঙ্গেও তাদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। মুণ্ডারা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। রাঁচিতে রইল মুণ্ডা; যারা মানভূমে গেল, তারা হল ভূমিজ; সিংভূমে যারা গেল, তারা হল 'হো' বা 'লাড়কা কোল' অর্থাৎ 'লড়াইয়ে কোল'। সময় এদের বিরুদ্ধে চলে গেল বলতে হবে। বন্দুক-কামান আবিষ্কার হল। এরা কিন্তু তীরধনুক ছাড়িয়ে আর এগুতে পারল না। এরা যদি বন্দুকের সন্ধান রাখত, তাহলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মতো কতকটা হয়ে যেত এদের ইতিহাস। ঠিক তাদের মতোই এরা গরিলা-যুদ্ধে সুনিপুণ। প্রথম আফগান যুদ্ধে যেমন খাইবারের পার্বত্যপথে একটা বৃটিশ চমূর একজন বাদে সব নির্মূল হয়েছিল, তেমনি লাড়কা-কোলদের সঙ্গে ১৮৫৭ সালে একটা যুদ্ধে বৃটিশের সব সৈন্য নিহত হয়েছিল। কেবল আহত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে সেনাপতি পালিয়ে বেঁচেছিলেন। তাদের ছিল একদম গণশক্তি। তাদের মত হচ্ছে—মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে নি, কেউ সঙ্গে নিয়ে যায়ও না। মাটি তাদেরই থাকবে, যারা মাটির সন্তান। কোন রাজা, জায়গিরদার বা মহাজন তা নিতে পারে না। তারা ব্যাপক-ভাবে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ করেছে বহুবার। ১৮৫৭ সালে তারাও সিপাহীদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যোগ দেয়। হাজারিবাগ থেকে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে রাঁচি যায়। রাঁচির ডোরাণ্ডাস্থিত সিপাহীরাও যোগ দেয়। মুণ্ডারা সিংভূম, মানভূম ও রাঁচির বহু জায়গায় বৃটিশ-শাসন ছিন্ন করেছিল।

১৮৯৯-১৯০০ সালের কথা। এইবার তাদের সশস্ত্র-বিদ্রোহের শেষ আক্রমণ। খ্রীষ্টান ধর্ম ও বৃটিশ রাজত্ব এ-দুটোকে উচ্ছেদ করা তাদের লক্ষ্য ছিল। 'বিরশা ভগবান' বলে একজন এদের মধ্যে জন্মায়। সে চাইবাসায় কিছু লেখাপড়া শেখে। পরে হিন্দু ধর্ম ও মুণ্ডা ধর্ম মিলিয়ে একটা নতুন ধর্ম প্রচার করতে থাকে। অসাধারণ তার প্রভাব হল লোকদের মধ্যে। একবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার-পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে কিছুদিন চুপ করে থাকে। সরকার মনে করে, সে নিরীহ হয়ে গেছে। সে কিন্তু গুপ্ত-সমিতি গড়ে তোলে। ১৮৯৯ সালের বড়দিনের সময় রাঁচি জেলা ও শহরে বিদ্রোহ সুরু হয়। খুঁটি সাবডিভিসনে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইংরেজ যারা ছিল তারা রাঁচি শহর থেকে পালায়। বহু হতাহত হয়। শেষ পর্যন্ত দূরপাল্লা বন্দুকের কাছে স্বল্পপাল্লা তীরধনুকের হার হয়।

বহু লোকের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও জেল হয়। বিরশা বলেছিল, তাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। বহুদিন ফেরার থেকে পরে সে সিংভূম জেলায় ধৃত হয়। রাঁচিতে এনে বিচার করা হয় ও ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় ফাঁসির দিনের আগের রাতে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। ফাঁসি তাকে দিতে পারা যায় নি। ১৯০৭ সালে সন্ধ্যা-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

মুণ্ডাদের বার বার বিদ্রোহের (অবশ্য সরকারকে পৃষ্টকারী জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বেশী) কারণ অবধান করলে এ-ক'টি কথা স্পষ্ট হয়ঃ (১) অসাধারণ স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহা; (২) গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সমাজের হাতে থাকবে।

অর্থনৈতিক অবনতিতে দেখা যায় বিদেশী জমিদার, রাজা ও মহাজনরা শোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাব, বিহার বা বাংলা থেকে লোক এসে মুণ্ডাদের আর্থিক অবনতি ঘটায় এবং তাদের জমি দখল করতে থাকে। ইংরেজের আইনের ফাঁকি-জুকিতে প'ড়ে সাদাসিধে মুণ্ডারা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হচ্ছিল।

(৩) আপনার কৃষ্টি বা সংস্কৃতির অভিমানে আঘাত। খ্রীষ্টানদের দ্বারা এটি ঘটছিল।

(৪) গণ-আন্দোলনের মূলে ছিল মুণ্ডা-সমাজের ভিত্তির সুন্দর ব্যবস্থা। তারা হচ্ছে খুঁট-কাট্টি—অর্থাৎ জঙ্গল কেটে গ্রাম বসিয়েছে। তাদের চষত-বাটি ও বসত-বাটিতে তাদের নিরূঢ় অধিকার, স্বত্ব-স্বামিত্ব গোড়াপত্তনের দিন থেকে স্বীকৃত হয়ে রয়েছিল। তারা প্রথম দিন থেকে সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল যে—জমি, জমির উপর যা-কিছু আছে বা জন্মাবে তার স্বত্ব বা উপর-স্বত্ব; জমির তল-স্বত্ব; পাহাড়ের উপর ও নীচে যা আছে, নদী ও নদীর নীচে যা আছে এসবের স্বত্ব প্রত্যেক মুণ্ডা-গ্রাম অধিবাসীতে বর্তেছে। এ অধিকার কোন আদালত বা আইন খারিজ করতে পারে না। তারা অন্যবিধ ব্যবস্থা মানতে প্রস্তুত নয়। সে স্বাধিকার রাখতে জান-কবুল।

আমি এই তথ্য কুমারকিল্লা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। ওটা মস্ত জঙ্গলা-পাহাড়ের দেশ। আমি দু'বার বাঘের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই। জঙ্গলের ভিতর কোথাও কোথাও গ্রাম ছিল। তাদের মুখে শোনা যেত ঘরের দাওয়া থেকে বাঘ তাদের ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে।

জঙ্গল তল্লাটে কোলহান প্রদেশ বা কোলভূমে এমন জঙ্গল ছিল যাকে সরকারের বন-বিভাগ বলত 'virgin forest'। মানুষ তাতে তখনও প্রবেশ করে নি। বুনো হাতী, গয়াল বা নীল গাই, হায়না, বাঘ-ভল্লুকের মুল্লুক ছিল সেটা।

১৮৫৭ সালে কলহান বা পোড়াহাটের রাজা অর্জুন সিং সিপাহীদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দেন। বিদ্রোহান্তে তাঁকে কাশীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়। তাঁর

রাজ্য দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক অংশ 'সরাইকেলা ও খোরসানকে (ইংরেজের অনুচর রাজারা) আলাদা করে দেওয়া হয়। অপর অংশ পোড়াহাটে পরে তাঁর উত্তরাধিকারীকে আসতে দেওয়া হয়।

আরও শোনা যায় যে, রাঁচি শহর থেকে সাত মাইল দূরে জগন্নাথপুরের রাজাও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। ডোরাণ্ডার সিপাহীদের নেতৃত্ব তিনি করেন বা সিপাহীরা তাঁকে নেতা হতে বাধ্য করে। আন্দোলনের আমলে তাঁর সমস্ত জায়গা-জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। শুধু ঠাকুর জগন্নাথের ভোগরাগাদির জন্য একখানি গ্রাম ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমান খাসমহলের মধ্যে বড়কাগড় স্টেট যতটা, সবটাই একসময়ে ছিল পূর্বোক্ত রাজার। শহরের অনেকখানি জায়গা বড়কাগড় স্টেটের মধ্যে।

সৈন্যরা ডোরাণ্ডায় বিদ্রোহ করলে, সৈন্যদের জমাদার মাধো সিং তাদের নেতৃত্ব করে। পাণ্ডে গণপৎ রায়কে তারা সেনাপতি বানায় এবং রাজা বিশ্বনাথ সাহীদেও-কে সর্দার বানায়। ইংরেজ রাজ্যের চিহ্ন মুছে দেওয়া হয়। রাজা দরবার করতেন। সেখানে বিচার-বিভাগের কাজ হত। রাজা দরবারে আসার আগে শিঙে, জয়ডঙ্কা প্রভৃতি বাজান হত। গণপৎ রায় এবং রাজা বিশ্বনাথের পরে ফাঁসি হয়।

আমি কয়েকটি হো ও সাঁওতালী গান সংগ্রহ করেছিলাম। বাঙালী পাঠকের সুবিধার জন্য তাদের বিরচিত শুধু বাংলা গান দু-একটি নমুনাস্বরূপ এইখানে দেওয়া হল—

(ক) "দিল লো দিল। রাজার বেটা পুঁথি পড়িল।"

—রাজার বেটা হয়ে লেখাপড়ায় মন—দুনিয়া উল্টে গেল যে!

(খ) "ঘর গেল, দুয়ার গেল তায় আমি ভাবি না।
পিতল-বাঁধা হুঁকা গেল, কিসে খাব ধুঁয়া?"

—যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। নেশাখোরের কাছে নেশার জিনিষই বড়।

(গ) "পুখরী কাটালে বঁধু, না বাঁধালে ঘাট হে—
ডালিম লাগায়ে বঁধু, গেলে পরবাস হে!"

—বসন্ত এল মালঞ্চে তার সমারোহ নিয়ে। মালী তুমি কোথায়?—এ খেদ এ সঙ্গীতে ধ্বনিত হচ্ছে।

একটি হো-ভাষার গান ঃ

(ঘ) "এ হেরেল, দিকু হেরেল—
বারুদারে লাতা হেরেল!"

—হে দয়িত, প্রিয় দয়িত—কুসুম গাছের মতো (প্রিয়) তুমি! (একরকম গাছ আছে, তার নাম কুসুম গাছ। তার ফুল সুন্দর; তরুণীরা খোঁপায় পরে। তার ফল থেকে একরকম তেল হয়; তরুণীরা মাথায় মাখে।) তোমায় ফুল করে কেশে ধারণ করি—তোমার তনুর সৌন্দর্য কাউকে জানতে না দিয়ে তেলের ছলনায় কেশের প্রসাধনে লাগিয়ে পুলকিত হই!—এই আবেগময়ী ভাব এই গানটিতে প্রকাশ হচ্ছে।

মধ্যাহ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবার পিতামহীর আহ্বান এল। তিনি বড়ই ব্যথা অনুভব করছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর বংশে জন্মে কেউ সরস্বতীর সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ করে থাকবে! পিতামহীর সাদর আহ্বান আর শাসন-বাক্য একই পদবাচ্য। একটি কড়া কথা না বলে, হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে সুন্দরভাবে সাংসারিক শৃঙ্খলা রাখতে তিনি ছিলেন সুনিপুণা। যখন অনেকে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশা ও অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখছিলেন না, ঠিক সেই সময়ে আমার ভবিষ্যতে আস্থা রেখে আমাকে পিতামহীর কলকাতায় আনা দরকার হল। পিতামহীকে বলতাম 'কুইন ভিক্টোরিয়া'। তাঁর ডাকের কাছে কারও সাধ্য ছিল না আমায় আড়াল করে রাখে। তাঁর মধুর শাসন সবাই মাথা পেতে নিত। পোষ্য ও পাল্যদের উন্নতি-কামনায় তাদের ভিতরের মানুষটিকে স্পর্শ করতে তিনি জানতেন।

কলকাতায় এলাম। এবার পাকাপাকিভাবে সরস্বতীর সঙ্গে ঝগড়া রফা হয়ে গেল। রফার কারণ হচ্ছে—ঠাকুমার অনুযোগ যে, আমি পড়ার ভয়ে পালিয়ে ছিলাম। কার কোন্‌খানটা ছুঁলে ফল হবে কেমন যেন তিনি বুঝতে পারতেন। ভয়ের কথা তুলে সংসারের কর্ত্রীর কূটনৈতিক জয় হল। আমি ছেলেদের 'বিদ্যাস্থানে-ভয়ে-বচ'র মোকাবিলা করতে সর্বাস্তিক শক্তিতে এগিয়ে পড়লাম। ভালো না-লাগা আর ভয় এক জিনিষ নয়।

বিদ্যালয়ে এলাম। কিন্তু বৃহত্তর জীবনের পাঠ অনেক শিখে। বাবার সঙ্গে 'কমিশনে' গিয়ে মেদিনীপুর জেলার বহুতর গ্রামে আমি বাস করেছি। যেখানে গেছি সেখানে নিজ ধারা বজায় রেখেছি। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে গিয়ে স্থানীয় এলাকায় খাওয়া-দাওয়া মেলামেশা করেছি। চোখ-কানের সাহায্যে বহু কিছু শিখেছি। তার চেয়ে বেশী কিছু পেয়েছি মনের অন্দর-মহলের মারফত।

'কমিশন' কথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। আমার বাবা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে জরিপের কাজ শিখে নিয়েছিলেন। সেজন্য যে-সব মোকদ্দমায় জমি মাপামাপির দরকার পড়ত, তাতে আদালত থেকে বিশেষ অনুরোধ করে আমার পিতাকে নিযুক্ত করা হত। আমি এই প্রসঙ্গে বহু জায়গায় ঘোরার সুখ ও সুবিধা পেতাম। আমি মক্কেলদের কথা, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কথা, বাড়ির মেয়েদের কথা ও আমার বাবার সঙ্গে অপরদের ও তাঁর নিজের আলাপ-আলোচনা থেকে কয়েকটা মোক্ষম জ্ঞানের কথা শিখতে পেরেছিলাম। সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গেলে তা দাঁড়ায় এই—

(১) ইংরেজ-রাজ্য স্থাপনে যারা সাহায্য করেছিল তারা পুরস্কার-স্বরূপে পেয়েছিল জমিদারি। আদায়কারী তশীলদারের কাজ মোটামুটিভাবে তারা করত। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহের কথা মুখে মুখে তখনও অনেকে বলত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদাররা যত টাকা আদায় করে দিত, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা রাখত নিজেদের খরচ-খরচা ও মুনাফার জন্য। কিন্তু সব টাকাটাই যোগাতে হত বেচারা নিরীহ কৃষকদের। যেখানে বারো কোটি টাকা আদায় হত, সেখানে তিন কোটি বা চার কোটি টাকা যেত ইংরেজের তহবিলে। বাকী টাকা থেকে যেত মাঝখানকার লোকেদের হাতে।

(২) রাজসরকারের প্রয়োজনে বেগার কুলী জুটিয়ে দেওয়াও ছিল এদের কাজ। গোলামির শেষচিহ্ন-স্বরূপ হচ্ছে এই বেগারী ব্যবস্থা। এই কাজটি সুচারুরূপে নির্বাহ করে দেবার জন্য বহুতর নিগ্রহানুগ্রহের ক্ষমতা ছিল জমিদারদের হাতে।

(৩) নিজেদের ছেলের অন্নপ্রাশন ও বিবাহাদিতে নির্দিষ্ট করাতিরিক্ত অর্থাদি গরীবদের কাছ থেকে আদায় করা হত। না দিলে, নানারূপ লাঞ্ছনায় তাদের ভুগতে হত।

(৪) প্রজাদের মূর্খ ও অজ্ঞ রাখায় তাদের অন্যায় ও শাসন অব্যাহত থাকবে ভেবে, দেশে নিরক্ষরতা তারা বাড়িয়েছে বই কমায় নি।

(৫) সামাজিক দুষ্টরীতির পোষক এরা। 'জমিদারের সমক্ষে ছাতা বা জুতো ব্যবহার করা প্রজাদের পক্ষে অন্যায় বেয়াদবি'—এরাই চালিয়ে এসেছে। বসবার স্থান ও আসনের তারতম্য এরাই বজায় রেখে এসেছে। প্রজার জমির গাছ ও পুকুরে প্রজাদের অধিকার নেই।

(৬) দরিদ্র ঘরের নারীর উপর রাজা-জমিদারের অকথ্য অত্যাচার এরাই কোথাও কোথাও চালিয়ে এসেছে।

(৭) পাইক-বরকন্দাজ, লাঠিয়াল দিয়ে জব্দ করা ছাড়া, নায়েব-গোমস্তার মারফত মিথ্যা দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় ফেলে অবশীভূত প্রজাকে এরা সর্বস্বান্ত করে থাকে।

(৮) কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধি কেমন করে হয়েছে ও হচ্ছে :

দেশের কলা ও শিল্প বৈদেশিক কলের শক্তির কাছে দিন দিন পরাভূত ও লুপ্ত হয়ে আসছে। পেটের দায়ে শিল্পী ও কারিগররা জমির ওপর আছড়ে পড়েছে। নির্ধন কৃষকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

(৯) দারিদ্র্যে পড়ে মহাজনের শরণাপন্ন হতে হয়। শেষ পর্যন্ত চক্রবৃদ্ধি সুদের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ দুরূহ হয়ে পড়ে। জমি-জায়গা বিক্রি করে, পেটের দায়ে গায়ে-গতরে খেটে খেয়ে বাঁচতে হয়। গতর বিক্রি করে খাওয়া এদের পেশা।

গ্রামের ছুতোর ও কামার থাকতই। গ্রামবাসীরা গার্হস্থ্য ও কৃষিকার্যের প্রয়োজন মেটানর জন্য ছিল তাদের দরকার। সস্তার কোদাল, কুড়ুল, দা, খন্তা, কাস্তে, বঁটির ফলা বিদেশ থেকে এসে কামারকে মেরেছে ও মারছে। ছুতারও কাজ পাচ্ছে কম। গরীব চাষীরা নিজেরাই লাঙল-তৈরিতে হাত দিয়েছে। ছুতোর ও কামারের বংশ যে পরিমাণ বাড়ছে, সে পরিমাণে গ্রাম থেকে তাদের জাতীয় পেশার বদলে নূতন করে আরো জমি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

কাঁসার কাজ, কেটে-তসরের কাজ, তাঁতের কাজ আর লাভজনক নয়। কাঁসারী ও তাঁতী মরতে বসেছে। ম্যালেরিয়ার দয়ায় যমের দক্ষিণ দুয়ার খোলা! খাওয়া-পরার অভাব, তার ওপর রোগের ওষুধ জোটান যায় কি করে? জমিদার নিজেরাই কসাই বা চামড়াওলাদের সঙ্গে ভাগাড়ের বিলি-বন্দোবস্ত করে নিচ্ছেন। মুচী বা চামার জাত তাতে মরছে। আগে এরা গ্রামের নোংরা অবস্থার 'শুদ্ধারক' ছিল। ভাগাড়ের গরু-মোষের জন্য একপয়সাও দিতে হত না। এখন সেদিন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে। চামড়াওলারা মুচীর কাছে কিনত, তাতে মুচী পয়সা পেত। এখন চামড়া-ওলা সস্তায় চামড়া পাচ্ছে।

কুমার, নাপিত, তেলী, কলু সবাই অর্থনৈতিক দুর্দশার কবলে পড়েছে। সস্তার বাজারে পোটো, পুতুল বা খেলনাওলারা বিলাতী মালের প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। বিবাহে পণের টাকা যোগাড় করতে না পারায় বহু জাতি বংশহীন হয়ে মরে যাচ্ছে বা তাদের লোকসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই—সবাই বাঁচতে চায়। মরতে চায় না কেউ। কিন্তু যেমন সমাজব্যবস্থা আছে, তাতে জাঁতার-মধ্যে-পড়া ডালের মতো সবাইকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে হবে। পার পাবে না কেউ। এর থেকে বাঁচার উপায় বার করতে হবে। যা বন্দোবস্ত আছে, তাতে চলবে না। যা করলে হবে, তা এখনও এক্তিয়ারে আসে নি।

একদিন এক গ্রামে মাঠে বেড়াতে বেড়াতে আমি একলা একদিকে চলে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একটি বৃদ্ধ ঘাসের একটা মস্ত বোঝা মাথায় নিয়ে অতি কষ্টে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে খানিকটা জল পার হতে হবে। জল প্রায় উরু পর্যন্ত। বেচারী বৃদ্ধের কষ্টের অবধি ছিল না! তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথায় যাবে? সে কেন বোঝা বইছে? তার ছেলে নেই? বৃদ্ধ উত্তরে বলল, সে সামনের পাড়াতেই যাবে। তার কেউ নেই। ছোট ছোট দুটি নাতি ও একটি নাতনী। ঘাস বেচে নুন-তেল কেনার পয়সা যোগাড় করতে হবে। এক দিন তার কিছু জমি-জমা ছিল—ভগবান মেরেছেন! আজ এই বুড়ো বয়সে এই দুর্দশা। বৃদ্ধ কথায় কথায় বলল—যা করলে তার মতো লোকের দুঃখ ঘুচবে, তা মানুষের হাতে নেই। আমি বিস্ময় বোধ করলাম।

এ বিষয়টা নিয়ে বুধের পাড়ার অধর চাপড়ীর কাছে গেলে সে আমাকে বলেছিল যে—আমি ছেলেমানুষ, এসব কথা বুঝব না। যেটুকু বুঝব সেইটুকু সে বলছে—জমিদার না থেকে যদি জমি তাদের হত যারা চাষ-আবাদ করে খায়, তাহলে খাওয়া-পরার দুঃখ যেত। তারা স্ত্রীলোকেরও অধম। স্ত্রীলোকের এক স্বামী; তাদের দুই স্বামী—সরকার ও মধ্যস্বত্বরা। মরা ছেলেমেয়ের শোক মানুষ মেটাতে পারে না। সে হচ্ছে ভগবানের হাত। কিন্তু এরকম দুঃখ মানুষ মেটাতে পারে। কিন্তু তারা কাহিল; তাদের হাত থেকেও নেই। বিলাতী মাল আমদানী বন্ধ করতে পারলেও মানুষ খেতে-পরতে পায়। কিন্তু সে হবে কি করে? এখন কোম্পানির মুল্লুক। বিলাতী মালও ওদের দেশ থেকে আসে।

অধর চাপড়ীদের মোটা তসর বা কেটের এবং সুতার ব্যবসা ছিল শহরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সহপাঠীদের সঙ্গে আমি আবার প্যারীবাবুর চরণপ্রান্তে বসে জ্ঞানলাভ করতে লাগলাম। প্যারীবাবু আমার মাঝে অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার খবর জানতেন। আমার মুখে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনে খুশি হলেন। বললেন—আমরা ভারতবাসী—ভারতকে জানি না, চিনি না। জানার ঔৎসুক্যও মরে গেছে। বুয়াররা যে এত কৃতকার্যতার সঙ্গে লড়েছিল তাদের অতি সামান্য উপচার নিয়ে, তার ভিতরের কথা হচ্ছে যে তারা আপনাদের প্রতিটি ইঞ্চি জমির সঙ্গে পরিচিত ছিল। বিনা ভ্রমণে বিশেষ করে গ্রামের ভিতরে, দেশকে চেনা যায় না, জানা যায় না। ভারত এমন বিশাল দেশ যে, একে এক মহাদেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো ভারতের পায়ের নখ দেখেছে, কেউ হয়তো হাতের এক-আধটা আঙুল দেখেছে। এর নাম কি ভারতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ? মোটেই তা নয়। তোমরা অন্ততঃ এইটুকু কর, গরীব-দুঃখীদের সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছেড়ো না। গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটিতে গ্রামে গ্রামে বেড়াতে বেরোবে। পুজোয় গ্রামে নতুন জীবন জাগে। সেই সময় পাশাপাশি দুটো ভাব দেখতে পাবে। জীবনহীন মরন্ত গ্রাম্যজীবন ও শহর-প্রত্যাগত নবজীবনের ইঙ্গিতবাহী রকমটা। দুটোকে একত্র পাওয়ায়, তুলনায় ও তারতম্যে ধরতে শিখবে—আমরা কী ছিলাম, কী হয়েছি, কী হতে হবে ? শহরের লোকেরা এসে গ্রাম্যজীবনের অল্পে তুষ্ট থাকার ঘোর ভেঙে দিচ্ছে। গ্রামের লোকেরাও ক্রমশঃ জীবনের স্বল্প এঁটো-কাটার মতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে দিন কাটাতে রাজী হবে না। এমনি করে জাগবে দেশব্যাপী একটা অসন্তোষের ভাব। তার ফলে ঘটে যাবে ভাব-বিপ্লব। তার থেকে আন্তরিক শক্তি পেয়ে আসবে সমাজ ও রাষ্ট্রে আমূল পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই থেকে ডাকবে মুক্তির বান। নাল্পে সুখমস্তি।

তিনি আরও বুঝিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরানী-কেন্দ্রিক শিক্ষার অনুপূরক আর একটা শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে চলা চাই। যে শিক্ষা স্কুল-কলেজে দেওয়া হয় সেটা অঙ্গহীন, অপূর্ণ, অসার্থক শিক্ষা।

আমার পিতাও এরকম কথা বলতেন। তিনি বলতেন—শুধু কলা-শিক্ষা দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে করে অযথা মানবীয় উপাদানের অপব্যয় হচ্ছে। ব্যাবহারিক জীবনে বিজ্ঞানকে লাগাবার মতো করে শিক্ষা-প্রণালীকে বদলে না ফেললে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে। বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া আর এতে কিছু হবে না।

বাবার বন্ধু রূপনারায়ণবাবু এই বেকার-সমস্যাকে ইঙ্গিত করে বলতেন—আজকাল কন্যাদায়ের চেয়ে বাপ-মায়ের বড় হয়েছে পুত্রদায়। শিক্ষিত পুত্র দরিদ্র বিধবা কন্যার চেয়ে বেশী ভাবনার বিষয়। মেয়েরা সংসারে সাহায্য করে, ছেলেরা হয় গলগ্রহ।

আমার পিতা বলতেন—বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। কলা (Art)-শিক্ষা বরং কমিয়ে কর্ম-শিক্ষা ও যন্ত্র-শিক্ষা দেওয়াই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার গতি হবে শিল্পকেন্দ্রিক। যেসব দেশ এই আদর্শ গ্রহণ করেছে, তারা এগিয়ে চলেছে। যে-সব দেশ শুধু কৃষি আর তাঁত নিয়ে পড়ে থাকছে, তারা পিছনে পড়ে থাকতে বাধ্য। তিনি আমাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি লেখাপড়া শিখে যাই হও, শুধু সেইটের উপর নির্ভর না রেখে পাশাপাশি আর একটা কিছু ভরণপোষণের উপায়ও শিখে নেবে। যেমন, ঘড়ি-মেরামতের কাজ, টিন-মিস্ত্রীর কাজ, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, দর্জির কাজ, ইত্যাদি।'

দেশের মধ্যে কোন বড় পরিবর্তন ব্যক্তিগতভাবে আসে না বা আনা যায় না। সমষ্টিগতভাবে এদের আনতে হয়। তাহলে সে-কাজটা রাষ্ট্র বা সমাজের। রাষ্ট্র করলে সহজ, সুগম ও সত্বর হয়। সমাজ করলে কিছুটাও হয়, কিন্তু "একা ভেকা"।

প্যারীবাবুর ছাত্ররা একত্র একভাবে চিন্তা করতে লাগল। অক্ষয়, শরৎ ও আমি 'এসব বিষয়ে' পুরোপুরি একমত ছিলাম। শরৎ অন্যের কাছে আমাদের ভাবপ্রচার ও কর্মকে গতিসম্পন্ন করতে অদ্বিতীয়। 'গোড়াকার কাজ গোড়ায় করা চাই'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে চিন্তার বিলাসিতার পরিবর্তে কর্মে আমরা প্রবৃত্ত হলাম। "স্বল্পমপি ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—আপনি আচরণ না করলে পরে কেন কথা শুনবে ?

মড়া-পোড়ানো তখনকার দিনে এক ভয়াবহ ব্যাপার। কারও বাড়িতে শোকের ব্যাপার ঘটলে তার যে কী মুশকিল হত, তা বলে বোঝাবার নয়। 'আমার যেতে তো আপত্তি নেই, বাড়িতে…অন্তঃসত্ত্বা—' তিনি পাশ কাটালেন। আবার কেউ হয়তো বলত, 'আমায় একটা মাদুলি ধারণ করতে হয়েছে। তাতে মানা আছে।' তিনিও সরে পড়লেন। 'আমার পেটটা ভুটভাট করছে, নইলে এতে আপত্তি করতে আছে ?' তিনিও বাদ পড়লেন। এইরকম একটা-না-একটা বাজে অজুহাতে আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই কেটে পড়তেন। রোগীর সেবা ও মড়া-পোড়ানোয় এই তরুণরা অগ্রসর হল। দেশের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য লাট-দরবারে কথা-কাটাকাটি চলত। গোখলে এ বিষয়ে জবরদস্ত আন্দোলনকারী ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কর্তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় হত না। ছাত্রবন্ধুরা মনে করল, দু'একজন যাকে পারে তাদের নিরক্ষরতা

দূর করার জন্য যদি প্রত্যেকটি শিক্ষিত পুরুষ ও নারী ব্রতী হয়, তাহলেও একটা শুভারম্ভ হয়। বিদেশী সরকারের মুখের দিকে চেয়ে বসে থেকে কিছু হবে না। এরা 'সান্ধ্য পাঠশালা' আরম্ভ করল। নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে। পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কোনদিন উদ্ধার নেই।

আরম্ভ করল সমাজসেবার দিক থেকে। ক্রমশঃ রাজনীতিক দৃষ্টি খুলতে লাগল তার ভিতর থেকে। গ্রামে গ্রামে ঘোরা চলল। গ্রামের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দুর্দশা যেন ডেকে তাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। যে পুকুরে পালিত পশুদের নাওয়ায় সেই পুকুরেই মানুষ স্নান করে, তার জলে শৌচ সাবে, আবার সেই জল খায়। গ্রামে ভালো পুকুরের অভাব। আগেকার অনেক পুকুর মজে গেছে। গ্রামের মধ্যে যাদের অবস্থা ভালো, তারা শহরে গিয়ে বাস আরম্ভ করেছে। যারা ছন্নছাড়া বললেই হয়, তারা গ্রামে পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। নতুন করে পুকুর-প্রতিষ্ঠা কমই হচ্ছে।

শিক্ষার অবস্থাও তথৈবচ। শিক্ষক ও শিক্ষালয়ে যে খরচ তা গরীব কৃষকদের দিয়ে সরবরাহ হচ্ছে না। নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না।

স্বাস্থ্য-বিভাগেও সেই কথা। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রতিষেধ করা যায়; কিন্তু কিছু হচ্ছে না।

অন্য দেশে কি হয়? সংবাদ সংগ্রহ করে জানা গেল, সেখানে রাষ্ট্র এ বিষয়ে আগুয়ান। রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। এখানে কার জন্য কার মাথাব্যথা? পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার জন্য বিদেশীরা এদেশে এসেছে। তাদের নিজেদের জন্য যা তারা তাদের দেশে করে, সেটা এখানে আশা করা বাতুলতা মাত্র। তুলনামূলক আলোচনায় প্যারীবাবুর সাহায্যে তারা জানতে পারল যে, প্রাচীন কালে এদেশে শিক্ষা ছিল আবশ্যিক, অবৈতনিক। রাষ্ট্র সমস্ত খরচা বহন করত, সমাজও সাহায্য করত। ছাত্ররা ছিল রাষ্ট্র বা সমাজের পাল্য। তারা আটবছর বয়সে গুরুগৃহে যেত। বিশবছর বয়স অবধি বিদ্যার্জন করত। তাদের বিশেষ চিহ্নের জন্য একটা উপবীত দেওয়া হত। যেখানে তারা যাবে সেখানকার লোক তাদের সাহায্য করবে। লেখাপড়া শেষ করে ফেরার নাম ছিল 'সমাবর্তন'। সেই সময় আগেকার উপবীত ফেলে দিয়ে আসতে হত। ভারতের সভ্যতা প্রধাবিত হত গ্রাম থেকে নগরে। এখনকার মতো শহর থেকে গ্রামে নয়।

১৯০৩ সালে এই ছাত্ররা একটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হল। শিক্ষাই বলো, স্বাস্থ্যই বলো, অর্থনৈতিক উন্নতিই বলো—রাষ্ট্র নিজেদের করায়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কল্যাণ বা অগ্রগতি আশা করা ভুল হবে। অতএব রাষ্ট্র-পরিবর্তন অবশ্য করণীয়।

মনে হওয়ামাত্রই তো এটা কাজে হয়ে যাবে না? দরিদ্রদের মনোরথের মতো এই সিদ্ধান্তটাও কি মনে উঠে মনে বিলীন হয়ে যাবে! না, এটাকে সংকল্পে পরিণত করা হল। একার কাজও এ নয়? তবে, উপায়? একোঽহম্ বহুস্যাম্—এক-একটি ব্রতীকে বহু ব্রতীতে পরিণত হতে হবে। অর্থাৎ বুঝিয়ে বুঝিয়ে অপর তরুণ ও ছাত্রদের এই সংকল্পে একমত করতে হবে। সংখ্যা বাড়াতে হবে। এটা হল এবার থেকে কাজ। তা ছাড়া আরও একটা কাজ তারা নিল। যারা মজুরি করে খায়, তাদের ছেলেদের নৈশ-বিদ্যালয়ে তো পড়ান হচ্ছে। সেইসব অভিভাবকদের মধ্যেও ভাব প্রচার করতে হবে। কৃষকদের মধ্যেও কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু কর্মী-সংখ্যা নগণ্য। তবু এরা দমল না। বোধ হয় ভাবাতিশয্য সেটা হবে। এরা ভাবত—কোথাও, কাউকে কোনরকমে এই যজ্ঞের আরম্ভ ও আয়োজন করতেই হবে। আরম্ভ যেদিন হবে, সেদিন থেকে সমাপ্তির দিন গুনতিতে ক্রমেই কমে আসবে।

এদের ভাবপ্রচারের একটা নমুনা: মহারানী ভিক্টোরিয়া ১৯০১ সালে মারা গেলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পুত্র সপ্তম এডওআর্ড সিংহাসনারোহণ করেন। সেই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে কলকাতায় ভারী ধুমধাম হয়। ১৯০২ সালে গড়ের মাঠে দু'দিন ধরে বাজি পোড়ানো হয়। একদিন বিলাতী বাজি, আর একদিন চীনা-বাজি। একদিন সকল বাড়ি দীপান্বিত করা হয়। ১৯০৩ সালে একদিন একটি মফঃস্বলের লোক স্বগ্রামের বহু যাত্রীর সঙ্গে যাদুঘর দেখতে যাচ্ছিল। তাকে পথে অনেকবার খোঁজ নিতে হচ্ছিল। এই ছেলেদের একজনের সঙ্গে ঘটনাক্রমে রাস্তায় সেই দলটির সাক্ষাৎ হয়। কলকাতার জাঁকজমক সম্বন্ধে তাদের শোনা কথা ও কল্পনায় বিস্তৃত অনেক কিছু সেই লোকটির মুখ থেকে শোনা যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করছিল, সব বাড়ি নাকি আবার দীপান্বিত হবে? ছাত্রটি উত্তরে জানাল—'না'। তবে কর্তৃপক্ষ একবার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেই হবে যাবে। কারণ তেল ও আলোর খরচা তো এদেশের লোকেদের। এদেশের পয়সা উড়ে গেল কি পুড়ে গেল, তাতে কি? বিলাত থেকে তো পয়সা আনতে হবে না। গ্রাম্য লোকটি ভ্রূসংকুচিত করল। ব্যাপারটা তার বোঝার ইচ্ছা হল—তাকে আনুপূর্বিক ইতিহাস শোনান হল: কী করে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ এই শাসনের ভিতর দিয়ে চলছে। ছেলেটির কথা যে ঠিক তা সেই লোকটি স্বীকার করে নিল।

এদের কাজ এই দাঁড়াল। গরীবকে সাহায্য করত; কিন্তু তাদের বোঝান হত, তাদের দারিদ্র্যের মূলে সহানুভূতিহীন বৈদেশিক শাসন। গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব অনুভূত হলে বলত—এটা বৈদেশিক শাসনের ফল। লোকেরা চিঠি পড়াতে বা লেখাতে এলে তাদের বলা হত, তাদের নিরক্ষরতার মূলে এই বৈদেশিক

শাসন। কুলী, মুটে, মজুর, কৃষক, চাকর-চাকরানী, গাড়োয়ান, মাঝি যাদেরই সংস্রবে এরা আসত, একটা ছুতো পেলেই তাদের মনের মাঝে ঢুকিয়ে দিত—'বিদেশী শাসনের কুফল'। হ্যাঁ, অবশ্য কম লোকের সাহায্যে এসব তথ্য প্রচারিত হত। কিন্তু তবু হত।

আত্মসম্মান রক্ষার সমস্যা সামনে বেশ জম্‌কে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারি সৈন্যদের 'রিভিউ' হত। নববার্ষিক প্যারেড। দেশী-বিলাতী সৈন্য, ভলাণ্টিয়ার সৈন্য (শেষদিকে বলা হত 'অক্সিলিয়ারী ফোর্স'), নৌ-সৈন্য কলকাতার গড়ের মাঠে সমবেত হত। একখানি যুদ্ধের জাহাজ এই সময়ে প্রতিবছর 'বাবুঘাটে' এসে লাগত। নানারকম ভাবে মিলিত সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করত। কামান ছোঁড়া হত জল ও স্থল দুই সৈন্যের তরফ থেকে। বন্দুকের আওয়াজ করা হত। প্রধান সেনাপতি আসতেন, নৌ-সেনাপতি আসতেন। বড়লাট এসে সকল রূপ সৈন্যের সেলাম নিতেন। সকালে সেদিন গড়ের মাঠে অসাধারণ ভিড়। রাত থাকতে দর্শকরা শীতকে অগ্রাহ্য করে মাঠে এসে জমা হত। কিন্তু তাদের বেওয়ারিস মালের মতো সৈন্য ও পুলিসের চাবুক খেতে হত। এমন কি ভলাণ্টিয়ার, যাদের মধ্যে অধিকাংশ চুনোগলির ফিরিঙ্গী থাকত, তারাও ভিড় হটাবার বাহানায় বেধড়ক হাতের সুখ করে নিত। মনে হত এদেশের লোক 'মানুষ' বলে গণ্য হয় না! যেন গরু-মোষের দল।

ফুটবলের মাঠেও শ্বেতাঙ্গ লাইন্‌স্‌ম্যান যাকে-তাকে জুতোর ঠোক্কর দিত। গোরারা, যারা ম্যাচ দেখতে আসত, তারাও যার-তার ওপর হাতের সরু সরু বেত চালিয়ে দিত।

চা-বাগান বা রেলের সফরে কোথাও সাদায়-কালায় লাগলেই, শ্বেতাঙ্গদের বুটে কৃষ্ণাঙ্গের পিলে ফেটে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' ঘটত।

এর প্রতিকার কি নেই? আছে। গায়ের জোর করা ও আত্মরক্ষার বিদ্যা আয়ত্ত করা।

১৯০৩ সালে শ্যামবাজারে ভূপেন বোসের বাড়িতে একটি 'বক্সিং ক্লাব' হয়েছিল। বালিগঞ্জের সরলা দেবীও একটি সমিতি স্থাপন করেন। 'বীরাষ্টমী'র চলন করেন। পুজোর মহাষ্টমীর দিন সেখানে বিভিন্ন জায়গার লোকেরা গিয়ে লাঠি-তলোয়ার প্রভৃতির খেলা দেখাত। সরলা দেবী নিজেও বীরাঙ্গনা-বেশে তলোয়ার-হাতে আবির্ভূতা হতেন।

কিছু 'বুয়ার' বন্দী হয়ে কলকাতায় ছিল। তাদের কাছে কেউ কেউ মুষ্টিযুদ্ধ শিখেছিল। তাদের কাছে শিখলে মনে হত মুষ্টিযুদ্ধবিদ্যা অতিরিক্ত একটা শক্তি লাভ করেছে।

'মারের বদলে মার না দিলে, মার বন্ধ হবে না'—এই ভাবটা বহু লোককে পেয়ে

বসেছিল। এরকম সময়ে আসামে কোন এক চা বাগানের ডাক্তার বঙ্কিমবাবু উদ্ধত ম্যানেজারকে রীতিমতো শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন বলে কাগজ মারফতে সে খবর পেয়ে জনসাধারণ তাঁকে ধন্য-ধন্য করেছিল।

১৯০৩ সাল। মোহনবাগান ও মেডিক্যাল-মিলিটারি 'ট্রেড্‌স কাপে' সেমি-ফাইনালে পড়ে। মেডিক্যাল-মিলিটারি খেলত যত তার চাইতে মারত বেশী। তাদের সমর্থক টুপিধারীরা ঘুষি লাথি ভারতীয় দর্শকদের উপর চালাত। মোহনবাগান তখনও শীল্ডে খেলার মতো আত্মবিশ্বাস লাভ করে নি। সবাই জানত শীল্ডে যাওয়া তাদের পক্ষে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া'। দেশী টিম-এর মধ্যে 'শোভাবাজার' শীল্ডে খেলত। তাদের দেখাদেখি এসেছিল 'চিনসুরা' (চুঁচুড়া)। প্রথম দু'এক রাউণ্ডে প্রায়ই এরা কাবু হয়ে যেত। ১৯০৫-এ চুঁচুড়া সেমি-ফাইনালে হারে।

১৯০২ সালের আগে কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম ছিল। শুধু খিদিরপুরের ট্রাম চলত ছোট একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে। ১৯০২-০৩ সালে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামের ব্যবস্থা হয়। নতুন লাইন হচ্ছিল বলে আর্মেনিয়ান গ্রাউণ্ডের কাছে বহু খোয়া জমা ছিল। এই মাঠে মোহনবাগানের ম্যাচ। স্কুলে স্কুলে নোটিশবোর্ডে দেখা গেল—'আজ মোহনবাগানকে মিলিটারিরা মারবে বলে ঠিক করে রেখেছে। ভাইসব, চল সেখানে, —অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে।'

খেলার পূর্বে দেখা গেল "ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ"। উভয় পক্ষের লোক ভিড় করে জমা হয়েছে। শিবদাস ভাদুড়ী গোলের কাছে দু'একবার বল নিয়ে দৌড়ে যাবার পর মিলিটারির এক খেলোয়াড় পায়ে মেরে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চজন্য, ভেরী-তূরী নিনাদ সুরু হল। তুমুল সংগ্রাম। একজন শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী-পুলিসের লোক কালা আদমির দিকে ধাওয়া করতে, আমার সেজদা ক্ষীরোদগোপাল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার মুখ বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিল। মুখে বলল, 'যাও অন্যদিকে নিরাপত্তা খুঁজতে।' ট্রামের জমা-করা খোয়াবৃষ্টিতে মিলিটারি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। এই যুগে এই প্রথম ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিল।

১৯০৫ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বা কন-ভোকেশনে চান্সেলার বড়লাট কার্জন তাঁর ভাষণ দিলেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—প্রাচ্যদেশীয়দের চরিত্রে সত্যের অপলাপ একটা বৈশিষ্ট্য। পরদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ভগিনী নিবেদিতা প্রভুজির পুস্তক 'Problems of the East' থেকে উদ্ধৃত করে দিলেন যে, তিনি যখন প্রাচ্যদেশের কোরিয়ায় যান, তাঁর বয়স কত জিজ্ঞাসা করলে, প্রতীচ্যের সজ্জন হয়েও বয়স ভাঁড়িয়ে বেশী বলেছিলেন।

এ বৈশিষ্ট্য কোন্ দেশের? সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজেও প্রতিবাদ করেছিলেন। এরূপে সংখ্যার পর সংখ্যায়, দেশী ও বিলাতী ভাষায় লেখা কাগজে প্রতিবাদ ও কার্জনের হঠকারিতার তীব্র নিন্দা ছাপা হতে লাগল। পার্কে পার্কে প্রমোদ-উদ্যানের ঘাসের চাপড়ায়, বৈঠকখানায়, ট্রামে, গঙ্গার ঘাটে, বাজারে সর্বত্র একটা বিরুদ্ধ আলোচনা চলতে লাগল। আলোচনা ক্রমে আন্দোলনে দাঁড়াল। টাউনহলে মিটিং করে প্রতিবাদ করা স্থির হল। ১০ই মার্চ প্রসিদ্ধ বাগ্মী, প্রসিদ্ধ উকিল ও নেতা রাসবিহারী ঘোষ সে সভায় সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হলেন। এ আন্দোলনের মাথা বয়স্ক নেতারা ঠিক কথা, কিন্তু যুব-ছাত্ররা হল এর প্রাণ। সভা আরম্ভের পূর্বেই বহু আগে থেকে এত জনসমাগম হয়েছিল যে টাউনহলের বাইরে হলের চেয়েও বেশী লোককে অপেক্ষা করতে হল। টাউনহলের মধ্যে রাসবিহারীবাবু সভাপতিত্ব করলেন। তাঁর দামী গম্ভীর ওজন-করা কথায়, ওজস্বিনী ভাষায় তিনি কার্জনের ধৃষ্টতার তীব্র নিন্দা করলেন।

ও দিকে, বাইরে। টহলরাম গঙ্গারাম এখানে এক আলাদা সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। লোকেরা চুপ করে থাকতে পারছিল না। তাঁর ভাষায় গাম্ভীর্যকে তিনি বিদায় দিলেন; কিন্তু এমন জ্বালাময়ী নিন্দাত্মক শব্দ বেছে বেছে ব্যবহার করলেন যে, তাতে আপামর জনগণের মন 'তাথৈ তাথৈ, তা তা থৈ থৈ' নেচে উঠল। 'আলবৎ বলেছে কিন্তু! যাকে বলতে হয় বলার-মতো বলা···।' বিশ্লেষণ করে দেখলে তাতে পাওয়া যাবে—তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে যা আহরণ করে এনেছিলেন, তাই কার্জনকে উপহার দিয়েছিলেন। এদেশে তাকে বলে 'অশোভন'। সে ছিল অবিমিশ্র গালি-গালাজ। এক্ষেত্রে বিলাতী ভদ্রতার ভাষা এদেশের পক্ষে অভদ্রোচিত বুলি বলে প্রতিপন্ন হল। যারা টহলরামের ভালো সমঝদার তারা বলতে লাগল 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর'।

এখন এই টহলরাম লোকটি কে? সীমান্তপ্রদেশের ডেরা-ইসমাইলখাঁর অধিবাসী। পুরো নাম টহলরাম গঙ্গারাম। ইনি বিলাতে I.C.S. পড়তে গিয়েছিলেন। ইনি বলতেন যে, ভারতে বৃটিশ শাসননীতির নিন্দা করে বক্তৃতাদি দেওয়াতে এঁকে পাস করতে দেওয়া হয় নি। টাউনহলের মাঠে নির্ভীকভাবে যে-সব কথা ইনি বলেছিলেন, তেমন কথা আর কেউ বলতে সাহস করত কিনা সন্দেহ। এই একদিনের ঘটনায় তাঁর স্তাবক জুটে গেল বহু। মুখে মুখে এঁর নাম খুব প্রচার হয়ে গেল।

ক্রমে টহলরাম গোলদীঘি, হেদুয়া, বিডন-উদ্যানে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। ছাত্ররা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হতে লাগল এঁর খোলাখুলি বৃটিশ বিদ্বেষী ভাবে ও ভাষায়। এঁর নামে মোকদ্দমা হল। তাতে ইনি বীরের আসন পেলেন।

মেডিক্যাল-মিলিটারিরা একদিন গোলদীঘির বক্তৃতার পর এঁকে মারল, ফলে এঁর জনাদর বাড়ল। আর একদিন গুণ্ডারা এঁকে মারে। লোকে মনে করত, পুলিস গুণ্ডা দিয়ে এঁকে মারিয়েছে। জনাদর বিপুল তো হলই, জনপ্রিয়তায় ইনি স্থানীয় নেতাদের ছাপিয়ে গেলেন। ছাত্ররা অতঃপর এঁর দেহরক্ষীর কাজ করতে লাগল। টহলরাম বৃটিশবিরোধী বক্তৃতা ছাড়লেন না। ছাত্র বা যুবকরা বক্তৃতার সময় এঁকে ছেঁকে থাকে এবং বাসায় ফেরার সময় সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পেঁাছে দিয়ে আসে। এই হল এদের কাজ। এরপর টহলরামের সঙ্গে কিছু যুবকও বক্তৃতা আরম্ভ করল। প্রভাসচন্দ্র দেব এ বিষয়ে হয়েছিলেন অগ্রণী। বাংলার ইতিহাস ঘেঁটে প্রভাসচন্দ্র টহলরামের কথার সমর্থনের নজির দিতে লাগলেন। ঢাকার মসলিন কী করে নষ্ট হল—তাঁতীরা আঙুল কেটে ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার হতে রক্ষালাভ করতে বাধ্য হল, নীলকরের অত্যাচার, চা-কুলীর মর্মভেদী আত্মকাহিনী, শোষণ নীতিতে বাংলায় দীনদরিদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রভাসচন্দ্রের ঘর্ঘরা বক্তৃতায় জ্বলন্ত আকার ধারণ করত। ছাত্ররা এর প্রতিকার চিন্তা করতে লাগল। প্রভাসের সহকারীরূপে আর এক ছাত্রবক্তা জুটল—বাসুদেব ভট্টাচার্য। পরে আরো কিছু ছাত্র বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তার মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ইনি ডাফ কলেজে পড়তেন। ইনি মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বলতেন।

পুরাতন ছাত্রদের সঙ্গে ক্রমে নবীন ছাত্রদের মোলাকাত হয়ে যেতে লাগল। তাদের মুখে আর এক অনুপ্রেরণার সংবাদ জানা গেল। শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ টহলরামের ঢের আগে এমনি করে ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাতেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতোই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু চাকরি করতে করতে তাঁর ভুল ভেঙ্গে যায়। তিনি ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির জীবন আদর্শস্বরূপ ছাত্রদের সামনে রাখতেন। আত্মোৎসর্গের পথে স্বাধীনতা আনার জন্য যুব ও ছাত্রদের সংঘবদ্ধ হতে পরামর্শ দিতেন। তিনি এ বিষয়ে বহু পুস্তক প্রণয়ন করে যান। বাংলা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি রাখে, এমন কথাও ইনি লিখে গেছেন। আমরা যোগেন বিদ্যাভূষণের কথা লোকমুখে শুনে উৎফুল্ল হতাম। আমার এক দাদা (মাখনগোপাল) বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। টহলরামের কথা সরাসরি শুনলাম এবং তাঁর দেহরক্ষীর কাজে ভাগ নিয়েছিলাম। বৃটিশ শাসন দূর করতে হলে দু'একদিনে তো হবে না। সুতরাং কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে সংঘ গড়ে তোলবার জন্য আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হবে। সেটা তাদের খাওয়া-পরার কথা। চাকরিতে ঢুকলে 'গোলামের জাত আরও গোলাম ব'নে যাবে'। টহলরাম সহমত হলেন। ছাত্র অবস্থায়ই আমরা স্থির করলাম, ফুলফলের চাষ ও

অন্যবিধ কৃষি ও কারুকলা শিখে নিলে ভালো হয়। সুঁড়োতে একটা বাগান এইজন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এ তো হল 'উদ্যোগ-বিভাগ'। একটা 'রণ-বিভাগ'ও তো গড়া চাই। তার জন্য প্রথম দরকার একটা 'জাতীয় সঙ্গীত'। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলে তো কিছু ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ সৈন্য, ছোট অফিসার, বড় অফিসার সৃষ্টি করতে হবে। এক উদ্দেশ্যে একজনের অধীনে কলের মতো সমস্ত ঝাঁকটি চলবে। টহলরাম ইংরেজী সৈন্যদলের অনুরূপ সাধারণ সেনা, লেফটেন্যান্ট, ক্যাপটেন, মেজর, কর্নেল প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করলেন। প্রথম ক্যাপটেন হল সতীশ দত্ত। দর্জিপাড়ায় এর বাড়ি ছিল।

এখন থেকে ক্যাপটেনের অধীনে সংগঠন চলতে লাগল। প্রতিটি মিটিং আরম্ভ হবার আগে ক্যাপটেন বিউগেল বাজাত। তারপর টহলরামকে ঘিরে রক্ষীরা সুশৃংখলে দাঁড়াত। টহলরাম বিরচিত জাতীয় সঙ্গীত গীত হত।

টহলরামের জাতীয় সঙ্গীত ইংরেজীতে লেখা ও ছাপানো ছিল। সবটা মনে নেই—

"God save our sacred Hind !
Sacred Hind, once glorious Hind,
From Saugor Island to the Sind,
From Cashmere to Cape Comorin
May perfect peace ever reign therein !"

সাধারণতঃ ধরতে গেলে, ভীষণ অবসাদ ও উদাসীনতার যুগ ছিল সেটা। ভারত আবার জগৎসভায় স্থান পেতে পারে, এ চিন্তাও কল্পনীয় ছিল না বহুর কাছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবল দীপ্তি এ দেশের লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধরা বলতেন, 'ওদের সঙ্গে আমরা কোনদিন তুল্য হতে পারব না। ভগবান যেন ওদের দুর্লভ কোন্ উপাদান দিয়ে তৈরি করেছিলেন। আর আমরা রেজ্‌লা মালে গঠিত।' কংগ্রেসের কোন প্রভাবই তখন লোকের উপর হয় নি। 'তিনদিনের সখের কান্নার প্রতিষ্ঠান' বলে একে ব্যঙ্গ করা হত। "কঙ্গরসে রঙ্গরস"-শীর্ষক বিদ্রূপের লেখা বাংলা কাগজে কত বেরুত। খবরের কাগজ খুব কম লোকে পড়ত। এটা আমাদের দেশ—তার প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে, আর পাঁচটা স্বাধীন দেশের মতো আমাদের বাঁচার অধিকার আছে—এজাতীয় চিন্তা বিরল ছিল। ঠিক যুগসন্ধি এসে এই সময় উপস্থিত। বিপ্লবী মনোভাবের অভিব্যক্তি কেমন করে হয়েছে তার চিত্র এই সময় থেকে ঘটনাগুলির গতি ও রূপ পর্যবেক্ষণ করলে ধরা যায়।

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' গড়বার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজ রাজত্বের মধ্যেও আমরা যেন আত্মনির্ভর হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারি। আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী তিনি শুনিয়েছিলেন। অবশ্য যদিও তাতে

সম্মুখ-সংগ্রামের কার্যতালিকা ছিল না, তবু যুদ্ধ বাদ দিয়ে অনেক কিছু করার কথা বলা হয়েছিল। ভাব-বিপ্লবের রাজ্যে এর স্থান ছিল যথেষ্ট।

আমাদের কথায় আসি। দেশের ব্যাপার ও বার্তায় লোকের মন লাগান হল এই নতুন দেশপ্রেমীদের একটা কাজ। টহলরাম মতিবাবুর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কিনে দিতেন। তখনকার দিনে এই ছিল উগ্রপন্থী কাগজ। প্রত্যেক কর্মীর কর্তব্য ছিল একখানি কাগজ নিয়ে অন্ততঃ চারজনকে পড়ে শোনান। পরের দিন টহলরামকে রিপোর্ট দিতে হত। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনী যুবাদের মধ্যে প্রচার আর একটা কাজ। অন্যায়কে না মানা—ধর্ম। বিদেশী-রাজ অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক দেশের উপর আধিপত্য করার হক অপর দেশের নেই। হতে পারে না। এই তথ্যগুলি ছাত্র ও যুবাদের মনে খুব ভালো লাগত, সাড়া জাগাত।

১৯০৫ সাল এসে গেছে। লর্ড কার্জন ভারতের রাজনৈতিক গগনে বাংলার প্রভাব দেখে প্রমাদ গণলেন। "বাংলা আজ যা ভাবে, সারা ভারত কাল তা ভাবে"। তিনি বাংলাকে রাজনীতির দিক থেকে অবশিষ্ট ভারত হতে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার কল্পনা করতে লাগলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন 'সুবে বাংলা' অবয়বে বেজায় বড়। একজন ছোটলাটের পক্ষে এর সুশৃংখলিত শাসন চালানো একরূপ অসম্ভব। একে কেটে দু'টুকরো করতে হবে। একটা 'মুসলমান প্রদেশ' এবং অপরটা 'হিন্দু প্রদেশ' হবে। তিনি ঢাকায় গিয়ে মুসলমানদের প্রোৎসাহিত ও প্রসন্ন করার মানসে ঘোষণা করে এলেন যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে হবে 'মুসলমান প্রদেশ'। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেব প্রথমটা এর বিরোধিতা করেন—এতে দেশের ক্ষতি হবে মনে করেন। পরে একে সমর্থন করেন ব্যক্তিগত লাভের আশায়।

কাগজে কাগজে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ চলতে লাগল। একটার জায়গায় দুটো প্রদেশ করলে শাসন-কাজ চালানোর খরচ বাড়বে, অতিরিক্ত করভার প্রপীড়িত জনগণকে বইতে হবে, বঙ্গভাষাভাষীদের পৃথক করে তার সংস্কৃতির প্রগতিকে ব্যাহত করা হবে, হিন্দু-মুসলমানে রেষারেষি বাড়ান হবে, চট্টগ্রাম বন্দর খুলে কলকাতার উপযোগিতা-মূল্য কমান হবে—এইরূপ বহুরকম যুক্তি দেখান হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রতিবাদ-সভায় তাঁর অননুকরণীয় ভাষা ও ধাঁচে প্রবন্ধপাঠ করতে লাগলেন। লিখলেনও অনেক। মাতৃ-অঙ্গচ্ছেদ হবে এই ভেবে যুবজনদের অন্তর্বেদনা উপস্থিত হল। চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ বেশী করে দেখা দিল। 'সংস্কৃত যার জননী, ভাব যার প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ যার কাণ্ডারী—সে ভাষাভাষীর দুর্দিন কেউ আনতে পারে না। কখনও আসতে পারে না।'—এমনতর আশা ও সান্ত্বনার বাণী কোন-কোন প্রতিবাদ-সভায় শোনা যেত। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'শুধু ম্যাপে একটা লাইন টেনে দিলেই

আমরা দু'টুকরো হয়ে যাব ? মনে যদি সংকল্প করি আমরা বিভক্ত হব না—কে করে আমাদের বিচ্ছিন্ন ?' এই উক্তি বড়োই ভালো লেগেছিল।

এইরকম সময় রংপুর ট্রেনিং স্কুলের এক ছাত্রকে সাহেব সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রহার করায়, সুদসুদ্ধ সাহেবের পাওনা সেই ছাত্রটি ফিরিয়ে দেয়। এই নিয়ে হয় একটা ভারী হল্লা। প্রথমটা বিস্ময়, তারপর আক্রোশ। চিরবিদিত বিনয়ী বাঙালী ছাত্র একি করে বসল ? এতবড় স্পর্ধা ! একে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এই নিয়ে জেলার সাহেব-কর্তারা হল সবাই একদিকে। ছাত্ররা হল আর-এক দিকে। কাগজে বেরুল বিবরণ ও সাহায্যের আবেদন। এতে যুগপৎ ছাত্রদের প্রতি সাধারণের সহানুভূতি ও শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের অবিচারের প্রতি একটা বিরোধের সুর জেগে উঠল। শরৎ ও আমি চাঁদা-তোলার কাজে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের মন এতে ভেড়াতে লাগলাম। ছাত্রদের আনুকূল্যে আমরা কিছু অর্থসংগ্রহ করে 'ডিফেন্স ফাণ্ডে' পাঠালাম। যুবকরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই প্রথম সংঘর্ষে নামল। টহলরামের সভাপতিত্বে গোলদীঘি, হেদুয়া ও বিডন-উদ্যানে প্রতিবাদ-সভা হয়েছিল। এই ঘটনার পর 'অনুশীলন সমিতি'তে* যুবক ও ছাত্ররা বেশী করে দলে দলে ভর্তি হতে লাগল। অনুশীলন সমিতি কুস্তী, 'স্যাণ্ডোর প্রণালী'র ব্যায়াম, লাঠি, তলোয়ার, ছোরা, ড্রিল, বক্সিং শেখাত। সাইকেল চালানো, নৌকা বহা, সাঁতার দেওয়া শেখান হত। প্রতি রবিবারে দেশপ্রেমোদ্দীপক ভাব জাগানর জন্য রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ সিং, বাংলার চাঁদ রায়, কেদার রায়, সীতারাম, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির জীবনী, স্বামী বিবেকানন্দের 'বক্তৃতা ও পত্রাবলী' এবং অন্যান্য পুস্তক একত্র বসে পড়া হত। মুখে মুখে কিছু আলাপ-আলোচনাও হত। এ ব্যবস্থাকে বলা হত 'মর‍্যাল ক্লাস'।

প্রভাস দেব বেছে বেছে কিছু যুবক টহলরামের কাছে পাঠাত। সে হয়েছিল টহলরামের সেক্রেটারি। কিন্তু যাদের দেখত আগামী জাতীয় সংগ্রামের জন্য বেশী উপযোগী, তাদের সোজাসুজি সমিতিতে পেঁছে দিত। কী করে যে সে বাদ-বিচার করত, তা সে-ই জানত। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সে ভুল করে নি। দেশের পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

আমায় সে টহলরামের দল ছাড়িয়ে সবান্ধবে 'অনুশীলন সমিতি'তে নিয়ে আসে। আমার 'গেরিলা দল' করার ঝোঁক ছিল সে জানত। সেইজন্য সে আমায় সুবিধা সুযোগ করে দেবার মতলবে এখানে নিয়ে আসে।

আমার ভিতর গেরিলার খেয়াল ছেলেবেলায় তমলুকে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় স্ফুরণ লাভ করে। আমার মেজভাই মাখনগোপাল যোগেন বিদ্যাভূষণের সঙ্গ করার ফলে ইন্ধন যোগান আমার এ প্রবৃত্তিতে।

* অনুশীলন সমিতির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে—তার পরিচয় তাই আর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের জীবনের মতো জাতির জীবনও নিজের আয়ত্তের বাইরে প্রকৃতির—বিধানে কতকগুলি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে—নব নব গতিভঙ্গী বা ছন্দ নিতে বাধ্য হয়। মানুষ হয়তো চায় এক, কিন্তু হয়ে বসে আর কিছু। জীবন-স্রোতে একটা ক্রম বা ধারাবাহিক পারম্পর্য আছেই। কখনও সেটা লক্ষিত হয়, কখনও বা হয় না। তবে বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক বিধান।

একদিন কয়েকটি বিপ্লবী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন আলোচনা করছিল। প্রশ্ন এসে পড়ে, এত লোক দেশে থাকতে এই লোকগুলি কেন এ বিশেষ পথে এসে দাঁড়াল? মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক পরিস্থিতি ধরে বিচার চলতে লাগল। অনুসন্ধিৎসার ধারা বর্তমান থেকে ক্রমশঃ অতীতের দিকে এগিয়ে চলল। সূত্রটা এইভাবে টেনে নিয়ে চলা হতে লাগল—

একজন বা এক যুগের কিছু লোক প্রেরণা পেলেন সমসাময়িক বা অতীত কিছু ঘটনা এবং লোকের কাছ থেকে। তাঁদের প্রেরণাদাতারা পেয়েছিলেন তাদের পাথেয় এমনি ভাবে পূর্বাগত কিছু লোক বা ঘটনা থেকে।

এই ধারায় বিচার করতে করতে এই সত্যে উপনীত হওয়া গেল যে, স্বাধীনতা-স্পৃহা মানবের জন্মগত মনোভাব বা ধর্ম। মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার অন্তরাত্মা স্বাধীনতা চায়। কোন কারণে যখন এই স্বাধীনতার ব্যবহার বা প্রকাশপথ রুদ্ধ হয়ে আসে বা বাধা পায় তখন বাধে সংঘর্ষ।

এই সংঘর্ষের এষণা সংক্রামক। পূর্বপুরুষদের চিন্তা, বাক্য, অভিলাষ ও কর্ম সাফল্যলাভ না করতে পারলে, বীজের আকারে যেন আকাশে-বাতাসে থেকে যায়; উপযুক্ত আধার পেলে তাতে হয় সংক্রমিত। মন দিয়ে পারিপার্শ্বিককে কতকটা বদলান যায়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকই মনকে বদলে দেয়। পূর্বগামীদের ডাক থেকে যায় পরবর্তীকালের সাধকদের জন্য। তার রূপ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তার সারাংশ অবিকৃত।

এই ভূমিকা নিয়ে আসা যাক্ স্বামী নিরালম্বের জীবন-চরিতে। এঁর পূর্ব-আশ্রমের নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃভিটা বর্ধমান জেলার খানা জংশনের কাছে চান্না গ্রামে। জন্ম বাংলা ১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯শে নভেম্বর, ১৮৭৭ সাল। তিরোধান বাংলা ১৩৩৭ সালের ১৯শে ভাদ্র বা ইংরেজী ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল। পিতার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সরকারী চাকুরে; যশোহর ম্যাজিস্ট্রেটের পেশকার। এই চান্না গ্রামে বিখ্যাত

দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির। সুবিখ্যাত মাতৃমন্ত্রের সাধক কমলাকান্ত এখানে বহু সাধনা করেছিলেন। এই গ্রামে ছিল তাঁর মাতুলালয়। কমলাকান্তের কথা এসে পড়ে এইজন্য যে, যেমন বিশ্বমাতাকে তিনি আজীবন অবলম্বন করে ছিলেন, তেমনি কালপ্রভাবে স্বাদেশিকতারূপ নূতন ধর্ম মর্মে বাসা বাঁধায়, দেশমাতাতে বিশ্বমাতার প্রতীকবোধ জেগেছিল যতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে। মন্দিরের দেবতা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে তিনি দেশব্যাপী দেবতা নিয়ে কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এক ব্যক্তি চিন্ময়ীকে ধরে রইলেন। অপর ব্যক্তি মৃন্ময়ীতেই তাঁকে পেলেন।

যতীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ভারী দুর্দান্ত ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন। ছেলেদের সর্দারি, খেলাধুলো, ডানপিটেমিতে তাঁর সময় বেশ কাটত। পড়াশুনায় যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না ভেবে পিতৃদেব চিন্তাকুল হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত বড়। সেজন্য মাহিনগর গ্রামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধু ব্রহ্মচারীবাবার কাছে তাঁকে নিয়ে যান। যদি তাঁর পায়ের ধুলোয় বা গায়ের হাওয়ায় ছেলে 'সুশীল ও সুবোধ বালক' হয়। সাধুসঙ্গের একটা ফল তো আছেই! যতীন্দ্র যেমন একদিকে একগুঁয়ে দুরন্ত, তেমনি আবার অতিশয় সত্যনিষ্ঠ এবং বিবেকী। পরখ না করে, দেখে-শুনে না নিয়ে তিনি কিছু মেনে নিতে পারতেন না।

দিকে দিকে সাধুর খ্যাতি রটে গিয়েছিল যে, তিনি দেহ থাকতে দেহমুক্ত। অসামান্য তাঁর শক্তি। তিনি বলতেন—তাঁর দেহ অপাপবিদ্ধ তো বটেই, 'অ-বন্দুক'-বিদ্ধও। তরুণ যতীন্দ্র এ কথা শুনেছিলেন। মনে বালক-সুলভ কৌতূহলও জেগেছিল এই সাধুর সম্বন্ধে। এখন পিতার প্রস্তাবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাবে ভেবে তিনি সানন্দে সাধু-সন্দর্শনে যেতে রাজী হলেন। যখন পিতাপুত্র সাধুর আস্তানায় পৌঁছালেন তখন প্রায় সন্ধ্যা। সাধুর কাছে অন্য ভক্তদের ভিড় ছিল। এঁদের অপেক্ষা করতে বলে, সাধু সমাসীন ভক্তদের সঙ্গে একে একে কথাবার্তা সাঙ্গ করতে লাগলেন।

পরে যতীন্দ্রনাথকে কালিদাসবাবু সাধুর কাছে পরিচিত করে দিলে, সাধু প্রসঙ্গমতো অনর্গল সদুপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। সুদর্শন, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ বালককে একনজরেই সাধুর ভালো লেগেছিল।

সাধু থামলে, শিষ্টাচারের সঙ্গে সবিনয়ে যতীন্দ্রনাথ একটি প্রশ্ন করলেন, 'শুনেছি আপনি এত উচ্চে উঠেছেন যে, গুলীর আঘাত করলেও আপনার শরীরে তা বিদ্ধ হয় না। একথা কি সত্যি?' গম্ভীর এবং বেশ স্বাভাবিক স্বরে উত্তর এল, 'হাঁ।' যতীন্দ্রনাথ বললেন, 'একি পরখ করা যায়?' সাধু অসংকোচে জবাব দিলেন 'নিশ্চয়ই।' তখন যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ বলে বসলেন, 'আমি আপনাকে গুলী করব' এবং পকেট থেকে পিস্তল বার করে সাধুর বক্ষ লক্ষ্য করে বসলেন। যতীন্দ্রনাথের পিতার·

একটি পিস্তল ছিল। পিতাও জানতেন না যে যতীন্দ্র সেটিকে সঙ্গে করে এনেছেন। এমন অতর্কিতে বালককে পিস্তল ছুঁড়তে উদ্যত দেখে সাধু ও যতীন্দ্রের পিতা হকচকিয়ে গেলেন। সাধু পাকা লোক। তিনি যতীন্দ্রনাথকে থামতে ইসারা করে বললেন, 'বন্দুকের গুলী অবিশ্ব যে 'আমি'কে বলি, সেটা এই দেহ নয়। সে 'আমি' হচ্ছে আমার আত্মা। আত্মা অমর, আত্মা অজর—'

ঘৃণায় ও অশ্রদ্ধায় যতীন্দ্রনাথের মুখচোখ বিকৃত হয়ে উঠল। তিনি পিস্তল পকেটে রেখে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরলেন। যাকে সোনা ভেবেছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে সে পিতল সাব্যস্ত হয়ে গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অপরোক্ষ অনুভূতি ছিল তাঁর জীবনে চলার-পথে কষ্টিপাথর।

মায়ের সস্নেহ পরিচালনায় দুষ্ট বালক ক্রমে শিষ্ট হল। গ্রামের পড়া শেষ করে তিনি শহরে পড়তে গেলেন। তিনি এফ. এ. (আজকালকার আই. এ.) অবধি পড়েছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় বেঁচি গ্রামে বহুগুণালঙ্কৃতা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে। পরে ইনিও সন্ন্যাস নেন। নাম হয় চিন্ময়ী দেবী।

যখন তিনি সাজোয়ান যুবক—তখন ভেতো বাঙালী, ভীরু বাঙালীর দুর্নাম ঘোচানোর নেশায় তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে বাঙালীর দুর্বিষহ দুর্নাম মোচনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ঈশ্বরলাভের জন্য বহুজন ঘরছাড়া হয়েছেন এদেশে। ইনি কিন্তু সিপাহী-জীবন লাভের জন্য গৃহছাড়া হলেন। এর একটা বিশেষ কারণ ছিল। ইংরেজ অন্যায়ভাবে জগদ্দল পাথরের মতো এদেশের বুকে বসে তার অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সর্বনাশ করছিল। তাকে দূর করে দেশমাতাকে পাশমুক্ত করতে হবে, এই সর্বনাশা নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। কে যে তাঁর রাজনীতির গুরু তা জানা যায় না। তবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধের অন্যতম নেতা তান্তিয়া টোপির প্রতি তাঁর অসাধারণ একটা টান ছিল। ঐ যুদ্ধের আলোচনা উঠলে তিনি তান্তিয়ার রণচাতুর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। তাই অনুমান হয় ১৮৫৭ সাল, তারই সুপ্ত বীজ হয়তো সময় ও উপযুক্ত আধার পেয়ে যতীন্দ্রনাথের মধ্যে নবাঙ্কুরিত করে থাকবে। আবার এও হতে পারে যে—আনন্দমঠ, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও শিবাজির জীবনী এই সংকল্পে ইন্ধন জুগিয়ে থাকবে। সেখানে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৮৯৪ সালের কাছাকাছি সময় থেকে আবিসিনিয়ার কালা আদমির সাথে ইটালির পরাজয় ঘটলে কলিকাতা ও মফস্বলের কয়েকটি জায়গায় ছেলে ধরে বেড়াতেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। বারীনবাবু ২৭.১.৪২ তারিখে এক জায়গায় বলেছেন—যতীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ দ্বারা দলে আনীত হন। দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথও তো এই সময়ে তরুণ মনে আগুন ধরিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মোট কথা, তিনি সশস্ত্র বিপ্লব বা বিদ্রোহে ইংরেজকে তাড়াতে চেয়েছিলেন।

শুধু সৈনিক হতে সাধ হলেই তো হবে না? সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া চাই। 'ইংরেজের সৈন্যদলে বাঙালীর স্থান নেই।' তাই তিনি কতকগুলি দেশীয় রাজার সৈন্যদলে ঢোকার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলাহাবাদে পৌঁছন। সেখানে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে থেকে কিছুদিন রামানন্দবাবু পরিচালিত 'কায়স্থ পাঠশালায়' হিন্দী শিক্ষা করেন। রামানন্দবাবুকে তাঁর সৈন্যদলে যোগদানের ইচ্ছা জানালে রামানন্দবাবু তাঁকে বরোদা রাজ্যে গিয়ে চেষ্টা করার পরামর্শ দেন।

যতীন্দ্রনাথ বরোদায় উপস্থিত হলেন ২১—২২ বছর বয়সে (১৮৯৮-৯৯)। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ তখন মহারাজের খাস-সচিব। তাঁর বন্ধু ছিলেন কালেক্টর খাসিরাও যাদব, লেফটেন্যান্ট মাধবরাও যাদব, দেশপাণ্ডে প্রভৃতি। তাঁদের সাহায্যে শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে ভোল বদলে সৈন্যদলে ঢোকালেন। নাম হল অবাঙালী: যতীন্দর উপাধ্যায়। উপাধ্যায় ইচ্ছা প্রকাশ করলে, একেবারে অপেক্ষাকৃত বড় পদ পেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মতলব ছিল যুদ্ধের নানা-বিভাগীয় বিদ্যা আয়ত্ত করা। তাই তিনি সাধারণ সৈন্য হলেন। শীঘ্র শীঘ্র তাঁর পদোন্নতি হতে লাগল। অবশেষে ঘোড়সওয়ার সৈন্য থেকে হলেন মহারাজের শরীররক্ষক। লম্বাচওড়া চেহারা, অতি সবলদেহ, মুখে-চোখে প্রতিভার দীপ্তি, কথাবার্তায় তর্কবিতর্কে তাঁকে হারাবার জো ছিল না। কথা একবার আরম্ভ করলে নিজের প্রতিপাদ্যটি তিনি স্থাপিত করে তবে ছাড়তেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে খুব ভালবাসতেন।

যতীন্দ্রনাথের নিজমুখে শোনা যায় যে, তিনি ক্রমশঃ দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা আলোচনা করতে করতে দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতিতে টানেন এবং বাংলায় আনেন। তখনকার দিনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কল্পনা ও ব্যবস্থায় বাংলার তুলনায় মারাঠা দেশ অগ্রপথিক ছিল। লোকমান্য তিলক সে দেশের প্রকাশ্য নেতা। এই তিলকের কথা কয়ে-কয়ে যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ-হৃদয় রঞ্জন করতেন। অরবিন্দের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনিও দেশ স্বাধীন-ব্রতে ব্রতী কিন্তু ক্ষেত্র কোথায় করবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তাই এই দুজনে 'ধরতে' গিয়ে 'ধরাধরি' হয়ে যায়—গুজরাট তাঁর স্থান হয়—তাঁর স্থান হবে বাংলায়—এই প্রেরণা যোগান যতীন্দ্র উপাধ্যায়।

১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ পুণার ঠাকুরসাহেবের গুপ্ত-সমিতির দীক্ষিত সভ্য হন এবং গুজরাট বিভাগের কর্তা হন। পরে বাংলায় এসে এঁরা একটা গল্প প্রচার করেন যে, সারা ভারত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। বাংলা শুধু কাপুরুষের মতো পেছনে পড়ে থাকছে। বাংলার তরুণ কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল, 'ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ।'

ভাব-বিপ্লবী চিরটা কাল এই শ্যামা বাংলা। এখানে তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, সহজিয়া, মরমিয়া, বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি মনোরাজ্যে কত উলট-পালট এনেছে—যা ভারতের সংস্কৃতিতে, মনের ক্ষেতের আবাদে রয়ে গেছে অতি সমৃদ্ধ। বিপ্লব এ দেশবাসীর ধাতে বাসা বেঁধে আছে। ইতিমধ্যেই ইংরেজ রাজ্যেও শান্ত ও অশান্ত ভঙ্গীতে এদের প্রতিশোধস্পৃহা রূপ নিয়েছে।

এদিকে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র বা পি. মিত্র একটা বড় ভূমিকায় রাজনৈতিক আসরে নামেন। নৈহাটিতে তাঁর বাড়ি। মাতৃভূমির বন্ধন-মোচনের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমের কাছে।

১৯০২ সালে বঙ্কিমের অনুশীলনের আদর্শ নিয়ে কলকাতায় 'অনুশীলন সমিতি'র জন্ম হয় দোল পূর্ণিমার দিনে ২১নং মদন মিত্র লেনে। সোদপুরের শশিভূষণ রায়চৌধুরী এর সভ্য ছিলেন। তিনি গণআন্দোলনে দেশের মুক্তি আনার স্বপ্ন দেখতেন এবং গ্রামে কাজ করতেন। তিনি মিত্তিরসাহেবকে 'অনুশীলন সমিতি'তে আনেন। ব্যাপারটা হয় এইরূপে। তরুণরা দল গড়ল কিন্তু বড় বা হোমরা চোমরা নেতার অভাব বোধ করে। শশীদা তাদের ব্যারিস্টার এ চৌধুরীর কাছে নিয়ে যান। তখন নব দেশপ্রেম বসন্তের পাগলা দোলায় দুলতে চলেছে। চৌধুরী এদের পি. মিত্রের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন—এখানেও দুদিক থেকে খোঁজা। স্বামী বিবেকানন্দ সানন্দে এই তরুণের দলকে কাজের বহু উপদেশ দেন। সমিতির অনেকেই আগে থেকে বেলুড় মঠে যেতেন।

মিত্তিরসাহেব সতীশ বসু প্রভৃতিকে বলেন, 'বরোদা থেকে একটা দল এসেছে। তোমাদের উদ্দেশ্যের মতো তাদেরও উদ্দেশ্য। সামরিক শিক্ষা তারা দেবে। তাদের সঙ্গে তোমাদের মিলিত হতে হবে।' এর ফলে উভয় দল মিলে গেল। মিলিত দলের সভাপতি মিত্তিরসাহেব। সহ-সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রীঅরবিন্দ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন ঠাকুর।

অন্যদিকে এই সময় জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা কলিকাতায় আসেন। তিনিও শিক্ষিত ও অভিজাতদের মধ্যে ছড়াতেন ভারত-মুক্তির মন্ত্র। ওকাকুরা ১৯০১ সালের শেষদিকে বেলুড় মঠে এসে ওঠেন।

মিত্তিরসাহেব তখনকার অবিসংবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথের খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। এর আগেই তিনি ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গুপ্ত-সমিতি গঠনের চেষ্টা চলছিল। মিত্তিরসাহেব 'অনুশীলন'-এর সঞ্চালক বা ডাইরেক্টর পদে বৃত। বোধনকাল সমুপস্থিত। তীর্থযাত্রীদের ডেরা ছাড়ার সময় এসেছে বুঝে যতীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে সরলা দেবীর নামে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন। এখানে মিত্তিরসাহেবের আনুকূল্য লাভ করেন

এবং 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে পরিচিত হন। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্য সারকুলার রোডে সুকিয়া স্ট্রীট থানার কাছে একটি বাড়ি ভাড়া করে সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। এখানে একটি সমিতি স্থাপন করা হল। নাম ইস্ট ক্লাব (East Club)। এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল বিপ্লবী-নীড়। এখানে ঘোড়দৌড়, সাইকেল, সাঁতার, মুষ্টি-যুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখানো হত এবং বিপ্লবী ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা ও পাঠচক্র পরিচালিত হত। ভগিনী নিবেদিতা এটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দিলেন তাঁর বিপ্লববাদের পুস্তকসংগ্রহ। তাঁর বইগুলির মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইটালির মুক্তিদাতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী ; রমেশ দত্ত, ডিগ্‌বি, দাদাভাই নৌরজির অর্থনীতির বই, অধ্যাপক ওকাকুরার বই প্রভৃতি। নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথকে রাজনীতি শেখাবার জন্য এই বইগুলি দিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে অক্টোবরে বরোদার মহারাজের নিমন্ত্রণে তিনি বরোদায় যান। সেখানে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

সারকুলার রোডের এই রাজনীতিক স্কুলে যে-সব ছাত্র এসে জুটলেন তার মধ্যে ছিলেন 'অনুশীলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশ বসু এবং সমিতির সভ্য গড়পারের মন্মথ মিত্র, বিখ্যাত বারীন ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, ভূপেন দত্ত (ডাক্তার ভূপেন দত্ত) এবং 'আত্মোন্নতি'র ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। এখানে সখারাম গণেশ দেউস্কর অর্থনীতির ক্লাস নিতেন। মিত্তিরসাহেব পড়াতেন ইতিহাস—সিপাহী-যুদ্ধের, শিখ-যুদ্ধের, ফরাসী-বিপ্লবের (তাঁর বাড়িতেই এই ক্লাসটি বসত)। যতীন্দ্রনাথ পড়াতেন রণনীতি ; তা ছাড়া তিনি ছাত্রদের উচ্ছ্বাস-ভরা জ্বলন্ত ভাষায় ভাবী বিপ্লবের মনোমদ কথা শোনাতেন। এই সময় যতীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন ইটালির বিপ্লব সম্বন্ধে।

১৯০৩ সালে যোগেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়িতে ভাবী যুগান্তরকারীদের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটল। বিদ্যাভূষণ আগে থেকে দেশে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে বেড়াতেন। কত প্রবন্ধ ও বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির কথা বাংলাভাষায় সকলের আমলে আনতে তিনি সক্ষম হন। এঁর বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ আসেন। সেখানে ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভাবী কালের 'বাঘা' যতীন এঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে যতীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলেন বাঘা যতীন। বঙ্কিমবাবু যখন চুঁচুড়ায় ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট সে সময় সেখানেও সুন্দর একটি যোগাযোগ ঘটে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন বিদ্যাভূষণ প্রায় বঙ্কিমবাবুর কাছে যেতেন। তাঁর বাসায় এবং ভূদেববাবুর বাড়িতে বহু আলোচনার পর তাঁরা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে দেশপ্রেম ফোটাবার এবং ছড়াবার

সংকল্প করেন। এঁদের ও এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যসেবীদের লেখনীমুখে দেশ-হিতৈষণা, দেশ-উদ্ধারের সংকল্প সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয় সরকারের নাম করা উচিত। চুঁচুড়ার সাহিত্যিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এঁরও অবদান ছিল। 'বন্দেমাতরম' গীত সম্বন্ধে এঁর উক্তি—১৮৭৫-৭৬ সালে নৈহাটিতে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে এঁরা জুটতেন। একদিন এঁরা পেঁাছেছেন কিন্তু তখনও বঙ্কিমবাবু অন্দরমহলে। পরে গুনগুন সুরে গাইতে গাইতে বৈঠকখানায় আসেন—বলেন 'আজ একটা গান এসেছে।' এটা তাঁর রচনা নয়, এসে গেছে। বাংলা সংস্কৃত মিশানর সমালোচনা তিনি শুনলেন না। বললেন—এটি তিনি বদলাতে পারবেন না। বছর ত্রিশ বাদে এর থেকে একটা তুমুল আন্দোলন হবে।

বারীনবাবু ১৯০৩ সালে সারকুলার রোডের বাসায় এসে যোগ দেন। বারীনবাবু দেওঘর থেকে ১৯০০ সালে এণ্ট্রান্স পাস করে পাটনায় পড়তে আসেন, তারপর ফিরে দেওঘর আসেন, তারপর ঢাকায়, তারপর কলকাতায়। চা ও খাবার দোকান খোলেন। ১৯০২ সালের শেষে বরোদায় যান। অরবিন্দের সঙ্গে আমেদাবাদ কংগ্রেসে যান—এরপর বোম্বাই যান ও পরে কলকাতায় আসেন। চমৎকার সম্মিলন। সুন্দর মেলামেশা। তখন কে জানত, অনাদৃত হয়ে এঁদের মধ্যে একদিন এসে ঢুকবে অশিবের অভিসম্পাত! কত স্বপ্ন, কত ভাবাদর্শের মোহনীয় পরশ, কত আবেশময় মুহূর্ত এঁদের জীবনকে কানায় কানায় ভরিয়ে দিল নতুন-দিন আনার নবীন উৎসাহের প্রবাহ! উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার সর্বত্র চলল এখানকার ছড়ানো মন্ত্রে প্রাণ-সন্দীপনী কর্মতৎপরতা। যুযুধান নব শিক্ষার্থীর দল বেড়ে চলল। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার ভার যা ছিল যতীন্দ্রনাথের হাতে, তাই নিয়ে লাগল ঠোকাঠুকি। যুবকরা এতটা কড়াকড়ি পছন্দ করত না। তিনি ছিলেন বড় শক্ত মানুষ।

একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি যুবক অনুমতি না নিয়ে কোথায় উধাও হল। কয়েকদিন বাদে তারা ফিরলে যতীন্দ্রনাথ কৈফিয়ত তলব করলেন। প্রথমটা তারা কিছু না-বলে মুখ বুজে রইল। তারপর যতীন্দ্রনাথ চাবুক হাতে নিয়ে তাদের শাসন করতে গিয়ে বললেন—সব কথা পরিষ্কার স্বীকার করো, নইলে রক্ষা রাখব না। তখন তারা স্বীকার করল, আর একজনের প্রোৎসাহে তারকেশ্বরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। যেখানে টাকা ছিল বলে তাদের সংবাদ, সেখানে দেখল কয়লার কাঁড়ি। এই ঘটনার সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথের কাছে আগেই নালিশ করেন যে, কয়েকটি যুবক তাঁর রিভলভারটি ধার চাইতে গিয়েছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে এই প্রস্তাবিত ডাকাতির কথা বলা হয়। নিবেদিতা খুব

অসন্তুষ্টা হন। যন্ত্রটি দিলেন না, উপরন্তু যতীন্দ্রনাথের কাছে সব কথা ফাঁস করে দেন।

এইরকম এক ঘরে দুই কর্তার উদ্ভবে হল কাজের বিশৃঙ্খলা। মিত্তিরসাহেব ছিলেন সমস্ত প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি। তাঁর কানে এমনভাবে কথা দেওয়া হল যাতে তাঁর মন বিষিয়ে উঠল যতীন্দ্রনাথের প্রতি। পি, মিত্র যতীন্দ্রনাথকে অপসৃত করাই স্থির করলেন। যতীন্দ্রনাথ উদ্দাম কর্মী, এত সহজে ভাঙবার লোক নন। তিনি সারকুলার রোডের আড্ডাটি ছেড়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের একটি মেসে ওঠেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে সব সংবাদ জ্ঞাপন করে কলকাতায় আসতে আমন্ত্রণ জানান। এই ঘটনা ঘটে ১৯০৪ সালে।

শ্রীঅরবিন্দ এসে বারীন্দ্র-প্রমুখ কর্মীদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের আবার মিল করিয়ে দিয়ে যান। মিলে-মিশে কাজ কিছুদিন চলল। যতীন্দ্রনাথ কতকগুলি স্থানে প্রচার ও পরিদর্শন করতে যান। কিন্তু ভাঙা মন পুরোপুরি জোড়া লাগে না। আবার গৃহকলহ আরম্ভ হল। যোগেন বিদ্যাভূষণ নিজে মিত্তিরসাহেবকে ধরলেন। ফল কিছুই হল না। এর ফলে উত্তরবঙ্গের কর্মীরা বিপ্লবী দল থেকে বেরিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথকে দল থেকে চলে যেতে বাধ্য বা অপসারণ করা বাঙালী চরিত্রের একটা মস্ত দুরপনেয় কলঙ্ক।

বঙ্গভঙ্গ। ১৯০৩ সালে কার্জন বাংলাদেশকে দুভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেন। ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর বাংলা পৃথকীকরণ হয়। মোগল রাজ্যে পাঠান শাসনকর্তা ছিলেন—তাঁরা প্রায়ই বিদ্রোহ করতেন। বাদশা মহম্মদ বাংলাকে তিন ভাগে ভাগ করেন—(১) মালদাসহ গৌড় (২) সোনারগাঁ বা পূর্ববঙ্গ (৩) ত্রিপুরা।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরে চলতে লাগল। বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের প্রচার-বিভাগ গড়ে তোলা নিয়ে লাগল মিত্তিরসাহেবের সঙ্গে খটাখটি।

১৯০৬ সালে কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে নিখিল বঙ্গ বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভা হয়। এতেও যোগদান করেন যতীন্দ্রনাথ।

এটি কংগ্রেস অধিবেশনের সমসাময়িক ঘটনা। কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নৌরজি বলেছেন শুধু স্বদেশীতে চলবে না। আমাদের চাই স্বরাজ। চারিদিকে উৎসাহ। মিত্তিরসাহেব দলীয় কাগজ 'যুগান্তর'কে সাহায্য করার আবেদন জানান। এই সালে মার্চ মাসে 'যুগান্তর কাগজ বার হয়। বলা যেতে পারে দলের নাম 'অনুশীলন' এবং দলীয় কাগজের নাম হল 'যুগান্তর'। নামটি ডাঃ ভূপেন দত্তের দেওয়া। কিন্তু এই কাগজ প্রকাশ করতে মিত্তিরসাহেবের সঙ্গে উৎসাহী যুবকদের কয়েকজনের হয় মতান্তর। এর ফলে এই যুবকরা আলাদা হয়ে গেলেন। এদের পুরোধা বারীনবাবু।

১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ দেশ-পর্যটনে বার হন। তিনি পাঞ্জাবে অনুরক্ত, বিপ্লবী-ভক্ত সংগ্রহ করেন। তাঁদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। বিপ্লবী-বীর সর্দার অজিত সিং। ১৯০৭ সালে এঁকে ও লালা লাজপৎ রায়কে দেশান্তরী করা হয়। তাঁর ভ্রাতা সর্দার কিষণ সিং। ইনি সুবিখ্যাত (মৃত্যুঞ্জয়ী) ভগৎ সিং-এর পিতা। এঁদের মারফত বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী লালা হরদয়াল যতীন্দ্রনাথের অনুরাগী ভক্ত হন এবং আমেরিকায় 'যুগান্তর আশ্রম' স্থাপন করেন। শিয়ালকোটের উকিল লালা অমরদাস। ইনি পরবর্তীকালে মোকদ্দমায় ভগৎ সিং-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। লালা সম্বলদাস শিয়ালকোটের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। ওবেদুল্লা সিন্ধি, পেশোয়ারের ডাক্তার চারু ঘোষ ও আম্বালার ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়। এই বৎসর তিনি ঘুরতে ঘুরতে সোহহংস্বামীর কাছে গিয়ে পড়েন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হয় স্বামী নিরালম্ব।

১৯০৭ সালে অক্টোবর মাসে 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবের দেহান্ত ঘটলে স্বামী নিরালম্ব কলকাতায় আসেন এবং 'সন্ধ্যা'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। এই সময় শিবনারায়ণ দাস লেনে 'সন্ধ্যা'-অফিস ছিল। 'মরি নাই—আমি আসিয়াছি' এই শিরোনামায় তিনি এক অতি তেজালো প্রবন্ধ লেখেন। 'সন্ধ্যা'-পরিচালকগণ এইরূপ গরম রাজনীতি পছন্দ বা সমর্থন করতে পারলেন না। স্বামিজীর সঙ্গে হল মতান্তর। তিনি 'সন্ধ্যার'-সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে দলের লোক অন্নদা কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় ওঠেন। এই সময় 'যুগান্তর' কাগজ চালাতেন নিখিল রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত, কিরণ মুখার্জী প্রভৃতি। তাঁরাও অন্নদা কবিরাজ মশায়ের কাছে অনেক সাহায্য পেতেন। স্বামিজীর সঙ্গে তাঁদের এ সময় একটা সাময়িক যোগাযোগ ঘটে। পরিব্রাজক-সন্ন্যাসী হলেও স্বামিজী গর্ভধারিণী মায়ের ডাককে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। মা তাঁকে যখন-তখন দেখতে পাবেন বলে চান্না গ্রামে এসে থাকতে বলেন। নিরালম্ব ছিলেন জ্ঞানমার্গী।*

১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা ফাটার পর ধড়পাকড়ের হিড়িকে, বিশেষ করে নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তির পর আলিপুর বোমার মামলার আসামী করে তাঁকে ধরে

*স্বামিজীর চান্নায় আসার ইতিহাস : তাঁর মা সোহহংস্বামীকে প্রায়ই লিখতেন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সের শেষটায় তাকে মাঝে মাঝে দেখতে চান। স্বামিজী তখন যেখানে যেতেন পুলিসের লোক পিছনে থাকত। গৃহকর্তাদের উপর জুলুম করত। সেইজন্য সোহহংস্বামী তাঁকে বলেন, 'তুমি একজায়গায় এবার থাক, মাও চাইছেন—চান্নায় যাও।' সেই কথায় তিনি চান্নায় এসে বিশালাক্ষীর মন্দিরে থাকতেন। পরে তাঁর মায়ের কথায় গ্রামের লোকেরা শ্মশানের ধারে আশ্রম করে দেন। ১১.১০.৫৬ সালে প্রজ্ঞানপাদ স্বামীর চিঠি—তিব্বতীবাবা শ্যামাকান্তর নাম দেন সোহহংস্বামী, নিরালম্ব ছিলেন সোহহংস্বামীর শিষ্য।

আনা হয়। শেষ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেট মুক্তি দেবার প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করেন, ছেড়ে দিলে তিনি বাড়ি যাবেন কিনা? স্বামিজী উত্তর দেন, 'সন্ন্যাসীর আবার বাড়ি কোথায়?' এরপর তাঁর বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে বৈপ্লবিক কাজ চালাবার দরকার বোধ করেন বাঘা যতীন। ১৯০৯ সালে বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি নিরালম্বস্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে আসেন। আবার ১৯১৫ সালে যখন তিনি, একটি দল বাদে, সর্ববৈপ্লবিক দলের নির্বাচিত নেতারূপে কাজ করছিলেন—তিনি চাইলেন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে অর্থাৎ স্বামী নিরালম্বের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করতে। গুপ্ত-সমিতির নিয়মানুযায়ী চব্বিশ পরগণার অতুলনীয় বিখ্যাত কর্মী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে উভয়ের মধ্যে দূত নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। এই পরামর্শের পর বাঘা যতীন বালেশ্বরে চলে যান। তখন তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচহাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত ছিল। ১৯২৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দেশান্তরী করে লেখককে রাঁচি পাঠানো হয়। আলিপুর জেল থেকে বার হয়ে মাত্র কয়েকটা দিন লেখক কলকাতায় থাকার অনুমতি পান। এই সময় স্বামিজী দর্জিপাড়ার কাছে জয় মিত্রের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তিনি লেখককে ডেকে পাঠান ও যথাযথ উপদেশ দেন। পরে ডিসেম্বর মাসে তিনি স্বয়ং রাঁচিতে লেখকের কাছে এসে কয়েকটা দিন থাকেন। তখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দুজনে বহু আলাপ-আলোচনা হয়। লেখকের কর্মপদ্ধতিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং জাপান, চীন ও বর্মার সঙ্গে যোগ রাখতে উপদেশ দেন।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি চান্না গ্রামে গিয়ে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করেন। ১৯২৯ সালে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করার পর গা-ঢাকা অবস্থায় তিনি স্বামিজীর উপদেশ নিতে আসেন। স্বামিজী তখন বরানগরে যোগেন্দ্র বসাক রোডে বিজয়বসন্তবাবুর বাড়িতে ছিলেন। ভগৎ সিং ঐখানে এসে ওঠেন। তারপর তাঁর কাজ হয়ে গেলে তাঁকে মোটরে লুকিয়ে নিয়ে বিজয়বাবু ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন। পরে পুলিস বিজয়-বাবুর বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করে নি। স্বামিজীর মতবাদ —দেশের স্বাধীনতা দুই ধাপে আসবে। প্রথম আনতে হবে রাজনৈতিক মুক্তি, তারপর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। স্বামিজীর ওপর দল থেকে অবিচার করার ফলে তিনি কর্মক্ষেত্র হতে সরে যান সত্য, কিন্তু কোনদিন তাঁর মুখ থেকে বিরোধের সুর বা অভিযোগ শোনা যায় নি। প্রকৃত বীরের মতো তিনি দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করেছিলেন। তাঁর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তা দেবব্রত বসু ও ডাঃ ভূপেন দত্ত পরে স্বীকার করেন।

১৯৩০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বরানগরে বিজয়বাবুর বাড়িতে স্বামিজীর নশ্বর

দেহ যায়। বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্রহ্মা এইভাবে একপ্রকার সবার অগোচরে মহানির্বাণ লাভ করেন। স্বামিজী গেলেন। কিন্তু ১৯০২ সালে যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, তা মহামহীরুহ হয়ে উঠল কালক্রমে। ১৯০২ থেকে ১৯৪৪ সাল অবধি তার ফুল-ফলের শোভার সমারোহ। তাতে যে কাজের সুরু তার অন্ত হল নেতাজির ইম্ফল-কোহিমা আক্রমণে এবং ইংরেজের কবল মুক্ত ভূখণ্ডে স্বাধীন ভারতের পতাকার প্রথম উত্তোলনে।

১৯০১ সালের প্রথমে প্রসিদ্ধ জাপানী নেতা কাউণ্ট ওকাকুরা শিল্প ও বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করতে এই সময় ভারতে আসেন। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। তাঁর তৃষ্ণা আরো বাড়ে। বৌদ্ধ ধর্মে সমধিক জ্ঞানী অপর কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতে বললে, সে ব্যক্তির নাম শুনেই তিনি ঘৃণাভরে বলেন, 'যে নিজে পরাধীন হয়ে আর এক দেশের পরাধীনতা ঘটিয়েছে তার সঙ্গে আমি দেখা করি না।' এই ব্যক্তি তিব্বতের বহু গুপ্ত সংবাদ ইংরেজ সরকারকে সংগ্রহ করে এনে দেয় এবং কার্জন ১৯০৩ সালে 'তিব্বত মিশন' পাঠিয়ে তিব্বতের সর্বনাশ করেন। যুদ্ধ করে গিয়ান্তসি-চুম্বী উপত্যকা দখল করে নেন। এই সময় ইংরেজের চীন-ভীতি ছিল—এরা তিব্বত হয়ে ভারত আক্রমণ করতে পারে। তিব্বত ছিল চীনের একটি প্রদেশ। কার্জন-নীতি তিব্বতকে দু-ভাগে ভাগ করল। Outer Tibet বা সদর তিব্বত, অর্থাৎ ভারতে-লাগাও প্রদেশগুলি ভারতের সঙ্গে টেনে নেওয়া হল। Inner Tibet বা অন্দরের তিব্বত দালাইলামার অধীনে রইতে দেওয়া হল। কর্নেল শেক্সপীয়র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উদাহরণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত খুলতে উপদেশ দেন। আসামের উত্তর ও পূর্বে তা প্রতিষ্ঠিত হল। তার জন্য হয় আরবদেশ আক্রমণ। আরবরা লড়ল; পরে পরাস্ত হয়ে নিরস্ত হল।

ওকাকুরা ভারতের স্বাধীনতাস্পৃহা ও প্রচেস্টাকে উৎসাহিত করেন। তিনি কোনো এক দেশসেবীকে জিজ্ঞাসা করেন যে—স্বাধীনতা আনতে হবে স্থির ক'রে এখন থেকে খাটলে কতদিনে তাঁরা লব্ধকাম হতে পারবেন, আশা করেন?

ভারতীয় দেশপ্রেমিকটি উত্তর করেন, 'কুড়ি বছরে'। সন্দিগ্ধভাবে ওকাকুরা মাথা নাড়েন। তিনি বলেন, 'প্রাচ্য জাতিরা স্বভাবতঃ ঢিলে। তারা যেটা বিশ বছরে হবে ভাববে, সেটা হতে চল্লিশ বছরের বেশি লেগে যাবে। তার চাইতে এমন প্রযোজনা করা হোক, যাতে দশ বছরে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে যায়। তবে বিশ বছরে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হতেও-বা পারে।'

এই সংবাদ যশোহর জেলার মাগুরা-নিবাসী 'অনুশীলন'-এর প্রবীণ নেতা হীরালাল রায়ের কাছে লেখক পান।

অনুশীলনের কথায় আবার আসি। ১৯০২ সালে 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ'-এর (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) জিমন্যাস্টিক বিভাগের কতিপয় ছাত্র (যারা কেউ কেউ পরে ক্লাবে অর্থাৎ যতীন ব্যানার্জীর সারকুলার রোডের আখড়ায় ছিল) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনের আদর্শে একটি সমিতি গঠন করেন। সতীশ বসুর নায়কত্বে নরেন ভট্টাচার্য (স্কুলমাস্টার), পুলিন মুখার্জী, প্রিয়ব্রত সরকার, ধীরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এর প্রতিষ্ঠাতা। উপরিউক্ত যুবকদের উপর বিবেকানন্দ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। বিবেকানন্দের 'চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে' যে জয় হয় সেটা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়, পরাধীন জাতির ঐতিহ্যের দাবি মিটিয়ে সে এক পরম বিত্ত বলে প্রমাণিত ও পরিগণিত হয়েছিল। ধন্য ১৮৯৩ সাল! ঐ সালে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক এক দিগ্বিজয়ী দেশের বাইরে গেলেন। আবার ঐ সালেই আর একজন রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ী ভারতে এলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গেলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ ফিরলেন দেশে।

১৮৯৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। পুণার 'ইন্দু-প্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেসের তদানীন্তন ভিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা সুরু করেন। ইংরেজের কাছে দরবার করলে ইংরেজ সুবিচার করবে, এই ক্লীব বিশ্বাসকে ভাঙতে চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

১৯০২ সালে অক্টোবরে গায়কোয়াড়ের নিমন্ত্রণে সিস্টার নিবেদিতা বরোদায় যান। সেই উপলক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁর কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় ওকাকুরার কাজকর্মের খবর পান। শ্রীঅরবিন্দ দেশের শত্রু, জাতির শত্রু নিধনের জন্য শক্তিসঞ্চয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় বগলাদেবীর পূজা করেন। এইসময়ে বোম্বাই-এ সরলাদেবীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে।

আরো কিছু কথা মনে পড়ছে। ভগিনী নিবেদিতা প্রকৃতপক্ষে আইরিশ মহিলা ছিলেন। তাঁর পিতামাতা বিলাতে বসবাস করেছিলেন মাত্র। পরাধীনতার জ্বালা নিবেদিতার অস্থি-মজ্জায় সঞ্চারিত হয়েছিল। রাশিয়ার বিপ্লবী-প্রধান অ্যানার্কিস্ট নেতা প্রিন্স ক্রপট্‌কিন স্বেচ্ছায় প্যারিসে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। শোনা যায়, নিবেদিতা নাকি তাঁর কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। আবার, স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ সালে ফ্রান্সে যান প্যারিস প্রদর্শনীতে যোগদান করতে। বিবেকানন্দের শিষ্য ও ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে ক্রপট্‌কিনের আলাপ করিয়ে দেন। উভয়ে বহু আলোচনা হয়। স্বামিজী জার্মানির প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডয়সেন-এর সঙ্গেও পরিচিত হয়ে আসেন।

'অনুশীলন সমিতি'তে পরোপকার, আর্তত্রাণ, সেবাধর্ম; দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং স্বদেশপ্রীতি-বর্ধনের চর্চা প্রভৃতি কার্যসূচী ছিল। সাপ্তাহিক

মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা দরিদ্রের মধ্যে চাউল বিতরণ করা হত। রোগীর সেবার জন্য বিপন্নদের বাড়ি গিয়ে শুশ্রূষার কাজ করা হত। মড়া-পোড়ানোয় শ্মশানবন্ধু এঁরা ছিলেন। ক্রমে এই সমিতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার করতেন—নিজেদের মধ্যে স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্য কলকাতায় একটি যৌথ সমবায়-সমিতির দোকান খুলেছিলেন। তার নাম ছিল 'বেঙ্গল স্টোর'।

ডন সোসাইটি। সুপ্রসিদ্ধ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এম. এ., বি. এল.) ওকালতির মধ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। মেট্রোপলিটন কলেজ (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) গৃহের ঘরে স্বদেশী দ্রব্যের একটি স্টোর খোলা হয়। এখানে ছাত্রদের জড়ো করে গীতার শিক্ষা প্রচার করা হত। দেশহিত-ব্রতে ত্যাগী কর্মী তৈরির খেয়াল রাখা হত। গঠনাত্মক কাজে এঁরা মনোনিবেশ করেন। সতীশবাবু বলতেন প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটি করে ছেলে চেয়ে নেওয়া হবে যারা দেশের কাজ নিয়ে থাকবে। বাড়ির বাকী ছেলেরা সংসারধর্মে তো রইলো। অভিভাবকদের এতে আপত্তি করার কারণ থাকতে পারবে না। 'ডন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা এই সমিতির মুখপত্র ছিল। এতে ভারতের মহত্তর ও বৃহত্তর দিক দেখানো হত। ভারতের নতুন উষার উদ্গম হয়েছে, এটা লোককে জানিয়ে দিত। পরে এখানেও লাঠিখেলার ব্যবস্থা হয়। 'অনুশীলন-এর লোকে শেখাতে আসত। আমরা 'ডন'-এর বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টিত ছিলাম। আমার ভাই ক্ষীরোদগোপাল ঘুরে ঘুরে বাংলা ও বিহারে এই পত্রিকার অনেক গ্রাহক করে দেন।

আত্মোন্নতি সমিতি। নামকরণ দেখলে মনে হয় মনস্তত্ত্বের দিক থেকে 'অনুশীলন'-এর মতো এরাও একই পথের পথিক। নিজেদের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। তাতেই দেশের উন্নতি। গোড়ায় স্বাধীনতার উপর বেশী জোর দেওয়া হত না। ১৮৯৭ সালে তরুণ বয়সে ছাত্রাবস্থায় কয়েকটি লোক এই সমিতি স্থাপন করেন। রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সেন প্রভৃতি বহুবাজার অঞ্চলে খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে আলোচনা-সভা করতেন। তারপর এতে আসেন ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হরিশ্চন্দ্র শিকদার, প্রভাস দে। শেষোক্ত চারজন যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। 'আত্মোন্নতি' পৃথক সত্তা বজায় রেখেই কিছু সভ্যের সাহায্যে বিপ্লবীর ভাবে আসে। এইটি গোড়াকার কথা।

সময়ের গুণ। বিংশ শতাব্দী এসেছে সমস্ত পৃথিবীতে একটা ওলট-পালট ঘটিয়ে দিতে। রাষ্ট্র ও সমাজ স্বল্পের হাত থেকে 'বহু'র হাতে শক্তি আসবে। এইটেই এর বিশেষ ও অন্তর্নিহিত অবদান—সবচেয়ে বড় দান আধুনিক জগতে। এই বিশ্ব-বিপ্লবে ভারত কি করে পেছিয়ে থাকবে? এখানেও জনজাগরণের কাজ

প্রথমটা লোকলোচনের অন্তরালে সুরু হয়েছিল। যেন নববসন্ত সমাগমে লাল, সবুজ, হলদে—নানা রঙের পোশাকে এল জাগৃতির দূত! ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, পরহিতব্রত, অনাথালয়, বিধবাশ্রম, আতুরাশ্রম—কতই না মুখোশে সেজেছে সে দূত! যাকে যেমন করে ডাক দিলে সাড়া দেবে তাকে তেমনি করে ডাক দিল, অথবা ডাকটি তার কাছে তেমনি বোধ হল। আসলে এ এসেছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সাধন করতে।

সোদপুরে তেঘরা গ্রামে শশিভূষণ রায়চৌধুরী গণজাগরণের জন্য 'গণের মধ্যে কাজ'-এর সুরটি ঐকতানে দিচ্ছিলেন। গ্রামে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিদ্যা ও কর্ম-শিক্ষার কার্যক্রম নিয়ে তিনি আরম্ভ করেন। তখনকার দিনে নাটাগড়ের তালা বিখ্যাত ছিল। ওখানে ঐরকম তালা-তৈরি শেখানো হত। উন্নতভাবে চাষ-আবাদের জন্য দেশে কী করা হয় এবং এখানেই বা তার কতটা নেওয়া চলে—এইসব শিক্ষাসূচীতে ছিল। এ ছাড়া জ্ঞানবৃদ্ধির শিক্ষাও বই পড়িয়ে দেওয়া হত। মোটের ওপর হাতে-কলমে কাজ ও জ্ঞানবৃদ্ধির পড়াশোনা এখানে চলত। জাতীয়তাবাদের গোড়ার কথাগুলিও তাদের ধরিয়ে দেওয়া হত। শশীদা ছিলেন গণক্রিয়া দিয়ে স্বাধীনতা আনার পন্থী। কলকাতার বিখ্যাত গুণী-জ্ঞানীদের তিনি এই 'কাজের মতো কাজের' দিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। কৃষক ও মজুরদের মধ্যে কাজের কথা তখনই কারু কারু মাথায় এসেছিল। বিশেষ করে বাংলার নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস তখনও স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছিল। তাদের বিদ্রোহ সরকারের বিরুদ্ধে না হলেও এক-একটি লাটের মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিওলা বেসরকারী সাহেবদের বিরুদ্ধে ছিল। তাদের আন্দোলন করে কৃষকরা; নেতৃত্বও এসেছিল তাদের ভিতর থেকে। দিগ্‌দর্শনে তারা সাহায্য পেয়েছিল কতিপয় সহৃদয় শিক্ষিত লোকের ভিতর থেকে। এইটাই তো মস্ত আশার কথা। শশীদার সঙ্গে আমার ও আমার সঙ্গীদের যোগ ঘটে যায় এবং আমার বন্ধুরা তাঁর আরব্ধ কাজ বহুদিন সঞ্জীবিত রেখেছিলেন।

১৯০৬ সালে স্বামী কেশবানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। ইনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেহে বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়লেও মনে বেজায় তাজা ছিলেন। আমি এঁর কাছ থেকে নীলকর আন্দোলনের ঘটনা-পরম্পরা বহুলভাবে জানতে পারি। এঁর দেশ ছিল যশোরে। এখনও বিনোদপুরে এঁর 'বেদান্ত আশ্রম' বেঁচে আছে (পাকিস্তান তা থাকতে দিয়েছে কিনা জানি না)। ভট্টপ্রতাপ গ্রামের একনিষ্ঠ কর্মী ও দেশসেবক ৺হীরালাল রায়ের সঙ্গে এঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। নীল-বিদ্রোহের সময় থেকে এ পর্যন্ত পুলিস তাঁর পিছু ছাড়ে নি। যেখানে ইনি যেতেন পুলিস সঙ্গে সঙ্গে যেত। স্বামী কেশবানন্দ আমাদের বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা-হীনতায় জীবনধারণ বৃথা। জীবনের সব বিভাগই মিছে হয়ে যায়—সাধুগিরি

পর্যন্ত। সত্য বলার সাহস যখন হ'রে যায় তখন কি করে বলতে পারবেন ঠিক-ঠিক ধর্মসাধনা হতে পারে?' তিনি যুবকদের খুব উৎসাহ দেন এগিয়ে যেতে, অজস্র আশীর্বাদ করেন তাঁর যৌবন হরণ করে নিয়ে যারা বাংলায় আবার অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের। যৌবন চিরজীবী হউক। যৌবনের জয় হউক! কৃষকদের মধ্যে কি ভাবে কাজ করলে সফলকাম হওয়া যায় সে সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। তাদের ধর্মবিশ্বাসে হাত না দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কর্মপন্থা অনুসরণীয় বলেন।

ব্যারিস্টার অপূর্ব ঘোষ বলতেন, 'জগতে সম-সমাজবাদের দিন এগিয়ে আসছে। পুঁজিবাদের নিজের ভারে নিজে ভেঙে উল্টে-পড়ার সময় সমাগতপ্রায়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যুবকদের কাজে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ভারতকে যারা কাঁচামালের বাজার করে রেখেছে, তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এদেশে কিছু কলকারখানা ও বিদ্যাগার তারাই করতে বাধ্য। তার ফলে কৃষিপ্রধান সভ্যতা ও আগামী শিল্পপ্রধান সভ্যতার ঠোকাঠুকি লেগে এদেশে একটা অসাধারণ নবজাগরণ হবে। সেইটাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে সাফল্য হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। এই যে নানারকম যুদ্ধবিগ্রহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, এ আর কিছু নয় শুধু পুঁজিবাদের জীবন অযথা বাড়াবার বিফল প্রচেষ্টা।'

আমাদের বাড়িতে আমার রাজনীতির হাতেখড়ি হয়। আমার মা বলতেন সব মানুষ সমান। সেখানে ভেদাভেদ নেই। কলসীর জলও যা, পুকুরের জলও তা। কলসীর পোড়ামাটির আবরণ ভেঙে দিলে দুই জল এক হয়ে যায়। এদেশ-ওদেশের আবরণ ঘুচিয়ে দিলে সবাই হয়ে যায় একমাত্র 'মানুষ'। কিন্তু তিনি যখন শুনতেন —আসামে শ্বেতাঙ্গের অযথা, সবুট পদাঘাতে পিলে ফেটে চা-কুলীর ইহলীলা সংবরণ, অথবা গোরা-সৈন্যের হাতে ভারতীয় কোনো নারীর সতীত্ব বা শ্লীলতাহানি—তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। রোরুদ্যমানা অবস্থায় নিজের সন্তানদের বলতেন, 'এদের দূর করে দিতে হবে। পারবি? তোরা পারবি!' আমরা অবাক হয়ে যেতাম। ইংরেজকে তাড়ানো কি সোজা? তিনি বলতেন, 'ওরা কি রাবণের চেয়ে শক্তিশালী? বনবাসী রাম, তাঁর কী ছিল সম্বল? রাবণকে তো তিনি হারালেন। রাবণের চেয়ে কি ইংরেজ শক্তিশালী? রাবণ দেবতাদের বন্দী করেছিল, মহাদেবকে জোর করে ধরে এনেছিল। এরা কি তা পেরেছে? গায়ের জোর বড় নয়, মনের জোর বড়।'

আমার বাবা জগতের ইতিহাস ঘেঁটে গ্রীস, রোম থেকে আরম্ভ করে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালির স্বাধীনতার আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস শুনিয়ে কর্মপন্থা বেছে নিতে বলতেন।

আমার কাকা সত্যলালবাবু বলতেন, 'প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে—দেশকে

জন্মের সময় সে যে-অবস্থায় পেয়েছে, মরার সময় তার চেয়ে যেন উন্নত দেখে যেতে পারে। তার উপযুক্ত কাজ করে যেতে হবে।'

আমার মেজদা মাখনগোপাল বলতেন, 'স্বাধীনতা-স্বাধীনতা' করে চীৎকার করলেই হবে না। তার রূপটা এঁকে নিতে হবে। 'যে মরল চষে, সে রইল বসে'। সোনার, লোহার, কয়লার, কাপড়ের, যন্ত্রপাতির বা নিত্য ব্যবহারের কারখানায় যারা কুলীগিরি করে আধপেটা খেয়ে, গতর পাত ক'রে খেটেখুটে পঙ্গু হয়ে থাকে বা মরে যায়—তারা পায় না সুখ! সকল সুখে সুখী হয় ধনীরা। তাদের টাকার উপর টাকার কাঁড়ি! মজুররা সকল দুখের দুখী। স্বাধীনতা মানে ইংরেজ তাড়িয়ে সাধারণ লোক, চাষী-মজুরদের হাতে আধিপত্য আনা।'

আমরা পরের তিন ভাই—ক্ষীরোদগোপাল, আমি ও ধনগোপাল বাড়ির এই শিক্ষায় খুব প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। মেজদা বিলাতের সোশ্যালিস্ট পার্টির কথা জানতেন ও বুঝতেন। কারণ তিনি বলতেন, 'ঐ রকম স্বাধীনতা যদি তলোয়ারের জোরে আনা যায়, তাহলে সামরিক শক্তি যাদের হাতে থাকবে তারাই ওপর-পড়া হয়ে অধিকারী হয়ে বসবে। কিন্তু সবাইকার মত বদলে শান্তির পথে যদি আসে তাহলে সর্বসাধারণ সত্যকার 'মালিক' হতে পারবে। সেজন্য জনসাধারণকে বুঝিয়ে সঙ্গে নেওয়াই প্রশস্ত পথ।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্প্রতি ক্ষুদ্র জাপানী মূষিক বৃহৎ রুশ হাতিকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে সমগ্র এশিয়াবাসীর কাছে বীরপূজা পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পতিত এশিয়ার উত্থানের দিনে বৈতানিকের কাজ করেছে। আবার, প্রাচী থেকে আলো গিয়ে প্রতীচি তথা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করবে। অসম্ভব বলে যা এতদিন মনে হচ্ছিল তা আজ অতি সহজ ও সম্ভব হল। 'জয়, প্রাচীর জয়! ওড়াও বিজয়-নিশান প্রাচী! এবার তোমার উত্থানের পালা।'…এইরকম মন-মাতানো হাওয়া প্রাণে বইতে লাগল।

ভারত ওঠো আজ! আর তোমার গড়িমসি করা শোভা পায় না। ঐ-যে সুরে সুরে কী মনের কথা ভেসে আসে! সময়ের গুণই বটে। এতদিন ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে যা উচ্চশিক্ষা বলে চলছিল তা বিশ্বের হাটে সোনা না হয়ে গিল্টি-করা টিন বলে ধরা পড়ে গেল। অন্যদেশের শিক্ষায় মানুষকে 'প্রকৃত মানুষ' করতে চলেছে—হেথায় মানুষকে 'অমানুষ' করে তোলা হচ্ছে। এরা গোলামির ছাপকে গলার ফাঁসি না বুঝে, গলার হার বলে আদর করে। এদের বিদ্যার দৌড় দেখে অন্যেরা হাসে।

জয় যুগধর্ম! সময়ের গুণ মানতে হবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় জাপানের জাগরণ, উন্নতি, জিত প্রভৃতির ইতিহাস ধারাবাহিক বক্তৃতায় একদিন ক'রে দিতেন। স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করা এর উদ্দেশ্য। উদ্দীপনা আনার জন্য একটি স্বদেশী গীত গেয়ে সভার কাজ আরম্ভ হত। এ ছাড়া অন্য স্বদেশী গান জনসাধারণ শুনতে পেত না। মাসিক পত্রিকার মারফত গোবিন্দ রায়ের 'কতকাল পরে, বলো ভারত রে, দুঃখসাগর সাঁতারি' পার হবে' পড়া যেত। 'না জাগিলে পরে ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না'-রও এই দশা। সরলা দেবীচৌধুরানীর 'অতীত গৌরব-কাহিনী, মম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান' মহাসভায় হয়তো গাওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণে শোনার সুবিধে পেত না। ১৯০১ সালে এ গান গাওয়া হয় বিডন উদ্যানে।

ব্রাহ্মসমাজ চিন্তাধারায় অগ্রণী ছিলেন। সেখানে এই গানটি শোনা যেত—

'তব পদে লই শরণ,
প্রার্থনা করো গ্রহণ—
আর্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে—অচেতন হে!
একবার কৃপা করি তোলো করে ধরি'…ইত্যাদি।

গানটি এমন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষের বাজারে এর দাম ঢের। 'বন্দেমাতরম্' গান তখনও সাধারণ্যে প্রচলিত হয় নি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। লর্ড কার্জন কূটনীতি-বিশারদ। এদেশের লোকের 'স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মত গড়ে ওঠা' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিজনক। Mill, Rousseau, Burke, Ruskin, Mazzini-র রচনা এবং ফরাসী-বিপ্লব, ইটালীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস পাঠে এদেশের লোকের চোখের ঠুলি ঈষৎ আলগা হচ্ছে। সেজন্য উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি করা দরকার। অতএব উচ্চশিক্ষা কমানোর মতলবে তিনি ১৯০৪ সালে 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন' প্রণয়ন করলেন এবং এর পর সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি নতুন করে বাংলাদেশে প্রবর্তন করলেন। বাংলায় ইতিপূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা একরূপ অজ্ঞাত ছিল বললেই হয়। এখানে হিন্দু-মুসলমান অপর প্রদেশগুলির চেয়ে শান্ত প্রতিবেশীর মতো বসবাস করত। মোগলের বিরুদ্ধে বাংলার পাঠান ও হিন্দু একজোট হয়েছিল। ঈশাখাঁর নাম সেজন্যই জনপ্রিয়।

একটা একটা করে দুটো ফ্যাঁকড়াকে ধরা যাক্। প্রথমে নেওয়া যাক ভারতে ইংরেজের শিক্ষা-নীতি। ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে কারবার করতে আসে। তাদের কিছু সস্তার কেরানী দরকার। পশ্চিমের শিক্ষা ছড়াতে গেলে প্রাচ্যের অভিমানে আঘাত লেগে পাছে আগুন জ্বলে ওঠে, সেজন্য কোম্পানি টোল-মক্তাবের শিক্ষা কায়েম রাখছিল। তাতে কিন্তু কোম্পানির কার্যসিদ্ধি হচ্ছিল না। অবশেষে লর্ড মেকলে বড়লাট বেণ্টিঙ্কের সময় তাঁর এক আত্মীয় (ট্রেভেলিয়ান) বড় কর্মচারীর মারফত কোম্পানির বোর্ড-অব-কন্ট্রোলের কাছে একটা নব্য নীতির খসড়া পাঠান। তার সারমর্ম এই ছিল যে—ভারতের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য এই দেখা যাচ্ছে যে, যারা বাইরে থেকে এখানে আসে তারা ক্রমে হীনবীর্য হয়ে পড়ে। এদেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে ভারতীয়রা কোনো বিদেশী রাজশক্তিকে বেশিদিন বরদাস্ত করে না। ভারতের সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যখনই কোনো বীর্যবান শক্তি ভারত জয় করেছে, সেই শক্তিকে ভারতীয়েরা আবার কিছুদিন বাদেই পরাভূত করে নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা টেনে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হিন্দু-পাঠান সংঘর্ষ। হিন্দু-পাঠান বনাম মোগল সংঘর্ষ। এগুলির ফলাফল দেখা যেতে পারে। ভারতের অন্তর্নিহিত এই বিদ্রোহ প্রবণতাকে চাপা দিয়ে রাখতে গেলে এখানকার মাটির সঙ্গে যাদের রক্তের সম্বন্ধ এবং যারা ভবিষ্যতে বিদ্রোহ আনতে পারে—এমন ভারতীয়কে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারা তার নিজ বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার বনিয়াদ পাকা করে দিতে পারলে, এই নব-শিক্ষিত ভারতীয়রা বৃটিশ-স্বার্থ ও অস্তিত্বে নিজ স্বার্থ ও অস্তিত্ব দেখবে। বৃটিশ প্রভুত্বকে এদেশে স্থায়ী করে রাখতে বদ্ধপরিকর হবে। তারা সংস্কার পেলেই তুষ্ট থাকবে, বিপ্লবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম রাখতে ভারতীয়দের মধ্যে একদল লোক সৃষ্টির ব্যবস্থা

হল। এরা হল নতুন একটা শ্রেণী। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ওদের এই ধারণা ভুল হয় নি। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইংরেজকে এদেশে বসবাস করাবার জন্য এক আন্দোলন করেন। বহুব্যক্তি-স্বাক্ষরিত একটা দরখাস্তও পাঠানো হয় বিলাতে। বিলাতের কর্তারা নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচলনের হুকুম দিলেন। কিছুদিন পরে যখন আলোকের চেয়ে উত্তাপ বেশী দেখা যাচ্ছিল, লর্ড কার্জন তখন আবার ব্যবস্থা দিলেন দূষিত অঙ্গকে কাটবার।

বাংলার জাগৃতি মানে দু-দিন বাদে সমগ্র ভারতের জাগৃতি। তাতে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক ক্ষতি ছিল অপরিসীম। ইংরেজের রপ্তানী কারবারে ভারত থেকে প্রচুর অর্থাগম হত। শুধু সেই অর্থাগমের ফলে ইংলণ্ডে ছ-ভাগের একভাগ লোক খেয়ে-পরে আরাম করে বাঁচত।

ভারতের কাঁচামাল, বিপুল লোকসংখ্যা, অর্থনৈতিক আয় ও সম্ভাবনা, সৈন্যসামন্ত, সামন্ত নৃপতিদের সমর্থন—এইসবকে মিলিয়ে জগতে ইংরেজ নিজেকে দুর্জয় শক্তিশালী করে রেখেছিল। এই শক্তির ভাণ্ডার কি কার্জন ফুটো করে দিতে বাঙালীকে ছাড়তে পারেন? বঙ্গভঙ্গের ভিতরকার কথা ছিল এই।

একটু গোড়ায় আসি। ভারতে জমি যে চাষ করত সেই থাকত মালিক। এই ছিল সমাজ-ব্যবস্থা। হিন্দু আমলে আট ভাগের একভাগ শস্য রাজাকে দিয়ে খালাস, সমাজ চলত নিজের ব্যবস্থায়। সেইজন্য কত রাজপাট বদলে গেছে তবু গ্রাম্য ভারত রাজস্বটুকু ফেলে রয়ে গিয়েছিল স্বাধীন। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী ব্যবস্থা' প্রবর্তন করে ভাঙলেন এই সমাজ-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা এবং নতুন শিক্ষা-বন্দোবস্ত পূর্বেকার সমাজ-কেন্দ্রিক মনোভাবকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে ছাড়ল। সাংস্কৃতিক পরাজয় এল এখানে। সবচেয়ে বেশী সর্বনাশের উৎপত্তি হল এই রকমে। নানা উপায়ে টাকা লুঠ হতে লাগল। কথায় বলে—'কার গোয়াল, কেবা দেয় ধোঁয়া'? কোম্পানি তো লুঠত-ই, কোম্পানির কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে লুন্ঠন আরম্ভ করল।

ইংরেজের শাসন ও শোষণ নীতির ফলে ভারত দুটি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান পেল —(ক) ভারতের পক্ষে আত্মঘাতী শিক্ষানীতির সম্প্রসারণ বা পোষ্যপুত্র-প্রদান পদ্ধতি এবং (খ) জমিদারী প্রথা। একসঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণ ও সংস্কৃতিগত পরাজয়ের সূত্রপাত হল। ইংরেজ নিজে যখন রাজা হয় নি, সেই কোম্পানির আমলে, কৃষককে ভূমির স্বত্ব-ছাড়া করে জমিদারকে করল ভূমির মালিক।

সমাজদেহে জীবনীশক্তি বর্তমান থাকলে তার অগ্রগতির পথে বাধা তাকে চিরকালের জন্য আটকে রাখতে পারে না। নব-শিক্ষিতদের মধ্যে নবজাগরণ এল। সবাই নিজেকে বিকিয়ে দেয় নি। বিজ্ঞানের বলে মানব-সমাজে আসছে প্রগতির ঢেউ। পাশ্চাত্ত্য দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনগুলির ফল ভারতকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল।

বিষয়টা আপাতবিরোধী মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যদি আত্মহারাই ক'রে ছাড়বে, তবে আবার জাগরণের প্রশ্ন আসে কি করে? কিন্তু সামাজিক জীবের অগ্রগতি, দুটি শক্তি—বাদ ও প্রতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বন্দ্বে মুহ্যমান বা অবসাদগ্রস্ত করতে পারে, কিন্তু ভিতরে প্রতিরোধশক্তি থাকলে নতুন চাঞ্চল্যে শক্তি জাগিয়ে তোলে। কিছু লোক অবশ্য মধ্যপথে বিরাম লাভ করে। আদিতে কোলাহলে অনেককে দেখা যাবে। কিঞ্চিৎ চপলতার পর হঠাৎ বিরাম এসে পড়াই হচ্ছে ভয়ের কথা। মেকলে তো এইটাই আশা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, তাম্বে, আনে, খারে প্রভৃতি নেতারা এর প্রকৃষ্ট প্রামাণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরোগ্যশক্তিরই জয় হয়। ইংরেজ বিশেষ করে কী চেয়েছিল? রাজনৈতিক কূটচালে হিন্দু-মোস্লেম বিসংবাদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা। সে ভেবেছিল তাতে করে তার ভারতে অবস্থানের কালটা বৃদ্ধি পাবে। হিন্দু-মোস্লেম সমস্যা একটা গভীর গবেষণার বিষয়। বিশদভাবে আলোচনা পরে করা যাবে। এটা একহাজার বছরের সমস্যা। এখানে এই সময়কার প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

মুসলমানরা শেষ বাদশা থাকার কারণে এবং ইংরেজ আমলে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম প্রচেষ্টায়, যাকে বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরা 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে ঘোষণা করে, তাতে মুসলমান আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনায় তারা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সেইজন্য ইংরেজরা 'সুয়োরানী-দুয়োরানী'র নীতি চালাতে থাকে। এর পিছনকার ঘটনা এইরকম—যখন ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা পরাজয়ে সমাপ্ত হল, বৃদ্ধ বাদশা বাহাদুরশাহের এক শুভানুধ্যায়ী সঙ্গী তাঁকে প্রাণ বাঁচানর জন্য পরামর্শ দেন—

'দমদমে মে দম নাহি হ্যায়, খয়ের মাঙো জান্ কি।
এ্যায়্ জাফর ঠাণ্ডি হুয়ি সমসের হিন্দুস্তান কি॥'

'কামান-গোলার দম ফুরিয়েছে। হে জাফর, আপন জীবনের মঙ্গলের দিকে তাকাও। হিন্দুস্তানের তলোয়ার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে (চিরতরে থেমে গেছে)।'

বাদশা কবি ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল জাফর। দেখা যাক্ তিনি তার কী উত্তর দিলেন:

'গাজীওঁ মে বু রহেগী যব্ তলক্ ইমান কি।
তব তো লন্ডন তক চলেগি তেগ্ড হিন্দুস্তান কি॥'

'যে পর্যন্ত স্বদেশের জন্য আত্মদানকারীদের মধ্যে ইমানের (বিশ্বস্ততার) গন্ধ থাকবে, সে পর্যন্ত হিন্দুস্তানের শাণিত তলোয়ারের চোট লন্ডন অবধি পেঁৗছাতে থাকবে।' বাহাদুরশাহের স্ত্রী জিন্নতমহল, লক্ষ্ণৌ নবাবের স্ত্রী হজরৎমহল শেষের দিকে ঝাঁসীর রানীর মত যুদ্ধ করে পরে নেপালে পালান।

১৮৫৬ সালে একদিন লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজেদ আলি শা আফসোস করে বলেছিলেন—'নেমকহারামিয়া, দুনিয়া ডুবায়া।' ১৮৫৭ সালের উথল-পাথালের পর আর এক ঘটনা মুসলমানদের আলোড়িত করতে শুরু করল। আরব থেকে 'ওহাবী' আন্দোলন এদেশে আমদানি হল। ওহাবীরা বিলাতের ইতিহাসের ক্রমওয়েলের পিউরিট্যানদের সঙ্গে তুলনীয়। তারা ধর্মে বেজায় গোঁড়া, কিন্তু রাজপাটে গণতন্ত্রবাদী। এদের মতে ইসলামে বহু অবাঞ্ছনীয় কু-প্রথা ও গলদ এসে ঢুকেছে। সেগুলির উচ্ছেদ করতে হবে। অ-মুসলমান রাজার অধীনে ইসলাম ধর্ম ঠিকমতো আচরিত হতে পারে না। সেজন্য তাকে উজাড় করতে হবে। ইংরেজ প্রয়োজনবোধে ওহাবী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করে। বহু মুসলমানকে নানারূপে লাঞ্ছিত, কারারুদ্ধ ও আন্দামানে পাঠানো হয়। কিছু সংখ্যার ফাঁসি হয়। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ওহাবী বন্দী শের আলি বড়লাট মেয়োকে আন্দামানে হত্যা করে। এর পূর্বে একজন কলকাতা হাইকোর্টের এক ইংরেজ জজ নর্মানকেও হত্যা করে ওহাবীরা।

সুতরাং হিন্দুরা 'সুয়ো' ও মুসলমানরা 'দুয়ো' হল। দেশের নাড়ীতে বিচক্ষণ চিকিৎসকের মতো হাত রাখা একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। বাইরে যদি জনমত প্রকাশের পথ না পায়, অন্তর্মুখী হয়ে সে ঘোর অনিষ্ট করতে পারে। অথচ রাজশক্তি জানতে না পারায় তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে পারবে না। এই তো কিছু আগেই দু-দুটো গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রাণান্তকারী প্রচেষ্টা ঘটিয়ে তুলল। ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ওহাবী-আন্দোলনের কাল। লর্ড ডাফরিন উৎসুক হয়ে সেজন্য 'কংগ্রেস' বা ভারতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠা করায় হাত দেন। ১৮৮৫ সালে ভূমিষ্ঠ হল কংগ্রেস। বাহ্যতঃ লোককে বোঝানো গেল যে, গণমতে চলতে অভ্যস্ত বৃটিশ সরকার সর্বেসর্বা একাধিপতির মতো শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না। কেউ কেউ এতে সত্য মহানুভবতার গন্ধও পেল।

ভারতীয়দের হাতে কিছু ক্ষমতা না থাকায় কংগ্রেস বিরুদ্ধ প্রতিবাদে বেশ নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। স্বামী রামদাস শিবাজিকে উপদেশ দিয়েছিলেন—এক ধর্ম, এক পতাকা, এক রাষ্ট্র জাতীয়তার লক্ষণ। মানুষ তো এমনিই সমাজবদ্ধ জীব। সেই সমাজ একটা ভৌগোলিক অবস্থানে থাকলে এবং একটা রাজনীতিক মেল-বন্ধনে বাস করলে তাকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা 'জাতি' বলে স্বীকার করেন। পাশ্চাত্ত্যরাও 'এক-পতাকা' মানেন। ওটা তো এক-রাজনীতিক সমাজের প্রতীক। এক ভাষা ও এক ধর্ম হলে আরো সুবিধা। ইংরেজরা দেখায় ভারতে তারা একটা সর্বভারতীয় ভাষা দিয়েছে, একটা ভৌগোলিক অবস্থান কার্যতঃ কায়েম করেছে। একটা পতাকা, যেটা তাদের—দিয়েছে, একটা রাজনীতিক সমাজ বা রাষ্ট্র গড়েছে। এই এতকাল বাদে ঊনবিংশ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ইংরেজের আনুকূল্যে ভারতীয় জাতীয়তার স্ফুরণ হল।

ইংরেজের এটা একটা মস্ত গর্বের দাবি। কিন্তু ঐতিহাসিক ঝাপসা দৃষ্টি তাদের অন্ধ করে রেখেছে একটা খুব বড় সত্য থেকে। ইউরোপেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দী না আসা পর্যন্ত জাতীয়তাবোধ জাগে নি। অথচ ভারতে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের বুদ্ধিতে জগতে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র ভারতে এক রাজা, এক পতাকা, এক ভৌগোলিক অবস্থান—একটি রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। পৃথিবীর বয়স তখন কিশোর—ভাবাদর্শটাকে ধরে রাখতে পারে নি।

ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুরা সুরুতেই নিয়েছিল। মুসলমানেরা নিজ শক্তি ফিরে পেতে, মানের ভয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর বসে ছিল। হিন্দুদের মধ্যে সেইজন্য নবজাগরণ প্রথম দেখা দেয়। কংগ্রেসের কিছু স্ফুরণ দেখে এইবার বৃটিশ রাজনীতিকরা খেলার-ঘর বদলানোর সময় এসেছে বুঝল। উসকানি দিয়ে আলিগড় মোস্লেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদকে ভ্রান্তপথে চালিত করে মুসলমানকে 'সুয়ো' ও হিন্দুকে 'দুয়ো' সাব্যস্ত করা হল। সৈয়দ আহম্মদ তাঁর 'আ সওয়াবে বাগাওৎ' বা বিদ্রোহের কারণ (১৮৫৭ সালের) গ্রন্থে যে স্বাদেশিকতার প্রমাণ দেন, পরে তার ঠিক উলটোটা করে বসলেন।

বাংলার শিক্ষিত সমাজ ভারতবর্ষে নতুন স্বাদেশিকতার উন্মাদনা এনে দেওয়ায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে দাবানোর জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে উঠল। রাজনীতিক দাবা খেলাই এই জাতীয় জিনিষ। লর্ড কার্জন বাংলার প্রতিভাকে ম্লান করার জন্য কায়দা করে একটা ঘরোয়া যুদ্ধের অবতারণা করলেন; এক ভাষাভাষী এবং এক কৃষ্টির অধীন হলেও বাংলাকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে চেষ্টিত হলেন। তাঁর এ রাজনৈতিক চাতুরি ধরা পড়তে বেশী দেরি হল না। ঢাকাতে গিয়ে বললেন যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে হবে 'মুসলমান প্রদেশ'। এই আত্মঘাতী অবস্থা যাতে না-আসে সেজন্য দেশের বুদ্ধিমান হিন্দু ও মুসলমান নেতারা 'বঙ্গভঙ্গ' রোধের আয়োজন করলেন। বহু প্রতিবাদ-সভা হতে লাগল। একটা প্রতিবাদ-সভা ১৯০৫ সালে কলকাতায় স্টার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে আহূত হয়। বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বঙ্গভঙ্গের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক্ সম্বুদ্ধ করে বললেন—শুধু প্রতিবাদ করলে হবে না, নিজেদের শক্তিমান করে সফলতা অর্জন করতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যনৈতিক ঠাটবাটকে 'বয়কট' করতে হবে। বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের মধ্যে দিয়ে জাত উঠে দাঁড়াবে। ইংরেজের চাকরি, আদালত, শিক্ষায়তন ও বাণিজ্য বর্জন করতে হবে। সভান্তে ভাবে বিভোর যুবকদের মধ্য হতে নামের তালিকা সংগ্রহ করা হল। তারা প্রতিজ্ঞা করল যে, ইংরেজদের চাকরি করবে না। আরও অনেক স্থানে জনমত গঠনের জন্য সভা হতে লাগল।

শুধু সভা করলে কি হবে? দেশের স্বাধীনতা রক্তকণা যাঁরা বীরের মতো

পূর্বে জীবন দিয়ে আদর্শস্থানীয় হয়ে গেছেন, তাঁদের স্মরণ করে বহু উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। উদ্দেশ্য—তাঁদের জীবনে জীবন লাভ করে, নতুন করে প্রেরণা পেয়ে দেশের দুর্দিন ঘুচিয়ে সুদিন আনায় ছাত্র যুবক ও জনসাধারণ যেন ব্রতী হয়।

খিদিরপুরে 'অনুশীলন সমিতি'র 'মনসাতলা ক্লাবে' ১৯০৫ সালে স্কুল-কলেজের গ্রীষ্মাবকাশের সময় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। লাঠি ও ছোরা খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ দেখানো হয়। সেখানে ব্যারিস্টার পি. মিত্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, 'প্রায় চারশো বছর আগে এমনি দুর্দিনে বাংলা জেগেছিল। শুধু জাগে নি, দেশের প্রতি কর্তব্যপালনে যা করতে হয় তা করেছিল। তারপর পৃথিবীটা তো এক জায়গায় বসে নেই? ভারতও পৃথিবী-ছাড়া নয়। খালি সেই কি এগোয় নি? মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হোন, সংঘবদ্ধ হোন, মায়ের মুখ চেয়ে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত থাকুন। সব দেশে যুবকরা দেশের সংকট-সময়ে অগ্রসর হয়। প্রতাপাদিত্যের দেশে, তাঁর নাম-স্মরণে এ বিপদের দিনে রোমাঞ্চ যদি না হয় তবে আমাদের 'বাঙালী' বলার অধিকার নেই। যে যুবক নিজেকে বলিষ্ঠ না করবে, আত্মরক্ষার কৌশলে অজ্ঞ ও অপারগ থাকবে—সমাজে তার স্থান হওয়া বাঞ্ছিত নয়। বি. এ., এম. এ. ডিগ্রি গুণ বলে পরিগণ্য না হয়ে, বীরভাব ও বীরের বিদ্যাই গুণ বলে গণ্য হওয়া উচিত।'

সভাভঙ্গের পূর্বে স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষাব্রতী আশুতোষ ঘোষ মহাশয় সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যে, শিখদের 'ওয়া গুরুজিকা ফতে' বা 'সৎশ্রী অকাল'-এর মতো আজ থেকে সকলে সংকল্প করুন যে 'বন্দেমাতরম্'কে উৎসাহধ্বনি রূপে ব্যবহার করবেন।

সকলে কয়েকবার তারস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। তারপর থেকে কয়েকজনের চেষ্টায় প্রতি সভা-সমিতিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। খিদিরপুরের এই সভাতেও 'বন্দেমাতরম্' গাওয়া হয় নি, অর্থাৎ 'বন্দেমাতরম্' গীতরূপে আর একটু পরে এল।* এই সভায় গাওয়া হয়েছিল—

'এসো ফিরে এসো ভারত-আবাসে,
মধুর অতীত পুলকময়।
পূত সামগান এসো তুমি ফিরে
জীর্ণ, পুরাতন দেবতা-মন্দিরে,
স্বদেশের প্রেম হও বহমান,
উথলি' ভারত-জন হৃদয়।'

* ১৮৯৬ সালে বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজে সুর দিয়ে প্রথম প্রকাশ্যে 'বন্দেমাতরম্' গান করেন। তবে গান হিসেবে বন্দেমাতরম সাধারণ্যে প্রচলন হয় আরো পরে।

এতে যে আকৃতি ব্যঞ্জনা পেয়েছে তা লক্ষ্য করার বিষয়। কিন্তু জীবনবেদে যে গান লেগেছে তার সুর বা ভঙ্গী এতে ফোটে নি। এখানেও ভাবের ক্রমবিকাশের দিকটা লক্ষ্য করার বিষয়।

আমরা সদলবলে এখানে উপস্থিত ছিলাম (আমরা ইতিমধ্যে 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দিয়েছিলাম)। 'অনুশীলন'-এর বিভিন্ন শাখা থেকে সভ্যগণ কুচকাওয়াজ করতে করতে সভায় যোগ দেয়। মনসাতলায় 'অনুশীলন'-এর একটি শাখা আগেই হয়ে গিয়েছিল। আমরা হেঁটে হেঁটে হেদুয়া (বর্তমান আজাদ-হিন্দ্ বাগ) থেকে গড়ের মাঠ পার হয়ে যখন খিদিরপুর পোলের কাছে উপনীত এমন সময় মনসাতলার সভাক্ষেত্র থেকে একটি সভ্য এসে 'অনুশীলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশবাবুকে বললেন, আমরা যেন তখনই সভাস্থলে না যাই। কাশী থেকে কে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নাকি জানিয়েছেন যে টহলরাম পুলিসের লোক। তাঁর উসকানি দেওয়া পুলিসের ইঙ্গিতেই নাকি চলছিল। তিনি সভা থেকে নিরস্ত হয়ে চলে গেলে তবে সভার কাজ আরম্ভ হবে। সেজন্য আমরা প্রায় একঘণ্টা পোলের কলকাতার পারে অপেক্ষা করি।

১৯০৫ সালের ৭ই অগস্ট বর্তমান জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদকল্পে কলকাতার টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জন আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয়।

এই সভায় এত লোকসমাগম হয়েছিল—এত মিছিল এসে জুটেছিল যে, টাউন হলে সভা আরম্ভের বহু পূর্ব হতেই তিলধারণের স্থান ছিল না। টাউন হলের বাইরেও মনে হল পুরীর রথের ভিড়। জগন্নাথের রথ মনে পড়েছিল বড্ড সময় বুঝে। সত্যিই একদিন থেকে উলটো-রথযাত্রা আরম্ভ। লগুড়তাড়িত মূক পশুর মতো এদেশের লোক চলেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে। সইতে সইতে সহনশীল উটেরও পিঠ ভেঙে পড়ে। এদেশের লোক আর ঐ হীনভাবে চলতে রাজী নয়। তারা সংকল্প দৃঢ়মতেই করল, সোনার পিঁজরের মোহ ত্যাগ করবে। বাঁচবে মানুষের মতো। মরতে হয়, তাও মানুষের মতো হবে।

প্রাণ-নিষ্যান্দিনী মন্দাকিনী মরা-হাড়ে জীবনের স্পন্দন দিতে নেমে এল! হঠাৎ যেন বাংলার তথা ভারতের জীবননাট্যে পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। সে কী ভাবের বন্যা বইল! মন্ত্রমুগ্ধবৎ চতুঃপার্শ্বে, নিকটে দূরে, কলকাতায় ও মফস্বলে একযোগে আলেখ্য পরিবর্তিত হয়ে চলল। বন্দেমাতরম্...বন্দেমাতরম্...বন্দেমাতরম্— আকাশে বাতাসে সর্বত্র ধ্বনিত হতে লাগল। মাকে ভুলে ছিলাম, এবার মাকে ফিরে পেয়েছি। আর মা ভুলে থাকব না!...মা গো, দীন অকিঞ্চন, অকৃতী সন্তানের সর্ব অপরাধ মার্জনা করে একবার চিররাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে দাঁড়াও! মৃন্ময়ীতে

চিন্ময়ীর আবির্ভাব হোক। আমাদের দেহমনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন অনুভব করি তোমার শক্তি, তোমার মহিমা। মা, মা, মা!...রুদ্ধ-মন্দির হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত মুক্তি-ক্রন্দন দ্বারে দ্বারে ধাক্কা দিয়ে আগল ভেঙে ফেলে দিতে লাগল। সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি ও ভয় অভয়-মাতৃমন্ত্রে তুচ্ছ হল। সবাই যেন ভাববিহ্বল। সর্বশক্তির উৎসের পাষাণ-বন্ধ মুখ যেন এই দিনে হঠাৎ খুলে গেল! দুর্বলতা, আলস্য, দেশহিত-কার্যে শিথিলতাকে আজ থেকে দূরে পরিহার!...এখানেও ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়। পরাধীন দেশে আগে যে প্রয়াস আসে তাকে বলা যাবে ধর্মমিশ্রিত রাজনীতি। পরে আসে সমাজ-অর্থনীতি আশ্রয়ী রাজনীতি।

ইংরেজ রাজনৈতিকতার মরণ কামড় ছাড়ল না। ৩০শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রকার অনুনয়-বিনয়, আবেদন-নিবেদন, বাদ-প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সরকারী কেতায় বৃটিশ সরকার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করল। বাঙালীর হৃদয়ের সবচেয়ে কোমল জায়গায় নির্মম আঘাত লাগল। ক্রিয়া হলে তার প্রতিক্রিয়াও আশা করতে হবে। বাংলা এই দিনকে 'শোকের দিন' বলে গণ্য করল। সঙ্গে সঙ্গে পণ করল এ কালিমা মুছে ফেলবেই।

কলকাতায় গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা ধর্মঘট করল ('হরতাল' কথা তখনও চলে নি)। আমরা এদের মধ্যে কাজ করতাম। সেজন্য মজুররা রাজনীতিক কারণে এগিয়ে এল। ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিকদের ধর্মঘট। কলকাতায় ও মফস্বলে দোকান-বাজার বন্ধ রইল। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল। অরন্ধন ও রাখিবন্ধন পালিত হল। রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের মন্ত্র দিয়েছিলেন—'ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই'। খালি পায়ে সংযতভাবে দিন যাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। বৈকালে সভা-সমিতিতে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী নেতাদের নির্দেশে প্রতিজ্ঞা করল যে, সেদিন হতে বঙ্গভঙ্গ রদ না-হওয়া পর্যন্ত বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ করবে। সারা বাংলায় এরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করা হল।

'ফেডারেশন মাঠে' মহতী সভা হল। মূক-বধির স্কুল ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল মাঠটি। এখানে একটি সারা ভারতের সম্মেলন-ঘর গড়ে উঠবে, নাম হবে 'ফেডারেশন হল'। এই সভায় একটি বড় করুণ ঘটনা দর্শকদের মন গলিয়ে দিল। প্রাচীন নেতা ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু রোগশয্যা থেকে চেয়ারে আনীত হলেন। কী প্রাণস্পর্শী হল সেদিনকার তাঁর ভাষণটি! তিনি বললেন যে, তথাগত বুদ্ধ ভগবানের জন্মের সময় একজন প্রাচীন ঋষি জানতে পেরেছিলেন যে এক মহাপুরুষ আসছেন। তেমনি তিনি আজ জানতে পেরেছেন এক নতুন জাতির জন্ম-সম্ভাবনা। জগতে এর কতবড় সম্ভাবনা ভেবে তিনি আকুল ও আনন্দে অশ্রু-বিগলিত হয়ে পড়ছেন।

সেই সভায় শ্রোতাদের এবং পরদিনের দৈনিক পত্রিকাগুলির মারফত পাঠকদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল। আনন্দমোহন নিজে বক্তৃতা দিতে পারেন নি। তখনকার রাষ্ট্রাধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে ভাষণটি পড়েন। আনন্দমোহন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সভাপতি হবার প্রস্তাব করেন। সভাপতির ভাষণ পাঠের পর একটি ঘোষণা করা হয়। সেটি ইংরেজীতে পাঠ করেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার মূল অংশ—'যেহেতু বাঙালী জাতির একান্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সরকার দেশকে বিভক্ত করছেন, সেজন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে মাতৃভূমিকে অখণ্ড ও জাতীয় একতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। ভগবান আমাদের সহায় হোন।'

যোগ্য কাজে যোগ্যদের অভিনব মিলন!

এখন থেকে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য আরম্ভ ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির দ্বারা সভাভঙ্গের নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। ক্রমশঃ দেশপ্রেম-সম্বন্ধীয় নতুন নতুন গান রচিত হতে লাগল। সুকবি সে সময়কার যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁদের আরাধ্যা দেবীর মন্দিরদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনী ভট্টাচার্য, স্বভাব কবি গোবিন্দদাস, বিজয় মজুমদার, বরদা মিত্র প্রভৃতি জাতীয়-সঙ্গীত-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে থাকলেন। ভাব-জাগরণে অশেষ সাহায্য এল এই দিক থেকে।

এই বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ নীতিকে উপলক্ষ্য করে দেশীয় শিল্পকলা ক্রমশঃ গড়ে উঠতে লাগল ও বেড়ে যেতে লাগল। চরখা, তাঁত, মোজা-গেঞ্জি, পেনসিল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, চীনামাটির বাসন, বালতি, সাবান, দেশলাই, খাম, টিকেটহীন নানাবিধ পোস্টকার্ড, বোতাম, বিড়ি, জুতো প্রভৃতি বাজারে দেখা দিল। সাধারণ জনসভায় চরখার মাহাত্ম্য প্রচার হত—'চরখার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি'।

বহুস্থানে 'পিকেটিং' অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ হল। পিকেটিং অর্থে দোকান-বাজারের সামনে ঘাঁটি করে বিনীতভাবে শ্রোতাদের মন-ফেরানো। পিকেটিং উপলক্ষ্যে যুব ও ছাত্রদের উপর পুলিসের জুলুম চলতে লাগল। কলকাতা শহর ও মফস্বলে এইরূপ নির্যাতিত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনলে শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবেরা খুব চটত ও পুলিস খুব মারত। কলকাতা, জলপাইগুড়ি, রংপুর, ময়মনসিং, বরিশাল, ঢাকা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এইপ্রকার জুলুম বিশেষভাবে হয়েছিল। বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী নুনকে বিশেষ করে বেছে ধরা হয়েছিল এইজন্য যে, এই দুটো একচেটিয়া বিলাতী ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারলে বিলাতী সদাগররা

আপন স্বার্থহানিতে ভারত সরকারের এই দুর্নীতিকে অপছন্দ করবে এবং পার্লামেণ্টে এই বিষয় নিয়ে সুর তুলতে বাধ্য হবে। তার ফলে 'বঙ্গভঙ্গ' উঠে যাবে। কোনো-কোনো আরাম-কেদারা-প্রিয় শখের রাজনীতিক আবার এও বলতেন, 'এই বয়কট-আন্দোলন করে নিজেদের নির্যাতন ডেকে না এনে, মাছের তেলে মাছ ভাজা যেতে পারত। যত আমাদের কাপড়-গেঞ্জি, জুতো-মোজার বরাত (order) ফরাসী, ইটালী ও জার্মানদের দিলে ইংরেজকে পেটে মারা হত। যা শত্রু পরে-পরে হয়ে যেত। ফরাসী, জার্মান, ইটালীর সঙ্গে ঝগড়া করলে তারা এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বসত। কণ্টকেন কণ্টকং উদ্ধারয়েৎ। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। সুরেন বাড়ুজ্যে, বিপিন পাল এগুলোর কি বুদ্ধি আছে!' কেউবা বলতেন, 'বঙ্গভঙ্গ-টঙ্গ কিছু নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের কতকগুলো অপোগণ্ড সন্তানকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়া। এটা নিছক ওদের পেটের ব্যাপার। আর নেতারা যাচ্ছে তাদের পেটে মারতে! এ কখনও সফল হতে পারে? যত নতুন প্রদেশ হবে, তত ওদের লোকরা মোটা মাইনের চাকরি পাবে। এটা বুঝতে তো হয়! সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কিছু লোক প্রতিপালিত হতে পারবে। আমাদের লাভের দিকটায় কেন অন্ধ হচ্ছি?'

যাই হোক, বিলাতী-বর্জন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণের মতো সারা বাংলার হাট-বাজারকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। এ আগুন ছড়িয়ে গেল ভারতের সর্বত্র। ইউ. পি, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র সুন্দর সাড়া দিল। 'বন্দেমাতরম্' মুক্তিমন্ত্র। তাকে যখন পাওয়া গেছে—আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। 'নিশিদিন না বিসরো মালা'। বন্দেমাতরমের জপ, বন্দেমাতরমের তপ, বন্দেমাতরমের ব্রত-আরাধনা হল নতুন জেগে-ওঠা জাতির একমাত্র শরণ ও অবলম্বন। নতুন উষার আলো হৃৎপদ্মকে ফুল্ল, তেজীয়ান করে তুললো।

কলকাতার ও মফস্বলের নির্যাতিত ছাত্রদের বিষয় কলকাতার সকল সভায় বর্ণনা করা হত। শ্রোতাদের অনুরোধ জানানো হত লাঞ্ছিতদের সম্মান করতে এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ করতে। প্রতি সভায় লাঞ্ছিতদের সম্মান করা চলল। অন্যান্য প্রদেশও বাংলার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে লাগল। বাংলার ভাবের-বন্যায় গা ভাসিয়ে দিল। এইখানে ভাববার কথা আছে। শুধু প্রান্তীয় ব্যাপারে গায়ে-আঁচড়-লাগা প্রদেশই মাতবে। কিন্তু নিখিল ভারতের সাড়া, মানে মনস্তত্ত্বর দিক থেকে, সমগ্র ভারতে বিস্ফোরণের অবস্থা আগে থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিল। হুজুগ এমনিই চলতে পারে। কিন্তু উৎপীড়ন ও নিপীড়ন বরণ-করা অগ্রগতি হুজুগে হয় না। খালি হুজুগের দম বেশী নয়।

এইসময় বাংলার সুমুখে মহারাষ্ট্রের একটা বিশেষ সম্মানের আসন ছিল। তার কারণ কতকটা এইরূপ—ভারতে দেশী সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে ইংরেজকে

ছড়িয়ে দিতে মহারাষ্ট্রীয়েরা উদ্যোগী ছিল। তাই কার্যতঃ যদিও বৃটিশ সফলকাম হয়েছিল, তবুও ভারতবাসীরা ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মহারাষ্ট্রীয়দের দেখত ও বিশেষ সম্মান করত। মনে হত অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় মহারাষ্ট্রবাসীর স্বাধীনতাস্পৃহা ঢের বেশী জাগ্রত ও উদ্যত। কেননা তারাও ক্ষুব্ধ-পীড়িত জাতি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ প্লেগ উপলক্ষ্যে সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তাতে জনমত বিক্ষুব্ধ ও বিরূপ হয়ে ওঠে। সেই ব্যাপারে চাপেকার-ভ্রাতাদের আত্মবলি জাতীয় অবমাননার প্রতিশোধ-প্রচেষ্টার (উৎপীড়নকারী র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্ট-কে হত্যা করায়) প্রথম মৃত্যুঞ্জয়ীর রক্তদান বলে পরিগণিত হয় ও শ্রদ্ধা পায়। লোকমান্য তিলক 'পেশোয়া'দের জাত। তাঁর ত্যাগ, তেজস্বিতা, দেশপ্রেম ও সেজন্য রাজরোষে কারাবরণ লোকের কাছে তাঁকে আরও শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু করে তুলেছিল। দেশভক্ত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁর দেশপ্রেম, মেধা ও অসাধারণ যৌক্তিক বিতণ্ডা-শক্তির দ্বারা বৃটিশ সরকারের অনুসৃত সকলপ্রকার অন্যায় কার্যকে কড়া নিন্দা ও তীব্র সমালোচনা দিয়ে দেশবাসীর চোখে ভারতে বৃটিশ-শাসনকে হেয় প্রতিপন্ন করে ছাড়তেন। তা ছাড়া মহামতি রানাডে জনসেবা ও তাঁর অমর গ্রন্থ 'The Rise of the Marhatta Power' (মারাঠী ইতিহাস) দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন। ভারতে আধুনিক যুগে প্রকৃত জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার বনিয়াদ মহারাষ্ট্রীয় বীররা স্থাপন করতে যাচ্ছিলেন ও চাচ্ছিলেন—এ কথা সুন্দরভাবে এই ইতিহাসটিতে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে দেখানো হয়েছে।

'ডেকান সভা' ও 'ফারগুসেন কলেজ' দুটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। তিলক, গোখলের মতো লোক মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনে ফারগুসেন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ত্যাগের প্রতিভায় মহারাষ্ট্র-দেশপ্রেম জ্বলজ্বল করছিল।

দাদাভাই নওরোজির 'Poverty and Un-British Rule in India', ডিগবি সাহেবের 'Prosperous British India', রমেশচন্দ্র দত্তের 'Economic History of India' এদেশের অর্থনৈতিক শোষণ কী শোচনীয় পরিণামে পৌঁছেছিল তা দেখিয়ে দিচ্ছিল। অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক হীনতা ও দীনতা ইউরোপীয়দের কাছে ভারতবাসীকে সামাজিক অপাংক্তেয় করে রাখায় অসন্তোষের বহ্নি ধিকিধিকি জ্বলছিল। আগুনে ইন্ধন পড়া বাড়ল বৈ কমল না। এই পটভূমির উপর রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্লব জমে উঠছিল। খুব ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাপূর্ণ ভারতীয় স্বাধীনতা-সমরের গভীরতম প্রদেশে দানা বেঁধে উঠেছে আর একটা জিনিষ। স্বদেশী ও বিদেশী সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ থেকে তলে তলে তার উৎপত্তি। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় ভারতীয় নেতা, যাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব বলা হয়, মহাত্মা গান্ধী, বিদেশী

কৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক। তিনি বিলাতী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার। ওদেশের নাচগানে দীক্ষিত। কিন্তু একি দেখি তাঁকে। মুণ্ডিত মস্তক, মাথায় টিকি, কটিবাস, খালি গা, খড়ম পায়ে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তীব্র বেগ ধারণ করে তাকে প্রত্যাহত করতে যেন এক প্রবল তপস্বীর আপ্রাণ চেষ্টা।

জগতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ আর এক প্রতীক। বাল্যকালে বিলাতে যান। সেথায় তিনি ওদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে মানুষ হন। কিন্তু পরিণত হয়ে বেরুলেন এক ভারতীয় ঋষি। কে এলেন এই নতুন প্রহ্লাদ! তাঁর পিতা তাঁকে খাঁটি সাহেব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি হয়ে গেলেন খাঁটি ভারতবাসী।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে তবে আন্দোলনের প্রকৃত ও সম্যক্ স্বরূপ ধরা পড়বে।

স্বাদেশিকতার বন্যায় সাহিত্য পরিপুষ্ট, সম্পন্ন ও শক্তিশালী হল। বাংলাভাষা তেজের কথায় অসম্পন্ন ছিল। রাগ বা উচ্ছ্বাস এসে পড়লে বঙ্গভাষীরা হিন্দি বা ইংরেজীর বুক্নি না ছেড়ে পারত না। 'কুচ্‌পরোয়া নেহি', 'খুন কর্ দেগা', 'ডাণ্ডাসে ঠাণ্ডা কর্ দেঙ্গে', অথবা 'Shut up', 'I will kick you down', 'Knock out his brains' খুব চলত।

কখনও বা হিন্দি ইংরেজী মিশ্রিত বুলি চলত। যেমন 'মারকে flat কর্ দেগা'। কেউ ভাবতে পারত না তেজালো ভাবের বাহন অনর্গল বাংলা কখনও হতে পারবে। সে দৈন্য দূর হল বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্মিতার অপ্রত্যাশিত ও অত্যাশ্চর্য শৌর্যশালী ভাষায়। 'যুগান্তর' কাগজ হল তেমনি ভাষার আর একটি বৈপ্লবিক বাহক। অদ্ভুত এ কাগজের শক্তিশালী লেখাগুলি। সাধারণতঃ মানুষের মনে ভাব জমেছে, প্রকাশ করার শক্তি বা ভাষা নেই ; অথবা প্রকাশ করার ভাষা সুষ্ঠু নয়। ভঙ্গী অপটু। কিন্তু কেউ যদি সেই ভাবকে যথোপযুক্ত ভাষা দিতে পারে, অবলীলাক্রমে সকলের মনকে সে গ্রেপ্তার করে ফেলবে। বলা ও লেখার ভিতর দিয়ে সমসাময়িক মনকে এত সুন্দর ও চমৎকার ভাবে এই দুই বাহক ফুটিয়ে তুলেছিল যে, যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত একটা মহাগ্লানি অবলীলাক্রমে স্বল্পকালে সূর্যোদয়ে তমঃ-র মতো দূর হয়ে গিয়েছিল। 'যুগান্তর' ও বিপিনবাবু যে অসাধারণ জনাদর লাভ করবেন তা বলা বাহুল্য। একটা কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, বিপিন পালের বক্তৃতা আর যুগান্তরের ভাষা বাংলায় 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে ভেসে যায়' যুগ আবার ফিরিয়ে এনেছিল।

খুব সাধারণ লোকদের মনকে তেমনি পেয়ে বসেছিল 'সন্ধ্যা' কাগজ। এর 'মাস্তিক' বা শিরোনামা এবং সম্পাদকীয় লেখার ঢং সত্যি একটা নতুন জিনিষ ছিল।

এ লেখায় অল্প-শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিতরা 'মন বাঁধা, প্রাণ বাঁধা' কিছু মাল পেয়ে যেত। 'লে মাটি দে চাপা', 'সুশীলের তুড়ি লাফ', 'ফিরিঙ্গীকে বলায় বাপ', 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে', 'কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা', 'ক্ষুদে-লাট ফুলার', 'লাঠি খটাখট বম ফটাফট' ইত্যাদি যখন কাগজ-ফেরিওয়ালার আকাশ-ফাটানো গলায় বেরুত, সে কী ভিড় জমে যেত তার চারপাশে একখানা 'সন্ধ্যা' দৈনিক খরিদ করতে! টিনওলা, ছুতোর মিস্ত্রী, কামার-কুমার, ছোট দোকানদার কে না কিনত এ কাগজ? একটি কাগজের চারপাশে অসাধারণ ভিড় নিয়মিতভাবে দেশের খবর শুনত। 'সন্ধ্যা' কাগজের জনপ্রিয়তার দিক থেকে উপরিউক্ত চিত্র দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও একে মুখরোচক হিসাবে যথেষ্ট সংখ্যায় পড়তেন। সাহেবরা এর ওপর ভারী চটা ছিল। কেননা 'সন্ধ্যা' তাদের ফিরিঙ্গী ছাড়া অন্য আখ্যায় বর্ণনা করত না। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এ কাগজের প্রতিষ্ঠাতা খুব সাফল্য লাভ করেছিলেন। সাধারণের ভিতর নতুন দেশপ্রেম ঢোকাতে ও ছড়াতে এ কাগজ ছিল অদ্বিতীয়।

'যুগান্তর'-এর লেখা ছিল আর এক ধরনের। উচ্চ ভাব, সাবলীল পুষ্পায়িত ভাষা—তীব্র তেজস্বিতা, সুন্দর দার্শনিক তত্ত্ব, অগ্নিময়ী উদ্দীপনা ও চমৎকার তথ্য-বিশ্লেষণ।

স্বাদেশিকতায় উৎপ্রাণনা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল কতকগুলি গান। তাদের পরিচিতির জন্য কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—

'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখো রেখো মনে এ ধ্রুব-জ্ঞান।
যাঁহার সলিলে মন্দাকিনী চলে, অনিলে মলয় সদা বহমান॥'

রচয়িতা কালীঘাটের গিরিন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে', 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার' পরে ঠেকাই মাথা', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'আমার যায় যাবে জীবন চলে—শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ ব'লে', 'দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে, এসো চণ্ডী যুগান্তরে'। তা ছাড়া 'আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ', 'মা-ই মোদের রাজা, মা-ই মোদের রানী'। কামিনী ভট্টাচার্যের 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সুদর্শনধারী মুরারি', 'শাসন-সংযত কন্ঠ জননী, গাহিতে পারি না গান'। গোবিন্দ দাসের 'স্বদেশ-স্বদেশ করিস কারে, এ দেশ তোদের নয়' একটি মন-মাতানো কবিতা। হেমবাবুর 'বাজ রে শিঙা, বাজ এই রবে—সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে'—এটি অনেক সভায় আবৃত্তি করা হত বা গাওয়া হত। 'বন্দেমাতরম্' তো সব সভায় উদ্বোধন-গীত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার দেশ' সুরে ও ছন্দে একদম

নতুন। শোভাযাত্রায় গাওয়ার পক্ষে এর উপযোগিতা অসাধারণ। গাইতে গাইতে গায়ক এবং শুনতে শুনতে শ্রোতারা উন্মাদনায় মেতে উঠত। অন্তে 'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ' গানও গায়ককে কোন্ এক নতুন লোকে নিয়ে যেত। দ্বিজেন্দ্রলাল পরে আর একটি গান দেন 'ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে—স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। কবিত্বে, পদ-লালিত্যে, কমনীয় ভাবে, উৎপ্রাণনায় এসব গানের জুড়ি নেই। কল্পনায় বঙ্গসন্তান কোথায় উড়ে চলেছিল অনুভূত হবে যখন 'পঞ্চাশ বছর পরে' শীর্ষক একটি ছবি বিচার করা যাবে। বাংলামায়ের দুলালরা এ পর্যন্ত আদরের পুতুলটি ছিল। শিল্পী ভাবনেত্রে দেখেছেন পঞ্চাশ বছরে এদেশে কী ভয়ানক ওলট-পালট হয়ে যাবে। ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে, এ যেন অতি সাধারণ ব্যাপার। বোন সাজিয়ে দিচ্ছে। মা আশীর্বচনে বিদায় দিচ্ছেন। ঘোড়া পাশে দাঁড়িয়ে। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে'—এ ভাববাণীতে কী অপূর্ব নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস! এত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল এ ছবিখানি যে, এ ছবি যে কেনে নি সেদিন সে 'বিফলে দিন গোঙায়েছে' বললে অত্যুক্তি হবে না। এ ছবিটি অনেকের মানস-পুত্তলির কাজ করত। ঠিক তারিখের পর তারিখ ধরে রোজনামচার মতো ঘটনাগুলি না দিয়ে, যুগের শক্তিগুলি ও ঝোঁকসমূহের খেলা চিত্রিত করাই বেশী সমীচীন বোধ করছি। ইংরেজের প্রতি রাজভক্তি, যা একদিন কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রতি একান্ত অনুরক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ক্রমশঃ তা টলে যেতে লাগল। কারণ অনেকগুলি বিশ্বাস ভক্তির তহবিল তছরূপ করা একটি মুখ্য কারণ। লাট কার্জন মহারানীর একটি আদেশ বা ফরমানকে লঘু-হৃদয়তার সঙ্গে উড়িয়ে দিলেন। উচ্চপদে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আবশ্যকীয় গুণসম্পন্ন যে-কোনো ভারতবাসী প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন—এই ছিল মহারানীর ঘোষণা। লাট কার্জন কূটতর্কের অবতারণা করে সে অর্থকে উড়িয়ে দিলেন। ইংরেজের সংস্রবে ভারতের লোকেরা একদিন উৎফুল্ল বোধ করেছিল। এবার সে স্থান নিল সংশয়, ব্যক্তিত্বের দুঃখ, অনর্থক হীনতার ছাপ; রাজ-আজ্ঞার মাঝে ফাঁকির অস্তিত্বে এল জ্বালা। আস্থার জায়গায় এল অনাস্থা। 'একসঙ্গে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি আর হয় না'—সে ঝগড়া আলাদা রকমের। দাম্পত্যজীবনে তা হয়ত খাটে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে তার জায়গা কোথায়? একদিকে স্বার্থ, নিছক স্বার্থ। আর একদিকে 'ভয়ে ভজি কি ভক্তিতে ভজি, ঠিক বলতে পারি না'। যেখানে মূলেই সম্পর্কটা এইরূপ, সেখানে মুহ্যমান অবস্থা কেটে গেলে থাকে কি? পরাধীন রাষ্ট্রকে পণ্ডিতরা যে যাই সংজ্ঞা দিন না কেন, বাস্তবে দেখা যায় এটি হচ্ছে একটি জবরদস্তি বা নিপীড়নের কলকাঠি। সেই কলকাঠি যার হাতে সে-ই

শাসক বা শসক-শ্রেণীর লোক। সম্পর্কটা বিকট। তবু এটাকে মধুমণ্ডিত করা বুদ্ধিমানের কাজ—বিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিকরাই করে থাকেনও। লাট কার্জনের সে বালাই ছিল না। তিনি যেটাকে বুদ্ধির চাল স্থির করেছিলেন তা গুণ হয়ে দোষে দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর বুদ্ধিবলের ফন্দী দাঁড়িয়ে গেল বাহুবলের ফন্দী। ফলও হল তেমনি। 'The timid Bengalee has been turned into a ferocious tiger' (Gokhale)—নিস্তেজ বাঙালী হয়ে গেল ভীষণ বাঘ। কুসুম-পেলব বাঙালী বজ্রাদপি কঠোর হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রুশ-বিজয়ী জাপান প্রাচ্যে আত্ম-মর্যাদা অসম্ভবরূপে বাড়িয়েছিল। জাপানীরা বলতে লাগল, 'আমরা ভিতরটায় যা ছিলাম তাই আছি। কিন্তু যেদিন ঝাঁকে ঝাঁকে রুশদের হননকার্যে কৃতকার্য হলাম, ইউরোপ-আমেরিকা আমাদের জাতে তুলে নিল। আমরা আর অসভ্য নই। পুরোদস্তুর সভ্য।' তাহলে সভ্যতার মাপকাঠিটি কি হল?

১৯০৫ সালে রুশদেশে একটা বিদ্রোহ হল। প্রবল-প্রতাপান্বিত জার বা রুশ-সম্রাট 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' করলেন। রুশিয়ার প্রজারা কিছু ক্ষমতা নিজেদের হাতে পেল। প্রথম পার্লামেণ্ট বা ডুমা প্রতিষ্ঠিত হল। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে উত্তর সীমান্তের আফ্রিদীরা, দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়াররা এবং তাদের সেনানী ডিওয়েট্ প্রাচ্য এশিয়ার 'নব-সভ্য জাপান' এবং মহারুশের জাগরণ পরপদানত, শোষণ ও বন্ধন জর্জরিত ভারতের পক্ষে মাত্ (leaven) [তখন আমরা লেনিন, স্টালিন, ট্রট্স্কির খবর জানতাম না] হয়ে দাঁড়াল। ময়দা মেখে তাতে মাত্ দিলে, ছোট তালটি ফেঁপে-ফুলে মস্ত হয়ে ওঠে। এমনি করে না পাঁউরুটি তৈরি হয়? ভারতের মনে লাগল মাতুনির ঢেউ। অবস্থা না থাকলে ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না। শাসকশ্রেণীর 'দয়াল প্রভু'রা অবস্থা বেশ অনুকূল করে গড়ে তুলে রেখে-ছিলেন। সেজন্য তাঁরা জাতির কাছে নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। আঘাতের পর আঘাত দিয়ে তাঁরাই তো মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে তুললেন। মোহমুদ্গরের কাজ করেছেন তাঁরাই।

ভেবে চিন্তে দেখতে গেলে একথা অস্বীকার করার যো নাই যে দুজন ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁদের শিষ্যদের ভিতর দিয়ে বাংলা তথা সারা ভারতকে নব স্বাদেশিকতায় মাতিয়ে তুলে ছিলেন—তাঁরা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দর কথা সকলের বিদিত। বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যরা (আমার মাস্টারমশায় প্যারীবাবুর কাছে শোনা ইনিও বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন) ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুন্দরীমোহন দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডন্ সোসাইটির সতীশ মুখার্জি ভারতের অভিনব রঙ্গমঞ্চের অতি প্রসিদ্ধ অভিনেতা। স্বামিজী যেমন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন তেমনি ব্রজেন শীল ১৮৯৯ খৃঃ ইটালীর 'Orientalist Congress'-এ যান এবং সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে নিরতিশয় যশস্বী হন। বিপিনবাবু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা আনার কথা বলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মনে আগুন ধরে যেত বিপিনবাবু যে-সময় সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে উঠে বলতেন, 'মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে আয়োজন ও প্রয়োজনে মিলিয়ে যখন দেখি সংকল্প করা হয়েছে অথচ নৈবেদ্য যথেষ্ট নয়, তখন ভাবি দেশে আগুন লেগে গেছে—কিন্তু অভিভাবকদের মুখের দিকে তাকালে চলবে না। গ্রামে আগুন লাগলে লোকে কি করে? বালতি, কলসী, টিনের বিচার রাখে কি? তোমরা কি আসবে না ভাই, ওই গোলামখানার মোহ কাটিয়ে? ওই একখানা চোতা কাগজের লোভে আকাশচারী হয়ে শুধু ভাগাড়ে দৃষ্টি নিবন্ধ করে থাকবে? বয়কট্ করো ওদের স্কুল-কলেজ। ইংরেজ জেলে দেবে? ইংরেজের জেলটা কত বড় ভাই? বাংলা দেশটার চেয়ে কি বড়? ওদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মিথ্যা—মোহ, ভ্রান্তি।'...সমগ্র জনতা নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধবৎ। মনে পড়ছে সে সময়ের মনোভাব সবাই অনুভব করত—তখন যদি ইংরেজের সৈন্য ও পুলিস এসে গুলী-গোলা চালাত, একজনও বোধহয় পালাত না। সবাই দাঁড়িয়ে মরত। 'দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি, কে পালাবে মা ফেলে?'

প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজ একবার নয়, তিনবার বয়কট্ করা হয়। মুশকিল হল নেতাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়ে। বিপিনবাবু মনে করতেন বিশ-ত্রিশ হাজার ছেলে যদি লেখাপড়া ছেড়ে দেয় ইংরেজ আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। এত তরুণ না-জানি ভিতরে ভিতরে কী করছে ভেবে মুসড়ে পড়বে। পথে আসবে। বঙ্গভঙ্গ রোধ সোজা হয়ে যাবে। সুরেন্দ্রনাথের মত ছিল অন্যরূপ। তিনি ভাবতেন ইংরেজ শিরীষ ফুলের ন্যায় নরম নয় যে এত সহজে ম্লান হয়ে যাবে। তারা এরকম কিছুই করবে না। উলটে অপরিণত মনের ছেলেরা রাজদণ্ডে ভেঙে পড়বে। অভিভাবকদের সহানুভূতি হারিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দ্রুত শিথিল হয়ে যাবে। তিনি বললেন, 'ফেরো। যাও, যে-যার পড়ার জায়গায় ফিরে যাও।' তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, ছেলেরা লেখাপড়া ছাড়লেই ইংরেজ ভড়কে যাবে। তাঁর আস্থা ছিল অর্থনৈতিক চাপে। তাতে ইংরেজ নিশ্চয় জব্দ হবে। স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনকে বুঝতেন অমোঘ অস্ত্র। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তখনকার দিনে সবচেয়ে বড় নেতা। বিপিনচন্দ্র উঠতি নেতা। ছেলেদের কাছে বিপিনবাবু নিত্য প্রিয়তর হয়ে উঠছিলেন। বড়দের কাছে সুরেন্দ্রনাথ। তাঁরা বলতেন, 'বিপিন পাল ভাবাতিশয্যে চলে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে সর্বদা যুক্তিযুক্ত, বাস্তবের পূজারী।' ছেলেদের মাঝে বিপিনবাবুর লোকপ্রিয়তা বোঝা যায় যখন কোনো-কোনো অভিভাবক দুঃখ করে অভিযোগের সুরে বলতেন, 'ছেলেগুলো কথা শোনে না মশাই, অবাধ্য

হয়ে গেছে। বিপিন পাল বললে এখনই লাঠি ধরবে। বাড়ির দিকে যদি একবার তাকায়, কি সংসারের একটা কাজ করে!'

আমি পড়তাম ডাফ কলেজিয়েট স্কুলে। আমাদের স্কুলে ওপরের দুটো ক্লাসে টমরি, আর্কুহার্ট ও ওয়াট্ সাহেব পড়াতেন। ওয়াট্ ফলিতবিদ্যা বা কর্মশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রতি ক্লাসের দেওয়ালে একটা কালো দাগ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে ইংরেজী ও ফরাসী মাপ লেখা ছিল। এক মিটার=৩৯·৩৭ ইঞ্চি। একরকম বলতে গেলে সব সময় একটা করাত হাতে করে ঘুরতেন। (টমরির বেত-হাতে করে ঘোরার চেয়ে ঢের ভালো।) মনে হল গ্যালারির এ দিকটা একটু লাইন ছেড়ে আছে—ঘস ঘস করে দিলেন তার মাথা চিরে। কিম্বা মাঝখানটা ফাঁক করে দিলে ছেলেদের আসা-যাওয়ার সুবিধা হয়—অমনি চলত করাত ঘস-ঘস-ঘস। মাঝ দিয়ে সুন্দর একটি পথ হয়ে গেল। বেঞ্চিটা মনে হচ্ছে একটু উঁচু—হয়ে গেল তার অ্যাম্পুটেশন বা পদচ্ছেদ।

বিপদ হত হঠাৎ যখন জিজ্ঞেস করে বসতেন, 'এই দরজাটা কত চওড়া?' কিম্বা, 'এই জানলা কত লম্বা?' অথবা 'এই হলটা কত বড়?' চোখে দেখে টপ্ করে বলে দিতে হবে। মাপজোখ চলবে না। ঐ কালো দাগটি কি জন্যে দেওয়ালে আঁকা রয়েছে তবে? 'মাটির পৃথিবীতে বিচরণ করছ, মাথাটি বায়ুলোকে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না।' পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল রেখে, তাল রেখে চলতে হবে তাঁর ছাত্রদের।

ভূগোল ছিল তাঁর প্রাণের জিনিষ। ভূ-বৃত্তান্ত বললে কথাটা স্পষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তপশীলভুক্ত ভূগোল নয়। সে তো অপর মাস্টারে পড়াতেন। তিনি রকম-বেরকম ম্যাপ টাঙিয়ে স্বেন হিডেনের ভ্রমণকাহিনী খণ্ডের পর খণ্ড পড়িয়ে যেতেন। 'পামির প্লেটো' বললে চটে যেতেন। বলতে হবে 'পামির প্ল্যাটো'। 'জেপান' বললে ধমক খেতে হবে। বলতে হবে 'জ্যাপ্যান'। ম্যাপ কতরকম হতে পারে, ম্যাপ পাঠ করার অভ্যাস ও সংঘবদ্ধ জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা পরে বোঝা গিয়েছিল। আমরা তাঁকে বলতাম 'গোঁসাইজি'। কারণ তিনি এণ্ডির পোশাক ভালবাসতেন। প্রায় তাই পরতেন। চেলি, গরদ-তসরের স্থলাভিষিক্ত হচেছ এণ্ডি। তাই তাঁকে বলা হত গোঁসাইজি। বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গেলে একটা সুরাহা হয়েই যেত। 'হোয়াট্স্ দি ম্যাটার, বোইজ?' বলে একবার যদি তিনি সম্ভাষণ করতেন তাহলে আমরা বুঝতাম আজ কেল্লামাৎ! একটু ধর্মিষ্ট ছাড়া আর কোনো দোষ ছিল না তাঁর। কথা দিলে প্রাণ দিয়ে তা রাখতেন।

একবার স্কুল-কলেজ বাড়ির খেলার মাঠ থেকে ফুটবলটি ছিট্কে দেওয়ালের

ওপারে চলে যায়। ওপারে ছিল কয়েকটি আস্তাবল। সহিস-কোচোয়ানরা প্রথমটা ছেলেদের দিল বকুনি—কেন তাদের ঘোড়া ভড়কে যায়? তারপর বলল, তারা ফুটবল চোখে দেখে নি। বলের খোঁজ তারা জানে না। নিমতলা স্ট্রীটে যেখানে আজকাল জোড়াবাগান থানা (মাঝে কিছুদিন জোড়াবাগান পুলিস-কোর্টও হয়েছিল), ঐ বাড়িতে ছিল ডাফ কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল। সাহেবরা থাকতেন আধুনিক স্কটিশ চার্চ কলেজ পার হয়ে আরও খানিকটা পুবে। ওয়াট্সাহেবের কাছে ছেলেরা গেল। আমি ছিলাম মুখপাত্র। বিকেলে স্কুল ও কলেজে পড়িয়ে সাহেব বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর খেলা আরম্ভ হয়। তারও পরে ছেলেরা গেছে। ছেলেরা দারোয়ানের হাতের স্লেটে লিখে দিল তাঁর কয়েকটি ছাত্র তাঁকে সসম্মানে স্মরণ করেছে। সাহেব বিশ্রাম ছেড়ে তখনি উপস্থিত। মুখে সেই অভয়বাণী—'হোয়াট্স্ দি ম্যাটার, বোইজ?' বৃত্তান্ত শুনে ছেলেদের নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে বললেন। তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে গেলেন। কোচোয়ানরাও ত্যাঁদোড়। বল দিল না। সাহেব পুলিস ডাকিয়ে বল উদ্ধার করলেন। কোচোয়ানরা আর কখনও গোল করে নি। শান্ত প্রতিবেশী হয়ে গেল। ওয়াটসাহেব ছাত্রবন্ধু হয়ে রইলেন। তাঁর সম্মানে লেখা হল—'ইতিহাসের পরিহাস নাহি মিলে রস। তোমা-হেতু ভূগোলের একচেটে যশ।' কথাটি খাঁটি সত্য। টমরির তুলনায় তাঁর চরিত্র-চিত্রণে বলা হল—

'রুক্ষ-দৃষ্টি, আর তব অশনি-হুংকার
কশার অধিক ভীতি করয়ে সঞ্চার।'

সাহেব এ লাইন দুটি পড়ে নিজেকে সহমত স্বীকার করেছিলেন। অশনি-হুংকারটি প্রকৃত প্রস্তাবে ছেলেদের প্রতি না হয়ে মাস্টারদের প্রতি বিশেষ প্রযোজ্য ছিল। ছিটকিনি লাগিয়ে টেবিলে পা তুলে গল্প-করা তাঁদের ঘুচেছিল। সাহেব হঠাৎ ক্লাসঘরে এসে পড়তেন। অবশ্য টমরির পর যখন তিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট হন তখন।

স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। প্রায়ই সভা-সমিতি লেগে থাকত। 'সাহেব ছুটি দিন, মিটিং-এ যাব' বললেই ছুটি পাওয়া যেত। সে বিষয়ে টমরিও ছিলেন ভালো। একদিন কিছু উপলক্ষে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র ছাত্ররা মিছিল করে এল 'ডাফ'-এর সামনে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সংকেতের কাজ করল। টমরি সাহেব ছুটি দিলেন। বৃষ্টি পড়ছিল। ওরিয়েন্টালের ছেলেরা ভিজছে দেখে বললেন, 'ওদের ভেতরে আসতে বলো। যে রকম কাচকাচারা ভেজাভেজি করে কষ্ট পাচেছ—কার্জনের এতে পাপ হবে নিশ্চয়।'

আর্কুহার্ট সাতে-পাঁচে থাকতেন না। তিনি বলতেন, 'পরের চিন্তাকে নিজের চিন্তা বলে না চালিয়ে, নিজের জন্য নিজে চিন্তা করবে।' একদিন একটি ছেলে

পড়া বলতে গিয়ে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আর্কুহার্ট বললেন, 'এ তুমি পেলে কোথায় ?' ছাত্রটি বলল—'রসময়বাবুর অর্থ-পুস্তকে।' রসময়বাবু হিন্দু-স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। সাহেব জবাব দিলেন, 'রসময়বাবু একথা বলতে পারেন। কিন্তু, তুমি নিজে কি বলছ ?—Rasomay Babu may say so. But what do you say ?' তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা করতে শেখাতেন।

এর মধ্যে দু'বার স্কুল-কলেজ বয়কট্ হয়ে গিয়েছে। এবার তৃতীয়বার হল। বিপিনবাবু বললে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ছাত্ররা সেই কাজ করে বসত। আবার সুরেনবাবু বড়কর্তা বললে, তাঁর কথাও রক্ষা করতে হত। ফিরে আসতে হত। এত ঘন ঘন সংকল্প ও বিকল্প বহু ছাত্রের ভালো লাগত না। স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ পেয়ে যেতেন মজা। ক্রমশঃ কঠোরতর নিয়ম-শৃংখলার ব্যবহার সুরু করলেন—মাপ চাও, জরিমানা দাও, রাস্টিকেট হও ইত্যাদি।

বিপিনবাবু বললেন, 'স্কুল-কলেজ ছাড়ো ; জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমরা গড়ব।' সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও দেশনায়ক আশুতোষ চৌধুরীর শরণাপন্ন হওয়া গেল। তিনি এর আগেই বর্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বলেছিলেন, 'আবেদন, নিবেদন এসব হচ্ছে ভিখারী মনোভাব। এ দিয়ে কিছু হবে না। এ নীতি সর্বথা বর্জনীয়। আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।'

সুরেন্দ্রনাথও 'যৌবন-জলতরঙ্গ' রুধতে অক্ষম হলেন। পান্তির মাঠের বক্তৃতায় (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সামনে, এখন ঐখানটায় বিদ্যাসাগর কলেজের বোর্ডিং হয়েছে) ঘোষণা করলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবে। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পণ্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ঘৃণা-উৎপাদক অনেক কথা বললেন। ওর সার্টিফিকেট বা চোতা কাগজের মোহ কাটাতে বললেন। যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চায় তাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা চাইলেন। বললেন, 'বিনা টাকায় তো বিশ্ববিদ্যালয় হবে না ? নেতারা টাকা তুলবেন। তোমরাও টাকা আনো। অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী যার কাছ থেকে পার চেয়ে, ভিক্ষে করে অন্ততঃ দশটাকা করে এনে দিতে হবে।' ছাত্রেরা পরখ ঘাড়ে তুলে নিল।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বনেদী মল্লিকবাড়ির সুবোধচন্দ্র মল্লিক সভাপতি ছিলেন। তিনি সভায় ঘোষণা করলেন যে তিনি উক্ত তহবিলে একলক্ষ টাকা দেবেন। 'ধন্য ধন্য' পড়ে গেল চারদিক থেকে। কৃতজ্ঞ জনসভা তখনি তাঁকে 'রাজা' খেতাব দিল। তিনি হৃদয় জয় করে রাজা হলেন। সরকারী খেতাব ঘৃণার পণ্য। দেশের লোকের দেওয়া খেতাব সম্মানের উপাধি। রাজা সুবোধচন্দ্রের গাড়ির ঘোড়া খুলে সভাস্থ লোকেরা গাড়ি টেনে নিয়ে গেল তাঁর বাড়ি পর্যন্ত। তখনও মোটরগাড়ি ওঠে নি। এই গাড়ি-

টানার নেতৃত্ব করেছিলেন জাপান-ফেরত রমাকান্ত রায়। ১৯০৫ সালের ৯ই নভেম্বর পান্তির মাঠে সভা হয়। পরে এই শিক্ষা পরিষদে মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আলকাতরা দিয়ে কে লিখে দিয়ে এল To Let—এইটি ভাড়া দেওয়া যাইবে।

আশুতোষ চৌধুরী অপর এক সভায় বললেন, 'খতিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা এখন সম্ভব নয়।' সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন' (জাতীয় শিক্ষা-মণ্ডলী) স্থাপিত করা স্থির করলেন। ছাত্রদের মন ভাঙল এতে। কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি, আর কোথায় তার একটা সস্তা অনুকরণ!

প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমি আমার এক কাকার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আমার কাকা অর্থ সাহায্য করতে রাজী হলেন—কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন যে, আমরা ভ্রান্ত পথে যাচ্ছিলাম। জাতীয় শাসনতন্ত্র না হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষা নির্ভর করে। সব দেশের শাসনযন্ত্র সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষানীতি প্রবর্তন ও প্রচলন করে। এদেশে গোলামি কায়েম রাখা হচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রের স্বার্থ। ইংরেজ সরকার সর্বপ্রকার বাধা দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা পণ্ড করে দেবে। তার চাইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিকে মন দিলে একদিন স্ব-রাষ্ট্র গঠনে সুবিধা হবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, পরাধীন অবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে যা চালানো হবে, তা হবে বিলাতী মালের দোকান। শুধু সাইনবোর্ডটা পালটে লেখা হবে। ওরকম ভেজাল মালে বিশেষ কিছু উপকার হবে না।

ছাত্র ধর্মঘট ভাঙল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ছাত্রেরা স্কুল-কলেজে ফিরল। মনের মতো না হওয়ায় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে' খুব কম ছাত্রই যোগ দিল। ডাফ স্কুল ও কলেজে কয়েকদিন ধরে পূর্ণ ধর্মঘট চলেছিল। বোর্ডিং-এর ছাত্রেরা ঐ বাড়িতেই বাস করত। তাদের পরিস্থিতি ছিল ভারী মুশকিলের। সে বেচারিরা খেয়ে-দেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াত। সাহেবরা বাইরের ছেলেদের পেতেন না, ঘরের ছেলেদেরও না। এবার ফিরে আসতে ছাত্রদের কাছ থেকে কৈফিয়ত চাওয়া হতে লাগল। অমন সহানুভূতিসম্পন্ন সাহেবরা দেখা গেল বিগড়ে গেছেন। টমরিসাহেব সুপারিনটেন্ডেণ্ট হিসেবে স্কুলের ছাত্রদের কৈফিয়ত নিচ্ছিলেন। আমাদের ক্লাসে ঢুকে বললেন, 'তোমরা এ কয়দিন কেন আস নি ? স্কুল তো বন্ধ ছিল না। কৈফিয়ত দাও।' এক একজনকে ধরেন। যে যা বলে, একটা ডায়েরির মতো ছোট খাতায়

টুকতে থাকেন। অনেকে বলল, 'পরীক্ষা আসছে, পড়া তৈরি করছিলাম।' সাহেব প্রতিপ্রশ্ন করলেন, 'এটা কি একটা কৈফিয়ত হল? ঐ কৈফিয়তেরও একটা 'কৈফিয়ত' দরকার।'

আমি বললাম, 'আপনি তো জানেন ছাত্র ধর্মঘট চলছিল। এখানে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় সেটা কারুরই অভিপ্রেত নয়। তাই আসি নি।'

সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে রইল, 'হাঁ, এটা একটা অপ্রত্যাশিত কৈফিয়ত।' তারপর আমার কথাটি খাতায় লিখে নিলেন। এর পরেই একটি ছাত্র জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনি এসব নাম ও বিবৃতি কাকে দেবেন?' প্রশ্ন শুনেই সাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'অশিষ্ট বালক! তুমি বলতে চাও আমি পুলিসের লোক! এতবড় অসম্মান তুমি আমায় করলে? কাকে আবার দেব? এসব আমার কাছে থাকবে।' সাহেবের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। একটু থামলেন। রঙও একটু বদলাল। তারপর তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের তিনটে পাপ হয়েছে। তোমরা অভিভাবকদের কাছে অপরাধী। স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে অপরাধী। ভগবানের কাছে অপরাধী। অভিভাবকেরা জানেন তোমরা ছাত্র, লেখাপড়া নিয়ে থাক এবং নিয়মিত স্কুলে আস ও যাও। সেখানে তাঁদের প্রত্যাশা নষ্ট হয়েছে। স্কুল খোলা ছিল, কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কামাই করেছ। ভগবান চান তোমরা নৈতিক বলে বলীয়ান হও, কর্তব্যপরায়ণ হও। তোমাদের সেখানেও পা পিছলেছে। তিনি তোমাদের মাফ করুন! তাহলে সকলের মাফ পাওয়া হবে। চতুর্থতঃ, তোমরা দেশের নেতা সুরেন্দ্রনাথের সহায়ক না হয়ে বাধাস্বরূপ হয়েছ। এখান দিয়েও তোমাদের বিবেক অ-দুষ্ট নয়। অতঃপর আর যেন এরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়!' এই বলে সাহেব বিদায় নিলেন। এর বেশী কিছু করলেন না।

কিন্তু 'জেনারেল অ্যাসেমব্লি'র প্রিন্সিপাল কয়েকজন এম. এ. ক্লাসের ছাত্রকে বরখাস্ত করলেন এবং অন্যদের কিছু পরিমাণ জরিমানা করলেন।

জেনারেল অ্যাসেমব্লির বাড়িতেই এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ অবস্থিত। ডাফ ও জেনারেল অ্যাসেমব্লি দুই কলেজ মিলে হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এবার ছাত্র-সমিতির কথায় আসা যাক্। বাংলায় স্বদেশীর বান! কিন্তু যোগান দেবার মতো দেশী মাল ছিল না বাজারে। বোম্বাই-এ যে কয়েকটি কাপড়ের কল হয়েছিল, বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় সেগুলি ফেল্ হবার উপক্রম হয়েছিল। নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই তাদের কল্যাণের জন্যই যেন এসেছিল স্বদেশী আন্দোলন। তারা এক টাকার মালকে চার টাকায় বেচতে সুরু করল। কাপড়ের পাড় ভালো নয়। ধোপে টেকে না। জমি বেজায় মোটা। খদ্দর তার কাছে অনেক ভদ্দর। লাল কল্কাপাড় ছিল তাদের মার্কা-মারা পাড়। কালো পাড় ধোপার বাড়ি গিয়ে 'মামার বাড়ির বাড়াবাড়ি আদরে' আত্মহারা হয়ে যেত। নিজের জায়গাটিকে বাদ দিয়ে গোটা 'জমি'টাকে করত কালোয় কালো। কী অসাধারণ কৃষ্ণপ্রীতি! মা-বোন, পিসিমা-মাসিমাদের হাতে-পায়ে ধরে স্বদেশী-বর্জন বন্ধ রাখতে হত। নৌকার পালের মতো মোটা কাপড় প্রথম ভাব-যৌবনে ভাসমান ছাত্রদেরই পরতে হত। বেশ মনে পড়ে একজোড়া 'পাল' আমার ভাগ্যে পড়েছিল। কোমরে কষি থাকত না কিছুতেই। কষি দিয়ে কাপড় প'রে, তার ওপর কোমরে দড়ি বেঁধে দেশপ্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতাম।

এই অবস্থায় শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের উৎপত্তি হয়। বিধবা পিসি-মাসিদের হাতে-পায়ে ধরে ছাত্রেরা শেয়ার কিনিয়েছিল। বাংলার বড় আদরের বড় গৌরবের এই প্রথম কাপড়ের কল! শোনা যায় আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির সময়ে নাকি একটি কল হয়েছিল, এবং আঁতুড়ে সেটি মারা যায়। সে স্বদেশী যুগের বহু পূর্বের কথা।

ছাত্রদের কাজ ছিল, যেদিকে জল পড়ে সেদিকে ছাতা ধরা। কাপড় সবাইকে পরাতে হবে। কাপড় জুটছে কম। উপায়? ছাত্র-সমিতি মিটিং করে স্থির করল, যত কম কাপড় পরা যায় তার ব্যবস্থা করা যাবে। তাহলে কাপড় অন্যদের জন্য কুলাবে। স্থির হল ছাত্রেরা পরবে ঢিলা পায়জামা ও একটি শার্ট। এর বেশী কিছু নয়। রসরাজ অমৃতলাল যে বলেছেন 'কাছাকে কাছা, কাছা দুগুণে গামছা'—কথাটা ঠিক। ছাত্ররা ধুতিতে কাছা ও কোঁচায় যে কাপড়টা যায়, সেটাকে বাঁচাতে চাইল। একখানা ধুতিতে হবে দুটো পায়জামা। তাহলে যেখানে দুটো ধুতি লাগছিল সেখানে লাগবে একটা। বাকিটা অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে। সমাজের অবস্থায় লুঙ্গির চলন চিন্তনীয় ছিল না। চাদর বা উড়ানি ব্যবহার নিষিদ্ধ হল। এ পর্যন্ত 'চাদর-নিবারণী সভা' পূর্ণ সফলতা লাভ করে নি। এইবার চাদর গেল।

রিপন কলেজের শচীন বসু ('ব্যবসায় ও বাণিজ্যের' সম্পাদক অবস্থায় ১২৪২ সালে মারা যান) ছিলেন ছাত্র-সমিতির প্রভাবশালী নেতা। তিনি বেশ বলিয়ে-কইয়ে

লোক ছিলেন। 'ছাত্র ইউনিফর্ম' কিছু লোক পরল। লোকলজ্জাকে সকলেই এড়াতে পারে নি। শচীনবাবু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর (বি. এ.-র) ছাত্র ছিলেন। আদর্শবাদী হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি হয়েছিল যথেষ্ট। তিনি শার্ট-পায়জামায় বিভূষিত হয়ে ছাত্রদের সভায় দাঁড়িয়ে যখন বলতেন 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' তখন ছাত্রদের মনেপ্রাণে নবভাবতরঙ্গ খেলে যেত।

গ্লানিভরা প্রাণে তরুণরা কেউ কেউ মনে করত, 'হে বিধাতা, আমায় পরাধীন ভারতবর্ষে—বাংলাদেশে, বাঙালীর ঘরে জন্ম দিলে কেন? এখানে পরাধীনতার গ্লানির চেয়ে তার ভিতরকার ন্যক্কারজনক ঘৃণিত কাহিনী বেশী দাবদাহ সৃষ্টি করে। কী করে এ পাপ তাপ মুছে যাব, সে পথ দেখিয়ে দাও। ঐ যে তুমি বলেছ—'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—সে কি শুধু কথার কথা? ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে সর্বপ্রকারে—আচারে, বিচারে, ভাষায়, ভূষায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরাধীন করে যে রেখেছে সেটা কি দুষ্কৃতি নয়? আজ বুঝি তোমার মনে পড়েছে তোমার যুগযুগান্তে করা অঙ্গীকার! তাই কি স্বদেশী আন্দোলনের বেশে এলে? যদি এসেছ—আমাদের তোমার উপযুক্ত সহচর করে নাও। পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন যথাবিধি করে যেতে পারি। সে বল-বুদ্ধি, ভরসা দিয়ো।'

পলাশী যুদ্ধের কলঙ্কের কথা তাদের মনকে পীড়া দিত।

আমরা অনেক সময় স্বামী কেশবানন্দের কথা স্মরণ করতাম। তিনি বলতেন, 'ভারতের সবখানটাই পবিত্র। খালি এই বাংলা ছাড়া। সর্বত্র দেশের জন্যে প্রাণ দিয়ে লোক ধন্য হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা সমরের অগ্নিহোত্রী, হোতা ও ঋত্বিক্ সব প্রদেশে বেরিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যবৈগুণ্যে তারা বিফলপ্রযত্ন হয়েছে। এবার বাংলার পালা। বাংলা এবার যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করবে সে আর নিভবে না! তার লেলিহান শিখা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে। ধন্য মনে করো তোমরা তোমাদের। তোমরা আজ নিখিল ভারতের মুক্তিগঙ্গা বহিয়ে আনতে নির্বাচিত হয়েছ।'

তিনি আরও বলতেন, 'কতকগুলি বিশেষ আত্মা মূর্তি পরিগ্রহ করে, যখন যেখানে গোলামি হয়েছে তখন সেখানকার গোলামি ঘোচাতে। তোমরাই আমেরিকার স্বাধীনতা সমরে ছিলে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে ছিলে। ইটালির স্বাধীনতা সমরে তোমাদের ভাগ নিতে হয়েছিল। এবার এসেছ ভারতের মুক্তি ছিনিয়ে আনতে। নিজেদের যোগ্য করো। নিজেদের তৈরি করো।'

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম—খণ্ড খণ্ড করে স্বাধীনতা সমরগুলোকে দেখতে নেই। সবগুলোকে মিলিয়ে ধরতে হবে একটা। এগুলি যেন ইমারত

তৈরির আলাদা আলাদা উপাদান সংগ্রহ। সবগুলো জুটলে দাঁড়াবে একটা বিশাল সৌধ। মানব সভ্যতার প্রকৃতির উপর জয় স্থাপনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হবে সেটা। সব ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মিলে দাঁড়াবে একটা জগৎ-জোড়া কাণ্ড। মানুষ সেদিন প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হবে। সেদিন হবে সত্যকার বিজয়োৎসব।

আমাদের বাড়িতে আসতেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। লোকে ছেলেদের ঠাট্টা করলে তিনি তাদের রক্ষা করতেন। একদিন বিডন উদ্যানে সভার পর বহু লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, 'এসব হুজুগ করে কি হচ্ছে? মন দিয়ে লেখাপড়া করো গে যাও। নিজেদের দিন কিনে নাও গে।' আমি বিনীতভাবে নিবেদন করলাম, 'সব দেশে তো পরাধীনতার পাশ কাটতে চেষ্টা ক'রে তবে সফলতা এসেছে। এ দেশে আপনা-আপনি কি করে আসবে?' তিনি বিরক্ত হলেন। বললেন, 'অন্য দেশের কথা ছেড়ে দাও। এ দেশের প্রত্যেকটা লোককে বাজিয়ে নিলে বেরুবে যে কি!' নেতাদের নাম ধরে বললেন, 'সবাই আপনার আপনার সুবিধা খুঁজছে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে চাচ্ছে লাট-বেলাটের মতো একটা বড় চাকরি। বিপিন পালকে একটা 'রেজিস্ট্রার' করে দিলে হয়ে যাবে ঠাণ্ডা। আরে! পদমর্যাদা বলো আর যাই বলো, আসলে জিনিষটা হচ্ছে 'পৈটিক' ব্যাপার।' সবটার তিনি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করলেন। আমি প্রতিবাদ জানালাম। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের পূর্ব অবস্থা যা আমার জানা ছিল তার সঙ্গে ভারতের অবস্থার তুলনা করলাম এবং দৃঢ়তার সঙ্গে মোলায়েম ভাষাতে বললাম ভারতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। যুগলক্ষণ দেখা দিয়েছে। ভদ্রলোক গেলেন ক্ষেপে। রেগে কাঁপতে কাঁপতে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'ছোকরা, বেশী বোকো না। এসব খেয়াল ছেড়ে দাও।'

মানুষের কেমন স্বভাব, একটা শেষ আবেদনের জায়গা চায়। আমাদের বাড়িতে যে বৃদ্ধটি আসতেন তিনি ছিলেন কতকটা আমাদের হাইকোর্ট। আপীলে জুড়ুবার জায়গা। বড্ড জ্বালা ধরলে তাঁকে সব জানাতাম। আমি বিডন বাগানের ঘটনা তাঁর কর্ণগোচর করলাম। তিনি বললেন, 'বালকরা শুধু অপরিণত মানুষ, এইরকম করে না-দেখে দৃষ্টিটা একটু বদলে নিলে ভারী সুন্দর সব নতুন তথ্য জ্ঞানগোচর হয়। ফাগুনের পাগলা হাওয়া, আষাঢ়ের মেঘ, কার্তিকের হিম, পৌষের কুয়াশা আপাত-দৃষ্টিতে খালি হাওয়া, মেঘ, হিম, কুয়াশা। কিন্তু তার চেয়ে বড় পরিচয় এদের রয়ে গেছে যেটা লোকে তলিয়ে দেখে না। তারা এক-একটা ঋতুর অগ্রদূত। বালকরা যে যুগবার্তাবহ, নবযুগের অগ্রদূত—এ কথা আমরা ভুলে যাই। ভুল বিচার করে ভুলে পড়ি। মানুষের জীবনগুলোর মধ্যে একটা অন্বয় আছে। একটা ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্য আছে। সব গতির একটা লক্ষ্য আছে একটা স্থিতির পানে। তাছাড়া আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে সবটার ইঙ্গিত আছে। বিশ্বপিতার চার ছেলে—চার বর্ণ।

তারা প্রত্যেকে বাপের বিষয় ভোগ করবে বৈকি ? ব্রাহ্মণ প্রাধান্য করেছে। তারপর এসেছে ক্ষত্রিয়। এখন যাচ্ছে বৈশ্যের দিন। তোমরা এসেছ শূদ্রের হক্ প্রতিষ্ঠিত করতে। সকল-সহ সকল-বহর এবার হবে সুদিন। তাকে কি কেউ রুখতে পারে ?'

এর মধ্যে পূর্ববঙ্গে 'লায়ন সারকুলার' ও পশ্চিমবঙ্গে 'কার্লাইল সারকুলার' ছাত্রদের উপর জারী হল। মোদ্দা কথাটা হল এই—'ছাত্রেরা অধ্যয়নরূপ তপে সর্বদা নিরত থাকবে। তারা কোনরূপ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দেবে না। 'বন্দেমাতরম্' বলবে না। (মূর্খের মতো কোনো-কোনো শ্বেতাঙ্গ বন্দেমাতরম্-এর অর্থ করত 'বেঁধে মার'।)' স্কুল-কলেজের অধিকারীদের জানানো হল তাঁরা এদিকে যেন শ্যেনদৃষ্টি রাখেন। নচেৎ তাঁদের সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে।

ছাত্ররা যথাবিধি উত্তর দিল। 'অ্যাণ্টি-সারকুলার সোসাইটি' স্থাপন করল। (এর সভাপতি হলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং সচিব হলেন শচীন্দ্রনাথ বসু।) সভা-সমিতিতে তারা যথাপূর্ব যোগ দিতে লাগল। 'বন্দেমাতরম্' বলা ছাড়ল না। কলেজ স্কোয়ারের পূর্বধারে একটি ঘরে অ্যাণ্টি-সারকুলার সোসাইটির আফিস হল। স্বদেশী দ্রব্যের একটি দোকান খোলা হল। ত্রিরঙ্গা পতাকা দিন-রাত উড্ডীন রাখা হল। 'অ্যাণ্টি-সারকুলার সোসাইটি' কথাটা বড় বড় হরফে লিখে একটা সাইনবোর্ডও দরজার উপর লট্কে রাখা হল। এ ছাড়া ছাত্রভাণ্ডার স্থাপিত হল বিপ্লবী কাজ চালাবার জন্য। চুনি নন্দী, পবিত্র দত্ত এটির বিশেষ কর্মী ছিলেন। তাছাড়া নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে 'যুবক-মণ্ডলী' স্থাপিত হয়। স্থাপয়িতা কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ঋষিকল্প স্টিফেনসাহেব এইসময় ডাফ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এখানে প্রতি ঘণ্টার শেষ পাঁচমিনিট ক্লাসগুলির ছুটি হত। ছাত্রেরা এই ছুটিগুলিতে তারস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করত। সরকার জানাল, যদি কলেজ-কর্তারা তাঁদের শর্ত না মানেন, তাহলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হবে। স্টিফেনসাহেব উত্তর দিয়েছিলেন—স্কুল-কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখা অবশ্য তাঁদের কাজ। স্কুল-কলেজের বাইরে ছেলেরা কী করে না-করে তার জন্য তাঁরা দায়ী হবেন না। এতে যদি সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, যাবে। তাঁরা এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্কটল্যাণ্ড) সঙ্গে কলেজকে মিলিয়ে রাখবেন। সরকার এ অরুচিকর উত্তরে আর কিছু করেন নি। মাস্টারদের কারু কারু কাছে এ খবরটি শুনেছিলাম। মিঃ এ. এল. সিং নামে এক খ্রীষ্টান মাস্টার ছিলেন। তাঁর কর্ণকুহরে 'বন্দেমাতরম্' বিষ উদ্গিরণ করত। একদিন ঐ পাঁচ মিনিটের ব্যাপারে স্কুলের নীচের ক্লাসের একটি ছেলেকে কয়েক থাপ্পড় লাগালেন। পরদিন আমরা ছাত্র-সমিতির তরফ থেকে ধর্মঘট করেছিলাম। স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং হল শূন্য। গেটে জড়ো হওয়া ছেলেদের সাহেবরা ভিতরে ডাকলেন। কেউ গেল না।

তারা স্কুলে ঢুকবে না। স্টিফেনসাহেব নিজের বাসায় ডাকতে, কেউ আপত্তি করল না। সেখানে উভয়পক্ষের বিবৃতি ও সাক্ষ্য নেওয়া হল। সিং-এর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড ও পনেরো দিন স্কুল-আসা বন্ধ (সাসপেণ্ড) হল।

আমার বন্ধু শরৎ ঘোষের সহায়তায় আমি স্কুলের উপরের চার ক্লাস নিয়ে এবং কলেজের ছয়টি ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে 'সুহৃদ সমাজ' স্থাপন করি। মাসিক চাঁদা ছিল চার পয়সা। উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সংখ্যক লোককে আমাদের ভাবে প্রভাবান্বিত করা যায় ততই ভালো। সেইজন্য চাঁদার হার এরূপ কম রাখা হয়েছিল। এই চাঁদা থেকে আমরা 'যুগান্তর' পত্রিকা বিপন্ন হলে কয়েকবার অর্থসাহায্য পাঠিয়েছি। বার্ন কোম্পানিতে ধর্মঘট হলে (১৯০৭ সালে) সাহায্য পাঠিয়েছি। তাছাড়া আতুর ও দরিদ্রের সেবায় এখান থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হত।

ছাত্রদের আগ্রহাতিশয্যে ও প্রয়োজনবোধে ১৯০৬ সালে গ্রীয়ার পার্কে (সারকুলার রোডে মূক-বধির বিদ্যালয়ের পাশে) এক বিরাট জনসভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ও সনির্বন্ধ অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সকলের প্রাণস্পর্শ করে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। লাল, হলদে ও সবুজ ঐক্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দ্যোতক। ঘোড়ায় চড়ে এক যুবক এই পতাকাটি বহন করে আনেন। এরপর 'অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটি'তে এই পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল। কতবড় অভাব যে পূরণ হয়েছিল মনের জগতে এর দ্বারা, তা লিখে জানানো যায় না। মনে পড়ে একদিন একটি ক্লাসে পড়াতে পড়াতে মাস্টারমশায় সব স্বাধীন জাতের জাতীয় পতাকা দেখাচ্ছিলেন। সব পতাকা দেখানো শেষ হল। হতাশায়, ঔৎসুক্যে একটি ছাত্র সসম্মানে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্যার, আমাদের জাতীয় পতাকা তো দেখালেন না? সেটি কী রকমের?' গভীর খেদে ও দুঃখে শিক্ষকমহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমাদের পতাকা নেই, পরাধীনদের জাতীয় পতাকা থাকে না।' ছেলেদের মনে শেলের মতো সে কথাগুলি বিদ্ধ হয়েছিল। বার বার ঘুরে-ফিরে এই প্রশ্নটাই মনে আসছিল— পরাধীনদের কি জাতীয় পতাকা থাকতে নেই? দেশের সঙ্গে মমত্ববোধক, দেশবাসী সবার সঙ্গে একত্ববোধক এই চিহ্নটি। এটিও থাকবার জো নেই! একেও আমাদের রাখবার জো নেই! হায় রে দুর্ভাগ্য! জাতীয় পতাকার ইতিহাস এইরকম—ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী যুবজনের মন হরণ করেছিল। এদিকে জাতীয় পতাকার অভাবটা বোধ হচ্ছিল। ছাত্রদের এক সভায় এ বিষয়ে এক সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ছাত্রসংঘের নেতা শচীন বসু এ বিষয়ে অবহিত হন। ১৯০৬ সালে ফরাসী পতাকার অনুকরণে ত্রিবর্ণ পতাকার ছাপ পড়ল কর্মকর্তাদের মনে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর একটা নমুনা দেখানো হয়। বিশিষ্ট কিছু লোকের পরামর্শে ত্রিবর্ণ পতাকার কোলে প্রথম লাইনে আটটি প্রদেশের প্রতীক আটটি শ্বেতপদ্ম বসানো

হয়। তখন বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উন্মাদনা দেশকে মাতিয়ে চলেছে—সেজন্য মাঝখানে 'বন্দেমাতরম্' লেখা হল। নীচের লাইনে রইল সূর্য ও অর্ধচন্দ্র। ৭ই অগস্ট বয়কট্ দিবসের বাৎসরিক উৎসব হয় গ্রীয়ার প্রাঙ্গণে। সেখানে বন্ধু নরেন সেন একটি প্রার্থনা করেন। এমন সময় যতীন বসু অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটি থেকে একটি জাতীয় পতাকা উড্ডীন অবস্থায় ঘোড়া-ছুটিয়ে ঐ সভায় সমুপস্থিত। ভূপেন বসু সুরেন্দ্রনাথকে ঐ পতাকা সভায় উচ্চ দণ্ডে উত্তোলিত করতে অনুরোধ করেন। সুরেন্দ্রনাথ চমৎকার একটি বক্তৃতার সঙ্গে ঐ পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকা ঐ বৎসর কলকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই-এর সভানেতৃত্বে উড্ডীন করা হয়।

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রায় ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঐ পতাকা 'জাতীয় পতাকা' বলে প্রদর্শিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসে। এই পতাকার রঙ ছিল লাল, পীত ও সবুজ। বঙ্গভঙ্গ রদ হলেই এই পতাকার ব্যবহার উঠে যায়। সে সাল হচ্ছে ১৯১১।

সংঘবদ্ধ ছাত্ররা একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াল। কোথাও কিছু করতে হলে এখন আর ভাবতে হয় না। ছাত্রদের প্রধান কেন্দ্রে খবর কোনরকমে একবার পৌছোতে পারলেই হল। চট্ করে কলের মতো কাজ হয়ে যায়। যা দেশের পক্ষে শক্তি তা-ই বিদেশী শাসকদের পক্ষে গ্রন্থি। এই 'ছাত্রসংঘ'কে ভাঙা হল তাদের স্বার্থ। তাদের হিসেবে ভুল হয়েছিল। এত সহজে একে ভাঙা চলে না। 'ছাত্রসংঘ' শুধু ছাত্রদের সাময়িক একটা সংগঠন হলে তা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু এ-যে ছিল সমাজদেহে পরাধীনতার বিষ-প্রতিষেধক শক্তির বিকাশ। এর রূপ পরিবর্তনশীল। কিন্তু এর গতি কেউ নিরোধ করতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ মাঝে মাঝে যবনিকার অন্তরালে চলে যাবে। সে ক্ষণিকের জন্য। আবার আর একরকম সাজে বাইরে আসবে। তাছাড়া ছাত্রসংঘের শক্তির উৎস বাহ্যতঃ ছিল এর কর্মকেন্দ্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ছিল অন্যরূপ। 'অনুশীলন' ও 'আত্মোন্নতি সমিতি'তে চলে গিয়েছিল এর মূল শিকড়। সেখান থেকে রস টেনে এ বাঁচছিল—বাড়ছিল। (মথুরায় যখন দেশের শত্রু মরবে, তার পূর্বে গোকুলে এ শক্তি বাড়বে বৈকি!) বরিশালে 'স্বদেশ-বান্ধব সমিতি', ময়মনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমিতি' ছিল। আরও কয়েকটি সমিতি দেশে জেলায় জেলায় ছিল। যথা—'সন্তান সমিতি', 'শক্তি সমিতি', 'ব্রতী সমিতি'। সব সমিতিই কম-বেশী একই ধরনের কাজ করছিল। সে কাজ দেশপ্রেমদ্যোতক।

পুলিস কোনো একটা অজুহাত পেলেই ছাত্রদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। প্রথমে দলে দলে পিকেটারদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন বসু মাঝে পড়ে লালবাজার থেকে অনেক ছাত্রকে ছাড়ালেন। মেডিকেল কলেজের একটি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র (তখনকার দিনে পাঁচ বছর পড়তে হত) বড়বাজারে পিকেটিং করতে

গিয়ে অন্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়। গ্রেপ্তার হলে ছাত্র-যুবকরা খুব জোরে জোরে পুনঃ পুনঃ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করত। পুলিসের লোকেরা আরও চটত। যে কয়জন যুবক গ্রেপ্তার হয়েছিল তার মধ্যে এই ছেলেটি ছিল বেশী শিক্ষিত। সেজন্য যত মার তার উপর পড়ল। এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী মারছিল। সে মারতে-মারতে বলল, 'এবার তোমার 'বন্দেমাতরম্' কোথায় রইল ?' ডাক্তারী ছাত্রটি ধীরে ধীরে বীরের মতো উত্তর দিল, 'আমার বুকের ভিতরে।' ফলে আরও মার চলল। সে কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' ছাড়ল না। পরে সে ছেলেটি মেডিকেল কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এই অপরাধের জন্য। তখন মাত্র একটি মেডিকেল কলেজ। জুলুমের প্রতিকার ছিল না। ছেলেটির নাম আজ আর ঠিক মনে নেই। বোধ হয় হরিশ্চন্দ্র সিংহ হবে। কিছু যুবকের জেল হয়েছিল। জেল-যাওয়া ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজার পিকেটিং-এ আরম্ভ। সুরেশ বসু নামক এক যুবক ভবানীপুর থেকে তিন মাসের জন্য জেলে যান। ফিরে এসে তিনি তাঁর কারাকাহিনী পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। কী আগ্রহ নিয়েই না সে বইখানি পড়েছিলাম ! তাতেই প্রথম পড়ি 'সিগ্‌মান (sick man)', 'কাণ-বিলাসী', 'তিন-কাপড়া' যথাক্রমে 'রোগী', 'আরোগ্যপ্রাপ্ত (convalescent)' এবং জাঙিয়া, কুর্তা, টুপি। মনে হত এমনটি আমার কবে হবে ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বদেশী আন্দোলন দেশবাসীর প্রাণে কী নতুন স্পন্দন জাগিয়েছিল! মাতৃজাতি কাঁচের চুড়ি ত্যাগ করে বিদেশী ঐ পণ্যকে খতম করে দিলেন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—মোটা কাপড় বিলিতী শৌখিন কাপড়ের বাজারকে দমিয়ে দিল। খদ্দর তো ১৯২১ সালে এসেছে। প্রতি সভাস্থলে স্তূপীকৃত বিলিতী ধুতি ও শাড়ি পোড়ানো হত। এ এক নতুন হোমের সৃষ্টি হল! তাঁত ও চরখার প্রচলন হল। রোজার্স-এর বিলিতী ছুরি ছাড়া একদিন চলত না। সে স্থান নিল কাঞ্চননগরের ছুরি। ডসন ও ল্যাটিমার ক্লীকের বিলিতী জুতো ছাড়া আর কিছু পায়ে উঠত না। সে-সব গেল চুলোয়। বারবেরিক্যান, বিলিতী গেঞ্জি ছাড়া আর কিছু গায়ে উঠত না। সেখানে খিদিরপুরের এবং মাদ্রাজের মোটা দেশী গেঞ্জি। সিগারেট নইলে যেখানে পোষাত না, সেখানে স্থান পেল দেশী বিড়ি। বিলিতী মিহি গুঁড়ো নুনের জায়গায় এল সৈন্ধব ও করকচ। অনেকাংশে এনামেলের থালা, বাটি, গ্লাস উঠে গেল। জায়গা নিল কাঁসা-পিতল। দেশী বোতাম, চিরুনি, সেলাইয়ের সুতো বাজারে উঠল।

পথে-ঘাটে দেখা হলে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে উভয়পক্ষ হাত তুলে নমস্কার করে বলত 'বন্দেমাতরম্'। এর আগে এ জিনিষটা ছিল না। এ তো গেল সমাজের শালীন অংশের কথা। এমন কি বারবনিতারাও স্বদেশী-গ্রহণ ও বিলাতী-বর্জনে সাড়া দিয়েছিল।

বরিশালে অশ্বিনীবাবু ছিলেন অদ্বিতীয় জননেতা, যাঁকে বলতে হয় জনসাধারণের —হিন্দু ও মুসলমানের নেতা। শহর ও গ্রামে তাঁর প্রভাব হল অপরিসীম। সাধারণ লোকের উপর এরূপ প্রভাব আর কারও দেখা যায় নি। বরিশালে স্বদেশী চলল খুব জোর। বিদেশী-বর্জন হল সাফল্যমণ্ডিত। লোকে বলত সাহেব-সুবোরা অশ্বিনীবাবুর লেখা 'পাস' না পেলে একটুকরো কাপড় কিম্বা একছটাক নুনও দোকানে কিনতে পেত না। ওখানকার সাফল্য নাশ করার জন্য গুর্খা দিয়ে দমননীতি চলতে লাগল। অশ্বিনীবাবু ও তাঁর 'স্বদেশ-বান্ধব সমিতি' সংঘর্ষ মাথা পেতে নিলেন। অশ্বিনীবাবুকে 'ক্ষুদে লাট' ফুলার নিজের স্টীমারে ডেকে ভয়প্রদর্শন করেন।

'অশ্বিনীবাবু ও ফুলার' সংবাদ একটু খুলে বলি। ১৯০৬ সালে বরিশালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন' হয়। সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। পূর্ববঙ্গে সরকারের চীফ সেক্রেটারি ইস্তাহার দিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি বেআইনি ঘোষণা করেন এবং সভা-সমিতি বন্ধ করে দেন। আইন না বদলে এরকম হুকুম দিলে সেই হুকুম হয়ে যায় আইন-অসঙ্গত। সেজন্য এই আইন

অমান্য করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তখনি ব্যারিস্টার জে. চৌধুরী গিয়ে রাজসাহি ও পাবনায় নাগরিক স্বাধিকাররক্ষার্থে 'বন্দেমাতরম্' বলান ও সভা করান। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে নিয়ে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে আসেন।

বরিশালের বেলায় স্বয়ং ফুলারসাহেব অশ্বিনীবাবুকে নিজের স্টীমারে ডেকে বললেন—তাঁরা যদি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা না করেন তবে সভা হতে দেওয়া হবে। সময় আর ছিল না। কলকাতা ও সারা বাংলার অভ্যাগতরা রওনা হয়ে পড়েছেন বা পড়ছিলেন—তেমন সময় সভা-বন্ধ অনভিপ্রেত মনে হওয়ায় অশ্বিনীবাবু ফুলারের কথায় রাজী হন। পরে সুরেন্দ্রনাথ ঢাকা থেকে আনন্দ রায় প্রভৃতির সঙ্গে এসে পৌঁছলে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সব জেলার প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছোলেন। তাঁরা 'বন্দেমাতরম্' বলে তখনই আইন ভঙ্গ করে ফলভোগ করতে রাজী। বরিশালের অভ্যর্থনা-কমিটি প্রদত্ত কথার কি হবে? তাঁদের সম্মানরক্ষার্থে সুরেন্দ্রনাথ এই নির্দেশ দিলেন—অভ্যর্থনা কমিটির কথা রক্ষা করে তাঁরা নিঃশব্দে নামবেন; কিন্তু পরদিন রাজপথ দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করে সভাস্থলে যাবেন।

সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মিছিল হল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি চলল। সভামণ্ডপে প্রতিনিধিরা উপনীত হলেন। পথে লাঠি চলায় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ আহত হলেন। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর দুশো টাকা অর্থদণ্ড হয়েছিল। সেদিনের বীর ছিল দেশনেতা মনোরঞ্জনবাবুর সুযোগ্য পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা। যতই লাঠি পড়ে তার উপরে ততই সে 'বন্দেমাতরম্' বলে। অবশেষে পুকুরে পড়ে যায়। তবু পুলিস লাঠি চালানো ছাড়ে না। অবশেষে সে অচৈতন্য হয়ে যায়।

সেদিন সত্য হল কবির কথা:

'ভাঙবে ওরা যতই জোরে, গড়বে তুলে দ্বিগুণ ক'রে
ধর্ম যতই দলবে তত ধুলোয় ধ্বজা লুটবে
ওদের ধুলোয় ধ্বজা লুটবে।...'

'ক্ষুদে লাট' কথাটা সেদিন 'সন্ধ্যা' এইজন্যে বলেছিল যে, একে তো বাংলার লাট ছিলেন ছোটলাট—তার হুন্দো কেটে করা হল দুটো। তাহলে এক ছোট, অপর হবে কি? তাই সমস্যার পাদপূরণ: ক্ষুদে। ছোটরও ছোট।

সভায় প্রায় তিনশোর উপর মহিলা সমবেত হয়েছিলেন। তখনকার দিনে আইন-অমান্য সভায় মহিলারা এসে স্থান নিয়েছিলেন ভাবলে যুগপৎ হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয় এবং বাংলার মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানে মন ভরে ওঠে।

সত্যই প্রথম দিনের সভা আইন-অমান্য করেই হয়েছিল।

ময়মনসিংহের স্বাধীনচেতা জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী দাঁড়ালেন

দমন নীতির বিরুদ্ধে। পরমোৎসাহে স্বদেশী আন্দোলন চালনায় ব্রতী হলেন। লোকের মুখে মুখে শোনা যেত 'ক্ষুদে লাট' তাঁকে নাকি ডেকে বলেছিলেন, 'এসব বৃটিশ-বিরোধী নীতি ছাড়ো। নইলে মহারাজ, তোমায় পথের ভিখারী করে ছাড়া হবে।' মহারাজ তাঁর যোগ্য এবং উচিত জবাব দিয়েছিলেন, 'তাতে খেদ নেই। আমার দেশবাসীরা আমায় অন্তরে-অন্তরে 'মহারাজা' করে রাখবে।' অবশ্য এ আমার শোনা কথা। লোককে দেখে লোক পথ চলে। অশ্বিনীবাবু ও মহারাজা সূর্যকান্ত লোক-সংগ্রহার্থে মস্ত দুটি চরিত্র। এঁদের আদর্শে বহু লোক এগিয়ে পড়ল। এবংবিধ সংবাদ মুখে মুখে ও কাগজের মারফত যতই প্রচারিত হতে লাগল লোকের অন্তরে তত উত্তেজনা জাগতে লাগল। দমন-নীতি প্রথম চোটে ব্যর্থ হল। লাঞ্ছিতের সম্মান লোক-হৃদয়ে বানের জলের মতো বৃদ্ধি পেতে লাগল।

দেশী দ্রব্যের প্রচলন ও বিলিতী বর্জন অব্যাহত রাখতে হলে দেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য চাই পুঁজি। জাতীয়-ভাণ্ডার খোলার প্রয়োজন বোধ হল।

১৯০৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের কথা। বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাটির বিশাল প্রাঙ্গণে সভা ডাকা হল। একদিনে সত্তর হাজার টাকা চাঁদা উঠল। সেদিনের ভাণ্ডারে শ্রেষ্ঠ দান দিল দীন ভিখারী অন্ধ চিন্তামণির। সে তার ভিক্ষালব্ধ একটি টাকা সেই সমারোহ ব্যাপারের মধ্যে যখন দান দেয় তখন কী হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল সভার মাঝখানে! স্বাদেশিকতার ডাক জাতির প্রাণের মূলে শিকড়টিকে কিরকম টান দিয়েছিল তা এর থেকে বোঝা যাবে।

বর্তমান 'যাদবপুর টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট' এই টাকার সার্থকতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব বললেই তো তোলা যায় না? 'ওঠ্ পুঁটি, তোর বিয়ে' বললেই কি এতবড় ব্যাপার সমাধা হয়? বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের উপযুক্ত শিল্পী সব কোথায় পাওয়া যাবে? Council for the Advancement of Industrial and Scientific Education স্থাপিত হল। জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের সুযোগ্য পুত্র হাইকোর্টের উকিল যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ হলেন তার প্রধানতম উদ্যোক্তা। এখান থেকে অর্থসাহায্য বা যাতায়াতের জাহাজ-ভাড়া দিয়ে উমেদার ছাত্রদের জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপে পাঠানো হতে লাগল। কৃতী ছাত্ররা ফিরে এসে গড়ে তুলবে আবশ্যকীয় কলকারখানা। জাপান এমনি করে নিজের শিল্প প্রতিষ্ঠান একদিন গড়ে তুলেছিল। জাপানের আদর্শ চোখের সামনে তখন জ্বলজ্বল করে চমক দিচ্ছিল।

রুশ-বিজয়ী জাপান এশিয়ার গৌরবে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হলে তারা 'বাণিজ্যাবাস' এদেশে খুলেছিল। কলকাতায় তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মিনাকাওয়া কোম্পানি'। ক্লাইভ স্ট্রীটে আর. সি. গুপ্তর দোকানের পাশে হল

তাদের অফিস। প্রথম ম্যানেজারের নাম ছিল নিশি দে। মাঝবয়সী লোক। তার পরে এলেন কমবয়সী হাসাগাওয়া। তিনি রুশ-যুদ্ধে লড়েছিলেন। জাপানী ফৌজে ক্যাপ্টেন ছিলেন।

স্বদেশী দ্রব্য আমাদের দেশে কতটুকুই-বা তখন হত! খিদিরপুরে বগুড়ার নবাবের একটি গেঞ্জির কারখানা ছিল। আর তো কিছু কলকারখানা আমাদের ছিল না। সেজন্য প্রথম ধাক্কায় কিছু জাপানী মাল গ্রহণ করতে হয়েছিল। সস্তার মোজা-গেঞ্জি, লেড পেনসিল, রবারের ঈরেজার দেওয়া পেনসিল, ছাতার বাঁট, ক্যানাঙ্গো ওয়াটার, কিছুটা সাবান, এসেন্স প্রভৃতি।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতিলাল ঘোষ চরখা ও তাঁত প্রচলনের বাণী দেন এবং বিশেষ চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজের পাশে (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) তাঁত-চরখার স্কুল খোলা হয়েছিল।

জাপানের দাবি ছিল দুটো। তারা এশিয়াবাসী। সেজন্য প্রথম সুযোগ দেওয়া হবে ভারতকে। দ্বিতীয় পালা গাইবে এশিয়া, ইউরোপ নয়। অপর দাবিটা বীরপূজার নৈবেদ্য। তারা রুশের সঙ্গে লড়ে জিতেছে, মানে ভারতেরও সে-জেতায় ভাগ আছে। এমনি প্রাচ্যে-প্রাচ্যে টান প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে।

সমাজতত্ত্বের মধ্যে আসে রাজনীতি, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার চালচলন বুঝতে হলে এই তিন দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। 'সন্ধ্যা' মনস্তত্ত্বের অধীশ্বর ছিল। রাষ্ট্রের প্রতি জনশ্রদ্ধাকে যদি জনতাচ্ছিল্যে নামিয়ে আনা যায়, তাহলে সেই রাষ্ট্রের আয়ু বেশিদিন থাকে না। 'জুজু ধরলে'র মতো রাজভয় দূর করার এটা একটা প্রকৃষ্ট উপায়। ১৯০১-০২ বা ১৯০২-০৩ সালে আর একটি ঘটনা সরকারী ইজ্জতকে ধূলিসাৎ করতে সাহায্য করেছিল। নোয়াখালি জেলায় কোনো একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা বিষয়ে Mr. Ezechiel নামে পুলিসসাহেব জড়িয়ে পড়েন। এজিকিয়েলসাহেব চাইছিলেন যেন আসামীদের সাজা হয়ে যায়। দায়রা-জজ পেনেল তাতে বিগড়োলেন। কলকাতার লাট-দরবার থেকে 'ডি. ও.' (অর্ধ-সরকারী নির্দেশ) গেল ঐ আসামীদের সাজা দেওয়ার জন্য। পেনেলসাহেব রাজী হলেন না। ফের তাগিদ গেল। ইংরেজী জজিয়তির বিরুদ্ধে শাসন বিভাগের না-হক্ হস্তক্ষেপ পেনেলসাহেব সহ্য করলেন না। তিনি এস. পি.-কে (পুলিসসাহেবকে) উল্‌টে গারদে পুরলেন। তাই নিয়ে তাঁর চাকরি যায়। তিনি ব্যারিস্টার হয়ে এসে হাইকোর্টে ব্যবসা করতে চাইলে প্রধান বিচারপতি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। পরে তিনি বর্মা চলে যান। এই নিয়ে দেশব্যাপী হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার হয়েছিল। বৃটিশ প্রতিপত্তি লোকচক্ষে নেমে গিয়েছিল। 'পেনেল প্রসঙ্গ' ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বহু সংখ্যায় বিক্রি হয়েছিল।

১৯০৬ সালে বরিশাল ঘটনার পর লাঞ্ছিতেরা আমাদের পরম বাঞ্ছিত তা প্রমাণ করা হল। সভা-সমিতি করে লাঞ্ছিত বীরদের সম্মান প্রদর্শন তো করা হলই, তা ছাড়া রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে লাঞ্ছিতপ্রবর, প্রকৃত দেশনেতা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হল। তাঁকে বাংলার জনগণ-অধিনায়ক রূপে অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিষেক করা হল। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মঙ্গলাচরণ ও আশীর্বচনের পর তাঁর মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়ে দিলেন। ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলী তাদের হৃদয়ের সমর্থন জ্ঞাপন করল। স্বদেশী আন্দোলন হয়ে ইংরেজী অনুকরণে তালি-দেওয়ার রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। 'হিতবাদী'-সম্পাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এরপর একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা পরাধীনতার দুঃখ বুঝিয়ে দেন এবং সে বন্ধন-জাল কাটাবার জন্য স্বদেশী ও বয়কট্ জোরের সঙ্গে চালাতে বলেন।

সুরেন্দ্রনাথ আবার ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর দেওয়া সম্মানের জন্য নিজের কৃতজ্ঞতা ও নতি জানান। বিলিতী কাপড় যে tallow বা শূয়ার-গোরুর চর্বি দিয়ে মার্জিত করা হয়, কাব্যবিশারদের এই বাক্য সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, আগে এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু কোনো ইংরেজ গ্রন্থকারের বইয়ে এর উল্লেখ দেখে মানতে বাধ্য হন।

বিলিতী কাপড় ব্যবহারের সম্বন্ধে শ্রোতাদের মনোভাব যে কী হল তা অনুমান করে নিলেই চলবে।

বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের রাজ্যাভিষেক (অবশ্য লোকের মনোরাজ্যে) নিয়ে ইংরেজরা ও তাদের কাগজগুলো ক্ষেপে উঠল। কিন্তু ঐ সভায় একজন মাদ্রাজী উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'খালি স্বদেশীতে হবে না ব'লে স্বরাজ্য কামনা করি। কিন্তু বয়কট্ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ স্বাধীনতা আনবে না। রুশিয়ায় গিয়ে নিহিলিস্টদের কাছ থেকে বোমা-তৈরি শিখে আসতে হবে।'

১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' কাগজ বেরুতে আরম্ভ করে।

'যুগান্তর' কাগজের ইতিহাস—সারা বাংলায় মিত্রসাহেবের অধীনে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার নাম 'অনুশীলন সমিতি'। যারা কয়েক অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য রেখে ভিন্ন নামেতে চলছিল, তারাও মিত্রসাহেবের অধীনস্থ হয়। সে সমিতিগুলির নাম—'আত্মোন্নতি সমিতি' (কলিকাতা), 'সুহৃদ সমিতি' (ময়মনসিংহ), ইত্যাদি।

কিছুদিন বাদে অভিজ্ঞদের সঙ্গে অনভিজ্ঞ কিন্তু উৎসাহীদের মতান্তর হল।

'উৎসাহী যৌবন' সব বাধা অগ্রাহ্য করে ছুটতে চায়—সে চারদিক চেয়ে সাবধানীর মতো চলতে রাজী নয়। তাই বারীনবাবুরা সাপ্তাহিক কাগজ বার করলেন। খোলাখুলিভাবে বিপ্লব-প্রচার এটির উদ্দেশ্য। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তর' নামকরণ করেন। প্রথম সম্পাদকও ভূপেনবাবু। কাগজখানি অতিশয় জনাদর লাভ করে। সুতরাং দলের নাম রইল 'অনুশীলন', কিন্তু দলীয় কাগজের নাম হল 'যুগান্তর'। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের কালে সারা বাংলার বিপ্লবীদের একটা বৈঠক ডাকা হয়। এর সভাপতিত্ব করেন পি. মিত্র। তিনি সকলকে কাগজটির সহায়তা করতে বলেন। সভা বসে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। পরবৎসরও ঐ স্থানে আর একবার অধিবেশন হয়।

গোড়ায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন মিত্রসাহেব। সহকারী সভাপতি দুজন—শ্রীঅরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কোষাধ্যক্ষ—সুরেন ঠাকুর। কিন্তু ১৯০৭ সালে বিপিনবাবুর 'অহিংস নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে দেশবন্ধু বিপ্লবী দল ছাড়েন। 'যুগান্তর' বেরুবার কিছুদিন বাদে সক্রিয় নতুন গ্রুপটির সভাপতি হলেন শ্রীঅরবিন্দ। যদিও সব বিরাট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতেন মিত্তিরসাহেব।

শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু আইরিশ কর্মীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে পেনেল-এর কার্যপ্রচেষ্টা থেকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গ্রহণ করেন।* কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় এসে অহিংস আন্দোলনে অটল বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। পুণার গুপ্ত-সমিতির সভ্য হন। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি যে তিনি এঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে টানেন এবং বাংলায় আনেন।

'যুগান্তর' কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যায় আন্দোলনের রূপ এবং বিপ্লব কিসের জন্য—তার একটি সুন্দর বিবৃতি বেরোয়। লেখাটি সেদিনকার সর্বপ্রথম নিগৃহীত যুবক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের। লেখাটিকে সম-সমাজবাদের বিবৃতি বলতে হবে—Socialist Manifesto। 'যুগান্তর' কী চায়, বৃটিশ যুগের অন্তে কী আনতে হবে এবং আসবে তারই পরিচয় এতে ছিল। শ্রীঅরবিন্দও এতে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন।

এই কাগজখানি বিপ্লববাদীদের প্রাণ ছিল। তার অবদানও অসাধারণ। 'যুগান্তর' প্রসঙ্গে তার বিপদকালীন সঞ্চালক কিরণ মুখার্জী, নিখিল মৌলিক ও কার্তিক দত্তের কথা মনে না করে পারা যায় না। কী প্রবল আগ্রহ তাঁদের এটিকে সপ্তাহে-সপ্তাহে বার করার জন্য! কী ঝঞ্ঝাবাত না তাঁদের উপর দিয়ে গেছে সেদিন! একদিকে রাজরোষের তীব্র তাড়না, অপর দিকে অর্থাভাব : এই ঝোড়ো দ্বন্দ্বের মধ্যে

* ডাঃ ভূপেন দত্তের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনুশীলন-এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশবাবুর বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

দিয়ে এ সাপ্তাহিক কাগজখানি ছিল যেন ঘোড়ার সওয়ারি। এর বুকে থাকত একটি পতাকার কোনাকুনি চিকে-কেটে ত্রিশূল ও তলোয়ার, চিকের উপরে স-তারকা চাঁদ, নীচে সূর্য—হিন্দু-মোস্লেম-শিখ-রাজপুত সবার বাঞ্ছিত প্রতীক একত্রে।

এর কাছাকাছি যায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'। উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯০২ সালে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়-স্থাপনে বোলপুরে কার্যারম্ভ করেন। পরে চলে আসেন ও 'সন্ধ্যা' কাগজখানি বার করেন। এটি দৈনিক কাগজ। ১৯০৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ) 'সন্ধ্যা'র প্রথম প্রকাশ। প্রথমে এটি ছিল হিন্দুসমাজের ঝাঁঝালো পত্রিকা। ১৯০৫ সালের শেষাশেষি এটি হয়ে যায় চরমপন্থী রাজনীতির দৈনিক বাহন।

আর কাগজ ছিল মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি', গীষ্পতি কাব্যতীর্থের 'সোনার বাংলা', ইংরেজীতে 'বন্দেমাতরম্'।

'বন্দেমাতরম্'-এর ইতিহাস এইরকম: স্বাধীনতার বাণী আগুনের মতো ভাষায় বুকে বহন করে যদি একটি কাগজ বের হয় তো বেশ হয়—এইরূপ অভাব বোধ হলে, চরমপন্থী কয়েকজন নেতা কাগজ প্রকাশ করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কাগজের নাম হয় 'বন্দেমাতরম্'; তার প্রথম সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল। সুবোধ মল্লিক, হরিদাস হালদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি এতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের মতে মিল না হওয়ায় বিপিনবাবু কাগজের সংস্রব ছেড়ে দেন আর তাঁর জায়গায় অরবিন্দ হন প্রধান সম্পাদক। ১৯০৬ সালের ৬ই অগস্ট এ পত্রিকার জন্ম। কাগজের শিরোনামায় লেখা হল 'India for Indians'। প্রধান লেখকদের মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. সি. চ্যাটার্জী (ব্যারিস্টার), শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। 'বন্দেমাতরম্' অতি সত্বর অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর ফলে বাংলায় জাতীয়তাবাদী দলের প্রভাব বাড়ে—এমন কি অল্প সময়ের মধ্যে সারা ভারতে 'বন্দেমাতরম্' অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। ভাষা ও চিন্তাধারার দিক থেকে কাগজটি সত্যই অতুলনীয়। 'বন্দেমাতরম্' নামটি শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া। শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী-চিন্তা এর মাধ্যমে চালাচ্ছিলেন। 'সোনার বাংলা' নামক একটি বিপ্লবী পুস্তিকাও গোপনে প্রচার করা হল। বিলিতী কাগজওলারা চিৎকার সুরু করল—আবার সিপাহী বিদ্রোহের মতো একটা অবস্থা আনয়নের চেষ্টা চলছে। বিপিনবাবু টিপ্পনী কাটেন, 'পাগলা-গারদের বাইরে কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করতে পারে না।' এই নিয়েই সম্পাদক ও পরিচালকমণ্ডলীতে লাগে ঠোকাঠুকি। ফলে ১৮ই অক্টোবর থেকে বিপিনবাবু সম্পাদকীয় গদি ত্যাগ করেন। তখন আইন অনুযায়ী সম্পাদকের নাম কাগজে ছাপানো বাধ্যতামূলক ছিল না। তাই অরবিন্দের নাম সম্পাদক বলে

ছাপানো হত না। শুধু কলকাতা কংগ্রেসের সময় একদিন তাঁর নাম ছাপা হয়েছিল। ১৯০৮ সালে অরবিন্দবাবু বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হলে বিপিনবাবু আবার এটির প্রধান সম্পাদক হন। যাই হোক, 'বন্দেমাতরম্' ভারতকে অগ্নিমন্ত্রে রাজনীতিক দীক্ষা দিত। রুশিয়ার সশস্ত্রবাদীদের কার্যকলাপের বিবরণ এই পত্রিকায় ছাপা হত। 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' একই মত প্রচার করত। তফাত ছিল উপায় নিয়ে। 'যুগান্তর' খোলাখুলি বিপ্লব ও সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষে — 'বন্দেমাতরম্' নিরস্ত্র বৈধ ও অবৈধ পন্থার পক্ষে। পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী উভয়েরই অঙ্গ শোভিত করত।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে কাগজগুলি বেরোয় তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠগুলির নাম উল্লেখ করা হল।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর মাসিক পত্রিকা 'নব্য ভারত' আগে থেকেই বেরুত। সুন্দর লেখা। স্বদেশীর আগে দেশটা এমন মরা, অসাড়, নেতিভাবাপন্ন ছিল যে, কর্মপ্রেরণা কি করে জাগানো যায় তাই নিয়ে মাথা-ঘামানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল। দেবীবাবু একটি প্রবন্ধে প্রস্তাব করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে—শুধু হাততালির নেশায় মানুষ জলে ডুবে মরতে পারে ; তেমনি 'আমরা পারি, পারি, পারি' ক্রমাগত শুনিয়ে-শুনিয়ে কর্মচেষ্টা জাগালে মন্দ হয় না। অকর্মককে সকর্মক করা সেদিনের কতবড় সমস্যা ছিল এর থেকে আন্দাজ মিলবে।

সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' আর একটি সুন্দর পত্রিকা।

বিলাত থেকে আসত শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার 'ইণ্ডিয়ান সোশিয়লজিস্ট'। ইংরেজীতে লেখা। বিপ্লববাদ প্রচার ছিল এর কাজ। উচ্চাঙ্গের লেখা, তবে খুব কম লোকের হাতে পড়ত এ কাগজ।

জুনিয়ার ব্যারিস্টার যাঁরা স্বদেশীতে এগিয়ে পড়েন তাঁদের মধ্যে সি. আর. দাস, জে. এন. রায়, অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, অপূর্বকুমার ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পি. মিত্র ছিলেন পুরানো ব্যারিস্টার। এ. চৌধুরী, জে. চৌধুরীও পুরানোদের মধ্যে পরিগণিত।

মুসলমান নেতাদের মধ্যে সর্ববরেণ্য ছিলেন মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন ও রসুল সাহেব। তাছাড়া ছিলেন আবুল কাসেম, ডাঃ গফুর, দিদার বক্স প্রভৃতি।

আগেই বলেছি আমার সহপাঠী শরতের সাহায্যে আমি স্কুল-কলেজের বন্ধুদের নিয়ে 'সুহৃদ সমাজ' স্থাপন করি। শরৎ ছিল এর প্রাণ, মন, দেহ। ডাফ স্কুলের উপরের তিন ক্লাস ও কলেজের সব ক্লাসের ছাত্রেরা ছিল এর সভ্য। মাসিক চাঁদা এক আনা। উদ্দেশ্য : সৎ উদ্দেশ্যে, সাধু সংকল্পে সবরকম ক্ষেত্রে এর সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হতে পারবে। আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। যুব-সম্মেলনীতে কোনও বৃদ্ধকে সভাপতি করার বিরুদ্ধে ছিলাম আমি। শরৎও এ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ

করে। সে এ মত গ্রহণ করায় অনেক তর্কযুক্তির পর সকলেই আমাদের মতাবলম্বী হয়। শরৎ সব রকমের লোকের সঙ্গে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বোঝাবুঝিতে দড় ছিল। আমার দ্বারা এ কাজ হবার নয়। অতঃপর কোনো প্রফেসর বা প্রিন্সিপালের নাম পর্যন্ত কেউ অধিবেশনের সভাপতিত্বর জন্য করত না।

কতকগুলি ছাত্র রাজনীতির গন্ধে 'সুহৃদ সমাজে' থাকতে ইতস্ততঃ করছিল। আমি একদিন সমাজের অধিবেশন ডেকে বোঝাই যে—পরাধীন জাতির 'রাজনীতি' বলে কোনো জিনিষ থাকতে পারে কি? তারা যুদ্ধ-ঘোষণা বা শান্তি-স্থাপনের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তারা যেটা করবে তা হবে নিতান্ত ঘর-গোছানো ব্যাপার। ঘরোয়া কথায় বাধা কি থাকতে পারে, তা আমার মগজে ঢোকে না। এই ধরনের যুক্তিতে সকল অন্তরায় দূর হল। এর মধ্যে 'যুগান্তর' কাগজ অর্থসংকটে পড়েছিল। 'সুহৃদ সমাজ'-এর অর্থ প্রথম কিস্তিতে এখানে দেওয়া হল। পরেও দেওয়া চলল।

১৯০৭ সালে পুজোর কাছাকাছি সময়ে হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির কেরানীদের উপর আত্মমর্যাদাহানিকর নিয়ম প্রচলিত করা হয়। হাজিরাবহিতে উপস্থিত বা অনুপস্থিত লেখা ছাড়া তাদের টিপসই দিতে হবে। এই নিয়ে হয় আন্দোলন। কেরানীরা ধর্মঘট করে। যে পর্যন্ত না ধর্মঘট সসম্মানে মিটে যায় সেই অবধি কেরানীরা যাতে অটল থাকে 'সুহৃদ সমাজ' সেদিকে লক্ষ্য দেয়। আমাদের সভ্য রাসবিহারী মুখার্জী সহানুভূতি সহকারে ধর্মঘট চালনায় মন দেন। কোম্পানি ধর্মঘটীদের কাজে সহজে নিতে চায় না। ধর্মঘটকারীদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাঁদা তোলা চলতে লাগল। 'সুহৃদ সমাজ' এতে যোগ দিল। কলেজে পুজায় থিয়েটার করার জন্য বেশিমাত্রায় চাঁদা অপর ছাত্ররা তুলেছিল। সমাজের ভাণ্ডার স্বল্প। সত্বর ফুরিয়ে গেল। 'সমাজের' তরফ থেকে প্রস্তাব করা হল—এবার থিয়েটার বন্ধ রেখে ঐ টাকাটা বার্ন কোম্পানির দুঃস্থ কেরানীদের দেওয়া হোক। থিয়েটারপন্থীরা আপত্তি তুলল। একটা যুক্তি দেখাল যে, থিয়েটারের জন্য তোলা টাকা অন্য কোন কাজে ব্যয় করা অসাধুতা হবে। দু'দলে মীমাংসা না হওয়ায় প্রিন্সিপালকে মধ্যস্থ মানা হল। থিয়েটারপন্থীদের 'অসাধুতা'র দোহাইটাই ছিল বড় যুক্তি। তার নীচে ছিল—ছাত্রদের হাড়ভাঙা খাটুনির পর চিত্ত-বিনোদন নিতান্ত দরকারী—আমোদ—নির্দোষ আমোদ, খাদ্য-পানীয়ের মতোই জীবনের একটা অতি আবশ্যকীয় ব্যাপার। সমাজের তরফ থেকে আমাদের উত্তর হল—পূর্বপক্ষদের কথা মিছে নয়। কিন্তু অবস্থার ফেরে ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষরাই করতে পারে। সেইটাই জীবনের চিহ্ন। থিয়েটার হল—একজনরা কিছু করে গেছে, সে আখ্যায়িকা শুনে বা পড়ে তাদের অনুকরণ করে আমোদ পাওয়া ও দেওয়া। কিন্তু যারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে আজ পথে বসেছে, এবং না-খেয়ে ঘা-প'রে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে তারাই

না আদি ও অকৃত্রিম অভিনয়কারী জীবন-রঙ্গভূমে ? অতীত কারুদের চরিত্র অনুকরণ করে আমোদ করা বড়, না, এই ভাগ্যহীনদের মুমূর্ষু স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ওষুধ-পথ্য, বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা ও তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার বিমল আনন্দ বড় ও কাম্য ? কোন্‌টা চাইব ? কোন্‌টা বেশী করে মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তুলবে ?

স্টিফেন্সসাহেব উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে রায় দিলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এবার থিয়েটার বন্ধ থাকুক। আর্তরা বাঁচুক। আপনারা ধন্য হোন !'

বার্ন কোম্পানির ধর্মঘটকারীদের জয় হল। মজুরদের সহায়ক রাজনীতিকদের সঙ্গে এভাবে একটা যোগস্থাপন হল। এইবার ট্রাম-ড্রাইভারদের পালা। ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হয়েছে—তাদের খাটুনির পরিমাণে মাইনে মিলছে না। ১৯০৬ সালে বাংলায় ধান ভালো হয় নি। বরিশাল, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কলকাতায় কাজেই চালের দাম বাড়ে। ড্রাইভারদের ধর্মঘট করতে উপদেশ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে আমি খুব যাতায়াত করতাম। নেতাদের ও খবরের কাগজের আনুকূল্যে ধর্মঘট জয়যুক্ত হয়। এটা নিয়ে হল তৃতীয়বার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদারদের মধ্যে যোগাযোগ। তখন এ দুই দাবি একত্র করা হত না। এ ছাড়া আর দুটো ধর্মঘটের উল্লেখ করা উচিত মনে করি। গভর্নমেণ্টের ছাপাখানায় একটা ধর্মঘট হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্যারিস্টার অপূর্ব ঘোষ তার নেতৃত্ব করেন। সসম্মানে এটির নিষ্পত্তি হয়। এইখানে প্রথম দেখা গেল জনপ্রিয় নেতারা ধর্মঘট পরিচালনা করছেন।

এরপর ঈস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে ধর্মঘট হয়। এতে ব্যারিস্টার ঘোষ খুব বড় অংশ গ্রহণ করেন। এ দুটিতে আমার কোনো কাজ ছিল না।

আমার কাকার বাড়িতে কতকগুলি ঝাঁকামুটে ও ট্রাম-কর্মচারী আশ্রয় পেয়েছিল। তাদের ভেতর দিয়ে আমি ভাবপ্রচার করতাম। তাদের শিখিয়েছিলাম পরাধীন প্রজা আমরা—কোন অস্ত্রশস্ত্র তো নেই। ধর্মঘটই একমাত্র অস্ত্র যা আমরা ব্যবহার করতে বাধ্য। বুঝে-সুঝে ধর্মঘট করতে পারলে জয় আশা করা যায়। ধর্মঘটের কথা শিখেছিলাম তমলুকে।

১৯০৭ সাল থেকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি আরম্ভ হয়। সরকারের চণ্ডনীতি দুর্দান্ত প্রতাপে চলতে থাকে।

বরিশালে সাধারণ পুলিস ও অস্ত্রধারী গুর্খা পুলিস গ্রামে গ্রামে গিয়ে উৎপীড়ন করতে থাকে। স্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক র‍্যাট্‌ক্লিফ ও ব্যারিস্টার পিউ অবস্থা পরিদর্শন করে আসেন ও পুলিসের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন।

বহু জায়গায় লুটতরাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়। হিন্দু-মুসলমানে লড়ানো কায়দা-মতো চালানো হতে থাকে—রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহে হিন্দুদের মুসলমানরা আক্রমণ করে। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা-

পরিষদে পাঁচলক্ষ টাকা দান করেছিলেন। জামালপুরে তাঁর কাছারি লুট করিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে হিন্দু মহিলাদের সম্মান রক্ষার জন্য কয়েকজন যুবক যান। শ্রদ্ধেয় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ নন্দী, হরিশ সিকদার, সুধীর সরকার, নরেন বসু, শিশির ঘোষ, প্রভাস দে-র নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রভাসবাবু ও হরিশবাবু ময়মনসিংহ শহরে থাকেন। বাকিরা জামালপুরে আত্মরক্ষার্থে কয়েকবার গুলী দাগেন। মহিলারা সব দয়াময়ী ঠাকুরের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুসলমানরা অতিরিক্ত সংখ্যায় আক্রমণ করে, কিন্তু গুলীর ভয়ে কিছু করতে পারে নি। বিপিনবাবুরা দাঙ্গার অজুহাতে পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হন, কিন্তু কেউ সনাক্ত করতে না পারায় মুক্তিলাভ করেন। অবশ্য সুধীর সরকার গ্রেপ্তার হন নি, পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েন। ময়মনসিংহের দেশনেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীও খুব খাটেন। কুমিল্লায় হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থে গুলী চালাতে বাধ্য হয়। হাঙ্গামা থামে। রংপুরে সাহায্যপ্রার্থী হিন্দুদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, 'আমার কাছে কেন? বিপিন পালের কাছে যাও। সে তোমাদের রক্ষা করুক এসে।' কলকাতায় শোভাবাজার, শ্যামবাজারের কাপড়ের দোকানগুলি গুণ্ডাতে লুট করে। পুলিস চুপচাপ দর্শকের মতো থাকে। বিডন উদ্যানে যাকে-তাকে পুলিস লাঠি মারে। দোতলার উপরে একটা যাত্রার দল ছিল। তারা গানবাজনা করছিল। অকারণে তাদের টেনে নামিয়ে এনে, মেরে মাঠে ফেলে রাখা হয়। গুণ্ডাদেরও লেলিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ট্রাম এসে থামে, নিমতলা স্ট্রীট ও বিডন স্ট্রীটের মোড়ে—পুলিস বিনা বাছবিচারে যাত্রীদের ঠেঙাতে থাকে, আর গুণ্ডারা আরোহীদের মেরে সবকিছু কেড়ে নিতে থাকে। কিছু লোকের কাপড় খুলে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়। তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে থাকে। পুলিস প্রথম একটা সভা ভঙ্গ করে দেয় বিডন-বাগানে, তারপর উভয়পক্ষে মারপিট হয়। এরপর থেকে সার্জেন্টরা দল বেঁধে ঘুরে-ফিরে পাহারা দিত।

গুলী চালিয়ে বহু লোককে আহত করে 'বন্দেমাতরম্'-এর কণ্ঠরোধ করা হল। আমার ভাই ধনগোপাল সইতে না পেরে সার্জেন্টদের সামনে গিয়ে একলা 'বন্দেমাতরম্' বলে। সে গুরুতর আহত হয় তার ফলে। এতটা বাড়াবাড়ি দেখে কয়েকটি যুবা ৪ঠা অক্টোবর সার্জেন্টদের সামনে বেনেটোলা স্ট্রীটের মোড়ে 'বন্দেমাতরম্' বলে। সার্জেন্টরা তাড়া করে তাদের। অবশেষে এক সার্জেন্টের হাত তারা কেটে দেয়। পাঁচজন এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়। তার মধ্যে আমার ভাগ্নে ছাড়া আমার বন্ধু ছিল দুজন। আর দুজন বাজে লোক। একজন একটা কোকেনের আড্ডা চালাত; আর একজন এই দিকে বেড়াতে এসেছিল। 'সন্ধ্যা' কাগজে বেরুল— 'ফিরিঙ্গীর থাবা সাবাড়!' হাত-কাটা সাহেব সার্জেন্ট ওয়াটার্স একজন একদম

নির্দোষ লোককে সনাক্ত করল। আমি এদের খাবার দিতে জেলখানায় রোজ যেতাম। এরা সে সময় হাজত-আসামী ছিল। তাদের ভরসা দিয়ে আসতাম এবং তাদের জন্যে যে তদবির হচ্ছে মোকদ্দমা-ব্যাপারে, তাও জানিয়ে আসতাম। এক নির্দোষ বেচারির সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। তার নাম সত্যচরণ দাঁ। সে ঘটনার সময় না জানলেও পরে জেনেছিল আসল কাজটা কে করেছে। তবু বন্ধুদের বাঁচাবার জন্য কথাটি না বলে সে দোষের বোঝা ঘাড়ে নিল। আমরা তার বন্ধুরা আজও তার জন্য গর্ব অনুভব করি।

এদিকে জনগণ ইংরেজের প্রমত্ত পশুবলের কাছে দমে আসছিল। মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন এ দুরবস্থা সইতে পারলেন না। তিনি যুবকদের জড়ো করে বহুবাজার থেকে শ্যামবাজার, বাগবাজার হয়ে চিৎপুর রোড ধরে বিডন উদ্যানের সামনে দিয়ে মার্চ সুরু করেন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি অবশ্য আবার দেওয়া হতে লাগল। সার্জেন্টদের সামনে আসার আগে তিনি সতর্কবাণী দিতেন, 'যাদের ভয় আছে, তারা সরে পড়ো। চলে যাও। এরপর যে বা যারা ভাগবে, সে বা তারা মানুষ নয়—কুকুর-বেড়াল।' সাহস ও উৎসাহের আগুন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল। উৎপীড়িত ও লুণ্ঠিত কলকাতা-বাসিন্দারা যেন মরা দেহে প্রাণ ফিরে পেল। ভেঙে গেল পুলিসের ভয়। চারদিক থেকে হতে লাগল মৌলবী সাহেবের জয়জয়কার। কারাবরণটা তাঁর কাছে ভাত-জল হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ সভা সরকার বন্ধ করেন। মৌলবী সাহেব বার বার সে আইন ভঙ্গ করে কারারুদ্ধ হন। নিজে দণ্ডভোগ করে লোকের মনে আইনভঙ্গের ভাব তিনি জাগালেন। মৌলবী সাহেবের মতো অমন খাঁটি লোক বিরল। 'চিরজীবী, চিরজয়ী তুমি লিয়াকৎ!'

হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে কয়েকজনকে জজসাহেব আমন্ত্রণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনারেবল্ ভূপেন্দ্রনাথ বসু। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে সারদাবাবুর বাড়ির একেবারে সন্নিকটে এলে ভূপেনবাবুর গাড়ি রোখে সার্জেন্টরা এবং তাঁর গাড়ির উপর লাঠি চালায়। পরে জজসাহেব পুলিস কমিশনারকে খবর দিয়ে এর একটা বিহিত চান। এর ফলে বিভাগীয় আইনের বলে পুলিস কমিশনার যা ভালো বোঝেন করেছিলেন।

বর্বরতার বর্বর পরিণাম ঃ লোকে অসহনীয় অত্যাচারে, অবমাননায়, পদে পদে নিগ্রহে প্রতিকারপরায়ণ হয়ে উঠল। আমাদের শিরোভূষণ যাঁরা তাঁদেরও মান-সম্ভ্রম কিছু নেই? তাঁদেরও এরা সবার সামনে পায়ে দলতে বদ্ধপরিকর?—এই ভেবে লোকে নিজের হাতে বিচার তুলে নেওয়া মনে-মনে স্থির করল। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরমপন্থী ও চরমপন্থী। একটা মহাযজ্ঞ আরম্ভ করা কঠিন। কিন্তু আরম্ভের পর তার গতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করা আরও কঠিন। নেতারা তাঁদের দেশপ্রেম থেকে কর্তব্যবোধে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' সুরু করেন। সবাই কর্তার-ইচ্ছায়-কর্মের মতো চলছিল। সুরেন্দ্রনাথ দেশপূজ্য ছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা এবং তাঁরই সহযোগী ও সহকর্মীরা বাংলার জেলাগুলির নেতৃত্ব করবেন, এ আশা তাঁর ছিল। আন্দোলন বৈধ থাকবে, বেআইনী কিছু হবে না—এ ধারণা করা তাঁর দিক থেকে অন্যায় ছিল না। হিসেবে ধরা হয় নি যা, তা হচ্ছে সরকারী চণ্ডনীতির মাত্রা এবং তাতে লোকের সাড়ার তারতম্য।

যেখানে দুটি শক্তি বিরুদ্ধমুখীন কার্য একসঙ্গে করে সেখানে একটা নতুন শক্তির উদ্ভব হয়—সে প্রারব্ধ দুটোর কোনটারই অংকশায়ী হয় না। বৃটিশ সরকার ও সুরেন্দ্রনাথ, দুই পক্ষেরই হাত থেকে সংঘাতউদ্ভূত নিজস্ব গতি পৃথক করে নিয়েছিল। শক্তি তো একটা কিছু উপলক্ষ অবলম্বন ক'রে কাজ করে। এখানে সেই অবলম্বন হল কতকগুলি লোক, কতকগুলি সংবাদপত্র এবং কতকগুলি সভা-সমিতি।

জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বরাবর দেখা গেছে জনমত যাঁরা গড়েন সেই অগ্রণীরা কিছুদিন বাদে নবোন্মেষিত জনমতের কাছে পিছিয়ে পড়েন। সুখান্তক নাটক লিখতে বসে প্রায়ই এমনি করে দুঃখান্তক নাটক গড়ে ওঠে। এ বিষাদ (tragedy) সব দেশের জাতীয় জীবনে দেখা গেছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, জনমত একবার গড়ে উঠলে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় বা বেড়ে ওঠে যে—তার সঙ্গে মত-গঠনকারী নেতা পাল্লা দিতে পারে না। এই এ জিনিষের সহজ ধর্ম। সুরেন্দ্রনাথ বাংলা তথা সারা ভারতের রাষ্ট্রনেতা এ কথা অত্যুক্তি নয়। তিনি রাজনীতিতে নেমে বলেছিলেন, 'আমি এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করে দেব (I shall shake the foundation of this Empire)।' নিজ জীবনে তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়ে গিয়েছেনও। তাঁর দেওয়া গতি-আত্মক রাজনীতিতে ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির ছাপ ছিল। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' তাতে শক্তি যোগালো —কিন্তু তার মোড়ও ফেরালো। আন্দোলনটি শেষ অবধি বৈধ থাকবে এ আশা দুরাশা প্রমাণিত হল। বিপিনচন্দ্র এলেন আন্দোলনটিকে প্রাণের ছন্দে ছন্দোবদ্ধ করতে; প্রাণের প্রাচুর্যে ও স্ফূর্তিতে যেদিকে যায় সেদিকে তাকে যেতে দেওয়ায় তাঁর আপত্তি ছিল না। কতবার তিনি আপদ্ধর্মের কথা জনতাকে শোনাতেন। রক্ষাকালী-পূজা মনে করিয়ে দিতেন। সে পূজায় বলিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলতেন

না। 'প্যাসিভ রেজিস্টান্স' কথাটি প্রায়ই সভাতে বলতেন। হাতিয়ার যখন আমাদের নেই, শুধু-হাতে খালি মনের জোরে যতটা পারা যায় এবং যত রকমের পারা যায় অবৈধ বিদেশী রাজশক্তিকে বাধা দিতে হবে—এই কথা বিপিনচন্দ্রের পূর্বে কেউ বলেন নি। বয়কট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও প্যাসিভ রেজিস্টান্স ভারতের রাজনীতিতে বিপিনচন্দ্রের দান। এদেশের সমসাময়িক ইতিহাসে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবুক হিসেবে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। মোটের উপর জনতা দুটো মন্ত্রই একসঙ্গে পেতে লাগল। একটা—'স্বদেশী করো। কিন্তু আমরা বেআইনী কিছু করব না।' অপরটা—'দেশের দুর্দশা দূর করতেই হবে। সেখানে পথের দাবি কে রোখে?' ক্রমে দুই নেতার মত-প্রভেদ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে দাঁড়াল। নেতাদের কথা জানি না কিন্তু যুবমনের কথা জানি। নব বিকশিত রাজনৈতিক ভাবাদর্শ তরুণদের হৃদয়ের উপর অপ্রতিরোধনীয় ভাববিস্তার করে। সব কালে, সব দেশে, সব আন্দোলনে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। আজকের যুবা কাল হবে দেশের মালিক—ঘর-সংসারের কর্তা, ভবিষ্যৎ নেতা। দুই নেতার আহ্বানে দোটানায় পড়ে জনতা বিভ্রান্ত বোধ করে। বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তরুণ নীর ছেড়ে ক্ষীর বেছে নিয়ে এগিয়ে যায়। তার কাছে, চলতে চলতে মরে-পড়ে-যাওয়াটা একটা বড় কথা নয়। তার পক্ষে জড়তা, পশুত্ব ঘুচিয়ে চলে-চলাই প্রাণধর্ম। দেশের ডাক শুনে তার প্রেমের আগুনে নিরন্তর দগ্ধ হয়ে কোনরকমে বেঁচে-বর্তে থেকে নিতান্ত সাধারণ ক্লিষ্ট জীবন যাপন করা অতীব দুঃসহ। তারা কেমন ক'রে যে জেনেছে—যা চলে গেলে আর ফেরে না, তা হচ্ছে উচ্ছল যৌবন; এবং যা একবার এলে, ঠেলে দিলেও যেতে চায় না—তাই হচ্ছে জরা। যৌবনে জরাগ্রস্ত হওয়ার মতো অভিশাপ এ দুনিয়ায় আর কিছু আছে কি? যৌবন থাকতে থাকতে যৌবনকে তার নিজ রঙ্গে, নিজ ধাঁচে জীবনের গান সেরে যেতে না দিলে কৃপণ যক্ষের মতো পরে শুধু অনুতাপ নিয়ে জ্বলে মরতে হবে।

বিপিনবাবুর সমর্থকের দল বাড়তে লাগল তরুণদের মাঝ থেকে। এতে হল চরমপন্থীর উদ্ভব। লাল-বাল-পাল এল মন্ত্র হয়ে। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রবীর বালগঙ্গাধর তিলক ও নয়া-বাংলার প্রাণ বিপিনচন্দ্র পাল হলেন একমত, এক গোষ্ঠী। সারা ভারতে জন্মাল চরমপন্থীরা। নাম মন্ত্র হয় ক্রমবিকাশে। প্রথমে নামের অসাধারণত্ব ও অভিনবত্ব আকর্ষণ করে জনতার মনোযোগ। তখন তিনি হন শ্রদ্ধেয় ও সম্ভ্রান্ত। তারপর বাড়ে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা। রক্তের আত্মীয়তার চেয়ে ভাবাদর্শের আত্মীয়তার বন্ধন অনেক বেশী শক্তিশালী। এ অবস্থায় নামী হন যশের মালিক, কিন্তু জনচিত্তের অনেক কাছাকাছি। শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল হলেন এবার 'বিপিনবাবু'। তার পরের স্তরে উঠলে তখন তাঁর নাম ভূমার অধিকারী হয়। সে অবস্থায় 'নাম'টি হয় মন্ত্র। বিপিনচন্দ্র (আর 'বিপিনবাবু' নয়) সেই

দিক থেকে হল মন্ত্র। 'লাল-বাল-পাল'ও এমনি করে হয়েছিল মন্ত্র। ছোট-বড় বয়স-নির্বিশেষে সবাই উচ্চারণের অধিকারী। উচ্চারণের ফল প্রাণে প্রেরণা-প্রাপ্তি। নইলে আমরা কি 'তিলক' বলতে পারি? ছোট মুখে বড় কথা হয় যে!

তবে এ কথা পরে জানা গিয়েছিল যে শ্রীঅরবিন্দ নতুন দলের প্রকৃত গঠনকারী।

১৯০৬ সালে কলকাতায় হয় কংগ্রেস ও শিল্প-প্রদর্শনী। চরমপন্থীরা চাইল তিলককে সভাপতি রূপে পেতে। তিলক ছিলেন সরকারের কাছে মার্কা-মারা লোক বা নামকাটা সেপাই। তিলককে সভাপতি করলে দুটো বিপদ। চরমপন্থীরা উপরে উঠে পড়বে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে এবং সরকার হয়তো কংগ্রেসকে বেআইনী সভা বলে বন্ধ করে দেবে। সুরেন্দ্রনাথ নিষ্কৃতির পথ ঠাওরালেন। বিলাতে ছিলেন দাদাভাই নওরোজি। তাঁকে সভাপতি হতে অনুরোধ করে 'তার' পাঠালেন। তিনি রাজী হলেন। এভাবে এ-যাত্রা হল মুশকিলের আসান।

দাদাভাই এলেন। তাঁকে সামরিক কায়দায় স্বাগত করা হল। সে কী বিরাট শোভাযাত্রা তাঁকে আগ-বাড়িয়ে নিয়ে এল! এইরকম শোভাযাত্রা বিরল। তিনি বললেন, 'শুধু স্বদেশীতে হবে না। আমরা চাই 'স্বরাজ'।' সাময়িকভাবে নরম ও চরম পন্থীরা খুশি হল। পরে এই স্বরাজ কথাটি দাঁড়াল 'উদূখল মুষল'। উভয়ের মধ্যে মিটমাট অসম্ভব হয়ে গেল। সমস্যা হল স্বরাজের সংজ্ঞা কি? নরম দল অর্থ করলেন—'ইংরেজের অধীনে স্বাধীনতা।' চরম দল বললেন—বিশেষ করে অরবিন্দবাবু তাঁর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায়—'ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কহীন, নির্ব্যূঢ় স্বাধীনতা। একদম স্বাতন্ত্র্য।' মনে পড়ছে অরবিন্দবাবুকে বোধহয় ইংরেজের আইনের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য মতিলাল ঘোষ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ওকালতির সুরে বলেন, 'শ্রীঅরবিন্দ যাই লিখুন—তাঁর মনে আছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।' 'বন্দেমাতরম্'-এ শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন—তিনি যা লিখেছেন তাই তাঁর মনে আছে।

এ বছরে কংগ্রেস সংক্রান্ত প্রদর্শনী চরমপন্থীরা বয়কট করলেন। কারণ ওতে কিছু বিলিতী মালও দেখানো হচ্ছিল। 'অনুশীলন সমিতি' থেকে অনুশাসন এল। আমরাও হুকুম মতো প্রদর্শনী বর্জন করলাম। তার বদলে পার্কে পার্কে জনসভায় শুনতে লাগল সবাই 'লাল-বাল-পাল'-এর প্রাণ মাতানো বক্তৃতা। নরম দল লোকমতের কাছে কোথায় নেমে গেল একেবারে!

১৯০৬ সালে গ্রীষ্মকালে পান্তির মাঠে শিবাজি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ওখানে শিবাজির ভবানী-আরাধনার মূর্তি গড়ে দেখানো হয়। বাংলার দেশহিতে জয়যাত্রার পথে এইসবে অভিযান আরম্ভ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ অনুভূতি যে ঋত্বিকের আছে, তাঁকে এই যজ্ঞে আহ্বান করা হল। বাংলার সাদর ও ব্যাকুল আমন্ত্রণে লোকমান্য তিলক আসতে রাজী হলেন। তিনি যে বুঝেছিলেন বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলন একটা সামান্য উপলক্ষ নিয়ে আগত হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ছিল এইখান থেকে নিখিল ভারতের প্রচণ্ড বিপ্লবের শুভারম্ভ। ভারতে বিপ্লবী রাজনীতির রাষ্ট্রপিতাই, সে পর্যন্ত তাঁর ঠিক-ঠিক পরিচয়। তিনি শুভাগমন করলেন। সঙ্গে এলেন খাপার্দে ও ডাঃ মুঞ্জে। মুঞ্জে এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ। বয়স বত্রিশ হবে। বিপদের সময় আপনার লোকেরা এলে যেমন বিপদের মধ্যে সম্পদ গনে লোকে, তেমনি বাংলার লোক এ ঘোরতর দুর্দিনে এঁদের পেয়ে যেন বাঁচল।

তিলকের গাড়ি হাওড়া স্টেশনে পেঁছানমাত্র সে কী কোলাহল তাঁকে দর্শনের জন্য! কে সেই জন-তুফানে শৃংখলা রক্ষা করবে? অনেক কণ্টে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে এই নেতা তিনটিকে উদ্ধার করা হল। হাঁ, উদ্ধারই বলতে হবে। পূজারীদের পূজার চাপে পূজ্যেরা পঞ্চত্বপ্রাপ্তির জোগাড় হয়েছিলেন। কী মুগ্ধ হল তারা, যারা তাঁর সাদর সম্বর্ধনা করতে এসেছিল! অতবড় লোক! এসেছেন পাঁচজনের একজন হয়ে—থার্ড ক্লাসে। মন-প্রাণ-হারা হল সমবেত জনমণ্ডলী। ঘোড়াকে গাড়ি টানতে দেওয়া হল না। জগন্নাথের রথ টানার ভিড় এখানেই দেখা গেল। কাকে বাদ দিয়ে কে টানবে? দড়ি কত বড় হবে? দড়ি তো ছিলই, তাছাড়া হাতে হাতে ধরাধরি করে সবাই স্পর্শ করল তাঁর যানকে। ধন্য হল তাঁকে টেনে! গগন বিদীর্ণ করে কণ্ঠস্বর উঠতে লাগল—বন্দেমাতরম্…তিলক মহারাজ কি জয়! 'লোকমান্য' কথাটির তখনও চল হয় নি। শিবাজি-উৎসবের মাঠের কাছেই বাড়িটি ছিল, যেখানে তাঁকে রাখা হল। 'অনুশীলন সমিতি' থেকে ভলাণ্টিয়ারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। তাঁর দেহরক্ষীদের মধ্যে আমিও স্থান পেয়েছিলাম। উৎসব খুব সাফল্যমণ্ডিত হল। বরিশালের অশ্বিনীবাবু ও তিলক মহারাজ, সে যুগে এ দুজনেরই ছিল সাধারণ গণ-অনুচর। এঁদের দুজনেরই দর্শনাভিলাষী লোকও জুটেছিল অনেক। কয়েকদিন ধরে জনসভা হয়। প্রথমদিন সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। একদিনের সভার কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। সেদিন সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। তিলক ছিলেন প্রধান বক্তা। প্রথমে ডাঃ মুঞ্জে অভিভাষণ দিলেন। তখনকার দিনে একটা নতুন সুর শোনা গেল তাঁর বক্তৃতায়। তিনি বললেন, 'মার্হাট্টা হচ্ছে সর্বপ্রথমে দেশভক্ত, তারপরে রাজভক্ত।' খুব হর্ষান্বিত হল শ্রোতারা। বারবার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে লাগল। ব্যাপার হচ্ছে এই—সে সময়ে কেউ খোলাখুলি বলতে পারত না যে, সে রাজভক্ত নয়। গোরুর আড়ালে তরণীসেনের যুদ্ধের মতো—রাজার প্রতি ভক্তি-জারি রেখে আমলাদের প্রতি অভক্তি, সমালোচনা ও নিন্দা ছিল রাজনৈতিক বাগ্মিতার বা কলমবাজির কায়দা। সেজন্য মুঞ্জের কথায় নূতনত্ব পাওয়া গেল।

তারপর দাদা খাপার্দে সুন্দর হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে তাঁর বক্তব্য সারলেন। বেশ সুরসিক লোক তিনি। ইংরেজ রাজত্বকে ডুবিয়ে দিলেন। অধীর জনগণ

তিলকের কথা শোনবার জন্য অধীরতা দেখাতে লাগল। একজন, মাননীয় অতিথির প্রতি মমত্ব-জ্ঞাপনার্থে বলে উঠলেন, 'জেল-ফেরতা তিলক মহারাজ এবার বলুন।' অনেকে বক্তার প্রতি বক্রদৃষ্টিতে চাইলেন। তাঁর ধৃষ্টতা ক্ষমার যোগ্য ছিল কি? তিলক বা সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত হলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বিষয়টিকে বেশ মধুমাখা করে নিলেন। তিনি সহাস্যবদনে বললেন, 'হাঁ-হাঁ, আমি বক্তার প্রতি 'হার্দিক' সহানুভূতি জানাচ্ছি। ঠিক-ই। যেখানে একজন জেল-ফেরতা সভাপতি সেখানে একজন জেল-ফেরতা বক্তাও হাজির। আচ্ছা, এবার আমি পুরাতন দাগী, দাক্ষিণাত্যের অনভিষিক্ত অথচ প্রকৃত রাজাকে (uncrowned king) অনুরোধ করছি সভাকে তাঁর বাণী শোনাতে।' সুরেন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনে স্বল্পকালের জন্য জেলে গিয়েছিলেন, হাইকোর্টের জজ নরিস-এর কার্যে তীব্র কটাক্ষ করে লেখার ফলে। শালগ্রাম শিলাকে জজসাহেবটি কোর্টে হাজির করার হুকুম দিয়ে বসেছিলেন। জনগণের ধর্মসংস্কারে আঘাত। এই হুকুমকে বর্বরতার নামান্তর বলায় সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং দু'মাসের জেল দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে দেশ জ্বলে ওঠে। ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের বিখ্যাত 'বাঘা' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) ছাত্রদের নেতৃত্ব করেন। পি. মিত্র সুরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু ছিলেন। গুপ্ত-সমিতি স্থাপনে দুজনে অনেক পরামর্শ হত। মিত্তিরসাহেব জেল ভেঙে সুরেন্দ্রনাথকে বার করে আনার প্রস্তাব করেছিলেন। উদ্যোগীদের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায় এই প্রস্তাব কার্যকর হয় নি। এটি ১৮৮৩ সালের ঘটনা। সাধারণের কল্যাণার্থে জেল-গমন সেই প্রথম দেখা যায়।

তিলক বললেন, 'দুঃখ না করলে সুখের মুখ দেখার তো কথা নয় আমাদের। আত্মত্যাগ, আত্মবলি, দুঃখ-দৈন্যের ভিতর দিয়েই আমাদের পথ। দেশের জন্য নিজেকে ক্ষয় না করলে তো দেশমাতার জয় আসবে না। আমাদের বিরুদ্ধে বিরাট প্রস্তুতি, অমিত শক্তি দেখে বিষণ্ন বা অবসন্ন হবার কিছু নেই। যুগে যুগে ন্যায়ে-অন্যায়ে এমন সংঘর্ষ বহুবার হয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত ন্যায়েরই জয় হয়েছে। অন্যায় হেরেছে। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। আমলাতন্ত্রের সাধ্য নেই তার থেকে আমাদের ঠেকিয়ে রাখে। আপনারা দেশমায়ের পায়ে-ঝ'রে-পড়া ফুল হিসেবে নিজেদের দেখুন। সাফল্য আসবেই আসবে।'

পূর্বে তিনি বাংলায় প্রাণের অফুরন্ত জোয়ারের সূচনাটুকু দেখে গিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সময় এসে দ্বিতীয়বার দেখলেন জীবন-তরু সতেজ হয়েছে। দেশের মাটি থেকে রস বেশ টানছে। তাঁর আশীর্বাদ অজস্রধারায় ঝরতে লাগল।

শিবাজি-উৎসবের সময়ে তিনি 'অনুশীলন সমিতি' পরিদর্শন করতে আসেন।

ব্যাটালিয়ান ড্রিল, লাঠি-তলোয়ার-ছোরা খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি দেখে খুব প্রীত হয়েছিলেন। সমিতির সভ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'পুরাতন ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, এমন একদিন ছিল যখন মারহাট্টিরা বাংলায় এসে উৎপাত করে যেত। 'বর্গী' নামে তারা অভিহিত হত। আজ হাওয়া বদলেছে। নতুন ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। স্বচক্ষে এই ক'দিন বাংলায় যা দেখেছি, শুনেছি এবং আজ যা স্বচক্ষে দেখলাম তাতে প্রতীতি হচ্ছে বাংলা দুরপাল্লায় মহারাষ্ট্রকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে যাবে। যদি বাংলা এবার গিয়ে মহারাষ্ট্রকে জিতে ফেলে আমি তাতে বিস্মিত হব না।' লোকমান্য তিলক ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন।

জনমান্য অশ্বিনীবাবু তিলক মহারাজের (তখন তাঁকে এই নামে সম্মান দেখানো হত) কথাগুলি বাংলায় তর্জমা করে সবাইকে শোনালেন। শেষ করলেন এই বলে—'তিলক মহারাজ বলেছেন যে তিনি বিস্মিত হবেন না, এবার বাংলা গিয়ে যদি মহারাষ্ট্রকে জিতে ফেলে। আমি বলি, বাংলা তা করতে যাবে কেন? বরং আমরা সবাই মিলে রাজনীতিক্ষেত্রে এমন খেলা খেলব যে, জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে।'

জনবরেণ্য দুই নেতার ভাষণে উৎসাহ ও উদ্যম শতগুণে বেড়ে উঠল—

'কাঁধে লাঠি, বদ্ধ-কটি মল্লের সমান
সেনানী-ইঙ্গিতে যবে করি অভিযান—
পুরাতন স্মৃতি মনে জাগে যে তখনি
শিরায় শোণিতস্রোত বহে যে অমনি!'

'যুগান্তর' একদিন লিখেছিল, 'রক্ত আমার উঠিছে নাচিয়া রুদ্ধ ধমনী বহিয়া।'

কংগ্রেস অধিবেশনের পর 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা' ও 'নবশক্তি'-র উপর রাজরোষ পড়ল। কিছু আগে থেকেই গুজব শোনা যাচ্ছিল যে এবার কাগজগুলি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করার চেষ্টা করবে।

গ্রেপ্তার হবার অরুণাভাসে গ্রেপ্তার-হোনেওলারা কদমফুলের মতো পুলকিত হয়ে উঠলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসতে দেরি হচ্ছে দেখে পূর্বরাগের গাওনা সুরু হল। 'সন্ধ্যা' লিখে বসল, 'সে সুখের দিন কবে-বা হবে? টিকটিকির পূর্ণ লাহিড়ী ওয়ারেণ্টো হাতে দেবে!' 'কারাগার স্বর্গ মানি, মা ব'লে টানব ঘানি'...ইত্যাদি।

'যুগান্তর'-এর ভাগ্য প্রথম খুলল। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি ভূপেনবাবুকে ধরে নিয়ে গেল। তাঁর বিচারের শেষ দিনে ২৪শে জুলাই ভূপেনবাবু একটি লিখিত জবানবন্দী* দাখিল করে দিলেন, 'আমার দেশের প্রতি যা কর্তব্য বোধ করেছি,

*ডাঃ দত্ত নিজে বলেছেন যে উক্ত Statement ব্যারিস্টার এ. চৌধুরী তৈরী করেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে সেটাকে গ্রহণ করেছিলেন। এটাই তিনি কোর্টে পড়েন।

তা আমি করেছি। আপনি যা ইচ্ছে সাজা দিতে পারেন। আমি তা স্বানন্দ চিত্তে সইব। (I have done what I thought to be my duty to my country. You may mete out any punishment you like. I will bear it cheerfully.)' বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তো জবানবন্দী শুনে অবাক— সবিস্ময়ে বলে ফেললেন, 'What things are coming to !—এসব কি হতে চলেছে !' এ ঘটনা ঘটে জুলাই মাসে। কোথায় লোক হাজার চেষ্টায় অব্যাহতি খুঁজবে, না তার জায়গায় সাধ করে জেল যেতে চাওয়া! ভূপেনবাবুর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। ভূপেনবাবু স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই। দেশের জন্য কারারুদ্ধ হওয়ায় তাঁর মাকে মহিলারা একটি সভা করে সম্মানিত করেন। সেই তাঁর মস্ত সান্ত্বনা। আভাস এল, বীরগণ জননীকে এমনি করে রক্ততিলক পরিয়ে যাবে।

'বিবেকানন্দ-জননী' শীর্ষক প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংবাদপত্রগুলিতে বেরুতে লাগল। ভূপেনবাবু বোধ হয় নিজেও জানলেন না তাঁর এ আত্মদানে কত ছাত্রকে আত্মদানের দীক্ষা দিল। আমার কাছে তিনি আজীবন একটি দৃষ্টান্তস্থল হয়ে রইলেন। এই তো প্রথম নিজেদের মধ্যে থেকে আদর্শ পাওয়া গেল। এযাবৎ তো আদর্শের জন্য ধার করতে ছুটতে হত পাঞ্জাবে, রাজপুতনায় বা মহারাষ্ট্রে। এবার নিজেদের পুঁজি হল। আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। ভগবৎকৃপায় সে অভাবনীয় সম্পদ বেড়ে চলল।

ক্রমে একের পর এক 'যুগান্তর'-এর মুদ্রাকরেরা সানন্দে কারাবরণ করতে লাগলেন। তখনকার দিনে কাগজের পিঠে সম্পাদকের নাম লেখার আইন ছিল না। সেজন্য সম্পাদক দণ্ডিত হতেন না। তাঁকে তো খুঁজে পাওয়া যেত না। জেল যাবার জন্যই আত্মদানেচ্ছু ছেলেরা 'যুগান্তর'-এর মুদ্রাকর হত। ভূপেনবাবুর পর বসন্ত ভট্টাচার্য, বৈকুণ্ঠ আচার্য, ফণী মিত্র ও বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে যান। তারানাথ রায় ও পূর্ণ সেন গেল নিজেকে উৎসর্গ করতে, কিন্তু কাঁচা বয়স দেখে হাকিম তাদের মুদ্রাকর হবার অনুমতি দিলেন না। পূর্ণর ছাত্রবন্ধু আমিও নিজেকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু ম্যানেজার আমাকে কম বয়সের জন্য ফেরত দিলেন।

এবার অরবিন্দবাবুকে ফাঁসাবার জন্য 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার উপর আনা হল রাজদ্রোহিতার মামলা। রাজা অমল বাগচি, অরবিন্দবাবু গ্রেপ্তার হলেন। কালিচরণ-বিধুভূষণের ন্যায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়েও অরবিন্দবাবুর বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ হল না। এবার বিপিনচন্দ্রকে মানা হল সাক্ষী। তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক। অতএব আসার সময় কাকে সম্পাদকীয় ভার দিয়ে আসেন সে-কথা তাঁর কাছ থেকে বেরুতে পারবে। বিপিনচন্দ্র এজাহার দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বলেন, 'শপথ গ্রহণ করব না, সাক্ষ্যও দিব না।' তাঁকে প্রশ্ন করলে বলেন, তাঁর বিবেকের দিক

থেকে সাক্ষ্য দিতে আপত্তি আছে। মোকদ্দমার শেষ শুনানির আগে তিনি 'নবশক্তি'তে লেখেন এবং গোলদীঘিতে বক্তৃতায় বলেন, 'কেন সাক্ষ্য দিলাম না'। সে সভায় মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনও বক্তৃতা দেন। মৌলবীসাহেবকে খরচের খাতায় ধরা হয়েছিল। কারণ বরিশালে তাঁর নামে মোকদ্দমা ঝুলছিল। তিনি এখান থেকে সোজা শেয়ালদা গিয়ে ট্রেন ধরেন। বরিশালে গিয়ে কারারুদ্ধ হন। বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এই—'বন্দেমাতরম্' আমার মানসপুত্র। ইংরেজ সরকার এমনি দয়ালু যে আমায় বলছেন আমার পুত্রের বুকে নিজের হাতে ছুরি বসিয়ে দিতে। আমি তা কেমন করে পারি? না পারার ফলভোগ করতে হবে। সে ভোগ স্বেচ্ছায় কারাবরণ। তাতে কি? প্রভু যীশু একদিন এমনি করে বিদেশী আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁকে কণ্টকের মুকুট পরিধান করতে হয়েছিল। সাধারণ দস্যুদের সঙ্গে একত্র ক্রুশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বিদেশী রাজশক্তির জিঘাংসা চরিতার্থ হয়েছিল বটে। কিন্তু যে সত্যের জন্য তিনি লাঞ্ছিত, অপমানিত, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন—তাকে কি ধামা-চাপা দিয়ে রাখতে পেরেছে? আমায়ও ভাই কাঁটার মুকুট পরতে হবে। তোমাদের কাছ-ছাড়া হয়ে যেতে হবে। মায়ের সেবা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু এও ঠিক, রাতের আঁধারের পর যেমন অরুণোদয় হয়—তেমনি ভারতের এই স্বাদেশিকতা আমাদের অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে শক্তিশালী এবং আয়ুষ্মান্ হবে। তোমার, আমার, সবার স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সত্য হবে! বন্দেমাতরম্…'

নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধে জেল যাওয়ায় বিপিনচন্দ্র সেদিন সাধারণ মানুষের ঢের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন। বিপিনবাবুর ছ'মাস বিনাশ্রমের জেল হয়। ১৯০৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধগুলি লেখার জন্য 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা হয়। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রথম আড়াই মাস এবং শেষের ছ'মাস বিপিনচন্দ্র সম্পাদক ছিলেন। মধ্যের দেড় বছর সম্পাদকের নাম কেউ জানত না। শুধু একদিন অরবিন্দের নাম প্রকাশ হয়। 'বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমা'য় সরকার হারল। রাজা অমল বাগচি খালাস পেলেন।

'সন্ধ্যা'র উপাধ্যায় মহাশয়ের মামলা আরও জবর। তিনি কাগজে লিখেছিলেন, 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'। ৩১শে অগস্ট ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রাজদ্রোহিতার অপরাধে মামলা-সোপর্দ হন। মামলার সম্বন্ধে লিখলেন, 'অন্টরম্ভা ভবিষ্যতি'। আদালতে হাজির হবার দিন তিনি বেরুলেন যেন ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন। মুদ্রাকর হরিচরণকে সাজালেন বর। নিজে সাজলেন বরকর্তা, হাতে একছড়া কলা। একজন শাঁখ বাজাতে বাজাতে চললেন। গাড়িতে তিনজন এইভাবে যাওয়ায় 'ফিরিঙ্গী আদালত' ও বিচারককে নিয়ে তো প্রহসন করা হলই, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গী সরকারকেও।

আদালতে বেজায় ভিড় হয়। ইংরেজ সরকার ও তার আদালতকে অস্বীকার করে তিনি এই বিবৃতি দিলেন: 'I accept the entire responsibility of the Paper and the article in question. But I don't want to take any part in the trial, because I do not believe that in carrying my humble share of this God-appointed mission of 'Swaraj'. I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development.'

তিনি বলেছিলেন—ফিরিঙ্গী সরকার তাঁকে জেলে দিতে পারবে না। ছেঁড়া চটিজুতোর মতো তিনি, জেলে যাবার আগে, দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন। হলও তাই কার্যতঃ। 'যুগান্তর' বা 'সন্ধ্যা'র কেউ গ্রেপ্তার হলে প্রায়ই ভারত-ভাণ্ডারের (স্বদেশী বস্ত্রালয়ের) অধিকারী অতীন্দ্রনাথ বসু জামিন হতেন। উপাধ্যায়মশাই জামিনে থাকা অবস্থায় হাসপাতালে হার্নিয়া অপারেশন করান এবং সেই অবস্থায় মারা যান।

এরপর যান মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিবৃতিতে তিনিও আদালতকে অস্বীকার করেন। তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হয়। পরে তিনি স্বামী বিদ্যানন্দ নামে পরিচিত থাকেন। 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে যায়। 'মিটমাট অসম্ভব' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য মামলা হয়।

সম্ভবতঃ তারক দাস এই সময়েই টোকিও (জাপান) হতে অরবিন্দর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে একখানি পত্র পাঠান।

কী শক্তিই না ব্রহ্মবান্ধব সেদিন সঞ্চার করলেন সারা দেশে! উপাধ্যায় মহাশয়ের দেহান্ত হলে মনে হচ্ছিল যেন একটি দিক্‌পাল চলে গেলেন। দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। আর কে এমন করে লিখবে? কে এমন ভাব জাগাবে? তাঁর স্থান অপূরণীয়। সাধারণ লোকের মনের ওপর এমন অধিকার আর কারও ছিল না। এলেন এঁর জায়গায় স্বামী নিরালম্ব। ইনি এসেই লিখলেন 'মরি নাই, আবার আসিয়াছি'। সে লেখায় দেশব্যাপী সাড়া পড়ে গেল। তাতে 'সন্ধ্যা'র ওপর আবার সরকারী উৎপীড়ন এসে পড়ল। 'সন্ধ্যা' কাগজের পরিচালকবর্গ এত তাড়াতাড়ি হানার ওপর হানা সইতে প্রস্তুত ছিলেন না। মতান্তর হল। স্বামিজী শেষ পর্যন্ত 'সন্ধ্যা' অফিস ছেড়ে অনাথ রায় কবিরাজ মহাশয়ের বাড়িতে চলে এলেন। সেখানে ছিল 'যুগান্তর' কাগজের প্রধান কেন্দ্র। এইসব ঘটনা ঘটে ১৯০৭ সালে।

নবম পরিচ্ছেদ

পুনরাবৃত্তি এসে পড়লেও একটা কথা বলতে হবে। 'অনুশীলন সমিতি'র জন্ম, উত্থান ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের ইতিহাস দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের নবযুগের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ হিসাবে যদি আমরা কিছুই না হলাম, তবে উন্নতি, স্বাধীনতা এসব কথা অর্থহীন হয়ে যায়। জঙ্গলে জন্তুরা স্বাধীন। সে স্বাধীনতার দাম কি? তা নিয়ে হবেই-বা কি? সভ্য মানুষ সভ্যতার চরম শিখরে উঠতে চায়। সে ওঠাটার মাপকাঠি কি হবে?

সভ্যতা বলতে কি বুঝতে হবে? আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রয়োজনে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি যেখানে বাহিরের বিপদ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা, আহার ও আশ্রয়ের বিলি বন্দোবস্ত করালো, মানুষ সেখানে যা দেখালো তা হল 'সভ্যতা'। অথবা এও বলা যেতে পারে যে, ক্রমবিকাশে জীবনের যে স্ফুরণ এল, যাতে করে মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে নিজের কাজে লাগাতে পারল—তাই হল 'সভ্যতা'। প্রকৃতির শক্তিগুলির উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপনে মানুষ তার সভ্যতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতির যে শক্তিগুলি মানব-নিরপেক্ষ বা বাহ্যিক জগতে অবস্থিত শুধু তার জয়েই তো পূর্ণ সভ্যতার বিকাশ নয়! তার বিকাশ মানুষের নিজের ভিতরেও প্রকৃতির যে শক্তিগুলি আছে, সেগুলিকে বশ্যতায় আনতে পারায়। ভিতর-বাহির জয় হলে তবেই হবে পরিপূর্ণ সভ্য মানব। অন্ততঃ এইটেই ভারতের অতীত কালের শিক্ষা-সাধনার ভিতরকার কথা।

এসব প্রশ্ন উঠেছিল প্রবর্তকদের মনে। 'নিউ ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট'-এর হেডমাস্টার নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশবাবু, পুলিন মুখার্জী প্রভৃতির সঙ্গে চিন্তার মিল পেয়ে প্রথমে তাঁর স্কুলে সমিতির অধিবেশন করেন। দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে তাঁদের নজর গিয়েছিল। সমাজ সেবায়ও তাঁরা মন দেন। আর্তের সেবা, বিপন্নকে সাহায্য ছিল বড় একটা দফা তাঁদের কার্যসূচীতে। বঙ্কিমবাবুর ঢালা ছাঁচে তাঁরা নিজেদের গড়তে চাইলেন। বঙ্কিমবাবু তো এ সময় গত হয়েছিলেন—শুধু তাঁর লেখার মারফৎই প্রেরণা রেখে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমবাবুর আদর্শটি বজায় থাকে অথচ সামনে থেকে আদেশ-উপদেশ, উৎপ্রাণনা-দেনেওলা যদি কাউকে কাছে পাওয়া যায়, মন স্বতঃই চায় তার দিকে ছুটতে—ঝুঁকতে। তেমন লোক সৌভাগ্যবশতঃ জুটে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন আমেরিকায় 'জগৎ-ধর্মসভা'র দিগ্বিজয়ী বীর স্বামী বিবেকানন্দ। মূর্তি গড়া হয়েছিল, অভিষেক হয়েছিল বঙ্কিমবাবুর ছাঁচে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্রে। বিবেকানন্দ ছিলেন 'অভী'র পূজারী—দেশপ্রেমিক, সম-সমাজবাদের বীজমন্ত্র দাতা। জাতির ঐতিহ্যকে হেলা না করে, তার

থেকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালাতে তিনি বলতেন। নিজের জীবনেই তিনি ভারতে বিপ্লব দেখে যাবেন এমন কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তাঁর জীবন অবসন্ন জাতের সৌরমণ্ডলে তেজ ও আলো এনে দিয়েছিল অকাতরে। নিবন্ত সূর্য আবার ভাস্বর হয়ে উঠল। সবার কাছে জুতোর ঠোক্কর খাচ্ছিল ইদানীং যে জাতটা, তাকে তিনি উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। দুর্দিনেও এ গরিমা যে পায়, সে কি সেটাকে অবহেলা করতে পারে? পতিত, দুর্গত, পর-পদানত, পরাধীন ভারতবাসী মনে মনে নিজেকে মহীয়ান্ ভাবতে লাগল। বিবেকানন্দের বাণী—'ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ জনের কথা শুনে এগিয়ে চলো' —ভারতের আনাচে-কানাচে পৌঁছেছিল। অনবদ্য ছিল তাঁর প্রতিভা ও প্রভাব। স্বামিজীর দেহান্তের পূর্বে 'সমিতি'র প্রতিষ্ঠাকর্তারা সাক্ষাৎভাবে স্বামিজীর সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন; উপদেশ অনেক নিয়েছিলেন।

দেশ, দেশ, আমাদের এই দেশ! একেই আমাদের বড় করতে হবে। ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে সবরকমে একে তুলতে হবে। 'সমিতি' প্রবল দেশপ্রেমের ডাক শুনল—বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট, যোগেন বিদ্যাভূষণের নিকট এবং সর্বশেষে জীবন্ত, জাগ্রত, তেজোবীর্যসম্পন্ন বিবেকানন্দের কাছে। সেবা-সমিতি প্রেরণার উৎস-সন্ধানে গিয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আজকাল লেনিন-এর নাম শুনলে ভারতীয় যুবকের মনে যেরকম সাড়া জাগে, তখনকার দিনে ম্যাট্‌সিনির নামে তাই হত। ভারতে-জাগা প্রাণ ভারত ছেড়ে ছুটে গেল বিশ্বে তার আহার্য যোগাড় করতে। ভারতের রাজনীতি রাজ-সরকারের চিত্তে করুণা উদ্রেক করতে খোশামুদির পোঁচড়া থেকে আরম্ভ ক'রে সসম্মানে সমালোচনা দিয়ে আবেদন-নিবেদনের পৈঠেয় পৌঁছায়। সেখানে ব্যর্থকাম ও ভেটের ঝুড়ি মাথায় করে যাওয়া-আসার পথে বার বার দরজায় মাথা ঠুকে মাথা ফুলিয়ে জেরবার হয়। তখন জাগল মর্যাদার চেতনা। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' এই মহাজন-বাক্য মনে বসে গেল। স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পণ নিয়ে রাজনীতির মোড় ফিরল। লাগল ন্যায় ও অন্যায়ে ঠোকাঠুকি। ন্যায় বলে, আমার আসন আমায় ছেড়ে দাও। আমার জন্মগত স্বাধিকার আমায় পেতেই হবে। অন্যায় বলে, সে কি করে হবে? আমি যে এখানে ডেরা পাকড়ে আছি। কোনও পাপ কোনোদিন কি আত্মহত্যা করেছে? যদি ন্যায়ের দাবি তোমরা করো, অন্যায়ের দাবি আমরা ছাড়ব না। এর কাছে পথের কোনো বাঁধাধরা দাবি হার মানল। ব্যর্থতা, অপমান, জাগ্রত আত্মসম্মান-জ্ঞান, নিষ্ফল আক্রোশ, প্রতিকারপরায়ণতা, জাতির অপমানের শোধ নেওয়ার প্রবণতা, নৈরাশ্য—এইগুলো গোলে-তালে কাজ ক'রে পথের দাবির নেশা জমিয়ে তুলল।

এবার প্রত্যক্ষ আন্দোলনের দিন এল। আন্দোলন আরম্ভ হল বঙ্গভঙ্গের প্রতিবিধান নিয়ে। বঙ্গভঙ্গ রদ হতে হতে জাতির সক্রিয় চেষ্টায় যে দাবি জন্মে

গিয়েছিল—সে এগিয়ে পড়েছিল অনেক দূরে। তাকে আংশিক মেটাতে যে কালক্ষয় হল, ততক্ষণে দাবি এগিয়ে চলেছিল আরো আগে। এই দাবি মেটাবার কাছাকাছি আসতে না-আসতে সব দাবির সেরা দাবি খাড়া হয়ে পড়ল। এখানে ক্রমবিকাশের চমৎকার একটি ধারা প্রবাহিত হয়। 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রদ', 'প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব', 'দেশের স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস', 'স্বাধীনতার সার', 'পূর্ণ স্বাধীনতা', 'মোট-ঘাট নিয়ে পথ দেখো'—এই রাজনৈতিক দাবিসমূহের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি মানস চক্ষের সামনে রেখে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে। এর সঙ্গে বাংলার সমিতিগুলির ভাগ্যচক্রের খেলাও দেখে যেতে হবে।

দেশে মরাগাঙে বান এল বটে, কিন্তু বিদেশী সরকার চুপ করে বসে রইল না। ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভারতীয়দের যে আনুগত্য ও ভক্তি ছিল, সেটাকে কি করে কাজে লাগানো যায় সেই চেষ্টা তারা দেখতে লাগল। অবশেষে কুইনের নাতি প্রিন্স-অফ-ওয়েলসকে (পরে ইনি হন পঞ্চম জর্জ) ১৯০৫ সালের শেষে এখানে আনা স্থির হল। কুইনের পুত্র সপ্তম এডওআর্ড কি জানি কি কারণে আসেন নি। সে কী রাজভক্তির সহজাত প্রদর্শন! লোকে মফস্বল থেকে রেল বা স্টীমারে সওয়ার হয়ে এসে রাজকুমারকে দেখে রাজদর্শনের ফল লাভ করতে ভিড় লাগাল। মনে হল, সমসাময়িকভাবে স্বদেশীর পালে যে হাওয়া লেগেছিল তা পড়ে যাবে। কিন্তু আমলাতন্ত্রকে শত শত ধন্যবাদ! তারা নিজগুণে আন্দোলনটিকে বাঁচিয়ে দিল। নইলে হয়তো ঈশ্বরের দশমাংশ (রাজা) ধার্মিক জনসাধারণের ভক্তি-অঞ্জলি ঠিকমতো পেয়ে যেতেন।

'অনুশীলন সমিতি' প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড নিয়ে চলতে আরম্ভ করে। এর কার্যসূচী ও কর্মীদের সেবাকার্য দেশের ও দশের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই হল তখনকার গঠনমূলক কর্মসূচী।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, পি. মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজা সুবোধচন্দ্রের পিতৃব্য মন্মথ বসুমল্লিক, সুরেন্দ্রনাথের ভাই ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন ও আর্য সমাজের কয়েকটি স্বামিজী সমিতিকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন এবং কোনো কিছু শেখাবার উদ্দেশ্যে এসে উপদেশ বা বক্তৃতা দিয়ে সভ্যদের উৎসাহিত করতেন।

স্যার গুরুদাস বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। মনুষ্য-জীবনে কি করা উচিত, সে বিষয়ে অনেক সদুপদেশ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ মনোজগতের কারবারী। তিনি মনের সম্পদ বাড়াবার জন্য যথেষ্ট করতেন। নিজে গান গেয়ে শোনাতেন; 'স্বদেশী সমাজ' গড়ে তোলার পরিকল্পনা সামনে ধরতেন। দীনেন্দ্র-

নাথকে তাঁর রচিত স্বদেশী সঙ্গীত শেখাবার জন্য প্রয়োজনমতো রবিবারে-রবিবারে পাঠিয়ে দিতেন। দেশ বলতে কী বুঝতে হবে, দেশের উন্নতি বলতে কাকে বোঝায়, সমিতি-জীবন কেন এবং জীবনে কী আহরণ করতে হবে—এসব বুঝিয়ে বলতেন।

বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্রনীতির ক্লাস নিতেন। সি. আর. দাস রাষ্ট্রনীতিক সংঘর্ষের রূপ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন—দেশের ঐতিহ্যের উপর খুব জোর দিতেন। প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী রাজনীতির অর্থনীতিক ব্যাখ্যা শোনাতেন। অপূর্ব ঘোষ আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। সখারামবাবু ইতিহাসের ক্লাস নিতেন। অর্থনৈতিক দিকটা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'দেশের কথা' সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

পি. মিত্র বলতেন কম, কিন্তু সমিতির সর্ব-বিভাগের পরিদর্শন তিনিই করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দ গীতার ক্লাস নিতেন। মন্মথবাবু (রাজা সুবোধচন্দ্রের কাকা) 'জীবন-সংঘর্ষ' আখ্যায়িকায় বক্তৃতা করতেন। তাতে সোশ্যিয়ালিজম-এর গোড়াকার কথা ভরা থাকত। সোদপুরের শশীদা গণজাগরণের কথা শোনাতেন। বহু মহাপুরুষের জীবনী পাঠ হত।

সমিতি শহরের বিভিন্ন পল্লী থেকে সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করত। দীন-দুঃখীদের ভাগ করে দেওয়া হত সেগুলি। প্রতি রবিবার সকালে ভিক্ষা-সংগ্রহ, বিকালে তাই বিতরণ ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'মর‍্যাল ক্লাস' হত।

'মর‍্যাল ক্লাস' শেষে ফুটে উঠেছিল ট্রেনিং ক্লাসে। এখানে বিচার-বিবেচনা হত এইসব বিষয়ে—সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা, নীতিশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান, সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের), প্রাথমিক চিকিৎসা, ভারতের ঐতিহ্য ও দর্শনাদি।

ক্লাস আরম্ভ হত 'বন্দেমাতরম্' গেয়ে; তাছাড়া রবিবাবুর গান এবং অন্যান্য গান, যেমন 'স্বদেশের ধূলি, স্বর্ণরেণু বলি রেখো রেখো হৃদে' এ ধ্রুবজ্ঞান' প্রভৃতিও গাওয়া হত।

এখানে বাছা বাছা বইয়ের একটি সুন্দর লাইব্রেরী ছিল। সে বিষয়ে রবিবার আলোচনা হত, কিশোরদের সেই বিষয়ের আবশ্যকীয় বইয়ের নাম বলে দেওয়া হত। সভ্যরা বইগুলি বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়তেন। তাছাড়া তাঁরা পড়লেন কিনা সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হত। যেখানে শক্ত লাগত বক্তা সেখানটা বুঝিয়ে দিতেন। ভালো-লাগা জায়গাগুলি টুকে রাখতে বলা হত।

অধুনা আমেরিকা-প্রবাসী তারকনাথ দাস বলতেন—খবরের কাগজের যে লেখাগুলি ভালো লাগে তা কেটে খাতায় আঠা লাগিয়ে জমিয়ে রাখতে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষায় যে ফাঁক থাকত তা এখানে পূরণ করা হত। তাছাড়া

ছাত্রদের জন্য 'কোচিং ক্লাস' ছিল। বাড়িতে আলাদা প্রাইভেট শিক্ষক রাখার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় অনেক অভিভাবক ছেলেদের 'সমিতি'র সভ্য করে দিতেন।

রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার তো ছিলই। দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের জন্য সাহায্য-সংগ্রহ ও বিপন্ন স্থানে গিয়ে সাহায্য-বিতরণও 'সমিতি'র কাজ ছিল। বর্ধমানে, উড়িষ্যায় সাহায্যার্থে প্রথমে লোক পাঠানো হয়।

সমবায়-প্রথায় আহার্যের জন্য একটি দোকান খোলা হয়েছিল। তাছাড়া 'বেঙ্গল স্টোর্স' নামে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান রাখা হয়।

তলোয়ার, লাঠি, ছোরা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি ও ড্রিল শিক্ষা দেওয়া হত। কুস্তির জন্য নন্দ সিং নামে এক পাঞ্জাবী শিখ পালোয়ান রাখা হয়েছিল। 'বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরি'র ভারপ্রাপ্ত জাপানী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দুজন 'গিকিন' বা জাপানী তলোয়ার খেলা শেখাতে আসতেন। এঁদের কাছে জুজুৎসু খেলাও দেখা গিয়েছিল। একজন জুজুৎসুর পালোয়ান আসে। স্যান্ডো-র শিষ্য একজন জার্মান মল্লও সে সময়ে আসে। ব্যায়ামবীর স্যান্ডো-র নাম তখন জগৎ-জোড়া। জার্মান ও জাপানীতে লড়া হল। Y.M.C.A.-তে (হ্যারিসন রোডে) একদিন সমিতির সভ্যরা প্রদর্শনীর খেলা দেখাতে যায়। সেইদিনই এদের খেলার পর ঐ ম্যাচ্ বা মল্লযুদ্ধ হয়। লম্বা-চওড়া, প্রবল জোয়ান জার্মানকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল-চেহারার খাটো-সাইজের জাপানী পলকের মধ্যে হারিয়ে দেয়।

সমিতির সভ্যরা কলকাতা ও শহরের বাইরে নানা স্থানে 'প্রদর্শনী খেলা' দেখাতে যেত। এতে সমিতির পৃষ্ঠপোষক, অনুগ্রাহক, সমর্থক সংগ্রহ হত এবং প্রতিপত্তি খুব বাড়ত। নতুন নতুন কত আখড়া বা ক্লাব খোলা হত।

সমিতিতে দুর্গাপূজা হত এক নতুন রকমে। কোনো মূর্তির স্থান সেখানে ছিল না। বহুরকম অস্ত্রশস্ত্র, লাঠি, ছোরা, তলোয়ার প্রভৃতি একত্র করে সুন্দর রূপে সাজিয়ে তারই সামনে বসে পূজা হত। পুরোহিত—ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ যে উপযুক্ত সাব্যস্ত হত, সেই হত। হোম হত—হোমাগ্নির সামনে সভ্যরা বসতেন ও এই মন্ত্র পাঠ করতেন :

"ইত্থং যদা যদা হি বাধা, দানবোত্থা ভবিষ্যতি,
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি—
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!"

'বন্দেমাতরম্' তো গাওয়া হতই। তাছাড়া স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক আরও বহু গান গাওয়া হত। এই গানটিও গাওয়া হত :

"দীন-দুঃখ-হরা তারা, করো কৃপা বিতরণ,
একবার অন্নপূর্ণারূপে দাঁড়াও মা, হেরি তোমার শ্রীচরণ!

হৃদয়ে নাহি বল, দেহ যে কঙ্কাল—যেন 'মা' ব'লে মা ডাকতে পারি !
প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার করে অন্নের কাঙাল হয়েছি মা !
(এই রত্নপ্রসূ ভারতভূমে অন্নের কাঙাল হয়েছি মা !)"

বিদেশী শাসনে শোষণে দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার একটা অর্থনৈতিক ছাপ যুবক কর্মীদের মনে জেগে উঠত।

১৯০৫ সালে বিপিনচন্দ্র ও পি. মিত্র স্বদেশী প্রচারের জন্য ঢাকা যান। সেথায় পুলিন দাসের সঙ্গে এঁদের আলাপ ঘটে। পুলিনবাবু পূর্ববঙ্গে 'সমিতি' গঠনের ভার নেন। ১৯০৬ সালে একদল কলকাতা থেকে বরিশালে আমন্ত্রিত হয়ে খেলাধুলো দেখিয়ে আসে। এইরূপে 'অনুশীলন সমিতি' সমগ্র বাংলায় একটা ছিল। সঞ্চালক বা নির্দেশক ছিলেন মিত্তিরসাহেব (ব্যারিস্টার পি. মিত্র)। পুলিনবাবু ও সতীশবাবু পালা করে এক এক বছর সাধারণ সম্পাদক থাকতেন। একবার বিশ্ববিখ্যাত পাঞ্জাবের গোলাম পালোয়ানের ভাই কাল্লু ও কিক্কড় সিং-এর কুস্তির ব্যবস্থা হয়। কিক্কড় সিং কলকাতায় সমিতির বাড়িতে সদলবলে এসে থাকেন। বিখ্যাত মাদ্রাজী ব্যায়ামবীর রামমূর্তিও এই সময় সমিতির বাড়িতে থাকতেন। রামমূর্তিই প্রথম শেকল-ছেঁড়া ও বুকের ওপর হাতি-তোলা খেলা দেখান।

'সমিতি'র নাম এইরূপে মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ল। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে 'নিরালম্বস্বামী') প্রভাবে আসেন সে সময় পাঞ্জাবের কিষণ সিং প্রভৃতি।

বাড়ি ছেড়ে আসার জীবন আসবেই। সেজন্য বেছে বেছে সভ্যদের এখানে একত্র রাত্রিবাস করানো হত। মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও অনুকম্পা এতে জমে উঠত।

১৯০৭ সালে অর্ধ-চন্দ্রোদয় যোগে বহু গঙ্গাস্নানার্থী কলকাতায় আসেন। এত অধিক জনসমাগম খুব কমই দেখা যায়। পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য বেসরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। 'সমিতি' এতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। সে সময়ের ছাত্র ও যুবকরা এই বন্দোবস্তে কাজ করতে আনন্দিত বোধ করে। 'আত্মোন্নতি সমিতি'ও খুব পরিশ্রম করে। দুটি সমিতির নাম থেকে বোঝা যায় এদের প্রতিষ্ঠার সময় উদ্দেশ্য একরূপই ছিল। সময়ের গুণে ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দুই-ই বলতে গেলে এক পথের পথিক হতে বাধ্য হয়।

আমরা ও প্রতীচ্যবাসীরা দুই-ই মানুষ। দোষত্রুটি উভয়েরই আছে। যেখানে ওরা বড় বা আমরা ছোট থেকে গেছি সে হচ্ছে দেশের বা জাতের প্রয়োজনে, এক উদ্দেশ্যে, একের অধীনে এবং অধিনায়কত্বে ওরা ভেদাভেদ ভুলে কাজ করতে তৎপর। আমরা কাজ বেগড়াতে তৎপর। এই দোষটা না মারতে পারলে আমরা উন্নতির আশা করতে পারি না। এই শিক্ষাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমিতির সভ্যদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

অর্ধোদয়-যোগ এরূপ সংশিক্ষার একটা সুযোগ এনেছিল। সে সুযোগ হারানো হল না। খুব সুন্দরভাবে, সুশৃংখলে কার্য সমাধা হয়। বহু লোকের আশীর্বাদ কুড়ালো সমিতি। পুলিস কমিশনার হ্যালিডেও মুক্তকণ্ঠে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসা করেছিলেন। সমিতি নিজ শক্তির খোঁজ পেল এবং একটা মহলা দিয়ে কৃতকার্য হল। কলকাতার কেন্দ্র-সমিতির সুনাম মফস্বলের সমিতিগুলিতে বিচ্ছুরিত হল। তারাও স্ফূর্তি লাভ করল। নিখুঁত, নিয়মানুগ, শক্তিশালী সকেন্দ্রিক সংঘের গুণ আস্বাদিত হল। জাতীয় জীবনে এ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। যা এতদিন সমিতিতে শেখানো হচ্ছিল, এবার তা ব্যবহৃত হল। শক্তি বাড়ল। সময়ের পরিবর্তনে সরকারের নির্যাতন-নীতিতে যখন জাতি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল তখন নবজাগ্রত যুবকরা প্রতিশোধপরায়ণ হল।

সমিতির নির্দেশক দুটি কার্যকরী কেন্দ্র বা চক্র গঠন করেন—(ক) আভ্যন্তরিক (Inner circle); (খ) বহির্ভাগীয় (Outer circle)।

আভ্যন্তরিক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা গুপ্ত-বিভাগের মতোই ছিল। সাধারণ সভ্যেরা এটির সংবাদ জানতেন না। এইখান দিয়ে অরবিন্দ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব), সি. আর. দাস, সুরেন ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে 'অনুশীলন'-এর নির্দেশক মিত্রসাহেবের সঙ্গে যোগ ছিল। সমিতির কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী গঠনকার্য কতকটা সামরিক ঢঙে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গঠনকার্য সম্পন্ন হলে বৈদেশিক শাসনযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবেন, এইরূপ ভাবধারা কর্তৃপক্ষের মনে ছিল।

বহির্ভাগীয় বিভাগ জনমত গঠন ও গণসহানুভূতিলাভের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করত। সমিতির সভ্যদের মন, মত, শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি, সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা হত। প্রচার, আন্দোলন, আনুষ্ঠানিক গঠন এদিক দিয়ে চলত। লোক সংগ্রহ হত এবং তার থেকে লোক বাছাই করা হত। সারা বাংলায় এইভাবে আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চলেছিল—সমিতির সভ্যদের গোড়ার দিকে একটা প্রতিজ্ঞা নিতে হত; শুনতে পাই পরে মিত্তিরসাহেব, সতীশবাবু ও পুলিনবাবু তিনজনে মিলে প্রতিজ্ঞাটিকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—আদি ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞা। আভ্যন্তরিক বিভাগে এলে আদি প্রতিজ্ঞা নেওয়া বিধি ছিল। অন্তর্বিভাগে বিশেষ যোগ্যতা দেখালে অন্ত্য প্রতিজ্ঞা নিতে হত। আমায় কোন প্রতিজ্ঞা নিতে হয় নি।

এইখানে পরিষ্কার করে দু' একটা কথা বলা প্রয়োজন। মিত্তিরসাহেব যুবকদের সংহত করার দিকে যত নজর দিয়েছিলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকে এগিয়ে দিতে ততটা পারছিলেন না। এই নিয়ে কয়েকটি যুবকের সঙ্গে দাঁড়াল মতান্তর। তাঁরা চাইলেন প্রচারের জন্য একটি সংবাদপত্র এবং উগ্র কর্মের একটি তালিকা। এই উগ্র কর্মের দ্বারাও প্রচার হয় এবং লোক-সংগ্রহ বাড়ে। মিত্তিরসাহেব তখন এই

পরিকল্পনার যুক্তিবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। সেইজন্য বারীন ঘোষ, ভূপেন দত্ত, দেবব্রত বসু প্রভৃতি আলাদা করে প্রচার বিভাগ গড়ে তোলেন ; ১৯০৬ সালে মার্চ মাসে যুগান্তর-আনয়নকারী 'যুগান্তর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তাতে খোলাখুলি ইংরেজ তাড়ানোর কথা বহু ভাবে লেখা হতে থাকে। বলা যেতে পারে মূল প্রতিষ্ঠানের নাম রইল 'অনুশীলন' ; দলীয় কাগজের নাম হল 'যুগান্তর'। নামে মিত্তিরসাহেব সবটার মাথার উপর রইলেন। আভ্যন্তরিক বিভাগের শক্তি হল যুগান্তরীয় ঝাঁকটি।

এক দল এবার সন্ত্রাসবাদের সমর্থক হয়ে উঠল। তারা এখনই কাজে নামতে চায়। সমিতির কর্তৃপক্ষের কাছে এরূপ প্রস্তাব এলে মিত্তিরসাহেব তা নাকচ করে দেন। এর ফলে বারীনবাবুরা সমিতি থেকে আলাদা হয়ে যান। অরবিন্দবাবু, বারীনবাবু তখনই সংঘর্ষের পোষক ছিলেন। এই সময়কার 'যুগান্তর'-এর লেখা দেখে পরিষ্কার বোঝা যেত হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে। ঠিক এইসময় এরূপ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত আমার বন্ধুদের মনকে তোলপাড় করতে থাকে। ম্যাট্‌সিনির ইটালীয় সংগঠন এবং আইরিশ, রুশ বিদ্রোহীদের সংগঠন থেকে যুবকরা আহার্য সংগ্রহ করছিল। আমাদের মধ্যে আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস যথেষ্ট পঠন-পাঠন ও পর্যালোচনা হত।

সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে একমত হয়ে গিয়েছিল আমার বন্ধু প্রভাস দেব। সে ও আরেকজন (মহেন্দ্র দাস) বারীনবাবুর মত প্রচার করছিল সমিতির কিছু ছেলেদের মধ্যে। আমার অন্য বন্ধুদের তারা প্রায় তাদের মতে মিলিয়ে ফেলেছিল। গুপ্ত-সমিতির প্রয়োজনীয়তা আমরাও স্বীকার করেছিলাম। কারণ প্রবলপরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুঝতে গুপ্ত পরামর্শ ও ব্যবস্থা মানবসমাজের মতোই পুরাতন ব্যাপার। এটা সব দেশের রাজনীতিকরা সমীচীন মনে করে এসেছেন।

আমি এখনই একটা কিছু করে ফেলার বিপক্ষে মত দিই। সন্ত্রাসবাদে আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি যা বুঝতাম তাই বন্ধুদের বোঝাতে লাগলাম। সন্ত্রাসবাদ সাফল্য লাভ করতে পারে না। এই 'বাদ' নিজেই হচ্ছে ধৈর্যহারা উত্তেজনাপ্রবণ মনের সন্তান। নৈরাশ্যজাত। নৈরাশ্যের কথায় কোনো জাতকে বড় করা যায় না। ব্যর্থতা হচ্ছে এর কপালের টীকা। জাতকে আশার বাণী শোনাতে হবে। দেশের লোক যতক্ষণ সমর্থক না হচ্ছে ততক্ষণ উপায় নেই। সেজন্য অধীর হলে তো চলবে না? ধৈর্যসহ কাজ করে বিপ্লবের কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লব চতুরঙ্গ। ছাত্র, কৃষক, মজুর ও সৈন্যকে এতে ভেড়াতে হবে। ভারত স্বাধীন হবে মানে, কী হবে? কয়েকজন উচ্চস্তরের ভারতবাসী বিভাগীয় কমিশনার বা লাট-পরিষদের সভ্য বা লাট-গভর্নর হলে তো হবে না? জাতটা আমাদের থাকে গ্রামে।

করে কৃষিকাজ। মরে খাজনার চাপে—ঋণে, রোগে, অস্বাস্থ্যে। তাদের মন যাতে সাড়া দেয়, তাদের মুখে যাতে হাসি ফুটে ওঠে—তেমন কার্যসূচী নিতে হবে। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা পাঁচজন। তারা চায় রাজশক্তি নিজের হাতে নিতে। তার মানে 'তাদের সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। পদ, মান, মর্যাদা এই হলেই তারা থেমে রইল। বাকিরা কৃষক, কারিগর, মজুর। মজুর মানে দৈহিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রমিক। তাদের মন চায় ভাত-কাপড়ের সংসার। এখন এই দুটোকে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে—একসঙ্গে জুতে জাতীয়-রথ চালাতে হবে। তাহলে তার মানে কি হচ্ছে? শিক্ষিতদের অর্থনৈতিক কার্যসূচীতে বেশী মন দিতে হবে এবং অশিক্ষিত জণগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে হবে। অতএব কৃষক, কারিগর ও মজুরদের মধ্যে কর্মকেন্দ্র খোলা হোক। এদের সমর্থন না পেলে বিপ্লব বা বিদ্রোহ কিছু টিকবে না। ১৮৫৭ সালে সিপাহীরা সশস্ত্র স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা করেছিল। তাদের চেষ্টা পণ্ড হল কেন? ঝাঁসির রানী, তাান্তিয়া, নানাসাহেব, কুমার সিং, বাহাদুর শাহ এবং হিন্দু-মুসলমান সৈন্যরা নিরর্থক ভেসে গেল—শুধু ভারতের জনসাধারণ সমর্থন করে নি বলে। তারা একটা পরিবর্তন পছন্দ করছিল। যা 'বিলাতী কোম্পানিত্ব' থেকে ফিরিয়ে আনত বাদশাহত্ব—সেটা তারা পছন্দ করছিল না। বর্গীর উৎপাত, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের অত্যাচার-অনাচার, জমিদার ও জায়গিরদারদের উৎপীড়ন, খুন, ডাকাতি, রাহাজানির বাড়াবাড়ি জনগণকে বাদশাহী আমল ফিরিয়ে আনায় বিমুখী করেছিল। তারা চাইছিল শান্তি, স্বস্তি।

মাত্র কয়েকটি বন্ধু তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদ করে এই মতের পোষক হল। এই মতের অনুকূল আবহাওয়া তখন দেশে গড়ে ওঠে নি। যাই হোক, কয়েকজনের মত পেলাম। তারা একটা কার্যসূচী চাইল। আমি খসড়া তৈরি করলাম। সেটা নিয়ে আরেকবার আলোচনা হল। এ আলোচনা অতি সংগোপনে হয়।

আমি বলতে চাই, বিপ্লবের উপাদান চারটি—ছাত্র-যুবক, কৃষক, কারিগর, মজুর এবং সৈন্য। সব দেশের ইতিহাসে এই দেখা যায়। ছাত্র-যুবকদের মনোমদ আদর্শবাদ ও বাকিদের যা সাক্ষাৎ স্বার্থ সেদিকে নজর রেখে আন্দোলন চালাতে হবে, তবে এদের সাড়া পাওয়া যাবে।

দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বীজ বুনে যেতে হবে। শেষ অবধি রাজনৈতিক জাগ্রত চেতনার সঙ্গে সঙ্গে এদের বোঝাতে হবে, তারা যে যা চায় তা রাজনৈতিক স্বাধীনতা না এলে হবার নয়। অতএব কে কাজ করবে?—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।

এর জন্য প্রয়োজন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, দেশের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার পর সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজানো আমরা চাই। এই হচ্ছে—কী কাজ করতে হবে।

আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনা করি। কেন করি? দুটো কারণ। ভারতের মতো প্রকাণ্ড দেশ নিয়ে কথা কিনা?

এত ভাষাভাষী প্রদেশ, এতরকম সংস্কৃতির সম্মেলন, এতরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একসঙ্গে জুড়ে যদি রাষ্ট্রের রথ চালাতে হয় তাহলে তখনকার দিনে সবচেয়ে প্রগতির আদর্শ-দেশ আমেরিকার পন্থা অনুসরণ করলে সকলে মানতে পারে এবং সবাইয়ের কল্যাণ হতে পারে। এটাও আমাদের মনে এসেছিল যে, ইংরেজ যতবড় ভারত একরাষ্ট্রে এনেছে, ওদের ভারত-ছাড়া করার পর অতবড় ভারত আমাদের আয়ত্তে থাকবে না। আরবের এডেন, বর্মা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে থাকবে না। তাছাড়া মারাঠারা যখন প্রবল তখনও মুসলমানেরা আলাদা স্বাধীনতা-রক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। দেশে আভ্যন্তরিক পরস্পর বিভিন্নমুখী দুটো শক্তিকে ইংরেজ চাপা দিয়ে রেখেছিল। আমাদের সুসময়ে এই সংঘর্ষ আবার জেগে ওঠার সম্ভাবনা। এর নাম হিন্দু-মোস্লেম সমস্যা —বলতে গেলে এটি হাজার বছরের অসমাধিত সমস্যা।

আমরা কেমন রাষ্ট্র গড়ব তার হদিস আমাদের দেশের প্রাণগত ভাব থেকে নিতে হয়। এদেশটা সংস্কৃতির সম্মেলন গ'ড়ে তোলার ঐতিহ্যে গরীয়ান। 'হিন্দু' কথাটা গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের আগে পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্ম কি ও কেমন, তার ঠিক বর্ণনা কেউ দিতে পারে না। নাস্তিকও হিন্দু, আস্তিকও হিন্দু। একেশ্বরবাদী হিন্দু, আবার দ্বৈতবাদীও হিন্দু। অর্থাৎ কোনো একটা গোঁড়া মতবাদ নিয়ে হিন্দুর হিন্দুত্ব দাঁড়ায় নি। সংস্কৃতির মহামিলনে হিন্দুত্ব। হিন্দু সমাজ আছে। হিন্দু ধর্ম নেই। ধর্মটার নাম হচ্ছে সনাতন ধর্ম। সিন্ধুর এপারের লোকদের ওপারের লোক বলতে লাগল 'হিন্দু'। এর থেকে কি বুঝি? আমাদের বিশিষ্টতা সমবায় বা সম্মেলন পদ্ধতিতে।

রাষ্ট্র সংস্কৃতিকে মেনে চলবে। এই কারণেও আমরা ভারতের যুক্তরাষ্ট্র কামনা করতাম।

সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা ভুলি নি। সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে দেখা যায় যোগানো উপাদানের চেয়ে পরিণাম-ফল কিছু কমই হয়ে থাকে। The end results are less than the ingredients supplied। সুতরাং আমরা বিপ্লব চাইলে এবং তার জন্য খাটা সত্ত্বেও হয়তো 'সন্ত্রাসবাদ' যাকে বলে সেই ধাপ পর্যন্ত এগুনো হবে। কারণ আমাদের বিপক্ষে প্রবল বাধা হচ্ছে পরম শক্তিশালী ইংরেজ। আমি সন্ত্রাসবাদ কথাটা বিশ্বাস করতাম না। কে কাকে ভয় দেখাবে? সমগ্র ভারতে একটিমাত্র সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ছিল। তার নাম 'বৃটিশ রাজশক্তি'। ভারতীয়রা যা করতে যাচ্ছিল তা ছিল মুক্তি-সাধনার একটি বিশেষ সোপান মাত্র।

কাজ কি করে হবে? মতপ্রচার, আন্দোলন, সংঘবদ্ধতা, কার্যকরী বিভাগ,

'চর বিভাগ' বা সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগ, আবিষ্কার বা গবেষণা বিভাগ। বিদেশের সঙ্গেও যোগাযোগ দরকার হয়ে পড়বে। এও একটা দিক। এইগুলি দিয়ে তবে সাফল্য আনতে হবে। খবরের কাগজও চাই। 'যুগান্তর'টা এ বিষয়ে বেশ কাগজ। একে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই হল। যারা লিখছে, ভালোই লিখছে। কিছু কিছু লেখা এখানে পাঠালে আপাততঃ চলে যাবে। আমাদের বন্ধু বাসুদেব ভট্টাচার্য এই কাগজের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। প্রভাস দেব ও কিরণদাও (কিরণ মুখার্জী) ছিলেন।

কর্মীদের তিনটি অঙ্গীকার করতে হবে—কর্মীজীবনে দারিদ্র্য-ব্রত, ব্রহ্মচর্য, অবিবাহিত জীবন বা সংসারের ভারহীন জীবন। দারিদ্র্য-ব্রতের অর্থ এই নয় যে, পরভাগ্যোপজীবী হতে হবে। সে কথা মোটেই নয়। রোজগারের পুরো শক্তি ফুটিয়ে তুলে, রোজগারের অর্থ সবটাই নিজের ওপর খরচ না করে বেশিটাই কাজের জন্য খরচ করা। নিজের খরচ যত কম হয় করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিবাহিত লোক এ পর্যন্ত কেউ ছিল না। চরম আত্মদানের কাজে বিবাহিতদের যত না-টেনে পারা যায় ততই ভালো। রাজনৈতিক সন্ন্যাসী সৃষ্টি করা দরকার।

এখন থেকে কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, যশোহর, হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরে আমরা যাতায়াত সুরু করি। রবিবার বা বিশেষ ছুটি এবং গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটির সুবিধা নেওয়া হতে লাগল। নীল-আন্দোলনে জয়ী কৃষকেরা যদি সঙ্গে আসে সংঘর্ষে আমরা জিতবই।

সমিতিতে অনেক নতুন বন্ধু জুটে গিয়েছিল। তাতে এমনটা করা সুবিধাজনক হল। তবু স্বীকার করতে হবে আমাদের সংখ্যা বেশী ছিল না।

আমাদের তিন ভাইয়ে—ক্ষীরোদগোপাল, আমি ও ধনগোপালে বহু আলোচনা ও পরামর্শ চলল। বিপ্লব চতুরঙ্গ। ছাত্র, কৃষক, মজুর ও সশস্ত্র সৈন্য—এই চারটির একটি অঙ্গ বাদ গেলে বিপ্লব সফল হবে না। অথবা শুধু একটি অঙ্গ ধরে থাকলেও হবে না। সৈন্য হাত-করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু ইংরেজ অফিসার দ্বারা চালিত হওয়া যাদের অভ্যাস তাদের বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে চালাবার লোক না দিলে শুধু সৈন্যরা হবে বেকার। তাছাড়া বহির্জগতের সাহায্য পাওয়া একটা পরম প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ফ্রান্সের সাহায্য না পেলে আমেরিকা স্বাধীন হতে পারত না। নেপোলিয়ানের যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ভেঙে না পড়লে এবং বৈদেশিক সাহায্য না পেলে ইটালি স্বাধীন হতে পারত না। সুতরাং ঐরূপ পথ আবিষ্কারের জন্য আমরা তিন ভাই আমেরিকা চলে যাব। এক 'ঠাকুর' ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার এক দেশের 'কনসাল'—ব্যবসায়-প্রতিনিধি। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল ব্রেজিল বা আর্জেণ্টিনায় জাতিবৈষম্য নেই। সুতরাং সেখানে প্রথমে গিয়ে সামরিক বিদ্যা লাভ করে পরে

যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া যাবে। মুশকিল হল ভাষা নিয়ে। সে দেশের লোক স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে। আমরা কেউ তা জানতাম না।

আবার অনেক বিচার বিবেচনা চলতে লাগল। আমরা ভাবলাম আমেরিকা, জাপান, চীন, শ্যাম, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা ও বর্মা—সবক'টাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তাই শেষ সিদ্ধান্ত হল আমি থাকব দেশে। ধনগোপাল জাপান হয়ে চলে যাবে আমেরিকা। সেজদা ক্ষীরোদগোপাল যাবেন বর্মায়। এর মধ্যে চিঠিপত্র চলবে যে সাংকেতিক ভাষায় তা আমরা স্থির করে ফেললাম। শ্যাম থেকে খবর আসবে বর্মায়। বর্মা থেকে আসবে আমার কাছে। এ দিকটা পূর্বদেশ; সাম্রাজ্যওলা পাশ্চাত্য দেশের আধিপত্য ও প্রভাব এদিকে বেশী। তাই এই দিকে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা হল। ধনগোপালের সঙ্গে যে সংকেত চলবে তা করলাম অন্যরূপ। অবশ্য যারা বাইরে যাবে তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হবে। বলে-কয়ে গেলে হয়তো কর্তারা আপত্তি তুলতে পারেন।

১৯০৮ সালে ওরা দু'ভাই দিল চম্পট। তারা কোথা গেল, কেমন করে গেল তা খালি আমি জানতাম। কারণ আমায় তো তাদের সাহায্য করতে হয়েছিল।

শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ভালো কাজের অনেক বাধা। আবার আর একদল বন্ধু সরকারী নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দেশে বেআইন ও বিশৃঙ্খলা আনতে রত হল। তারা ভেবেছিল এইরকম বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে আমলাতন্ত্র সরকারকে ভাঙা যায়। এরা ঠিক সন্ত্রাসবাদী নয়। বরং অকালে প্রকট গেরিলা দলের অগ্রদূত—Advance-guards of the Guerrillas। এই দলে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ছিল। আর ছিল শরৎ ঘোষ, যতীন শেঠ প্রভৃতি।

তারা রাজনৈতিক কাজের জন্য জোর করে টাকা কেড়ে বা লুটে আনার 'প্রোগ্রাম' নিল। শিবাজীর দোহাই পাড়ল। আবার আমি বাধা দিই। তারা মানল না। আমি অসম্মত হলাম। এ পথে কাঁটাই বাড়বে। কাজ কিছু এগুবে না। সরকারী টাকা নেওয়া শক্ত হয়ে উঠবে একবার কি দু'বারের পর। তখন দেশের লোকের টাকায় টান পড়বে। তারা বেগড়াবে। তাদের ভাই-বন্ধুরা চটে যাবে। প্রতিটি আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য অন্ততঃ ত্রিশটি লোক বিমুখ হবে। ফলে সমর্থকের জায়গায় গজিয়ে উঠবে কর্মীদের উচ্ছেদকামী। অর্থাৎ যা করতে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তার উলটো কপালে ঘটবে। কাজ সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে চাই সদা বিপদ-সম্মুখীনের ঝাঁক, তাদের ভক্ত সমর্থক, সাহায্যকারী, সহায়ক, আশ্রয়দাতা, আড়কাঠি, বাহবাদাতা। আর চাই অর্থের ব্যবস্থা। কিন্তু জোর করে টাকা আনতে গেলে হবে অনর্থপাত। সব উচ্ছন্নয় যাবে। এতে অবিমৃষ্যকারিতা হবে। পা উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটার মতো ভুল কাজ হবে এটা। (পরে দেখা গেছে যেখানে ডাকাতি হয়েছে সেখানকার

বহু যুবক মেতে গিয়ে দলে এসেছে। কিন্তু চতুরঙ্গের বাকী কৃষক-মজুর এতে মাতে নি—স্বদেশীতে আসে নি ; বিরুদ্ধ সমালোচনা সমাজে বেড়েছিল।)

একটা দেশ বিপ্লব আনবার উপযুক্ত হয়েছে কিনা তখন বোঝা যাবে যখন জনসাধারণের মনে নির্যাতন-বিরোধী রোগ ধরে যায়। বিলাতওয়ালাদের সবকিছু দুঃসহ অবিচার আপামর জনসাধারণের কাছে কই এখনও কি দুর্বহ ঠেকছে ? আয়ার্ল্যান্ড ইংরেজী খেলা ছেড়ে দেশী খেলার আন্দোলন চালিয়েছে। ইংরেজরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট হতেই ওরা রয়ে গেল রোমান ক্যাথলিক, ইংরেজী ভাষা বর্জনের ঢেউ ওদেশে চলেছে। এইগুলো সুলক্ষণ। আমাদের দেশে কি করে সাহেবদের মতো চোস্ত ইংরেজী বলা যায়, লেখা যায় তাই নিয়ে আমরা এখনও ব্যগ্র ও ব্যস্ত। গোলামি এর চেয়ে বেশিদূর কোথায় যাবে ? তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে বিলাত-ফেরত না হলে বড় নেতা এদেশে হয় না। 'ওদের বিদায় করতে যাচ্ছি' মুখে বলা হচ্ছে, কিন্তু মন বলছে 'ওদের গলায় মালা পরিয়ে নিজেদের মূল্য বাড়িয়ে নাও'। উৎপীড়ন-বিরোধী ভাব আমাদেরও আনতে হবে। কিছু ধৈর্যের প্রয়োজন। সময়ের দরকার। তার জন্য খাটা চাই। নীল চাষীরা যেমন বলেছিল 'যা হবার হোক, এই হাতে আর নীল বুনব না', তেমনি দেশসুদ্ধ লোক বলবে 'ওরা জোর করে থাকতে পারে, থাকুক—আমরা মন থেকে ওদের সরিয়ে দিলাম। ওদের প্রতি ভয়ভক্তি মুছে ফেলেছি'। সে অবস্থা নিশ্চয় আসবে। তাকে সবাই গড়ি এসো। পরে এর সঙ্গে সবরকম প্রতিরোধ জুড়তে হবে। শেষ পর্যায়ে সিপাহীদের বিদ্রোহী করে দেওয়া হবে।

কিছু বন্ধু এই লম্বা পাল্লার কার্যসূচী নিল। বেশির ভাগ নিল না। স্বল্পদূরের পাল্লার কাজ তাদের পছন্দ। সমিতির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই নিয়ে আমার মতান্তর হল। আমি সাময়িকভাবে সমিতিতে যাওয়া-আসা কমিয়ে অনুপস্থিত সভ্যের মতো রইলাম। যারা আমার ভাব নিল, তাদের নিয়ে নিজেদের সংখ্যা ও যোগ্যতা বাড়াতে রত রইলাম। আমি জানতাম আজ যারা লঘিষ্ঠ সংখ্যক, কালে তারাই পাবে গরিষ্ঠ পদ। কারণ তাদের পথটা খুব সমীচীন। ওদিকে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে ঈ. বি. আর -এর চাংড়িপোতা রেল স্টেশনের তহবিল লুট হল। এইটি এখন পর্যন্ত আমাদের জানা প্রথম সফল রাজনৈতিক ডাকাতি। একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। এরপর ঢাকায় 'বাহ্রা ডাকাতি' হয়। সে আরো অনেক রোমাঞ্চকর। এটি জলপথের সাহায্যে করতে হয়েছিল। পুলিসের লঞ্চকে ফাঁকি দিয়ে নৌকা সাফ বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। এরপর যতকিছু হল সব এদের কাচ্চা-বাচ্চা। দু'একটি বাদ দিয়ে সবগুলোতেই দেশী লোকের টাকায় হাত পড়ল। ১৯০৯ সালে ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে 'রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি' হয়। এটা একটা নতুন রকমের ব্যাপার

হয়েছিল। চলন্ত ট্রেন থেকে টাকা কেড়ে নেওয়া হয়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা এটি করে। ওদিকে সন্ত্রাসবাদে যাদের বিশ্বাস তারা আগেই কাজ সুরু করেছিল। চন্দননগর, মানকুণ্ডু (E.I.R.) ও নারাণগড়ে (B.N.R) ছোটলাটের ট্রেন ওড়াবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কার্য পণ্ড হয়। পুলিস কয়েকজন নির্দোষ কুলীকে চালান দেয়। মেদিনীপুরে দায়রায় তাদের সাত থেকে দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্ট আপীল নামঞ্জুর করেন। ১৯০৮ সালে নভেম্বরে কলকাতার ওভারটুন হলে লাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে জিতেন রায়চৌধুরী গুলী করতে ওঠেন। তাঁর পিস্তলের ঘোড়া আটকে যায়। তিনি গ্রেপ্তার হন। ভারী হৈ-চৈ পড়ল। লাটসাহেব বেঁচে যান। আমরা ঠিক সেই সময় সমিতির প্রধান কেন্দ্রে ছিলাম। এই মামলায় কঠোর সাজা দেওয়া হয়। একটা বইয়ের মধ্যে বোমা পুরে কিংসফোর্ডকে পাঠানো হয়। তিনি সে সময়ে মজঃফরপুরে বদলির হুকুম পাওয়ায় বইয়ের পার্শেলটি খোলেন নি। তাই আকস্মিকভাবে রক্ষা পেয়ে যান। এই বোমা পাঠান বারীনবাবুর দল। এঁরা এসময় 'অনুশীলন সমিতি' থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্রভাবে শ্রীঅরবিন্দের নায়কত্বে কাজ করেছিলেন। দলের মধ্যে নতুন দল গড়ে উঠেছিল। চাংড়িপোতা ও বাহুা ডাকাতি 'অনুশীলন' করে। সাফল্যমণ্ডিত ডাকাতির গৌরব 'অনুশীলন'-এর কপালে ছিল। বারীনবাবুদের প্রচেষ্টিত ডাকাতিগুলি সফল হয় নি।

১৯০৭ সালে রাজদ্রোহী প্রবন্ধ লেখায় শ্রীঅরবিন্দের নামে মামলা হয়। বিপিনবাবুকে সরকার সাক্ষী মানে। বিপিনবাবু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর উপর আদালত অবমাননার দায়িত্ব আনা হয়। কোর্টে ভিড়ে ভিড়। তরুণ-বয়স্ক সুশীল সেন ভিড়ে ছিল। সার্জেণ্ট তাকে মারে। সুশীলও মারে। তাই তার পনেরো বেত সাজা হয়। সেজন্য গুপ্ত-সমিতি কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের বিধান করে।

'পালাইবার পথ নাই, যম আছে পিছে'। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড গেলে কি হবে? মৃত্যুর দূতের মতো প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম তাঁর পিছে ধাওয়া করেন। যে গুপ্ত-বিচারালয় কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি করে তাতে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, চারু দত্ত, সুবোধ মল্লিক—এরকম শোনা গেছে। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড সর্বদা সতর্ক থাকতেন। তিনি প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব ও নিজ বাংলো ছাড়া আর কোথাও বেরোতেন না। ঘটনার দিন 'কেনেডি'রা মা ও মেয়ে বিকেলে ক্লাবে আসেন। সন্ধ্যার সময় তাঁদের গাড়িতে ফিরছিলেন। গাড়িটি কিংসফোর্ডের গাড়ির অনুরূপ। তাই ভুল হল। শ্রীমতী ও কুমারী কেনেডির উপর বোমা পড়ে। বেচারারা অনর্থক মারা যান। উইনি স্টেশনের কাছে ধরা পড়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসি

হয়। তাকে গ্রেপ্তার করে আনার সময় স্টেশনে লোকের অসম্ভব ভিড় জমা হয়। সে বীরের মতো ফাঁসির সম্মুখীন হয়। সমস্তিপুরে ট্রেনে চড়ে মোকামায় পেঁছোলে সন্দেহে সহযাত্রী দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জী পলায়নপর প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। 'আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দেবেন?'—বলে মোকামার প্ল্যাটফর্মে প্রফুল্ল নিজের রিভলভারে আত্মহত্যা করে। তার মাথাটা কেটে মজঃফরপুরে সনাক্ত করতে আনা হয়। ক্ষুদিরামকেও দেখানো হয়। যদিও পরে বোমার মামলায় আলিপুর আদালতে শ্রীঅরবিন্দের ব্যারিস্টার সি. আর. দাস ঐ দলের সর্বপ্রয়াস ব্যর্থতায় পরিসমাপ্ত হওয়ায় সারা ব্যাপারটাকে খেলাঘরের বিপ্লব-প্রচেষ্টা (Toy revolution) বলেন, তথাপি স্বীকার করতে হবে এই নতুন ঢঙের সক্রিয় রাজনীতিতে তরুণরা দিশেহারা ও মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এই পন্থার সমর্থক যেন আকাশ-বাতাস থেকে ঝরতে লাগল। অন্য কথা ছেলেরা কানে নেয় না। তারা অনেকেই প্রাণে-মনে বিশ্বাস করত বোমার ভয়ে ইংরেজরা এদেশে চাকরি করতে আসবে না। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তি ভারতীয়দের হাতে এসে যাবে। যদি তাদের বোঝানো যেত যে, শ্বেতাঙ্গরা খুব কড়া পাহারায় নিজেদের নিরাপদ রেখে কৃষ্ণাঙ্গদের দিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে নেবে, সে কথা কেউ মেনে নিতে রাজী হত না (সত্যই রুশের জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার পর এই অবস্থা হয়)। মনের ক্রিয়া তাদের তখন অন্য পথে চলেছিল। রুশের নিহিলিস্টদের ব্যর্থতা নজিরস্বরূপ খাড়া করলেও তারা ফিরতে চাইত না। সে সময় ভাবের উচ্ছ্বাস যুক্তিকে আড়াল করে ফেলেছিল। তাছাড়া 'সন্ত্রাসবাদী'দের অভিনবত্ব, আন্তরিকতা, চরিত্রের দৃঢ়তা, নির্জলা দেশপ্রেম সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এদের মধ্যে ও পেছনে সত্যই খুব ভালো-ভালো লোক ছিলেন। যুক্তির দুরবস্থা সেই সময় দেখার জিনিষ। 'যে নেশা লেগেছে—আমার নেশা যেন না ছোটে'—এই বলে ভাবোম্মাদরা সব ন্যায়, যুক্তি, পরামর্শকে উড়িয়ে দিত। অন্য কথাকে আমল দিতে চাইত না।

'নাসতো বিদ্যতে সতোঃ'। ভাবতে গেলে এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, দেশের এই সময়ের পুঞ্জীভূত অনুভূতি থেকে ওরকম জিনিষ জন্মাতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ না থাকলে কার্য কি করে হতে পারে? আমি কিন্তু ভেবে-চিন্তে দেখলাম তারা ঠিক সন্ত্রাসবাদী ছিল না। জাতীয় অবমাননার প্রতিশোধপরায়ণ দেশপ্রেমিক ছিল।

যাই হোক, গোড়ায় সমিতি সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে ছিল। মিত্রসাহেবের সঙ্গে বারীনবাবুদের এই নিয়ে ছাড়াছাড়ি, তা আগেই বলেছি। কিন্তু তাদের কার্যক্রম সমিতির কিছু লোককে প্রভাবান্বিত করেছিল আর-এক রকমে। সমিতি চাইছিল কোনো সময় গরিলা যুদ্ধ। ঢাকার পুলিন দাসের নেতৃত্বে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হত। তাতে যুবকদের অসীম সাহসিকতায় যথেষ্ট শিক্ষা হচ্ছিল। সমিতির

ডিরেক্টরের অধীনে সমস্ত সংগঠনটা ছিল। সুতরাং ঢাকার যুবকরা কলকাতা কেন্দ্রে এসে থাকত ; আমাদের মধ্যে যথেষ্ট মেলামেশা হতে পারত এবং ভাবের আদান-প্রদান চলত। পূর্ববঙ্গের অমৃত হাজরা, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দিগেনবাবু, বীরেন সেন, নৃপেন চক্রবর্তী, শান্তি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কথা আজও আমার স্মরণ হয়।

কিন্তু যতদিন অপেক্ষা করে তৈরি হতে হয় সে-দেরি অনেকের সইল না। শিবাজি-ঢঙে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর বাক্সে হাত পড়ল। ফল যা হবার তাই হল। একটা বিষচক্রের সৃষ্টি হল। পুলিস বা রাজকর্মচারী হত্যা—ডাকাতি। ডাকাতি—পুলিস হত্যা বা রাজকর্মচারী নাশ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদের ছাপ ওদের উপর এসে পড়ল। নেতারা যদি অনুচরদের দ্বারা চালিত হন, তাহলেই হয় গভীর পরিতাপের বিষয়। পরিচালিত নেতারা আর নেতা থাকতে পারেন না। কে কার কথা শোনে! তখনকার হাওয়ায় ভাসছে—'বোমার বিধান দিল বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী ত্যাজিল প্রাণ'।

যাই হোক, সে সময় এদেশে এক ডামাডোলের ব্যাপার। গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে গুলী করা হয়। শিশির গুহ গুলী করেন। তিনি আহত হলেন। মারা যান নি। কুষ্টিয়ার পাদরী হিগেনবোথামও গুলীতে আক্রান্ত হন। বলদেব রায় এ-কাজে যুক্ত ছিলেন শোনা যায়।

রাজনৈতিক ডাকাতিও বেড়ে চলল। ১৯০৬ সালে কুমিল্লায় ছোটলাট ফুলার যান। তাঁকে সম্বর্ধনা করার জন্য যথারীতি তাঁবু ও শামিয়ানা খাটানো হল। কাল লাট-দরবার, আজ রাতে কে বা কারা তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিল।

সরকার এবার বেড়াজাল ফেলল। কলকাতার মানিকতলায় মুরারিপুকুর বাগান ও আরও বহু স্থানে খানাতল্লাশি ও গ্রেপ্তার হল। বোমার আড্ডা ও বহুতর লোক ধরা পড়ল। অরবিন্দবাবুও গ্রেপ্তার হলেন। অরবিন্দবাবু এ সময় 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদনা করতেন।

২রা মে ১৯০৮ সালের ভোরে কে-কে কোথায়-কোথায় ধরা পড়েন তার তালিকা—

(১) গোপীমোহন দত্ত লেনে—কানাইলাল দত্ত ও নির্মল রায় (প্রকৃত নাম নিরাপদ)।

(২) ১৩৪নং হ্যারিসন রোডে—কবিরাজ ধরণীধর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী।

(৩) ৩৮।৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে—হেম দাস (অন্য নাম হেমচন্দ্র কানুনগো)।

(৪) ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বোস।

(৫) মুরারিপুকুর বাগানে (মানিকতলা)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র ঘোষ, অন্য এক বাগানের উড়িয়া মালী।

(৬) মেদিনীপুরে—সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বারীনবাবুদের স্বীকারোক্তি ও মুরারিপুকুর বাগানে অন্য খাতাপত্র-দৃষ্টে পরে ধরা পড়েন—নরেন গোঁসাই, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল (এঁরা শ্রীরামপুরের); যশোহরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল, খুলনার সুধীর সরকার। সিলেটের তিন ভাই—হেম সেন, সুশীল সেন ও বীরেন সেন। নাগপুরের হরিকৃষ্ণ কানে।

পরে ধরা পড়েন—প্রভাসচন্দ্র দেব (অপর নাম মানিক), কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, দেবব্রত বসু, বিজয় ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক, চন্দননগরের প্রফেসর চারুচন্দ্র রায়। পরে আসেন—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (একদম নির্দোষ লোক)। মুরারিপুকুর বাগানে পাওয়া যায়—বোমার খোল-ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি, রিভলভার, বন্দুক, রাইফেল, ডিনামাইট, বিস্ফোরক-শিক্ষার বই, গুপ্ত-সমিতি গঠন-প্রণালী।

হ্যারিসন রোডে পুলিস পায় কয়েক বাক্স বোমা, বিস্ফোরক তৈরির যন্ত্রপাতি ও মশলা।

কিরণদা এই মামলায় খালাস পান। কিন্তু 'কঃন্থা'-নামক পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁর দু'বছর জেল হয়।

১৯০৮ সালের মে মাসে এই ব্যাপার হয়। 'মানিকতলা বোমার মামলা'ই প্রথম রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা। লোকে এত সন্ত্রস্ত হল যে, রবিবারের মুষ্টি-ভিক্ষার চাল আনতে গেলে অনেকে বললেন, 'আর আসবেন না। শেষে কি হাতে দড়ি দেওয়াবেন?' কেউ-বা অরবিন্দবাবুর গ্রেপ্তারে উন্মাদ হয়ে বললেন, 'আর কেন? এবার বঁটি, কাটারি, লাঠি যা আছে নিয়ে উঠে পড়া যাক্।' কবি হেমচন্দ্রের কথা মনে পড়িয়ে দিল—

'জপ তপ আর ব্রত আরাধনা
সে সবে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা!'

অরবিন্দবাবুকে ধরবার সময় এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। পুলিসের সঙ্গে যে ইংরেজ কর্তা গিয়েছিলেন তিনি অরবিন্দবাবুর জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ দেখে হতভম্ব হয়ে যান। নয় বছর বয়সে যিনি বিলেতে গিয়ে থেকে যান, যাঁর মুখ দিয়ে বাংলা বাক্য বেরুত না, সাহেবদের সঙ্গে সাহেবী ঢঙে অশন-বসনে শরিক হয়ে পড়েন—

ভোগৈশ্বর্যের পূজারী হয়ে নিশ্চয় তিনি ফিরবেন, এরকম একটা ধারণা মনে ছ'কে নিয়ে এসেছিলেন সাহেব অফিসার। এসে দেখছেন তাঁর ঘরে আসবাবের বালাই নেই। একটা সাধারণ জলের কুঁজো এবং মাদুর অরবিন্দবাবুর সম্পদ। তিনি খাট-বিছানায় না শুয়ে ভুঁয়ে মাদুর পেতে শুয়ে ছিলেন। তল্লাশি করে যা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে একটি কৌটা ছিল। কৌটায় বোমা-ভ্রম দূর করে অরবিন্দবাবু বললেন, 'ওতে দক্ষিণেশ্বরের পূত রজঃ আছে। পরমহংস রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ও-যে পবিত্রীকৃত স্থান!' সাহেব অরবিন্দবাবুর ভূমিশয্যা দেখে বলেছিলেন, 'I am ashamed of you!' অরবিন্দের মনে হল—বিলাস-পাগলকে দারিদ্র্য-ব্রতের মহিমা কি বুঝোব?

মেদিনীপুরে প্রায় একশো লোক ধরা হল। রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত কোনো অবস্থার লোকই বাদ পড়ে নি তাতে। নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ, বিখ্যাত জমিদার যামিনী মল্লিক, 'মেদিনী-বান্ধব'-এর সম্পাদক দেবদাস করণ, ছাত্র যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষ দাস, পুরোহিত সুরেন মুখুজ্যে—এঁরা সব এদের মধ্যে ছিলেন।

'নাটোর ডাক-মারা কেসে'ও বহু লোক গ্রেপ্তার হন। সমিতিকে আলিপুর ও মেদিনীপুর মামলায় জড়ানো হল। রামকৃষ্ণ মিশনও সন্দেহভাজন হল। ভোলানাথ নাটোরের ব্যাপারে ছিল। কিন্তু ধরা পড়ে নি। সে বড় দুঃসাহসিক ছেলে।

এই সমস্ত ধর-পাকড়ের সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে বলে ভারত সরকার পরিবর্তিত ফৌজদারী কার্যবিধি প্রণয়ন করেন (Criminal Law Amendment Act of 1908)।

স্যার হার্ভি অ্যাডামসন সমিতিগুলোর উপর কটাক্ষ করেন। লিখতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়, বাংলা সাহিত্যের নামী এক বৃদ্ধ সাহিত্যিক সরকারকে লিখে উস্কে দিল সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করতে। অ্যাডামসনসাহেব তাঁর চিঠি পড়ে শোনান, নাম বলেন না। পরে 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা'য় তাঁর নাম প্রকাশ পায়।

সারা বাংলার 'অনুশীলন সমিতি', কলকাতার 'আত্মোন্নতি সমিতি', বরিশালের 'বান্ধব সমিতি', ময়মনসিংহের 'সাধনা সমিতি', 'সুহৃদ সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি' প্রভৃতি এতদ্বারা বেআইনী ঘোষিত হয়। এদের কেন্দ্রগুলি বেআইনী আড্ডা ঘোষিত হল। পাঁচজনের বেশী এদের সভ্যরা একত্র মিশতে পাবে না, এ ভয়ও দেখানো হয়।

বিশেষ আদালতে বিচারের ব্যবস্থা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করে একেবারে বিশেষ আদালতে মামলা পাঠাবেন। তিনজন হাইকোর্টের জজ একত্রে বিচার করবেন। এর পর আর আপীল থাকল না।

'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' উঠে গেল। 'যুগান্তর' গুপ্ত ছাপাখানায় ছাপা ও বিতরিত হতে লাগল। বোমার মশলা ও ভাগ (formula) এতে

দেওয়া হত। বন্ধ হবার পূর্বে 'যুগান্তর'-এর জনাদর এত প্রসারিত হয়েছিল যে, একজন হকার ঐ কাগজ একখানি ১০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যে বেচেছে। আমাদের কিরণদা (কিরণচন্দ্র মুখার্জী) ছিলেন সেদিনের সেই হকার। কাগজখানি কলুটোলার বিখ্যাত কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের বাড়ির কোনো লোক অত দাম দিয়ে কেনেন। কলকাতার পথ গ্রাহকের ভিড়ে এত জনাকীর্ণ হত যে, যানবাহন পরিচালনা বন্ধ হয়ে যেত। 'মুক্তি কোন্ পথে', 'বর্তমান রণনীতি' 'যুগান্তর'-চালকরা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

আগের 'যুগান্তরে'র বাছা বাছা লেখা সংগ্রহ করে 'কংস্থা' নামক পুস্তক গোপনে বিক্রি ও প্রচারিত হতে লাগল।

দশম পরিচ্ছেদ

'কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে—
এসো কে কেঁদেছ নীরবে ;
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।
নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল ;
মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্বল-সবল সে কি ভাবিবে ?'

এই গানটি দেবব্রত বসুর রচনা। তিনি 'যুগান্তর'-এর একজন খুব ভালো লেখক ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় তিনিও আসামী হন। খালাস পেয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তখন তাঁর নাম হয় প্রজ্ঞানন্দ স্বামী। তাঁর প্রভাবে কয়েকটি উচ্চদরের দেশকর্মী বাংলাদেশ পায়।

বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ আপন মনে বাঁশী বাজাতেন। মনের অবস্থা অনুযায়ী শ্রোতাদের মধ্যে এক এক জনের এক এক রকম ভাব বা অনুভূতি জাগত। কানের ভিতর দিয়ে সে বংশীর ধ্বনি একেবারে মনের মাঝে পেঁাছে যেত। যশোদা ভাবতেন তাঁর ছেলে তাঁকে ডাকছে। রাখাল বালকরা বোধ করত সঙ্গীদের রাখালরাজা খুঁজছে। গোপীরা মনে করতেন তাঁদের ঘর-সংসার ছেড়ে বেরুবার ডাক এসেছে।

ঠিক তেমনি হল 'এসো কে কেঁদেছ নীরবে' শুনে। একটা দ্যোতনার স্পর্শ সবাই অনুভব করত। কেউ মনে করত জাতীয় শিক্ষায়তন গড়ে তোলার এ ডাক। কেউ মনে করত জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভালো করে দাঁড় করানোর এ আহ্বান। কেউ মনে করত বৈদেশিক শাসনের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার এই ইসারা। কেউ ভাবত সব ছেড়ে-ছুড়ে এগিয়ে পড়ার এই ইঙ্গিত। কেউ বুঝত গ্রাম ও শহর নিয়ে বিদেশী-রাজকে ধ্বসিয়ে দেবার প্রস্তুতির এই সংকেত। আর কেউ অনুভব করত ডাইনে-বাঁয়ে না দেখে বোমা-পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে অত্যাচারের বুকে। কর্মেই অধিকার, ফলে তো নয়। তবু অসংখ্য লোক ছিল, যাদের কাছে এ ডাক গিয়ে ফিরে-ফিরে এসেছে বা প্রাণের দ্বারে পেঁাছাতে পারে নি।

ইংরেজ চণ্ডনীতি গ্রহণ করেছিল। সে নীতি 'তর' থেকে 'তম'-এর কোঠায় পেঁাছায়। এসময়ে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনার একটি সুন্দর গান শুনতে পেতাম।

'অর্ধশত বর্ষ গত
দেশের সন্তান যত—একদিন করেছিল পণ
সেদিন ঝাঁসী হতে লক্ষ্মীবাঈ,...মালব হতে তাঁতিয়া
বিঠুর হতে নানাসাহেব এসেছিল গর্জিয়া
বিহার হতে কুমার সিংহ—এসেছিল মায়ের ঘুচাতে বন্ধন।'

শুধু বাংলার অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে একটা মাতামাতি হয়েছিল ভাবলে ভুল করা হবে। অর্থনৈতিক দুর্দশা, রাজনৈতিক নৈরাশ্য, সামাজিক দুর্গতি এইগুলি পুঞ্জীভূত কারণ হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে কাজ করছিল। তাই তুষানলের ধিকিধিকি আগুন সময়ের সুবাতাস পেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। সেইজন্য বাংলার মনস্তাপ সারা ভারতের বুকের বাড়বানলে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, বর্মা সেদিনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

সংক্ষেপে তার কিছু বিবৃতি দিচ্ছি।

বোম্বাই-এর কথা

১৯০৫ সালে অগম্য গুরু পরমহংস নামে এক সাধু ভারতের নানা স্থান পরিক্রমা করেন। খোলাখুলিভাবে নির্ভীক মনে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। তিনি সরকারকে ভয় করতে নিষেধ করেন। এর ফলে ১৯০৬ সালে পুণায় ছাত্রেরা একটা সমিতি গঠন করে। বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে তারা নেতা নির্বাচিত করে। জনগণের মনের সমর্থন লাভের জন্য সেই সাধু চাঁদার হার এক আনা রাখার নির্দেশ দেন। অবশ্য ১৯০৬ সালে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার ছাত্রবৃত্তি লাভ করে বিনায়ক সাভারকর বিলেত গেলে এই সভা ভেঙে যায়। কিন্তু এটির কিছু সভ্য বিনায়কের দাদা গণেশ সাভারকর প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত সমিতি'তে যোগ দেয়। এর পূর্বে দুই সাভারকর ভাই ১৮৯৯ সালে 'মিত্র মেলা' স্থাপন করেছিলেন। নাসিকে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল। কাজে যোগ্যতা লাভের জন্য মন-গড়ার প্রতিষ্ঠান ছিল সেটা।

ব্যারিস্টার শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা কাথিয়াওয়াড়ের কচ্ছপ্রদেশের লোক ছিলেন। ইনি বেশ ধনী হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি বিলাতে 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করেন এবং নিজে তার প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯০৬ সালে লণ্ডনে 'ভারত-ভবন' (India House) প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ভারতে বৃটিশ শাসনকে খুবই নিন্দা করা হত। ১৯০৭ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনা হয় যে, কৃষ্ণবর্মার বিরুদ্ধে সরকার কিছু করতে চান কিনা। তার ফলে শ্যামজি ফ্রান্সে চলে যান। সেখান থেকে তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালাতে থাকেন। 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' নামে একটি চার-পয়সা মূল্যের পত্রিকা বিলাত থেকে প্রচার হত। বিলাতে এটির ভার তাঁর শিষ্যরা নেন।

১৯০৯ সালে জুলাই মাসে কাগজটির মুদ্রাকরের সাজা হয়। আর একজন মুদ্রাকর হন। ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই পত্রিকা ভারতের সব প্রদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হত। দ্বিতীয় ব্যক্তির সাজার পর কাগজটি প্যারিস থেকে প্রচার হত। প্যারিসে এস. আর. রানা শ্যামজির সহকর্মী হন। তিনি মাঝে মাঝে বিলাতে গিয়ে কার্যপদ্ধতির গোছগাছ করে আসতেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সোশ্যিওলজিস্টে' লেখা হয়েছিল—ভারতে গোপনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ইংরেজকে শিক্ষাদান করতে হলে রুশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা চাই।

১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষিপ্ত হলে 'কাল' নামক পত্রিকার এক রচনার জন্য পারাঞ্জপে বোম্বাই হাইকোর্ট থেকে দণ্ডিত হন। বলা হয়েছিল—স্বরাজ লাভের জন্য ভারতীয়রা সবকিছু করতে প্রস্তুত। ইংরেজের প্রবল পরাক্রমে লোকেরা আর শঙ্কিত নয়। রুশিয়ার বোমা-নিক্ষেপ থেকে ভারতের বোমা-নিক্ষেপ স্বতন্ত্র। বোমারুদের বিরুদ্ধে রুশিয়ায় বহু নাগরিক রাজশক্তির পক্ষে আছে। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশের প্রতি কারও সহানুভূতি আছে কিনা সন্দেহ। যদি এই অবস্থায় সশস্ত্র বিদ্রোহে রুশ নাগরিকরা ডুমা (পার্লামেণ্ট) লাভ করে থাকে তাহলে ভারতও সেই পথে স্বরাজ্য নিশ্চয় লাভ করবে। ভারতের বোমারুদের 'অ্যানার্কিস্ট' বলা অন্যায়।

লোকমান্য তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় ক্ষুদিরামের কাজের সমর্থনে ব্যাখ্যা দেন। সেজন্য তাঁর ছয় বছর কারাবাস হয়।

১৯০৯ সালে গণেশ সাভারকর 'লঘু অভিনব ভারত-মেলা' শীর্ষক উদ্দীপনাময়ী কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করলে তাঁর বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন-এর এজলাসে। পরে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়। এক কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, 'ধরো তলোয়ার—এই সরকার বিদেশী ও অত্যাচারী'। দুঃসংবাদ নাসিক থেকে বিলাতে বিনায়কের কাছে পাঠানো হয়।

৯ই জুন গণেশের সাজা হয় এবং ১লা জুলাই লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে এক সভায় ভারত-সচিব মর্লি-র এক সহায়ক (A.D.C.) স্যার কার্জন ওয়াইলিকে শ্যামজির ভারত-ভবনের সভ্য এবং বিনায়কের সহকর্মী পাঞ্জাবী যুবক মদনলাল ধিংড়া গুলীর আঘাতে নিহত করে। লালকাকা নামক এক পার্শী ভদ্রলোক ওয়াইলিকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হন। ধিংড়া ধরা পড়ে। তার পকেটে একটি কাগজ পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল—ভারতে নির্মম শাসনের অজুহাতে তরুণদের ফাঁসি ও দ্বীপান্তর দেওয়ার প্রতিফল ক্ষীণভাবে দিলাম। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। সে জজের রায় শুনে বলে, 'Thank you my Lord, I am glad to have the honour of dying for my country—আমার দেশের জন্য মরার সম্মান পাওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

এই ঘটনার পর শ্যামজি প্যারিস ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান। ভারত-ভবনের সভ্যদের অন্যতম ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, পার্শী মহিলা মাদাম কামা প্রভৃতি। ফেব্রুয়ারিতে বিনায়ক দামোদর প্যারিস থেকে বিশটি পিস্তল পাঠান। গণেশ দামোদরের গ্রেপ্তারের পর চতুর্ভুজ নামে এক ব্যক্তি পিস্তল নিয়ে বোম্বাই-এ আসে। নাসিকে গণেশের বাড়ি তল্লাশি হয়। সেদিন ২রা মার্চ। খোঁজ করতে করতে দেয়ালের কার্নিশে বোমা তৈরি করার প্রক্রিয়া-লেখা কাগজ ধরা পড়ে। কলকাতার মানিকতলার বাগানের অনুরূপ এই বিজ্ঞপ্তিটি ছিল।

যাই হোক, ২১শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে একটি বিদায়-সভায় জ্যাকসনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। সেখানে আততায়ীরা তাঁকে পিস্তলের গুলীতে নিহত করে। এই পিস্তলটি বিনায়ক-প্রেরিত যন্ত্রগুলির একটি। সাতজন আসামীর বিচার হয় এইজন্য। অনন্তলক্ষ্মণ কানহেরে, কৃষ্ণজি গোপাল কার্ভে এবং বিনায়কনারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসি হয় এবং আর তিনজনের দ্বীপান্তর। এই একই কারণে বিনায়ক সাভারকরকে হত্যার সাহায্যকারী হিসাবে বিলাতে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১০ সালের ১৩ই মার্চ তাঁকে ধরে ভারত অভিমুখে পাঠানো হয়। ফরাসী দেশের মার্সাই বন্দরে জাহাজ পৌঁছালে তিনি শৌচাগারে যাবার নামে ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন। সাঁতরে তীরে এলে ফরাসী সিপাই তাঁকে ধরে ইংরেজ পুলিসের হাতে সমর্পণ করে। মাদাম কামা তাঁকে ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করেন। স্বাধীন ফ্রান্সের মর্যাদাহানির দোহাই দেন। কিন্তু কার্যতঃ কিছু হয় না। ১৯১০-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন হাইকোর্টের জজের কাছে 'নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা' উপস্থিত হয়। আটত্রিশ জন আসামী ছিলেন। সাত জনের সাজা হয়। সাভারকরের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকরের ব্যারিস্টারির অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। বীরেন চট্টোপাধ্যায়কে ব্যারিস্টার হতে দেওয়া হয় নি। এই সময় গোয়ালিয়রে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র গড়া হয়েছিল; সরকার তাকে নষ্ট করে। আমেদাবাদে লর্ড মিণ্টো গেলে তাঁর উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কোনক্রমে তিনি বেঁচে যান।

মাদ্রাজের কথা

বিপিনবাবু তখন কারাবাসে; কারাদণ্ড হয় শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলায় সাক্ষ্য না দেওয়ার দরুন। ৯ই মার্চ ১৯০৮ সালে ছয় মাস কারাবাসের পর বিপিনবাবুর মুক্তির দিন ধার্য হয়। তাঁর তখন এমনই প্রভাব-প্রতিপত্তি যে, মাদ্রাজের লোকে তাঁকে 'স্বরাজ-কেশরী' (Lion of Swaraj) আখ্যায় বিভূষিত করে। ওদিকে চিদাম্বরম্ পিল্লাই ও সুব্রহ্মণ্যশিবম্ বিশেষভাবে বিখ্যাত হন।

১৯০৮ সালে কতকগুলি গুপ্ত-পত্রিকা দেশের নানা দিকে বিলি করা হয়। তাতে রুশের আদর্শে দেশে গুপ্ত-সমিতি গঠন করার কথা বলা হয়। ঐ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মাদ্রাজে সুব্রহ্মণ্যশিবম্ এবং তারক দাসের শিষ্য চিদাম্বরম্ পিলাই ইংরেজ বর্জিত পূর্ণ স্বরাজের কথা প্রচার করেন। ৯ই মার্চ টিনেভেলিতে চিদাম্বরম্ একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন এবং বলেন তিন মাসে স্বরাজ আসবে (১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন একবছরে স্বরাজ আসবে), অবশ্য দেশ যদি সমস্ত বিলাতী দ্রব্য বর্জন করে। ওঁরা দুজন ১২ই মার্চ গ্রেপ্তার হন। ১৩ই তারিখে ভীষণ দাঙ্গা হয়। এতে বহু সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়। সরকারের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খোলাখুলিভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। এজন্য সাতাশজনের সাজা হয়। ১৭ই মার্চ কৃষ্ণস্বামী নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ্য সভায় বলেন—টিউটিকোরিনে স্বদেশীর জোর এত বেশী যে, বিদেশী আদালত ধ্বংস হয়ে গেছে। এঁরও বিচার হয় এবং সাজা হয়।

বেজওয়াদায় 'রাজ' নামে একটি তেলেগু কাগজে চিদাম্বরম্ পিলাই-এর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে ২৬শে মার্চ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা ছিল—অসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ফিরিঙ্গীরাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

১৯১১ সালে 'টিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলা' হয়। নীলকান্ত ব্রহ্মচারী এই মামলার একজন আসামী। তিনি ১৯০৯-১০ সালে শঙ্করকৃষ্ণ আয়ারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেশে বিদ্রোহানল জ্বালাচ্ছিলেন। ১৯১০ সালে শঙ্কর নীলকান্তকে নিজ আত্মীয় ওয়াঞ্চি আয়ার-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ওয়াঞ্চি ত্রিবাঙ্কুরের বনবিভাগে চাকরি করত (ডেরাডুনে রাসবিহারী বসুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়)। ১৯১০ সালে শ্যামজির ভারত-ভবন থেকে ভি. ভি. এস. আয়ার ভারতে আসেন এবং পণ্ডিচেরিতে তরুণদের রিভলভার ছোঁড়া শেখার একটা কেন্দ্র খোলেন। ১৯১১ সালে জানুয়ারিতে ওয়াঞ্চি তিনমাসের ছুটি নিয়ে পণ্ডিচেরি যায়। আয়ারের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। ১৭ই জুন ১৯১১ সালে অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাশকে একটি রেলের কামরায় ওয়াঞ্চি হত্যা করে। সে নিজেও আত্মহত্যা করে। তার পকেটে একটি কাগজ পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল—ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধনে ওয়াঞ্চি তার কর্তব্য করেছে। এই সময় একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়—'ভগবানের কাছে শপথ করো, ফিরিঙ্গীকে যেভাবে পার দেশছাড়া করবে এবং স্বরাজ স্থাপন করবে'। অ্যাশকে হত্যা করার দু'দিন আগে শঙ্কর ও ওয়াঞ্চি প্রচার করে—'ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াও। সনাতন ধর্ম স্থাপন করো। রামদাস স্বামী ও শিবাজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, শিবাজি এবং গুরু গোবিন্দের কথা বর্ণে বর্ণে পালন করো।'

চিদাম্বরম্ পিলাই-এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। হাইকোর্টে আপীল করলে সাতবছরের সাজা দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি ডকের

মজুরদের বিদ্রোহে আহ্বান করেন ও তারই ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। এই প্রথম মাদ্রাজে দেশের কাজে মজুররা ধর্মঘট ও দাঙ্গা করে। বলা বাহুল্য, সুব্রহ্মণ্যশিবমেরও দীর্ঘ কারাবাস হয়। তিনি একজন অতি উচ্চদরের দেশপ্রেমিক ছিলেন। চিদাম্বরম্ ছিলেন উকিল। তাঁর প্রচেষ্টায় 'টিউটিকোরিন-কলম্বো স্টীমার কোম্পানি' খোলা হয়। দেশীয় লোকেদের জাহাজ-চালানো শিক্ষা দেওয়াও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এই নিয়ে এক ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে তাঁর রেষারেষি হয়। এই ব্যাপারও যে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারকে চালিত করে নি তা বলা যায় না।

টিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলায় দক্ষিণ ভারতের গোঁড়ামি ভাঙার প্রচেষ্টা প্রকট হয়। জাতের বিচার দূর করার শপথ গুপ্ত-সমিতির সভ্যদের নিতে হয়েছিল।

আল্লুরি সীতারাম রাজুর জন্ম অন্ধ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার মাগাল্লু গ্রামে ১৫ই মে ১৮৯৭। চোদ্দবছর বয়সে তিনি গ্রাম ত্যাগ করেন। লেখাপড়া করেন রাজমহেন্দ্রীতে। কাজ চালানোর মতো ইংরেজী শেখেন। ১৯২১ সালে সন্ন্যাসীর বেশে গ্রামে গ্রামে পর্যটন করেন। অন্ধ্রদেশে যাকে এজেন্সি-ভুক্ত জায়গা বলা হত অর্থাৎ ইংরেজের খাস-মহল, সেইসব জায়গায় ছিল এঁর কর্মস্থল।

তাঁর ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ—(ক) জঙ্গল এলাকা সরকার নিজস্ব খাসে রাখায় উপজাতিদের কষ্টের অবধি ছিল না। (খ) সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর অত্যন্ত জুলুম করত। এই কারণে সন্ন্যাসী রাজু বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

সীতারাম রাজুকে ঢিট করার চেষ্টায় সরকার ১২,৩৬,০০০ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ইনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নি, কিন্তু তিনি অনেকগুলি পঞ্চায়েত স্থাপন করেন। তিনি খাজনা দেওয়া নিষিদ্ধ করেন। সরকার এঁর দলকে বিধ্বস্ত করার জন্য 'মপলা হাঙ্গামা'-দমনকারী মালাবার সশস্ত্র পুলিস এবং আসাম সশস্ত্র পুলিস নিয়োজিত করে। ১৯২২ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে দখল করার উদ্দেশ্যে সীতারাম সংবাদ দিয়ে ১৯শে অক্টোবর দুটি থানা সদলবলে আক্রমণ করেন। ঐ সালের ৬ই ডিসেম্বর পুলিসের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। রাজু গ্রামদেশে সরে যান। তাঁকে ধরার জন্য ১,৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হয়। তিনি মোটের উপর পাঁচটি থানা আক্রমণ করেন এবং সরকারী অস্ত্রশস্ত্র লুট করেন। ১৯২২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে পেডাবলসাঘাট থানায় রাজুর দলের সঙ্গে পুলিসের একটি সংঘর্ষ হয়। দুজন ইংরেজ নিহত হয়। পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল দৈবক্রমে গুলীর আঘাত থেকে রক্ষা পান। এরপর সরকার অবশ্য কড়া উপায় অবলম্বন করে। সরকারী নথিপত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯২৪ সালে এপ্রিল মাসে ভিজাগাপটনমের ম্যাজিস্ট্রেট রাজুর বিরুদ্ধে দশ

হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৪ই মে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ পায় রাজু মালাবার পুলিসের এক জমাদারের গুলীতে নিহত হন।

১৮ই মে ১৯২৪ থেকে ৭ই জুন ১৯২৪ পর্যন্ত বাদবাকী বিদ্রোহীদের দমনে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়।

বিহার-উড়িষ্যার কথা

বারীনবাবুর দল এখানে একটি সমর্থকের ঝাঁক পান। এখানে একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে কাশীর শচীন সান্যাল বাঁকিপুরে একটি সমিতি স্থাপন করে। বিহার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র বঙ্কিম মিত্র এটির সংগঠনকারী। রঘুবীর সিংকে সে দলে আনে। রঘুবীর সিং পরে এলাহাবাদে চাকরি নিয়ে যায়। সৈন্য-বিভাগে সে কেরানীর পদ পায়। আর একজন কর্মী ছিল সুধীর সিংহ। তার মামা কামাখ্যা মিত্র বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ সালে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা করার ফলে কামাখ্যাবাবুর চাকরি যায়।

এরপর 'ঢাকা অনুশীলন'-এর রেবতী নাগ ভাগলপুরে একটি শাখা খোলে। সুধীর ও বঙ্কিম ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর মজঃফরপুরে বিহারী ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করে।

মজঃফরপুরে যে শাখা গড়ে ওঠে, বাবু রামবিনোদ সিং তার এক প্রধান কর্মী। রামবিনোদবাবু, তাঁর ভাই শুকদেব প্রভৃতি ত্রিশজন যুবক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্তরীণ হয়ে ছিলেন। রামবিনোদবাবু বর্তমানে এম. এল. এ.। ইনি বেজায় ভুগেছেন। ইংরেজ আমলে এঁকে 'Criminal Tribes Act'-এ ফেলেছিল। ব্রজেন ব্যানার্জীও অন্তরীণ হন। উড়িষ্যায় 'যুগান্তর'-এর ভালো দল ছিল। সেখানে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্র ব্যানার্জী (নিরালম্ব স্বামী), দেবব্রত বসু প্রভৃতি যেতেন। বিহারেও তাঁদের একটি দল ছিল।

একবার দলের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি সরকার, প্রফুল্ল চাকী এবং সতীশ সরকার পাটনায় আসেন। বাঁকিপুরের উকিল কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী তাঁদের 'পঞ্চপাণ্ডব' উপাধি দেন।

নতুন 'যুগান্তর' দলের দ্বারা ১৯১৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যাজপুরে একটি ডাকাতি হয়। কয়েকটি উড়িয়া ছাত্র এ দলের সভ্য ছিল। এরপর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা বিস্ফোরণ হয় এবং ১৯১৫ সালে বালেশ্বরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মজঃফরপুরে 'অনুশীলন'-এর কয়েকটি বিশিষ্ট বিহারী যুবকের নাম রামবিনোদ সিং, শুকদেব সিং, ধ্বজাপ্রসাদ, কামতাপ্রসাদ, মদনলাল প্রভৃতি।

মধ্যপ্রদেশের কথা

এখানে ১৯০৭ সালে 'হিন্দ কেশরী' ও 'দেশসেবক' নামক দুখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। তাদের লেখা যুবক ও ছাত্রদের খুব প্রভাবান্বিত করে। ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দিন দিন বৃদ্ধি পায়। চরমপন্থী রাজনীতিকরা এদের কাছে সম্মানের আর নরমপন্থীরা বিদ্রূপের পাত্র হতে লাগলেন। এজন্য সরকার খুব কড়া ব্যবহার সুরু করে। শ্রীঅরবিন্দ এ সময়ে নাগপুরে আসেন। তিনি বয়কট ও স্বদেশী সমর্থন করতে বলেন। একে তো তিলকের প্রভাব এখানে ছিল—এখন শ্রীঅরবিন্দের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি মন্ত্রের মতো কাজ করল। 'দেশসেবক' বোমার জন্য প্রচার করতে লাগল; কিন্তু ক্ষুদিরামের কাজকে সমর্থন করে নি। 'হিন্দ কেশরী' অন্যভাবে লেখে, 'যুগান্তর' কাগজের প্রশংসায় শতমুখ হয়। ফলে কিছু লোকের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হল।

তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে প্রতিবাদ-সভা করতে দেওয়া হয় না। এখানে সরকার চণ্ডনীতি অনুসরণ করে। ১৯০৮ সালের শেষ দিকে কুইন ভিক্টোরিয়ার মূর্তিতে কে বা কারা আলকাতরা লেপন করে ও অঙ্গহীন ক'রে দেয়। ১৯১৪-১৫ সালে বরিশালের কয়েকটি যুবক ঐ প্রদেশে একটি বিপ্লবী শাখা খোলে। ওদেশের কর্মীদের মধ্যে রুইকর নামক এক ব্যক্তি বোমা সংগ্রহের জন্য কলকাতায় আসেন। সত্যেন মিত্রের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়। সত্যেনবাবু আমাকে ঐ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করতে বলেন। তারা বোমা পেতে বেজায় ব্যস্ত। আমি বলি, বোমা আর নয়; রিভলভার নিয়ে যান। বোমার ব্যবহারে দেখা গেছে প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে। শিকার ফসকে অন্য লোক আহত হয়েছে বা মারা গেছে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তাঁরা কথাটা বুঝেছিলেন।

১৯১৫ সালে রাসবিহারী উত্তরপ্রদেশের নলিনী মুখার্জীকে জব্বলপুরের সৈন্যদের বিদ্রোহ সম্পর্কে কাজ সুরু করতে পাঠান। কাজ কিছু হয় না। নলিনী 'কাশী ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী হন এবং কারাদণ্ড লাভ করেন।

পরে ঢাকা অনুশীলন'-এর নলিনী ঘোষ মধ্যপ্রদেশে যান। 'কাশী ষড়যন্ত্র মামলা'র নিখোঁজ আসামী বিনায়ক রাও কাপ্লেও জব্বলপুরে কর্তব্যপালনে যান।

উত্তরপ্রদেশের কথা

১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে শান্তিনারায়ণ এলাহাবাদে 'স্বরাজ্য' নামক একটি সংবাদপত্র বার করেন। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমার ব্যাপারকে সমর্থন করায় তাঁর দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হয়। কাগজটি চলতে থাকে। আরও তিনজন সম্পাদক

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১০ সালে সংবাদপত্র আইন-নিয়ন্ত্রণ আইনে কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ কাগজটিতে ক্রমাগত ক্ষুদিরাম, বোমা, বয়কট, 'অত্যাচারী ও দুরাচারী' বিষয়ে উৎকট প্রবন্ধ ছাপা হত।

১৯০৮ সালে আলিগড় থেকে হোতিলাল বর্মা কলকাতার 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। বিপ্লববহ্নি ছড়ানোর জন্য তাঁর দশ বছর দীপান্তর হয়। তাঁর কাছেও কলকাতা মানিকতলার বোমা প্রস্তুতপ্রণালী পাওয়া যায়।

শচীন সান্যাল 'কলকাতা অনুশীলন'-এর পটলডাঙা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনস্থ শাখার সভ্য ছিল। আমি সেখানে লাঠি ও তলোয়ার খেলা শেখাতে যেতাম। তাই আমার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তার পিতা ডাক বিভাগে কাজ করতেন। তিনি কাশী চলে যান। শচীনও যায়। সেখানে সে কলকাতার সমিতির অনুরূপ একটি সমিতি গড়ে। ব্যায়াম ও কলকাতার আদর্শে সাপ্তাহিক মর্যাল ক্লাস হত। একটি 'ভিতরের চক্র' এবং একটি 'বাইরের কেন্দ্র' স্থাপন করে (Inner and outer circle)। মদনপুরা পল্লীর 'আদর্শ বিদ্যালয়' বিপ্লবের আদর্শ ছড়াবার স্থল ছিল।

১৯১৩ সালে শচীন কলকাতায় আসে। বড়লাট হার্ডিঞ্জকে বাঁকিপুরে আসার কালে হত্যার মানসে আমার সঙ্গে দেখা করে ও রিভলভার চায়। আমি 'ব্যক্তিগত হত্যায় স্বাধীনতা আসবে না সুতরাং ও পথ ছাড়ো, বরং চতুরঙ্গ বিপ্লবের আয়োজনে লাগো' বলায় সে থমকে গেল। আমি কোনো প্রকারেই রিভলভার দেবার ব্যবস্থা করলাম না। তখন সে তার কাশীর বন্ধু দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যায়। দেবনারায়ণ তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের লেডি ডান্ডাস হোস্টেলে থাকত। সে অপর কাউকে তেমন জানত না, আমায় জানত। অবশেষে ওখানকার ছাত্র ভূপেন্দ্র-কুমার দত্তকে সে শচীনের ঐকান্তিক আগ্রহের কথা বলে। ভূপেন তখন ঢাকা অনুশীলনের সভ্য। সে শচীনকে মাখন সেনের কাছে নিয়ে যায়। ঐ স্থানে অমৃত হাজরা উপস্থিত ছিলেন। এই যোগাযোগে শচীনের সঙ্গে অমৃত হাজরার আলাপ হয়। শুধু তাই নয়, বোমার জন্য চন্দননগরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীমতিলাল রায়ের সঙ্গেও শচীনের পরিচয় ঘটে। ভূপেন কোনো কারণে ঢাকা অনুশীলনের উপর অসন্তুষ্ট হয় ও সমিতি ছাড়ে। তারপর ১৯১৩ সাল থেকে বরাবর সে আমাদের সঙ্গে থাকে। বাঘা যতীনের সংস্রবে তার প্রাণের আলো আরও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে।

এরপর ১৯১৪ সালে কলকাতায় রডা কোম্পানির অস্ত্র লুট হবার পর শচীন কলকাতায় আসে এবং এটা কাদের কাজ আমার কাছে জানতে চায়। আমি তাকে যতটুকু বলা যায় বলি। সে আমায় বলে, সারা ভারতের একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—আমি তাতে কেন যোগ দিই না। আমি জানতাম একথা ঠিক নয়।

যেটির কথা সে বলেছিল সেটি হচ্ছিল চন্দননগরের মাধ্যমে রাসবিহারীর সঙ্গে 'ঢাকা দল'-এর যোগ। ঢাকার দল তাদের প্রধান কেন্দ্র আলাদা রেখেছিল। রাসবিহারীও একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এদিকে বাংলার সব দলকে মিলিয়ে যতীন্দ্রনাথের অধীনে আমরা যে প্রচেষ্টা করছিলাম 'ঢাকা সমিতি' তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। তাদের তখনকার নেতৃহীন অবস্থায় তারা ইংরেজের সঙ্গে সোজাসুজি যুদ্ধ করতে চায় না। এই অবস্থায় আমি খ'য়ের-বন্ধনে পড়ি। আমাদের প্রস্তুতিতে জার্মানির সঙ্গে যোগের সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায় শচীনকে এই নতুন দিকের কিছু ইঙ্গিত দিতে পারি নি। সে আমায় বলে 'ফলেন পরিচীয়তে'। তাকে বিপিনদার (বিপিন গাঙ্গুলী) কাছে পেঁছে দিই।

এরপর সে 'কাশী ষড়যন্ত্র মামলা'য় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা পায়। কিন্তু রাজানুগ্রহে (amnesty) চারবছর পরে খালাস পায়। পরে আমার সঙ্গে ১৯২২ সালে দেখা হলে অনুযোগ করে—আমি কেন তাকে সব কথা খুলে বলি নি। 'ফলেন পরিচীয়তে'র কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিই। সে জানত না রাসবিহারীর সঙ্গে আমাদের যোগের বিষয়। শ্রমজীবী সমবায়ের কথা সে জানত না। পাঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা ভাই পরমানন্দ আন্দামানে শচীনকে আমাদের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথাই বলেন।

রাসবিহারী গোড়া থেকেই 'যুগান্তর'-এর লোক। মানিকতলা বাগানে তাঁর দুখানা চিঠি ধরা পড়ে, এ কথা আগে বলেছি।

এখন শ্রমজীবী সমবায়ের কথায় আসি। স্বদেশী যুগে ১৯০৮ সালে হ্যারিসন রোডে এই দোকানটি খোলা হয়। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'যুগান্তর'-এর লেখক ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী ব্যবসার দিক থেকে এটির প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এটির আবরণে বিপ্লবী কাজের প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঘা যতীন, চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ এবং মতিলাল রায়। এঁদের সঙ্গে রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেইজন্য ১৯১২ সালে দিল্লীতে লাট হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা ফেলার জন্য বসন্ত বিশ্বাসকে অমরদা রাসবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দেন। বোমাটি চন্দননগরে প্রস্তুত এবং বোমারু শ্রমজীবীর লোক। ১৯১৫ সালে পিংলে-র মীরাটে প্রয়োজন হতে পারত যে বোমা, তা বসন্ত বিশ্বাসের খুড়তুত ভাই মন্মথ বিশ্বাস কাশীতে নিয়ে যায়।

আবার পাঞ্জাবের যোগাযোগ দেখা যাক্। ১৯০৬ সালে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবে প্রচার করতে যান। তাঁর সংস্পর্শে আসেন সর্দার অজিৎ সিং, তাঁর ভ্রাতা (ভগৎ সিং-এর পিতা) কিষণ সিং, আম্বালার ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, পেশোয়ারের ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ, শিয়ালকোটের লালা অমরদাস প্রভৃতি। লালা লাজপৎ রায়ের বাড়িতে হরদয়াল বিলাত থেকে এসে ওঠেন। সেখানে কিষণ সিং, অজিৎ সিং

প্রভৃতির সম্পর্কে লালা হরদয়াল যতীন্দ্রনাথের অনুরাগী ভক্ত হন, যার ফলে আমেরিকায় 'যুগান্তর আশ্রম' খোলেন।

এদিকে রাসবিহারী এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেন পুরানো আড্ডায় এসে পৌঁছলেন। কারণ রাসবিহারী তো মানিকতলার কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেনই, পরে ১৯১২ সালে চন্দননগর দল তাঁকে নিজস্ব করে নেয়। কিন্তু মানিকতলায় ও চন্দননগরে একই শ্রীঅরবিন্দ প্রেরণা যোগান। দল সেদিক থেকে একটা হয়ে দাঁড়ায়।

এখন পরীক্ষা করে দেখা যাক্, শচীন সান্যাল আমায় ভারত-জোড়া একটিমাত্র বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের কথা যে বলেছিল, তার অবস্থা কি? তিনটি প্রতিষ্ঠানের কথা এতে আসে। ঢাকার অনুশীলন, চন্দননগর দল—যা ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় গড়ে ওঠে এবং উত্তর ভারতের রাসবিহারীর দল। এদের মধ্যে একটা কাজের সমন্বয় হয়েছিল। সবটা ভেঙে মাত্র একটা দল কোনোদিন হয় নি। একটিমাত্র নেতার অধীনে তাঁরা কোনোদিন একত্রিত হন নি, এ কথা ঠিক। কারণ ঢাকার বন্ধুরা আমায় বলেছিলেন তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বরাবর বজায় ছিল।

১৯২৩ সালে আমি দলীয় কাজে উত্তরপ্রদেশে যাই। এইসময় আমরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম এবং দেশবন্ধুকে স্বরাজ্য পার্টি গড়ে তোলায় সাহায্য করি ও ভূপতি মজুমদার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। তখন পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তন-বিরোধী দল কংগ্রেসে লড়াই করছে। এলাহাবাদে মতিলাল নেহেরুর আনন্দ-ভবনে এই উভয় দলের সভা হয় এবং তিনমাসের জন্য একটা রফা হয়ে যায়।

আমি শচীনের বাড়িতেই ছিলাম কয়েকটা দিন। কাশীতে শিবপ্রসাদ গুপ্ত এবং শ্রীভগবানদাসের সঙ্গে দেখা হয় এবং আমাদের নতুন কর্মতালিকা নিয়ে আলাপ করি। শচীন আমায় অনুরোধ করে যেন আমি তাকে আমাদের প্রতিনিধি বলে নতুন পরিচয় দিই। তাই করেছিলাম। তার কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব তাকে কিছু মুশকিলে ফেলেছিল। আমার অনুরোধে শিবপ্রসাদ গুপ্ত তাকে কাজের জন্য কিছু টাকা দিয়েছিলেন। এই কথা বন্ধুবর মনোরঞ্জন গুপ্তকে জানিয়েছিলাম। রামগড় কংগ্রেসের সময় (মার্চ ১৯৪০) শচীনের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। সে আমার রাঁচিস্থ বাড়িতে এসে কয়েকদিন থেকেছিল। তখন আমার বাড়িতে এম. এন. রায় প্রভৃতি বন্ধু ছিলেন। শচীন এ সময় কাশীর হিন্দী কাগজ 'অগ্রগামী'র সম্পাদক ছিল।

ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' কাশীর নলিনী মুখোপাধ্যায় একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন রাসবিহারীবাবু ও নলিনীবাবুরা নিজেদের যুগান্তর দলের লোক বলতেন। এখানে দলাদলির প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কারণ গোড়ায় একটাই দল ছিল। পরে দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯১৪ সালে রাসবিহারী দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন এবং গা-ঢাকা দেন। তিনি কাশীতে এসে বাস করতে থাকেন। এই সময় শচীনের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা হয়ে যায়। কার্যতঃ এখন থেকে রাসবিহারী কাশী-কেন্দ্রেরও মাথা হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে পিংলে নামক এক মারাঠা যুবক গদর পার্টির সঙ্গে ভারতে আসে এবং কাশীতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করে। ভারতে সম্ভাব্য বিদ্রোহের কথা সে রাসবিহারীকে জানায়। এই প্রসঙ্গে রাসবিহারী শচীনকে পাঞ্জাবে খোঁজখবর নিতে পাঠান।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে পিংলে ও শচীন কাশীতে ফিরে আসে। রাসবিহারী বিদ্রোহ যে সম্ভব তা বুঝলেন। তিনি যতীন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠান। পরামর্শে স্থির হয় উত্তর ভারতের কাজের ভার রাসবিহারী নেবেন এবং বাংলার বিশেষ ভার যতীন্দ্রনাথের হাতে থাকবে। রাসবিহারী আর যাঁদের উপর কাজের ভার দিলেন তাঁদের কথা বলি। দামোদরস্বরূপ এলাহাবাদে; রাসবিহারী, শচীন ও পিংলে পাঞ্জাবে; বিভূতি ও প্রিয়নাথ কাশীতে; নলিনী মুখার্জী জব্বলপুরে—সবাই বন্দোবস্ত অনুযায়ী বিদ্রোহের কাজ করবেন।

শচীন পরে কাশীর কর্মাধ্যক্ষ হয়ে ফিরে আসে। মণিলাল ও বিনায়করাও কাপ্‌লে বোমার সরঞ্জাম নিয়ে লাহোরে যায়। যতীন্দ্রনাথকে খবর পাঠানো হয় যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি একসঙ্গে সমগ্র ভারতে 'অভ্যুত্থান' হবে। তারপর সন্দেহ হয় যে, এই তারিখ পূর্বেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং শত্রুপক্ষের তা জানা অসম্ভব নয়। সেজন্য তারিখ পরিবর্তন করে ১৯শে ধার্য করা হয়। মনে রাখতে হবে—সিপাহীদের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করানোর কর্মসূচী ছিল। সংকেত ছিল যে, ঐ তারিখে পাঞ্জাব মেল না পৌঁছালে জানতে হবে 'বিদ্রোহ' হয়েছে। রামায়ণের আখ্যায়িকা যেন আবার ফিরে এল। কোথা রামের অধিবাস, হয়ে গেল বনবাস! কোথায় অভ্যুত্থান, আর কোথায় বিস্তৃত জালে পাঞ্জাবে ধরপাকড়। সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। পিংলে ও রাসবিহারী কাশীতে ফিরে আসেন। বেশ-পরিবর্তন করে অন্য সাজে সেজে তাঁরা পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পেরেছিলেন। কয়েকদিন পরে পিংলে মীরাটে শেষ চেষ্টা করতে যায়। কিন্তু তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ফাঁসি হয়ে যায়।

রাসবিহারী নিরাশ হয়ে বাংলায় ফিরে আসেন। চন্দননগর, নবদ্বীপ ও কলকাতায় কিছুদিন কাটিয়ে আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য ছদ্মবেশে জাপানে চলে যান। যাবার পূর্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অসুস্থ থাকায় আমি যেতে পারি নি। যতীনলোচন মিত্রকে আমি পাঠাই এবং সে দেখা করে এসে আমায় সব সমাচার জানায়। এসময় যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর জেলার কাপ্তিপদায়। রাসবিহারী

রবীন্দ্রনাথের জাপান-যাত্রার সম্ভাবনায় যেন তাঁর লোক পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্মনামে ১৯১৫ সালের ১৫ই মে চলে যান।

শচীন ধরা পড়ে ১৯১৫ সালের জুন মাসে। তার বাসস্থানে 'যুগান্তরে'র কতকগুলি পুরানো সংখ্যা পাওয়া যায় এবং ক্ষুদিরাম, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসুর ফটোও পাওয়া যায়।

১৯১৬ সালে দুজন বাঙালী যুবক কাশীর রাস্তায় রাস্তায় 'যুগান্তর' (দলের সে-সময়ের লেখা গুপ্ত পত্রিকা) কাগজ দেওয়ালে লাগাচ্ছিলেন বলে গ্রেপ্তার হন। একজনের নাম নারায়ণচন্দ্র দে। তিনি কাশীর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির শিক্ষক ছিলেন। দুজনেই বাংলার জেল-ফেরতা লোক। কাশীতে যুগান্তর দলের নেতা তখন সুরনাথ ভাদুড়ী।

শচীনদের সাজা হয়ে যাবার পরই 'যুগান্তর' কাগজ কাশীর গলিতে গলিতে প্রাচীরপত্রের মতো আবার লাগানো হয়।

পাঞ্জাবের কথা

রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট, লায়ালপুর, অমৃতসর, ফিরোজপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ও মতপ্রচার দেখা যায়। লাহোরে দু'বার কয়েকজন ইংরেজকে অপমান করা হয়। সভা-সমিতি বিস্তর হচ্ছিল। চেনাব খালের উপনিবেশ ও বারি দোয়াবের অধিবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য প্রবল আকার ধারণ করে। পুলিসের লোক ও সৈন্যদের ইংরেজের চাকরি ছাড়তে উত্তেজিত করা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রেলের চেনাবের কর্মচারীরা ধর্মঘট করলে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সভা-সমিতি হতে থাকে। তাদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়। নেতারা তখনই বাহুবলে বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বল করে ইংরেজকে দেশছাড়া করার কথা ভাবছিলেন। গণআন্দোলনে তাঁরা সিদ্ধকাম হবেন ভেবেছিলেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে—ইংরেজ পাঞ্জাব দখলের পর শিখদের মধ্যে 'নামধারী সম্প্রদায়' (নেতা রাম সিং) অমৃতসর থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত অসহযোগ এবং কর-বন্ধ আন্দোলন চালান এবং ইংরেজ কর্তৃক নিপীড়িত হন। ১৯০৭ সালে সরকার লালা লাজপৎ রায় এবং সর্দার অজিৎ সিংকে বর্মার জেলে দেশান্তরী করেন। রাজদ্রোহী সভা-বিরোধী আইনও পাস হল।

ছয়মাস পরে এঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯০৯ সালে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হল। সর্দার অজিৎ সিং ফিরে এসে ব্রিটিশ-বিরোধী কাজে এখন থেকে প্রাণ ঢেলে লাগলেন। তাঁকে আবার ধরার চেষ্টা

হতে তিনি পারস্য দেশে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর ভাই সর্দার কিষণ সিং ও লালচাঁদ ফালকের জেল হল। ভাই পরমানন্দের কাছে মুচলেকা নেওয়া হল। মানিকতলার মতো বোমা প্রস্তুতপ্রণালী ও লালা লাজপৎ রায়ের দুখানা চিঠি তাঁর কাছে পাওয়া যায়। এই চিঠি ভাইজি লণ্ডনে থাকাকালীন পান। প্রথম পত্রে লালাজি শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার কাছ থেকে কিছু অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা করতে বলেছিলেন।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সালে দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং পরে ৭ই মে লাহোরে গর্ডন নামক এক দুরাচারকে হত্যার জন্য রাস্তায় বোমা পাতা হয়। দিল্লীবাসী লালা হরদয়াল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাতে উচ্চশিক্ষার্থে যান। তিনি পরে বৃত্তি ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে। ১৯০৮ সালে লাহোরে এক বক্তৃতায় বলেন—ইংরেজকে ভারত-ছাড়া করতে হবে। উপায় হবে বয়কট ও দেশব্যাপী নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ। তাঁর দুজন ভালো ছাত্র জুটে যায়। জে. এন চ্যাটার্জী এবং দীননাথ। তিনি নিজে আমেরিকায় গিয়ে 'গদর দল' তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। দিল্লীর আমীরচাঁদের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটে। লালা লাজপৎ রায়ের গৃহে হরদয়ালের সঙ্গে এই যুবকরা মিশত। চ্যাটার্জী দীননাথকে রাসবিহারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। রাসবিহারী তখন দেরাদুনের সরকারী কর্মচারী। ১৯১৩ সালে 'লিবার্টি' পত্রিকা গুপ্তভাবে প্রকাশ হয়। রাজদ্রোহী ভাবে ভরা থাকত লেখাগুলি।

এরপর দীননাথ ধরা পড়ে সব কথা ফাঁস করে দেয় এবং পরে 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'তে রাজসাক্ষী হয়। এই মামলায় আমীরচাঁদ, আউধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়; রাসবিহারী পালিয়ে কাশী চলে যান।

১৯১২ সালে তুর্কির সঙ্গে ইটালির যুদ্ধ হয় এবং 'বলকান যুদ্ধ' বাধে। ইংরেজ তুর্কির মুরুব্বি না হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানেরা চটে যায়। ইতিপূর্বে ১৯১১ সালে ইংরেজ পারস্যের দক্ষিণ অংশ জোর করে দখল করে নেয়। সেজন্য মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হয়েই ছিল। এই কার্যকারণ পরম্পরায় ভারতে ইংরেজ মুসলমান-প্রীতি হারায়।

হরদয়াল ১৯১১ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কোয় যান। বহু জায়গায় বক্তৃতা দেন। 'গদর' বা বিদ্রোহী পার্টি স্থাপনে সাহায্য করেন। প্রচারের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, নাম 'গদর'। ১৯১৩ সালে এই ঘটনা ঘটে। 'গদর' পত্রিকা হিন্দী, গুরুমুখী ও অন্যান্য ভাষায় প্রচারিত হয়ে ভারত, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মায় প্রেরিত হত। রামচন্দ্র পেশোয়ারী ও বরকৎউল্লা বিপ্লবের কাজে তাঁর ডানহাত হন। হরদয়াল কলকাতার যুগান্তরের নামে আমেরিকায় একটি 'যুগান্তর আশ্রম' স্থাপন করেছিলেন। এখানে ছাপাখানা ছিল।

১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ, হরদয়াল আমেরিকায় উত্তেজনাপূর্ণ লেখা ও বক্তৃতার জন্য গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে খালাস হন। এই ফাঁকে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলে আসেন। জার্মানির প্রচুর অর্থসাহায্যে ভারতের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী বার্লিন-কমিটি কাজ অগ্রসর করতে লাগল। হরদয়ালের অনুপস্থিতিতে রামচন্দ্র গদর দলের কাজ চালাতেন। 'গদর' কাগজের লেখার প্রতিপাদ্য ছিল ইংরেজকে যে-কোনো উপায়ে ভারত-ছাড়া করতে হবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ সালে বজবজে 'কোমাগাটামারু'র আরোহীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। গুরুদিৎ সিং নামক এক শিখ সিঙ্গাপুরে কণ্ট্রাক্টরি করতেন। কানাডায় ভারতীয়দের নামতে বাধা দেবার জন্য কানাডা সরকার আইন প্রণয়ন করেছিলেন যে, প্রত্যেক আরোহীকে সোজাসুজি দেশ থেকে কানাডায় যেতে হবে এবং প্রত্যেকের কাছে অন্ততঃ দু'শত ডলার অর্থ যেন থাকে। এই আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য গুরুদিৎ সিং হংকং-এ গিয়ে একটি জাহাজ ভাড়া করেন ও বহু শিখ ও কিছু পাঞ্জাবী মুসলমানকে নিয়ে যান। যাত্রীসহ জাহাজ ছাড়ে সাংহাই বন্দর থেকে। আরও যাত্রী ওঠে জাপানের মোজি ও ইয়োকোহামা থেকে। কানাডায় এদের নামতে দেওয়া হয় না। ৪ঠা এপ্রিল জাহাজ হংকং ছাড়ে এবং ২৩শে মে কোমাগাটামারু ভাংকুভারে পৌঁছায়। ২৩শে জুলাই জাহাজ কানাডা থেকে ফিরতে বাধ্য হয়। লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়। আমেরিকার বিপ্লবীরা তাদের সহানুভূতি জানায় এবং অস্ত্র যোগান দেয়।

এরপর অগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর জাহাজ বজবজে নোঙর করে। ঐখানে রেলে চাপিয়ে যাত্রীদের পাঞ্জাবে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। যাত্রীরা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হচ্ছে বুঝে বিগড়ে যায়। দাঙ্গা বাধল। উভয় পক্ষে বহু হতাহত হল। গুরুদিৎ সিং গা-ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই ঘটনায় পাঞ্জাবে শিখরা চটে আগুন হয়ে উঠল। নতুন আইন গড়া হল যাতে বিদেশ থেকে ভারতে কেউ সহজে প্রবেশ করতে না পারে।

২৯শে অক্টোবর 'তোষামারু' নামক জাহাজ কলকাতায় যাত্রী নিয়ে পৌঁছায়। এতে কিছু বিপ্লবী শিখ আসে। পরে তাদের ছ'জনের বিভিন্ন অপরাধে ফাঁসি হয়। এরা নিজেদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পাঞ্জাবের নানা স্থানে কাজ করে।

২৭শে নভেম্বর একটা দল মগা মহকুমার ট্রেজারি লুট করতে যায়। পথে দুজন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটে ও বচসা হয়। তাদের গুলী করে মেরে ফেলা হয়। এই সময় 'গদর-ই-গুঞ্জ' (বিদ্রোহের গুঞ্জন) নামে এক পুস্তিকার বহুল প্রচার হয়। তাতে এক জায়গায় লেখা ছিল—'সরকারের টাকা লুট করো, সমস্ত পাঞ্জাবকে জাগাও।'

গদর দলের লোক বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেছিল। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে পিংলে পাঞ্জাবে এসে জানায় যে, বাংলার সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

শিখ গদর দলের লোকের সঙ্গে পিংলে আমেরিকা থেকে দেশে এসেছিল। এদিকে রাসবিহারীর সঙ্গে পিংলের যোগস্থাপন হয়ে গিয়েছিল। রেল ও টেলিগ্রাফ চলাচল বন্ধ করারও ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃপাল সিং নামক দেশদ্রোহী দ্বারা সব বন্দোবস্ত পণ্ড হয়। সে কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছিল।

পনেরোজন মুসলমান ছাত্র ব্রিটিশ রাজ্য ছেড়ে সীমান্ত প্রদেশে চলে যায়। তারা ইংরেজের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব সরকার ভারত সরকারকে খবর দেয় শিখ ষড়যন্ত্রকারীরা (যারা লাহোরে গ্রেপ্তার হয়েছিল) গ্রামের লোক। তাদের সাম্য ও প্রজাতন্ত্রের তত্ত্ব শেখানো হয়েছে আর সে কাজ হয়েছে হরদয়ালের দ্বারা আমেরিকায়।

এর ফলে 'ভারত-রক্ষা আইন' পাস হয়। ১২ই এপ্রিল অমৃতসর জেলায় একটি পোলে যে-সব মিলিটারী সান্ত্রী মোতায়েন করা হয় তাদের বিপ্লবীরা আক্রমণ ক'রে তাদের সর্দারকে হত্যা করে এবং রাইফেল ও রসদ সমস্ত নিয়ে চলে যায়।

নতুন আইন অনুসারে লাহোরে কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলা হয়। বহু লোকের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও জেল হয়। কর্তার সিং নামে ১৯ বছর বয়সের এক তরুণ গদর দলের লোক ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সে এরোপ্লেন তৈরি করতে শিখে এসেছিল। বহু সৈন্যের সামরিক আদালতে বিচার হয়েছিল।

বিপ্লবীদের কর্মসূচীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তারা (ক) সর্বজনীন অভ্যুত্থান এবং (খ) রেল ও টেলিগ্রাফের যোগাযোগ নষ্ট করার ব্যবস্থা করেছিল।

বিপ্লবীরা ফিরোজপুর এবং মিয়ান-মিয়ের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কার্যক্রম রেখেছিল; কাজে করতে পারে নি।

ভাই পরমানন্দ বিলাত থেকে আমেরিকা যান ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে। আমেরিকায় হরদয়ালের সঙ্গ করেছিলেন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এ সময়ে বিপ্লবীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে খোলাভাবে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচার করত। ফেব্রুয়ারি-অভ্যুত্থান পণ্ড হলেও প্রচার সমান জোরে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় জার্মানির সাহায্যে বিপ্লবীরা শ্যাম, ম্যানিলা, আফগানিস্তান ও তুর্কিতে গিয়েছিল। আরও জানা যায় রিও-ডি-জেনিরো (Rio-de-Janeiro) বাসিন্দা অজিৎ সিং-এর সঙ্গে হরদয়ালের যোগ ছিল। ১৯০৮ সালে পাঞ্জাবেই তো তিনি অজিৎ সিং ও তাঁর ভ্রাতা কিষণ সিং-এর প্রভাবে পড়েন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় জানা যায় যে, বার্লিন-কমিটির আলোচনায় তুর্কিরা এবং বড় বড় জার্মান সরকারী কর্মচারীরা যোগ দিতেন। ভারত-প্রত্যাগত জার্মান প্রফেসররা ও মিশনারীরাও এখানে জমায়েত হতেন। হরদয়াল ও বীরেন চট্টোপাধ্যায় জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে দৈনিক যাতায়াত করতেন। 'ওরিয়েণ্টাল ব্যুরো'

বা প্রাচ্য পরিষৎ নামে একটি কেন্দ্র খোলা হয়। এখান থেকে যুদ্ধবন্দী ভারতীয়দের ইংরেজের অনুকূলে মন ছাড়িয়ে নেবার জন্য বহুপ্রকার কাগজপত্র বিলি করা হত। আমেরিকাস্থিত জার্মান বাণিজ্যদূত ভারতে বিপ্লব বাধাবার কাজে খুব উদ্যোগী ছিলেন। একটি আমেরিকান মহিলা, অ্যাগনেস স্মেড্‌লি, ভারত-বিপ্লবকে জীবনের ব্রত করে খেটেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মতোই তাঁর ভারত প্রীতি ছিল।

পাঞ্জাব সরকার আরও দুটি কাজ করেছিল—

(ক) 'জমিন্দার' নামক সংবাদপত্রের উপর হুকুম হয়েছিল কাগজ প্রকাশের পূর্বে লেখাগুলি সরকারকে দেখিয়ে নিতে হবে। জাফর আলি খাঁ ঐ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

(খ) লোকমান্য তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল 'হোম রুল' (স্বাধিকার আন্দোলন) উপলক্ষে বক্তৃতা করার জন্য পাঞ্জাব যেতে প্রস্তুত হলে তাঁদের পাঞ্জাবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। 'স্বাধিকার আন্দোলন' ('Home Rule') পূর্ণ স্বাধীনতার কাছে-পিঠে আসে না। স্বাধিকার বা স্বায়ত্তশাসনকে মিউনিসিপ্যালিটির বড় সংস্করণ ধরা যেতে পারে। তবু সরকার তখন কত ভয়চকিত হয়ে পড়েছিল তা এই আদেশ থেকেই বোঝা যায়।

গদর দলের নেতারা বিপ্লবীদের আত্মদানের সুবিধা নিয়ে ইংরেজের কাছ থেকে কিছু সংস্কার পাবার আশা করতেন। এঁরা মুখে ইংরেজের সম্পর্কশূন্য স্বাধীনতার কথা বলতেন, কিন্তু লক্ষ্য বরাবর ছিল সংস্কারের ভাগাড়ের দিকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'হোম রুল আন্দোলন'। তারপর ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিঠলভাই প্যাটেল বলেছিলেন—অহিংস আন্দোলনে সাড়া না দিলে ইংরেজকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের মত একটা প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে হবে। অবশেষে ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরু প্রকাশ্য বিবৃতি দেন যে, বাংলায় বিপ্লবীদের হাতে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এসে গিয়েছে। আমরা কিছু লোক সে সময়ে জেলে (১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম।); কিন্তু দেশবন্ধুদের বিবৃতির অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার বেড়াজালে ঘিরে বাংলার বিস্তর দেশপ্রেমিকদের গ্রেপ্তার করেছিল। তাতে সুভাষ, অনিলবরণ, সত্যেন মিত্র, পূর্ণ দাস, সুরেন ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন। অথচ দেশবন্ধুর বিবৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—আসলে রাজনৈতিক হুমকিমাত্র। সরকার বলত—নেহেরু-দাশের উক্তিই তো যথেষ্ট। ঐ লোকগুলিকে বিশেষ আইনের কবলে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অনুশোচনায় দেশবন্ধু বললেন, 'They take my diagnosis but not my treatment—ওঁরা আমার রোগ-নির্ণয় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার ব্যবস্থা নয়।' অর্থাৎ সংস্কার দিচ্ছেন না।

গদর পার্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' যে খবর পাওয়া যায় তদনুযায়ী হরদয়ালের পূর্বেই একটি 'দল' স্থাপিত হয়। কাশীরাম এটির নেতা ছিলেন। হরদয়াল ১৯১৩ সালে এসে এই দলে যোগ দেন এবং তাঁর পরামর্শে দলের নাম হয় 'গদর পার্টি'।

এই দল জাপান থেকে বরকৎউল্লাকে পান। কারণ বরকৎউল্লা জাপানে অধ্যাপকের কাজ করতেন। কিন্তু ইংরেজ-বিরোধী লেখা ও বক্তৃতার জন্য তাঁর চাকরি যায়। তিনি আমেরিকায় আসতে বাধ্য হন।

১৯১৪ সালে রামচন্দ্র গদর দলে যোগ দেন। বাংলার সত্যেন সেন ও পিংলে দলের সভ্য হন। শিখদের গ্রন্থী সোহন সিং এই দলে যোগ দিলে শিখদের মধ্যে খুব উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সুরেন করও এই দলে যোগ দেন। তিনি একজন প্রভাবশালী কর্মী হন।

পাঞ্জাবের আরো কিছু কথা: পটভূমিকা হিসাবে ১৮৬৫ সালে ও তৎপরে পাঞ্জাবে বাবা রাম সিংহের 'কুকা আন্দোলন'-এর কথা না বললে ইতিহাস অপূর্ণ থাকবে। এঁর দলকে 'নামধারী দল'ও বলত। শিখরাজ্য ইংরেজ গ্রাস করলে শিখরা নিস্তেজ হয়ে যায়। এই সময় সদ্‌গুরু বাবা রাম সিংহ মরা ধড়ে প্রাণ আনেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেন। ১৮৬৫ সালে বাবার অনুচরেরা এক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এর পাঁচটি অঙ্গ ছিল—(১) সরকারী চাকরী কেউ গ্রহণ করবে না; (২) সরকারী স্কুল-কলেজে পড়বে না; (৩) ইংরেজের আদালতের ছায়া মাড়াবে না; (৪) হাতে-কাটা সুতার কাপড় পরবে; (৫) বিবেক-বিরোধী ব্রিটিশ আইনের ধারাগুলি ভঙ্গ করতে হবে।

তিনি আম্বালা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত একপ্রকার সমান্তরাল স্বদেশী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। বাইশজন শাসক এই বাইশটি অঞ্চল শাসন করতে নিযুক্ত হন। কুকা ডাকবিভাগও প্রচলিত হয়।

ইংরেজও বসে ছিল না। কঠোর হস্তে বিদ্রোহের মূল-উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হয়। বহু কুকা কর্মীকে উড়িয়ে দেওয়া হয় তোপের মুখে।

বর্মার কথা

এখানের কাজ ছিল শ্যাম ও ভারতের বাংলা প্রদেশের প্রচেষ্টার পরিপূরক। প্ল্যানটি ছিল এইরূপ। শ্যাম থেকে সশস্ত্র বিপ্লবকারীরা বর্মায় আসবে এবং বর্মার ভারতীয় সৈন্য এবং মিলিটারী পুলিস সে সময় বিদ্রোহ করবে। এই সম্মিলিত দল একযোগে পরে আসাম এবং বাংলায় চলে যাবে।

এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে ক্ষীরোদগোপালকে ১৯০৮ সালে বর্মায় পাঠানো হয়। তিনি প্রথমে রেঙ্গুনে ডেরা করেন। সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। শরৎবাবু এই প্রথম বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অবহিত হন। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠানো হয় শ্যামে। ভোলানাথ শ্যামে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। কুমুদ মুখোপাধ্যায় নামক উকিল এবং অমর সিং নামক ইঞ্জিনিয়ারও কাজের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হন।

ভোলানাথ আমায় সাংকেতিক চিঠি লিখতেন। সে চিঠি প্রথমে আসত বর্মায় ক্ষীরোদগোপালের কাছে। তারপরে ক্ষীরোদগোপাল সেটি আমায় পাঠিয়ে দিতেন।

কাজের সুবিধার জন্য কিছুদিন পরে ক্ষীরোদগোপাল মিক্‌টিলায় সরে যান। মিক্‌টিলা বর্মার সীমান্তে। ওখান থেকে শ্যাম দেশের লোকদের মাতিয়ে তোলা হত। রেঙ্গুনে থাকেন রংপুরের যতীন হুই। ১৯১৫ সালে আমি হুই-এর সঙ্গে রেঙ্গুনে যাওয়া ঠিক করি। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে হুই রংপুরে মসার পিস্তল সহ ধরা পড়েন। আইনের ফাঁকে মোকদ্দমার কবল থেকে তিনি অবশ্য বেঁচে যান শেষ পর্যন্ত।

অবশেষে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার হয়ে পড়লে ক্ষীরোদগোপাল গ্রেপ্তার হন। মাসিদি খান-এর মারফত কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে বিপ্লব-প্রচারেও তাঁর অংশ ছিল।

১৯১৬ সালে মান্দালয়ে দুটি ষড়যন্ত্র মামলা হয়। নবাব খান এবং মুলা সিং রাজসাক্ষী হয়। এদের সাক্ষ্যে প্রকাশ হয় যে, আমেরিকা ও কানাডায় হরদয়াল, বরকৎউল্লা এবং ভাই পরমানন্দ ঘুরে ঘুরে ভারতীয়দের উত্তেজিত করে বক্তৃতা করতেন। গদর দল এরই ফলে গড়ে ওঠে। 'গদর' নামক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় সানফ্রান্সিস্কোতে ১লা নভেম্বর, ১৯১৩ সালে। এই পত্রিকার এক সংখ্যায় বলা হয়, 'চাই বীর সৈন্য ভারতে বিপ্লব বাধাতে। বেতন—মৃত্যু। পুরস্কার—মৃত্যুঞ্জয়িত্ব। পেন্‌সন—স্বাধীনতা। যুদ্ধক্ষেত্র—ভারতবর্ষ।'

গদর-ই-গুঞ্জ নামে এক পুস্তিকা প্রচার করা হয় আমেরিকা থেকে। একটি কবিতায় প্রশস্তি থাকে—তিলক, লিয়াকৎ হোসেন, সুফী অম্বাপ্রসাদ, অজিৎ সিং, বরকৎউল্লা, অরবিন্দ ঘোষ, সাভারকর, হরদয়াল, শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতির। তাতে লেখা হয়—চলো আমরা যুদ্ধার্থে দেশে যাই। এই আমাদের প্রতি শেষ আদেশ।

১৯১৪ সালের ১৮ই অগস্টের 'গদর' পত্রিকায় বলা হয়—কর্মীরা 'গদর' কাগজ বিস্তৃতভাবে বিতরণ করবে; নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ আরম্ভ করবে এবং লাইন উপড়ে রেল-চলাচল বন্ধ করে দেবে; লোকদের ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিতে বলবে; সৈন্যদের আবেদন করবে ফিরিঙ্গীদের মাটিতে লুটিয়ে দিতে।

আমেরিকায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয় ১৯১২ সালে। উদ্দেশ্য—ভারতে গণতন্ত্র স্থাপন।

ব্যাঙ্ককে 'গদর' পত্রিকা আসত। বর্মায়ও নানা ভাষায় লেখা 'গদর' আসত—গুজরাটি, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি, মারাঠি ও মাঝে মাঝে ইংরেজীতে।

'জাহান-ই-ইস্লাম' (মোস্লেম জগৎ) ঃ তুর্কীতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হত। এর বক্ষে হিন্দী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় রচনা শোভা পেত। ১৯১৪ সালে মে মাসে এটির জন্ম। একজন পাঞ্জাবী মুসলমান রেঙ্গুনে কিছুদিন মাস্টারি এবং পরে কেরানীগিরি করে তুর্ক-ইটালী যুদ্ধের কালে মিশরে চলে যান। তাঁর নাম আবু সৈয়দ। তিনি 'জাহান-ই-ইস্লামে'র উর্দু বিভাগের সম্পাদক হন। কলকাতা, লাহোর, বর্মা প্রভৃতি স্থানে এই পত্রিকা আসত। ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধে লেখা থাকায় ১৯১৪ সালের অগস্টে ব্রিটিশ সরকার এটির আমদানি বন্ধ করে দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলে হরদয়ালের একটি প্রচণ্ড লেখা উর্দু সংখ্যায় বের হয়। ২০শে নভেম্বর, ১৯১৪ সালে আনোয়ার পাশার এক বক্তৃতা এই কাগজে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, 'সময় এসেছে, যখন ভারতে বিদ্রোহ সুরু হওয়া উচিত। ইংরেজদের অস্ত্রশস্ত্র লুট করে তাদের বধ করা উচিত। হিন্দু ও মোস্লেম তোমরা ভাই, বীর যোদ্ধা! এই হীন ইংরেজরা তোমাদের শত্রু। ইংরেজকে নিধন করে ভারত স্বাধীন করো!'

হরদয়াল সেপ্টেম্বরে কন্স্টান্টিনোপলে আগমনকালে আবু সৈয়দের অতিথি হয়েছিলেন।

১৯১৩ সালে নব্য তুর্কী দলের তেওফিক বে আবু সৈয়দের আমন্ত্রণে রেঙ্গুনে আসেন। রেঙ্গুনের আহমদ মোল্লা দাউদকে তিনি তুর্কীর বাণিজ্যদূত নিযুক্ত করে যান।

একদল বেলুচ সৈন্যকে বোম্বাই থেকে রেঙ্গুনে বদলি করা হয়। মুসলমানরা 'গদর' পত্রিকা বিলিয়ে তাদের ভিতর কাজ করে। ঐ সৈন্যদল বিদ্রোহ করতে রাজী হয়ে যায়। জানুয়ারি ১৯১৫ সালে তাদের অভ্যুত্থানের পূর্বে কর্তৃপক্ষ খবর পেয়ে যান এবং যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করেন।

সিঙ্গাপুরের এক গুজরাটী মুসলমান ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে রেঙ্গুনে তাঁর পুত্রকে পত্রে জানান যে, সিঙ্গাপুরের দুটি সৈন্যদলের মধ্যে একটি দল বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত। তাদের নাম ছিল 'মালয়া স্টেট গাইডার'। তাদের সরকার সন্দেহের বশে অন্যত্র চালান করে দেন।

কিন্তু সিঙ্গাপুরের অপর সেনাদলটি (ফিফ্থ ইনফ্যান্ট্রি) আমেরিকার গদর দলের হিন্দু ও মুসলমান কর্মীদের প্রভাবে এসে সত্যই বিদ্রোহ করে। ২১শে

ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান হয়। সাতদিন তারা সিঙ্গাপুরকে নিজেদের অধিকারে রাখে। ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ চলেছিল। দুজন বিদ্রোহী বর্মায় পালিয়ে আসেন। এই দলে শিখ ও মুসলমান ছিল। যাঁরা ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ পরে রেঙ্গুনে চলে আসেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন মুলচাঁদ ওরফে মুজতবা হোসেন। বর্মার সেনানিবাসে আন্দোলন চলতে লাগল। শ্যাম রাজ্যেও শিখ এবং অন্য ভারতবাসীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলেছিল।

১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধকালে দিল্লীর বিখ্যাত নেতা ডাঃ আনসারির অধীনে 'রেড ক্রিসেণ্ট' নামে একটি সেবাদল তুর্কী গিয়েছিল। তার মধ্যে দুজন আলি আহমদ ও ফাইম আলি বিশ্বযুদ্ধ বাধলে রেঙ্গুনে চলে আসেন। তাঁরা ১৫,০০০ টাকা চাঁদা তোলেন। একটি মুসলমান স্কুলের হেডমাস্টারকেও দলে টানেন। মাসিদি খান নামক একজন দুর্ধর্ষ আফগান গোপনে অস্ত্রাদি সরবরাহের ভার নেয়। এইভাবে একটি গুপ্ত-সমিতি গড়ে ওঠে। এই মাসিদি খানের সঙ্গেই ক্ষীরোদ-গোপালের অস্ত্রাদি যোগাড়ের ব্যাপারে যোগ ছিল।

এইরকম সময়ে দুজন গদর দলীয় লোক হাসান খান এবং সোহনলাল পাঠক ব্যাংকক থেকে শ্যাম-বর্মার সীমান্ত পার হয়ে রেঙ্গুনে আসে। তারা ডাফরিন স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া নেয়। এখানে দলের একটি কেন্দ্র খোলে। দুটি গুপ্ত-সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়।

বর্মার মিলিটারী পুলিসে পনেরো হাজার লোক ছিল। তারা শিখ ও পাঞ্জাবী মুসলমান। এদেরও বিদ্রোহ করাবার চেষ্টা চলে।

ব্রিটিশের গোয়েন্দা বিভাগ চুপ করে বসে ছিল না। তারা ডাফরিন স্ট্রীটের বাসার সব চিঠি খুলে পড়ত। এখান থেকে একখানি চিঠি পাঠানো হয় হরনাম সিংকে। তার ছদ্মনাম ছিল ঈশ্বর দাস। চিঠিতে মৌলমিনের মিলিটারী পুলিসের শিখ গুরুদ্বার থেকে একজন ঈশ্বর দাসের কাছে টাকা চেয়ে পাঠায়।

সোহনলাল পাঠক সানফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের লোক। মাইমোর সৈন্যদের উত্তেজনা-মূলক বাক্যালাপে মুগ্ধ করে। কিন্তু তাদের জমাদার সোহনলালকে ধরিয়ে দেয়। সোহনের কাছে তিনটি পিস্তল এবং বিস্তর কার্টিজ পাওয়া যায়।

তার কাছে কাগজপত্রও কিছু পাওয়া যায়—হরদয়ালের উচ্ছ্বাসভরা আবেদন, জাহান-ই-ইস্লাম, তুর্কীর খলিফার জেহাদ ঘোষণা, বিস্ফোরক প্রস্তুত প্রণালী। পাঁচ-দিন পরে নারায়ণ সিংকে মাইমোতে গ্রেপ্তার করা হয়। নারায়ণ সিং শ্যামদেশে রেলকর্মচারী ছিল। সীমান্ত পার হয়ে সে বর্মায় এসেছিল। সে সঙ্গী ছিল সোহনলালের।

সোহনলালের মৃত্যুদণ্ড হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে সৈন্যদের বোঝাচ্ছিল,

'কেন ভাই, ইংরেজের জন্য প্রাণ বিসর্জন করবে ? স্বদেশ যে তোমার পড়ে রইল বিধর্মীর অধীনে ! মাতৃভূমির জন্য প্রাণদান বীরের কর্তব্য।' তাকে যখন জমাদার ধরিয়ে দেয়, সে জমাদারকে হত্যা করার চেষ্টা করে নি। পালাতেও চাইল না। শুধু বলতে লাগল, 'ভাই হয়ে ভাইকে ধরিয়ে দেবে !'

জেলে সে 'সরকার সেলাম' প্রভৃতি নিয়ম মানত না। শুধু একটি কথা বলত, 'ইংরেজ শাসনকে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করি। কেমন করে তার জেলের নিয়ম মানব ?'

মৃত্যু-আজ্ঞার পর বর্মার লাট-জেলে তার সঙ্গে অনেকে দেখা করেন এবং ক্ষমা-ভিক্ষা করবার জন্য অনেকপ্রকার বোঝান। সে বলে, 'তুমি তোমার কাজ করো। আমিও আমার অন্তিম কর্তব্য করে যাই !'

বীরের মতো নিষ্কম্প পদে সে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে।

সোহনলাল ছাড়া বাসুদেব সিং, কৃপারাম সিং, চালান সিং-এরও ফাঁসি হয়। হরদিৎ সিং, কাপুর সিং, জগলু সিং, চৈৎরাম, বদন সিং প্রভৃতি বারোজনের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বর্মায় কয়েকজন মুসলমান ১৯১৫ সালে বকরী ইদের সময় বিদ্রোহ করতে মনস্থ করে—ইচ্ছা প্রকাশ করে ছাগলের বদলে ইংরেজ কোরবানি করার। কিন্তু তারা কাজ করার আগেই ধরা পড়ে যায়।

এবার বাংলায় ফিরি—কিছু পুনরুক্তিও প্রয়োজন।

১৯০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে তিন আইনে বাংলা থেকে অশ্বিনী দত্ত, সতীশ চ্যাটার্জী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিন দাস, ভূপেশ নাগ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ছাত্রনেতা শচীন বসু, রাজা সুবোধ মল্লিক ও কৃষ্ণকুমার মিত্র নির্বাসিত হন।

শ্যামবাবু স্বদেশী আন্দোলনে গোড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতায় বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হত। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে তিনি অরবিন্দের মামলার তদ্বির করছিলেন—পরে বন্দেমাতরম্-এর প্রধান সম্পাদকও হয়েছিলেন। ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্র এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র নামে দুটি বড়রকম বিপ্লবী দমনের মোকদ্দমা হয়। ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারি হাইকোর্টে সামসুল আলমকে হত্যা করে বীরেন দত্তগুপ্ত। বীরেনের সঙ্গে ছিলেন নাটোরের সতীশ সরকার। তিনি ঠাণ্ডা মেজাজে নেমে এসে অপেক্ষমাণ ঘোড়ার গাড়িতে চড়েন। কিন্তু বীরেন উত্তেজিত হয়ে গুলী ছুঁড়তে-ছুঁড়তে অন্যদিকে চলে যায় ও গ্রেপ্তার হয়। সতীশবাবু হাইকোর্ট থেকে

ফিরে এসে অবিনাশ চক্রবর্তী মশায়কে সংবাদটা দেন। তিনি সব শুনে সতীশবাবুকে সবকিছু শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে নির্দেশ দেন। শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ শোনালে তিনি বলেন, 'আমায় চন্দননগরে যেতে হবে।' এই কথা আমি সতীশবাবুর (বর্তমানে নির্বাণস্বামী) মুখ থেকে শুনে লিখছি। আবার জানা গেছে, ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার খবর দিলে তিনি ফেব্রুয়ারির কোনো সময় চন্দননগর চলে যান। আরও শোনা যায় ফেব্রুয়ারির শেষার্ধে তাঁর অনুগত সহযোগী রামচন্দ্র মজুমদার 'কর্মযোগিন্' অফিসে কোনো লেখার জন্য রাজদ্রোহ মামলা হবে এই খবর দেওয়ায় শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে চলে যান।

ওদিকে সন্দেহক্রমে বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর বীরেনের স্বীকারোক্তির ফলে তাঁকে ঐ হত্যা-মামলায় বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। আইনের গোলমালে বা ফাঁকে বিচার টেকে নি শেষ অবধি। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বেকসুর খালাস পান।

জাতীয় আন্দোলনে দারিদ্র্য-ব্রত নিয়ে এসেছিলেন—দুই অরবিন্দ এবং আরও কয়েকজন। শ্রীঅরবিন্দ একশো টাকায় কার্য স্বীকার করলেন। অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ হিন্দু স্কুলের মাস্টার ছিলেন। তিনি সরকারী চাকরি ছেড়ে কম বেতনে জাতীয়-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ আরম্ভ করলেন। পুণার ফারগুসেন কলেজের ব্রতী-শিক্ষকের অনুরূপ ত্যাগী শিক্ষক বাংলা এই প্রথম পেল। এঁদের ভাবাদর্শ বহুজনের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

ম্যাটসিনির কথা ঃ গুপ্ত ষড়যন্ত্র পরাধীন জাতির ধর্ম। বাংলায় একালের কর্মীরা ধর্মের মতোই তা গ্রহণ করল। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত-সমিতির নীড় রচনা করতে ব্যস্ত রইলেন। শ্রীঅরবিন্দ সময় বুঝে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় এলেন। লেখাগুলি বেরুতে লাগল যুগপ্রবর্তকের মতোই। এ সময়ে এঁকেই নবযুগের মন্ত্র-উদ্গাতা মনে হল। অল্পদিনে এঁর যশঃছটায় রাজনৈতিক গগন উদ্ভাসিত হল। চুম্বকের মতো ইনি মানুষের মনকে এঁর দিকে টানতে লাগলেন।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে নরমপন্থী ও চরমপন্থীতে বেশ এক জম্বর লড়াই হয়ে গেল। ফলে কংগ্রেস ভেঙে গেল। শ্রীঅরবিন্দ, তিলক, বিপিন পাল, লাজপৎ রায় চরমপন্থীদের নেতৃত্ব করেন। নরমপন্থীদের 'আবেদন-নিবেদন' ত্যাগ করতে বলা হয় এবং সরাসরি সক্রিয় কার্যসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বয়কট ও প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ) দিয়ে স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কার্যসূচীকে কার্যকরী করে নিতে হবে। নরমপন্থীরা ততটা এগুতে সাহস করলেন না। নরমপন্থীরা দেশের লোকের কাছে সম্ভ্রমহীন হয়ে

পড়লেন। তাঁদের হাতে কংগ্রেস থাকল বটে, কিন্তু হতশ্রী হয়ে রইল। জনমত চরমপন্থীদের সমর্থন করেছিল।

পরাধীন দেশের রাজনীতিতে, তেড়ে গিয়ে বিদেশী শক্তিকে ধাক্কা দিয়ে সংঘর্ষ জাগাবার কর্মসূচী থাকলে তার পেছনে আসে জনসাধারণ ও লোকপ্রিয়তা। অরবিন্দবাবু জনতার এই মনস্তত্ত্ব কাজে লাগাতে চান। Politics, to be popular, successful, must be aggressive—এই ছিল তাঁর ভাষা।

সকল দেশের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় দেখা যায় তিনটি কর্মধারা স্রোতের আকারে না বইলে কিছুই হয় না। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মন্ত্র-উদ্গীতি, সুনিপুণ রাষ্ট্রনায়কের সেই সুর বাজানোর একটি যন্ত্র খাড়া করা আর সেনানীর হাতে হাতে-কলমে এঁদের ভাব সাধার ভার। যেমন ইটালির ম্যাটসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডি। একজনের দ্বারাই এর একাধিক সুরের কাজ হতে পারে। মন্ত্রদাতা তো মরা হাড়ে প্রাণসঞ্চার করবেন! কিন্তু তোখড় একজন রাষ্ট্রনেতা হবেন এর এবং সেনানীর মধ্যে মধ্যমণি। তা ছাড়া বহিঃরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড চালাতে বোঝাবুঝি করতে তাঁকে দরকার। আয়ার্ল্যাণ্ডে উঠেছিলেন মাইকেল কলিন্স, ডি ভ্যালেরা এবং গ্রিফিথ। বর্তমানে রুশে হয়েছিলেন লেনিন, ট্রট্স্কি ও চিচেরিন। পরে স্ট্যালিন হয়েছেন একাধারেই তিন।

শ্রীঅরবিন্দ দেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনাকে পুরোভাগে রেখেছিলেন। মনে হতে লাগল শ্রীঅরবিন্দকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিলককে মনে হত পাকা রাষ্ট্রনেতা। বাকী কাজটা গেল যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁর বিভাগ সবে আরম্ভ হয়েছিল। তার শৈশব কাটিয়ে যৌবনে পৌঁছতে যথেষ্ট দেরি ছিল। এর মধ্যে বারীনবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠায় বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে ও কাজ হতে অবসর গ্রহণ করতে হয়। তিনি 'নিরালম্বস্বামী' নামে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

বোমার যুগ এসে পড়েছিল আগেই বলেছি। পাবলিক প্রসিকিউটার হিউমসাহেব থাকতেন বারাকপুরে। কয়েকবার রেলে তাঁর কামরায় বোমা ফেলার চেষ্টা হয়। গাড়ি ঘা খেয়েছিল, কিন্তু তাঁর কোনো বিপদ হয় নি। এই সময় কিরণদা (কিরণ মুখার্জী) খুব কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন।

যারা এইসব করত তাদের কাজে ব্যর্থতা বেশী, সাফল্য কম। দিন দিন লোকের চক্ষে এটা ধরা পড়তে লাগল। এদিকে জাতীয় অভিমানে যে আঘাত লেগেছে তার প্রতিকারকল্পে যুবজনের মন পাগল। অস্থিরতা, অধৈর্য, চাঞ্চল্য, 'একটা কিছু করা হোক' মনের এরকম একটা ছটফটানি কোনো কিছু ভালো করে গড়ে বা গুছিয়ে তোলার বিষম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কাজের গুরুত্ব উপলব্ধির শক্তি হরণ করছিল।

আমি স্বীকার করতাম চাঞ্চল্য জৈবধর্মে প্রাণের পরিচায়ক। কিন্তু শুধু

চাঞ্চল্যটাই সবটুকু নয়। তোড়জোড় করার জন্য সময় লাগবে। সেজন্য স্থির ও ধীর ভাবে খেটে যেতে হবে। সংগঠনের প্রাণ হচ্ছে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। এগুলি ফুটিয়ে তুলতে সময় লাগে। না-ফুটিয়ে কিছু করতে যাওয়া ধৃষ্টতার নামান্তর।

বিলাস, অফুরন্ত আরামে সময়ক্ষেপ, ধনলুব্ধতা অবশ্য নিন্দনীয় ও সর্বথা পরিহার্য। কিন্তু মনের মতন ও কাজের উপযুক্ত করে আয়োজন, উপচার সংগ্রহ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সময় না দিতে চাওয়া সুষ্ঠু বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। একদিকে হুড় হুড় যাত্রা, অপরদিকে 'সব ফাঁকি'—এ-দুটোর মাঝে যে পথ পাওয়া যায় সেদিকে বহু ভালো লোকই নজর দিতে পারছিলেন না। এই হচ্ছে এ-সময়কার দুঃখ। ফলে বিরুদ্ধপক্ষ সব সংগঠনটা ভাঙার সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে গেল। 'যুগান্তর' বড় দুঃখ করে লিখেছিল, 'না হইতে মাগো, বোধন তোমার—ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গলঘট!'

অল্প কয়েকটি বন্ধু একজোট হয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন করা কি? একত্র যাব বলে যারা বেরিয়েছিল, সঙ্গের সেই সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ সঙ্গ ছেড়ে দূরে চলে গেল। শুধু আমরা গেলাম না। আমাদের না-যাওয়াটা আমাদের উপর একটা অবাঞ্ছিত সতর্কতার কালো ছাপ চুপিসাড়ে লাগিয়ে দিয়ে গেল। এ অবস্থায় মনকে বাঁধা ভারী শক্ত। কম-শক্ত ধাতের লোক এ দশায় নিস্তেজ প্রতিপন্ন হয়ে যেত। যৌবন কি ভীরুতার ছাপ নিতে চায়?

আমরা অপেক্ষাকৃত স্থিরপ্রাজ্ঞ বন্ধুদের বোঝাতে লাগলাম যে তাদের কার্যসূচী পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা ভালো। কিন্তু এ পর্যন্ত সেটার দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যায় নি। ছাত্র, কৃষক, কারিগর, মজুর প্রভৃতির ভিতর রাজনৈতিক চেতনা বাড়িয়ে যেতে হবে। শিক্ষিতরা ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় রাজনৈতিক শক্তিটা হাতে নেবার জন্য। তাদের কর্মপ্রেরণার উৎস এখানে। কিন্তু বাকিরা গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় পায় সেই উৎসের সন্ধান। সুতরাং দুটোকে যে মিলিয়ে নিয়ে চলতে হবে তার আর ভুল নেই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব'লে বার্ন কোম্পানি ও ট্রাম কোম্পানির কর্মচারীরা ধর্মঘট করতে সাহস পেল এবং জয়যুক্ত হল। দেশের জাগ্রত চৈতন্যের সমর্থন ও সহানুভূতি তারা লাভ করেছিল। এর থেকে তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে সাহায্য করল। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে। রাষ্ট্র যদি হাতে এসে যায় তাহলে ওরাই হবে মালিক। ওদের দুর্দিন হবে দূর। যে দিক দিয়ে বিচার করা যায়, এ জিনিষটা ছাড়া চলে না। এরা সমর্থন না করলে সৈন্যরাও যদি সঙ্গে আসে তাহলেও জয় হবে না। স্থায়ী লাভ হবে না। ১৮৫৭-সাল সেই শিক্ষা দিচ্ছে।

তাছাড়া রণনীতি অনুসারে বিপক্ষের যুদ্ধের যোগান নষ্ট করে দেওয়া রেওয়াজ। শিবাজি তো ডাকাত ছিলেন না! তিনি এই নীতির অনুসরণ করতেন। এদেশে কাপড়ের ব্যবসায়ে ওদের পেট মোটা। সেটাকে নষ্ট করে দিলে ওরা কাহিল হতে বাধ্য। সাধারণ চাষী-মজুর যদি একবার প্রতিজ্ঞা করে বসে যে, দেশী কাপড় ছাড়া অন্য কোনো বস্ত্রে তাদের দেহ-আচ্ছাদন বা লজ্জানিবারণ করবে না, চকিতে বিদেশী-বর্জন সফল হয়ে যাবে। এরকম গোঁ ধরে চলা এদের ধাতস্থ এবং এরাই সংখ্যায় আমাদের জনগণের প্রায় সবটা। শিক্ষিতদের মতো এরা ইংরেজের চাকরি সর্বস্ব তো নয়? নিরস্ত্র দেশে এটাই একটা চমৎকার কাজের মতো কাজ। তারপর ওদের জমির মালিকানা যে ঠকিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে কথা ওদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে—তা ভুললে চলবে না।

আমেরিকায় যখন স্বাধীনতা সমর প্রজ্বলিত হয়—সেখানে গুরু-পুরোহিতরা ধর্মের দোহাই দিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাল বর্জন করিয়েছিল। এদেশেও গুরু-পুরোহিতদের দেশের কাজে লাগাতে হবে। তাছাড়া সাধারণভাবে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

শুনতে পাওয়া যায় প্রথম গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির মতো মানুষ। কিন্তু তাঁরা কাজ এগিয়ে নিতে পারেন নি।

ভারতের সাধারণ লোক থেকে বিচ্যুত হয়ে একটা সাময়িক হৈ-চৈ করা যেতে পারে, কিন্তু তা 'বিপ্লব' বলে পরিগণিত হতে পারে না। দেশের লোকের ভিতর কাজ করতে গেলে তাদের মনের সঙ্গে আগে পরিচিত হতে হবে। তাদের মাঝে ঘুরলে দুটো জিনিষ নিজেকে জাহির করে—তাদের বাসনা, তাদের প্রাণের বাণী। সেখানে কি দেখা যায়? খাওয়া-পরা বা রক্ত-মাংসের ডাক তারা অগ্রাহ্য করতে পারে না সত্য; কিন্তু শুধু সেইটের মূল্য চোকাতে তাদের জীবন, জন্ম বইয়ে দিতে তারা একদম রাজী নয়। তাদের অন্তরতম প্রদেশে সর্বদা আত্মিক সম্পদ অধিকতর মূল্যবান ও স্পৃহনীয়। যেটা খুবই শক্ত বলে সাধারণ জন আয়ত্ত করতে পারে না—তাকেই যারা আয়ত্ত করেছে এই দেশে, তারাই হয়ে রয়েছে এদের কাছে অটুট আদর্শ। এইটাতে জনসাধারণের বাসনা ধরা দেয়। তাছাড়া সর্বজনীন একটা বাণীও এদের আছে।

অতএব এদের সাড়া পেতে গেলে ভারতের শাশ্বত বাণী এদের ভিতর দিয়ে যা আজও বহমান, তা জগৎকে শুনিয়ে চলা কল্যাণপ্রদ হবে। সে তো এই কথা—ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস বলছে 'সকলকেই ভালবাস, কাউকে ঘৃণা কোরো না'। গ্রীক, শক, হুন, বাক্ত্ প্রভৃতি সবাই তো তার বুকে স্থান পেয়েছে!

আমার বন্ধুরা আজ এই বিচার ধরে থাকছে ব'লে 'ক্ষুদ্রশক্তি'। কিন্তু এতে খাঁটি সত্য আছে। সেজন্য একদিন এ শক্তি যথেষ্ট বেড়ে উঠবে। সেদিনের প্রতীক্ষায় নিজের কাছে নিজেকে ফাঁকি না দিয়ে খাঁটি মানুষের মতো খেটে নেওয়া যাক্। নিজ

নিজ কর্তব্য পালন করে গেলে একদিন দেশ এই বা এর অনুরূপ কর্মপদ্ধতি নেবেই। এখন কিছুটা অংশকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। কিছুটা অংশ খোলাখুলি যা কাজ করা যায় তাই নিয়ে থাকবে।

ছোট একটি সংঘ এই কার্যক্রম নিয়ে গড়ে উঠতে লাগল। আমরা আয়ার্ল্যাণ্ড ও রুশের ইতিহাস থেকে দেখলাম সংঘর্ষটা দু'ভাগে—গুপ্ত ও প্রকাশ্য ভাবে—কাজ করতে বাধ্য হয় কেন?

সুশাসন যখন দুঃশাসনে অধঃপতিত হয়, সেটা তখন ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজে ইন্ধন হয়ে প্রতিবাদী প্রজাশক্তিকে একেবারে খোলা পথে বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে দেয়, আবার তাকে দাবিয়ে গুপ্ত-কর্মীর সৃষ্টি করে। গুপ্ত-সমিতি দমিত হলেই ফের বেরোয় প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন। পুনরায় চণ্ড-নীতি একে দাবিয়ে জন্মাতে দেয় গুপ্ত প্রণালীকে। এইভাবে ঢেউয়ের মতো আন্দোলন উঠতে-উঠতে, নামতে-নামতে নাচার ছন্দে আপন গন্তব্য অভিমুখে এগিয়ে যায় যে পর্যন্ত না একটা অদমনীয় গতি সে লাভ করে। এর কোনো একটা ঢেউকে বিপ্লবী সংগঠন বললে ভুল করা হবে। একটা জিনিষের দুটো দিক ধরে পুরোপুরিটাকে বিপ্লবের রূপ বলা উচিত। এই বিচারে কংগ্রেসকে 'প্রকাশ্য পন্থী' মানা যেতে পারে, যদি এটা চরমপন্থীদের হাতে আসে। সরকারের দমন নীতিতে তাই আমাদের অবসাদগ্রস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। ইংরেজরাই বিপ্লবের যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে রাখার আদি কারণ হয়ে থাকবে। কারণ থাকলে কার্য হবেই।

কংগ্রেস চরমপন্থীদের হাতে আসার কথা আমি তুলেছিলাম এইজন্য যে, সুরাটের পর বিপিনবাবু, অরবিন্দবাবু মত প্রকাশ করেছিলেন যে—তাঁদের হয়তো একটা আলাদা কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

তাছাড়া, আমি বন্ধুদের সামনে ধরেছিলাম আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইংরেজ-জার্মানির ঈর্ষার চিত্র। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সেটা রাজনীতির মারফত একটা মহাযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। সেদিন হবে আমাদের শুভকার্যারম্ভ। তার জন্য আজ থেকে চতুরঙ্গ বিপ্লবের জন্য তৈরি হতে হবে।

এই ধরনের আলোচনা ১৯০৭ সাল থেকে অনেক বার আমরা নিজেদের মধ্যে করেছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৯০৮ সালে ছয়মাস কারাভোগের পর বক্সার জেল থেকে মুক্ত হয়ে বিপিনচন্দ্র ফিরলেন। তাঁকে সম্মান দেখাতে হাওড়া স্টেশনে ভিড়ে ভিড়। প্রভাস দেব ও নিখিল মৌলিক বিপ্লবী ইস্তাহার লোক মারফত বিলি করেন, Now or never—এখনই কার্য আরম্ভ কর, নইলে আর সময় মিলবে না। তাঁকে প্রকাশ্য জনসভায় সাদর সম্বর্ধনার জন্য ফেডারেশন মাঠে এক বৃহতী সভা আহূত হল—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার সভাপতি। বিপিনবাবুকে দেশ তার হৃদয়ের স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শনের প্রতীকস্বরূপ আট হাজার টাকার একটি তহবিল উপহার দিতে চাইল। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মতো বিপিনবাবু বললেন, 'আমি অর্ধ-গৃহী, অর্ধ-সন্ন্যাসী। কাল কি হবে সেজন্য আজ সঞ্চয় করি না। আমি দেশমাতার পায়ে নিজেকে অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য হয়েছি। আপনাদের স্নেহ-সহানুভূতি সর্বদা আমার সম্বল। আমার বিবেকে বাধছে বলে, এ অর্থ আমি গ্রহণ করতে পারব না। আমার এ প্রত্যাখ্যান বন্ধুমহলে মার্জনীয় হবে, সে আশা রাখি বলেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাদের দেওয়া এই প্রীতি-উপহার আপনাদের হাতে প্রত্যর্পণ করছি। তবে যদি এমন কোনো কাজ দেশের সামনে উপস্থিত হয় এবং আপনারা মনে করেন আপনাদের এই সেবক সেই কাজ করার উপযুক্ত, তখন তাহলে আপনাদের অনুজ্ঞামতো এই অর্থ আমার দ্বারা ব্যয়িত হবে।'

বিপিনবাবু হীরেন্দ্রনাথের হাতে টাকা ফিরিয়ে দিলেন। চারদিক থেকে সাধুরব উঠল।

বিপিনবাবু জেলে যা ভেবেছেন, বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন—চীন-কুম্ভকর্ণের নিদ্রা একদিন ভাঙবে। চীন-ভীতিতে ব্রিটিশ সরকার তিব্বতের উপর অন্যায় চড়াও করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তপ্রদেশ গড়তে মনঃস্থ করেছে। ওদিকে লোভী সাম্রাজ্যকামী পাশ্চাত্ত্য জাতিদের মধ্যেও ঠোকাঠুকি লেগে যাবে। রুশ-ভল্লুকের ভয়ে সেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জড়সড় হয়ে রয়েছে। জাপানও সুবিধা পেলে ছেড়ে কথা কইবে না। পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুই চাপের মধ্যে পড়ে ইংরেজকে বলতে হবে—'সম্বর! সম্বর!' সেদিন ভারতের মধ্যস্থতায় তার নিষ্কৃতির পথ পড়বে। সুতরাং এমন দিন সামনে আসছে যখন আন্তর্জাতিক যুদ্ধে ইউরোপ ও এশিয়া মেতে উঠবে। সে দুর্দিনে ভারতের কাছে ইংরেজকে আসতে হবে বাঁচার জন্য। এই পরিস্থিতির উদ্ভবে ভারতে মুক্ত হবে।

এর কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে 'ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা' নিয়ে আন্দোলন

করার জন্য বিপিনবাবু বিলাত চলে যান। সেই সময় ঐ আট হাজার টাকা তাঁকে দেওয়া হয়।

বিলাত যাবার কারণ : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্রিটিশ সদাগরগণ বিচলিত হয়। পার্লামেন্টের দিক দিয়ে বিলাতী সরকারকে চাপ দেওয়া হয়। ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বলেন, 'বঙ্গভঙ্গ একটি অনড় ঘটনা। একে বদলানো যাবে না। ভারতে ব্রিটিশ-নীতি হবে—নরমপন্থী বা উদারনৈতিক দলকে সরকারের পক্ষপুটের আবরণে আনা এবং চরমপন্থীদের দলিত করা।' ভারতে স্বায়ত্তশাসন (Self-Government) সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেন; বলেন, 'ঐ জিনিষটা ভারতের ধাতে সইবে না। ক্যানাডার দৃষ্টান্ত অনেকে দেয়। তারা জানে না, যা ক্যানাডার জন্য ভালো তা ভারতের পক্ষে সুবিধার হবে না। ক্যানাডায় ফার-কোট (লোমওলা পশমী জামা) প্রয়োজনীয়; ভারতে তার ব্যবহার চলে না।'

বঙ্গভঙ্গের নেতারা 'মর্লি মিঞা'র ('সন্ধ্যা'র ভাষায়) কথাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলে মানতে অস্বীকৃত হলেন। তাঁরা বললেন, 'জগতে নির্দিষ্ট ঘটনা বলে কিছু নেই। আজকের নির্দিষ্ট ঘটনা হয়ে যায় কালকের অনির্দিষ্ট ব্যাপার। বঙ্গভঙ্গ রদ করাবোই।'

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ্‌দের মনের দৌর্বল্য ব্রিটিশ শাসকরা ঘা মেরে মেরে ভাঙলেন। ১৯০৫ সালে বিলাতে লিবারেল পার্টি পার্লামেন্টের সদস্য-নির্বাচনে বহুদিন বাদে জয়ী হল। স্যার হেনরি ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান হলেন প্রধানমন্ত্রী, লর্ড মর্লি ভারত-সচিব। খবরের কাগজওলাদের ও নেতাদের আনন্দের আর সীমা নেই। হতভাগা কন্‌জারভেটিভরা গেছে, এবার বাঁচা গেল! একে তো লিবারেল পার্টি পেল ক্ষমতা, তার উপর তারা করল দার্শনিক মর্লিকে ভারত-সচিব—এবার সব দুঃখ দূরে যাবে। এই মর্লিই না প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে ছিলেন যখন তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য 'হোম রুল বিল' (আত্মকর্তৃত্ব) পার্লামেন্টে আনেন? ভদ্রলোকের উদার হৃদয় বিকল হয়ে যাবে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত না হলে। সেই মর্লি-সাহেবই আশাভঙ্গ করলেন। বঙ্গভঙ্গ এরাই ঘোষণা করল। তারপরের যুগের কর্তারা লেবার পার্টির উপর রাখলেন আশা-ভরসা। লেবার পার্টি ১৯২৪ সালে প্রথম ক্ষমতা হাতে পেয়েই অর্ডিনান্স করে বাংলার বহু লোককে কারারুদ্ধ করে। আমাদের নেতাদের এতদিনে বোধ হয় জ্ঞান হল—

'যাকে যত্ন করে রত্ন ভেবে রাখলেম এতদিন,
খুলতে হল—গিল্টি-করা, রাঙে-ভরা টিন!'

এই তিনটি পার্টিই ভারতের সম্বন্ধে এপিঠ আর ওপিঠ। পুঁটিমাছের কাছে যেমন খাদকদের উচ্চজাতি আর নিম্নজাতি ভেদের কোনো অর্থ থাকে না, তেমনি

ভারতের বেলায় সাম্রাজ্যবাদীদের পার্টির কোনো অর্থ হয় ? দারার ফরাসী ডাক্তার Bernier, আওরঙ্গজেবের ইটালীয় ডাক্তার Manucci, ফরাসী পরিব্রাজক Tavernier বলেন, 'আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলা জনসমাকীর্ণ, সমৃদ্ধ ও ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল। বাংলাদেশ ব্যবসায় ও কৃষিকার্যে মিশরের চেয়ে অনেক বড় ছিল।' কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে এখানে হয়েছে কি ? খালি দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লীলা-নিকেতন ! কেন এমনতর হল ? এখানের দারিদ্র্য মানে হল 'ইংলণ্ডের অভ্যুদয়'। ওখানকার মজুররা 'রাজার হালে' আছে, এখানকার মজুররা উপোস করছে বলে। ওদের দেশের একজন নামী লোক, লর্ড লিটন (বাংলার লাট) বলেছিলেন—বিলাতের প্রতি ছয়জন লোকের মধ্যে একজনের ভরণপোষণ নির্ভর করে ভারতের আমদানির ওপর। লর্ড ক্লাইভ বলেছেন—বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ লণ্ডনের মতো ধনসম্পদে ও জনসংখ্যায় ; কিন্তু লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীরা এখানকার ধনীদের কাছে ছোট। সে জায়গায় এখন পাওয়া যায় দুর্ভিক্ষ, মড়ক, দারিদ্র্য ও লোকক্ষয়।

পার্টি হিসেবে বরং কন্‌জারভেটিভদের ভালো বলতে হবে। তাদের আমরা বুঝতে পারি। তারা খোলাখুলিভাবে আমাদের উচ্চাশার বিরোধী। তারা সোজাসুজি প্রাণের কথা বলে, 'ভারত আমাদের কামধেনু, আমাদের অপোগণ্ড সন্তানদের চারণভূমি। একে আমরা আমাদের পুষ্টির আগার হিসাবে দেখব ও রাখব ; কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেব না।' বেশ কথা। এ আমরা বুঝি। বুঝি না লিবারেলদের ব্রজবুলি। তারা এদেশে অস্ত্র-আইন তো রোধ করে নি—এত বড় দেশকে নিবীর্য করে ছেড়েছে। শ্রমিকদল লোভ দেখাচ্ছে যে, তারা তো এখন হাতে ক্ষমতা পায় নি—ক্ষমতা পেলেই ভারতের সব দুঃখ দূর করে দেবে। এ বকধর্মের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওদেশে কলকারখানা হওয়াতে দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল সেখানে তৈরি হচ্ছে। সেগুলো খাপাবে কোথায় ? ভারতের মতো বাজারে। সে বাজারটি যেন হাতছাড়া না হয়। প্রয়োজন একচেটিয়া প্রভুত্বের। তাই এ রাজ্যপাট। তবেই দাঁড়াচ্ছে এই—ওদেশে কলকারখানায় মাল তৈরির ব্যবস্থার প্রয়োজনে এল বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া বাজারের প্রয়োজনের জন্য চাই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা। কাঁচা মাল এদেশ থেকে সস্তায় কিনে তাকেই পাকা মালে পরিণত করে ছ'শত গুণ বেশী দামে এদেশে বেচে লাভ করবে। এই করে পয়সা না নিয়ে গেলে, বিলাতের পঁচাত্তর লাখ লোক না খেয়ে মারা যাবে। সুতরাং ওদেশের মজুর বা প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে একজোট। এই কথাই ঠিক জানাতে হবে। আমাদের মুক্তির জন্য ওদের দিকে তাকালে কোনোদিনই মুক্তি আসবে না। স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই একমাত্র প্রয়োজন।

বাংলার তথা ভারতের উজ্জ্বল ভাগ্যাকাশে কত সাধনে অনুকূল মেঘশোভা হতে

না-হতে প্রতিকূল পবন তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ভাগ্যলক্ষ্মী তখনও প্রসন্ন হন নি। চারিদিকে মুক্তিকামী কর্মীরা নির্যাতিত ও আবদ্ধ হতে লাগল। তিলক বিচলিত হলেন। কেন লোকে বোমা মারে? এর অন্তর্নিহিত সত্য কি এবং তার কার্যকারণ সম্বন্ধ-বিচার বুঝিয়ে সবিস্তারে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় তিনি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১২ই মে লেখেন, 'দেশের দুর্ভাগ্য', এবং ৯ই জুন লেখেন, 'এসব ব্যবস্থায় বেশীদিন লোককে শান্ত রাখা যাবে না।' এগুলি উপলক্ষ করে তাঁকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে ১৯০৯ সালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৩ই জুলাই বোম্বাই হাইকোর্টে তাঁর ওপর মামলা চলে। তিনি নিজপক্ষ সমর্থন নিজেই করেন। মোকদ্দমার শেষে তাঁকে এমন একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে—দুঃখ প্রকাশ করলে মামলার ফল তাঁর পক্ষে ভালো হতে পারে। তিনি তো দুর্বলতা দিয়ে গড়া পুতুল ছিলেন না। তিনি বললেন, 'There are higher powers that rule the destinies of men and nations, and I think, it may be the will of the Providence that, the cause I represent, may be benefitted more by my suffering than by my pen and tongue.—যে মহাশক্তি মানুষ ও জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরই ইচ্ছায় কারাভোগ ও দুঃখবরণ দ্বারা আমি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা অপেক্ষা দেশকে অধিক ভালোভাবে সেবা করতে পারব।'

তাঁকে ছয় বছরের জন্য দেশান্তরের দণ্ড দেওয়া হয়। তিনি বর্মায় ম্যাণ্ডালে জেলে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'গীতা-রহস্য' লেখেন।

কথায় আছে দুর্দিনের ভিতর দিয়ে সুদিনের পথ পড়ে। আমাদের ভাগ্যে সেটা একরকম করে ঘটে গেল। শ্রীরামপুরবাসী আমাদের সমিতির কয়েকটি সভ্যের সঙ্গে ১৯০৭-০৮ সালে আমার খুব বন্ধুত্ব জমে উঠল। সতীশ সেন তখন কলকাতায় বি. এ. পড়ছিলেন। আশুতোষ দাস এলেন। এঁদের মারফৎ জিতেন লাহিড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমাদের দল আরো দানা বাঁধল। সতীশ সেনের অনুরোধ ও উৎসাহে অনুশীলন সমিতিতে আমি 'ম্যাটসিনি' ক্লাস প্রতি রবিবারে গ্রহণ করা সুরু করি। তখন আমাদের চলছিল আভ্যন্তরিক সংঘর্ষ। দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলছিল—স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। তার সঙ্গে বোমা-পিস্তলও। কিন্তু আমরা এ বাতাসে বন্দর ছাড়ছিলাম না। ভবিষ্যতে নিজেদের কর্মপদ্ধতির জন্য যোগ্যতা অর্জন আমাদের তখনকার কাম্য। আমরা এই সময়কার বীর কর্মীদের খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম। তাঁদের বিচারে তাঁরা পুরোদস্তুর ঠিক, তা মনে-মনে মেনে নিতাম। কিন্তু আমরা নিজেদের বিচার ও সিদ্ধান্তে থাকতাম অটল। অনেকে ছাত্র-ভাণ্ডারে যাতায়াত রেখেছিলেন। সতীশ সেন অরবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা ও সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা করতেন। 'যুগান্তর' কাগজে মাঝে মাঝে লেখাও দিতেন।

আমরা বাকিরা থাকতাম চুপচাপ। সতীশ সেন সেই থেকে রইলেন আমাদের বহির্বিভাগের কর্ণধার। আমরা রইলাম অন্তর্বিভাগ নিয়ে। 'যুগান্তর' পত্রিকা এই সময় চালাতেন নিখিল রায়, কার্তিক দত্ত, কিরণ মুখার্জী।

ম্যাটসিনি-ক্লাসে ক্রমিক সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অদম্য উৎসাহ দেখা দিল। সে কি উদ্দীপনা! 'Mine shall be the hand that will first raise the standard of revolt'…বার বার প্রাণ-উন্মাদনাকারী ভাষায় উচ্চারিত, উদ্‌গীত হতে লাগল, 'এই হাত—এই হাত প্রথমে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলিত করবে!' মনের দৃঢ় সংকল্প হাতের বজ্রমুষ্টির ভিতর দিয়ে ভাষা পেল, 'রক্তের অক্ষরে আমাদের ইতিহাস লেখা হবে। সর্বস্ব পণ করে নিষ্কলঙ্ক পবিত্র এদেশের প্রাঙ্গণ আমরা মুক্ত ও রক্ষা করব! লোকহিত ও জগৎহিত হবে স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য।'

আমাদের আপন-গড়া কাজ অবিচলিতভাবে চলতে লাগল। তিনটি মেস্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুরের বন্ধুদের নিয়ে যে মেলামেশা সেই সম্পর্কে মেস্ তিনটির কথা বলছি। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে সরকার ইস্তাহার দিয়ে 'সমিতি' বেআইনী করে দিলেও আমরা নানা ছলে সংহতি বজায় রেখে এসেছি। ভবানী দত্ত লেনে একটি মেসে আশু দাস মেডিকেল ছাত্র হিসাবে থাকে। সেখানে আমরা মিলতাম। এখানে আশুর পরিচালনায় আর একটা 'ম্যাটসিনি'-ক্লাস আরম্ভ হল। বর্তমান পি. এস. পি. নেতা ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ওখানে আসতেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতান্তর শীঘ্রই হল। তিনি শুধু বিবেকানন্দকেই অনুসরণ করার পক্ষপাতী। 'অরবিন্দর যুগ' যে এসে গেছে সেটা তিনি মানতে চাইতেন না। তারপরে মেস্ যায় আরপুলি লেনে। সর্বশেষে মির্জাপুর স্ট্রীটে। পরের কথা পরে হবে।

১৯০৮-১৯০৯ সাল আলিপুর বোমার আসামী গ্রেপ্তার ও তাদের বিচারের কাল। অরবিন্দবাবুর পক্ষ সমর্থনের জন্য চাঁদা তোলা হয়। এ বিষয়ে আশু দাস আমাদের অগ্রণী হয়। আসামী পক্ষে প্রথমে সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী নিযুক্ত হন। পরে সি. আর. দাশ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য স্বীকার করেন। অন্যান্য ব্যারিস্টার যাঁরা আসামী পক্ষ সমর্থন করছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পি. মিত্র। মামলার গোড়ায় নর্টন আসামীদের 'Notorious' বলে অভিহিত করলে মিত্তিরসাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করেন—'এই বিশেষণ প্রত্যাহার করুন।' তাঁর অসামান্য তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার ফলে নর্টন ঐ শব্দ প্রত্যাহার করেন।

সরকারী কৌঁসুলি নর্টনকে কে বা কারা বেনামী চিঠিতে ভীতিপ্রদর্শন করে। সে সময়ে 'দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ান হাইল্যান্ডার' সৈন্য কলকাতায় ছিল। তাদের তরফ হয়ে কে একজন 'ইংলিশম্যানে' লেখে যে, নর্টনের গায়ে যদি আঁচড় লাগে তবে বাছ-

বিচার না করে 'বাঙালীদের রুধিরে বহাবো নদী'। নর্টন আদালতে ভীতিপ্রদর্শনের চিঠি ও সৈন্যদের চিঠি পড়ে বলেন যে, তিনি সৈন্যদের একটা ভোজ দেবেন।

মোকদ্দমা চলতে চলতে একটা গভীর পরিতাপের ঘটনা ঘটে। আসামীদের মধ্যে কম বয়সের কয়েকজন ছিল। সবচেয়ে ছোট ছিল মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল। শচীন, পূর্ণ সেন এরাও ছোট ছিল। পূর্ণের পিতা যোগেন্দ্রনাথ সেন তমলুকের উকিল ছিলেন। দিনের পর দিন তাঁর জেরা চলছিল। এ অবস্থায় একদিন তিনি হঠাৎ হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। পত্রিকাগুলিতে নর্টনকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয় এই দুর্ঘটনার জন্য। সে সময় রাজভীতি কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার একটা আন্দাজ মিলবে যদি আসামীদের কোনো কোনো ব্যারিস্টারের সশঙ্কচিত্ততা লক্ষ্য করা যায়। আসামীদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়জন ব্যক্তি স্বীকারোক্তি করেছিলেন। বারীনবাবু নিজেও করেছিলেন এবং অন্যদেরও প্ররোচিত করেছিলেন। ঐ ঝাঁকের হেমচন্দ্র কানুনগোই বারীনবাবুর কথা সত্ত্বেও স্বীকারোক্তি করেন নি। অবশ্য অরবিন্দ কোনো কথা বলেন নি।

বারীনবাবুর ব্যারিস্টার আর. সি. ব্যানার্জী কোর্টে প্রথমে নিজের রাজভক্তি নিবেদন করে তবে বারীনবাবুকে 'রক্ষা' করার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ বারীনবাবুর নির্দোষিতা প্রমাণ করতে অগ্রসর হন। বারীনবাবুর স্বীকারোক্তিতে 'নারাণগড় মামলা'য় দণ্ডপ্রাপ্ত নির্দোষ কুলীরা খালাস পায়। নানারূপ কাগজপত্র ধরা পড়ার ফলে শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই গ্রেপ্তার হয়। সে রাজসাক্ষী হয়ে সব কথা বলে দেয়। মামলা চলার সময় জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন বসু গুলী করে মেরে ফেলেন। সে দিনটা ছিল ৩১শে অগস্ট, ১৯০৮ সাল।

'বন্দেমাতরম্' এই উপলক্ষে লেখে, 'Beware of the fate of the traitor.—বিশ্বাসঘাতকের অদৃষ্ট দেখে সতর্কতা অবলম্বন করো।' এইবার কাগজ বন্ধ হয়ে গেল—সরকার আর চলতে দিল না। কানাই দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হল। কানাইকে আপীলের জন্য সাতদিন সময় দেওয়া হল বলায় সে উত্তর দিল, 'There shall be no appeal.—আপীল হবে না।'

সত্যেন যে কতবড় আধার ছিলেন তা হেম দাসের 'বিপ্লব-প্রচেষ্টা' পড়ে জানা যায়। বিশ্বাসঘাতককে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেবার সকল ব্যবস্থাই তিনি করেন। পরে কানাইলাল জানতে পেরে অমন অনন্যসাধারণ বীরের কাজে অংশ নিতে প্রার্থনা করেন। সেদিন ছিল আগে নিজের প্রাণ কে দেবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। ভীরুতা, দুর্বলচিত্ততার দিন অপগত করে এসেছিল যত অপূর্ব ধরনের বীরবৃন্দ। কানাই-এর প্রার্থনা কানাই-এর সতীর্থ সত্যেন বোস পূর্ণ করলেন। এদের ষড়যন্ত্র শুধু হেমচন্দ্র

ও উপেন্দ্রনাথই জানতেন। জেলে অস্ত্রসংগ্রহ উপেন্দ্রনাথ চন্দননগর গোঁদলপাড়ার দলের সাহায্যে করেন। বসন্ত ব্যানার্জী এবং শ্রীশ ঘোষ রিভলভার দুটি দিয়ে আসেন। কিন্তু এখন জানা যায় একাধিক দিক থেকে অস্ত্র জেলে যায়। অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি গোঁদলপাড়ায় ফেরৎ আসে। প্রথম প্রথম যখন মামলা চলে তখন জেলে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না।

কাজ সুচারুরূপে হয়ে গেল জেলের হাসপাতালে। কাজ করলে তার ফল আছে। যে ফলে সম্পন্ন হল দেশ, তা রইল লোকলোচনের অন্তরালে। বিদেশী নিষ্ঠুর, লোভী শাসকের হুকুমে উভয়ের ফাঁসির হুকুম হয়। আইনের নিয়মে জেলা-আদালত হুকুম দিলেই সে হুকুম তখনই তামিল হয় না। হাইকোর্টে আপীলের জন্য একটা সময় দেওয়া হয়। হাইকোর্ট যদি ফাঁসির হুকুম বহাল রাখে তবে ফাঁসি হয়। জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব নথিপত্র সরকারী দপ্তর থেকে পেলে একটা দিন স্থির হয়। সেই অনুসারে ফাঁসি হয়।

এই অবকাশকালে সত্যেন বোস শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চান। উদ্দেশ্য—তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, সেইজন্য অন্তিম যাত্রার পূর্বে একটু আশীর্বাদ চাইছিলেন। সত্যেনের প্রাণে শান্তি আনার প্রয়োজন হয়েছিল।

শাস্ত্রীমশায় সরকারের কাছ থেকে হুকুম পেয়ে জেলখানায় যান। সত্যেনকে ভগবদ্‌নিষ্ঠ থেকে শান্ত মনে বিরাটের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে আসেন। তিনি আরও বলেন যে, বাপ ও জ্যাঠাকে স্মরণ করো—তাঁরা ধর্মপ্রাণ ছিলেন। পৃথিবীর ভাবনা মন থেকে অপসারিত করো।

তিনি ফিরে এলে কিছু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সত্যেন-কানাই-এর পুজারীতে দেশ তখন ভরে উঠেছিল। তাদের সমাচার জানতে সবাই পাগল।

শাস্ত্রীমশায়ের মুখ থেকে পূর্বোল্লিখিত বিবরণ শুনে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি সত্যেনকে আশীর্বাদ করে এলেন, কানাইকে করলেন না যে ?'

শাস্ত্রীমশায় উত্তরে যা বললেন, তা শুনলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তিনি বললেন, 'কানাইকে দেখলাম, সে পায়চারি করছে—যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ। বহুযুগ তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।'

আমার বন্ধু আশু দাস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন, 'কানাই শিখিয়ে গেল হে! Shall আর Will-এর ব্যবহার করতে কেউ আর ভুল করবে না।'

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ সাল। চারু বসু নামক এক যুবক দিন-দুপুরে আলিপুর কোর্টে গিয়ে সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলী করে। আশুবাবু মারা যান এবং চারু ধরা পড়ে। ধৃত হয়ে তাকে সেসনে সোপর্দ করলে সে বলে,

'No Sessions' trial, but hang me tomorrow. It was all preordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged.—সেসন-বিচারে কাজ নেই, আমায় কালই ফাঁসিতে লট্‌কে দেওয়া হোক।' ধরা পড়ার পর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে এ কাজ করেছিল কেন, সে উত্তর দেয়, 'এসব ভবিতব্যতা। আশুবাবু আমার হাতে গুলীর আঘাতে প্রাণ দেবেন এবং আমি ফাঁসি যাব।' চারুর ফাঁসি হয়ে গেল। এরা কি সাধারণ মানুষ? এদের উল্লেখ করে যথার্থ বলা যায় 'কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা'। শোনা যায় এঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বাঘা যতীন। ১৯০৮ সালে প্রধান প্রধান বিপ্লবী নায়করা ধরা পড়ে গেলে যতীন্দ্রনাথ তাঁর বিপ্লবী গুরু যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তখন সন্ন্যাসী) সঙ্গে ১৯০৯ সালের গোড়ায় দেখা করা প্রয়োজন মনে করেন। তাঁর অনুচর বৃন্দাবনের ঠিকানা এনে দিলে যতীন্দ্রনাথ বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করে আসেন।

দীর্ঘকাল বিচারের পর দায়রা-জজ ১৯০৯ সালের ৬ই মে রায় দেন। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পান; বারীনবাবু ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড; উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, বিভূতি সরকার, বীরেন সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ, নিরাপদ রায়—দশবছর দ্বীপান্তর; অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণহরি কানে, শিশির সেন—সাতবৎসর দ্বীপান্তর; কৃষ্ণজীবন সান্যাল—একবছর কারাবাস। উনচল্লিশজন দণ্ডিত হন। সতেরোজন মুক্তিলাভ করেন। রায় শুনে হৃষিকেশ বলেন, 'এটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র!'

হাইকোর্টে আপীলে বারীনবাবু ও উল্লাসকরের ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। হেমবাবু ও উপেনবাবুর পূর্বের আদেশ বহাল থাকে। বাকী যাদের 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর' হয়েছিল তাদের কমে গিয়ে 'দশবছর' হল। অপরদের মেয়াদ কমে যায়। বালকৃষ্ণহরি কানে মুক্তি পান। দুই জজে মতান্তর হওয়ায় নিম্নলিখিতদের তৃতীয় জজ বিচার করেন। তাঁর রায়ে ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুশীল সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল মুক্তি পান। শৈলেন বসু ও বীরেন সেনের পূর্বাদেশ বজায় থাকে।

বলা বাহুল্য, পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে ধরা পড়েছিলেন—অধ্যাপক চারু রায় (চন্দননগরের রাষ্ট্রগুরু), যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন বসু (মেদিনীপুরে অস্ত্র-আইনে ইতিপূর্বে এঁর দু'মাস সাজা হয়েছিল), বিজয় ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিল রায়মৌলিক, দেবব্রত বসু, হরিদাস দত্ত, প্রভাসচন্দ্র দেব এবং বালকৃষ্ণহরি কানে।

অরবিন্দবাবু যখন মুক্ত হন তখন তিলক বর্মার জেলে, বিপিনবাবু বিলাতে আর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীবাবু আটক-আইনে আবদ্ধ। অরবিন্দবাবু আবার আঁধার ঘরে আলো জ্বালায় ব্যাপৃত হলেন—উত্তরপাড়া, বিডন-উদ্যানে, কুমারটুলি ও বরিশালের ঝালকাটিতে বক্তৃতা করলেন।

তিনি 'ধর্ম' (বাংলা) ও 'কর্মযোগিন্' (ইংরেজী) পত্রিকায় লিখে ধর্ম, জাতীয়তা প্রভৃতি ভালোভাবে বোঝাতে লাগলেন। ১৯০৯ সালের ২রা জুলাই 'কর্মযোগিন্'-এ লেখেন 'The doctrine of sacrifice—আত্মবলির তত্ত্ব'। পরের সপ্তাহে 'An open letter to my countrymen—আমার দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি'। ২৫শে ডিসেম্বর লেখেন 'To my countrymen—আমার দেশবাসীর প্রতি'। এই প্রবন্ধটিতে তাঁর নিজের নাম-সই ছিল। এই প্রবন্ধ লেখার ফলে তাঁর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দিল। তিনিও দেশ ছাড়তে সংকল্প করেন। মোট কথা তিনি চণ্ডনীতিকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—'No control, no cooperation—শাসনযন্ত্রে আমাদের অধিকার না দিলে আমরা সহযোগ করব না। জনগণ যদি নিপীড়িত হয়, নেতারা নির্বাসিত হন, পুলিস ও গোয়েন্দার অত্যাচার চলতে থাকে—তবে ট্রান্সভালে গান্ধীজি প্রভৃতি ভারতীয়গণ যা করেছেন, আমাদেরও তাই করতে হবে।' অরবিন্দ ঐ সময়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা passive resistance-এর কথা বলতে আরম্ভ করেছেন।

অরবিন্দবাবু 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার'।

বিভূতিবাবু লুঙ্গি-পরা অবস্থায় ধরা পড়েন। ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি মুসলমান?' বিভূতিবাবু উত্তর দেন, 'আজ্ঞে না। আমি হিন্দু মিতব্যয়ী—I am a Hindu economist.'

কৃষ্ণজীবন, পূর্ণ, শচীন প্রভৃতি অব্যাহতি পান। পরে দেবব্রত বসু, প্রভাস দেব, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভবভূষণ মিত্র প্রভৃতির একটা উপরন্তু মামলাও হয়েছিল। উপেনবাবু ডাফ কলেজে পড়তেন, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী। উপেনবাবুও চন্দননগরের লোক। হৃষিকেশবাবুও পড়তেন ডাফ কলেজে।

এই মামলায় শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র রায়কে চন্দননগর থেকে ধরে আনা হয়। তিনি কানাইলালের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের কল্যাণে চারুবাবু ফরাসী প্রজা বলে রেহাই পান শেষ পর্যন্ত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলালের বি. এ. ডিগ্রি কেড়ে নেয়। এইদিন হীরেন দত্ত মশায়ের কথা ফিরে মনে হল, 'ডিগ্রির সার্টিফিকেট একটা চোতা কাগজ মাত্র। ডিগ্রি-হারা হয়ে কানাই-এর মান বাড়ল বরং।'

'মহারাজা' নামক দায়মলবাহী জাহাজে চড়িয়ে এঁদের আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই উপলক্ষে একটি সঙ্গীত রচনা হয়েছিল, 'দেখরে সকলে, নীলসিন্ধুজলে ভেসে যায় মায়ের পূজার ফুল !'

যারা আর ফিরবে না এমন ভয় হয়েছিল, তাদের উদ্দেশে গাওয়া হল—'মাতৃভূমির সন্তানবীর, আবার আসিও ফিরে !'

'মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য় কোনো আসামী মেদিনীপুরে জজ-আদালতে জামিন না-পাওয়ায় হাইকোর্টে দরখাস্ত আসে। তখন হাইকোর্ট পূজার জন্য বন্ধ। ছুটির জজ সারদাচরণ মিত্র ও চিটিসাহেব বিচার করতে বসেন। সারদাবাবু অনেককেই জামিন দেবার পক্ষে, চিটিসাহেব নন। সারদাবাবু 'লেটার পেটেন্ট' অনুযায়ী সিনিয়র—পদমর্যাদায় বড় বলে তাঁর রায় বহাল রাখলেন। চারদিকে 'ধন্য ধন্য' পড়ে গেল।

দায়রা মামলায় অ্যাপ্রুভার লালমোহন সাহা আপন স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। সরকার তরফে ছিলেন ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ—পরে লর্ড সিন্‌হা। তিনি তিনজন আসামী ছাড়া বাকী সকলের মোকদ্দমা প্রত্যাহার করেন। রয়ে গেল শুধু যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষকুমার দাস ও সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, ফটোয় হত্যার চিত্র পাঠিয়েছিল এবং বেনামী চিঠি দিয়েছিল ভয় দেখিয়ে।

ইতিমধ্যে সিন্‌হাসাহেব বড়লাটের পরিষদের সর্বপ্রথম ভারতীয় আইন-সভ্য হয়ে চলে যান। গ্রেগরিসাহেব ('সন্ধ্যা'র ভাষায় 'গড়গড়ি') বাংলার অ্যাডভোকেট-জেনারেল পদে আসেন, সিন্‌হার পরে। তিনি মেদিনীপুরে মামলা করতে যান। আসামীদের দশবছর করে দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড হয়।

আপীলের সময় কলকাতা হাইকোর্টে নতুন চীফ-জাস্টিস লরেন্স জেংকিন্স ও আশুতোষ মুখার্জী বিচারে বসেন। চীফ-এর জেরার উত্তর দিতে না পারায় শেষ পর্যন্ত গ্রেগরিসাহেব কোর্টে ফিরে আসেন না। তিন আসামীই খালাস পায়।

চোদ্দমাস নির্বাসনে থাকার পর পুলিন দাস, অশ্বিনীবাবু, শ্যামবাবু প্রভৃতি নয়জনই খালাস পান। পুলিনবাবু ফিরে আসায় 'সমিতি' আবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমরা মিত্তিরসাহেবের বাড়িতে একদিন রাত্রিকালে মিলিত হয়েছিলাম। 'সমিতি' এ সময় গোপনে বেঁচে ছিল। কারা 'বেআইনী' করছে এটা সরকারকে বুঝিয়ে দিতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। কারা বেআইনী ? সমিতির সভ্যরা, না, বিদেশী শাসন ? নানা ছলে বাঁচা দরকার। তাই 'সমিতি'র কিছু লোক সমবায় প্রথায় চাষ-

আবাদ নিয়ে গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য জনগণের সংস্পর্শের জীবন যাপনের দিকে গেলেন। 'Bengal Young Men's Cooperative Credit and Zemindery Society' স্থাপন করা হল। 'সমবায় প্রথা' দেখে যদি গ্রামগুলি নিজেদের মধ্যে ঐ ধারা আনে তাহলে তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর হতে পারে। ডেনমার্ক এই প্রথায় খুব উন্নতি করেছিল। এই কাজে জজসাহেব সারদাচরণ খুব সহায়তা করেন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন-এর সাহায্যে সুন্দরবনে 'গোসাবা'য় জমি পাওয়া যায়। আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি শুনে হ্যামিলটনসাহেব একটু অপ্রসন্ন হলেন; বললেন, 'I don't understand the medical men'. তিনি চাইছিলেন যে, আমিও যেন চাষ-আবাদে মেতে যাই।

বাকী যারা রইল তারা কলকাতায় নৈশ-বিদ্যালয়, সোদপুর জনশিক্ষায়তন (শশীদার), গ্রামে গ্রামে দল বেঁধে গিয়ে প্রচার, দেশহিতৈষণাবর্ধক পড়াশুনা নিয়ে রইল। অনেকগুলি পাঠাগার গড়ে তোলা হল, কোথাও কোথাও ব্যায়ামাগার। কোথাও বা কপাটি-পার্টি, কোথাও বা ঘোড়দৌড় শিক্ষার ক্লাস, কোথাও নৌকা-চালনা। উত্তর কলকাতায় একটা সেবা-সমিতি গড়ে তোলা গেল।

এই সময় 'অনুশীলন'-এর সভ্যদের ভারী দুর্দিন। চেনাশোনা লোকও তাদের রাস্তায় দেখলে মুখ ফিরিয়ে অপর দিকে সরে যেত। অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ বরদা মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গানবাজনা ও থিয়েটারের ক্লাব হয়। দু'একজন সভ্য প্রস্তাব আনলেন এর আড়ালে আত্মগোপন করার। আমাদের মত হল না। থিয়েটারে পরের চরিত্র অভিনয় করা হয়। তার চেয়ে তেমন জীবন যাপন করা ভালো, যার থেকে অভিনয়ের উপাদান লোকে খুঁজে বার করবে। কলকাতার প্রথম হিন্দু দপ্তরী আমাদের নৈশবিদ্যালয় থেকে বেরোয়।

ইতিমধ্যে ১৯১০ সালে ঢাকায় ধরপাকড়ের তোলপাড় লেগে গেল। পুলিনবাবুরা গ্রেপ্তার হলেন। কলকাতায় মিত্রসাহেবের বাড়ি পুলিস ঘিরে রাখতে লাগল। এমন সময় সন্ন্যাস রোগে মিত্রসাহেব মারা যান। 'সমিতি'র সভ্যরা মিছিল করে মৃতদেহ কেওড়াতলায় নিয়ে গিয়ে সৎকার করলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হল এইভাবে।

'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা' সুরু হল। সি. আর. দাশ ঢাকায় গেলেন আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য। ওখানে সুবিধা হল না। পুলিনবাবু, আশু দাস, ভূপেশ নাগ, শান্তি মুখাজী প্রভৃতির দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ড হল।

আপীল এল কলকাতা হাইকোর্টে। সি. আর. দাশ এসময় ডুমরাও মামলায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি হাইকোর্টে মামলা চালাতে রাজী হচ্ছিলেন না। সতীশ সেন আমাদের ও অন্যান্য বন্ধুদের চাঁদা তুলতে বললেন। চাঁদা তোলা হতে লাগল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির সহকর্মী মদনজিৎ সে সময় কলকাতায় ছিলেন। তাঁর

সঙ্গে পরামর্শ করা হল মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি করা যায়। তিনি দাশসাহেবের কাছে যেতে রাজী হলেন। এদিকে বিপিনবাবুকে গিয়ে ধরা হল যাতে তিনিও দাশসাহেবকে অনুরোধ করেন। দাশসাহেবের ওপর বিপিনবাবুর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দাশসাহেব বিপিনবাবুর রাজনৈতিক শিষ্য, এ কথা অনেকে বলতেন। আরও অনেকের চেষ্টায় বন্দোবস্ত হল দাশসাহেব মোকদ্দমা হাইকোর্টে আরম্ভ করিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। তাঁর আরম্ভকারী বক্তৃতা অতি সুন্দর ও কাজের হয়েছিল। এ পর্যন্ত গীতা ও চণ্ডী রাজদ্রোহিতার পরিপোষক হিসাবে দণ্ডার্হ পুস্তক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী ব্যারিস্টার 'অনুশীলন সমিতি'র সভ্য হওয়ার নিয়মাদি আদালতকে শোনাতে গিয়ে আদ্য-প্রতিজ্ঞা, মধ্য-প্রতিজ্ঞা, অন্ত-প্রতিজ্ঞা পড়ে দেন। তারপর 'পরিদর্শক' বা সমিতির ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট পড়ে শোনান। এরই মধ্যে তিনি খানাতল্লাশিতে কোথায় কোথায় গীতা চণ্ডী পাওয়া গিয়েছিল জানান। জজ আশুতোষ মুখার্জী প্রশ্ন করেন, 'এ বইগুলির বিশেষ উল্লেখ করবার কারণ কি?' সরকারী কৌঁসুলী বলেন, 'গীতা রাজদ্রোহের উৎসাহ দেয়।' আশুবাবু স্তম্ভিত হয়ে যান; বলেন, 'এ পল্লবগ্রাহী মত কোথা হতে এল? গীতা অতি উচ্চদরের দর্শনগ্রন্থ। হিন্দুদের বাড়িতে প্রত্যহ পাঠ হয়ে থাকে।' চণ্ডী খুনখারাপিকে উৎসাহ দেয়, কৌঁসুলীর এই মন্তব্যে আশুবাবু বলেন, 'উদ্ভট কথা। আমার বাড়িতে প্রায়ই চণ্ডীপাঠ হয়।' তখন কৌঁসুলী পাশ কাটাতে পথ পান না। এ দুইখানি বই রাখতে লোকের এত ভয় হয়েছিল যে, সে ভয় পিস্তল-বোমা রাখার চেয়ে কম ছিল না। এই বই দুটি মেঘমুক্ত হল। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ে কয়েকজন খালাস পেলেন। কয়েকজনের সাজা কমে গেল। পুলিনবাবুর সাতবছরের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

একে একে নিবিল দেউটি। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি আর কানে শোনা যায় না। সভা-সমিতি বন্ধ হয়ে গেছে। কারারুদ্ধ—মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন। তাঁর অভাবে ভয়-ভাঙানো গান, মায়ের নামে উচ্চধ্বনি ও মিছিলের দিন ফুরিয়েছে। জীবনের সাড়া যে বহুলভাবে পরিলক্ষিত হত, তা দীপ-নির্বাণের মতো কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছে। নগর যেন শ্মশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অরবিন্দবাবু কারামুক্তির পর প্রথম বক্তৃতা দেন উত্তরপাড়ায়। রাজা প্যারিমোহনের পুত্র মিশ্রীবাবু (রাজেন্দ্রনারায়ণ) স্বদেশীতে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে গিয়েছিলেন; কাছেই ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। উত্তরপাড়ার সভায় অরবিন্দবাবু বললেন—

তিনি বিলাতে থাকাকালীন যৌবনে প্রত্যাদিষ্ট হন ভারতে এসে মুক্তির বাণী প্রচার করতে। তাই তিনি এদেশে আসেন। সেদিন তাঁর অন্তরে একটি বাণী ছিল—যা তিনি দেশবাসীকে শোনাতে চান। তাঁর মোকদ্দমায় তিনি বিচলিত হন নি। কেননা তিনি দেখেছিলেন আদালতগৃহে সব বাসুদেবময়। অভিযোগকারী সরকারী ব্যারিস্টার 'বাসুদেব'। এজলাসে বসে আছেন 'বাসুদেব'। কাঠগড়ায়ও সব 'বাসুদেব'। আসামী পক্ষের উকিল-কৌঁসুলীরাও 'বাসুদেব'। বাসুদেব এসেছিলেন তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে। সেজন্য তিনি মক্কেল হিসেবে নিজ ব্যারিস্টারকে যেসব নির্দেশ দিতে হয়, সি. আর. দাশকে তা দেন নি। বাসুদেব তাঁকে বার করে এনেছেন তাঁর কাজ করাবার জন্য।

দেশের মুক্তির কথাও ভগবানের প্রত্যাদেশে প্রচার হচ্ছে। যারা সে সভায় ছিল, বক্তৃতায় তারা তো বিমোহিত হলই—যারা সংবাদপত্র মারফত এই বিবরণ জানল তারাও নিজেদের ভাগ্যবান বোধ করতে লাগল। জনগণমনে তড়িৎসঞ্চারণের প্রভাব যে অনুভূত হয়েছিল, তা না বললেও বোঝা যায়। কর্মযোগিন্‌-এর এক সংখ্যায় তিনি 'My Political Will—আমার রাজনৈতিক উইল' প্রকাশিত করলেন।

সরকার শ্রীঅরবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেণ্ট নিয়ে ধরতে এলে তাঁকে পাওয়া যায় না। প্রিণ্টার মনোমোহন ঘোষের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অনুচররা খোঁজ করলে বড়রা বলতেন, তিনি তপস্যা করতে গেছেন। শক্তি লাভ করে আবার স্বাধীনতা-সংগ্রামে আসবেন। আমি স্বকর্ণে একথা শুনেছি। বহু পরে জানা যায় তিনি চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরি চলে গেছেন। এ বিষয়ে চন্দননগরের মতিবাবু ও উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে অরবিন্দবাবু বাংলা সরকারকে এড়িয়ে চলে যেতে পেরেছিলেন। তিনি ছদ্মনামে 'ডুপ্লে' নামক ফরাসী জাহাজে পণ্ডিচেরি যান। তাঁর পণ্ডিচেরি যাত্রায় মস্ত সাহায্য তিনি পান সুকুমার মিত্রের কাছ থেকে। ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র এবং অরবিন্দের মাসতুত ভাই।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সালে হাইকোর্টে বীরেন দত্তগুপ্ত পুলিসের ডেপুটি-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সামসুল আলমকে গুলী করে।

চীফ-জাস্টিস দায়রায় তার বিচার করেন। তার ফাঁসির হুকুম হয়।

সামসুলকে কেন হত্যা করা হয়?

পশ্চিমবাংলায় কতকগুলি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়, এদের মধ্যে ১৯০৭ সালে সরকারের টাকা লুটের জন্য ডায়মণ্ডহারবার লাইনের চাংড়িপোতা রেল স্টেশনে হানা দেওয়া হয়। এইটি প্রথম সাফল্যমণ্ডিত ডাকাতি।

১৯০৯ সালে ডায়মণ্ডহারবারের কাছে নেত্রাতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ডাকাতি হয়। টাকা নিয়ে যাবার সময় তারা বলে যায়, 'এই টাকা ইংরেজ তাড়ানোর জন্য নেওয়া হচ্ছে।' এই দুই ডাকাতিতেই নরেন ভট্টাচার্য ছিল।

১৯০৮-০৯ সালে সামসুল আলমের হাতে 'আলিপুর বোমার মামলা'র তদন্তের ভার ছিল। নেত্রা ডাকাতির তদন্তও তিনি করেন।

১৯০৮ সালে ৯ই নভেম্বর নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যা করা হয়। এই ব্যক্তি প্রফুল্ল চাকীকে ধরার চেষ্টা করেছিল। এখন জানা যায় যে আসলে নন্দলালকে হত্যা করেন রণেন গাঙ্গুলী ও শ্রীশ পাল। ২৩.২.৫৭-তে বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী রণেনবাবু ও শ্রীশ পাল সম্পর্কে একথা কাগজে লেখেন। পরে রণেন গাঙ্গুলী নিজে সংবাদপত্রে এ কথা প্রকাশ করেছেন।

১৯০৭-০৮ সালে ও তারপরে 'অনুশীলন সমিতি', বারীনবাবুর দল ও যতীন মুখাজীর অনুচরেরা কলকাতা, তার আশেপাশে ও হুগলি, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় এবং পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক ডাকাতি করেন।

পরে 'শিবপুর ডাকাতি'র ফলে কৃষ্ণনগরের উকিল এবং যতীন মুখাজীর মামা ললিত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর মুহুরী নিবারণ মজুমদার গ্রেপ্তার হন। আবার 'নেত্রা ডাকাতি' সম্পর্কে ললিতবাবুর বাড়ি তল্লাশি হয়।

২৯শে অক্টোবর, ১৯০৯ সালে নদীয়া জেলার হলুদবাড়িতে ডাকাতি হয়। এটির ফলে একজনের আটবছর এবং পাঁচজনের সাতবছর করে জেল হয়। ঐ মামলায় ধৃত শৈলেন চাটুজ্যে যাতে স্বীকারোক্তি না করে সেজন্য হরেন বসু জেল-সিপাহির হাতে এক গোপন পত্র দেন। এই চিঠি ধরা পড়ে। হরেনবাবুর জেল হয়। কিন্তু চিঠিখানি সামসুল আলমের হাতে আসে।

১৯০৬ সালে 'অনুশীলন' দল ঢাকা শেখরনগরে ডাকাতি করে।

১৯০৭ সালে হাটগেছ্যায় (মেদিনীপুর) ক্ষুদিরাম সরকারী ডাক লুট করে।

১৯০৭ সালে 'অনুশীলন' চাংড়িপোতা স্টেশন (২৪ পরগনা) লুট করে।

১৯০৮ সালে 'অনুশীলন' শিবপুর (হাওড়া) ডাকাতি করে।

১৯০৮, ২রা জুন 'অনুশীলন' ঢাকার বাহ্রা গ্রামে ডাকাতি করে। ঐ সালে ফরিদপুর নাড়িয়া গ্রামে ডাকাতি হয়। 'অনুশীলনে'র কাজ।

১৯০৮ অগস্টে বাজিতপুরে (ময়মনসিংহ) বিপ্লবীরা ডাকাতি করে।

১৯০৮ সেপ্টেম্বরে হুগলি জেলার বিঘাটি গ্রামে ডাকাতি হয়। এই মামলায় কার্তিক দত্ত ধরা পড়েন এবং সাজা পান। এই দুই জায়গায় কর্মীরা পুলিসের পোশাকে যায়। ২৯শে নভেম্বর নদীয়ার রায়তা গ্রামে ডাকাতি হয়। এর পর হুগলির মরীহাল গ্রামে ডাকাতি হয়।

১৯০৯ সালের ৫ই নভেম্বর ললিত চক্রবর্তী দার্জিলিং-এ গ্রেপ্তার হয়। তাকে ডায়মণ্ডহারবারে আনা হয়। সে রাজসাক্ষী হয়। যে বত্রিশজনের নাম সে করে তার মধ্যে বিশিষ্ট লোক ছিলেন—যতীন মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য, ননী সেনগুপ্ত, কেশব দে, তারানাথ রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথের মামা ললিতবাবু, তাঁর মুহুরী নিবারণ মজুমদার, নরেন বসু, হেম সেন, সতীশ সরকার, বিজয় চক্রবর্তী, শ্রীশ সরকার, চারু ঘোষ। সে বলে চারু ঘোষের কাছ থেকে রিভলভার এনে সে নাকি নরেন বসু এবং হেম সেনকে দেয়; তদ্দ্বারাই নাকি নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হয়।*

সামসুল আলম সঙ্গোপনে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' গোছাতে বা সাজাতে সুরু করেন।

এরূপ অবস্থায় ২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সালে বিপ্লবীরা তাঁকে ধরাধাম হতে সরিয়ে দেন।

পূর্ণচন্দ্র মৌলিক যাজপুরের (উড়িষ্যা) সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি কলকাতায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আসেন। ঐ বাড়িতে সুরেশ মজুমদার ('আনন্দবাজার পত্রিকা'র মালিক) থাকতেন। তিনি পূর্ণবাবুর রিভলভারটি সরিয়ে আনেন। ঐ রিভলভার সঙ্গে নিয়ে বীরেন দত্তগুপ্ত হাইকোর্টে যায়। ঐ সময় 'আলিপুর বোমার মামলা'র আপীল হাইকোর্টে চলছিল। সামসুল সেজন্য প্রত্যহ হাইকোর্টে আসতেন।

নাটোরের সতীশচন্দ্র সরকার বীরেনের সঙ্গে হাইকোর্টে যান। তিনি সামসুলকে চিনিয়ে দেন।

২৪শে জানুয়ারি সামসুল আলম যেমন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন বীরেন দত্তগুপ্ত তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। সামসুল আলম নিহত হন। বীরেন দৌড়ে নেমে আসে। কয়েকজন চাপরাসী 'খুন! খুন!' চিৎকার করতে করতে তার পশ্চাদ্ধাবন করে। অস্ত্রধারী এক কনেস্টবল সামনে থেকে ছুটে আসে। বীরেন তার দিকে গুলী ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এমন সময় হাইকোর্টের চাপরাসী দুজন তাকে পেছন থেকে ধরে ফেলে।

এর ফলে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'র জন্য যারা সন্দেহভাজন হয়েছিল পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করে।

বীরেনের মোকদ্দমা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে ওঠে। বীরেন ধরা পড়ে জিজ্ঞাসিত হলে, বলেছিল, 'কোনো কথা বলব না। যা ইচ্ছা করতে পারো।'

* পরে জানা যায় নন্দলালকে তারা মারে নি; তাই ললিত চক্রবর্তীর কথা কতটা বানানো, কে বলবে?

আদালতে সে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। কোনো কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্যে সে উচ্চহাস্য করে। যে পিওনটি রিভলভার কেড়ে নিয়েছিল সে সাক্ষ্য দিতে এসে বীরেনকে দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। বীরেন হাসে। মোকদ্দমা হাইকোর্টে দায়রায় যায়। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেংকিন্স বিচার করেন। বীরেনের পক্ষে কোনো উকিল-ব্যারিস্টার ছিল না। প্রধান বিচারপতি ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে বীরেনের পক্ষ সমর্থন করতে অনুরোধ করেন। বীরেন নিশীথ সেনকে কোনো কথা বলতে রাজী নয়। মিঃ সেন জজকে বলেন যে, আসামী বোধ হয় পাগল। সে আত্মপক্ষ সমর্থনে রাজী নয়। যাই হোক, বিচারে বীরেনের ফাঁসির আদেশ হল। বীরেন অবিচলিতভাবে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের কেউ একজন ছল করে তাকে একটা ঝুটা বিপ্লবী-সংবাদপত্র দেখায়। এটি শোনা কথা। তাতে বীরেনের সম্বন্ধে নিন্দাভরা লেখা ছিল। বীরেন সামলাতে পারল না। বলে ফেলল, 'যত লোকেই তাকে নিন্দা করুক, একজনের সমর্থনে তার বুক বড় হয়ে আছে!' সে ব্যক্তি কে? এর উত্তরে সে নাম করে যতীন মুখার্জীর।

এবার সে পুলিসের খপ্পরে পড়ে গেল ফলে সব কথা বলে দিল, লাটের কাছে প্রাণ-ভিক্ষার দরখাস্ত করল, মার্জনা হল না। যতীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে হাওড়া জেলে ছিলেন। তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে আনা হল। তাঁর বিরুদ্ধে তখন যোগ-সাজসের চার্জ আনা হল। বীরেন তাকে সনাক্ত করল। পরের দিন বীরেনের ফাঁসির জন্য ধার্য ছিল। যতীন্দ্রনাথের ব্যারিস্টার সেদিন সাক্ষীকে জেরা করতে পারবেন না বলেন। পরের দিন বীরেনের ফাঁসি হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে জানতে পারে যে, সে একটা মহা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে ভরাডুবি করেছিল। ফাঁসি যাবার সময় আবার সে বীরের মতো ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে। খালি এই তার সান্ত্বনা ছিল যে, পৃথিবীর সকলের কাছে ঘৃণিত ও নিন্দিত হলেও যতীন্দ্রনাথের স্নেহহারা সে হয় নি।

হত্যা-অপরাধে পরে যতীন্দ্রনাথের মামলা এলে জেরা-না-করা বীরেনের সাক্ষ্য আইনতঃ অগ্রাহ্য হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ ফাঁসি থেকে বেঁচে গেলেন। বীরেনের আশা ও বিশ্বাস অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ তার অপরাধ গ্রহণ করেন নি। পরে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'ও টিকল না। যতীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে মুক্ত হন।

এই 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'য় নরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাংলার বহু জেলার বহু লোক আসামী ছিলেন। শুধু হলুদবাড়ির ডাকাতির ছয়জন ছাড়া আর সকলে খালাস পান। এই মোকদ্দমায় দুজন রাজসাক্ষী হয়—ললিত চক্রবর্তী ও যতীন হাজরা।

যতীন্দ্রনাথের নামে আর একটি অভিযোগ ছিল—দশম-সংখ্যক জাঠ সৈন্যের সঙ্গে যোগস্থাপন তিনি করছিলেন। ফলে ঐ সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে নরেন চ্যাটার্জীই এই যোগাযোগের কাজ করেছিল।

এখন থেকে 'নিখিল বঙ্গ অনুশীলন সমিতি' ও তার সংশ্লিষ্ট দলের এক পর্ব শেষ হল। এবার উদ্ভব হল পূর্ববঙ্গে চারিটি দল। নরেন সেনের অধীনে 'ঢাকা অনুশীলন', স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অধীনে বরিশালের দল, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের দল এবং পূর্ণ দাসের অধীনে মাদারীপুর দল। এ ছাড়া বগুড়ায় ছিল যতীন রায়ের দল।

যতীন্দ্রনাথের সরকারী চাকরি যায়। তিনি হুইলারসাহেবের স্টেনোগ্রাফার ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। সংসারযাত্রার জন্য এরপর তিনি যশোরের ঝিনাইদহে ঠিকাদারি (কন্ট্রাক্টারের) কাজ করতেন। এই বছর ডিসেম্বরে দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

চুঁচুড়ার ননীগোপাল মুখার্জী (১৯১১) গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ডেনহ্যামসাহেবকে লক্ষ্য করে ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা ভুলক্রমে এক ইঞ্জিনিয়ারসাহেবের গাড়িতে পড়ে। কেহ হতাহত হয় নি, কারণ বোমাটি ফাটে নি। এই কারণে প্রফেসর জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষও গ্রেপ্তার হন। তিনি পরে খালাস পান। কিন্তু ননীগোপালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ঐ ইঞ্জিনিয়ারের নাম ছিল কাউলি।

এই ঘটনা ঘটে ২রা মার্চ ১৯১১ সালে, বিকাল ৫টায়।

ইতিপূর্বে ২৯শে ফেব্রুয়ারি গোয়েন্দা বিভাগের হেড কনেস্টবল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী (ওরফে বুলবুল) 'কলকাতা অনুশীলনে'র লোক দ্বারা রিভলভারের গুলীতে নিহত হয়।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব এইরূপে শেষ হল।

নরেন ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে 'নেত্রা ডাকাতি' সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে একটা জমা-খরচ খতিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। খরচ—অর্থাৎ স্বাধীনতা-যজ্ঞে বিঘ্ন ক'রে বিদেশী সরকার যথেষ্ট ক্ষতি করে। সে ক্ষতি যে হবে, সে তো ধরা কথা। কিন্তু লাভের অঙ্ক ক্ষতির পরিমাণকে ছাপিয়ে অনেক উচ্চে উঠে যায়।

কথাটা বোধহয় হেঁয়ালির মতো শোনায়, কিন্তু হেঁয়ালি নয়। কথায় বলে —'যে বিয়ের যে মন্ত্র'। আমি জিনিষটা বরাবর যা বুঝে এসেছি এবং বুঝিয়ে এসেছি তা এইরকম। ইংরেজ রাজশক্তি যে গায়ের জোরে আমাদের চেয়ে প্রবল, অ

তো জানা কথা। এই দিয়ে ওরা যে জিতবে তা স্বীকার্য। কিন্তু নৈতিক লাভে আমরা এগিয়ে যাব। এইভাবে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হবে, পশুবলে ওরা জিতবে। কিন্তু প্রতিবারেই নৈতিক বলে আমরা জিতব। আর এরূপ সংঘর্ষের ফলে ওরা কিছু 'সংস্কার' দেবে। তা নেবার লোক দেশে দুষ্প্রাপ্য হবে না। কিন্তু আমরা ওতে ভুলব না। শেষ সংঘর্ষে আমাদের নৈতিক জয় অসাধারণ হবে এবং নৈতিক ভূমি থেকে কায়িক ভূমিতেও আমরা ক্ষমতাবান হয়ে যাব। ওদের শেষ সংস্কার হবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মতো একটা কিছু। এখানেও আমাদের মোহগ্রস্ত হলে চলবে না। এইটাকে করায়ত্ত করে একবারে স্বাধীনতার ধাপে আমাদের সমাসীন হওয়া সহজ হবে। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারদের এই তো পথ।

এই গেল একদিককার কথা। বিপ্লবের দার্শনিক দিক। প্রলয়ের সঙ্গেই সৃষ্টির ব্যবস্থাও হতে থাকে। এইবার সেই দিকে লক্ষ্য দেওয়া যাক্।

সতীশ সেনের গুণের তুলনা হয় না। ভাঙা হাটে কি করে কি করব, সেই দিকে তাঁর গঠনশক্তি বা উপাদান-আহরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি প্রভাসচন্দ্র দে, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হরিশ্চন্দ্র সিকদারের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেন। এঁদেরই সংস্রবে এসে অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়ে যায়। আমাদের এই পরিচয় কাজের দিক থেকে একটা পরম লাভ। এঁরা ছিলেন 'আত্মোন্নতি সমিতি'র লোক।

এদিকে 'অনুশীলন সমিতি' প্রকাশ্যভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সভ্যদের অনেকের মনে প্রচণ্ড একটা ক্ষোভ জাগে। নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), জ্ঞান মিত্র, সুধীর রায়চৌধুরী এই অবস্থাটা মেনে নিতে চাইছিলেন না। তাঁরা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) কাছে যাতায়াত বাড়ালেন এবং সরকারকে তখনই একটা প্রচণ্ড জবাব দেবার পক্ষপাতী হন। যতীন্দ্রনাথও দেশের অবসাদ ও দুর্দশাকে চুপচাপ মেনে বসে-থাকার বিরোধী ছিলেন।

এবার আমার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথাটা একটু সংক্ষেপে বলি। আমার বাবা আঠারো বছর বয়সে গোরা ঠেঙিয়েছিলেন। আমার ছোটকাকা গৌরবাবু বাঘের সঙ্গে লড়েছিলেন। এইজন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম। মনে মনে একটা গৌরবও ছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদে গৌরবের স্থলে জন্ম নিল বিষাদ। মনে হল আগের যুগে বীর জন্মাত, আমার যুগে কই জন্মায়? এমন সময় ১৯০৬ সালে খবরের কাগজে বের হল একজন যুবক একপ্রকার খালি হাতেই একটা ছোরার সাহায্যে একটা বাঘ মেরেছে। গৌরবে বুক দশহাত হল। কারণ আমি বীরের যুগের লোক হয়ে গেছি। পরে তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁকে সপ্রশংস নয়নে অনেকদিন দেখতাম। নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি যে আমার 'গুরুবীর'—

এই মমত্ববোধ তাঁর প্রতি আমার জন্মে গেল। তাঁর চিন্তা, ভাবাদর্শ, কর্মপদ্ধতি জানবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেই সময় সরকার সুবিধা করে দিল। ইচ্ছা করে আমি সরাসরি তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম না। তাঁর মতামত শুনতাম বন্ধুদের বিশেষ করে নরেন ভট্টাচার্যের মুখে।

এর পরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা হয় ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে—'গার্ডেনরিচ মোটর ডাকাতি'র পর। এ বিষয়ে বিশদভাবে আমি পরে উল্লেখ করছি।

দ্বিতীয় খণ্ড

উন্মেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিজের জীবনে নিজের স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফলবতী দেখতে পাওয়া পরম ভাগ্যের কথা। জীবনটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়—কিছুটা ভালবাসা, কিছুটা পায়ে থ্যাঁতলানো, কিছু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, তারপর চিরবিদায়। এইরকমে পালা সাঙ্গটাকে কিছু বদলানো যায় না? এইখানে ঢুকল কল্পনা, খোঁয়ারি, স্বপ্ন। এই যে এতকালের অনুত্তরিত 'কেন, কিসে, কেমন ক'রে'-র স্রোত বহে চলেছে, এতেই স্থান হয়েছে দার্শনিকের ও কবির। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন নিয়ে রইলেন দার্শনিক। কিন্তু এখানকার সুখ-দুঃখের হাটে হৃদয়রসে রঞ্জিত অনুরাগ-বিরাগ নিয়ে কারবার হল কবির। দার্শনিক উচ্চাধিকারী কয়েকজনকে আনন্দ দেন। কবি সব অধিকারীকে যজমান করেছেন। কবিচিত্ত ইন্দ্রিয়গম্য বোধকে সরস, সতেজ, সুন্দর ও আনন্দময় করে। সুখে তো সুখ হয়ই, দুঃখেও দুঃখের তীব্রতা হ্রাস হয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে দরদ দিয়ে বোঝা—পরের দিকটা। কিন্তু রসভোগের মাঝে রূপান্তরিত হয়ে-যাওয়া এবং রূপান্তরিত ক'রে-ফেলার খেয়াল পেয়ে বসে তাদের, যারা দার্শনিকতা ও কবিচিত্তকে নিজের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে ফেলেছে। তারাই বিপ্লবী। তারা হয়তো তাদের কালে শান্তিতে থাকতে পায় না। কিন্তু যখন যেখানে, যেভাবে থাকুক-না কেন—মনের পরম সুখে বসবাস করে। তাদেরই না স্মরণ করে কালকের কথা মনে ভেবে গাওয়া হয়েছে—'দুঃখ-দৈন্য বক্ষে ধরিয়া কেঁদেছিলে শুধু পরের লাগিয়া!' তাদেব কথা অহরহ ভেবেই তো ছ'টা ঋতুই দেশমাতার চোখের কাছে বর্ষাকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'নিশিদিন বরষত নয়ন হামারে'। চিরবিদায়ে চিরজীবিত্ব, চিরায়ুআনন্ত্ব তারা কি অর্জন করে যায় নি? গেছে বৈকি। ঐ তো চিরজীবী হওয়ার পথ। শুধু চিরজীবী নয়, চিরযুবার মতো চিরজীবী! বারেকের পরিচয়েই বার বার তাদেরই মনে পড়ে। হে নবীন প্রেমোম্মাদ, তোমার গৌরবগাথা নীরব হবার নয়! 'কালের বিষাণ গাহিবে সে গান, জাগাবে আবার ধীরে'!

তাদের মধ্যের একজন বলে গিয়েছিলেন—

'ভারত স্বাধীন-ব্রতে ভুলিব না দীক্ষা দিতে ;
বনের বিহগে ডাকি—যদি না মানুষ পাই!'

(শোনা যায় হেমচন্দ্র কানুনগো নাকি এই পদ্যের রচয়িতা।)

১৯১১ সালে সুরেন্দ্রনাথের দেবতা পূজা নিলেন। বিলাতের সরকার 'বঙ্গভঙ্গ রদ' ঘোষণা করলেন। যদিও এই 'রদ' নতুন কায়দায় বাংলাকে ছিঁড়ে বিহার ও আসামে কয়েকটুকরা করে উপহার দিলে—যাতে বাংলায় লোকসংখ্যা কম থাকে অর্থাৎ ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব যাতে ছোট গণ্ডীতে আটকে থাকে। সপ্তম এডওআর্ড মহাশয়নে শুলে তাঁর পুত্র পঞ্চম জর্জ নামে ইংলণ্ডের অধীশ্বর হলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বিলাতের মন্ত্রিমন্ডলী এই ঘোষণা করাল। সুরেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ভারতে বিলাতী মসনদের ভিত্তি শিথিল করে দিতে পেরেছিলেন এবং 'মর্লি-মিঞা'র নির্দিষ্ট ঘটনাকে অনির্দিষ্টের ভিড় ঠেলে অচেনার পঙক্তিতে হারিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে তাঁকে ভাগ্যবান বলতে হবে। এতবড় একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব করে সফলকাম হতে পারা খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটে। ইতিপূর্বে ১৯০৯ সালে ইংরেজরা একটা সংস্কার প্রবর্তন করে। তার নাম 'মর্লি-মিণ্টো সংস্কার' বা মাকাল ফল।

কিন্তু বিদেশী কূটনীতিবিদ্‌দের পাশায় জিতের দান এটা হল না। তারা ভেবেছিল কার্জন-নীতিকে দুর্জনের মতো সমর্থন করে যে ছিদ্র দেওয়া হয়েছিল তাতে ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে অনর্থ বেড়েই চলবে। এবার গতি স্থির করে মতিটাকে পালটে দেওয়া যাক। ১৯০৫-০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করলে যে ফল তাদের লাভ হত, ১৯১১-তে সে ফল আশা করা দুরাকাঙ্ক্ষা। বঙ্গভঙ্গের দাবিতে যা আরম্ভ হয়েছিল তা এখন 'স্বরাজ' না হলে থামতে চায় না। যারা বঙ্গভঙ্গ রদ হলে থেমে যেতে রাজী, দেশের অগ্রগতির সাধকদের কাছে তারা হল পুরানো খাতার ছেঁড়া পাতা। 'স্বরাজ' কথা দিয়ে পররাজ যারা চালাতে চায়, তারাই দেশের পর হয়ে যেতে বাধ্য। এহেন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বন্ধ হল, কিন্তু বিলাতী বস্ত্র-বর্জন বন্ধ হল না। যে যুদ্ধ অস্ত্রের না-হয়ে বস্ত্রের হয়েছিল, সে অজানা সাজে সাজতে চলল।

যাই হোক, বঙ্গভঙ্গ একরকম রদ হওয়ায় দেশব্যাপী একটানা একটা আনন্দস্রোত বয়ে গেল। প্রথম সংঘর্ষে, ভারতে ও ইংলণ্ডে ১৮৫৭-র পর এটা একটা বিশেষ জয় বলে গণ্যর জিনিষ। দেশের লোকের আত্মপ্রত্যয় বাড়ল। এইটাই সবচেয়ে বড় লাভ।

বঙ্গভঙ্গ মিটে গেল নতুন রকম অঙ্গচ্ছেদে। আসাম আবার পূর্বের মতো চীফ কমিশনারের প্রদেশ হল; কিন্তু গোয়ালপাড়া শ্রীহট্ট কাছাড় নিয়ে গেল। কাটা পূর্ববঙ্গ কাটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলে গেল। বিহার-উড়িষ্যা কেটে বেরিয়ে গেল ও স্বতন্ত্র প্রদেশ হল; বিহারে মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জুড়ে গেল। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে উঠে দিল্লীতে গেল। 'Indian Daily News' লিখল—দিল্লীতে যাওয়া কাজটা ভালো হল না। Delhi, the grave of

dynasties—দিল্লী রাজবংশগুলির কবরস্থান। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ পৃথ্বীরাজের রাজপাটের আবাসভূমি, পাঠান-মোগলের দেলহী এর মধ্যে ঢুকে রয়েছে। যেদিন দিল্লীতে দরবার হবে বলে তাঁবু-শামিয়ানা ও কানাত লাগানো হয়েছিল, ইলেকট্রিক তার গলে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল। বড়লাট হার্ডিঞ্জ যেদিন কলকাতার প্রাসাদ ছাড়েন সেদিন বাজ পড়ে ইউনিয়ন জ্যাক (বিলাতের জাতীয় পতাকা) পুড়ে গেল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা মন্দ গণল এইসব ব্যাপারকে একত্র ধরে। সুশিক্ষিত ইংরেজ এতে বাধা বোধ করল না। ১৯৪৭ সালে কি হবে, ১৯১১ সালে তা কে জানবে?

সুরেন্দ্রনাথ জয়লাভ করলেন। এদিকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিপিনবাবুর পরাজয়ের সূত্রপাত হল। তিনি বিলাতে গিয়ে লেখা ও বক্তৃতা সুরু করেছিলেন। ভারতের প্রবাসী ছাত্রদের মধ্যে নিজ ভাবধারা বেশ জোরের সঙ্গেই প্রচার করতেন। কাগজে 'Etiology of Bomb—বোমার নিদান'-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখলেন। ভারত সরকার কাগজখানি 'সমুদ্র ও বন্দর আইনে' বাজেয়াপ্ত করলেন।

বিপিনচন্দ্র ফেরবার সময় হয়েছে বুঝে প্রত্যাগমনের জাহাজী টিকিট খরিদ করলেন। বিদায়কালীন বক্তৃতায় বললেন, 'ভগবান যদি আমায় একদিকে একান্তে স্বাধীন ভারত দিতে চান এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ জাতিসমূহের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনশীল ভারত দেন—আমি নিঃসন্দেহে পরের প্রস্তাবটি গ্রহণ করব।'

কাগজ পড়ে তাঁর স্তাবক ও শুভানুধ্যায়ীরা বজ্রাহত হলেন। সুরেন্দ্রনাথ সংবাদ পেয়ে বললেন, 'বিপিন বলে কি হে? আমি 'নির্জলা স্বাধীনতা' বলি না। জানি যে, বিনা-রক্তপাতে সে হবার নয়। ভগবান যদি দেন, তবে তো রক্তপাতের বালাই থাকে না! সে অবস্থায় আমি ইংরেজ-সম্পর্কশূন্য স্বাধীনতা চাইব।'

বিপিনবাবু বোম্বাই-এ এসে নামতেই পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করল। বিলাতে লেখা প্রবন্ধের জন্য মামলা হবে। বিপিনবাবু অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন যাতে তাঁকে একবার কলকাতা গিয়ে পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়—বহু দিন তিনি তাদের দেখেন নি। সরকার তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। মোকদ্দমা হল। তাঁর একমাস কারাদণ্ড হয়।

সুনাম আগুনের মতো। অনেক কষ্টে বা তোড়জোড় করে আগুনকে জ্বালাতে হয়। উজ্জ্বল শিখা হয়। কিন্তু একবার নিভলে পুনরায় প্রোজ্জ্বল করা অতীব দুরূহ। বিপিনবাবুর সুনামের সেই দশা হল। অথবা, বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্র সম্পর্কে ধরা যাক। একদিন নেতার চেয়ে জনমত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছিল। সুরেনবাবুকে পিছনে ফেলে বিপিনবাবু এগিয়ে গিয়েছিলেন। বিপিনবাবু চরমপন্থী দল গড়ার মুখে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বিপিন এসব কি করছ? আমার পদপ্রান্তে বসে তুমি একদিন রাজনীতি শিখেছিলে!' বিপিনবাবু উত্তরটা তাঁকেও

দিয়েছিলেন এবং সভায়ও বলেছিলেন, 'শিখেছিলাম কেন? এখনও তো পদপ্রান্তে বসে আছি! আপনি দেশকে হৃদয়ের মণি করেছিলেন বলে, আপনাকে আমরা মাথার মণি করেছিলাম। কিন্তু দেশ যা চায়, দেশের আজ যা প্রয়োজন সেদিকে অবহেলা করলে তো চলবে না?' কালকের রাজনৈতিক আগ্নেয়গিরি, আজকের ভস্মস্তূপ! বিপিনবাবু যাদের জাগিয়েছিলেন, তারা আজ তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। বিপ্লবের একটা দুর্নাম আছে। সে মাছের মা বা সাপের মার মতন নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলে। বিপ্লব নেতার সৃষ্টি নয়। নেতারাই বিপ্লবের সৃষ্টি। বিপ্লব একটা জটিল বা কুটিল শক্তি। সেই শক্তির প্রকাশ হয় যাকে উপলক্ষ করে, তিনিই নেতা। কর্মীরাও তদ্রূপ বিপ্লবী শক্তির উপলক্ষস্থল। নেতা ও কর্মীরা, যুগাবতার ও তাঁর অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ।

কাজ মিটে গেলে কাজের বাড়ির লোকেরা বসে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করে। কতকগুলি লোক নিম্ন প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে পারে না। তারা এর-ওর-তার দোষত্রুটি ধরে এবং খুঁজে খুঁটিয়ে বের করে। উচ্চ প্রকৃতিতে যাঁরা বিহার করেন বা করতে শিখেছেন তাঁরা এসবের ওপরে বিচরণ করতে চান। তাঁদের মধ্যে দার্শনিক ভাব ফুটে বেরোয়।

বঙ্গভঙ্গ-নিরোধে একদল লোক দুঃখিত হল। তারা বলল—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বয়কট এবং সক্রিয় প্রতিরোধ ঢুকিয়ে দেশের দফাটা রফা করা হল। ইংরেজকে অসম্ভব চটানো হয়েছে। 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ-অঙ্গচ্ছেদ' করে যে লোকগুলো চেঁচাচ্ছিল—তাদের হুজুগ থামিয়ে দিল! মুখের চুলবুলি তো এদের বন্ধ করে দিল? ওদিকে পেটে মারবার ব্যবস্থা হল। আসাম, বিহার-উড়িষ্যায় চাকরি আর দেবে না। রাজধানী দিল্লীতে চলে যাওয়ায় কাছে-পিঠে যেসব প্রদেশ আছে, তাদের লোকেরা নজরে পড়বে। নজর থেকে দূরে, মানে মনের থেকেও দূরে। বাঙালীর আর ভারত সরকারে চাকরি মিলবে না। বাংলা ম্যালেরিয়ায় ভরা। বিহারে বদলি হয়ে তবু নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হচ্ছিল। এবার সে গুড়েও বালি! বাঙালী টাকায় ঘাটি খাবে, স্বাস্থ্য নষ্ট হবে, প্রতিপত্তিতে 'নাস্তি' হয়ে যাবে। কলকাতার গুরুত্ব ও দামিত্ব রাজধানী বলে ছিল। এবার এখানে দিনে শেয়াল ডাকবে। বাড়ি-জমি-সম্পত্তি জলের দরে বিকুবে।

ঊর্ধ্বমার্গীরা এসব কথা গায়ে মাখলেন না। তাঁরা দেখছিলেন জগতে জাতিসমূহের মাঝে ভারতের যে-আসন হওয়া উচিত, রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য সেটি তার হচ্ছে না। সেদিকে এক-পা এক-পা করে এগুতে পারলে সেও ভালো। বিশ্ব-প্রেম, বিশ্ব-করুণা, বিশ্ব-শান্তি, বিশ্ব-মৈত্রী—এই বারতা নিয়ে একদিন ভারতের শ্রমণ-ভিক্ষুরা পৃথিবীর কত জায়গায় না গিয়েছিল! নিজেদের স্থায়ী একটা ছাপ

সেখানে রেখে আসতে পেরেছিল। কায়াটা পড়ে আছে, প্রাণ তার নেই! তাতে আর একবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করার দিন সমাগত। মানুষের মধ্যে যে পশুভাব আছে, তাকে দিয়ে বাদান্তর বা মনান্তর নিষ্পত্তি না ক'রে প্রজ্ঞার সাহায্যে সেটি করিয়ে নেওয়া আরও উচ্চস্তরের সভ্যতার পরিচায়ক। সে দ্যোতনা তো ভারত অনায়াসে যথেষ্ট দিতে পারে। ভারতের আত্মিক দূতাবাস দিকে দিকে খোলা হোক। ভারতকে কেন্দ্র করে তারা ঘুরুক। জগৎ-সভ্যতায় ভারত হবে ধ্রুবতারা—দূতেরা অন্য দেশগুলো জাগাক। তারা হবে ধ্রুবতারা-প্রদর্শক জ্যোতিষ্ক।

১৯১১ সালের রাজনৈতিক জয় পরাধীন জাতের আশাকে কতকটা বাড়িয়েছিল। সেই বছর 'মোহনবাগান' ফুটবল ম্যাচে শিল্ড পেয়েছিল। বাঙালী তথা দেশী দলের এই সর্বপ্রথম শিল্ড পাওয়া। তারা সেণ্ট জেভিয়র টিম ছাড়া (এটি অ-মিলিটারী ছিল) বাকি সব মিলিটারী দলকে হারিয়ে শেষ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিল। এটা নিছক খেলার ব্যাপার। কিন্তু খবরের কাগজের অঙ্কে ও কি লিখেছে—'এতদিন পরে পলাশীর প্রতিশোধ নেওয়া হল।' মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের ফটো ছাপিয়ে 'অমর এগারো জন' আখ্যায় ভূষিত করে বিক্রি হতে লাগল। মোহনবাগানের সেণ্টার হাফব্যাক রাজেন সেন ছিল 'অনুশীলন'-এর সভ্য। এতে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় ঐ উক্তিটি 'পলাশীর প্রতিশোধ'—'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নয়। মোহনবাগানের জয় যেন পলাশী-ক্ষেত্রে মোহনলালের রক্তরাঙা বিজয়।

বিজয়োল্লাসে ভাবোচ্ছ্বাস বহুদূর ব্যাপৃত হয়েছিল। কেউ কেউ ভাব ধারণাকে বাক্যে প্রকাশও করল, 'ইঁটের পাঁজা হে, ইঁটের পাঁজা! একখানা যদি খুলতে পেরেছ তো বাকিগুলো সব আপনি খসে আসে।' অর্থাৎ আমলাতন্ত্র ক্রমশঃ ধাপে ধাপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। 'এবার বোঝা গেল ওদের জোর অতশত নয়। আমাদের দুর্বলতাতে ওদের সবলতা বিরাজ করছিল।'

ওদিকে ইংরেজ রাজনৈতিকও ঘুমোচ্ছিল না। কার্জনের সময় সেনাপতি কিচেনার-এর সঙ্গে কার্জনের লেগেছিল প্রভুত্বের লড়াই। কার্জন চান যেহেতু তিনি রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট, তাঁর অধীনে থাকবে প্রধান সেনাপতি। কিচেনার বলেন যুদ্ধবিদ্যা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের জিনিষ। যখন যেখানে যেটি করতে হবে, তা হবে সামরিক প্রয়োজনে। সুতরাং সমরবিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি ছাড়া 'স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিক্স'—রণকৌশলে কি লাভ করতে হবে এবং কেমন করে তা লাভ করা যাবে—অপর কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। বরং অব্যবসায়ীর দ্বারা হস্তক্ষেপে উদ্দেশ্যনাশ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত দুজনের কড়চা বিলাতে যায়। সেখান থেকে নির্দেশ আসে যে, প্রধান সেনাপতি ও তাঁর বিভাগের উপর প্রভুত্ব বিলাতের

রণ বিভাগের অঙ্গ ও অধীন। রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটের তার উপর প্রভুত্ব চলবে না। অভিমানী কার্জন পদত্যাগ করে চলে যান।

তাঁর জায়গায় এলেন সমর বিভাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্যানাডার ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো। তিনি তিনটি প্যাঁচ মারেন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে। প্রথম প্যাঁচ—হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। ভগবানের খামখেয়ালিতে তারা ভারতে ঢুকে পড়েছিল। তাদের পৃথক সত্তা বজায় রেখে পালন করতে হবে। দ্বিতীয় প্যাঁচ—রাজনীতির দুষ্টামির বদগন্ধহীন স্বদেশী (Honest Swadeshi) সরকারের সমর্থনযোগ্য। অর্থনীতির দিক দিয়ে তাঁর দরদ স্বদেশীতে তিনি রাখেন, এই কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন। এটা যে কতবড় ভুয়ো কথা তা রাজনীতির বর্ণপরিচয় যাদের হয়েছে তারাও ধরতে পারবে। তৃতীয় প্যাঁচ—একপশলা রাজনৈতিক সংস্কারবর্ষণ। এ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন এদেশে চলছিল স্রেফ শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা। এবার থেকে কিছু কৃষ্ণাঙ্গকে এদের 'পোঁ' ধরে থাকতে দেওয়া হবে। চতুর ইংরেজ অনেক আগে থেকে জানে, লর্ড মেকলের শিক্ষানীতি এমন ভারতবাসী উৎপাদন করেছে যাদের দেহটা এদেশের, কিন্তু মনপ্রাণ সমর্পিত হয়ে আছে বিলাতীদের পায়ে। 'তোর ধন তোকে খাইয়ে, রাখাল যায় কলা দেখিয়ে'। ভারতের পয়সায় ভারতের লোককে পুষে, ভারতের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজ কার্যসিদ্ধি করে নেবে ব্রিটিশ রাজনৈতিক।

১৯০৬ সালে মিণ্টোসাহেব মওলানা মহম্মদ আলির ভাষায় 'had a command performance'; মুসলমানদের দিয়ে একটা 'দুই-জাতীয়ত্বের' অভিনয় করিয়ে নেন। আগা খাঁর অধিনায়কত্বে মুসলমানরা তাদের পৃথক দাবির কথা জানান। সে কথা মিণ্টো সহানুভূতির সঙ্গে মেনে নেন। এইবার মুসলমানদের পৃথক দাবি মানবার ব্যবস্থা হল। লাটের শাসন-পরিষদে একজন ভারতবাসীর স্থান হল। এই আর একবার 'মুষল' সৃষ্টি হল। 'উদূখল-মুষলং যদুকুল-নাশনং'। সরষের মতো ছোট বীজ থেকেই প্রকাণ্ড মহীরুহ হয়। বটবৃক্ষের এই-না জীবন-ইতিহাস। ফুলারসাহেব নতুন প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'-এর শাসক হিসাবে বলেছিলেন—'মুসলমান আমার সুয়োরানী'। লর্ড মিণ্টোও ঢপ্-কীর্তনে গাইলেন—

'তোমারই গরবে গরব আমার,
রূপ যে তোমারই রূপে!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলায় মুরসান নামে একটি জায়গা আছে। মোগলেরা সেখানে যাঁকে রাজাবাহাদুর উপাধি দেন তাঁর বংশে শেষ রাজার সময় ইংরেজ নিজ অধিকার বাড়াতে গেল। রাজাবাহাদুর বাধাদানের উদ্দেশ্যে লড়াই করেন। শেষে পরাস্ত হন। রাজ্য হাতছাড়া হল। তবে খেতাব বজায় রইল। সসম্মানে বসবাসের জন্য রাজাকে দুশো গ্রাম ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৮৮৬ সালে ১লা ডিসেম্বর তারিখে রাজা ঘনশ্যাম সিংহের তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই হলেন পরবর্তী কালে স্বনামধন্য রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ।

মাত্র তিনবছর বয়সে হাথরাসের রাজা হরনাম সিংহ তাঁকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। এই বংশও ১৮১৮ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। রাজ্য হারিয়ে জমিদার হয়। এই দুই ইতিবৃত্ত থেকে মহেন্দ্রপ্রতাপ ইংরেজকে তাঁদের সম্পত্তি-অপহারক মনে করতেন। বৃন্দাবনে তাঁর নতুন মা দুজন থাকতেন (হরনামের দুই রানী ছিলেন)। সেইজন্য তিনি মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে যেতেন।

১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা কংগ্রেস দেখতে আসেন। সে সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন খুব জোর চলেছিল। নতুন স্বাদেশিকতা রাজাকে খুবই প্রভাবান্বিত করে। রাজা স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। রাজা দেশে ফিরে এসে সব বিদেশী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলেন। ইনি ঝিন্দের রাজকন্যাকে বিবাহ করার ফলে পাতিয়ালা ও নাভার রাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত হন। নাভার সে-সময়ের যুবরাজ পরে ইংরেজ কর্তৃক গদিচ্যুত হন। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ইংরেজকে প্রাণ খুলে সাহায্য করেন নি।

১৯০৪-০৬ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ভারতের বহু স্থান ভ্রমণ করেন। দেশ-দেখা তাঁর প্রাণের জিনিষ ছিল। ১৯০৭ সালে তিনি সস্ত্রীক ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে যান। ফেরার পথে তিনি চীন, জাপান, মালয় হয়ে আসেন। ১৯০৮ সালে তিনি বৃন্দাবনে একটি টেকনিক্যাল (কারিগরী) কলেজ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রেরা সেখানে বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করবে। নাম হল 'প্রেম মহাবিদ্যালয়'। ১৯০৯ সালে কাজ আরম্ভ হয়। এর জন্য রাজা বহু সম্পত্তি দান করেন।

রাজা মানুষের মধ্যে ছোট-বড়, অজাত-কুজাত সইতে পারতেন না। তিনি 'জাত-পাত-তোড়ক' বা পতিতোদ্ধার আন্দোলন চালান। একদিন ইস্তাহার দিয়ে এক মেথরকে শুদ্ধ করে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে কয়েকজনের সঙ্গে আহার করেন। গোঁড়ারা তাঁকে জাতিচ্যুত করেন। তিনি কুক্রিয়াসক্তদের সংস্পর্শে থাকা আর সুক্রিয় হলেও

জন্মের জন্য নীচ জাতে কারো থাকা ঠিক হতে পারে না বলেন এবং বহু ভণ্ডের মুখোশ খুলে দেন।

তিনি 'প্রেম' নামে একটি পত্রিকা বার করেন ও নিজেই তার সম্পাদক থাকেন। তিনি মথুরায় তাঁর গ্রামে বিদ্যাপ্রচারের জন্য বিস্তর অর্থ দান করেন।

'প্রেম মহাবিদ্যালয়'-এর ছাত্রাবাসের জন্য বৃন্দাবনে তাঁর স্ত্রীর নতুন ভবনটিও দান করেন।

১৯১৪ সালে দেরাদুনে তিনি 'নির্বল সেবক' নামে আর একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধী নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ আন্দোলন চালান। তার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। রাজা দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে যোগ দিতে চান। রাজা একহাজার টাকা চাঁদাও দেন।

রাজার জীবনে ১৯০৬ এবং ১৯১০ সাল রাজনৈতিক কারণে বিখ্যাত। ১৯০৬ সালে তিনি দাদাভাই নৌরজি, তিলক, বিপিন পাল ও মহারাজ গায়কোয়াড়কে দেখেন। ১৯১০ সালে মতিলাল নেহেরুকে দেখেন। ঐ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন হয়। তিনি 'প্রেম মহাবিদ্যালয়ে'র কতকগুলি ছাত্রকে মহাসভার অধিবেশন দেখাতে নিয়ে যান।

১৯১৪ সালে মহাসমর বাধলে তাঁর মনে যুদ্ধের ঘটনা বুঝবার জন্য ইউরোপ যাবার প্রেরণা জাগে। ঐ সালে আবার কমিশনার 'প্রেম মহাবিদ্যালয়ে'র পারিতোষিক বিতরণের জন্য আসেন। রাজা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, 'অন্যায়কে দূর করে ন্যায়ের রাজ্য আমাদের স্থাপন করতে হবে।' কমিশনার এই অভিভাষণে অসন্তুষ্ট হন। ফলে রাজার মন জার্মানির দিকে ঝোঁকে।

রাজা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে প্রাইভেট সেক্রেটারি করে এবং যথাবিধি ছাড়পত্র-প্রাপ্তির ব্যবসা করে ইউরোপ যাত্রা করেন। ব্যবস্থা থাকে যে, তিনমাস বাদে হরিশ্চন্দ্র ফিরে এসে 'নির্বল সেবক'-এর সম্পাদনা করবেন। 'নির্বল সেবক'-এর এক সংখ্যায় জার্মানির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সরকার বিরক্ত হয় ও জামানত আদায় করে। লোহিত সাগরে জাহাজ এলে জার্মান সাবমেরিন-এর ভয়ে বহু সাবধানতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ভূমধ্যসাগরে প্রকৃত বিপদের সূত্রপাত ঘটে। হুকুম এল জাহাজ মার্সাই বন্দরে আশ্রয় নেবে। সুতরাং রাজাকে সেখানে সদলবলে নামতে হল। স্থানীয় ব্রিটিশ বাণিজ্যদূত সুইজারল্যান্ড হয়ে বিলাতে যাবার অনুমতিপত্র দেন। সুতরাং এঁরা জেনেভাতে এলেন। হরিশ্চন্দ্র আর দেশে ফেরেন নি। রাজা শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সন্ধানে বেরুলেন।

সম্ভবতঃ ১৯১৩ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের দ্বারা স্থাপিত প্রেম মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সুরেন কর আমেরিকা যান। সেখান থেকে পরে জার্মানি যাত্রা করেন।

এদিকে রাজা সময়মতো ছাড়পত্র না পাওয়ায় ইটালীর জাহাজে যাওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারেন নি। শেষ অবধি ইংরেজী জাহাজে যান এবং সুইজারল্যাণ্ডে উপনীত হন। সেখানে বিখ্যাত পাঞ্জাবী-বিপ্লবী হরদয়ালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। বার্লিনে যাওয়া স্থির করেন। তিনি কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রয়াসী হন, কিন্তু জার্মান রাজদূত সে বিষয়ে আশ্বাস দিতে পারলেন না। পরে বীরেন চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা) এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে তাঁকে বার্লিনে নিয়ে যান।

১৯১৫ সালে রাজা জার্মানিতে পৌঁছোন। সেখানে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সংস্থাটি ওদেশের পররাষ্ট্র বিভাগের পরিচালনাধীন ছিল। প্রেম মহাবিদ্যালয়ে থাকাকালে আমাদের বন্ধু সতীশ সেনের সঙ্গে সুরেন করের সম্পর্ক ছিল। সুরেনবাবু যাবার সময় সতীশ সেনের মারফত আমাদের বৈদেশিক কাজের প্রতিনিধিত্ব করতে স্বীকার করেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায় বিলাতে শ্যামজির প্রভাবে পড়েন। তাঁর ব্যারিস্টারী পড়ায় বাধা পড়ে, শেষ পর্যন্ত তিনি জার্মানিতে এসে পৌঁছোন এবং বার্লিনের ভারতীয় কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য হন। কাজেই সুরেন করের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়।

জার্মান সরকারের বহির্বিভাগের ব্যারন ফন ভেসেনডঙ্ক রাজাকে দেখাশুনায় বা তাঁর অনুরোধরক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। করাচিস্থিত ভূতপূর্ব বাণিজ্যদূত মিঃ নয়েনহফারকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখার আদেশ দেওয়া হয়। রাজাকে পূর্ব-ইউরোপে যুদ্ধস্থান দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। মিঃ জিমারম্যান রাজাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান কাইজারের সঙ্গে দেখা করাতে। দুজনের সাক্ষাৎকার হয়। রাজা কাইজারকে ভারতীয় ভঙ্গীতে অভিবাদন জানান। কাইজার পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা সম্বন্ধে খবর যে রাখতেন তা তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ হল। তিনি কথার শেষে রাজাকে বললেন, তিনি যেন আফগানিস্তানের আমীরকে কাইজারের শুভেচ্ছা জানান। রাজাকে সম্মানিত করা হল Red Eagle (Second Class) দিয়ে। চ্যান্সেলার, বেথম্যান-হলওয়েগ নিজ স্বাক্ষরে একটি পত্র দিলেন। তাতে ভারত সম্বন্ধে জার্মান সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল।

১৯১৫ সালে রাজা কাবুল যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ ফন হেন্‌টিগ ও মৌলানা বরকৎউল্লা। তিনি কাবুলে দোভাষীর কাজ করবেন—আমীর তো ফারসী ভাষায় কথা বলবেন। আফগান-আফ্রিদী সৈন্য কয়েকজন সঙ্গে চলল। তারা ব্রিটিশপক্ষের সৈন্য ছিল এবং জার্মানির হাতে বন্দী হয়েছিল। তাই তারা ইংরেজদের পক্ষ ত্যাগ করল। জার্মানির জেনারেল স্টাফ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের কয়েকজন প্রতিনিধি এঁদের বার্লিন স্টেশনে এসে বিদায় দেন।

রাজা ক্রমে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছোন। সেখানে তুর্কীর সুলতান সাক্ষাৎকার দেন। তিনি তখন জগৎ-জোড়া মুস্লিম সমাজের ধর্মনেতা বা খলিফা। তুর্কীর যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশাও আলাপ-আলোচনা করেন। রাজার অনুরোধে একজন তুর্কী কর্মচারী ভারতীয় মিশনের সঙ্গে কাবুল চললেন। সুলতান আমীরকে একখানি সুপারিশ ও পরিচয়পত্র দেন রাজার হাতে। ভারতীয় রাজাদের নামেও ইংরেজ-উচ্ছেদকল্পে পত্র দেওয়া হয়। আনোয়ার সৈনিক বিভাগকে নির্দেশ দেন ভারতীয় মিশন যাতে নিরাপদে এশিয়া-মাইনর পার হয়ে যেতে পারে। তাদের পারস্য-প্রবেশ দরকার। এই সময় ইংরেজরা গ্যালিপলি আক্রমণ করছিল। ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে যারা কয়েদী হয় তাদের রাজধানীর শহরে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হিল্‌মি পাশার সঙ্গেও রাজার সাক্ষাৎ হয়। শেখ-উল্‌-ইসলামের (ইসলামের প্রধান আচার্য) সঙ্গেও এই মিশনের সাক্ষাৎ হয়। এসবের ফলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষিত হয়। রেল স্টেশনে হরদয়াল প্রভৃতি বন্ধুদের কাছ থেকে রাজা বিদায় নেন। ভারত স্বাধীন করার উন্মাদনা সবাইকে তখন মাতিয়ে তুলেছিল। ক্রমে পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী আফগান নগরী হিরাটে মিশন পৌঁছোলে আফগান সরকার অভিনন্দন জানাল। ২রা অক্টোবর তাঁরা পৌঁছোন কাবুলে।

বলা বাহুল্য, ভূপালের বরকৎউল্লা বার্লিনের বন্ধুদের সঙ্গে পূর্বেই জোটেন। পাঞ্জাবের হরদয়াল আমেরিকায় গদর পার্টির কাগজ চালানোয় ও কাজকর্মে খুবই লিপ্ত থাকায় ইংরেজদের প্ররোচনায় আমেরিকা থেকে ১৯১৪ সালে বহিস্কৃত হন। হরদয়াল সিং খুব ভালো ছাত্র ছিলেন—পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা ছিল যথেষ্ট। তিনিও আমেরিকা থেকে সুইডেন হয়ে জার্মানিতে আসেন।

এক এক করে জার্মানিতে যাঁরা এসে জুটলেন, পরবর্তী কালে তাঁদের কাজ হল 'ইংরেজের দুর্দিনে ভারতের সুদিন' আনায় মেতে যাওয়া।

মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তখনকার আমীর হবিবুল্লাকে বোঝাতে যে, ইংরেজ ভারতে থাকলে কারুর কল্যাণ নেই।

কাবুলে বাগ-ই-বাবর (বাবরের উদ্যান) প্রাসাদে মিশনের থাকার ব্যবস্থা হয়। আমীরের সঙ্গে দেখা হল তিন সপ্তাহ পরে পাঘমান-প্রাসাদে। দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা চলেছিল। আমীরের ছোট ভাই সর্দার শ্রেষ্ঠ নাসিরুল্লা খাঁ তাঁদের সাদরে আমীর হবিবুল্লার কাছে নিয়ে যান। কাইজারের ও তুর্কীর সুলতানের চিঠি দেওয়া হল আমীরকে।

ভারতীয় কিছু মুসলমান ছাত্র ঐ সময়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। তারা তুর্কীকে সাহায্য করতেই দেশ ছেড়ে ছিল। তারা এবং মৌলানা ওবেদুল্লা প্রথমে কাবুলে বন্দী অবস্থায় থাকেন। দুজন শিখও পাঞ্জাব সরকারের লাঞ্ছনা অতিক্রম করে

পালিয়ে যান কাবুলে, তাঁরাও বন্দী হন। রাজার অনুরোধে এঁদের সবাইকে এখন মুক্তি দেওয়া হয়। আমীরকে যুদ্ধে নামানো ছিল ভারতীয় মিশনের উদ্দেশ্য। এই মিশনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন কাজিম বে নামে একজন তুর্কীও ছিলেন। ডাঃ ফন হেন্টিগ জার্মান চ্যান্সেলারের পত্র আমীরকে দেন। আলোচনা ভারতীয়দের সঙ্গে আলাদা, জার্মানদের সঙ্গে আলাদা, তুর্কী প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথকভাবে কয়েকবার হয়। ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের কথা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বস্ত অনুচর আবদুল রাজিক ভারতীয় সমস্যার আলোচনার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হন।

স্বপ্ন সফল করার উদ্দাম প্রচেষ্টার সারথিরূপে ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর স্থাপিত হয় 'স্বাধীন ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'। স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি বা রাষ্ট্রপতি হলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ; মৌলানা বরকৎউল্লা প্রধানমন্ত্রী আর মৌলানা ওবেদুল্লা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরে আরো অনেকগুলি সচিবের পদ সৃষ্টি হয়। যাঁদের কারামুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে থেকে লোক বেছে এই পদগুলিতে বসানো হল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহম্মদ আলি, আর একজন আল্লা নেওয়াজ। ইনি পরে বার্লিনে আফগান দূত হন। আফগানিস্তান সরকারের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সমানে সমানে।

এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কয়েকটি দেশে কয়েকটি 'মিশন' পাঠান। যেমন রুশিয়ায় কেরেন্স্কি সরকারের কাছে—পরে বলশেভিক সরকারের কাছেও। কতকগুলি ঘোষণাও প্রচার করেন এই সরকার। এই সরকারকে স্বীকার করে নেন জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গারি, তুর্কী প্রভৃতি।

রুশিয়ায় যাঁরা দৌত্য করতে যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ আলি এবং সামসের সিং (আসল নাম ডাঃ মথুরা সিংহ)। ১৯১৬ সালে শ্রীগুজর সিং (আসল নাম শ্রীকালা সিং) রুশ সীমান্তে যান এবং জেনারেল একোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেনাপতি জানান সে সময়ে মহেন্দ্রপ্রতাপের রুশদেশে যাওয়া বিপজ্জনক হবে।

১৯১৭ সালে ইরাকে তুর্কীর পরাজয় দেখে আমীর আরো ব্রিটিশ-ঘেঁষা হয়ে পড়েন। ইংরেজকে তাঁরা ঘাটাতে চাইলেন না। এই সময় গুজর সিংকে ছদ্মবেশে গোপনে নেপালে পাঠানো হল। তাঁর কাছে মহারাজার জন্য জার্মান চ্যান্সেলার ও রাষ্ট্রপতি মহেন্দ্রপ্রতাপের পত্র দেওয়া হয়। তাছাড়া কয়েকজন ভারতের দেশীয় রাজন্যকেও নব রাষ্ট্রপতির (মহেন্দ্রপ্রতাপের) পত্র দেওয়া হয়। গুজর সিং গোপনে ভারতে চলে আসেন।

সোভিয়েট সরকার পরে মহেন্দ্রপ্রতাপকে রুশরাজ্যে যেতে দেয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আফগানী শস্য খরিদ করার। ১৯১৮ সালে পেট্রোগ্রাডে ট্রট্স্কির সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হয়। রাজা সেবার জার্মানি যাচ্ছিলেন। তবে জার্মানি থেকে আফগানিস্তানে

ফিরবার পথে আবার তিনি আসেন রাশিয়ায় এবং আরো চারজন ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করেন লেনিনের সঙ্গে।

১৯১৯ সালে আমীর হবিবুল্লাকে কে একজন গুলী ক'রে গুপ্তহত্যা করে। তাঁর তৃতীয় পুত্র আমানুল্লা পূর্বনির্ধারিত যুবরাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইনায়েৎউল্লাকে কারারুদ্ধ করেন ও নিজে বাদশাহ হন। ১৯১৯ সালেই তিনি জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। পেশোয়ারের দিকে তাঁর সৈন্য ধাওয়া করে। ইংরেজ তাদের মওড়া আগলায়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত স্থান থল-এ কাবুলী প্রধান সেনাপতি নাদির খান হঠাৎ আক্রমণ করে যুদ্ধজয়ী হন। অতঃপর উভয়পক্ষে সন্ধি হয়ে যায়।

এই যুদ্ধের ফলে ১৯২০ সালে মুসৌরিতে উভয়পক্ষের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে সন্ধি-শর্তগুলি স্থির করেন। সন্ধির ফলে কাবুলীদের এই সুবিধা হল—(ক) আমীর অতঃপর 'হিজ হাইনেস' থেকে 'হিজ ম্যাজেস্টি' পদে উন্নীত হলেন। অর্থাৎ ইংরেজের আওতা থেকে পূর্ণ মর্যাদার স্বাধীনতা লাভ বলে। (খ) এতদিন কাবুলী সরকার কোনো বিদেশী সরকারের সঙ্গে সোজাসুজি বিলি-বন্দোবস্ত বা সন্ধি প্রভৃতি করতে পারতেন না। এগুলি ইংরেজের হাতে ছেড়ে রাখতে হয়েছিল। অতঃপর তাঁরা পররাষ্ট্র বিভাগ খুলে স্বাধীনভাবে যে-কোনো দেশের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন। (গ) 'ডুরাণ্ড-লাইন'-এর পুনঃপরীক্ষা হয়ে দুই রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হবে। ল্যাণ্ডিকোটাল অবধি ইংরেজের অধীন, ল্যাণ্ডিখানা থেকে কাবুলের রাজ্য। খাইবারের শেষ সীমা হল ল্যাণ্ডিকোটাল। এই অবধি ইংরেজ রেল নিয়ে গেছে। এর ওধারে কাবুলী সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত।

কাবুলের অসুবিধা : বৎসরে ব্রিটিশ সরকার যে বাইশ লক্ষ টাকা ঘুষ বা উপঢৌকন দিত, সেটা আর দেবে না। তবে কাবুল সরকারের অস্ত্রসম্ভার বিদেশ থেকে আসতে ইংরেজের বন্দরে এবং রেলের সুবিধা দেওয়ার চুক্তি হয়েছিল।

১৯০৫ সালে যুবরাজ ইনায়েৎউল্লা কলকাতায় আসেন। সেদিন শহরে কাবুলীদের কী উৎসাহ! 'হামারে শাজাদা আয়া !'—বলতে বলতে কাবুলীরা নাচতে-নাচতে রাস্তা দিয়ে ছুটছিল পথে তাঁকে একবার দেখবে বলে।

একজন দর্জী আমাদের জামার মাপ নিতে নিতে বলেছিল—'একটু তাড়াতাড়ি, বাবুরা, মাপটা দিয়ে নেন!' 'কাবুলের যুবরাজ আসছে তো তোমার কি?'—প্রশ্ন করায় সে উত্তর দিয়েছিল, 'কি বলেন, বাবু? আমরা যে এক-পাতে খানেওলা?'

১৯০৭ সালে আমীর হবিবুল্লা স্বয়ং ভারতে আসেন। তিনি দিল্লী জুম্মা মসজিদে নামাজ পড়তে যান। মুসলমান জনসাধারণ তো খুব খুশি হয়েছিলই, হিন্দুরাও হয়েছিল। তাঁর সম্মানের জন্য দুশো গোরু কাটা হবে বকরী ইদে, এ সংবাদ তাঁর কাছে পেঁছালে তিনি বলেন, 'হিন্দু ও মুসলমান পড়শী। এক পড়শীর

মনে অন্য পড়শীর কষ্ট দেওয়া অন্যায়। দুশো ছেড়ে একটাও গোরু কাটলে তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন না।' তিনি আরও বলেছিলেন যে, আফগানিস্তানে নাকি গোরু-কোরবানি হয় না।

কলকাতায় এলে তাঁকে মেডিকেল কলেজ দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন পুরাতন হাসপাতালটিই সবে-ধন নীলমণি। প্রিন্স-অব-ওয়েলস হাসপাতাল তখনও তৈরি হয় নি। স্ত্রী-রোগের হাসপাতাল 'ইডেন হস্পিট্যাল' অবশ্য তখনও ছিল।

তখনকার দিনে পুরানো হাসপাতালের উপরতলায় থাকত শ্বেতাঙ্গ রোগীরা। নীচের তলায় কৃষ্ণাঙ্গরা। উপর তলায় ইলেক্‌ট্রিক পাখা ছিল। নীচের তলায় ছিল না। আহার্য বিষয়ে তারতম্য ছিল। উপর তলায় দেওয়া হত উৎকৃষ্ট খাদ্য, নীচের তলায় দেওয়া হত অপকৃষ্ট খাদ্য। এরূপ অসঙ্গত বিভিন্নতা আমীরের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বলেন, 'রোগী-পরিচর্যায় এ তারতম্য কেন? এটা তো ঠিক নয়।' তার ফলে নীচের তলায়ও ইলেক্‌ট্রিক পাখার বন্দোবস্ত হয়।

কাবুলীরা যে নাচে-গায় এই অপূর্ব ব্যাপার সে দিনের পূর্বে জানা ছিল না। ছোট ঢোল-সহরত, লাঠি হাতে করে লম্ফ-ঝম্ফ প্রদানে উদ্দণ্ড পাহাড়ী নৃত্য ও কর্ণবিদারী তীক্ষ্নস্বরে গীতের মধ্যে দিয়ে তাদের উল্লাস প্রকাশিত হয়েছিল।

মানুষ ভাবে এক, হয়ে যায় আর এক। ইতিহাসে হল হবিবুল্লার অপমৃত্যু, যুবরাজের কয়েদ! যার হবার কথা ছিল না, সেই আমানুল্লা হয়ে গেল কাবুলের প্রথম ইংরেজের কূটনীতির বাঁধন-ছাড়া স্বাধীন বাদশা।

আমার বিবৃতিতে সময় আসার আগে এই অধ্যায়টি লিখে ফেললাম। ঠিক সন-তারিখ মিলিয়ে ঘটনার পারম্পর্য রেখে লেখার ধাঁজ আমি অনুসরণ করছি না। আমি দেখাতে যাচ্ছি—'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে' কোথায় কিভাবে ঘটে উঠেছিল; সারা দেশের আবহাওয়ায় এর উপাদান বজ্র-বুকে-লুকানো মেঘের মতো কেমন বিরাজ করছিল।

ইংরেজ রাষ্ট্রবিদ্‌দের একটা কূটচালের কথা বলা দরকার। ১৯০৭-১৯১৮ সালে সশস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চেষ্টা যারা করেছিল তাদের অ্যানার্কিস্ট আখ্যা দিয়েছিল। আবার ১৯৩০-৩৪ সালে যারা ঐ পন্থা অনুসরণ করে, তাদের সন্ত্রাসবাদী বলত। Anarchist বা Terrorist কথাগুলি এদেশের মুক্তি-সেবকদের পক্ষে ভাষার অপলাপ। অ্যানার্কিস্ট তো এরা ছিলই না, টেররিস্টও না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৯০৮ সালে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে Criminal Law Amendment Act পাস হয় এবং ঐ মাসেই কলকাতার 'অনুশীলন সমিতি' ও 'আত্মোন্নতি সমিতি' একই সময়ে বেআইনী ঘোষিত হল।

১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের নিম্নলিখিত সমিতিগুলিও বেআইনী ঘোষিত হয়—(১) অনুশীলন সমিতি (ঢাকা); (২) স্বদেশ-বান্ধব সমিতি (বরিশাল); (৩) ব্রতী সমিতি (ফরিদপুর); (৪) সুহৃদ সমিতি (ময়মনসিং) এবং (৫) সাধনা সমিতি (ময়মনসিং)।

'অনুশীলন সমিতি' বেআইনী ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পর, পৌরাণিক উপাখ্যানে দৈত্যের ভয়ে ভীত দেবতাদের গা-ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষার মতো, দৃঢ়চেতা ও দৃঢ়সংকল্পী সভ্যেরা আইনের চক্ষে দৃশ্যতঃ নির্দোষ বহু উপায় আবিষ্কার করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। তমলুকে সুরেনকে বহুদিন আগে লেখা আমার একখানা চিঠি তমলুকে সুরেনের বাড়ি খানাতল্লাশের সময় পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল সমিতির শাখা যেন ওখানেও বিস্তার করা হয়—এই কথা। সেখানি হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষ নথিভুক্ত করে দাখিল করে। সতীশ সেন ঐ মামলায় অভিযুক্ত বন্ধুদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ কি আছে তার অনুসন্ধান করতেন। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি দাগী হয়ে গেছ। লাইব্রেরি, পাঠচক্র, সেবা-সমিতি থেকে নিজের সম্পর্ক কাটিয়ে নাও। চুপচাপ কিছুদিন বসে যাও। তোমার উপর অতিশয় দায়িত্বসম্পন্ন কাজ আছে, তা নির্বাহ করার জন্য এরকম উপায় অবলম্বন দরকার।' বিষয়টা বুঝলাম। হঠাৎ তাই খুব অল্পসংখ্যক অন্তরঙ্গ সাথী ছাড়া, বন্ধুদের কাছে উদাসীন বনে গেলাম। 'সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েছি' এই কথা চালিয়ে দিলাম সাধারণ্যে। সাধারণ বন্ধুরা আমাকে টানতে চাইলে বলতাম—এসব করে কি আর হবে? অনন্ত শক্তিশালী ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য! তাকে ধানের ডগা দিয়ে উলটে দেব বললেই কি উলটানো যায়? তাছাড়া সাংসারিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আছে। সেগুলোকে অস্বীকার করে ক'দিন চলা যায়? অগ্রাহ্য করলেই তো সব অগ্রাহ্য হয়ে যায় না। অন্নচিন্তা চমৎকারা। বেশী ধরাধরি বা টানাটানি করলে বলতাম—মত যখন বদলে গেছে, তখন পথ অ-বদলানো কি করে থাকবে?

এ ভেল্কাটি বেশ কার্যকরী হল। যারা সরে পড়তে চাইছিল, তারা তখন আমাকে দৃষ্টান্ত করে নিজেদের দুর্বলতা চাপা দেবার সুবিধা পেল এবং সরে পড়ল। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা যে-কোনো সংগঠনের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ ও মারাত্মক।

এটাকে দূর করাই বুদ্ধির কাজ। তারা চলে যাওয়ায় সংগঠন শক্তিশালী হল। দ্বিতীয় লাভ এই হল যে, বন্ধুমহল যখন রটনা করেছে আমি আর এ-পথে নেই তখন বাইরের মহল বুঝল ব্যাপারটি সত্যি। ক্রমে সরকারের বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টিও তাই শিথিল হয়ে এল। তাদের সংবাদ-সংগ্রহের এও যে একটা ভালো উপায়।

ডাঃ আশুতোষ দাস তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তার আন্তরিকতা তাকে একটি খাঁটি মানুষ খাড়া করেছিল। অল্পবয়সেই সে হুগলি জেলায় অন্যতম নেতা হয়েছিল। তেমনি ছিলেন ফরিদপুরের বীরেন সেন। ভাঙা সমিতিকে জোড়া দিয়ে রাখায় এঁদের দুজনের এবং সতীশ সেনের হাত ছিল যথেষ্ট। বীরেনবাবু অসময়ে মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত কাজ কেউ পুরা করতে পারে নি। অর্থাৎ তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে পারে নি। পূর্ববঙ্গের কর্মীদের পশ্চিমবঙ্গে ঘোরানো এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের পূর্ববঙ্গে ঘোরানো ও পরস্পর পরিচিত করিয়ে দেওয়া ছিল এঁদের কর্মের কৌশল। এই অবসাদের সময় অধ্যাপক বিনয় সরকারের লেখা 'সাধনা' ও মাসিকপত্র 'গৃহস্থ' ভাব ও চিন্তার ধারা দিয়ে নিদাঘতপ্ত বোশেখ মাসের দিনে ঝারা দিয়ে তুলসীগাছ বাঁচানোর মতো কাজ করছিল। কর্মীদের সঞ্জীবিত থাকা সব অবস্থায় দরকার।

আশু দাস গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। চব্বিশ পরগণার শৈলেন ঘোষ পায়ে হেঁটে বদরি-কেদারনাথ ঘুরে এসেছিল। একটা কিছু ছুটি-ছাটা উপলক্ষ পেলেই সে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত গ্রামের দিকে। দুই বন্ধু সারাদিন কোনো মাঠে গিয়ে কাটাতাম। রাখাল বালকদের সঙ্গে আগে মিশতাম। তারপর তাদের সঙ্গে গিয়ে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে দেশের কথা কইতাম। আশু দাস শেষে দল বেঁধে গ্রামে অভিযানের ব্যবস্থা করল। কয়েকজন বন্ধু মিলে পায়ে হেঁটে বারাকপুর, বজবজ, আন্দুলমৌরি, শ্রীরামপুর, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, নৌকায় নতুন খাল ধরে আরও দূরে প্রচারকার্যে যাওয়া হত। এছাড়া লম্বা ছুটিগুলিতে নিজেদের জেলায় গিয়ে বা অপর জেলার বন্ধুদের গ্রামে গিয়ে প্রচার করা হত। হুগলি জেলার জিরেট-বলাগড়ে একবার বহু জায়গার বন্ধু একত্র হয়েছিলাম। শৈলেন, আমি, আশু—তিনজনই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। শৈলেন একবছর পড়ে আবার সাধারণ বিভাগে ফিরে আসে এবং রিপন কলেজে ভর্তি হয়।

দুটি বিশেষ কাজ আমরা আরম্ভ করলাম—একটি সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগ, অপরটি সংঘর্ষ বিভাগ। সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগে রইল—(ক) দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের উদ্যম ও উদ্যোগের লক্ষণগুলির পর্যবেক্ষণ। (খ) সরকারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভাগের সংবাদ। (গ) নিজেদের মধ্যে হতচ্ছাড়াদের (যারা খারাপ হয়ে গেছে তাদের) কার্যকলাপের সংবাদ। (ঘ) স্বীয় প্রদেশের

কোথায় কোন কর্মীসংঘ গড়ে উঠেছে তার সংবাদ। (ঙ) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনশীল সম্পর্কগুলির সংবাদ। কাতে কাতে মিল, কাতে কাতে অমিল ; তারা পরস্পরের কিরূপ অনিষ্ট করতে চায় ; তার থেকে ভারতের কিভাবে লাভ হতে পারে—তার গবেষণা।

আলিপুর বোমার মামলা এবং ঢাকা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার পর অখণ্ড দল আর রইল না। বিভিন্ন মণ্ডলীতে বিরাজ করতে লাগল আসল দল। নেতাদের মধ্যে জানাজানি কিন্তু রক্ষা হতে পেরেছিল।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে অনেক মালমসলা পাওয়া গেল।

সংগ্রাম বা সংঘর্ষ বিভাগ—আমাদের 'দুর্বল জাতি' সবল, শক্ত, অর্থসামর্থ্য-সম্পন্ন, বিশেষভাবে তৈরী প্রতিপক্ষের সঙ্গে কি করে লড়তে পারে তার চিন্তা, গবেষণা, সংবাদ-সংগ্রহ ও প্রস্তুতি ছিল একটা বিশেষ কাজ। এর মধ্যে আসে প্রতিপক্ষের সংগঠনের দুর্বল স্থানগুলি আবিষ্কার করা ; শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ—কি করে তার প্ল্যান বার করা যায় ; বিকেন্দ্রিক সংগঠন, নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন—এই সব। এইরূপে থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ অসুবিধার মধ্যে বাস করেও যারা সংঘর্ষ করেছে—সেইসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণীয় অংশ বেছে বার করা—বিদেশগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন, বিদেশে আশ্রয় ; সামরিক শিক্ষা এবং সরঞ্জাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি। বিদেশে লোক পাঠানো ছিল এই বিভাগের অধীনে।

এই সময় সকেন্দ্রিক ও বিকেন্দ্রিক সংগঠন সম্বন্ধে উভয় রকমের পক্ষ ও বিপক্ষ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়। সকেন্দ্রিক সংগঠনে নিয়মানুবর্তিতা ভালো গড়ে ওঠে এবং সংগঠনের সর্বত্র একরকম আইন-কানুন চালানো চলে। কিন্তু এর মারাত্মক দুর্বলতা—যদি কেউ নিজেদের মধ্যে কোনোরকমে খারাপ হয়ে যায় বা অন্য কোনো উপায়ে প্রতিপক্ষ এর অস্তিত্বের গন্ধ পেয়ে যায়—সবটাকে বা একটা বৃহৎ অংশকে উৎখাত করতে তার বেশী সময় লাগবে না। অন্ততঃ উৎখাত করা তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। বিকেন্দ্রিক সংগঠনের সুবিধা এই যে, যদি একটা দঙ্গল ধরা পড়ে সেইটেই ভাঙবে। বাকিগুলো বেঁচে যাবে। তার ফলে অনেকদিন ধরে সংঘর্ষ চালানো সম্ভব থাকবে। গুণ এইটেই। দোষ—এর সর্বাঙ্গীন নিয়মানুবর্তিতা একটু নীরেস হয়। কলকাতা ও তার আশেপাশে তীব্র নজর ছিল সরকারের। সেজন্য এদিকে বিকেন্দ্রিক সংগঠন রাখাই বাঞ্ছনীয় রইল।

পরে কিন্তু দেখা গেছে ঢাকা অনুশীলনের মতো সকেন্দ্রিক সংগঠনও সহজে ভাঙে নি।

শিখেদের ইতিহাসে এরূপ বিকেন্দ্রিক গঠনের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রকৃত জনযুদ্ধ এদেশে তারা ক'রে একটা উদাহরণ বা আদর্শ রেখেছে। শিখেদের দশম

গুরু গোবিন্দ সিংহ নির্দেশ দিয়ে যান যে তাঁর পর আর কেউ গুরু-পদ পাবে না। শিখ সম্প্রদায় দ্বাদশটি দল বা মিছিলে বিভক্ত হয়। তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক-নায়কহীন অবস্থায় গণতন্ত্র করেছিল। আহম্মদ শা আব্দালি কুড়ি বছরে নয়বার ভারত আক্রমণ করেন। পানিপথের যুদ্ধে দুর্ধর্ষ মারাঠাদেরও ধ্বংস করেন। কিন্তু শিখদের দমন করতে পারেন নি। তাঁর জীবিতাবস্থায় শিখেরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাঞ্জাবে স্থাপিত করেছিল।

একটা কথা এখানে প্রকাশ থাকা চাই। ১৯১০ সালে 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা'য় যখন পুলিনবাবু, ভূপেশ নাগ প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন, নির্দেশক মিত্রসাহেব তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করে মোকদ্দমা চালাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি নিজে গ্রেপ্তার হতে পারেন এমন জল্পনা-কল্পনাও চলছিল। এমন সময় সন্ন্যাসরোগে মাথার শির ছিঁড়ে তিনি লোকান্তরিত হন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমিতির যোগ এইভাবে ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর পরে সকেন্দ্রিক এবং বিকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

ঢাকার বন্ধুরা আগের মতোই সকেন্দ্রিক সংগঠনের পক্ষপাতী। দেখা গেল উভয়ের মধ্যে কতকটা সহযোগিতা রইল। কিন্তু দুদিককার সংগঠন পৃথক পৃথক ভাবে গড়ে উঠতে লাগল। ঢাকার সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তুলে, নতুন জীবন যিনি দিলেন তিনি নাম-যশকে ঠেলে দূরে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছেন। তাঁর সহকর্মীদের নাম অনেকেই জানে। কারু কারু নাম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সুবিদিত। কিন্তু তাঁর নামটা না-জানা অপরাধ মনে করি। তিনি প্রকৃত অনামী থাকতে চেয়েছিলেন এবং অনামী রয়েও গেছেন। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আজ তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর নাম নরেন সেন। এমন ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান, দেশপ্রাণ ব্যক্তি দেশে প্রকৃতই বিরল। ১৯১১ সাল থেকে দলে এঁর অভ্যুদয়। পুলিনবাবুর পর মাখনলাল সেন নেতা হন। তিনি বিবেকানন্দের পথে ফিরে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। গোড়ায় গোড়ায় বীরেনবাবু ও শশাঙ্ক হাজরার (অমৃত হাজরা) মারফত উভয় পক্ষের যোগ-রক্ষা হচ্ছিল। বীরেনবাবু মারা যাওয়ার পর শশাঙ্কবাবুর ভিতর দিয়ে যোগ রইল। পরে যোগসূত্র আরও অন্যান্য উপায়ে রাখা হচ্ছিল। বোধ হয় ১৯১৩ সালে বাংলা কাগজ 'স্বাধীন ভারত' নবগঠিত ঢাকা সমিতির চেষ্টায় গুপ্ত উপায়ে প্রকাশিত হল। আমাদের সতীশ সেন মহাশয় এই কাগজে লেখা দিতেন। 'গৃহস্থে'ও লিখতেন। আগেই ইঙ্গিত করেছি ১৯১১ সালের সময় থেকে পদ্মার এপার এবং ওপারে ক্রমশঃ সংগঠনটি একটার জায়গায় দুটো হয়ে গেল। স্বাধীন, পৃথক সত্তা অনুভূত হল। কিন্তু সাহচর্য ও সহযোগিতা যে একেবারে ছিল না তাও নয়। ১৯১৩ সালে দেখি অতুল ঘোষের মাধ্যমে দুই বঙ্গের দলে সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। আগেই বলেছি ১৯০৮ সালে ধরপাকড় সুরু হয়ে গেলে রাসবিহারী বসুকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে

দেবার বিধান হয়। 'যুগান্তর' কাগজ সম্পর্কে ইতিমধ্যে বারীনবাবু প্রভৃতি কর্মীদের নিয়ে দলের মধ্যে একটা 'দল' হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ 'অনুশীলন'-এর মধ্যে একটি নতুন দল গজিয়ে উঠেছিল। মাথার উপর অরবিন্দবাবু। প্রায় দেড়বছর বাদে বারীনবাবুরা বোমা-প্রস্তুতের জন্য চলে গিয়েছিলেন মুরারিপুকুরের বাগানে। তখন থেকে ঐ কাগজ নিয়ে ছিলেন কবিরাজ অনাথ রায়, কার্তিক দত্ত, নিখিল রায়মৌলিক, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা কাগজ চালাবার জন্য টাকা-পয়সা যোগাড় থেকে প্রেসের কাজ এমনকি কাগজ ফেরি পর্যন্ত করতেন। এ সময় অধিকাংশ লেখা দেবব্রত বসু, প্রেমতোষ বসু, সুরেন ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বড়াল (পরে আনন্দ আচার্য), ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীর ছিল। আমাদের বন্ধু সতীশ সেনও মাঝে মাঝে লেখা দিতেন। শোনা যায় ঐ সময় বারীনবাবু, উপেনবাবু লেখা দিতেন না।

১৯০৮ সালে সরকার আইন ক'রে প্রকাশ্যে কাগজ বের করা বন্ধ করে দেয়। ওদিকে গ্রেপ্তারও হতে থাকে। রাসবিহারী বসু ডেরাডুনে চলে যান ও পরে ওখানেই বন বিভাগের সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি বাংলায় আসতেন। রাসবিহারীকে সরানোর কারণ ছিল যে, তাঁর লেখা দুখানা চিঠি মুরারিপুকুর বাগানে তল্লাশির সময় ধরা পড়ে যায়।

১৯১০ সালে চন্দননগরে একটি দল গড়ে ওঠে। তার কর্ণধার ছিলেন মতিবাবু। রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ মতিবাবুর উপযুক্ত সহকর্মী হন। অরবিন্দের পালানোর সময় চন্দননগরে তাঁর প্রেরণায় এই সংগঠনটি দেখা যায়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুদের চন্দননগরের সঙ্গে যোগ রাখার আর একটা উপলক্ষ দাঁড়াল। চন্দননগরে অরবিন্দ শুধু মতিবাবুর কাছেই থাকেন নি—দক্ষিণ গোন্দলপাড়াতেও কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন। সেইখান থেকে নৌকাযোগে আগড়পাড়ায় অমরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় কলকাতা হয়ে পণ্ডিচেরি যান। ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ হলে এখানকার উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে অরবিন্দের সঙ্গে 'বন্দে মাতরমে'র লেখক হিসেবে পরিচিত হন। তারপর গোন্দলপাড়ার নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। এই-ভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয় গোন্দলপাড়ার সঙ্গে।

বিদেশে লোক পাঠানো দরকার। ভারতের সঙ্গে চীনের এবং ভারতের সঙ্গে শ্যামদেশের যোগ-স্থাপন প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এইজন্য ভারত-ব্রহ্ম, ভারত-চীন, ভারত-শ্যাম পায়ে হাঁটার পথ আবিষ্কার দরকার। সামরিক শিক্ষা দরকার। বিদেশে না গেলে তা হয় না।

তারক দাস আগেই আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। অধর লস্করও গিয়েছিলেন। পরে জিতেন লাহিড়ী, সত্যেন সেনও গেলেন আমেরিকায়। তৎপূর্বে ভূপতি মজুমদারকে আশুবাবুরা আমেরিকা পাঠান। তিনি ইউরোপের ভারতীয় বিপ্লবীদের

সহিত যোগাযোগ করতে না পারায় এবং অর্থসংকটে পড়ে কিছুকাল পরে ফিরে আসেন। ভোলানাথ চ্যাটার্জী যান পেনাঙ-এ। সেখানকার খবর নিয়ে ফিরেও আসেন। ১৯০৮ সালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যায় জাপানে। একবছর বাদে সে আমেরিকা যায়। ঐ ১৯০৮ সালেই ক্ষীরোদগোপালও বর্মায় আড্ডা জমান। শেষোক্ত দুজন আমার সহোদর।

কয়েকটি কারখানায় কিছু লোক ঢোকানো হয় কলকাতার বরফের কলে, জেসপ কোম্পানি, বার্ন কোম্পানি এবং আর কয়েকটি জায়গায়। উদ্দেশ্য কিছু তৈরী কারিগরের দল সংগঠন। ভোলানাথ চ্যাটার্জী পেনাঙ থেকে ফিরে এসে এক সাহেব কোম্পানির অফিসে মেকানিকের কাজ গ্রহণ করে। কোম্পানিটির নাম এখন ঠিক মনে নেই।

আমি এম. ডুলে অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকি। বিদেশী আমদানী-রপ্তানী কাজের জন্য এই কোম্পানির ইটালিয়ান, জার্মান ও জাপানী অফিসের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। কাশ্মীর, পাঞ্জাবের সদাগরদের সঙ্গেও এদের পশমী কাপড়ের কাজ ছিল। আমি রুশ-জাপান যুদ্ধ-ফেরত, জাপানী মিনাকাওয়া কোম্পানির ম্যানেজার (ক্যাপ্টেন) হাসাগাওয়ার সঙ্গে বেশ মিল করে নিয়েছিলাম। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর এই প্রথম জাপানী সদাগরী অফিস কলকাতায় দেখা যায়। হাসাগাওয়া বলত—গোলা-গুলী, বারুদ ছাড়া আর একরকমের নিঃশব্দে যুদ্ধ হতে পারে। তার শক্তিও অতি প্রচণ্ড। সে যুদ্ধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে হতে বাধ্য এবং তার থেকে গোলা-গুলীর যুদ্ধ ফুটে বেরুবে। হাসাগাওয়া যে নিঃশব্দ যুদ্ধের কথা বলেছিল তা হল তুলো, রেশম, লোহা, স্টীম ও ইলেক্‌ট্রিসিটির সংযোগ। এর নাম শিল্পরাজ্যের ওলট-পালট। শিল্পে ওলট-পালট হলে গ্রাসাচ্ছাদনের বিধি-ব্যবস্থা বদলে যাবেই—বদলে যাবে মানুষের স্বভাব-চরিত্র, ভাবাদর্শ। কলকারখানার সভ্যতা দুর্বল জাতদের প্রবলদের প্রতাপাধীন করে রাখছে। এ যুদ্ধ আরো নিষ্ঠুর। প্রাচ্য এ বিষয়ে পেছনে আছে। প্রাচ্যে একমাত্র জাপান আগামী বিপদের লক্ষণ ধরতে পেরেছে। তারা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য জাতিদের দূর করতে বদ্ধপরিকর। তারা তৈরি হচ্ছে শিল্প-বিপ্লব বা কলের সভ্যতা নিজেদের দেশে আনার জন্য। চীনের দুর্বলতা জাপানের পক্ষে মারাত্মক। এশিয়া বাঁচতে পারে যদি তারা রোগ বুঝে আগে থেকে প্রতিবিধান করতে পারে। প্রাচ্য কলের সভ্যতায় বড় হয়, পাশ্চাত্ত্য জাতরা এটা চায় না। চীনে জাপানকে দু'বার যুদ্ধ করতে হয়েছে। ১৮৯৪-৯৫ সালে একবার; ১৯০৪ সালে আর একবার। কারণ একই। চীনকে দুর্বল পেয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ইটালি, পর্তুগীজ, রুশ, মার্কিন ভাগাড়ে শকুন পড়ার মতো সেখানে জড়ো হয়েছে। জাপানকে আমেরিকা দাবাতে চেয়েছিল, পারে নি। এখন জাপানকে দাবাবার জন্য সবার দৃষ্টি খর হয়ে আছে। জাপানে বিদেশীদের যুদ্ধ এসে পৌঁছোবার আগে বাইরে যাতে শত্রুর মহড়া

নিতে পারে সেজন্য জাপান একটু জায়গা চীনে করে নিতে চায়। প্রথম যুদ্ধে ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন হারলেও পোর্ট আর্থারের বন্দর জাপানকে রাখতে দেওয়া হয় নি। ১৯০০ সালে বক্সার যুদ্ধে সাতটি পাশ্চাত্ত্য জাতে চীনকে আক্রমণ করে। তারপর সন্ধি হয়ে গেলেও রুশ পোর্ট আর্থারে বসে থাকে, ফিরে যাওয়ার নামও নেয় না। ঐখান থেকে কোরিয়া মেরে নিয়ে জাপানকে একটি কিস্তি দিয়ে মাত করবার মতলব। সেইজন্য 'অসম শক্তি' বুঝেও জাপানকে রুশের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। জাপানের 'বুশিদো' গুণে (রাজপুত চরিত্রের মতো) জাপান জয়লাভ করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জাতদের চক্রান্ত কী বিষম! জয়লাভের ফল তাকে ভোগ করতে দেওয়া হল না। চীনের হাতে পোর্ট আর্থার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছে। জাপানের এ দুঃখ চীন ও ভারতের বোঝা উচিত। ব্যবসার বাজার নিয়ে ইউরোপে একটা যুদ্ধ কয়েক বছর বাদে লাগবেই। কাঁচামালের আড়ৃত প্রত্যেক সাম্রাজ্যই যে চায়। এইখানে লাগছে ঝগড়া। পৃথিবীব্যাপী আগন্তুক যুদ্ধের সংবাদ প্রথম এখান থেকে আমি পাই। জার্মানি 'সডার স্মিট্ অ্যান্ড কোম্পানি'র অফিসে জার্মানি ও ব্রিটিশ বাণিজ্য বিষয়ে অপ্রিয় পরিণাম রেষারেষির কথা জানতে পারি। অবশ্য জার্মানি সাহেব মুখে কোনো কথা বলে নি—তাদের দেশী কর্মচারীরাই বলত।

আমি আমার শিক্ষার জন্য এম. ডুলে কোম্পানির অফিস ছাড়া একটি মনিহারী দোকানেও কাজ শিখি। বিনা বেতনে দোকানদারের বিক্রি বাড়াতে সাহায্যকারীর কাজ শিখতাম। কলেজের অবকাশগুলি আমি এই রকমে কাজে লাগাতাম। সমিতির গুপ্ত বিভাগের অন্তরতম পর্যায়ে প্রবেশের আগে আমরা নিজেদের উপর একটা পরীক্ষা চালিয়েছিলাম—(ক) ভয়কে অগ্রাহ্য করার পরীক্ষা; (খ) নিজের ছ'মাসের খরচা নিজেকে রোজগার করার কাজ। ছেলে-পড়ানো বা কেরানীগিরি না করে কিন্তু সে টাকা রোজগার করতে হবে। বাঙালীরা ঐ দুটোতে গতানুগতিকতা রেখেছে বলেই তো অর্থনৈতিক জগতে তারা ধ্বংসোন্মুখ। আমি ফেরিওয়ালার কাজ করেছি—দোকানে-দোকানে মাল গছিয়ে দিয়ে আসতাম। বিক্রি হয়ে গেলে টাকা নিয়ে মহাজনকে দিলে, কমিশন পেতাম। কতকগুলো জায়গায় নগদ বিক্রি হত। এর পরে অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ শিখে নিয়ে তাও করেছিলাম। ছ'মাসের পরীক্ষা প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে, সমিতির তহবিলে অর্থ দেবার জন্য চার বছর ঐ সব কাজ করেছিলাম। ঐ কাজের জ্ঞান—সস্তায় কেনার মোকামের ঠিকানা ও যথেষ্ট লাভে বেচার বাজার বার করার বিচারের উপর নির্ভর করত।

সাহস পরীক্ষার জন্য আমাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র বা তার অংশ দিয়ে শহরের নানা জায়গা ঘুরে আসার নিয়ম করা হয়েছিল। অস্ত্র ও গুপ্ত পুঁথিপত্র সাবধানে রাখাও একটা পরীক্ষা ছিল।

আমি জীবনে এইরকম দুটো সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। ১৯০৬ সালে লোকে যাতে স্বদেশী জিনিষ বেশী-বেশী ব্যবহার করে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে ধনগোপালের আবিষ্কৃত পথটিকে একটু বদলে নিয়েছিলাম। ধনগোপাল বিপিন পালের বা আর কোনো স্বদেশী বক্তার সভায় মাঠে দেশী মোজা-গেঞ্জি নিয়ে বসত। বক্তৃতায় শ্রোতারা মেতে উঠলে তাদের নজর পড়ানো হত দেশী জিনিষের দিকে। 'স্বদেশী জিনিষ কিনে দেশমাতার বুকে বল দিন, নেতাদের মুখরক্ষা করুন'—হাঁকলে লোক এগিয়ে আসত এবং কিছু মাল খরিদ করত। কখনও বলা হত—'আপনারা যে আর গোলাম বাঙালী থাকতে চান না, তার পরিচয় দিন।' লোকে এসে জিনিষ কিনত। ধনগোপাল এর থেকে কিছু লাভ করত না। শুধু স্বদেশী প্রচার ছিল তার কাজ। মহাজনের মালের বদলে তার টাকাটা পেঁাছে দিতে হত। সে সময় দেশপ্রেমের কী দৈন্য অবস্থা তা এর থেকে বোঝা যায়। আমিও স্বদেশী মোজা-গেঞ্জি বেচে কমিশন নিতাম না। কমিশন নিতাম দেশী বোতাম, চিরুনি এবং জাপানী লেড-পেন্সিল, ছাতার বাঁট, সাবানাদি বেচে (সেই টাকা সমিতিকে দেওয়া হত)। তখনও এগুলি দেশে তৈরি হত না বলে এশিয়াবাসীকে ভারতের পরই স্থান দেওয়া হয়েছিল। একটি দোকানে আমি ঐ জিনিষগুলি দিয়ে আসতাম। ক্রমে নজর পড়ল সে অঞ্চলের লোক ততটা দেশী কাপড়-চোপড় ব্যবহার করছে না। আমি চিরুনি-বোতামের সঙ্গে কিছু ব্যাঙ্গালোরের দেশী গেঞ্জি আমার পরিচিত দোকানদারকে গছিয়ে দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। দোকানদার জিজ্ঞেস করল—ওগুলিতে কত কমিশন পাবে? বললাম, কিছুই পাব না। দোকানদার অবিশ্বাসের হাসি হাসল। শেষ পর্যন্ত আমাকে মিথ্যাবাদী বলল। তাতেও আমি কমিশন পাব স্বীকার না করায় দোকানদার চটল। বলল—সত্যিকথা বললে অপর মালের সঙ্গে এগুলিও সে রাখত। কিন্তু ব্যবসাদারের সঙ্গে ব্যবসাদার হয়ে মিথ্যাচার করায় সে কোনো মালই নেবে না। কোনো মাল নিল তো নাই, অধিকন্তু পাশের দোকানদারটিকে ডেকে বলল, 'সেনমশাই, এই দেখুন একটি নিঃস্বার্থ, পরোপকারী লোক! মাল গস্ত করছে অথচ বলছে একপয়সাও কমিশন নেব না। আমি আজ কোনো মাল রাখলুম না। আপনিও এর কাছ থেকে কিছু নেবেন না। দেখি ওর নিঃস্বার্থ পরোপকারী দৌড় কতখানি!'

মনমরা হয়ে ফিরলাম। দেশী কাপড়-চোপড় এমনিই তো বিলাতী জিনিষের চেয়ে বেশী দামী ছিল। তার উপর কমিশন দিতে হলে মহাজন জিনিষের দাম আরও বাড়াবে। ফলে লোকে দেশী জিনিষ কম কিনবে। এই বিচারে কমিশন নিতাম না।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটুকু আরও মজার। বৌবাজার স্ট্রীটে শিয়ালদহের কাছে একটি মুসলমান দোকানদার ছিলেন। সেখানেও মাল দিতে যেতাম। তিনি নগদ দামে

জিনিষ নিতেন। সে ভদ্রলোক একদিন কথা পাড়লেন, 'আপনি তো জাপানী অফিসে যাওয়া-আসা করেন? আমার একটা খবর জেনে আসবেন তো।' এর পরের দিন খবরটি না আনলে ভবিষ্যতে মাল নেওয়া বন্ধ করে দেবেন। ব্যাপারটি অতি সামান্য। মোটেই গুরুতর নয়। তিনি শুনেছিলেন জাপানের মিকাডো (রাজা) নাকি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন। মিকাডো মুসলমান হয়ে গেলেই ইসলাম স্টেট রিলিজন (রাষ্ট্রিক ধর্ম) হয়ে যাবে। বড় আনন্দের ব্যাপার! কিন্তু গোল বাধছে কোথায় তা তো দোকানদারসাহেব ন্যায়বিচার করে দেখছিলেন না। একজন অতি সামান্য ফেরিওলা, পারিবারিক সুনামের সাহায্যে মহাজনের কাছে ধারে সওদা পাচ্ছিল—জাপানী সম্রাটের ও জাপানী পররাষ্ট্র বিভাগের অতি প্রয়োজনীয় গুপ্ত খবরটি এ গরীব কি করে পেতে পারে? তবু সাহসে ভর করে হাসাগাওয়াকে কথায়-কথায় একদিন এ-কথা বলেছিলাম। হাসাগাওয়া হেসে কুটি-কুটি। খবরটি সম্পূর্ণ বাজে বলে উড়িয়ে দিল এবং সতর্ক করে দিল ভবিষ্যতে যেন এভাবে তার সময় নষ্ট না করা হয়।

ভাবী যুদ্ধের কথা ঃ চাঁদনিতে এক বড় দোকানদার হালিম ব্রাদার্স আমাকে বলেছিল যে একটা মস্ত যুদ্ধ আসছে। সেটা জার্মান ও ইংল্যাণ্ডে হবে। তার খবরের মূলে হচ্ছে তার দোকান। জামায় মেয়েরা যে আই-হুক বা টিপকল ব্যবহার করেন, জার্মানরা খুব সস্তায় তা দিত। এক বিলাতী কোম্পানির সাহেব সেই জাতীয় আই-হুক বেচতে আসে। দোকানদার নমুনা পছন্দ করে। কিন্তু দামে পড়তা পড়ে না। ইংরেজ সাহেব বলে, দেড় টাকা গ্রোস। দোকানদার নিজের সঞ্চয় থেকে নমুনা দেখায় এবং সাহেবকে বলে, সে কী দরে তা নিতে পারে। সাহেব জিনিষ দেখল। তাও ভালো। অবশেষে দোকানদার যখন বলল যে, সে একটাকা গ্রোসে সাহেবকে বেচতে রাজী আছে—সাহেব তখন কোথাকার মাল জিজ্ঞাসা করল। দোকানদার বলল, জার্মান মাল। বারো আনায় গ্রোস কেনা তার। ইংরেজ সাহেব রাগে গরগর করে উঠল; বলল, 'জার্মানরা মানুষ নয়, কুলী।' তার মানে ওদের বাজার থেকে না তাড়ালে মঙ্গল নেই। সাহেব দোকান থেকে উঠে চলে গেল। দোকানদার এই থেকে সাব্যস্ত করেছিল মাল-বেচা নিয়েই দুটো জাতে একদিন ঠোকাঠুকি লাগবে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসাবে আমি কিছু আইরিশ, ফরাসী ও জার্মান সাহেব-রোগীর সংস্পর্শে আসি। আইরিশটি জানায় একটা বড় যুদ্ধ আসছে। যুদ্ধের কথা ওঠে ১৯১১ সালে পারস্য দেশ ভাগাভাগি নিয়ে। উত্তরের এক-তৃতীয়াংশ এসে গিয়েছিল রুশের প্রভাবে। সুতরাং ইংরেজও দক্ষিণের এক-তৃতীয়াংশটি টেনে নিয়ে এল নিজের প্রভাবের মধ্যে। শাহ্ মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। মুসলমানদের

মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। বহু হিন্দু নেতা মুসলমান ভাইদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে অনেক প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা দেন ও ইংরেজের সাম্রাজ্য-লোলুপতাকে নিন্দা করেন। ১৯১১ সালে ইটালি আফ্রিকায় ত্রিপোলি তুর্কের হাত থেকে কেড়ে নেয়। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ হয়। তুর্কীর বিরুদ্ধে গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া দাঁড়ায়। তখন আর একবার মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হল। নেতা লিয়াকৎ হোসেনসাহেব এক জনসভায় বলেছিলেন, 'ইউরোপ্‌মে আগ্‌ লাগ্‌ যায়গি' (ইউরোপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে)। তুর্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ হল—বলকান দেশগুলি তুর্কীর অধীনতা মুক্ত হল। ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ তুর্কীর প্রতি বিরূপ দেখা গিয়েছিল। হিন্দুরা সহানুভূতি দেখাল। এ সময় আইরিশটি আমাকে বলে, 'কয়েক বছরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ ইউরোপে হবে। তুর্কীর লোকেরা নিজেদের সাম্রাজ্য রাখতে না পেরে জার্মানির সঙ্গে জুটবে। জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সঙ্গে নেবে। বলকান নিয়ে রুশ ও জার্মান-অস্ট্রিয়ার মধ্যে ঝগড়া বাধবে, কে বলকান জাতদের মাথা বা মুরুব্বি হবে এই নিয়ে। ইংল্যাণ্ডও জড়িয়ে যাবে। তবে ইংল্যাণ্ডের দিকে জগতের আর সব জাত আসবে। শেষ পর্যন্ত জার্মানরা হারবে।' আইরিশটি মনে মনে ইংরেজের পরাজয় কামনা করলেও মুখে আইন বাঁচাল। কিন্তু পরে জানা যায় ইংরেজ-আইরিশের বিরোধে সে ইংরেজ-বিরোধী। কিন্তু অন্যে আক্রমণ করলে সে ইংরেজ-সমর্থক।

জার্মানিটি বলেছিল ইংরেজ-ফরাসী জার্মানির সমৃদ্ধিতে বাধা দিতে চায়। আঠারো-ঊনিশ শতাব্দী থেকে পৃথিবীতে একটা নতুন আশা এসেছে। আগে রাজা, উচ্চ-বংশের লোকেরা, ধর্মযাজকেরা এবং ধনী সদাগররা সব দেশে শক্তি ও স্বামিত্ব ভোগ করত। সাধারণ লোক মানুষের মধ্যে গণ্য হত না। কলকারখানা হবার পর সাধারণ লোকের মধ্যে শক্তির নেশা জেগেছে। তাদের পয়সায় রাষ্ট্র চলে। সুতরাং তাদের প্রতিনিধির মত নিয়ে করলব্ধ রাজস্ব খরচ করতে হবে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুঃখদৈন্য দূরের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। চাষী ও মজুরেরা জেগেছে। গণতান্ত্রিকতার চাহিদা আসছে ও এসেছে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে শ্রমজীবীদের কদর বাড়তে বাধ্য। প্রতি দেশে আভ্যন্তরিক অশান্তি এদিক থেকে বাড়ছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জাতে-জাতে ব্যবহারে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। ইংরেজ পৃথিবীটা গ্রাস করে বসে আছে। জার্মানিকে ইউরোপ বা ইউরোপের বাইরে সে বাড়তে দিতে চায় না। জার্মানির জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। তার ছড়িয়ে-পড়ার জায়গা চাই। ইংরেজ ও ফ্রান্স ছড়াতে দেবে না। তাই বাধবে যুদ্ধ। ইংরেজ সাম্রাজ্য তার ফলে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তবে সে যুদ্ধ আসতে দেরি আছে।

ফরাসী লোকটি আমাকে একদিন ইংরেজীতে লেখা একটি মাসিক পত্রিকা দেখায়।

তাতে এরোপ্লেনকে গোলা মেরে ধ্বংস করার চিত্র ছিল। সে লোকটি আভাস দেয় যে, জার্মানি ভারী পাজী জাত। ছল খুঁজে ফ্রান্সের সঙ্গে ঝগড়া করে। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের কথা বলল। জার্মানি ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছে। ফ্রান্সও প্রতিবিধানের কথা ভাবছে। জার্মানি গোপনে এরোপ্লেন দিয়ে ফ্রান্সকে জখম করবে ভাবছে। ফ্রান্স সে-বিষয়ে সজাগ। জার্মানির মতো ফ্রান্সেও বাধ্যতামূলক সমর-শিক্ষা প্রবর্তিত হচ্ছে।

ইংরেজরা এরকম আলাপ নিজের থেকে করত না। তারা ভারতের কালা আদমির সঙ্গে এরকম আলাপ করা বোধ হয় সম্মানহানির বিষয় মনে করত। আমি নিজেও সাবধান থাকতাম এ-ব্যাপারে।

যা হোক, একটা বড় গোছের যুদ্ধ যে আসবে বছর দশেক বাদে এরকম আন্দাজ কর্মীরা পেল। সেই সময় তাদের কর্তব্য কী হবে, এই নিয়ে চলল দু'তিন জনের মধ্যে আলোচনা। এই বিভাগ ছিল যাদের বিশেষ বিষয় তারা ছাড়া আর কেউ তাতে যোগ দিতে পারত না। এতে ছিলাম আমি, বিনয় দত্ত, আশু দাস ও সতীশ সেন। বন্ধুদের ঐকান্তিকতায় এটা হয়ে পড়েছিল আমার বিশেষ দায়িত্বের বিভাগ।

যুদ্ধটি বুঝতে গিয়ে লড়াইকে এদেশ-ওদেশের বাদী-প্রতিবাদীদের কেচ্ছা হিসেবে না-দেখে সব জিনিষটি কোন্ শক্তি হতে উদ্ভূত, তার গতি কোন্ দিকে, তার লক্ষ্য কী এবং কোথায় সে কিভাবে অপ্রত্যাশিতরূপে নতুন শক্তির খেলা জাগাতে পারে—এসব সম্ভাব্য পরীক্ষা করা ছিল এই বিভাগের কাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কমিটি এই বিষয়ে যতদূর সম্ভব মাথা খাটাত। আমার বন্ধুদের অবদান অসামান্য।

ইতিহাসকে এই নজরে দেখতে গিয়ে কর্মীরা যা বুঝেছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যাচ্ছে—

প্রাচ্যদেশে সভ্যতার প্রথম বিকাশ : ভারতে সামাজিক সংস্থাপন ও বিন্যাসের প্রয়োজনে 'শ্রেণী'র উদয় হয়। সমাজে নিজেদের মধ্যে অসম বা বিসম প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'শ্রেণী'র সৃষ্টি হয়। এক একটা কাজ, কারু বা শিল্প নিয়ে এক একটি 'শ্রেণী' গড়ে ওঠে। 'শ্রেণী' সভ্যদের বা শ্রেণীর লোকেদের কাছে পরিবর্তনীয় ছিল। একহাজার বছর পূর্বেও শোনা যায় কামার হতে পারত কুমার। কুমার হতে পারত যোদ্ধা। যোদ্ধা হতে পারত পুরোহিত। পুরোহিত হতে পারত ব্যবসায়ী। এরপরে এল 'শ্রেণী'র মধ্যে ধনী-নির্ধনের অসমতার বিরোধ। তখন ব্যবস্থা হল একান্নবর্তী পরিবার। যার যেমন ক্ষমতা, সংসারের খরচ সে সেই মতো দেবে। যার যেমন দরকার, সে সেই মতো নেবে। এরপর লোকসংখ্যা

বুদ্ধির সঙ্গে প্রতিযোগিতা কঠোরতর হল। এ পদ্ধতিতে তখন আর কুলোয় না। বুদ্ধ এলেন। তিনি সংঘের ভাবাদর্শ দিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। সব সম্পত্তি সমাজের হবে। সমাজ প্রয়োজন মতো ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করবে। তিনি সংঘগুলিতে এ নিয়ম চালিয়ে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ সাধারণ হিসাবে এ ব্যবস্থা নিতে পারে নি তখন। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল কৃষি ও কারুর উপর। বুদ্ধের মাথা থেকেই দুনিয়ায় প্রথম বেরোয় সমাজের সমৃদ্ধ অবস্থায় সংঘ-জীবনের (Commune) কথা।

চীনে 'রাষ্ট্রের অধীনে সম-সমাজবাদ' উদ্ভূত হয় প্রথমে। রাষ্ট্র প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করে দেয়। অ-চাষীরা জমি রাখতে পারত না। শিক্ষা ও নীতি বজায় রাখার জন্য নতুন ব্যবস্থাও হয়। সেখানেও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা স্থাপিত হয় কৃষি ও কারুর উপর। এদিক থেকে সভ্যতা ক্রমে পশ্চিম দিকে যায়। মোটামুটি সভ্যতার রূপ এখান থেকে বাকিদের নেওয়া।

বিশেষ বা খাস একটি সভ্যতা পশ্চিমদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেটি এগিয়ে আসছে প্রাচ্যদেশগুলির দিকে। হাতের-শিল্পের জায়গায় এল কলের শিল্প। এতে পুরাতন ভাবাদর্শ বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলতে আরম্ভ হয়েছে। কৃষিকেও কলের-কৃষিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সমাজে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কলের-শিল্পের আস্তানায় টেনে আনা হচ্ছে। প্রাচ্য থেকে ঢেউ গিয়েছিল। সমুদ্রের পাড়ে ঢেউ লেগে সে যখন ফেরে, সে ফেরাটাও একটা শক্তি। সেও সক্রিয়। প্রতীচ্যের পাড়ে ঢেউ লেগে তট-ধোয়া বহুকিছু সে নিয়ে ফিরছে। প্রাচীর বুকে এসে সে শান্ত হবে। তখন হয়তো প্রাচী থেকে আবার একটা নতুন ঢেউ উঠতে পারে।

পাশ্চাত্যের এই ঢেউয়ের নাম 'সাম্রাজ্যবাদ'। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ একটা ধারাবাহিক জিনিষ। এর আরম্ভ পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্তুগালের ও স্পেনের লোকেদের সাগরপারের নব নব অভিযানে। এই শক্তির খেলা আজও ফুরায় নি। এরই সঙ্গে সমুদ্রমন্থনে-ওঠা রত্নের মতো পাওয়া যাচ্ছে জাতীয়তা ও গণতন্ত্র। যত যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে ঐসময় থেকে, সেইগুলিকে সমুদ্রমন্থন হিসেবে দেখলে সমগ্র মানব-সমাজের ইতিহাসে একটা সমগ্রতা ও সাদৃশ্য উপলব্ধি হবে। এভাবে দেখতে হলে স্থানীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনার পারম্পর্য অনুধাবন করতে হবে। এ যেন মানব-স্বভাবের ছবি তুলি দিয়ে আঁকতে বসা হয়েছে। কেউ কোনো একটা অঙ্গ থেকে সুরু করেছে—কিন্তু শেষে সবটা মিলে পুরো ছবিটা হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনগুলি বিশেষ করে লক্ষণীয়। বিজ্ঞানের প্রসারে ধর্মের ও আচারের পরিবর্তন, জাতীয়তার উধায় সংন্যস্ত রাষ্ট্র এবং স্বাদেশিকতা—এইসব ওপারের ঢেউয়ের সঙ্গে এদিকে এগিয়ে আসছে।

রাজাদের স্বৈরাচার কমে এসে সদাগরদের স্বৈরাচারের যুগ এসেছে। ব্যবসা ও কাঁচামালের বাজারের জন্য এই বাবুরা যুদ্ধের পর যুদ্ধে মানবজাতিকে জর্জরিত করেছে। সুতরাং কঠিন রোগের ওষুধও হচ্ছে কঠোরতর। বিপ্লবের ঢেউও ঐ দেশগুলি থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিলাতে দুটো বিপ্লব হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় বিপ্লবের ঝড় বয়। আমেরিকার তেরো বছর বাদে ফ্রান্সে বড় জোর বিপ্লব বাধে। তার প্রভাব ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে আসে। ইংল্যান্ডে আরব্ধ শিল্প-বিপ্লব বা কলের সভ্যতা এগুলির তলে তলে আরও বহু বিপ্লব জগতে আনছে।

রাষ্ট্রনৈতিক ও শিল্পসংশ্লিষ্ট পরিবর্তনকে বাধা দিতে গিয়ে তাদের শক্তিকে ইউরোপীয় রাজনীতিকরা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

নতুন জাতীয়তা ও গণতন্ত্রবোধ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি হয়ে রুশে পেঁছায়। তুর্কী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির অধীনে জাতগুলি এর থেকে 'মাত' বা উন্মাদনা পায়। ইংল্যান্ডের অধীনস্থ আয়ার্ল্যান্ডে ও অন্যান্য ব্রিটিশ অধিকারে সে-সব প্রেরণা ও উৎপ্রাণনা আসছে। আফ্রিকা, ভারত তথা এশিয়াতেও এর ফলাফল ঘটা অবশ্যম্ভাবী।

এক কথায় বলা যায় এটা গণতন্ত্রের যুগ। গণতান্ত্রিকতার তলে লীলা করছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার দ্যোতনা। রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার প্রতিটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী অবশ্য আছে।

বর্তমানকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে নিকট ও দূর অতীতের ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া উচিত। তাহলে ধরা পড়বে আমরা যা করেছি এবং আর যা করতে যাচ্ছি তার সবটাই প্রয়োজনের তাড়নায়। তার সবটার পেছনে একটা 'কেন'র উত্তর আছে। দেশবাসী মানে বুঝতে হবে সাধারণ লোক। বাছা বাছা কতকগুলি লোকের সমষ্টি নয়। তারা এক সময়ে যে সমাজ-ব্যবস্থায় ছিল এখন তাদের তাতে সুবিধা হয় না, পোষায় না। তারা একদিন রাজভক্ত ছিল। কিন্তু এখন কেন তা থাকতে চাইছে না? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ইতিহাস। রাষ্ট্রের লাগামটি নিজহাতে না পেলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না ব'লে গণতন্ত্রের স্রোত, গণের নিজস্ব বলির সাহায্যে, এগিয়ে আসছে পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রাচ্যে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা শক্ত। কিন্তু গণতন্ত্র এলেই হল না। তাকে গণের সেবায় নিযুক্ত করা চাই। সেইটিই একটি কঠিনতর আর অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্রত।

এখানে আরও দেখা যায় মধ্যযুগে রাজাদের স্বেচ্ছাচার ছিল। কিন্তু সব সময় সেটা স্বৈরাচার হতে পারত না। লোকেদের সভা বা সম্মেলন মাঝে মাঝে হত। তারা

সিম্ধান্ত দিয়ে রাজাকে করা হত নিয়ন্ত্রিত। রাজার বাঁধাধরা বরাবরকার সৈন্যবাহিনী (standing army) থাকত খুব কম। আপদ উপস্থিত হলে সামন্তরা লোক জুটিয়ে নিয়ে আসত। তাছাড়া, রাজা ও প্রজার অস্ত্রশস্ত্রে তারতম্য বিশেষ কিছু ছিল না। তলোয়ার, বল্লম, লাঠি, তীর-ধনুক যে ইচ্ছা সংগ্রহ করতে পারত। তেমন-তেমন অপ্রিয় অবস্থা হলে প্রজারা করত বিদ্রোহ। কিন্তু পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থাটা গেল বদলে। এ সময় পুরো যথেচ্ছাচারিতা দেখা গেল রাজাদের ভিতর। বারুদের আবিষ্কার হচ্ছে একটা মস্ত কারণ। কামান ও গোলন্দাজ রাজারা রাখতে পারত। সাধারণ প্রজারা এর থেকে থাকত বঞ্চিত। এই সময় সাগরপারের দেশগুলিতে ব্যবসা করতে চলল বহু সদাগর। তারা চাইত রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা। তাতে তাদের আদায়পত্র ও বিদেশের একচেটিয়া বাণিজ্যে সুবিধা হত। ধর্মযুদ্ধ এদেশে-সেদেশে হওয়ায় রাজাদের হাতে প্রজারা শক্তি তুলে দিতে বাধ্য হল। রাজার যথেচ্ছাচার এবং সাগরপারের ব্যবস্থা একত্র হওয়া মানে পৃথিবীতে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ বৃদ্ধি।

পর্তুগাল ও স্পেন নানা নতুন দেশ আবিষ্কার করে। আবিষ্কারের দাবি দেখিয়ে তারা কতকগুলি দেশ নিজেদের রাজ্য বলে কুক্ষিগত করে বসল। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল টেনে নিল পর্তুগাল। স্পেন তেমনি জমকে বসল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, মেক্সিকোতে, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ও ফিলিপাইনে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড চক্ষুলজ্জা ছেড়ে, স্পেনের দাবি অমান্য করে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করল।

হল্যাণ্ড, আফ্রিকা, ভারত, ভারত-দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রাজিল থেকে হটালো পর্তুগালকে।

অর্থাৎ এই শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন ও পর্তুগালের জাতীয়তা-গন্ধী পাঁচটি রাষ্ট্র উপনিবেশ-অধিকারে পরস্পরের বিরোধী হয়ে উঠল। এর থেকে যুদ্ধের সূত্রপাত। সে যুদ্ধগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকখানি জুড়ে ছিল। সে রোগ এখনও সারে নি।

উপনিবেশের এত দরকার হয়েছিল কেন? উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ, ধন আহরণ, অন্য দেশে ধর্মপ্রচার, যোগ্যতমের জয়ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কশাঘাত এবং মাতৃভূমিকে সবার সেরা দাঁড় করানোর ইচ্ছাই ছিল কারণ।

একচেটে ব্যবসা এবং অনুন্নত দেশ লুট করে পুঁজি সংগ্রহ করে কলের সভ্যতা ফলাও করা এসময়কার একটা প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই লুটের টাকা হয় পুঁজিপতির স্রষ্টা এবং পুঁজিবাদের চালক ও প্রতিপালক। স্পেন পেয়ে গিয়েছিল

আমেরিকার সোনা-রূপার খনির উপর আধিপত্য। পর্তুগাল পেয়েছিল প্রাচ্যদেশের মসলার ব্যবসার একচেটিয়াত্ব। প্রাচ্যও প্রকারান্তরে ছিল সোনা-রূপাপ্রসবী। কাজেই লুব্ধ হল অন্য দেশেরা এদের পদাংকানুসরণে। কপাল ভাঙল দুর্বল অনগ্রসর আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার। ইউরোপীয়রা সবাই চাইত পাকা মাল বেচে কাঁচা মাল কিনে আনবে। সর্বদা মোটা গোছের মুনাফার পরিমাণ তাতে এদের হাতে আসবে।

এর জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের নৌ-বিভাগ মজবুত করা দরকার হল। তবেই দেখা যাচ্ছে 'ইউরোপীয় বেনিয়াতি' হচ্ছে যথেচ্ছাচারিতার একটা প্রকাণ্ড বহিঃপ্রকাশ—দূরপ্রসারিত-বাহু।

যথেচ্ছাচারিতা ধ্বংস করতে হলে, এই জাতগুলোর পরস্পরের কলহের সুযোগ নেওয়া পরাধীন জাতদের অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

১৯১০ সালে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে চীনেদের মধ্যে দু'একটি চীনা যুবককে দেখা গেল টিকি-কাটা। চীনেদের মাথায় আপাদলম্বিত বেণী থাকত। হঠাৎ টিকিহীন লোক দেখে আমি এর কারণ নির্ণয়ে মন দিলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল টিকিটা গোলামির চিহ্ন। মাণ্চুরা চীন দখল করলে চীনাদের বেণী ধারণ করা রেওয়াজ করে দেয়। মাঞ্চুরা বেণী রাখত না। জেতা ও বিজিতদের তারতম্য এই দিয়ে হত। কে একজন সান্-ওয়েন চীনে উঠেছে। সে দল করেছে এবং সবাইকে টিকি কেটে ফেলতে বলেছে। বুড়োরা আর এ বয়সে বদলাবে না। যুবারা টিকি ফেলে দেবে। এই সময় চীন ও ইংরেজে মনের অনৈক্য হয়েছিল সীমান্ত-প্রদেশের সীমানা নিয়ে। দালাইলামা চীনের ভয়ে ভারতে পালিয়ে আসেন। দার্জিলিং ও কলকাতায় বাস করেন। চীনারা খবর নিত লামা কোথায়? তাকে পেলে নাশ করে দেবে। ১৯১১ সালে চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন তার নেতা। সান্-ওয়েন ও সান-ইয়াৎ-সেন একই লোক।

১৯০৮ সালে 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলন হয়। পুরাতন বাদশাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আনোয়ার বে ছিলেন এদের বড় নেতা। তরুণ তুর্কীরা তাদের আহত জাতীয় অভিমানকে আবার বড় করার জন্য উঠে-পড়ে লাগল।

পর্তুগালেও একটা রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। রাজা বিতাড়িত হন। সেখানে সাধারণ গণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীন, পর্তুগাল ও তুর্কী এই তিন জায়গায় একরকম বিনা রক্তপাতে বিপ্লব সাধিত হয়। তিনটি জায়গায় সৈন্যদের বিপ্লবীরা হাত করেছিল। এটা একটা নতুন কৌশল। সময়ের গুণে দেশগুলির লোকেরা এই কৌশল অবলম্বন করে। ১৯০৫ সালে রুশ রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টায় বিপ্লবীরা কিছু সৈন্য হাত করে। এটির ফলে রুশে একটা সংস্কার হয়—'ডুমা' বা পার্লামেণ্ট।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৯১২ সাল হবে। সিলেট জেলায় মৌলবীবাজার সাবডিভিসনে স্বামী দয়ানন্দ প্রেমধর্মে জগৎ জয়ের আশায় জগৎশীতে 'অরুণাচল' আশ্রম খোলেন। এঁদের ভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কিছু লোক মেয়েদের নিয়ে ওখানে যেতে আরম্ভ করেন এবং কেউ কেউ সপরিবারে থাকা সুরু করেন। ক্রমে এঁদের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিছু লোক এঁদের সাধনের অনুষ্ঠানের কোনো-কোনো অংশ অপছন্দ করেন। সরকারের কাছে খবর পেঁাছোল এঁদের বিরুদ্ধে। সরকার এখানে রাজনীতির গন্ধ পেলেন। একদিন সদলবলে পুলিস-ফৌজ আশ্রমে চড়াও হয়। আশ্রমবাসীরা বাধা দেন। সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। আশ্রমবাসীরা লাঠি-ত্রিশূল চালান। পুলিস গুলী করে। দেশপ্রিয় মহেন্দ্র সিং গুলীর আঘাতে মারা যান। তিনি সপরিবারে ওখানে থাকতেন। পরে আশ্রমের লোকদের নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। তাঁদের মাটিতে ফেলে ঘেঁষড়ে বা ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মেয়েরাও নির্যাতিতা হন। আশ্রম বেআইনী ঘোষিত হয়। স্বামী দয়ানন্দ ও আরও কয়েকজনের জেল হয়। অরুণাচল আশ্রম রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হয়। বহু হিন্দু সরকারী এই চণ্ডনীতিতে উত্ত্যক্ত হন। প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি অনেকের মনে জাগে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডনসাহেব অরুণাচল আশ্রম আক্রমণের হুকুম দিয়েছিলেন। তাঁকে পূর্ববঙ্গের 'অনুশীলন সমিতি'র তরফ থেকে বোমা-মারার চেষ্টা করা হয়। ২৭শে নভেম্বর, ১৯১৩ সালে যে মারতে গিয়েছিল (যোগেন চক্রবর্তী), অসময়ে বোমা বিস্ফোরণে সে নিজেই মারা যায়। সাহেবের উপর আক্রমণের আর একটা চেষ্টা হয়। তাও বিফল হয়। গর্ডনসাহেব সতর্ক হন। পরে পাঞ্জাবে বদলি হয়ে যান। ১৯১৩ সালের ১৭ই মে তারিখে গর্ডনকে মারবার জন্য বসন্ত বিশ্বাস লাহোর লরেন্স গার্ডেনে এক বোমা রেখে যায়। তাতে একটি দরোয়ান মারা পড়ে।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সালে পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লী দরবারের ব্যবস্থা হয়। শোভাযাত্রা করে যাওয়ার কালে রাসবিহারীর ব্যবস্থায় বোম নিক্ষেপ হয়। বড়লাট হার্ডিঞ্জ আহত হন। মারা যায় এক ভারতবাসী। বড়লাট রোগশয্যা থেকে আদেশ দেন দোষীকে খুঁজে বার করা হোক—নির্দোষদের যেন ধরপাকড় না করা হয়। সেদিনকার দরবার লাট-কাউন্সিলের মেম্বার স্যার গাই ফিটউড উইলসনকে দিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

বহু জায়গায় আততায়ী বা আততায়ীদের নিন্দাও করা হয়। বড়লাটকে সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য সভা করা হয়। বিশেষ করে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় তাঁর ঠাণ্ডা মেজাজের জন্য। এইরকম একটি সভা ডেরাডুনেও আহূত হয়েছিল। রাসবিহারী

বসু খুব প্রাণ খুলে সেখানে আততায়ীদের নিন্দা আর লাটসাহেবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। খোঁজ দিয়ে দোষী বা দোষীদের ধরিয়ে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এরূপ ইস্তাহার প্রকাশ হয় সরকারের তরফ থেকে।

পুলিসী তদন্তে দিল্লীর আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ প্রভৃতি ধরা পড়ে। কলকাতার রাজাবাজারে অমৃত হাজরা ধরা পড়ার সময় এক সাংকেতিক লিপ্টে আমিরচাঁদ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এখানে ষড়যন্ত্র মামলা হয়। দীননাথ অ্যাপ্রুভার হয়। সে দিল্লীতে বোমার সম্পর্কে রাসবিহারী বসু ও বসন্ত বিশ্বাসের নাম করে। বৃদ্ধ আমিরচাঁদের পোষ্যপুত্র সুলতানচাঁদ বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়।

রাসবিহারীকে ধরার জন্য মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। বসন্ত গ্রেপ্তার হয়ে যায়। তার 'লাহোর বোমার মামলা'য় ফাঁসি হয়। বসন্তের ভাই মন্মথ বিশ্বাস রাসবিহারীর সঙ্গে জোটে। রাসবিহারী জাপানে গেলে সে আমাদের সঙ্গে থাকে। অমরদাদের শ্রমজীবী সমবায় এই দুই ভাইকে দেশের কাজে নামায়। এদিকে আমিরচাঁদেরও ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯১৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফাঁসির দিন ধার্য হয়। রাসবিহারী ঠিক করেন ঐ দিন অমৃতসর থেকে কলকাতা পর্যন্ত সৈন্যবিদ্রোহ করিয়ে আমিরচাঁদকে মুক্ত করে নেবেন।

যা হোক, ক্ষণ বুঝে বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদীদের বড় সাধে বাদ সাধল। এত আড়ম্বর করে নতুন রাজধানীতে রাজপ্রতিনিধির সোৎসব-প্রবেশ বাধা পেল। এতে ভারতীয় জনগণের আনন্দবর্ধন হল আর প্রতিপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

পূর্ববঙ্গে আবার সুরু হল রাজনৈতিক ডাকাতি। 'স্বাধীন ভারত' ও 'লিবার্টি' এই পত্রিকা দুটি গোপনভাবে প্রকাশিত হত। বর্তমান শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে এতে লোককে উত্তেজিত করা হয়। 'স্বাধীন ভারত' অনুশীলনের কাগজ, 'লিবার্টি' রাসবিহারীর। বরিশালে একটা আড্ডা ধরা পড়ে। বহু লোক ও কাগজপত্র সরকারের হস্তগত হয়। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরে আনা হয়। তাদের উপর 'প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের হয়। ১৯১০-১৯১৩ পর্যন্ত যে-সব ঘটনা ঘটে তাই নিয়ে 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' হয়। এতে ছাব্বিশজনের বিচার হয়—দুজন হয় অ্যাপ্রুভার। ১৯১৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি রায় বেরোয়। ১৯১৫ সালে দ্বিতীয় মোকদ্দমা হয়। তার রায় ১৯১৭ সালে বেরোয়। যে-সব কাগজ হস্তগত হয় তাতে সংগঠন-প্রণালীর কথাও কিছু পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ আচার্য অ্যাপ্রুভার হয়। কিছু লোক কারারুদ্ধ হয়, কিছু লোকে ছাড়া পায়। প্রথম মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন রমেশ আচার্য, নরেন সেন প্রভৃতি।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' পরে হয়। প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও মদন ভৌমিক এতে আসামী হন। দায়রায় এঁদের

দ্বীপান্তর হয়। অবশেষে হাইকোর্টের আপীলে প্রথম দুজন মুক্ত হন।

১৯১৩ সালে 'রাজাবাজার বোমা মামলা'য় অমৃত হাজরা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। আলিপুরে বিচার হয়। আসামীদের দ্বীপান্তর ও কারাবাসের আদেশ হয়।

আমরা যে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমিতি-দুটিকে এক করবার চেষ্টা করছিলাম তা শশাঙ্কবাবুর (অমৃত হাজরা) গ্রেপ্তারে পণ্ড হল।

দেশে বাধার উপর বাধা সমুপস্থিত। এই সময়, ১৯১২ সালে বিদেশ থেকে আশার একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিল। সে হচ্ছে গান্ধীজির দক্ষিণ আফ্রিকায় 'নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ আন্দোলন'। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা ভারতবাসীর সঙ্গে হীনভাবে ব্যবহার করত। তার প্রতিবাদে গান্ধীজির নেতৃত্বে ঐ আন্দোলন। আমাদের দেশে কত দলাদলি—হিন্দু, মুসলমান, নরম দল, গরম দল ইত্যাদি। কিন্তু ওখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী এক নেতার অধীনে কাজ করছেন। পুণা থেকে গোপালকৃষ্ণ গোখলে কলকাতায় গান্ধীজির সাহায্যার্থে চাঁদা তুলতে এলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি বন্ধু দেখা করলেন।

সতীশ সেন আমাদের বোঝালেন দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য চাঁদা তোলা উচিত। আমরা বুঝলাম, যদি গান্ধীজি দেশে আসেন তাঁর নেতৃত্বে জনজাগরণের কাজ খুব ভালো হবে—প্রকাশ্য আন্দোলন বলশালী হবে। আমরা চাঁদা তুলে গোখলের হাতে দিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ সারা হলে গান্ধীজি যাতে ভারতে আসেন তাঁকে গান্ধীজিকে সেরূপ অনুরোধ জানাতে বললাম।

সতীশ সেন 'গৃহস্থ' পত্রিকায় এই মর্মে গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রশংসা করে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধও লেখেন।

এই বছর ঢাকার সঙ্গে মিলতে না পেরে যা বিষম ক্ষতি হল তা বলেছি। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে লাভও কিছু হল—যেমন অনেক নতুন বন্ধু।

খুলনার দৌলতপুর কলেজের ছাত্ররূপে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও তার সঙ্গীদের আমরা পেলাম। খুলনা-যশোহরে কাজের সুবিধা বেড়ে গেল। ভূপেনের বুকটা যেমন প্রশস্ত মনটা তেমনি উদার। গঠনশক্তিও চমৎকার। মুখে সর্বদাই সরল মিষ্ট হাসি।

বরিশালের মনোরঞ্জন গুপ্ত ও তার বন্ধুদের পেয়ে দল পুষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহের শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র আচার্যও তাঁর সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে এসে গেলেন। এখন শুনতে পাই সুরেন ঘোষ এবং নরেশ চৌধুরী কলকাতার মেসে ১৯১২ সালে থাকাকালে অতুল ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন—তার ফলে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কিন্তু কাজে যুক্ত হন আমার সঙ্গেই। আমরা এর ফলে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে বেশ প্রসারলাভ করলাম। কারণ উত্তরবঙ্গে আগে থেকে যতীন রায়, সতীশ সরকার

অবিনাশ রায় প্রভৃতি ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বহু দেশপ্রেমিক পুলিনবাবুর নেতৃত্ব মানতে পারেন নি। তাঁরা কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে কলকাতায় আসেন। এরই ফলে নতুন দল গড়ে ওঠে।

মাদারিপুরের স্বনামধন্য বিপ্লবীনেতা পূর্ণ দাসও ক্রমে এসে জুটে গেলেন। অতুল ঘোষ তাঁকে আমাদের মধ্যে আনেন।

১৯১৪ সালে চিৎপুর ও গ্রে স্ট্রীটের চৌমাথার কাছে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর নৃপেন ঘোষকে ঢাকা দলের বিপ্লবীরা গুলী করে। সেই মামলায় নির্মলকান্ত রায় গ্রেপ্তার হয়। পুলিস হাতে-নাতে আততায়ীকে ধরেছে মনে ক'রে গড়ের মাঠে একটা দরবার করে। বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল পুলিস ও অপর ব্যক্তি যারা নির্মলকান্ত রায়কে ধরতে সাহায্য করেছিল তাদের পারিতোষিকস্বরূপ অর্থাদি বিতরণও করেন।

পরে কলকাতা হাইকোর্টে দায়রা-বিচার হয়। ব্যারিস্টার নর্টন, সি. আর. দাশ, জে. এন. রায় এবং লোকেন পালিত আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। সরকারী সাক্ষ্য-প্রমাণে গলদ বেরিয়ে পড়ে। জুরি আসামীকে নির্দোষ বলেন। জুরি ছাড়লেও জজ ছাড়েন না। পুনর্বিচার তিনি বিশেষ জুরির সাহায্যে করেন। তাতেও জুরি আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ আবার বিচার করতে চান। এই ব্যাপারে দেশের মধ্যে হুলুস্থূল পড়ে গেল। সরকারের তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেল, অথচ যার জন্য পুরস্কার সেই হল নির্দোষ! অবশেষে গভর্নমেণ্ট মামলা প্রত্যাহার করেন—মুক্তিলাভ করে নির্মলকান্ত। সেদিন নর্টনের জনপ্রিয়তা কে দেখে! বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে সাময়িকভাবে তাঁর স্তাবক বেশি হয়ে গিয়েছিল। সরকারপক্ষ থেকে 'আলিপুর বোমার মামলা' করার দরুন তাঁকে পুলিস পাহারা নিয়ে চলতে হত—এই মামলার ফলে তিনি বেপরোয়া ঘোরাফেরা করতে পারতেন।

আমাদের দলের দেবেশ ঘোষের দোকানের সামনে এক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়। দেবেশকে পুলিস সাক্ষী মানে। কিন্তু দলের কথায় দেবেশ আসামীকে সনাক্ত করে নি।

এরপর মুসলমানপাড়া লেনে গোয়েন্দা বিভাগের ডি. এস. পি. বসন্ত চাটার্জীর বাড়িতে বোমা পড়ে। বসন্তবাবু বেঁচে যান। তাঁর আরদালি শিউপুজন সিং মারা যায়। নগেন সেন নামে একটি ছাত্র আহত অবস্থায় কিছুদূরে পড়ে থাকে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার নামে মামলা দায়ের হয়। সেও কলকাতা হাইকোর্টের দায়রায় খালাস পায়। নগেন সেন আহত অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থাকাকালীন তার ঘা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ওষুধ প্রয়োগ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ভার

আমার উপর পড়ে। তাকে অনেক উৎসাহ দিই। সতর্ক করে দিই পুলিসকে যেন কিছু না বলে।

পুলিস এসব কাজের জন্য দায়ী করে ঢাকার 'সমিতি'র লোকদের। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের সহায়তা ও সহযোগিতা ওঁরা বরাবর পাচ্ছিলেন। নিজেদের বোমায় কালীবাবু (কালী মৈত্র) আহত হন। তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার আমরা করি। অতুল ঘোষের দাদা অঘোর ঘোষ তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। তিনি অস্ত্রোপচার করেন, আমি ক্লোরোফর্ম দিই। পরে প্রত্যহ আমি ঘা ধোয়া-বাঁধা করতাম। আগেই বলেছি মিত্রসাহেব লোকান্তরিত হবার পর সমিতি দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সহযোগিতা কোনোরকমে চলতে থাকে পদ্মার ওপার এবং এপারের বন্ধুদের মধ্যে। এখন থেকে অতুল ঘোষ ছিলেন সম্পর্ক-বজায়ের লোক। আমি কারুর সঙ্গে মিশতাম না। তবে নির্মলকান্তের মোকদ্দমায় ও মুসলমানপাড়ার বোমায় আহত বিপ্লবীকে আমায় সাহায্য করতে হয়েছিল—এ কথা পূর্বেই বলেছি।

১৯১৪ সালে জার্মানি প্রথম বেলজিয়াম আক্রমণ করে। তারপরেই ৪ঠা অগস্ট জার্মানির সঙ্গে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রুশের যুদ্ধ ঘোষিত হয়। বিলাতের পররাষ্ট্র সচিব এডওয়ার্ড গ্রে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই তিন জাতের মধ্যে মৈত্রীর সন্ধি স্থাপন আগেই করে রেখেছিলেন।

২৬শে অগস্ট কলকাতায় রডা কোম্পানির চার গাড়ি মসার পিস্তল ও কার্টিজ লুট হয়। এই প্রথম জানানো হল যে এদিককার বিপ্লবীরা কাজে নামছে। শ্রীশ মিত্র বা হাবু, হরিশবাবু, অনুকূলবাবু, বিপিনবাবু, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত প্রভৃতি এতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমার ও আশু দাসের (পরে ডাক্তার) যোগ ছিল বিপিনদার সঙ্গে। রডার মাল সরানোর জন্য আমারও ডাক পড়ে। আমি কুড়িটি মসার পিস্তল এনে নরেন ভট্টাচার্যকে রাখতে দিই। এখন জেনেছি আমাদের বরিশালের বন্ধুরা—নরেন ঘোষচৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতিও মাল সরানোয় সহায়তা করেন। সেদিনের ঘোষচৌধুরী এক অসাধারণ কর্মী ছিলেন। মনোরঞ্জন চিরদিন মাথা-ঠান্ডা চৌকস লোক। যুগান্তর দলের বলিষ্ঠ স্তম্ভ হিসাবে মনোরঞ্জনের স্থান অতি উঁচে। তাকে 'নতুন যুগান্তর দলে'র একজন উঁচুদরের প্রতিষ্ঠাতা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। ওদিকে বরাহনগরে এক পুরুতের কাছে বিপিনদার এক কর্মী বারোটা পিস্তল রাখেন। সে ভদ্রলোক পরে ভয় পেয়ে সেগুলো গঙ্গায় ফেলে দেবার কথা ভাবছিলেন। সংবাদ পেয়ে নরেন সেগুলোও এনে রাখে। বড়বাজারে একটা গুদামে অনেক কার্টিজ রাখা হয়। পুলিস সেগুলো আবিষ্কার করে ফেলে। একটা মামলা দায়ের হয়। তাতে অনুকূলবাবু, হরিদাস দত্ত প্রভৃতি আসামী হন। একটি মুটের সনাক্ত করার উপর সব নির্ভর করছিল। বিখ্যাত ধনী

কেশোরাম পোদ্দারের বড় ভাই কালুরামকে আমি ধরি। তিনি সাক্ষীটিকে অন্যত্র সরিয়ে দেন। তবুও চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অনুকূল মুখার্জী, গিরীন্দ্র ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের বিচার হয়। হরিদাস দত্ত, ভুজঙ্গ ধর, কালিদাস বসু ও নরেন ব্যানার্জীর কারাদণ্ড হয়। বিপিন গাঙ্গুলী ফেরার থাকেন—সরকার ধরতে পারে না। এই মসার পিস্তলগুলি বিপ্লবীদের প্রকৃতই শক্তি বৃদ্ধি করে এবং দেশে চাঞ্চল্য ও উৎসাহের সঞ্চার করে। অস্ত্রের ক্ষুধায় কর্মীরা কত ক্লেশ ভোগ করছিল—রডার অস্ত্র লুণ্ঠন দুর্ভিক্ষের দিনে যেন মস্ত এক আহার্য-সংগ্রহ। এখানে বিপিনদার মহত্ব বর্ণনাতীত।

ইতিমধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় যেসব লোককে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা দেশের সাহায্যার্থে ওদিকে বন্দোবস্ত পাকা করেছিলেন। সত্যেন সেন, পরে জিতেন লাহিড়ী সব সন্ধান ও ব্যবস্থার খবর নিয়ে আসেন। জিতেন লাহিড়ী জার্মানিতে গিয়ে বার্লিন কমিটির কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। দু'জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র আমেরিকা থেকে আসবে, এই খবর আসে। কাউণ্ট বার্নস্টফ ওখানে সব ঠিক করছিলেন গদর পার্টির সঙ্গে। গদর পার্টি ও বাংলার প্রতিনিধিরা সমান অধিকার পায়। বার্লিন কমিটির ধীরেন সরকার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন দাশগুপ্ত, শ্রীশ সেন বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইউরোপে সুরেন কর এবং বীরেন চট্টোপাধ্যায় পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। বার্লিন কমিটিতে বরকৎউল্লারও খুব প্রতিপত্তি ছিল। ওখানকার সঙ্গে নিরপেক্ষ দেশের মারফত আমেরিকার সঙ্গে যোগ থাকে। ধীরেন সরকার ইতিপূর্বে আশাপূর্ণ একটা চিঠি লেখেন।

আগেই বলেছি সুরেন করের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল। সতীশ সেন এই যোগাযোগ করে দেন। পরে সুরেন কর বৃন্দাবন প্রেম মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন ও সেখান থেকে আমেরিকা হয়ে জার্মানি যান। জার্মানিতে বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সুরেনের মিলন ঘটে। জার্মানির India Committee থেকে আমেরিকার মারফত আমাদের নিকট খবর পেঁছায়, সেই সঙ্গে জার্মানির সাহায্য পাওয়ারও আশা পাওয়া যায়। সতীশ সেনই খবরটি আমায় দেন।

এই খবর পাওয়ার পর বাংলার সব দলগুলি মিলিত হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হন। কেবল ঢাকার দলটি এই আয়োজনে অংশ নিতে অস্বীকার করে।

ঢাকার দল এই বন্দোবস্তে না-এলেও চন্দননগরের মারফত রাসবিহারীর সঙ্গে যোগ রেখেছিল। আমরাও স্থির করেছিলাম যে, অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদেশ থেকে পেঁছে গেলে এই বন্ধুদের সাহচর্য ও সহযোগ পাওয়া যাবে।

ভোলানাথ চ্যাটার্জী চট্টগ্রাম পাহাড়তলি কারখানায় কাজ নিয়ে যায়। সেখানে সে কিছু কারিগরদের মধ্যে একটি দল খাড়া করে। বর্মায় ছিলেন ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় মিক্‌টিলায় এবং যতীন হুই রেঙ্গুনে। আর কিছু লোক ছিলেন এঁদের সঙ্গে।

সত্যেন সেন ১৯১৪ সালে সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে দেখা করে। তিনি পরামর্শ দেন চীনের আদর্শে কাজ করতে। সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যাওয়া ছিল তাদের প্রথা। আরও একটা কথা বলেন—পারতপক্ষে দেশ ছেড়ে না-পালিয়ে দেশে কাজ করতে করতে মরলে দেশহিতৈষণার দিক থেকে দেশ খুব উর্বর হবে। এটা মস্তবড় লাভ মনে করে কাজ করতে হবে।

এর ভিতরের কথা এই যে, অন্যান্য দেশের বিপ্লবীরা দেশ থেকে তাড়া খেয়ে পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে আশ্রয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে। ভারতে অবস্থা অন্যরূপ। ইংরেজ তো শত্রু। ফরাসী ও পর্তুগীজরাও আশ্রয় দিতে চায় না। তাই চীনে আশ্রয় নিলে কেমন হয় জানতে চাই।

ফেরবার পথে ননী ডাঙা পথে শ্যাম থেকে বর্মায় ও চট্টগ্রাম হয়ে দেশে ফেরে। ভোলানাথ জাহাজে আসে। পেনাঙ পেঁছালে এমডেন-এর গোলাবর্ষণ সে দেখতে পায়। এমডেন ছিল জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ। তার সৈন্যেরা রোমাঞ্চকর বহু দুঃসাহসিক কাজ করে প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে। মাদ্রাজে গোলাবর্ষণ করেছিল এরাই।

পূর্বে বলেছি ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে 'কোমাগাটামারু ব্যাপার' হয়। বজবজেতে শিখরা ট্রেনে চড়তে অস্বীকার করে। উভয়পক্ষে হয় সংঘর্ষ। দুই দিক থেকেই গুলী চলে। সরকারী পক্ষ প্রবল থাকায় জিতল। বহু শিখ হতাহত হল। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বহু শিখ এসেছিল। তাদের নেতা গুরুদিৎ সিং ও আরও কয়েকজন পালান। শোনা যায় মজঃফরপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মনসুখানি এঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং গ্রেপ্তার হন। ইনি পরে হয়েছেন স্বামী গোবিন্দানন্দ। সিন্ধুপ্রদেশের কংগ্রেসের কাজে এঁর খুব কৃতিত্ব হয়েছিল। আমাদের কলকাতার সংঘ শিখদের সাহায্য করে। এ কাজে অগ্রণী ছিলেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশীতে শচীন গড়ে তোলে কলকাতা অনুশীলন সমিতির শাখা। শচীন সান্যাল ১৯১৩ সালে কলকাতায় আসে। সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে। ভূপেন দত্তের মারফত তার ঢাকার দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ১৯১৪ সালে শচীন আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করার জন্য দেখা করে। নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু) প্রভৃতি আরো কয়েকজন ঢাকা অনুশীলনের সভ্য শচীনের সঙ্গে জোটেন। আমার সঙ্গে

সাক্ষাতের পর শচীন রাসবিহারীর সঙ্গে যতীন মুখার্জীর পরামর্শের ব্যবস্থা করে।

আলাদা আলাদা কাজের আয়োজন বেশ জম্‌কে উঠছিল। এখন প্রয়োজন হল এগুলিকে সমন্বিত করার। কাশীতে আলাপ আলোচনা সফল হল। যতীন্দ্রনাথ বাংলার বিশেষ ভার নেন। রাসবিহারী ভার নেন ইউ. পি. ও পাঞ্জাবের। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'উত্থানের দিন' ধার্য হয়। ঐ দিন পাঞ্জাব মেল রাসবিহারীরা আট্‌কে দেবেন এবং সেইটেই হবে বিদ্রোহের সংকেত। পাঞ্জাব মেল এসে না পেঁছালে বুঝতে হবে পাঞ্জাবে অভ্যুত্থান হয়েছে। সেই বুঝে বাংলাও কাজ সুরু করে দেবে।

যতীনবাবু বাংলায় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। বিনয়ভূষণ দত্ত ভীমরাও এবং বীর সাভারকরের ভ্রাতা ডাঃ সাভারকরের সঙ্গে মিলে মহারাষ্ট্রে কেন্দ্র খোলেন। সে সময় ডাঃ সাভারকর কলকাতায় মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। খিদিরপুরের স্কুলমাস্টার আশুতোষ ঘোষ পাঞ্জাবের সঙ্গে আর একটা আলাদা যোগ রাখেন। অর্থাৎ রাসবিহারীর সঙ্গে যোগ নষ্ট হলেও তখন ঐ দ্বিতীয় সূত্রে কাজ হবে। তখন যে ভারতীয় সৈন্য কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে ছিল তাদেরও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার ব্যবস্থা হয়।

সত্যেন মিত্র, পরে যিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হন, নাগপুরের সঙ্গে যোগ রাখেন। ১৯০৭ সালে ওখানে জোর আন্দোলন হয়। শ্রীঅরবিন্দ নিজে নাগপুরে গিয়েছিলেন। বাংলা ও মারাঠীদের মধ্যে সখ্যসূত্র গড়ে ওঠে। ১৯১৫ সালে শচীন সান্যাল নলিনী মুখোপাধ্যায়কে ওখানে পাঠায়। 'যুগান্তর'-সম্পর্কীয় কর্মীরাও ওখানে একটা সংঘ গড়ে।

নোয়াখালি, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, হাওড়া, হুগলি, বরিশাল, ময়মনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, নদীয়া, খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, গোয়ালপাড়া (আসাম), দিনাজপুর, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র ছিল। ক্রমে সংগঠন অন্যান্য জায়গাতেও বিস্তারলাভ করে। আগে থেকেই চন্দননগর নিজেই একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। বর্মা ও শ্যামে শাখা স্থাপিত হয়। কাশীতে 'যুগান্তরে'রও নিজস্ব একটা কেন্দ্র ছিল (শচীন সান্যালের দল ছাড়া)।

ব্যবস্থা হয়েছিল আমেরিকা থেকে জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আসার। 'ম্যাভেরিক' ও 'অ্যান লারসেন' মাল আনবে ঠিক থাকে। আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগ, বিশেষতঃ নৌ বিভাগকে এড়িয়ে আসতে চারদিন দেরি হয়ে যায়। পথে পিছু-লাগা সামরিক বিভাগের জাহাজকে ফাঁকি দিতে গিয়ে স্যান-ডেমিঙ্গোতে ম্যাভেরিক বিলম্ব করতে বাধ্য হয়। বহু ইস্তাহার এদের সঙ্গে ছিল। পথে যে আকস্মিক কারণে দেরি হয়ে যায় তার ফলে পাইলটের সাহায্য মেলে না। প্রশান্ত মহাসাগরে আসতে আসতে

'ম্যাভেরিক' সম্বন্ধে মিত্রশক্তি সন্দেহ করে। ওদিকে ফরাসী আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বিভাগ আমেরিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। তার ফলে ভারতে রাজ্যরক্ষা আইনে খুব ধরপাকড় সুরু হয়। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান ও ডাচেরা সাগরে পাহারা দিচ্ছিল। 'ম্যাভেরিক' ধরা পড়া যখন অবধারিত দেখে তখন কাগজপত্র, সামান্য যা-কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল সে-সব সমুদ্রজলে ফেলে দিয়ে জাভায় চলে যায়। সেখানে ডাচেরা লোকজন-সুদ্ধ জাহাজকে অবরুদ্ধ করে 'অ্যানি লারসেন' ভারতে পেঁছোতে পারে নি। হেরম্ব গুপ্ত, ফন্ বোয়েম ছাড়া তারক দাসেরও ঐ সঙ্গে আসার কথা ছিল। (এই খবরটি আমি 'Strait Settlement Gazette'-এর এক সংখ্যায় পাই। সেটি যতীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিই। বালেশ্বর যুদ্ধের পূর্বে ঐ স্থানে খানাতল্লাশিতে সে কাগজটা ধরা পড়ে।)

যতীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় প্রথমে কলকাতাতে সরকারী ব্যবস্থাকে অকিঞ্চিৎকর করে তোলার একটা মতলব হয়। কলকাতায় বিপ্লবীরা জোর দেখাতে পারলে সরকারী মর্যাদা সারা দেশে কমবে। এখানে প্রথমে মোটর ডাকাতি হয়। ১৯১৫ সালের ১২ই জানুয়ারি গার্ডেনরিচে দিন দুপুরে বার্ড কোম্পানির টাকা কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর হয় বেলেঘাটায়। তারপর করপোরেশন স্ট্রীটে, গ্রে স্ট্রীটে, টালায় এবং পরে আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে। ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জী, গিরীন চ্যাটার্জী, মধুসূদন ভট্টাচার্য এবং গোয়েন্দা নীরদ হালদার নিহত হয়েছিল। দিনের বেলায় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে হেদুয়ার কাছে সুরেশ মুখার্জী এবং মেডিকেল কলেজের কাছে মধুসূদন আক্রান্ত হয়। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহেও এইরকম কিছু ঘটনা ঘটে। কলকাতায় Flying Squad, Armoured Car-এর সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা হল। বড় রাস্তাগুলিতে ড্রপ-গ্রেট করা হল—রেল-লাইন বন্ধ করার যেরূপ লোহার পাল্লা খাড়া রাখা হয় ঠিক তেমনি। থানায় সাইরেন বসানো হল। কলকাতা থেকে উত্তর ও পূর্ব দিকে খাল পার হবার যত পোল আছে—চিৎপুর, টালা, বেলগেছে, মানিকতলা, নারকেলডাঙা ও হাওড়ার পোলে সশস্ত্র প্রহরী দেওয়া হল। যাকে-তাকে এবং যে-কোনো গাড়িকে ধরে তল্লাশ করা হতে লাগল।

এ ছাড়া মফস্বলের জেলাগুলিতেও এই ধরনের কাজ কিছুটা চলল। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' পুনর্জীবিত হল। 'Administration Report' ইংরাজীতে প্রকাশিত হতে লাগল। 'যুগান্তরে' স্পষ্ট লেখা হতে লাগল এই বিপ্লবের রূপটা কী।

জনসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার অর্জিত হবে। রাষ্ট্রের সর্বশক্তির উৎস হবে জনসাধারণ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এলেই জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পুনর্ব্যবস্থান হবে। এরাই হবে প্রভু, মালিক, সর্বশক্তির ও জাতীয় সম্পত্তির অধিকারী। জীবনে আনন্দ ফুটে উঠবে। সবাই সমান সুবিধা পাবে। এদিকে

ন'দে জেলার প্রাগপুর, শিবপুর নামক স্থান দুটিতে ডাকাতি হয়। উভয়পক্ষে খুব যুদ্ধ হয়। একটি বিপক্ষীয় লোককে উধাও করে আনা হয় এবং তাকে চরম দণ্ড দেওয়া হয়।

'Administration Report'-এর (স্বদেশী সরকারের কাজের বিবৃতি) এক সংখ্যায় রাজনৈতিক ডাকাতি কেন করা হয় তার একটা কৈফিয়ত দেওয়া হয়। বলা হয় সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার সহজেই খাজনা আদায় করে। কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে কি করে? জোর করে টাকা আদায় করে। সে অবস্থায় লুট-তরাজ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমাদের দেশীয় সরকার এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সেজন্য বলপূর্বক কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এগুলি যুদ্ধকালীন ঋণ বলে গণ্য হবে। দেশবাসীরা এটিকে এই চক্ষে দেখলে ভুল করবেন না।

মনে সন্দেহ জাগায় যে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি ফাঁস হয়ে গেছে—সেই জায়গায় তাই ১৯শে অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করা হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারির জন্য কর্মীরা অপেক্ষা করছে। ওদিকে পাঞ্জাবে সর্বনাশ হয়ে গেল। কৃপাল সিং বিশ্বাসঘাতক হয়ে আনারকলি গলির বাড়িতে এবং মুচিপাড়া গলির বাড়িতে রাসবিহারী, পিংলে ও কর্তার সিংকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পিংলে ও রাসবিহারী পালান। কর্তার সিং ও বাকিরা ধরা পড়ে। 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' হয়। সেপাই, বে-সেপাই বহু লোকের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও জেল হয়। কর্তার সিং-এরও ফাঁসি হয়।

রাসবিহারী পাঞ্জাব থেকে কাশীতে চলে আসতে বাধ্য হন। পিংলেকে পাঠান মীরাটে। শেষ আশা—সেখানে যদি কিছু করতে পারে। পিংলে যায়। সেপাইরা রাজী হয়। পিংলে ব্যারাকে রাত্রে থেকে যায়। সকালে উত্থান হবে। কিন্তু আকস্মিকভাবে রাত্রে এক অফিসার পিংলেকে দেখতে পান এবং সন্দেহ করেন। রাতারাতি গোরা সৈন্যরা ম্যাগাজিন-এর ভার ও চাবি নেয়। সকালে দেশী সেপাইরা ও পিংলে গ্রেপ্তার হয়। পিংলের ফাঁসি হয়। রাসবিহারী বাংলায় ফিরে আসেন। অবশেষে ১২ই মে জাপান চলে যান। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি অসুস্থ থাকায় আমার জায়গায় যতীনলোচন মিত্র দেখা করে তাঁর সঙ্গে।

১৯১৫ সালে জুলাই মাসে একদিন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় আমার বাড়িতে আমাদের কার্যোপলক্ষে পরামর্শ করতে আসে। আমরা গোপনে কথা কইছিলাম। এমন সময় একজন নতুন আগন্তুক আমাদের বাড়িতে ভোলানাথকে খোঁজ করে। বড়ই কুলক্ষণ। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। আগন্তুক একদম অচেনা। ব্যাপার ভারী বিশ্রী লাগল। তাকে ভাগাবার চেষ্টা খুঁজতে লাগলাম। বললাম ভোলানাথ নামে কেউ এখানে থাকে না। আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটি তো ফিরলই না, অধিকন্তু ভোলানাথের সম্বন্ধে আরো খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমিও কাটানো জবাব

দিলাম। এমন সময় দেখি পকেট থেকে রুমাল বার করে একটা বিশেষ রকম ভাঁজ করল। আমি হাত দিয়ে রুমাল স্পর্শ করতেই এক সাংকেতিক বাণী তার মুখ থেকে নিঃসৃত হল। বুঝলাম আমাদের লোক, শ্যামদেশ থেকে এসেছে। ভিতরে নিয়ে এলাম। ভোলানাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

১৯১৫ সালে পাঞ্জাবের অভ্যুত্থানে ফেব্রুয়ারি মাসে বাধা পড়ে ও ধরপাকড় হয়। তারই অব্যবহিত পরে আত্মারাম নামে এক গদর দলীয় পাঞ্জাবী পাঞ্জাব ঘুরে কলকাতায় আসে। তার কাছে অনেক খবর ছিল। শ্যামে আমাদের বৈদেশিক কেন্দ্র স্থির রইল। কুমুদবাবু আত্মারামের কাছ থেকে শ্যামের জার্মান কন্সালের নতুন প্রস্তাব আনেন। রসদসহ ৫,০০০ রাইফেল ও একলক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে আসবে। আমরা ব্যাটাভিয়ার হেল্‌ফেরিখ্‌কেও তার পূর্ব বন্দোবস্ত ঠিক রাখতে খবর দিই। কুমুদ ব্যাটাভিয়ায় ফিরে যান।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ 'ম্যাভেরিক' জাভার কাছে ধরা পড়ার খবর কুমুদ ফেরার পথে আমাকে পাঠান। সিঙ্গাপুরের একখানি সংবাদপত্রও ওদেশ থেকে পাঠান। ইংরেজ সরকার কাগজে ঐ খবর প্রকাশ করে দিয়েছিল। সেই কাগজের প্রয়োজনীয় অংশটুকু কেটে আমি দাদার কাছে আমাদের বক্তব্যসহ কপ্তিপদায় (বালেশ্বর হয়ে যেতে হয়) পাঠিয়ে দিই। এদিকে ৭ই অগস্ট কলকাতায় খানাতল্লাশি হয় 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সে'।

ওদিকে আমেরিকায় চেকোশ্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিকরা ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছিল। স্বাধীনতাকামী পরদেশীদের পরস্পরে ভাব হওয়া স্বাভাবিক। তারা কোনোক্রমে জানতে পারে ভারতে সশস্ত্র-অভ্যুত্থান পরিকল্পনার কথা। তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ফরাসি ও রুশের মুখাপেক্ষী ছিল। তাদের তখন দাবিয়ে রেখেছিল অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি। তারা ফরাসী বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগকে খবরটা পেঁৗছে দেয়। ফরাসীরা সেই খবর বিলাতের গুপ্ত বিভাগকে জানায়। এরা তো বন্ধু এবং একই পাপের পাপী! সাম্রাজ্যবাদী।

এর ফলে হঠাৎ ইংরেজের সুখ-স্বপ্ন ভাঙে। চৈতন্যের উদয় হয়। দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ কোমর বেঁধে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আত্মারাম কলকাতায় আসার আরো আগে আমার বাড়িতে ভোলানাথের নামে একটি টেলিগ্রাম আসে শ্যাম থেকে। আমি সে সময় বাড়ি ছিলাম না। হরিদা (হরিকুমার চক্রবর্তী) ও আরও দু'একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা সেই টেলিগ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। তাতে সুখবর ছিল। অস্ত্র আসার সংবাদ—যেটির জন্য আমরা সকলে মুখিয়ে ছিলাম।

হরিদার অন্তঃকরণের তুলনা দেখি না। তাঁর কাছে ছোট কিছু ছিল না।

কারণ তিনি নিজে সব দিক দিয়ে বড় ছিলেন। হৃদয়ে বড়, দুঃখভোগে বড়, পরদুঃখকাতরতায় বড়, সেবাধর্মে বড়, আত্মভোলার পরীক্ষায় বড়, দারিদ্র্যের কশাঘাতকে অগ্রাহ্য ও তাচ্ছিল্য করায় বড়।

'হ্যারি অ্যান্ড সন্স অফিস' ছিল একটা অর্ডার সাপ্লাই-এর অফিস। আসলে ওটি আমাদের বহির্বিভাগের খবর গ্রহণের স্থান। এখানে, সুধাময় মুখার্জীর অফিসে (বিসরা লাইম ওয়ার্কস) এবং শ্রমজীবী সমবায়ে সি. মার্টিনের খবর আসার ব্যবস্থা ছিল। সুধাবাবুকে কিছু বলা হয়েছিল কিনা জানি না। অমরদা ('শ্রমজীবী'র) তাঁর ঠিকানাটা আমাদের দিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সুধাবাবু নির্যাতিত হন। তাঁর মহত্ত্ব এইখানে যে, কিছুটি না-জেনে দুঃখ ভোগ করলেন—অথচ কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নি কোনদিন! পরে উমা ও হরিদাস মুখার্জীর 'Two Great Indian Revolutionaries' গ্রন্থে এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে সুধাবাবু অর্থ চেয়ে জাভায় কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠান ও তারই ফলে গ্রেপ্তার হন।

ভোলানাথ ছিল সাক্ষাৎ 'ভোলানাথ'। সে বলত, 'দেশের দুর্দিনে যখন সাধের হাট, আমাদের প্রাণের সমিতি ভেঙে গেল, দেশে উদ্দীপনা ম্লান হয়ে পড়ল, আশার আলো নিভে এলো—কিছু করবে না? আমার বুকের ভিতরটা যেন বেড়াল আঁচড়াচ্ছে। বুক যে ভেঙে যায়!' বলেছিলাম—সাগরী রোগে (sea sickness) একবার ভুগে এসো দেখি? তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করো। কাজ জুটবে।

সরল, সহজ, আন্তরিকতার প্রতিমূর্তি, ষোলবছরের ছেলে—একা চলে গেল। পিনাং-এ পোঁছে খবর দিল, সে বমি না ক'রে সাগরে পাড়ি দিতে পেরেছে। আর কী পরীক্ষা দিতে হবে?

'ভোলা, ফিরে আয়!'—সেদিন তাকে ডেকেছিলাম। আজ সে অনন্তে লীন হয়ে গেছে। তবু পোড়া প্রাণ থেকে-থেকে বলে ওঠে—ওরে, দেশমাতার সুসন্তান, ফিরে আয়! দেশের আজও তোকে দরকার আছে।

ভোলানাথ দেশসেবা করবার জন্য কলেজে পড়ার অভিলাষ ত্যাগ করল। চাষী-মজুরের মধ্যে কাজ করার জন্য তাদের মধ্যে তাদের মতো হয়ে মিশে পড়ল। অবশেষে সে কলের মিস্ত্রীর পেশা গ্রহণ করল।

যখন সে চল্লিশ টাকা বেতন পায়, তখন মাত্র পনেরোটি টাকা খাবারের ও বাসা ভাড়ার জন্য রেখে বাকী পঁচিশ টাকা দলের কাজে দিত। একটি বস্তিতে ঘর নিয়ে সে থাকত। নিজে রান্না করত। তার রান্নার তৈজসপত্র অসাধারণ। একটা তেলের টিনকে পরিষ্কার ও গন্ধহীন করে রেখেছিল। '৪৯ নম্বরের দিন' পালন করার তার ভারী ঝোঁক। অর্থাৎ যেদিন সমিতিকে সরকার বেআইনী ঘোষণা করে—সেই দিনকে স্মরণ। ঐদিন বিশিষ্ট বন্ধুদের সে একত্রিত ক'রে খাইয়ে ভারী আনন্দ পেত।

ঐ দিন এত লোকের রান্না, কাজেই খিচুড়ি পাক হত। রাঁধত সে নিজেই। কয়েকটি এনামেলের ডিস ছিল। তখনকার দিনে ওর চাইতে সস্তার পাত্র আর কিছুই ছিল না। সেদিনকার অধিবেশনের বিশিষ্টতা এই ছিল—সে রাঁধবে, বন্ধুরা তার কাছে থাকবে। সে মাঝে মাঝে এক-আধ লাইন গাইবে, বাকিরা শুনবে। অথবা মনের মাঝে কাতুকুতু বোধ করলে, গলায় গলা মিলিয়ে তারাও এক-আধ জায়গায় গাইবে। গানটি এই রকম ছিল—

'কামরূপ-কামিখ্যে থেকে মন্তর শিখে এল,
মায়ের আগে না ক'ল।
তারামণির কথায় নদেরচাঁদ কুমীর হইল।'...(ভাটিয়ালী সুর)

নদেরচাঁদ কামরূপ-কামিখ্যে থেকে মন্তর শিখে এসেছিল। সে ইচ্ছে করলে রূপ বদলে কুমীর হতে পারত। একপাত্র হলুদ-গোলা জলে সে মন্ত্র পড়ে রাখবে। সেই জল তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে সে আবার মানুষ হয়ে যাবে। তার কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য তার বউ তাকে কুমীর হতে বলে। সে সত্যি কুমীর হয়ে গেলে বউটি ভয়ে পালিয়ে যায়। মন্ত্রপড়া জল কুমীরের গায়ে দিতে পারে নি। সেইজন্য নদেরচাঁদ কুমীর হয়ে গ্রামের এক দীঘিতে আশ্রয় নিল। আজও 'নদেরচাঁদ' বলে ডাকলে সে ভেসে উঠে দেখা দেয়। ভোলানাথের গানের তাৎপর্য—রাণী ভবানীর কথা না শুনে, বিদেশীর আশ্বাসে বিশ্বাস করে দেশনেতারা অমানুষ হয়ে গিয়েছিল। গানের শেষে বলত—'গতিস্তং, গতিস্তং, গতিস্তং ভবানী'—ভবানীর পথই পথ। অর্থাৎ ইংরেজের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া। শ্রেয় ছেড়ে প্রেয়ের পথে এই সর্বনাশ হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর ব'সে পুরাতন স্মৃতির বোঝা পরস্পরে হালকা করা হত। ৪৯ নম্বর—উনপঞ্চাশ বায়ু নয়। 'অনুশীলন সমিতি'র বাড়ির নম্বর ছিল ৪৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। এখানে এইভাবে ভোলানাথের উৎসাহে সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সমিতি ১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে বেআইনী ঘোষিত হয় এবং উঠে যায়। আমরা ভোলানাথ ও ননী বসুকে শ্যামদেশে পাঠাই। তা আগেই বলেছি। এখানেও তার হৃদয়ের বিশালতা দেখা যায়।

আমাদের টাকা ছিল না। অথচ দেশের কাজে খরচ আছে। কাজ করতেই হবে। আশু দাস ও আমি অস্ত্রোপচারের রোগীদের বাড়িতে গিয়ে ড্রেসিং করা আরম্ভ করলাম। ঘা ধুয়ে মলম-ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে আসতাম। তাতে কিছু পেতাম। সতীশ সেন ছেলে পড়িয়ে কিছু দিতেন। ভোলানাথ এবার মেকানিক্যাল মিস্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছিল। সেও কিছু দিত। এইরকম করে সামান্য অর্থ জমিয়ে এদের চাটগাঁ হয়ে বর্মায় পাঠাই। সেখানে কাজের ব্যবস্থা ক'রে এরা শ্যামদেশে যায়। সর্বত্র ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যেতে হয়। লোক-দেখানো একটা

কাজ রেখেছিলাম। একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানির prospectus হাতে দিলাম। লোককে বলতে পারবে জীবন বীমার কাজ করতে তারা ঐ দেশে গেছে।

শ্যামে যখন তারা পেঁছাল তখন তাদের হাতে মাত্র ষাট টাকা ছিল। বলে দিয়েছিলাম আর কিছু পাঠাতে পারব না। তাদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশের কাজ করতে হবে। তারা তাদের মূল্যে প্রমাণ করে দিয়েছিল। ভোলানাথ শ্রমিকের কাজ ক'রে নিজেদের খরচ চালিয়েছিল এবং প্রদত্ত কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পাদন করেছিল। ফিরে যখন এল তখন হাতে তিনশো উদ্বৃত্ত টাকা। সেই টাকার সবটা সে আমার হাতে দিতে চায়। বললাম, ওটা তার টাকা। সে নিজের ইচ্ছামতো খরচ করতে পারবে। ভোলানাথের মনে কী ব্যথাই না তাতে ফুটে উঠেছিল! বলল, 'কী অপরাধে আমায় ছাড়লে? দেশের কাজে আমার সহায়তা গ্রহণ করবে না?' বুঝিয়ে বললাম—তার শ্রমে সংগঠনের অধিকার অব্যাহত ছিল ও থাকবে। বিদেশে-বিভুঁয়ে আমরা সাহায্য পাঠাতে পারি নি, কোন্ মুখে তার সঞ্চিত টাকা কেড়ে নেব? ও অর্থে আমাদের কোনো হক্ নেই।

ভোলানাথের মুখ ভার হয়ে উঠল। চোখে জল ছলছলিয়ে এল—বুক দুলে উঠতে লাগল। বহু মিনতি করে বলল—ও টাকায় তার কোনো হক্ নেই। ঐ টাকা নিজে নিলে তার পক্ষে মহাপাতকীর অধম কাজ করা হবে। সে তার বিবেককে প্রবঞ্চনা করতে পারে না! স্তব্ধ হয়ে গেলাম। শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রশংসায় আমার অন্তর উথলে উঠল। টাকা নিলাম এবং সংগঠনের এক অত্যন্ত দুঃসময়ে সেই অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। ভোলানাথ ছিল অসমসাহসিক, হৃদয়বান, দুর্ধর্ষ, প্রাণবন্ত যুবক। দেশসেবায় তার মতো একনিষ্ঠ কর্মী কমই আমার চোখে ঠেকেছে।

সব জিনিষটা ভালো করে বোঝার জন্য স্মৃতির ভান্ডার আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক্।

আমেরিকা থেকে ১৯১৪ সালে নভেম্বর মাসে মারাঠী যুবক পিংলে, সত্যেন সেন 'সালামিন' নামক জাহাজে নভেম্বর মাসে কলকাতায় আসে। পিংলে বিপ্লবের আয়োজনের জন্য পাঞ্জাবের দিকে চলে যায়। সত্যেন কলকাতায় থেকে যায়।

এদিকে হ্যারিসন রোডস্থিত শ্রমজীবী সমবায়ে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মজুমদার, অতুল ঘোষ, নরেন ভট্টাচার্য ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘন ঘন পরামর্শ সভা বসে।

১৯১৪ সালে রাসবিহারী 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'র ফলে কাশীতে বাস করতে থাকেন। পিংলে যতীনদার কাছ থেকে খবর নিয়ে যায়; রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা

করে ও বলে যে চারহাজার বিপ্লবী আমেরিকা থেকে পাঞ্জাবে এসেছে। কাজ আরম্ভ হলে আরো বিশহাজার জন আসবে। এর ফলে রাসবিহারী শচীন সান্যালকে পাঞ্জাব ঘুরে আসতে পাঠান। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে শচীন পিংলে সহ পাঞ্জাব থেকে ফিরে আসে।

রাসবিহারী শচীন ও পিংলে সহ লাহোরে যেতে মনস্থ করেন। দামোদর-স্বরূপ নামক এক স্কুলমাস্টারকে এলাহাবাদের ভার দেওয়া হয়। পরে শচীন ফিরে এসে কাশীর ভার নেয় এবং নলিনী মুখার্জীকে জব্বলপুরে পাঠায়। কাশী থেকে যাবার আগে রাসবিহারী যতীন্দ্রনাথ ও নরেন ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠান। ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা ভারত ব্যাপী সশস্ত্র সেনা-বিদ্রোহের কথা জানান এবং যতীন্দ্রনাথকে বাংলার বিশেষ ভার নিতে অনুরোধ করেন। এ কথা আমায় নরেন জানায়।

৭ই অগস্ট হ্যারি অ্যান্ড সন্সের অফিস খানাতল্লাশি হয়। হরিদা ও তাঁর ভাই মাখন গ্রেপ্তার হন। সেখানে ভোলানাথের কোনো একখানা চিঠি পাওয়া যায়। তারপরে ভোলানাথের খোঁজে তারা বেরোয়। চক্রধরপুর এলাকায় পুলিস যায়। ঐ অঞ্চলের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। চক্রধরপুর, রাউরকেল্লা ও কুলেঙ্গাতে ভোলানাথ, বিজয় চক্রবর্তী ও অপর কর্মীরা ঘাঁটি করে থাকতেন।

'শ্রমজীবী সমবায়' খানাতল্লাশি করে। অমরদা সেখানে ছিলেন। সোজাসুজি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু না থাকায় সেদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। শুধু ডেনহ্যাম বলেছিল, 'You are a fish of the deep water—তুমি গভীর জলের মাছ। এমনিতে ধরা-ছোঁয়া দাও না। কিন্তু পালিয়ো না ?' এর ফল হল অমরদার সেইদিন থেকে অন্তর্ধান। যার পেছনে কলকাতায় এবং উত্তরপাড়ায় সব সময় চারজন সেপাই পাহারায় নিযুক্ত থাকত, তার পক্ষে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া খুব কৃতিত্বের সন্দেহ নেই।

তারপর আমার বাড়িতে এল। সেই সময় (৩রা সেপ্টেম্বর) আমার বন্ধু আশু দাস জার্মানি থেকে এক বিশেষ দূত মারফত প্রেরিত বিস্ফোরক তৈরির ফর্মুলা আমায় দিতে এসেছিল। দূতের নাম ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য।

আমি তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। পুলিসের বড় কর্মচারী তাঁর সহায়ককে (পান্নালাল ব্রহ্মচারীকে) পাঠিয়েছিলেন সদলবলে এসে রাজ্য-রক্ষা আইন অনুযায়ী বাড়ি খানাতল্লাশ করতে।

একটা ফিকির করে তাকে সাময়িকভাবে হটালাম। আশুকেও সরিয়ে দিলাম।

আমি তাদের বললাম, 'রাজকার্যে এসেছেন—প্রজার কাজই হচ্ছে রাজার সহায়তা করা। কিন্তু এখন বাড়ির মালিক বাড়ি নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে খানাতল্লাশ করবেন ? হয়তো পরে এসে তিনি তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করবেন।' কর্মচারীটি

তাঁর কর্তার পরামর্শ নিতে গেলেন। বাড়ির সামনে এক সেপাই খাড়া রইল। আশুকে চাকর সাজিয়ে সরিয়ে দিলাম। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেললাম।

পরে আমার কাকা আসতে টেগার্ট সমেত পুলিস বাহিনী এসে উপস্থিত। তারা খোঁজে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে এবং এ বাড়ির চিঠিপত্রের গুচ্ছে যদি কিছু থেকে থাকে তাই। কাকা বললেন—এ বাড়িতে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বলে কেউ থাকে না। তারা জানতে চাইল আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ঐ নামের কেউ আছে কিনা? 'কেউ তো নেই'—আমাদের তরফ থেকে জবাব হল। পাড়ার লোকেদের কাছে খোঁজ নিয়েও জানল ঐ নামে কেউ আমাদের আপনজন নেই।

এদিকে খানাতল্লাশি সুরু হল। আমি পরম উৎসাহে একটা আলমারির জায়গায় দুটো খুলে দিতে লাগলাম। মুখে ঐ বুলি—রাজকার্যে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করতে হবে! যে কয়েকটা আলমারি দ্রুতগতিতে খুললাম, সবই কাকার আলমারি। আইন-বইয়ে ঠাসা। আমার আলমারির দিকেও গেলাম না।

এর মধ্যে রাজপুরুষদের কোথায় ভুল হয়েছে বুঝিয়ে দিলাম। দু'দিন আগে আমাদের বাড়ির প্রায় সামনের বাড়ি থেকে একদল ভাড়াটে হঠাৎ উঠে গেছে। তাদের কয়লার ব্যবসা আছে বলত। আমাদের সন্দেহ হয় তারা 'প্রকৃত ব্যবসায়ী' কিনা! কারণ কয়লার কালি-ঝুলি মেখে কাউকে বাড়িতে আসতে দেখি নি। তাদের বাড়িতে একটা ছোকরা ছিল। তাকে 'ভুলো' 'ভুলো' বলে বাড়ির লোক ডাকত। সম্ভবতঃ সাহেব তাদের উদ্দেশে এসে থাকবেন। ঠিকানাটা বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে। পাড়ার মধ্যে সংবাদ নিয়ে ওরা জানল আমার কথা ঠিক। সাহেব জলের মতো বুঝে গিয়ে সদলবলে চলে গেল—ভুলোই হবে 'ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়'।

হরিদার গ্রেপ্তারের পর আমার মনে হয়েছিল যে-কোনো দিন আমায় ধরতে আসতে পারে। আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারব না। দাদা, বিপিনদা, নরেন ভট্টাচার্যকে গা-ঢাকা অবস্থায় দেখেছি। 'সদা সত্য কথা বলিবে'—বিদ্যাসাগরমশায়ের সদুপদেশ তাঁরা যে-ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ দাদার হুকুম—কেউ জ্যান্ত ধরা দেবে না। সকালে যদি নাম হল 'হরিদাস ঘোষাল', বিকেলে হয়ে গেল 'ধরণীধর সামন্ত'। এত চটপট বেদবাক্য বলা আমার পক্ষে শক্ত ছিল। তাই দাদার কাছে আবেদন পাঠালাম, আমায় ধরতে এলে ধরা দেবার অনুমতি দিতে। এদিকে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার বৈদেশিক দপ্তরের ভার বুঝিয়ে দিলাম। সে এক বিষম বিষাদের ব্যাপার। আমার পরই—আমি মরে গেলে বা জেলে গেলে যার ওপর ভার থাকবে (আমরা আগে থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ নিজ বিভাগে ঠিক করে রাখতাম)—সেই বিনয়ভূষণ দত্তকে পুলিস আগে খুঁজে বসল। তাকে লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম। সে বিলাতের Murdoch কোম্পানির মারফত

কায়দা করে কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করত। সেটা কি জানি কেমন করে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। সাতকড়ি আমার আসন নিতে কেমন একটু সলজ্জ ইতস্ততঃ করছিল। এমন সজ্জন, সদ্বন্ধু এবং অনাড়ম্বর, বিশ্বাসী, আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মী দেশে কম দেখা যায় ও গিয়েছে। সেও দেশমাতার অতুলনীয় রত্ন ছিল।

হরিদা ও সাতকড়ি এবং চব্বিশ পরগণার কয়েকজন কর্মী অতি উঁচুদরের দেশসেবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু' একটি নাম উল্লেখ না করে থাকতে পারি না। ৺শৈলেশ্বর বসু, কালিচরণ ঘোষ খুব সুন্দর কাজ করতেন। শৈলেশ্বরের জোড়া মেলা ভার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তিনি বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এমপোরিয়াম' খোলেন। নারায়ণ ব্রহ্মচারী নামক একজন নূন ও আবগারী বিভাগের দারোগাকে তিনি সাচ্চা সমর্থক তৈরি করেন। বালেশ্বরে ধরা পড়ার পর হাজারিবাগ জেলে চৌষট্টি দিন অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। তাঁর অম্লশূল রোগ (Gastro-duodenal ulcer) ছিল। খালি পেটে এই দুঃসহ শূলবেদনা বড়ই তীব্র হয়। শৈলেশ্বরকে বন্ধুরা নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি ধর্মঘটে যোগ দেন। যুদ্ধে পিছিয়ে থাকার লোক তিনি ছিলেন না। তাঁর অমর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

কালিচরণ ঘোষ আজও সেই তরুণ স্বেচ্ছাসেবকটি রয়ে গেছে। তারই উৎসাহের প্রাবল্যে ১৯৪৭ সালে জাঁকিয়ে 'যতীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা'র সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব কলকাতায় হতে পেরেছিল। একমাত্র তারই অনন্য অধ্যবসায়ে যতীন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তি কলকাতার আজাদ হিন্দ পার্কে (হেদুয়ায়) স্থাপিত হতে পেরেছে। অথচ এরা চিরদিন অজানা থেকে যাবে!

প্রথম দিন হানা খেয়ে, হানা সামলে সাতকড়ির কোনো অনুনয় বিনয় না-মেনে সব ভার ও সাংকেতিক ব্যবস্থাগুলি তাকে বুঝিয়ে দিলাম। মধ্যে একদিন নির্বিঘ্নে গেল।

তারও পরের দিন লোম্যান আমার কাকাকে ডাকিয়ে পাঠায়। লোম্যান ছিল কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা। টেগার্ট কলকাতা বাদে সারা বাংলার গোয়েন্দাকর্তা। ডেনহ্যাম ছিল ভারত সরকারের সহকারী বড় গোয়েন্দাকর্তা। আমার কাকাকে পুলিসে ডাকতে আমি থৈয়ে-বন্ধনে পড়লাম। একজন প্রকৃত নির্দোষী লোক হয়ে যাবে বন্দী! সে কেমন করে আমি সইব? ওদিকে আমার নেতার হুকুম নেই জ্যান্ত ধরা দেবার। বিষম সমস্যা।

আমার কাকা ছিলেন আলিপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকিল। তিনি গেলেন। সঙ্গে দিলাম আর একজন উকিলকে। লোম্যান-এর অফিসে কাকাকে খাতির করে বসিয়ে ফোন করল, 'ডেনহ্যাম...'—কাকা এই নামটি শুনতে পেলেন। তিনি এদের কাউকে চিনতেন না।

পরে ডেনহ্যাম এসে নানারূপ প্রশ্ন করে। তাঁর বাড়িতে কে কে থাকে? তাদের আসল নাম ও ডাকনাম কি কি? কাকা দু'দিন পূর্বেই আমার তত্ত্ব বা থিওরি সাহেবকে শোনান এবং বলেন সাহেবের খবরে কোথাও ভুল আছে। সাহেব জিজ্ঞেস করে, তিনি কখন বাড়িতে থাকেন এবং কখনই-বা থাকেন না। কাকা যথাযথ জবাব দেন। কাকার এক ভাইপো ধনগোপাল আমেরিকায় থাকে শুনেই সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করল। অবশেষে সাহেব বলে, 'Somebody in your absence has abused your confidence and misused your house—আপনার অবর্তমানে কোনো লোক আপনার বিশ্বস্ততার অপব্যবহার করেছে এবং আপনার বাড়িতে কুকীর্তি করেছে।' কাকাকে ছেড়ে দেয়। তিনি এসে আমায় এই কথা বলায় বুঝলাম ডেনহ্যামের মাথায় 'ঘি' আছে। চমৎকার থিওরি বা তত্ত্ব বার করেছে। রহস্য সে একদিন উদ্ঘাটন করে ফেলবে।

সেই যে অনেকদিন আগে (কাকার অবর্তমানে তো বটেই। তিনি সকাল ন'টায় বেরুতেন, বিকেল পাঁচটার পর আসতেন) আমার অবর্তমানে বন্ধুরা শ্যামদেশের যে টেলিগ্রাম গ্রহণ করেছিলেন—বিষয়টা তৎসম্পর্কে। বুঝতে বাকি রইল না যে, আমার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। সে টেলিগ্রামটা ভোলানাথের নামে আমার বাড়ির ঠিকানায় এসেছিল।

সেদিন আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া একটু দেরিতে হয়েছিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছিলাম। শত্রুপক্ষ ছাড়বে না। অনুসন্ধান চালাবে। ধরা দেওয়া কিম্বা ধরা না-দেওয়া হয়েছিল কঠিন প্রশ্ন।

আমাদের বাড়ির ব্যবস্থা ছিল এইরকম—যাঁরা বিবাহিত তাঁরা থাকতেন কাকার বাড়ির প্রায় সামনে একটা গলিতে। কাকার বাড়ির ঠিকানা—৬২ বেনেটোলা স্ট্রীট। অপর বাড়িটা—৭নং দাঁ লেন। এইখানে সকলের খাওয়া-দাওয়া হত।

যে সময়ের কথা বলছি তখন কাকা ও তাঁর মক্কেলরা ওপর তলায় ছিলেন। আমি নীচের তলায় বিশ্রাম করছিলাম। এই বাড়িতে ঢুকতে নীচের তলায় দুখানা ঘর ও সিঁড়ির নীচে খানিকটা জায়গায় বহু গরীব লোককে অমনি থাকতে দেওয়া হত। তারা পশ্চিম দেশের লোক। কেউ ঝাঁকা-মুটে, কেউ ট্রামের ড্রাইভার, কেউ কলকাতার রাস্তা-মেরামতির মজুর, কেউ কোনো কলে কাজ করত, কেউ বা ছোট-খাটো ফেরিওয়ালা। আমাদের চাকরের সুবাদ বা সুপারিশে তারা থাকতে পেত। কাকার কাছে বাড়ির ছেলেদের চেয়ে তাদের খাতির বা মর্যাদা বেশি ছিল। তিনি গরীব লোকেদের বেশী ইজ্জত দিতেন। এই ছিল তাঁর রীতি।

বেলা দুটো—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল। হঠাৎ আমার পাড়ার এক বন্ধু

ছুটে এসে খবর দিলেন পুলিসের সাহেবরা সার্জেণ্টদের নিয়ে দাঁ লেনের বাড়িতে গেল। আমি যেন শীঘ্র সেখানে যাই।

চকিতে আমার মাথায় খেলে গেল ডেনহ্যামের বুদ্ধির চাল। অর্থাৎ দু'দিন পূর্বে ৬২ নম্বর বাড়িতে হানা দেবার সময় যে ছিল—সে চালাক ছেলে—অবশ্য ওখান থেকে বাস বদলে ৭ নম্বরে চলে গিয়ে থাকবে। তাকে চালে মাৎ করতে সাহেব দলবল নিয়ে ঐখানে আগে চলে যায়। আমার ইতিকর্তব্য তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেললাম।

আমার কাছে কাকার টাকার বাক্সের ও লাইব্রেরির চাবি থাকত। তাঁর চাবি তাঁকে বুঝিয়ে না-দিয়ে যাওয়া আমার নৈতিক বোধে বাধল। ক্ষণিকে ওপরে গিয়ে শুধু চাবিটা দিয়ে বললাম 'এইটা রাখুন। আমি কর্তব্য করতে যাচ্ছি।' মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসাবে আমায় বিভিন্ন সময়ে 'কর্তব্য' করতে যেতে হত। সেটা অতি বাঁধা-ধরা কথা। কিন্তু আজ যে কোন কর্তব্যের তাড়নায় যাচ্ছি তা কেউ বুঝল না। কাকার অনেক টাকা দলকে দিয়েছি। তাঁর বলাই ছিল—'উপযুক্ত কাজে টাকা খরচ করবে। আমায় হিসেব দিতে হবে না।' উপযুক্ত কাজ—দেশের কাজের চেয়ে আর কি হতে পারে?

বাড়ির সামনে ততক্ষণে লাল পাগড়ির দল ছেঁকে দাঁড়িয়েছে। উকিলবাবুর অ-বাঙালী মক্কেলের মতো সেজে দরজা থেকে নেমে পড়লাম। বগলে লাল ফিতে বাঁধা ভাঁজ-করা কাগজ—যাকে বলে উকিলের 'ব্রীফ'। পাহারাওয়ালাদের সামনে দিয়ে আপন মনে বলতে বলতে চললাম—আজকাল মামলা করা ঝকমারি। পাহারাওয়ালারা বাঙালী বাবুদের রোখবার হুকুম পেয়েছিল; অ-বাঙালীকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না।

এইবার এ পর্যায় ছোট করে দিই। লোম্যান, টেগার্ট, ডেনহ্যাম সদলবলে এসেছিল। আমার এক ভাগনে টাইফয়েড জ্বর থেকে সেরে উঠে মাত্র সেইদিন অন্নপথ্য করেছিল। তাকে ধরে নিয়ে গেল। তার ডাকনাম ছিল ভোলা। আসল নাম সুধীর চ্যাটার্জী। আজ সে কলকাতায় ডাক্তারি করছে। পুলিস আমার বাবাকে খুব নাস্তানাবুদ করেছিল ক'দিন ধরে।

কী আশ্চর্য কালের গতি ও ক্ষণ-মাহাত্ম্য—'যে আমি' সফল গা-ঢাকা জীবনে পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পরম সন্দিহান ছিলাম, 'সেই আমি' পলকে প্রলয় ঘটিয়ে বসলাম। বিনা সাধনে সিদ্ধিলাভ একেই বলে। আমার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম। সন্দেহের স্থলে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জমাট হয়ে মনের মাঝে বাসা বাঁধল।

পুলিস দল ঘণ্টা দুই চেষ্টা-চরিত্র করে আমায় না পেয়ে ফিরে গেল। পুলিসেরা চলে যাবার আরও ঘণ্টা দুই পরে আসল ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় একটি ব্যাগ হাতে

সশরীরে এসে হাজির। চক্রধরপুর এলাকায় তাড়া খেয়ে সে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে। সৌভাগ্যের বিষয় আমার আরও দুটি ভাগনে ছিল। তারা স্বদেশী বিষয়ে তোখড়। তাড়াতাড়ি ভোলানাথের ব্যাগটি রেখে দিয়ে, সেদিনের ব্যাপার শুনিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ সরে পড়তে উপদেশ দেয়।

আমাদের একটি আড্ডায় (ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে) ভূপতির মেসে বসে আছি, এমন সময় ভোলানাথ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত। আমায় সেখানে দেখে সে অদম্য হাসিতে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠল, 'আজ আমাদের আইবুড়ো নাম খণ্ডালো'—সঙ্গে সঙ্গে জবর রকমের কোলাকুলিতে আমায় ঠেসে ধরল।

কয়েকদিন পূর্বে বিনয়কে খিদিরপুরের একটি ডেরায় রেখে এসেছিলাম। সন্ধ্যার পর দুজনে সেখানে গিয়ে দলে মিশে গেলাম।

তারই খানিক পরে দাদার কাছ থেকে দূত এসে পেঁাছোল। হুকুম—আমায় বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হবে, ধরা দেওয়া কোনোরকমেই হবে না।

দাদাকে বালেশ্বরে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। গেরিলা যুদ্ধের যে কার্যক্রম মাথায় রেখে দেওয়া হয়েছিল এবার তার আভাস দিই—

(ক) বহু জায়গায় রেল লাইন উপড়ে ফেলা হবে এবং টেলিগ্রাফের তার কাটা হবে। গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। স্বাধীন ভারতের তিনবর্ণের পতাকা সেইসব স্বাধীন গ্রামে উড়িয়ে দেওয়া হবে। (গ্রামের লোকেদের মনোভাব তো জানা ছিল। তারা বলে নি? শুধু একটা করে খড় ফেলে আগুন লাগিয়ে দিলে ইংরেজরা ভস্ম হয়ে যাবে। ওরা আর ক'জন?) এমনই গ্রামে বাস করবার সময় বোঝা যেত না এখন কার রাজ্য—ইংরেজের, না, অপর কারুর। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা লালপাগড়ি গ্রামে এলে মনে হত যে ইংরেজরা এখনও আছে। ইংরেজের পুলিস ও সৈন্যে লোক আছে ক'জন? প্রত্যেক গ্রামবাসীর পেছনে একটি করে সেপাই রাখা ইংরেজের পক্ষে অসম্ভব ছিল। গ্রামেই ভারত বাস করে। এইজন্য গ্রামগুলিকে আগেই স্বাধীন করার কথা এসেছিল। স্বাধীনতার আদর্শ শহর অপেক্ষা গ্রামে স্থায়ী বেশিদিন হতে পারবে। তখন তো আমাদের শুধু ভাবাদর্শ রেখে যাবার কথা। (প্রস্তুত হতে পারি নি তো।) ভাবাদর্শ মরে না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের আত্মিক আহার যোগাবে।

(খ) বালেশ্বরে চাঁদিপুর গ্রামটি ছিল বঙ্গোপসাগরের উপর। এখানে ইংরেজের কামানের গোলা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সাগর তীরে একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমরা এই সংবাদ জানতাম। এদের আকস্মিক আক্রমণে ঠাণ্ডা করতে হবে, এ কথা আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম। জার্মান অস্ত্র যা বালেশ্বরে নামানো হত তার ব্যবহার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যেত।

চক্রধরপুরের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও লড়কা কোল বা 'লড়াইয়ে কোলেদের' মধ্যে তা বিতরণ করে তাদের নেতাদের মাতানোর ব্যবস্থা হত। ১৯০০ সালে এদের নেতা বিরশা ভগবান বিদ্রোহ করে। বিরশার নাম যথেচ্ছ ব্যবহার করা যেত। আইনের ভয় ও আইন চলে ততক্ষণ যতক্ষণ আইন মেনে চলা যায়। আইনের শৃংখল ভেঙে চুর হয়ে যায়, যখন দু'পায়ে আইন দলার ঝোঁক মাথায় চাপে। আজকাল যাকে ঝাড়গ্রাম মহকুমা বলে, সেই জঙ্গল-যুক্ত মহকুমা সিংভূমের গায়ে লাগা। সিংভূম দিয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করা যায়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া পাশাপাশি। এখানেও কাজ আরম্ভ হয়ে যেত। বীরভূম জেলায় পড়ে অজয় নদী। তার পোল ওড়ানো বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। সতীশ চক্রবর্তী এটির ভার নিয়েছিলেন।

সুন্দরবনে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামিয়ে এক ভাগ পাঠানো হত বালেশ্বরে। এক ভাগ পূর্ববঙ্গে কাজ আরম্ভের জন্য সন্দীপ বা হাতিয়া অঞ্চলে পাঠাবার কথা ছিল। অপর একভাগ পশ্চিমবঙ্গের জন্য রাখা হত। নূননগরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর যতীন রায় এবং বসিরহাটের জনপ্রিয় ডাক্তার যতীন ঘোষাল এই কাজের ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁদের হাতে বিস্তর লোক ছিল। তাঁরা সুন্দরবনে নৌকা ও লোক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হরিদা প্রভৃতিও সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অস্ত্র হাতে এলে অবশ্য ঢাকার অনুশীলন-বন্ধুদের সহযোগিতা চাওয়া স্থির ছিল। তাদের সহযোগিতা সে অবস্থায় প্রাপ্তিতে সন্দেহ ছিল না।

(গ) শত্রুসৈন্য আনা-নেওয়া এবং তাদের রসদ প্রভৃতি সরবরাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ই. আই. আর., বি. এন. আর., ই. বি. আর-এর কয়েকটি বড় পোল উড়িয়ে দেওয়া ধার্য করা ছিল।

(ঘ) কলকাতার কেল্লা ফোর্ট উইলিয়ামে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করা বিশেষ একটা কাজ ছিল। এখানকার দেশী ফৌজ হাত-করা ছিল। রাসবিহারীর সঙ্গে যোগ রাখা ছাড়া এই সৈন্যদের মারফত অমৃতসর পর্যন্ত আর একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে ফেব্রুয়ারি মাসে গোলমাল হয়ে যাওয়ায় সমস্ত পণ্ড হয়ে যায়। ওদিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু মনসা সিং প্রভৃতি কলকাতার সৈন্যদের ভার নিয়ে তখনও অপেক্ষা করছিল।

(ঙ) একটি অস্থায়ী ভারত সরকার স্থাপন করার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। বালেশ্বরের যুদ্ধের ঘটনা কি বিশ্বকবির মনকে স্পর্শ করেছিল? তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। ঐ সময়কার তাঁর একটি রচনা পড়ে এই কথাটা ভাবি। কবি লিখে গেছেন—

'ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল—
কার তরে সব ছুটে এলি সৌরভে আকুল !'

—কারা তাঁর পাগল চাঁপা ও উন্মত্ত বকুল ?

(চ) শ্যামদেশ থেকে জাতীয় সেনাদল বর্মা আক্রমণ করবে। বর্মা তখন ভারতের একটি প্রদেশ ছিল। বর্মার লোক নিজ দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে।

এর মধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল—(ক) জার্মানি ও তুর্কীর হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গড়া হবে ভারত-স্বাধীনতার ফৌজ। বরকৎউল্লা প্রভৃতির প্রচেষ্টা হেথা ফলবতী হয়েছিল।

(খ) রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কাবুলে অস্থায়ী 'স্বাধীন ভারত সরকার' স্থাপিত করেছিলেন। জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, তুর্কী প্রভৃতি এটিকে স্বীকার করে নিয়েছিল।

(গ) সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহী সৈন্যেরা ছ'দিন 'স্বাধীন রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জাপান সে সময় ইংরেজের দিকে ছিল। সেজন্য পরবর্তীকালে নেতাজী যা করতে পেরেছেন তখন তাতে বাধা পড়েছিল।

ওদিকে ডেনহ্যাম চুপ করে বসে ছিল না। সে বালেশ্বরের 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে' হানা দেয়। সেখান থেকে একটা কাগজের টুকরা পায়। তাতে কপ্তিপদার নাম ছিল। ব্যাস্। সে বালেশ্বরের সশস্ত্র পুলিস, নীলগিরি রাজ্যের সশস্ত্র পুলিস ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সশস্ত্র পুলিস নিয়ে রাতারাতি কপ্তিপদার ডাক-বাঙলোয় গিয়ে পেঁছায়। হাতি চেপে সাহেবরা গিয়েছিল। হাতির পিঠের ঘণ্টা শুনে একটি স্থানীয় লোক দাদাদের খবর দেয়। বালেশ্বরে পুলিস গ্রেপ্তার করে শৈলেশ্বর বোস, নিমাই এবং আবগারী বিভাগের কর্মচারী নারায়ণ ব্রহ্মচারীকে। কপ্তিপদায় বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিল্‌বি, ডেনহ্যাম, বার্ড, টেগার্ট যায়। পরবর্তী মোকদ্দমায় কিল্‌বির সাক্ষ্যে এ কথা আছে।

যতীন্দ্রনাথ এবং আপদ-বিপদ যেন পিঠোপিঠী ভাই। উভয়ে বড় ভাব। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, যতীন্দ্রনাথ সেখানে হাজির সর্বাগ্রে। যতীন্দ্রনাথ বোধ হয় সম্পর্কে বিপদের বড়ভাই ছিলেন।

এদিনও তিনি জ্যেষ্ঠের কর্তব্যে পিছিয়ে যান নি। স্বয়ং একলা নদী পার হয়ে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন। বুঝলেন সাহেবরা আছে। এই রাত্রে, এমন জঙ্গলে কোন্ সাহেব আর আসবে ? সাহেবদের প্রকৃত পরিচয় আন্দাজ করতে ভুল করেন নি। এরা যে শত্রুপক্ষ সেটাই ঠিক বুঝেছিলেন।

দ্রুত পদবিক্ষেপে ফিরে এলেন। সবাইকে সাবধান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তখনই

স্থান ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিতে বললেন। দাদাকে ওখানকার লোকে বলত 'সাধুবাবা'।

সেখানে তখন ছিল মনোরঞ্জন সেন ও চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। নীরেন দাশগুপ্ত ও যতীশ পাল ছিল আরও বারো মাইল দূরে আর একটা আড্ডায়, তালডিহিতে।

কপ্তিপদায় যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর নাম মণীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর বাড়ি দাদার আস্তানার অল্প কিছু দূরে। দাদারা মণিদাকে ডেকে সাবধান করে দিয়ে ভোরের দিকে তালডিহির পথে গেলেন। তিনি চাইলে বেশ পালাতে পারতেন। কিন্তু সে ধাতুতে তিনি গড়া নন। নীরেন, যতীশকে ফেলে গেলে নিরাপদ হন—কিন্তু সে নিরাপত্তাকে তিনি ঘৃণা করতেন।

তাঁরা থাকতেন একটি মুদিখানার দোকান ও আশ্রম করে। দাদা পরতেন গেরুয়া। গ্রামবাসীদের বিপদে আপদে সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন। রোগীর সেবা ও চিকিৎসা করতেন প্রাকৃতিক উপায়ে কিম্বা হোমিওপ্যাথী মতে। টিঞ্চার আইডিন, কুইনাইনের ব্যবহার জানতেন। খুব অসহায় লোক হলে নিজেদের কাছে এনে রেখে চিকিৎসা করতেন। নিরক্ষরদের পড়াতেন। গ্রামে আগুন লাগলে নেভাতে যেতেন।

ঘটনার দিন ঐরকম একটি শয্যাগত রোগী এঁদের আশ্রমে ছিল। যাবার সময় তাকে বলে গেলেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে যেন বলে—বাবুরা পশুর পায়ের দাগ অনুসরণ করে জঙ্গলে শিকার করতে গেছেন। যে চাকরটি ছিল সেও এত অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল যে এঁদের সঙ্গে তালডিহি পর্যন্ত গিয়েছিল।

৭ই সেপ্টেম্বর সকাল হতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মহকুমার হাকিম অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়কে ডেনহ্যাম ডেকে পাঠায়। ডেনহ্যামের সঙ্গে বিহারের গোয়েন্দা বিভাগের ডি. আই. জি. রাইল্যান্ড ছিল। এদিকে একজন স্থানীয় লোককে হুকুম দেওয়া হয় বাবুরা আছে কিনা দেখে আসতে। সে সব ফাঁকা দেখে ফিরে গিয়ে খবর দেয়। সাহেবদের বিশ্বাস হয় না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাঠায়। সেও ফিরে গিয়ে একই সংবাদ দেয়। তারপর মণিবাবুর ডাক পড়ে। তিনি বলেন—জঙ্গলে ঠিকেদারির কাজ করতে এরা এসেছিল। তাঁর সঙ্গে এ-ছাড়া কোনো সম্পর্ক নেই। এ সময় তারা কোথায় তিনি জানেন না।

এবার সাহেবরা সদলবলে আশ্রমে গেল। সাহস করে কে গোপনে অবস্থিত বাঘের সামনে যাবে? সেইজন্য অক্ষয়বাবুকে হুকুম হল আগে যেতে। স্বয়ং অক্ষয়বাবুর মুখ থেকে এইসব সংবাদ সংগ্রহ করি।

চাকরি করা যে ঝকমারি অক্ষয়বাবু তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন সেদিন। কাঁচা

মাথাটা আগে দিতে হচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে কোনো বিপদ হয় নি। কারণ সত্যই তো কেউ ছিল না। আমি নিশ্চয় বলতে পারি কেউ থাকলে অক্ষয়বাবু প্রথম খতম হতেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমি নিজেই একবার এইরকম বিপদের আস্বাদন করেছি। একটা আড্ডায় ওদের খবর দিতে হঠাৎ ঢুকে পড়ি। চিত্তপ্রিয় যেন বাঘের বাচ্ছা। সেও পিস্তল তুলে আমায় লক্ষ্য করে।

আবার গোয়েন্দা বিভাগের সুরেশ মুখার্জী নিহত হবার পর বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের একটা মেসে বিপিনদা, দাদা, চিত্ত, নীরেন ও মনোরঞ্জন একদিন আশ্রয় নেন। পরদিন প্রাতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আমায় ডাকা হয়। আমার কাছে সংবাদের ভাণ্ডার। সংবাদ দিতে হবে। শীত কাল। আমি পথপ্রদর্শকের সঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখি সব ক'জন আপাদমস্তক র‍্যাপার ঢাকা দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। তার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি 'দাদা' জানব কি করে? সেইজন্য আন্দাজে একজনের মুখের ঢাকা যেইমাত্র খুলেছি অমনি ব্যাঘ্র-ঝম্পনে লাফিয়ে উঠে সেই ব্যক্তি আমার ওপর রিভলভার তাক্ করে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ফিস্‌ফিসের চিৎকার যত জোর হয় তাই ক'রে বলে উঠলাম—'আমি, আমি, আমি যাদুগোপাল।' তাতেই রক্ষা।

সে আর কেউ নয়—স্বয়ং চিত্তপ্রিয়। নিতান্ত অপঘাতে প্রাণটা যাবার নয়। তাই বড় বেঁচে গিয়েছিলাম সেদিন। মনে মনে বললাম পূর্ণ দাস আচ্ছা বাঘের বাচ্ছা তৈরি করেছে যা'হোক।

কাপ্তিপদায় মসার পিস্তল ব্যবহারের অভ্যাস করতে করতে দুর্ঘটনাক্রমে মনোরঞ্জনের উরুদেশে গুলী ঢুকে যায়। আশু দাস গিয়ে চিকিৎসা করে আসে। এঁরা ছিলেন বেপরোয়া কয়েকটি আত্মা। সাধারণ মানুষের পর্যায়ে এঁরা পড়েন না। দাদাকে সাপে কামড়ায়। কিন্তু তিনি আশ্চর্যভাবে বেঁচে যান।

এঁরা মহিমামণ্ডিত উপায়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হবেন কিনা? তাই আঁধারে আঁধারে তাঁরা ইহলোক থেকে চলে যান নি।

অক্ষয়বাবু অক্ষত অবস্থায় থাকায় ক্রমে সাহেবরা আসতে সাহস পায়। খানাতল্লাশি করে কয়েকখানি ভালো বই পায়, সিঙ্গাপুরের সেই কাগজের টুকরোটা। দাদার চিন্তার প্রতীক একখানি তাঁর স্বহস্তে লিখিত খাতা। যেটার সম্বন্ধে পরে সাহেবরা বলেছিল—যে লোক এত উচ্চচিন্তা করতে পারে সে একজন জগৎ-নেতা হবার যোগ্য। এই কথা বহু পরে বালেশ্বরে ঐ সময় কর্তব্যরত এক পুলিস-কর্মচারীর মুখে শুনেছি। দারোগা কানাই ভৌমিক রেলের উপর নজর রাখতে আদিষ্ট ছিলেন।

পরে ঐ জায়গায় চারজন সশস্ত্র পাহারা এবং মণিদার বাড়িতে আর চারজন সশস্ত্র পাহারা রেখে সাহেবরা দলবল নিয়ে বালেশ্বরের দিকে ফিরে চলল।

মণিদাদের সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি। রাত্রে কোনোরকমে দুটো খেয়ে শুয়েছেন। মনটা ভালো যাচ্ছিল না।

রাত আন্দাজ এগারোটা হবে। বাড়ির পিছনের জানলা দিয়ে কার চাপা গলার আওয়াজ—'দাদা, দাদা—'

মণিদা ঝাঁ করে বুঝে ফেললেন—এ যে যতীনের কণ্ঠস্বর। কী সর্বনাশ! ভোরে যদি চলে গেল তবে আবার ফিরে আসা কেন?

মণিদা আস্তে আস্তে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সব খবর বললেন।

যতীনদা বললেন, 'পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারেন? হাতে পয়সা-কড়ি কিছু নেই।' তাঁদের গচ্ছিত টাকা মণিদা দিলেন। পাঁচটাকার দশখানি নোট। তারপর মণিদার কাছ থেকে একটি বন্দুক চান। মণিদার এগারোটা বন্দুক ছিল। তার থেকে একটি দিলেন। যতীন্দ্রনাথ বললেন যে, সেই বন্দুকটা ফেরত দিতে পারবেন না।

মণিদা খুব অনুনয় করে বললেন তাঁরা যেন মেঘাসনি পাহাড়ের কোলে কোলে চলে যান। তাহলে কোনো বিপদ তাঁদের স্পর্শ করতে পারবে না। নিমেষের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ লৌহমূর্তিতে যেন পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। বজ্রদৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'খালি প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব? আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব!' অন্য ভাইরা তাদের নেতার কথারই প্রতিধ্বনি করল। এই সংবাদ মণিদার কাছ থেকে পেয়েছি।

বলেছি তো আপদ ও যতীন্দ্রনাথ দুই যমজ ভাই। ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে? যতীন্দ্রনাথ পালাবার পথ দেখলেন না। যুদ্ধের পথে চললেন। ইংরেজ-শক্তির পিছু ধাওয়া করলেন। চললেন বালেশ্বরের দিকে।

দৈবক্রমে ইংরেজের সশস্ত্র বাহিনী ততক্ষণে প্রধান পথ ছেড়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার আরও একটি কাজ করে রেখেছিল। গ্রামে গ্রামে প্রচার করে দিয়েছিল—জার্মান ডাকাত এসেছে; বাঙালী ডাকাত এসেছে, তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে প্রতিটি লোক পিছু দুশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল চাঞ্চল্য।

এদিকে ৮ই দাদারা বালেশ্বর স্টেশন অবধি বিনা বিঘ্নে পৌঁছে গেলেন। দেখলেন একটা ট্রেন অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে নিলেন। গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু অত লম্বা ট্রেনের অনুপাতে যাত্রীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। ঠিক সন্দেহ করলেন এই ট্রেন পুলিসের লোকে ভর্তি হয়ে আছে। বোধ হয় দিদির কথা মনে পড়েছিল—'দেখো, যেন শুনতে না হয় সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ।'

পাঁচজনেই গাড়ি থেকে নেমে এলেন। টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আবার ফিরে চললেন। শহর থেকে দূরে মাঠের পথে—গ্রামের ধার দিয়ে। হরিপুর গ্রামে এসে পড়লেন। তারপর বুড়ীবালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুর পেঁছান।

ভাদ্রমাসের ভরা নদী। পারের জন্য নৌকা পাওয়া গেল না। কিছুদূরে একটি কাঠবাহী নৌকা খালি ছিল। তার মাঝি এই লোকগুলির অনুনয়-বিনয়ে পার করে দিল। এক ব্যক্তি এঁদের জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে সন্দেহ করে। লোকটি দফাদারকে ডাকতে গেল। ততক্ষণে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। চারদিকে রব উঠল জার্মান ডাকাতরা এসেছে। দফাদার বাড়ি ছিল না। তার ভাই আসে। দাদারা একটা ফাঁকা আওয়াজ করলেন। লোকগুলি পালাল—কিন্তু আবার ফিরে এল। বেলা প্রায় এগারোটার সময় তাঁরা দামুদ্রা গ্রামে পেঁছান।

এটা ৯ই তারিখের কথা। গ্রামের মুরুব্বি রাজমাহান্তি এবং সুদানি গিরি সামনে গিয়ে পথ আগলায়। মনোরঞ্জন গুলী করতে বাধ্য হয়। রাজমাহান্তি মারা যায়। সুদানি খুবই আহত হল। লোকেরা পালাল। কিন্তু দূর থেকে অনুসরণ ছাড়ল না। দফাদারের ভাই তিন চারজন লোক নিয়ে বালেশ্বরে খবর দিতে চলে গেল। ক্রমে সবাই পালাল। দু' চারজন দাঁড়িয়ে তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

দু'দিন (ডাক্তার সত্যেন গাঙ্গুলী বলেন তিনদিন) ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ হয় নি। দিনরাত শারীরিক শ্রম, বিনিদ্র পল-ক্ষণ। একটা গ্রাম্য খাবারের দোকান পথে পড়ল। সেখানে বসে যা পাওয়া গেল খেলেন। দাম দিতে গিয়ে একটা পাঁচটাকার নোট দিলেন। সঙ্গে খুচরা টাকা-পয়সা তো ছিল না। টাকা দেড়েকের মতো সামগ্রী দিয়ে পাঁচ টাকার নোট লাভ! এরা কত মহাপ্রাণ—ভাবল দোকানদার।

সময় নেই—একমুহূর্তও বাজে খরচ করার সময় নেই! আজ যে ভাগ্য-পরীক্ষার দিন। বিধিলিপি মানুষের পাঠের মতো ফুটিয়ে যাবার দিন।

তাঁরা চললেন। সঙ্গে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ। তার ক্ষুদ্র চাবিকাঠিটা সবার অজ্ঞাতসারে কোথায় পড়ে গেল! কেউ আন্দাজও করতে পারলেন না কী সর্বনাশ সেই সময় হয়ে গেল।

কিছুদূর যাবার পর গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে এসে ছেঁকে ধরল। তাদের সরে যেতে এবং চলে যেতে বলা হল। কিন্তু হাজার টাকার লোভ—সে কি সামলানো যায়?

মিষ্টি কথা, অনুরোধ, বিনয়, শুভেচ্ছা, সাবধানের বাণী, দৃঢ়স্বরে সতর্ক করা—সব বিফল হল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে যতীন্দ্রনাথকে জাপটে ধরল।

পলকে প্রলয়! নিমেষের মধ্যে ছিটকে সে চিৎপাত হয়ে ধরাশায়ী হল। অনেক

কণ্টে উঠে দাঁড়াল—অন্যান্যদের এগিয়ে এসে দাদাদের ধরবার জন্য চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল। সাহস করে কেউ আর গায়ে হাত দিতে এগুলো না। কিন্তু সঙ্গও ছাড়ল না।

বীরশ্রেষ্ঠ ছেড়ে অন্যদের ধরার চেষ্টা করল। অতঃপর শেষবারের মতো সতর্কবাণীতে সরে যাওয়ার উপরোধ ব্যর্থ হলে মনোরঞ্জন গুলী ছোঁড়ে।

গুলীতে একজন হত ও কয়েকজন আহত হয়। দুরভিসন্ধিপূর্ণ লোকেরা এবার পালিয়ে গেল। অতঃপর দাদারা এগিয়ে চললেন। গ্রাম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে চাষখন্দের কাছাকাছি একটি নদী পড়ল। সরকারী প্রচার ও প্রচেষ্টায় সব পারঘাটের নৌকা আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এঁরা পাঁচজনে সাঁতরে নদী পার হলেন। ভিড়ের লোকেরা পার হল না।

একটি গরীব গ্রামবাসীও আর এক জায়গায় সাঁতরে নদী পার হয়। এঁরা ক্রমে এগিয়ে একটি প্রকাণ্ড উই ঢিপির পাশে গিয়ে বসলেন। এইবার বোধ হয় বিশ্রামের অবকাশ মনে করলেন। সেই অতি দীন-দুঃখী, ছেঁড়া কাপড় পরা লোকটি নদী পার হয়ে একধারে গিয়ে একরকম চুপিসাড়ে একটি গাছে উঠে গেল। এই লোকটি একজন দারোগা। গরীব সেজে ছিল। নাম চিন্তামণি সাহু।

বেলা দুটোর সময় বালেশ্বরের পুলিসসাহেবের কাছে খবর পেঁছাল। ম্যাজিস্ট্রেট কিল্‌বি সশস্ত্র পুলিস নিয়ে নিজেই কর্মভার গ্রহণ করলেন। চাঁদিপুরের রদারফোর্ড ফৌজের পরিচালক হল। সদলবলে এরা যতীন্দ্রনাথদের বিরুদ্ধে ধাওয়া করল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিল্‌বি, পুলিসসাহেব খোদাবক্স, ডি. আই. জি. ই. বি. রাইল্যাণ্ডসাহেব (ডি. আই. জি, সি. আই. ডি, পাটনা) সমস্ত সশস্ত্র পুলিস এবং মিলিটারিদের জুটিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট রদারফোর্ডের নেতৃত্বে যাদের খোঁজ করছিলেন তাদের সন্ধানে চলল। কিন্তু প্রকৃত কোন্ জায়গায় দাদারা আছেন জানা না থাকায় এদিক ওদিক পর্যবেক্ষণ করছিল। এমন সময় দূর থেকে দেখল একটা গাছ থেকে একটা ভাঙা, সরু ডালে জড়ানো একটুকরো কাপড় নড়ছে।

এবার মনোরঞ্জনরা ব্যাপারটা বুঝল। কারণ তারাও পতাকা নেড়ে সামরিক যে ইসারা করা যায় সে বিদ্যা শিখে কপ্তিপদায় অভ্যাস করত। সিমাফোর—এই বিদ্যার ইংরেজী নাম। সশস্ত্র সরকারী বাহিনীও সংকেত বুঝে অকুস্থলে অগ্রসর হতে লাগল।

দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম...সরকার পক্ষ থেকে গুলীবর্ষণ হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরা এগুতে লাগল। যুদ্ধে দু'রকম ট্রেঞ্চ ব্যবহার হয়—Slit or Surface trench—খোঁড়া গাড়া (গর্ত নর্দমার মতো) অথবা অ-খোদিত মর্চা; শেষের

মর্চায় বালির বস্তা, পাথরের স্তূপ বা ঐরূপ কিছুর আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে হয়। দাদারা উই ঢিপির আড়াল থেকে যুদ্ধ করেছিলেন।

সরকার পক্ষের গুলীবর্ষণ চলতে লাগল। কিন্তু জাতীয় বীরদের পক্ষ থেকে তখনও চুপচাপ। যতীন্দ্রনাথ শুধু যে পুরোপুরি নির্ভীক, বলী, বীর ছিলেন তা নয়, কত সুন্দর সেনানায়ক ছিলেন তা এই যুদ্ধে বুঝা যায়।

সরকারী সিপাহীরা বুঝল স্বদেশীবাবুদের দুরপাল্লার অস্ত্র নেই। তারা এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল। কারণ লেফটেন্যান্ট সাহেবের হুকুম তখন তাই।

অকস্মাৎ একি! দু'তিনশো সিপাহীর সামনে ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে ভেবেছিল যাদের, তাদের তরফ থেকে অতি দ্রুত জবাব আসতে লাগল। কটাকট্ কটাকট্ কটাকট্...মসার পিস্তল সময় বুঝে মারাত্মক গুলী উদ্গিরণ করতে লাগল।

ব্রিটিশ সিপাহীরা নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে রুদারফোর্ডসাহেব সমেত হতাহত হতে হতে পালাতে লাগল।

নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্রের পাল্লার মাঝে আসতে উৎসাহিত করে যতীন্দ্রনাথ হুকুম দিয়েছিলেন—'Fire—গুলী করো শত্রুদের উপর!' যুদ্ধে সুফল ফলল।

'ব্রিটিশ বাহিনী কাদামাটিতে শুয়ে পড়ল। যারা পারল চাষের জমির আলের আড়ালে রইল। যেমনি মাথা তুলে বন্দুক চালায়, দেশমায়ের বীর সন্তানদের কাছ থেকে প্রত্যুত্তর পায়। শত্রুরা একরকম অনর্গল গুলিবাজি করে—ভারতীয় বীররা বুঝে বুঝে জবাব দেয়।

প্রায় দু'তিন ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। স্বদেশী বীরদের টোটা ফুরিয়ে এল। যতীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন ছোট চামড়ার থলিটি খুলে আরও টোটা বের করতে।

কী নিদারুণ দুর্ভাগ্য! থলিটির চাবি পাওয়া গেল না। কারও কাছে নেই। তাড়াতাড়ি হাতড়ে হাতড়ে দেখা হল। গত্যন্তর হয়ে দাঁতে করে সেটা কাটবার চেষ্টা হল। এমনি শক্ত ছিল সেই চামড়ার ব্যাগ যে কাটা গেল না।

ইতিমধ্যে সিপাহীদের এক সুবেদার গাছের ডালে উঠে পড়েছিল। কানের পাশ দিয়ে যাওয়া একটি গুলীকে এড়িয়ে যেই চিত্তপ্রিয় মাথা তুলেছে, গাছ থেকে সুবেদার তার মাথায় অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলী মারল। বীরবর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

যতীন্দ্রনাথের বাঁ হাতের বুড়োআঙুলে গুলী বিদ্ধ হলে তিনি এক হাতে মসার পিস্তল চালাচ্ছিলেন। এবার টোটা ফুরিয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট কিছু নেই। এমন সময় তাঁর পেটে গুলী বিদ্ধ হল। যতীশও ভীষণ আহত হল। মোকদ্দমার এক সাক্ষী বলেছে যতীন্দ্রনাথের বগলের নীচে গুলী লাগে। সেটি কিন্তু পেটেই

প্রবেশ করেছিল। তাঁর চোয়ালেও আঘাত লেগেছিল। He was injured in the armpit and jaw—এই ছিল postmortem report—শবব্যবচ্ছেদকের উক্তি।*

সংবাদপত্রে প্রচার হয় যে নীরেন ও মনোরঞ্জন হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে। এ বিষয়ে খুবই খটকা লাগে। সেই বীরদের চরিত্রে এটা সম্ভব মনে হয় না।

১৯৪৮-৪৯ সালে বিখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ঐ স্থানে অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। তিনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন তাতে কিন্তু আত্মসমর্পণের কথা আসেই না। দাদা, যতীশ ও চিত্তকে নিয়ে কর্মীরা যখন ব্যস্ত সেই অবকাশে শত্রুসৈন্যেরা আত্মগোপন রেখে ঘিরে ফেলে এবং পিছন থেকে এসে সেবারত ছেলে দুটিকে গ্রেপ্তার করে।

সেদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে ভারতের অকুতোভয় বিপ্লবী-আত্মার অর্ঘ্য দেশমায়ের পায়ে এমনি করে লুটিয়ে পড়েছিল! তারাই প্রথম পথ দেখিয়ে গেল স্বল্পশক্তি কেমন করে প্রবলশক্তিকে পাল্টা জবাব দিতে পারে। দেশব্রতী বীরদের পালিয়ে বাঁচার পালা শেষ করে সম্মুখ সমরে আত্মাহুতির নতুন পথে দেশের বিদ্রোহী শক্তিকে কি করে বলীয়ান করা যায় তাই তাঁরা দেখিয়ে যান। স্বাধীনতার যুদ্ধ-যজ্ঞে বালেশ্বরের যুদ্ধ এমন সমিধ যুগিয়েছিল যে, হোমাগ্নি আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

[* **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** ৩রা আশ্বিন ১৩৬৫ সাল, ইংরেজী ১৯৫৮ সালের ২৩শে অক্টোবরের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'বাঘাযতীন-এর শেষ কয়েক ঘণ্টা' পড়ে বীরগণের আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। আমাদের বার বার মনে হ'ত চিত্তপ্রিয় অমরলোকে চলে গেছে, যতীন আহত। যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক রকম জখম—তখন নীরেন, মনোরঞ্জন-এর পক্ষে খুব স্বাভাবিক এ ধারণা করা যে কোনও উপায়ে ওদের, বিশেষ করে দাদাকে বাঁচাতে হবে। সেই অবস্থায় আত্মসমর্পণ খুবই সম্ভব।

ডাঃ গাঙ্গুলী সে সময়কার বালেশ্বর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি লিখছেন—(যতীন্দ্রনাথের উক্তি) 'এবার আমার পালা ডাক্তার। আজ আমাদের জীবন দেবার শুভ সুযোগ এসেছে। সুরু হল আবার গুলী বিনিময়—সম্মুখে পিছনে, দক্ষিণে বাঁয়ে চারিদিক হতে আসছে গুলী—ওই যে আমাদের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে—ঐ জীবন-মরণের সেতু ভেঙ্গে আসছে।

তারপর অজ্ঞান হয়ে গেছি। কতক্ষণে জ্ঞান হল জানি না……দেখলাম যতীশ আহত হয়ে পড়ে আছে। মনোরঞ্জন ও নীরেন দু হাত তুলে আত্মসমর্পণ করছে… জানো ডাক্তার আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আসবে—পরাধীনতার শিকল ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে।']

দেশ সেদিন অপূর্ব সমৃদ্ধিতে মহিমান্বিত হল।

বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে বীরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ চিত্তপ্রিয় ইতিমধ্যে বীরেন্দ্রগণের সাধনোচিত ধামে গিয়ে অমরত্ব লাভ করেছিল। যতীন্দ্রনাথ নিজের উপর সব দায়িত্ব নিলেন। পরদিন মহাবীর মহাশয়নে চিরনিদ্রিত হলেন বালেশ্বর হাসপাতালে।

দেশের বিপ্লবী-আত্মার শক্তি নিজের বলবত্তা কখনও খোয়ায় নি। আঘাতের পর আঘাতে সে পবিত্র নিষ্কল অগ্নি আরও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'হার মানব না'—এই কথা বালেশ্বর যুদ্ধের বীরগণের চিতাগ্নি অনুকূল বাতাসের সহায়ে দেশময় ছড়িয়ে দিতে লাগল।

যারা ধরা পড়ল তাদের স্পেশ্যাল বিচারকমণ্ডলীর কাছে বিচার হয়। যতীশ পালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ এবং নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হয়।

ফাঁসির আগের দিন তারা আমার পরম বন্ধু ভূপতি মজুমদারকে কোনো উপায়ে একটি পত্র পাঠায়। তাতে এই মর্মে লেখা ছিল—

'দাদা, কাল আমাদের জীবনের বিজয়া দশমী। ঐদিন আপনাদের এবং চিরপ্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।……কে বিশেষ সাবধানে থাকতে বলবেন। তার উপর বিশেষ কোপদৃষ্টি। যাবার আগে মাতৃভূমির স্বাধীনতা কামনা করে যাব। যদি এ ব্রত অসমাপ্ত থেকে যায়, প্রার্থনা করব যেন আবার এই দেশে জন্মগ্রহণ করি এবং ব্রত-উদ্‌যাপন করে যেতে পারি।'

ভাষায় দু'এক জায়গায় আমার ভুল-ত্রুটি স্বীকার করছি। কিন্তু এ চিঠিটা আমরা সকলে দেখেছি।

কী মহাপ্রাণ! কাল ফাঁসি। আজও তাদের নিজেদের সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই। চিন্তা করছে শুধু সংগঠন-রক্ষা ও আমাদের জন্য। ধন্য ভারতমাতা! তুমি নইলে এমন বীরপ্রসবিনী কে হবে?

আমি বাড়ি থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর উধাও হই। কাজের জন্য কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। আমাদের সংবাদ-সংগ্রাহক বিভাগ শত্রুদের বালেশ্বর যাত্রার খবর আনে। খবর কলকাতার বাইরে আমায় পেঁছে দেওয়া হয়। দাদাদের সরিয়ে আনবার জন্য আমরা রওনা হই। আমি, শৈলেন ঘোষ ও নলিনী কর যাই। যাতায়াতের উপায় শত্রুর হাতে। আমাদের মোটর বা রেল তো ছিল না। ওদের রেলে যাই। পেঁছাতে সেজন্য কিছু দেরি হয়ে গেল। আমরা পেঁছবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম দাদা হাসপাতালে কতকটা সুস্থ হলে হাসপাতালে হানা দিয়ে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। অন্তত সেরূপ সৎ চেষ্টা করব। কিন্তু নিয়তি অন্য পথ নিল।

ভারতের বিদ্রোহী প্রাণ সতীর্থ যতীন্দ্রনাথের আত্মদানে একটা নতুন পথ পেল। দেশমাতার ললাটের টিকা সেদিন আরো গৌরবোজ্জ্বল হল।

বাংলায় এর পর কয়েকটা যুদ্ধ হয়েছে—সালখে, গৌহাটি, কলতাবাজার। অন্ধ্রদেশে আল্লুরি সীতারাম রাজুও ১৯২২-২৪ সালে এই পথ অনুসরণ করেন। যুক্তপ্রদেশের চন্দ্রশেখর আজাদ এলাহাবাদে নিজ পরিচয় এইভাবে দিয়ে গেছে ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদ পাহাড়ের অনন্যসাধারণ যুদ্ধ এরই উচ্চতর ধরনের স্ফুরণ।

যতীন্দ্রনাথের অকাল প্রয়াণে আমরা যা হারালাম তা বরাবর অপূরণ থেকে যাবে। যাবারই তো কথা। তাঁর চরিত্র লোকোত্তর বলা যেতে পারে। অতুল ঘোষ ঠিকই বলেন—'শিবাজীর মতো রণকুশলী দেশপ্রেমিক ও চৈতন্যের মতো হৃদয়বান একাধারে পেলে আমরা পাই যতীন্দ্রনাথকে।'

তাঁর মধ্যে বিপরীত গুণের অসাধারণ সমন্বয় হয়েছিল। একাধারে হনন ও প্রেম; নির্দয়তা ও দয়া। বধকর্তা ও বধ্য যেন একাধারে বিজড়িত। মায়ের মতো স্নেহ-কোমল হৃদয় ভালবাসায় ভরা। সে অবস্থায় যে তাঁকে দেখেছে তার মনে হবে না যে ইনি আবার কুলিশ-কঠোর হতে পারেন কর্তব্যের আদেশে। যে লোক বৃদ্ধা রমণীর ঘাসের বোঝা স্বয়ং মাথায় করে নিয়ে গিয়ে তার কুটীরে পেঁছে দিয়ে আসেন, যে ব্যক্তি ওলাওঠা রোগীর মলমূত্র অঞ্জলি ভরে সাফ করেন, যে ব্যক্তি মাসের সমস্ত বেতন অকাতরে অপরকে দান করে তারই কাছ থেকে পাঁচটি পয়সা ধার নিয়ে গ্রামে বাড়ি ফেরেন, যে ব্যক্তি শ্রান্ত অনুচরকে পাখার বাতাস ও শুশ্রূষা দিয়ে ঘুম পাড়ান, সেই ব্যক্তিই নির্মম, নিরঙ্কুশ-চিত্ত—যমের মুখে এগিয়ে যাবার হুকুম দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে—অদ্ভুত এ সমাবেশ। আর তাঁকে দেখেছি—মূর্তিপরিগ্রহকারী গীতা। এর ওপর আর কথা নেই। বলেছি তো ভয় জিনিষটি কী তা তিনি জানতেন না। এমনই তাঁর মায়ের শিক্ষা। আত্মসম্মান জ্ঞান অসাধারণ। তাঁকে ছেলেবেলায় পুকুরে নাইতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডুব দিতে ভয় পেয়েছিলেন। মা ডুবিয়ে স্নান করিয়ে ছাড়লেন। একটা কুকুরকে দেখে ভয়ে পেছিয়ে আসছিলেন—মা ওঁকে দিয়েই সেই কুকুরকে তাড়িয়ে ছাড়লেন। সেই যে ভয় ভাঙল, সারা জনম সেই ভয়ের টিকিটি আর দেখা গেল না। কাদের ছেলেকে মেরে এসেছিলেন—তার মা এসে নালিশ করলেন। যতীন্দ্রের মা মুখের উপর বলে দিলেন—'আমার ছেলে এমন অপকর্ম করতে পারে না।' কাদের ঝিকে বুঝি একটা কড়া কথা বলেছিলেন—সে এসে নালিশ জানাল। মায়ের মুখে সেই একই উত্তর—'আমার ছেলে এমন কথা মুখ থেকে বার করতে পারে না।' প্রকাশ্যে তো এই বললেন; অন্দরে নিভৃতে নিয়ে

ছেলেকে বললেন, 'তুমি কার সন্তান জান? তাঁর মুখে কি কালি দেবে?'—মায়ের এই সুমিষ্ট শাসনে ছেলে একেবারে ঢিট্। আর তাঁকে এমন অন্যায়ের মধ্যে কেউ কোনোদিন দেখে নি। ভয়ের কথা কি আর বলব? তিনি কোনোদিন চমকেছেন বলে মনে হয় না।

গীতায় সাধা ছিল তাঁর জীবন। সুখ-দুঃখ, বাঁচা-মরা, লাভ-অলাভ, জয়-অজয়, নিন্দা-স্তুতি তাঁর কাছে ছিল তুল্য। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল। তাঁর চেহারার বর্ণনা-সমেত ফটো দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হল। তাঁকে ধরিয়ে দিলে মোটা পুরস্কার মিলবে, বিদেশী সরকার তাও বিধিমতো প্রচার করল। ধরা পড়লে নিশ্চিত ফাঁসি। এমন অবস্থায় তাঁকে বালেশ্বরে সরিয়ে দেওয়া হল। তিনি জার্মান ষড়যন্ত্রের পরিণতিস্বরূপ অস্ত্রপাতি প্রাপ্তির আশায় পল গুনে গুনে কালাতিপাত করতে লাগলেন। কালক্রমে অস্ত্রবাহী জার্মান জাহাজ ধৃত হওয়ার খবর তাঁকে পৌঁছানো হল। ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর আঘাতে মুহূর্তে সাধের স্বপ্ন ভাঙল। আমরা কত সঙ্কোচ করছিলাম মন্দ খবরটা তাঁকে দিতে। এমন কি ব্যবস্থাও করেছিলাম—হঠাৎ সব কথা না বলে ক্রমে ক্রমে গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে প্রকাশ করতে। তিনি কিন্তু যেমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শুনতে আরম্ভ করেছিলেন তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শোনা একনিঃশ্বাসে শেষ করলেন। যেন বিষম বা বিরাট কিছু অঘটন ঘটে নি। শান্ত ভাবেই বললেন, 'আমরা একটা মস্ত ভুল করতে বসেছিলাম। ভগবান শুধরে দিলেন। আমরা বিদেশের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম। দেশ কিন্তু নিজের জোরে দাঁড়াবে। অপরের সাহায্যে নয়। বাঁচা গেল।' তাই বলতে পারি তিনি ছিলেন যেন রূপ-মূর্ত গীতা।

যতীন্দ্রনাথ কথা কইলে শ্রোতার দেহমনে তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যেত, অভূতপূর্ব বল সঞ্চার হত। তাঁর সামনে অসম্ভব কিছুই মনে হত না।

একদা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে অমরদা, রাসবিহারী বসু ও দাদা গিয়েছিলেন। আলোচনা জমাট বেঁধে উঠল। যতীন্দ্রনাথ বললেন 'কেল্লাটা দখল করতে হবে। এর ব্যবস্থা করতে পার?' মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় রাসবিহারী বললেন, 'হ্যাঁ।'

সত্যই তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দেশী সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন।

আমার নিজের জীবনে ঠিক এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি এত বলীয়ান ও উচ্চ স্তরে বিচরণ করতেন যে তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি চোখে ঠেকে নি।

মানুষ হয়ত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু পূর্ণতার কাছাকাছি যাঁরা

পৌঁছেছেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের স্থান সুনিশ্চিত। অনেকবার ভেবেছি আমি কি মোহগ্রস্ত হয়ে গেলাম? তাঁর খুঁত খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের চরিত্রে কোনো খুঁতই চোখে পড়ল না।

যতীন্দ্রনাথ গেছেন—কিন্তু প্রাণে প্রাণে দাবানল জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। তিনি নেই, তাঁর আদর্শ চিরজাগরূক থেকে ভবিষ্যৎ অনুগামীদের পথ নির্দেশ করেছে।

ইংরেজের পক্ষে যাঁরা কপ্তিপদায় যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডেনহ্যাম, বার্ড, রাইল্যান্ড। টেগার্ট বালেশ্বরে অপেক্ষা করছিলেন এ কথা কেউ কেউ বলেন। কিন্তু কিল্‌বির সাক্ষ্যে অন্যরকম কথা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কথায় টেগার্টও কপ্তিপদায় যান। তিনি কলকাতায় ফিরে ব্যারিস্টার জে. এন. রায়কে বলেন, 'I have met the bravest Indian. I have very high regard for him. But I had to do my duty.—আমি ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখেছি। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমায় আমার কর্তব্য করতে হয়েছিল।'

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। এটা একটা বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ব্যাপার নয়। এই সময় মাতুনি লেগেছিল প্রাচীর বহু দেশে।

চীনের ইতিহাস এখানে একটু পর্যালোচনা করা দরকার। তাহলে বোঝা সহজ হবে ভারত ও চীনের কোথা দিয়ে স্বার্থ এক হয়ে গিয়েছে। ভারত ও চীন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে বাধ্য হয়েছে তাদের প্রাণের টানে বা জাতিগত স্বার্থের খাতিরে। ১৯১০ সালে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের দুটি বেণী-কাটা চীনা যুবক যে সান-ওয়েনের নাম করেছিল তিনিই সান-ইয়াৎ-সেন। তাঁরই উপদেশে এবং তাঁর অধিনায়কত্বে চীনে মুক্তি-আন্দোলন চলে। সত্যেন সেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপদেশ নিয়েছিল—এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। একই ব্যথার ব্যথী বলে তিনি দুঃখ কোথায় বুঝেছিলেন।

ব্যবসার তাড়নায় ব্রিটিশ সদাগর ১৮৪০ সালে প্রথম চীনে আসে। চীনের অন্য কোথাও বিদেশীদের ঢুকতে দেওয়া হত না। দক্ষিণে ক্যাণ্টন প্রদেশ। এখানে আসতে দেওয়া হত। ভারতের মাদ্রাজে ও চীনের ক্যাণ্টনে ঐতিহাসিক একটা সাদৃশ্য আছে। ভারত পুরাকালে আক্রান্ত হত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিক থেকে। চীনও তাই। ভারতের দক্ষিণ কোনোদিনও বাইরের শক্তির পুরা কবলে আসে নি বা বেশিদিন থাকে নি। চীনের ক্যাণ্টনও তাই। ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি দক্ষিণ দেশে সংরক্ষিত থেকে গেছে। চীনেও তাই। তাছাড়া ক্যাণ্টন, শ্যাম (এখন থাইল্যাণ্ড) ও ব্রহ্মের সান রাজ্যের লোক একই মূল থেকে উদ্ভূত। এদের প্রাণের সাড়া, চাঞ্চল্য, উলট-পালটের আকাঙ্ক্ষা, নিজের সত্তাকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা খুব লক্ষিত হয়। বিদেশীদের ও বিদেশী সংস্কৃতিকে চীন ঘৃণা করত। তার প্রাচীন সভ্যতার গর্ব খুবই ছিল। ব্রিটিশ সদাগর ভারত থেকে আমদানী আফিম চীনে বেচবার অধিকার চাইল। চীন অসম্মত হল। ইংরেজ এরই জন্য প্রথম চীনযুদ্ধে লিপ্ত হয়। নতুন রকমের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে চীনকে হার মানতে হল। চীনের কাছে ইংরেজ খেসারত পেল আর পেল হংকং এবং পাঁচটি বন্দরে ব্যবসা করার অধিকার—তার মানে আফিম-বিক্রিরও অধিকার। ইংরেজের হাতে চীনের মানসম্ভ্রম যাওয়ামাত্রই ইংরেজ সদাগরের মাসতুতো ভাইরা একে একে দেখা দিল। মার্কিন,

ফরাসি, বেলজিয়ান, জার্মানি, হল্যান্ড পৌঁছে গেল। তারাও ঐ পাঁচটি বাণিজ্য-বন্দরে ঢোকার অনুমতি পেল।

দ্বিতীয় যুদ্ধ : কল্পিত বা বাস্তব কারণ সম্বন্ধে ইতিহাস খুব স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় না; তবে ব্রিটিশ পতাকাকে কোনো চীনা অপমান করে। একজন ফরাসি পাদরীকে কে হত্যা করে। ১৮৫৬-৬০ সালে এই নিয়ে যুদ্ধ হয়। ১৮৬০ সালে সন্ধি হয়। চীনের কাছ থেকে আরও ছ'টা বন্দরে বাণিজ্যের অধিকার এবার বিদেশীরা পায়।

তৃতীয় যুদ্ধ : ১৯০০ সালে 'বক্সার' নামে এক গুপ্ত-সমিতি বিদেশী-বহিষ্কার আন্দোলন করে। বিদেশী পাদরী ও তাদের হাতে খৃষ্টান হয়েছিল যে চীনারা, তাদের হত্যা সাধন করে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে দেয়, বিদেশীর ঘর জ্বালিয়ে দেয়। রাজধানী পিকিং-এ বিদেশী রাজদূত ও অন্যান্য বিদেশীদের বাসস্থানগুলি বক্সাররা ঘেরাও করে রাখে। ফলে সপ্তরথী এবার চীনকে ঘেরে। জাপান, রুশ, ব্রিটিশ, ফরাসি, মার্কিন, জার্মানি ও ইটালির সৈন্যেরা বিদেশীদের উদ্ধার করতে যায়। বক্সারদের পরাজিত করে এবং রাজপ্রাসাদ দখল করে। চীনকে এবার বহু দণ্ড দিতে হয়—বিদেশীদের সুখ-সুবিধা মেনে চলতে হবে। চীন বত্রিশ কোটি ডলার খেসারত দিতে স্বীকার করে। মার্কিন পরে বদান্যতা দেখিয়ে নিজের অংশের খেসারতের দাবি মিটিয়ে নেয়। মার্কিন বলে ঐ টাকা দিয়ে চীন দেশে শিক্ষা-বিস্তার করুক। ছাত্ররা আমেরিকায় পড়তে যেতে পারবে।

১৮৯৪-৯৫ সালে জাপানের সঙ্গে চীনের প্রথম যুদ্ধ হয়। কোরিয়া নিয়ে হয় মনোমালিন্য। কোরিয়াকে চীন চাইত তার সামন্তভূমের মতো রাখতে। জাপান চাইছিল সেখানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আধুনিক বা ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তুলতে। চীন আধুনিকতাকে দু'চোখে দেখতে পারত না। বেধে গেল লড়াই। জিতল জাপান। চীন জাপানকে কোরিয়া দিল, বাণিজ্য-বন্দরে ব্যবসার অধিকার দিল, খেসারতের টাকা দিল আর দিল ফরমোজা দ্বীপ ও লিয়াওটুং উপদ্বীপ। এটি ছিল দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায়, কোরিয়ারই কাছে।

ইউরোপীয় শক্তিরা এতে আপত্তি জানাল। রুশ মনে মনে কামনা করছিল মাঞ্চুরিয়া নেবে। জার্মানি জাপানকে বদনাম দিয়ে ঘোষণা করল—'পীতাতঙ্ক'। ফরাসি, রুশ ও জার্মানি চাপ দিয়ে জাপানকে ওখান থেকে হটাল। জাপান চীনের ধন চীনকে প্রত্যর্পণ করল। একরকম সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানি নিরানব্বই বছরের ইজারা নিল শানটুং প্রদেশের কিয়াওচাও। কারণ দুজন জার্মান পাদরী ওখানে হত হয়েছিল। এটি ঘটে ১৮৯৮ সালে। রুশ অমনি লিয়াওটুং উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার বন্দর ইজারা নিল, মাঞ্চুরিয়ায় রেল নির্মাণের অধিকার পেল। ফ্রান্স দক্ষিণ

চীনের একটি উপসাগরে আধিপত্য বিস্তার করল। ইয়াংসি নদীর মুখ রক্ষা করতে লাগল। ইংরেজ নিল ওয়াই-হাই-ওয়াই, কিয়াওচাও-র কাছে। এগুলি হল এদের 'প্রভাবাধীন এলাকা'। তার মানে এদের দেশের পুঁজিপতিরা এইসব জায়গায় একচেটিয়া ব্যাপার করবে—রেল তৈরি করবে, খনির কাজ করবে এবং অন্যান্য লাভের কারবার করবে।

আমেরিকা ঠিক 'প্রভাবাধীন এলাকা' চায় নি। সে চেয়েছিল সব জায়গায় তার লোক ঘুরতে ফিরতে পারবে, কারবার খুলতে পারবে। ১৯04 সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ দেখে চীনের হুঁশ হয়। এর পূর্বে হাজার হাজার ছাত্রকে জাপান আমেরিকা ও ইউরোপ পাঠাতে থাকে। সেই দেখে চীনও আফিম খাওয়া বন্ধ করার আইন পাস করে, দেশে রেল তৈরি করায় উৎসাহ দেয়, পাশ্চাত্ত্য ঢঙে কিছু সৈন্যসামন্ত তৈরি করে আর নৌবহরকে শক্তিশালী করবার ব্যবস্থা করে। তার প্রতি প্রান্তে ব্যবস্থা-পরিষদ খোলা হয়।

১৯১১ সালে চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। রাজা মাঞ্চু জাতের হওয়ায় লোকে সাধারণ গণতন্ত্র স্থাপিত করতে মনঃস্থ করে। মাঞ্চুরা সপ্তদশ শতকে চীনে রাজত্ব করে। নানকিং-এ নতুন রাজধানী বসানো হয়। প্রাচীন চীনের রাজধানী সেখানেই ছিল। সাময়িকভাবে সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হন সান-ইয়াৎ-সেন। পরে শক্ত মানুষ ইউয়ান-সি-কি সভাপতি হন। তিনি গণতন্ত্রে অতটা আস্থা রাখার মানুষ ছিলেন না। নিজে সম্রাট হবার চেষ্টা করেন। সান-এর সঙ্গে হয় গোলমাল। সান পালিয়ে জাপানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন ১৯১৫-১৬ সালে।

সান-ইয়াৎ-সেন জাপানে থাকায় জাপানের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকদের সঙ্গে মেশার সুবিধা পান। সে সময় প্রাচ্য-সমবায়ের ধারণা এঁদের মনে জাগে। জাপানকে নেতা ক'রে চীন ও ভারত মুক্ত হয়ে একত্র দাঁড়ালে দুনিয়ায় একটা নতুন যুগ এনে দিতে পারবে এইরকম ছিল পরিকল্পনা। লালা লাজপৎ রায় এই সময়ে জাপানে ছিলেন। জাপান কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির হাত থেকে তারা সানটুং প্রদেশ কেড়ে নিল এবং হেরম্ব গুপ্ত ও রাসবিহারী বসুর নামে বহিষ্কারের ওয়ারেন্ট জারি করল। চীন ও ভারতের বিপ্লববাদীরা যা চাইছিল তার ঠিক উল্টোটাই ঘটল।

তোয়ামা ছিলেন জাপানের এক দুর্ধর্ষ লোক। তিনি 'ব্ল্যাক ড্রাগন' পার্টি নামে এক গুপ্ত-সমিতি করেন। তার ধুয়া হচ্ছে এশিয়া থেকে শ্বেতাঙ্গদের তাড়াতে হবে। 'শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র'—এই যুক্তিতে তোয়ামা রাসবিহারী বসু ও হেরম্ব গুপ্তকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। জাপানী পুলিস এদের ধরে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করতে পারল না।

এদিকে তোয়ামার পার্টি ও বহু সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী ওকুমার রাজনৈতিক চাল ভুল মনে করে উৎকট বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু করে। সংবাদপত্রে বহু বিরুদ্ধ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। জনচিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। প্রধানমন্ত্রী ওকুমার ওপর বোমা পড়ে, যার ফলে তাঁর একটা পা কেটে ফেলতে হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী হন জেনারেল তেরুচি। তাঁর সময়ে ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহার করা হল রাসবিহারীদের ওপর থেকে।

জাপানে লালাজী এই সময়ের রাজনৈতিক ঘোঁটে যুক্ত থাকেন ব'লে বহুদিন তাঁকে ব্রিটিশ সরকার ভারতে ফিরে আসতে দেয় নি। লালাজী বাধ্য হন আমেরিকায় থাকতে।

চীনের যেসব ছাত্ররা বিদেশ থেকে ফিরত তারা কেবল পুরাতন গরিমার কীর্তনে বিভোর থাকার চেয়ে এগিয়ে চলার বেশী পক্ষপাতী হয়ে ফিরত। তাছাড়া 'প্রভাবাধীন এলাকা' মুছে ফেলবার জন্য তারা হত পাগল। কারণ তারা মনে করত এটা একটা বিকট অপমানজনক ব্যাপার।

সান-ইয়াৎ-সেন ভারতের প্রতি সহানুভূতি করতেন এই কারণে যে, চীন ও ভারত একই রোগের রোগী। রোগীতে রোগীতে বেশ দরদ হয়। পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদকে এশিয়া থেকে মুছতে হলে একা চীন বা একা ভারত পারবে না। চাই সংহতি।

প্রত্যেক জাতের জন্মগত অধিকার আছে যে তারা নিজেরা ঠিক করবে কিরকম ভাবে তারা শাসিত হবে এবং কার দ্বারাই বা হবে। সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কারু কাছে তা চাইবার দরকার নেই। এখানে দুই দেশকেই বাধা দিচ্ছিল বিদেশীরা। পরাধীন জাত যদি এ আশা হৃদয়ে পোষণ করে, তাতে তারা আগে বাড়বার প্রেরণা ও সম্বল বা পাথেয় পায়।

তারা নামেমাত্র জাতি বা অভিজাতি (Nationality)। পরাধীন অবস্থা ঘুচিয়ে যারা স্বাধীনতা অর্জন করে তারা পূর্ণ-জাতি (Nation) আখ্যা পায়। স্বাধীনতা নাই অথচ জাতীয়তার অভিমান আছে—তাকে অভিজাতি বলা হল। জাতীয়ত্বের অভিমুখী তাই অভিজাতি। নিম্পিষ্ট জাতিরা আত্মাধিকার চায় কিসের কারণে—

(ক) বিদেশীর হাতে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

(খ) নিজেদের বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য।

(গ) নিজস্ব ভাষার দাবি নিয়ে দাঁড়াবার জন্য।

(ঘ) ধর্মের টানে। (শাসকদের সঙ্গে একধর্মের লোক নয় বলে)।

(ঙ) জাতির বিশিষ্টতায় (আজকাল সব জাতই রক্ত মিশিয়ে ফেলেছে। খাঁটি কেউ নেই)।

(চ) একই রকম অর্থনৈতিক স্বার্থ। (কৃষক ও ব্যবসায়ীরা মনে ভাবে স্বাধীন হলে কর ও ট্যাক্সের আইন নিজেদের অনুকূল করে নিয়ে তারা ভালো দিনের মুখ দেখতে পারবে। তাই এরাও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়)।

(ছ) ভৌগোলিক একত্বের দরুন (অর্থাৎ স্বাভাবিক সীমানা দিয়ে)—বড় নদী, পাহাড় বা সাগর দিয়ে দেশটি যদি অন্য দেশ থেকে পৃথক থাকে তাহলে তারই দরুন।

ঐতিহাসিক ঐতিহ্যও একটা বড় জিনিষ। চীন ও ভারত এই নির্ণয় শলাকা দিয়ে পূর্ণ জাতীয়ত্বের দাবি নিশ্চয়ই করতে পারে। উভয়কেই বাধা দিচ্ছিল স্বার্থপর বিদেশীরা। দুর্বল চীন ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক। দুর্বল ভারত চীনের পক্ষে বিপজ্জনক। দুর্বলতার জন্য অনিচ্ছাকৃত পাপে উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। দুর্বল ভারতের জন্য চীনে 'আফিম যুদ্ধ' হয়। ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে চীনকে পদানত রাখা সহজ। তেমনি চীনের সাহায্যে ভারতকে পীড়ন করা সহজ। অর্থাৎ চীনের ধনে ধনী হয়ে ভারতকে নাকের জলে চোখের জলে করা চলতে পারে।

সান-ইয়াৎ-সেন চীনের ভিতর দিয়ে ভারতকে সশস্ত্র বা সবল করবার প্রস্তাব সহানুভূতি সহকারে শুনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় মিল হয়। মিল পাওয়া যায় কয়েকটি ভিত্তিগত তথ্যের উপর।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে ঠেকিয়ে রাখার বৃথা চেষ্টা ছেড়ে তার থেকে গ্রহণীয় বিষয় নিতে হবে। পশ্চিমের জাতরা যাতে বড় হয়েছে—এদেশের লোকেরা সে বিষয়ে অবহিত হলে দেখতে পাবে সেখানকার জনসাধারণের চেষ্টাতেই যথেচ্ছাচারী রাজার হাত থেকে শক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদেশেও তাই করতে হবে। ওদেশের জাতেরা স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত হয়েছে। অভিনব আবিষ্কারগুলি শিল্পরাজ্যে বিপ্লব এনেছে। তাই দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করা হচ্ছে। এখানেও যোগ্যতা অর্জন করে প্রকৃতিকে জনসেবায় লাগাতে হবে। বিজ্ঞান-জগতেও আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কলকারখানা যথেষ্ট সংখ্যায় গড়ে তুলতে হবে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে দুটো স্তর উদ্ভূত হয়। প্রথম স্তর—বৈতালিকের স্তর। আগে মাথা জাগে, তারপর অঙ্গসঞ্চালন সুরু হয়। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও গণতন্ত্রের দাবি প্রথমে আসে পুঁজিপতি, সদাগর, ছোট ব্যাপারি, আইন-ব্যবসায়ী, বড় সাংবাদিক, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতির তরফ থেকে। কিছু কিছু উচ্চশিক্ষিত লোক এদের সঙ্গে থাকে। এরা কিছু সংস্কার ও বৈধভাবে শাসনযন্ত্র অধিকারের খেয়ালে মাতোয়ারা থাকে। এদের আরব্ধ কাজের ফলে যারা জাগে তারা এত অল্পে তৃপ্ত থাকতে পারে না। তারা হয় চরমপন্থী। তারা চায় আমূল

পরিবর্তন। জোড়াতালি নয়। তাদের মধ্যে থাকে অল্প আয়ের সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, ছাত্র, চিকিৎসক, কৃষক ও মজুর। এরাই বিপ্লবের উপাদান।

সুখের বিষয় এইসব সিদ্ধান্তে পার্টি আগেই এসেছিল। ১৯০৭-০৮ সালে এরকম একটা কাটা-ছাঁটার প্রয়োজন উঠেছিল। বারীনবাবুদের সন্ত্রাসবাদ ও আমাদের সমিতির কিছু লোকেদের শান্তভাবে শোষিত ভারতে তখনই বিশৃঙ্খলা আনার রায়ের বিপক্ষে যুক্তি উঠেছিল সুব্যবস্থিত বিপ্লবী-সংগঠন গ'ড়ে তোলার জন্য। অনুশীলন-এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু—শরৎ ঘোষ, যতীন শেঠ এবং আমায় ঐ পথে টানেন। বন্ধু দুটি সতীশবাবুর কথার সায় দিলেন। আমি রাজী হই নি।

জাতীয়তা অর্থে তখন এই বোঝা গিয়েছিল যে স্বাদেশিকতা হবে এক রাজ্য বা রাষ্ট্রের অধীনে। ভাষাসাম্য থাকবে তাতে। আচার-ব্যবহার, প্রথা, ঐতিহ্য, কৃষ্টিতে মিল থাকবে। ভারতের পক্ষে 'রাজা' না হয়ে সাধারণ গণতন্ত্রই ঠিক হবে। ভারত এতবড় যে তাকে একটা মহাদেশ বলা চলে। সেজন্য এখানে একটা রাষ্ট্র-সমবায় (United States of India) যুক্তিযুক্ত হবে। আন্দোলনের দুটো বিভাগ। একটা প্রকাশ্য এবং একটা গুপ্ত থাকবে। জনসাধারণে ভাব ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরও সংঘবদ্ধ করে নিতে হবে। সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন। বহু প্রকারের ম্যাপে ব্যুৎপত্তি বা অধিকার, ম্যাপ পড়া, ম্যাপ আঁকা, স্থানীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহে মন দিতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিপ্লবী নেতারা রাজ-নিগ্রহে দেশে টেকা দায় হলে অপর কোনো স্বাধীন দেশে আশ্রয় নিতেন এবং সেখান থেকে আরব্ধ কাজ চালাতেন। ভারতের আশেপাশে থাকার তেমন সুবিধা নেই। তাই চীন ও শ্যামে আড্ডার কথাও ভাবতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পরেই Y.M.C.A.-এর পাশে হ্যারিসন রোডে ১৯০৮ সালে 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে একটি স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পের দোকান হয়। দোকানটি করেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী। শ্রমজীবীদের পেটের অন্ন এর থেকে কতটুকু হয়েছিল বলা শক্ত হলেও, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে এটির দৌলতে রাজলাঞ্ছিত কর্মীদের অনেকের গায়ের জামা ও পরার কাপড়ের অভাবমোচন হয়েছিল। অমরদার পদমর্যাদা যে বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। চারটি সেপাই সদাসর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত—তা তিনি কলকাতাতেই থাকুন বা উত্তরপাড়ার বাড়িতে থাকুন। বিনা বেতনে এতগুলি শরীররক্ষী রাখা শ্রমজীবী সমবায়ের অধ্যক্ষের পক্ষে অন্যায় খরচের একটা আড়ম্বর বলে কেউ নিন্দার কথা নিশ্চয় তুলবে না। তবে এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে একটি কথা বলতে হবে। এখানে এলে বহু চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। কে যে কী মতলবে আসত তা ভগবান জানেন। লিয়াকৎ হোসেন ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর দেখা এখানে মিলত। নরেন ভট্টাচার্য ও যতীন মুখার্জীর দেখাও এখানে পাওয়া যেত। চুনোপুঁটিদের কথা নাই-বা বলা গেল। এখানে কিরণদারও দেখা মিলত। 'ভাইটি' ব'লে যার মাথায় হাত দিতেন সে-ই বশীভূত হয়ে যেত। কিরণদাও কম যান না। অমরদা যদি স্বদেশীযুগের মহারাজা হন, কিরণদা তাহলে নিঃসন্দেহে একটি রাজা। তাঁর পেছনে সর্বদা থাকত দুটি পুলিস অনুচর। মাঝে মাঝে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে চারটিতে পেঁছাত।

আর একটি অফিস খোলা হয় রাজা উডমণ্ড স্ট্রীটে। নাম—হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স। এ প্রতিষ্ঠানটির মালিক ছিলেন স্বনামধন্য হরিকুমার চক্রবর্তী। হরিদা একান্তে বসে অফিস চালাতেন। অর্ডার সাপ্লাই ছিল এটির বিশেষত্ব। বাংলা ও বাংলার বাইরে ছিল এর চলতি কারবার।

বি. এন. রেলের চক্রধরপুরে বসল একটি কাপড়ের দোকান। দুর্গাবাবু নামে এক ব্যক্তি হলেন এর মালিক। দুর্গাবাবুর আসল নাম বিজয় চক্রবর্তী।

এই লাইনে আর একটু এগিয়ে আর এক স্থানে একটি দোকান হল। সেখানে শ্যাম-প্রত্যাগত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় রইলেন।

বালেশ্বর শহরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামে একটি ভালোগোছের সাইকেলের দোকান জমকে বসল। একটি ঘড়ির দোকানও সঙ্গে হল। দেশগতপ্রাণ শৈলেশ্বর বসু ছিলেন এখানকার কেন্দ্রকর্তা।

সম্বলপুরে একটি আড্ডা প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতীশ চক্রবর্তী আরও দুজনকে নিয়ে ঐ পথে গেলেন আরো ঘাঁটি বসাতে। এই আড্ডাগুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। বিশেষ বিবরণ পরে বলা যাবে।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ ঘোষিত হলে বাংলার ভাবজগতে রকমারি ঢেউ দেখা গেল। ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য আহ্বান জানালেন। সে আহ্বান বাংলায়ও পেঁছোল। মরিয়া ছেলেদের মন স্বভাবতঃ সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্তির আশায় মেতে উঠল। আমরা দেখলাম, যে যুদ্ধের আগমন-প্রতীক্ষা আমরা করছিলাম সেটি হঠাৎ—প্রায় আট-দশ বৎসর আগে—দুম করে এসে পড়ল। আমাদের উদ্যোগ ও আয়োজনের গতিবেগ সহসা বাড়ানো সম্ভব ছিল না। যেমনটি করলে দশবছর বাদে আমরা কাজে লাগতে পারব সেইভাবে সব ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল। ফ্রান্সের ক্ষিপ্র প্রস্তুতি জার্মানিকে যুদ্ধে এগিয়ে এনেছিল। যার ফলে বহু জার্মান জাহাজ মিত্রশক্তির হতে ধরা পড়ে। আমরা দেশের তরুণদের যুদ্ধে যাওয়া সমর্থন করলাম না। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে ইংরেজের দুর্বল হওয়া ভারতের পক্ষে ভালো মনে করতাম। আবার কিছু লোক দেশে ছিল যারা ছেলেদের যুদ্ধে যাওয়া উচিত মনে করল। তারা ভাবল আইবুড়ো-নাম খণ্ডানোর মতো বাঙালীর বেসামরিক নাম খণ্ডানোর এমন সুন্দর সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

চরমপন্থী নেতাদের মধ্যেও দুটি ভাগ দেখা গেল। মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন ছিলেন লোক পাঠানোর বিরুদ্ধে, সি. আর. দাশ ছিলেন পক্ষে। মৌলবী লিয়াকৎ-সাহেবের মত ছিল শত্রুর শত্রুকে মিত্রবৎ মনে করতে হবে। তাছাড়া তুর্কীর সঙ্গে ছিল ইংরেজের লড়াই। আর এইজন্য ভারতের লোকের যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। সি. আর. দাশ বলতেন—বাঙালীর ছেলেকে বারুদের ধোঁয়া শুঁকিয়ে আনা উচিত—তবে ত এরা ব্যাপকতর স্বদেশের যুদ্ধে কাজ দেখাতে পারবে।

দোনো-মনায় পড়ে ছেলেদের ও বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ রংরুটে নাম লেখালেন। রংরুটে ভর্তি জোর চলতে লাগল। বিনা মেঘে বজ্রপাত! অকস্মাৎ একদিন ক্র্যাডকসাহেবের ফতোয়া এল—সৈন্য চাই না; চাই সৈন্যদের অনুচর—কুলি-মজুর।

যারা নাম দিয়েছিল, আশাভঙ্গে তারা হল ক্ষিপ্তপ্রায়। এ অপমান করার প্রয়োজন কি ছিল বিদেশী সরকারের? এ অধিকার কে দিল তাদের?

বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনকে এই নতুন সরকারী দুর্বুদ্ধি অপ্রত্যাশিতরূপে জাগিয়ে দিয়েছিল। সরকার এক ঢিলে দুই পাখী মারছিল। যুদ্ধে সংগ্রামী লোক পাচ্ছিল এবং যারা বাইরে বাইরে মরলে সরকার নির্ঝঞ্ঝাট ও নিশ্চিন্ত হয়, তারাই অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। কিন্তু দেখা গেল বিধাতার

ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। কথায় আছে—'দিগ্বিজয়ীরা বেরোয়—কিন্তু আর ফেরে না'। যাদের বীরত্বের অভিমান প্রদেশের কালিমা..ছাতে উদ্বেলিত করেছিল তারা 'দিগ্বিজয়ীর মতো' ঘরে ফিরতে নারাজ হল। এই দিক থেকে কিছু একটা করার প্রেরণা এল।

তারপর এল রাসবিহারীর ডাক। যতীন্দ্রনাথকে ইতিমধ্যে যারা ডেকে এনেছিল তারাও এগিয়ে পড়েছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় বেশির ভাগ লোক ভেবে-চিন্তে কাজ করে না। আগে কেউ বা কয়েকজন মাথা খাটিয়ে একটু কিছু করে গেলে বাকিরা তারই অনুসরণ করে। চতুরঙ্গ বিপ্লব ছিল আমার কর্ম-তালিকায়। সে অঙ্গগুলি তেমন গড়ে না উঠলেও অন্ততঃ জার্মানির কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে দেওয়া আমার মতবিরুদ্ধ। যাই হোক, যখন যতীনদাকে ডেকে আনা হয়েছিল তখন কি করা যায়? অতএব পরামর্শ হল যারা এগিয়ে পড়েছে তাদের পেছোনো চলবে না। তারা কাজ করুক—করে মরুক। এর মধ্যে রডার অস্ত্র-লুণ্ঠন তো হয়েছিলই, তাছাড়া গার্ডেনরিচ ও বেলেঘাটায় মোটর ডাকাতি হয়। এই পরামর্শে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ, বিপিন গাঙ্গুলীমশায়। আমরা কয়েকজনও ছিলাম সেই বৈঠকে। সে বৈঠক বসে বালিগঞ্জে। আমাদের আরব্ধ কাজের ধারাবাহিক পারম্পর্য রক্ষা কিসে হয় সেই চিন্তাই এখন থেকে আমাদের কাছে হয়ে উঠল বড়। আমরা ধরা পড়ে বা মরে উজাড় হয়ে গেলেও বিপ্লবের কাজ যেন বেঁচে থাকে সেই কামনা তীব্র হয়ে উঠল।

আমি দেখলাম এখন বিকেন্দ্রিক সংঘকে একটা কেন্দ্রাভিমুখী গতি দিতে হবে। পরে দেখা যাচ্ছে জার্মানির 'স্পার্টাকুস্' সংগঠনের সঙ্গে এই সংগঠনের কতকটা ঐতিহাসিক মিল হয়ে গিয়েছিল। তারাও প্রয়োজনে পড়ে বিকেন্দ্রিক ছিল। আমরাও তাই। তাদের সংবাদপত্রে যা লেখা হত তা কিন্তু সব শাখাই পড়ত। মতের মিল ও মনের মিল ছিল শাখাগুলির বড় বন্ধন। আমাদের এখানেও সেইরূপ। আপৎকালে তারা একটা প্রধান কেন্দ্র খাড়া করেছিল। আমরাও করেছিলাম।

আমি যতীনদার সঙ্গে 'আত্মোন্নতি'র হরিশবাবু, বিপিনবাবুর দেখা-সাক্ষাৎ ও মিল করিয়ে দিয়েছিলাম। এঁরা একসঙ্গে এক নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে লাগলেন। বিপিনদা রডা কেস-এর পর গা-ঢাকা দিয়ে থাকতেন। বাংলার অন্যত্র থেকে বন্ধুরা উপদেশ নিতে আসতে লাগল। এইটাই হল হেড কোয়ার্টার। সারা বাংলার শীর্ষকেন্দ্র। তখনও কিন্তু এর বিভিন্ন বিভাগ গড়ে ওঠে নি। দাদা বালেশ্বরে যাবার পর প্রধান কেন্দ্র আবার বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

১৯১২-১৩ সালে সেটা হবে। বরিশালের ভূতপূর্ব স্কুলমাস্টার শ্রদ্ধেয় সতীশ মুখার্জী মহাশয় ইতিপূর্বেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। সতীশ সেন আমাকে স্বামিজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথম

দর্শনে দুজনের মধ্যে একটা বড় মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমার মনে হল তিনি যে ভালবাসাটা আমাকে দিলেন তেমন আর কাউকে দেন নি। শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আমার মন ভরে উঠল। সাধারণতঃ দেখা যায় নামীর চেয়ে নাম বড়। এক্ষেত্রে সময় যত যেতে লাগল ততই প্রতীত হল নামের চেয়ে নামীটি আরো অনেক বড়। একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য দুই মুখার্জীর মধ্যে ধরা পড়ল—সতীশ মুখার্জী ও যতীন মুখার্জীর মধ্যে। দুজনের কথা বলার ভঙ্গি, গলার আওয়াজ, যেখানে যেমন করে জোর দিতে হয়—সব একরকম—চোখ বুজে শুনলে বলা শক্ত এই দুজনের মধ্যে কে কথা বলছেন বা উপদেশ দিচ্ছেন। দুজনেই চূড়ান্ত স্বাধীনতা-প্রয়াসী। বলিদানের পথই দুজনের পথ। মায়ের মতো স্নেহার্দ্র মন দুজনেরই। কিন্তু কাজের সময় প্রয়োজনের ডাক এলে অকুণ্ঠভাবে বলতে পারতেন—'আমি চাই তোমরা মরো। তার ওপর দেশ দাঁড়াবে।' ফুলের মতো নরম, আবার বজ্রের মতো কঠোর। কাজ এগিয়ে পড়ল। আমরা বিভিন্ন দিকে নজর রেখে একটা 'কমিটি' ঠিক করলাম। সেটা একবার যতীনদাকে দেখানো দরকার। সম্মতি পাবার আশায় পূর্বাহ্নেই কমিটি কায়েম হল। তদনুযায়ী যতীনদা হলেন (আমরা এঁকে 'দাদা' বলতাম) প্রধান কার্যকরী সভার সর্বপ্রধান নায়ক। বরিশাল দলের সঙ্গে ময়মনসিংহের দল ইতিপূর্বে একজোটে কাজ সুরু করেছিল। বাংলা ও আসাম জোড়া দল হল।

পশ্চিম জলপথের ও পূর্ব জলপথের সংবাদ জানা প্রয়োজন। আশু দাস তখন ডাক্তারি পাস করেছে। তাকে একটি জাপানী জাহাজের ডাক্তার করে পাঠানো হল। কিছু টাকাও আসবে। তাছাড়া আশুর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে।

আমি সংঘের কাজে অর্থের প্রয়োজনে ডাকাতি করা বা টাকা ছিনিয়ে আনার বিরুদ্ধে ছিলাম। তবুও কেন ঐরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল সে কথাটা এখানে পরিষ্কার করা ভালো। রাসবিহারী যখন খবর পাঠালেন তখন সময় দুই বা আড়াই মাস বাকি ছিল। সবরকমে তৈরি হতে হবে ত। টাকার প্রয়োজন। টাকা আসবে কোথা থেকে? অনেক টাকা যে চাই। আমার আপত্তি যাবার নয় জেনে আমাকে না জানিয়ে 'গার্ডেনরিচ' করা হয়। কয়েকজনকে টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে। কিন্তু একজন ফিরে আসবে নিশ্চয় এই ছিল বন্দোবস্ত। সে ফিরে এল না। তার আসার সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। বিকেল হয়ে পড়েছিল। কাজটা তো হয়েছিল দুপুরে। দাদা নিজেই আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। নেতা সেদিন সাক্ষাৎভাবে আমায় ডাক দিলেন। আমাকে তখনই বেরুতে হল—যারা 'কাজে' গেছে, তাদের ভালোমন্দের খবর এনে দিতে হবে। ঠিক এই সরাসরি আহ্বানটির জন্য আমি কয়েকবছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। আমি মনে করতাম দাদার সঙ্গে যদি আমার কাজ করা বিধিলিপি হয় তাহলে আমি নিজে তাঁর দিকে এগুবে কেন, সময় হলে তিনি নিজেই

আসবেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি যুক্তি-তর্কের আলোচনায় নিজে কখনও দাদার কাছে যেতাম না। আমার হয়ে অন্য লোক যেত।

তখন আর আমার একটা মত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বসে রইলাম না। আমি সংখ্যালঘুর দলে থেকেও আপ্রাণ খেটে চললাম। আমি নিজে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতাম একদিন নিশ্চয় আসবে যখন আমার মত বা ধারণার লোকের সংখ্যা দেশে কর্মীদের মধ্যে বেড়ে যাবে।

এ কর্মক্ষেত্রের পরিসর ব্যাপকতর করার এবং সুফললাভের জন্য বাংলাদেশ ও উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল এইরূপ—বিদেশ থেকে প্রত্যাশিত অস্ত্রশস্ত্র এলে তাকে গ্রহণ ও বিতরণ করে 'জয়, দেশ-মায়ের জয়' বলে চারদিক থেকে মুক্তিকামীরা অভ্যুত্থান করবে।

যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে কেন অপেক্ষা করছিলেন তা বোধ হয় এবার বোঝা গেল। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর শহর থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ময়ূরভঞ্জের এলাকায় গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রাসবিহারীর স্থিরীকৃত সংকেত ও কার্য ব্যর্থ হলে যতীন্দ্রনাথকে ওখানে পাঠানো হয়। যাঁর সাহায্যে দাদাকে সরানো হয় তাঁকে রামচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন—'বাংলার প্রাণ আজ আপনার হাতে দেওয়া হল। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। নিজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন।'

দেশকর্মী মাখন সেনের সাহায্যে তাঁকে বাগনানের হেডমাস্টার অতুল সেনের কাছে পাঠানো হয়। বিপিনদাও সঙ্গে ছিলেন। পরে তাঁরা মেদিনীপুরের তমলুক শহরে যান। সেখান থেকে বাগনানের হেডপণ্ডিত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুমার-আড়া গ্রামে যান। সেখান থেকে বিপিনদা ফেরেন। দাদাকে বালেশ্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশন থেকে ফণী চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার ও নলিনী কর তিনখানি সাইকেল ও পাঁচখানা বালেশ্বরের টিকিট নিয়ে ওঠেন। পাঁশকুড়া স্টেশনে দাদা ও নরেন ভট্টাচার্য এসে যোগ দেন। ভূপতি মজুমদার বালেশ্বর স্টেশন থেকে ফেরেন। বাকিরা বালেশ্বরে থাকেন। বালেশ্বর থেকে দেশীয়-রাজ্য নীলগিরি হয়ে ময়ূরভঞ্জের কপ্তিপদায় যান। কুমার-আড়া মহিষাদলের কাছে। এত ঘুরিয়ে পাঠানোর উদ্দেশ্য, যেন কোনো অংশের লোক না জানে তিনি প্রকৃতপক্ষে কোথায় গেলেন।

ইতিমধ্যে বাংলা সরকার তাঁর নামে হুলিয়া প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, ফটো ছাপিয়ে চারিদিকে লটকে দিয়েছিলেন। বেশ মোটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল।

বালেশ্বরে যাবার আগে যতীন্দ্রনাথ তাঁর মনের বাসনা প্রকাশ করে বলেন যে, বহুযুগ ধরে আশ্রয়ে আশ্রয়ে বাস করার দরুন বাঙালী জাতটা হীনবীর্য হয়ে গেছে। বাঙালীর ছেলেকে বন্দুক ধরিয়ে এবার তিনি লড়িয়ে যেতে চান। সবচেয়ে কমপক্ষে এইটুকু এবারে করে যেতে হবে। বাঙালী যুবক যুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়তে জানে, বাঙালীর

চরিত্রে এই পরিবর্তনটুকু এনে দিয়ে তিনি যাবেন। তাঁর কথায় কেমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল। তাঁর সামনে গেলে ভীরুও বীর হয়ে যেত। 'না, হতে পারে না'—এমন কোনো কথা তাঁর কথার ভান্ডারে ছিল না। তাঁর সন্নিধানে থাকলে 'অসম্ভব' কথাটা অন্তর থেকে মুছে যেত।

তাঁর দিদি তাঁকে একটা চিঠি লেখেন। দিদির প্রত্যাশা এই থেকে বোঝা যাবে—'দেশের ডাকে তুমি গেছ। ভালো কথা। কিন্তু যেন শুনতে না হয় সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ।'

জ্যান্ত ধরা দেওয়া হবে না, এ প্রতিজ্ঞা তাঁর আগে থেকেই ছিল। তিনিও বলতেন, 'যে মায়ের দুধ খেয়েছি, মনে তো হয় একটা কিছু করে যাব।'

তিনি ভোলানন্দগিরির শিষ্য ছিলেন। স্বামিজী তাঁকে আশীর্বাদ করতেন, 'আরে মেরা শুরবীর, আরে মেরা বাহাদুর!'

ঘটনাটি বাঘ মারার আগে কি পরে বলতে পারি না। যা শুনেছি তাই লিখছি। ১৯০৬ সালে হবে। তাঁর প্রথম সন্তান—একটি পুত্র—তিনবছর বয়সে পরলোকগত হয়। যতীন্দ্র মনে বড় ব্যথা পান। তিনি পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বারে যান। সেখানে তাঁকে দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভোলানন্দগিরি মহারাজ বলেন, 'মনের ময়লা পরিষ্কার করে ফেলো।' যতীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন, 'আমার মনে আপনি কী ময়লা দেখতে পেলেন?' তাতে স্বামিজী বলেন, 'তোমায় কত বড় হতে হবে, কত বড় কাজ করতে হবে! পুত্রশোকে কাতর হলে চলবে না। যাও, গঙ্গাস্নান করে এসো।' যতীন্দ্রনাথ মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় স্নান সেরে এলেন। স্বামিজী আগ্রহ করে দীক্ষা দিলেন। তারপর বললেন, 'আরে মেরা শুরবীর! আরে মেরা বাহাদুর! আরে মেরা শের! রামদাস স্বামীর যেমন ছিলেন শিবাজি, তেমনি তুমি হবে আমার।'

তিনি বালেশ্বরে যাবার সময় আরও দুটো সিদ্ধান্ত হয়। দাদার সঙ্গে আমার কথা হয় এই যে, অ্যানার্কিস্ট কথাটি উড়িয়ে দিতে হবে—মিথ্যা প্রচার বন্ধ করানো চাই। আমি তাঁর সামনে প্রাণ খুলে আমার বক্তব্য নিবেদন করি এবং সমর্থন পাই। এই সঙ্গে আগামী কার্য উপলক্ষে আরও কয়েকটি কথা আলোচনা করি।

আমাদের কাজে যুদ্ধে বাঙালী যুবকরা মরলেও পরবর্তী কালে তাদের 'ডাকাতের দল' বলে ইংরেজ প্রতিপক্ষরা প্রচার করবে। সেটাও খন্ডন করা চাই। সেইজন্য সৈনিকের বেশভূষা তৈরি করার প্রস্তাব করি এবং তা করানোও হয়েছিল। দেশের লোকেরা মিথ্যা প্রচারের মধ্য থেকে তাহলে সত্য খুঁজে পাবে। কেন, কিসের জন্য এরা অকাতরে প্রাণ দিয়ে গেল—এ প্রশ্ন দেশের লোকের মনে জাগবে। মরণকে জয় করার উপায় হচ্ছে মানুষের মতো, বীরের মতো আত্মদান। আমার এই দুই প্রস্তাব

সর্বান্তঃকরণে তিনি গ্রহণ করেন। সরকারের দুষ্ট প্রচার বীরদের ডাকাত বানালেও লোকের মনে ঐ সৈন্যের পোশাক দেখে সন্দেহ জাগবে। সত্যি কি এরা ডাকাত? কিন্তু 'না হইতে মাগো বোধন তোমার—ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল-ঘট'। সৈনিকের সাজে সাজার অবকাশ মিলল না।

অ্যানার্কিস্ট কথা উড়িয়ে দেবার জন্য দু'রকম চেষ্টা হয়। দেশী সাংবাদিকদের পত্রদ্বারা অবস্থাটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তারা কিসের জন্য দেশপ্রেমিক আত্মভোলাদের অ্যানার্কিস্ট বলবে? তারা বলবে বিপ্লবী। মোলায়েম চিঠিতে কাজ না হওয়ায় পরে কড়া চিঠি দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ, নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যানার্কিস্ট কথা ছেড়ে বিপ্লববাদী বা রিভলিউশ্যানিস্ট লিখতে সুরু করলেন। ব্রিটিশ সরকারকে বেছে বেছে 'Administration Report' পাঠানো হত। এক খণ্ডে বলা হয়—যারা একটা রাজপাট বদলে আর-একটা রাজপাট বসাতে যাচ্ছে তাদের কিসের অজুহাতে অ্যানার্কিস্ট বলা হয়? আন্তর্জাতিক আইনে তা তো বলে না। এরূপ মিথ্যা বেশিদিন চাপা থাকবে না। বিপ্লবীরা নিজেদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করে যাচ্ছে এবং যাবে যে তারা অ্যানার্কিস্ট নয়। যে কারণে হোক পরবর্তী কয়েকটা বছরে সরকারী কাগজপত্রেও বিপ্লববাদী বা Revolutionary কথাটা ব্যবহৃত হতে লাগল। রাউলাট রিপোর্টেও Revolutionary কথা লেখা আছে।

১৯১৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জাপান থেকে নরেন ভট্টাচার্য খবর পাঠায় চীনের ভিতর দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। সেই অনুযায়ী পার্টির সভ্যরা আপনাদের গতিবিধি ও নতুন ডেরা-ডাণ্ডা ঐ ইঙ্গিতে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থাপিত করলেন।

১৯১৬ সালে শৈলেন ঘোষের নামে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বেরোয়। ইতিপূর্বে তিনি যে পাসপোর্ট পেয়েছিলেন সেটি বাতিল হয়ে যায়। তিনি অল্প কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে আমেরিকায় চলে যান। পরে সেখানে আয়ার্ল্যাণ্ডের জেল থেকে পলাতক আইরিশ নেতা ডি. ড্যালেরার সঙ্গে মিশে ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সম-স্বার্থের বুনিয়াদে মিল করেন।

আইরিশরা ভারতের জন্যও সেখানে আন্দোলনে সহানুভূতি দেখাতে লাগল। চেষ্টা চলল ভারতকে একটা আন্তর্জাতিক স্থান দেওয়ার। ফলে ইংরেজকে বেশ মোটা টাকা খরচ করে উল্টো প্রচার বিভাগ খুলতে হয়েছিল। হার্স্ট-এর অনেকগুলি কাগজ আমেরিকায় বেরোয়। সেগুলি ভারতের পক্ষ নিয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লিখতে লাগল। বিলাতের রাসব্রুক উইলিয়ম, পাটনা কলেজের অধ্যাপক হর্ন, যোধপুরের মহারাজা জেনারেল প্রতাপসিংহ এবং বাংলার এক খেতাবধারী মহারাজকে (বর্ধমানের মহারাজ) ইংরেজ ঐ দেশে ব্রিটিশের ওকালতি করতে পাঠায়। এই প্রতাপসিং প্রতাপ দেখিয়ে

ইংরেজকে ভরসা দেন যে হুকুম পেলে তাঁর পোলো খেলার দল দিয়েই বাংলাকে আক্কেল দিয়ে দেবেন।

দেশের চিন্তাশীল লোক ও কিছু মাথাওয়ালা ইংরেজ বুঝেছিলেন ক্র্যাডক্ কী ভুলই না করেছেন। তাঁরা বাঙালীদের ফৌজে ভর্তি করার আন্দোলন চালাতে লাগলেন। কলকাতার চীফ জাস্টিস স্যার লরেন্স জেংকিন্সের সহানুভূতি ঐ দিকে ছিল।

এদিকে রাজ্য-রক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের তিন-আইনে বহু লোক গ্রেপ্তার হতে লাগলেন।

সরকার শেষ অবধি 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর' করতে অনুমতি দিলেন। ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীর চেষ্টা এ বিষয়ে ফলবতী হয়। বিপিনচন্দ্র পাল প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ও বয়-স্কাউটের স্থান দাবি করে কিছু কিছু লিখতে লাগলেন। এতে কাজ হয় নি। পরে কিন্তু 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' নামে একটি সৈন্যদল খুলতে হয়েছিল।

ময়মনসিংহে খাজনা আদায় করার এক অভিনব উপায় অবলম্বিত হল। বাছা বাছা কয়েকটি ধনী লোককে জানিয়ে দেওয়া হল দেশের কাজের জন্য টাকা দরকার। এমনি টাকা না দিলে জোর করে আদায় করা হবে। সে অপ্রিয়তা করা কারও বাঞ্ছনীয় নয়। নিরাপত্তার চিহ্নস্বরূপ একটি মাদুলি দেওয়া হত। এই মাদুলি দেখালে খাজনা-আদায়কারী দেশী পল্টন তাদের নিরাপদে ছেড়ে চলে আসবে। এই উপায়ে খাজনা আদায় হতে লাগল।

সে সময় মধুবাবু বা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন ময়মনসিংহ কেন্দ্রের নেতা। হেমেনবাবু অন্তরীণ হয়ে গিয়েছিলেন। মধুবাবুর পিতা সবার শ্রদ্ধেয়। তিনি দেশের জন্য পুত্রের নির্দেশে কাজ করে গেছেন। তাঁর দেশভক্তির মাধুরী দেখলে বিমোহিত হয়ে যেতে হত।

ত্রিপুরা জেলাতেও টাকা আদায়ের এই অভিনব উপায় অবলম্বিত হয়। একবার টাকা আদায় উপলক্ষে দেশী পল্টনের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায়। টাকা যে দিতে এসেছিল গ্রাম থেকে, সে কুমিল্লা শহরে পুলিস লাইনের কাছে টাকা পৌঁছোবার জায়গা স্থির করে। গোপনে পুলিসকে খবর দিয়ে রাখে। টাকা আদায় করে আনার সময় সশস্ত্র পুলিস চ্যালেঞ্জ করে। উভয়পক্ষে গুলী চলে।

'ডাকাতি' কথাটা শুনতে ভালো লাগত না। প্রকৃতপক্ষে স্থির হয়ে গুছিয়ে না বসা পর্যন্ত একটা নতুন সরকার বলপ্রয়োগে খাজনা আদায়ের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আমাদের কাগজে সেজন্য এইভাবে লিখতাম। ডাকাতি না বলে বলতাম খাজনা-আদায়।

আমি তখন 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' কাগজে লিখতাম। ইংরেজীতে বের করতাম

'Administration Report' বা স্বদেশী সরকারী বিবরণ। একটা রাজ্যপাট উল্টে ফেলতে হলে তার জায়গায় আরেকটা রাজ্যপাট প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। ইংরেজের প্রভুত্ব যখন স্বীকার করি না তখন নিজেদের একটা সরকারী বিভাগ আড়ালে আবডালে হলেও দাঁড় করাতে হবে। ইংরেজীতে একে বলে 'Shadow Cabinet'—অদৃশ্য রাজ্যপাট।

এই ক্ষুদ্র বীজ জাতীয় মনে একদিন বড় করে স্পর্ধা জাগাবে, যাতে করে স্বরাজ সরকার বা জাতীয় সরকার সময়মতো ফুটে উঠবে। বিপ্লবী ধারণা তার সময় (সাধারণ লোকের হিসাবে অসময়ে) হিসাব করে অনন্য সাধারণ উপায়ে। তার সেদিনকার সে সময়টা সাধারণের কাছে একটা বে-আদবী বা বে-আন্দাজী স্পর্ধা বা দম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কালক্রমে এই দম্ভই হয়ে যায় সাধারণ সত্য। আমাদের একটা সরকার না থাকলে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চালু রাখবে কে? তাই ঐ অভিমান। এই অভিমান নিয়ে আমাদের সরকারী বিবরণে বিদেশী সরকারের বিবরণগুলির পাল্টা জবাব দেওয়া হত।

এরপর সালখেতে একটা যুদ্ধ হয়। কিছু লোককে গ্রেপ্তার করতে এলে এটা সংঘটিত হয়। সালখেতে বাসা ক'রে অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী ও যুগল দত্ত থাকতেন। ঘটনার দিন অতুল ছিলেন না। ঘাঁটি সদলবলে ঘিরে ফেললে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিপ্লবীরা বেরিয়ে পড়েন। ইংরেজ সিপাহিরা সরে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। যুগল দত্ত পরে কিছু দূরে গ্রেপ্তার হন। সতীশ পটাসিয়াম সায়ানাইড খান। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান; তার হার্ট সেই থেকে দুর্বল হয়ে যায়।

পর্তুগীজ রাজ্য গোয়ায় বিনয়ভূষণ দত্ত ও ভোলানাথ চ্যাটার্জী যায়। সেখান থেকে বিদেশের সঙ্গে খবরাখবর চালাত। এখানে কিছু জার্মান ও তাদের কিছু জাহাজ নজরবন্দী ছিল। এক মারাঠী যুবক বিশ্বাসঘাতকতা করায় এরা ধরা পড়ে। এদের খুব নির্যাতন করা হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রচার করে ভোলানাথ নাকি পুণা জেলে আত্মহত্যা করে। অনেকে কিন্তু মনে করেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

এরপর চন্দননগরে দিল্লীর পুলিস ও বাংলার পুলিস ফরাসি পুলিসের সাহায্যে এক জায়গায় খানাতল্লাশি করে। কিন্তু কেউই গ্রেপ্তার হয় নি। ১৯১৬ সালে মার্চ মাসে এটা ঘটে। সেখানে আমরা নামকাটা সেপাই সবাই ছিলাম। অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, অমর চ্যাটার্জী, নলিনী কর, বিজয় চক্রবর্তী এবং আমি। আমরা কেউই ধরা পড়ি নি। সেদিন সদলবলে উপস্থিত ডেনহ্যাম, টেগার্ট ও লোম্যানকে খুব ফাঁকি দেওয়া হয়। আমাদের পলাতক বা ভবঘুরে জীবনের কাহিনী বহু জায়গায় রোমাঞ্চকর। সে-সব কথা এখানে লিখছি না।

ওদিকে জাপান থেকে নরেন খবর পাঠায়। চীনের সঙ্গে যোগ-স্থাপনের কাজ

আরম্ভ হয়। ১৯১৬ সালে এপ্রিল মাসে আমি ও নলিনী কর ছদ্মবেশে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম যাই। পূর্বেই পাঁচুগোপাল এবং বিজয় চক্রবর্তীকে পাঠানো হয়েছিল। আসাম থেকে ভুটানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে তিব্বতের খানিকটা হয়ে সিচোয়াং প্রদেশে যাবার পথ ধরা স্থির করা হয়। সিচোয়াং-এর রাজধানী চেংটু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে রাজধানী হয়েছিল চুংকিং। জাপানের চাপে রাজধানী বদল করা হয়েছে এখানে। সিচোয়াং আত্মনির্ভর প্রদেশ। এ স্থানটি বিদেশীরা কোনোদিন আক্রমণ করতে পারে নি। ভুটান অবধি স্থানে স্থানে রিলে রেসের মতো লোক চলে গিয়েছিল। কিছুদূরে অন্তর একটা করে আড্ডা করে শেষ আড্ডাটি ভুটানে স্থাপিত হয়। আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে লিডোর একটি আড্ডার পরিকল্পনা হয়। এখান দিয়ে উত্তর বর্মার রাস্তা পড়ে। বর্মার ভামো হয়ে চীনে যে রাস্তাটি গেছে সেখানেও একটি আড্ডার প্রস্তাব করা হয়।

১৯১৭ সালে আবার অমরদার ডাকে আসাম থেকে বাংলায় ফিরি। ঐ সালের এপ্রিল মাসে পদ্মার দু'পারের সংগঠন দুটি সমবেত চেষ্টায় আবার এক হয়। দুটি সংগঠন আলাদা থাকার কোনো তাৎপর্য আর নেই এটা বুঝতে লেগেছিল বহুদিন। ১৯১৩ সালে পুনর্মিলনের চেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু অমৃত হাজরা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় তা কাজে পরিণত হতে পারে নি। তবে সহযোগ বজায় ছিল। ঘা খেয়ে খেয়ে উভয়পক্ষের যা বহুদিন আগে হওয়া উচিত ছিল তাই কাজে ঘটল। দুঃখের বিষয় এই মিলও ১৯২০-২১ সালে আবার ভেঙে যায়। আমরা বাইরে যা করি জেলের মধ্যে মনোরঞ্জন গুপ্ত সে চেষ্টা করেছিলেন। পরে আবার উভয়পক্ষ জেলে আসায় ১৯২৫ সালে 'সম্মিলিত সংঘ' হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় আবারও দলাদলি হয় এবং ১৯২৯ সালে শেষবারের মতো ভাঙাভাঙি হয়ে যায়। কথাটা একটু বিশদ করে বলি।

১৯১৭ সালে অমরদা, অতুল ঘোষ চন্দননগরে থাকতেন। ঢাকা অনুশীলনের নলিনী ঘোষ, প্রবোধ বিশ্বাস পুলিস-সান্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কলকাতার বন্দী-নিবাস 'ডালান্ডা হাউস' থেকে চম্পট দেন। তাঁরা আশ্রয়ের জন্য চন্দননগরে আসেন। মতিবাবুর সহায়তার তুলনা মেলে না। ১৯৬৪ সালে চন্দননগর প্রবর্তক সংঘের স্বর্গীয় মতিলাল রায়ের স্মৃতিমন্দির নির্মাণকল্পের আবেদনপত্র প্রচার করা হয়। তাতে আছে 'মুরারিপুকুর মানিকতলার বাগানে গোপনে গঠিত বিপ্লবকেন্দ্র ভাঙিয়া গেলে চন্দননগরে নূতন বিপ্লবকেন্দ্র গঠন করিলেন শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবুরাম কর—এই চারজনে'। সবাইয়ের আশ্রয়স্থল সেদিন তিনি। এখানে 'অনুশীলন'-এর তৎকালীন নেতা অমৃত সরকার আড্ডা করে ছিলেন। সঙ্গে অন্য সভ্যেরা থাকতেন। বিনায়করাও কাপুলেও (ওরফে সত্যেন)

কলকাতায় যাতায়াত করতেন। ওঁরা অমরদার কাছে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অমরদা আমায় ডেকে পাঠান। ওঁদের দিক থেকে নলিনীবাবু (ওরফে রাজেনবাবু) এবং কাপুলে প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের তরফ থেকে সতীশ চক্রবর্তী এবং আমি থাকি। প্রায় একমাসের কাছাকাছি আলোচনা চলে। তারপর উভয়পক্ষের রাজীনামায় মিলন হয়।

অতুল ঘোষ শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন ফরাসি দপ্তর থেকে খবর পাওয়া গেল পরের দিন কলকাতা থেকে ইংরেজ অফিসার এবং প্রহরীর দল আমাদের ধরতে আসবে। ব্যাপারটা এইরকম হয়। শিবরাম শেঠ সংবাদ প্রথমে পান। তিনি তাঁর ভাই দুর্গাদাসবাবুকে জানিয়ে দেন। দুর্গাদাসবাবু জানান মতিলাল রায়কে। সেখান থেকে অতুল জানতে পারে। তাছাড়া শেঠভ্রাতাদের সঙ্গে অতুল পরিচিত ছিল। 'অনুশীলন'-এর আড্ডাগুলি আগেই পুলিসের নজরে এসেছিল। বিখ্যাত ধনী রূপলাল নন্দীর একটি বাড়ি এই সময় তৈরি হচ্ছিল। মন্মথ রূপলালবাবুর সরকার সেজে সেই কাজের তদারক করত। অমরদা চুপিসাড়ে একটি ঘরে বন্ধ থাকতেন। দিনে নিঃসাড়ে বন্দী, রাত্রে মুক্তি—শৌচ, স্নান-আহার সারতেন। বন্ধুদের সঙ্গে দরকারমতো কথা বলতেন। আমি আসাম থেকে এসে এঁর ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হই। যাই হোক, অমরদার পরামর্শমতো দুই দলের সব লোক তাঁর কাছে রইলাম। পরের দিন যুদ্ধ হবে ঠিক রইল। কিন্তু দেখা দিল ধর্মসংকট। রূপলালবাবু কিছু জানতেন না। তাঁর বাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র করলে ইংরেজ ও ফরাসি সরকার তাঁকে নিয়ে কুরুক্ষেত্র করবে। তাই ঠিক হল এ-বাড়ি ভোরে ত্যাগ করে যাওয়া হবে, তারপর যেখানে যুদ্ধ বাধার বাধবে। আমাদের তরফ থেকে সারারাত গঙ্গার ওপর নজর রাখা হল। আমাদের বাড়ির সামনে একটা দোকান ছিল। সারারাত সেখানে সেদিন আলো জ্বলতে দেখা গেল। বুঝলাম ওরাও 'অনুশীলন'-এর বন্ধুদের অনুসরণ করে এদিকে এসেছে। যাই হোক ভোর-ভোর সময়ে গঙ্গার ঘাটে একটা লঞ্চও এল। তাতে টেগার্টকে চেনা গেল। আমরা স্নানাদি সেরে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ও নলিনী অপরূপ মোস্লেম সাজে একদিকে চলে যাই। আমরা দেখলাম চন্দননগর থেকে বাইরে যাবার সব পথ আগলানো রয়েছে। একটা মাঠ পেলাম। সেথায় একটা শুকনো নালা ছিল। সেইটাকে ট্রেঞ্চ-রূপে ব্যবহারের মতলবে সেইখানে নামলাম। অন্যেরা নটবর দাসের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

সারা দিন গেল। কিছু ঘটনা ঘটল না। সন্ধ্যায় বেরুলাম বন্ধুদের খবর সংগ্রহ করতে এবং রাত্রিবাসের ব্যবস্থা কী করা যায় তার চেষ্টা করতে। গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চে দু'বন্ধুতে বসে ভাবছি, এমন সময় ভারিক্কি গোছের একটা লোক এসে পাশের বেঞ্চ দখল করল। ক্রমে কয়েকজন লোক তাকে সেলাম করে দাঁড়াল। তাদের

মুখেই প্রথম শুনলাম কেউ ধরা পড়ে নি। তিনি আদেশ দিলেন গঙ্গার ঘাট এবং স্থলপথের বেরুবার ঘাঁটিগুলো কড়া পাহারায় রাখতে। তিন দিন এ ব্যবস্থা থাকে যেন—'প্রভুরা' সবাইকে ধরবেই।

এরপর আমরা উঠে সন্তর্পণে চলতে লাগলাম। গোন্দলপাড়ায় নিরাপদবাবুর খোঁজ করলাম। সেইখানে আমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার লোক পেলাম। সে পোঁছে দিল নটবরবাবুর বাড়িতে। আবার নরক গুলজার!

মন্মথ বিশ্বাস—এখন নাম হয়েছে বিধু—রাসবিহারী ভারত ছেড়ে যাবার পর, চন্দননগরে ছিল। এইবার সে নলিনী কর ও আমার সঙ্গে আসাম চলল ১৯১৭ সালে। আমরা এখন বাংলা, বিহার ও আসামের যত্রতত্র যাওয়া আরম্ভ করি। গ্রামের লোকেদের মধ্যে স্বাধিকারের জ্ঞান জাগরণের কাজ চলতে লাগল। বড় বড় সভা করে আমাদের লোকেরা বক্তৃতা দিত না। কিছু কিছু লোক বেছে তাদের সঙ্গে মিশত এবং তাদের মারফত বাকিদের মধ্যে বার্তা চালিয়ে দিত। পরাধীনতা গেলেই তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুদিন আসবে এটা কৃষকমাত্রেই বুঝত। জমিদার থাকবে না, জমিদারের জমি সব তাদের হয়ে যাবে এইটাই কৃষকদের মনে আপনা থেকেই আসত। তাতেই কিছু রসান দিয়ে দিলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্গতির কথা তারা ধরতে পারত। একবার একটি গ্রামের লোক বলেছিল, 'বিদেশীরা ক'জন? আমরা দেশসুদ্ধ লোক যদি একটা করে খড় ফেলে আগুন লাগিয়ে দিই, তাতেই ত ওরা ভস্ম হয়ে যাবে।' গ্রামের মধ্যে যাকে মাতব্বর করে ছাড়া হত, সে যে কিভাবে বাকিদের বুঝোত তার নমুনা এর থেকে পাওয়া যায়।

মিলনের পর আমি আসাম-ভুটান পথের আড্ডা থেকে 'অনুশীলনে'র নলিনী ঘোষের আহ্বানে গৌহাটি যাই। সেখানে তখন নলিনী ঘোষ, অমরদা প্রভৃতি থাকতেন। কথাবার্তা সেরে আমি বিহারে চলে যাই। এটা হবে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে। এরপর ১৯১৮ সালে ৯ই জানুয়ারিতে হয় গৌহাটিতে যুদ্ধ। ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা দুটো বাড়িতে থাকতেন। একটায় ছিলেন নলিনী ঘোষ, প্রভাস লাহিড়ী, তারাপ্রসন্ন দে; অপরটায় নরেন ব্যানার্জী, নলিনী বাক্‌চী, প্রবোধ দাশগুপ্ত। অমরদা প্রথমোক্ত বাড়িতে ছিলেন। তাঁদের ধরতে গিয়ে এই ব্যাপার হয়। এখানে প্রভাস লাহিড়ী জখম হয়ে পড়েন। তিনি ও নলিনী ঘোষ গ্রেপ্তার হন আহত অবস্থায়। এ সময় দলের নেতা ছিলেন নলিনী ঘোষ। অমরদা সরে পড়তে পারেন। নলিনী বাক্‌চী প্রভৃতি অন্যত্র পালিয়ে যান। অমরদা ছিটকে একলা হয়ে পড়েন ও জঙ্গলে পথহারা হন। এক আশ্চর্য ঘটনার কথা—একটা বাঘ তাঁকে পথ দেখায়।

আরো কিছুদিন বাদে ঢাকা কলতাবাজারে গুলী চালাচালি হয়। তারিণী

মজুমদার মারা যান। নলিনী বাক্‌চীও আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। একজন গোয়েন্দা দারোগা বিষম আহত হয়। নলিনী বাক্‌চীর কাছে পুলিসের লোক কিছু কথা আদায় করতে গেলে তিনি অবিচল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন, 'Don't disturb me. Let me die in peace.—আমাকে বিরক্ত করবেন না, আমায় শান্তিতে মরতে দিন।'

মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ আচার্য ১৯১৫ সালের বোম্বাই কংগ্রেস থেকে ফিরে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ঐ সময় বালেশ্বর যুদ্ধের মনোরঞ্জন ও নীরেনের চিঠি তাঁকে দেখানো হয়। সেই ফাঁসির আগের লেখা চিঠি।

হেমেন্দ্রবাবু চিঠিখানি পড়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। সে সময় তাঁর সেই ভাব দেখে ঘরের মধ্যে কেউ স্থির থাকতে পারেন নি। বীরের উপাদানে গড়া ছিলেন হেমেন্দ্রবাবু। তিনি বললেন, 'এর উত্তর দেওয়া চাই! কি আর হবে? বাঁচি আর মরি, আমাদের মাথা উঁচু রাখতেই হবে।'

তাঁর কাজ তিনি করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে রাজবন্দী হন। ময়মনসিংহে অন্ততঃ বাজিতপুর অঞ্চলে সংগঠন চলে গিয়েছিল সাধারণ লোকের মধ্যে। সেখানে স্মরণ করার যোগ্য লোক বন্ধুবর নরেশ চৌধুরী এবং সুরেন ঘোষ। আর এমনটি হয়েছিল হুগলি জেলার কামারকুণ্ড অঞ্চলের গ্রামে। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এর জন্যে চিরস্মরণীয়। নালকুলি স্টেশনে নেমে যেতে হত ভোলানাথদের গ্রামে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সব দেশ বলে, স্বাধীনতার রাস্তা কণ্টকাকীর্ণ। 'বহিবে মলয় বায়, ভেসে যাব রঙ্গে' ক'রে স্বাধীনতা আনা যায় না। স্বাধীনতা হরণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হীন স্বার্থে। সে স্বার্থ কি কি?—ব্যবসায়ীরা তাদের টাকা খাটাবে পরের দেশে ধাতুর খনিতে, তেলের খনিতে অথবা তিল সরষে পাট প্রভৃতি অন্য কোনো লাভজনক ব্যাপারে। কলের তৈরী পাকামাল বেচে বেশী লাভ করবে পদানত কাঁচামালের বাজারে। সেই টাকা মারা না যায় সেজন্য তারা নিজ রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার নেয়।

অথবা নিজ দেশের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য। কিম্বা পরের দেশে নিজেদের বাণিজ্য, ধর্ম বা কৃষ্টি প্রচারের মত্ততায়। কখনও বা রাজ্যের এলাকা বাড়িয়ে সুখ পাবার নেশায়। এইসব কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা পরদেশের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেয়। এই বিরাট স্বার্থের বিরুদ্ধে পদানত জাতিকে মাথা তুলতে হবে। পর্বতপ্রমাণ ভার বহন করার মতো শক্তি আসে যে পথে তা বড়ই বন্ধুর ও কষ্টপ্রদ।

ভারতে যারা দুর্ভোগ ও আত্মদানের পথে স্বাধীনতা আনতে বেরিয়েছিল তাদের সভা-সমিতি ক'রে খবরের কাগজের প্রবন্ধে নিবন্ধে গালি-গালাজ করা হতে লাগল। যারা (সাংবাদিক ও রাজনীতিকরা) এরূপ অপকর্ম করত তাদের উৎস ছিল কতকটা রাজভয়, কতকটা রাজভক্তি। কর্মীদের তাতে বলার কিছু ছিল না। 'যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর'—এটা ত সর্ববাদিসম্মত সত্য।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ যেমন আরম্ভ হল 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কী চমৎকার তোয়াজ করে লিখতে লাগল! ভারতবাসীদের স্বর্গে তুলে দিল। বাংলার দুলালদের বাছা বাছা বিশেষণে বিভূষিত করতে লাগল। কিছুদিন বাদে, যেমন সময় এগুতে লাগল দেশী ও বিলাতী পত্রিকাগুলিতে মন্দ বিশেষণ ব্যবহারে পাল্লা দিতে লাগল—'Unpatriotic, Hare-brained, Dastardly, Silly, Evil-deeds-doer Youths'-দের উদ্দেশে।

এমন দিন যখন যাচ্ছিল, সেই ১৯১৫ সালে গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের জন্য আন্দোলনের নেতৃত্বে এঁর সুনাম রটে গিয়েছিল। এদেশে এমন একজনও নেতা ছিলেন না যাঁর নেতৃত্ব অসংকোচে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান মানত। গান্ধিজীকে কিন্তু সে-দেশে মানত। এইটাই এঁর বিশেষ পরিচয়। ১৯০৭ সালে আমার রাজনীতিক জ্ঞানবৃদ্ধির প্রধান সহায়ক—আমার অগ্রজ মেজদা মাখনগোপাল—গান্ধিজীর নেতৃত্বের খুব গুণ-গরিমা আমায় শোনাতেন। ১৯১৩ সালে সতীশ সেনও সেই কাজ করেছিলেন। এঁদের দৌলতে আমি গান্ধিজীর প্রতি খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিলাম। গুণীর গুণ কে না মানে?

গান্ধিজী দেশে এলে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক গুরু শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে উপদেশ দেন তিনি যেন একবছর ভারত ঘুরে দেখেন। বিনা অভিজ্ঞতায় যেন বক্তৃতা না করেন। দেশভ্রমণে বেরিয়ে গান্ধিজী বাংলায় এসে উপনীত হন ১৯১৫ সালের শেষ দিকে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাতে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলা সরকারের রাজনীতি বিভাগের মালিক পি. সি. লায়ন। একখানি পুস্তিকাও ছাপিয়ে বিতরণ করা হচ্ছিল। লায়নসাহেবের বক্তৃতা এতে ছিল। তিনি বলতে চাইছিলেন—তিনি একজন বাঙালী। বাঙালী মা'র পেটে না জন্মেও যতটা বাঙালী হতে পারা যায় ততটা বাঙালী তিনি ছিলেন। তাঁর দেশের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশে কোনো ভাবী ঐতিহাসিক যদি বলে—এই দ্যাখো দেশদ্রোহীদের আবাস, তাহ'লে সে কথা তাঁর প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হবে। অতএব ভাই ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, কুটিল কুপথ ছেড়ে ভালো ছেলের মতো যুদ্ধ-উদ্যোগের কাজে এসে লেগে যাও। কম্‌সে কম দুরন্তপনা ছেড়ে দাও। দুর্নীতিপরায়ণ, নানা অপরাধে অপরাধী ভারতের ভাগ্য-আঁধারকারী দুষ্ট ছেলেরা সুযুক্তি শোনো।

গান্ধিজী সেই সভায় হঠাৎ উঠে বলে ফেললেন—বাংলার বিপ্লবী তরুণেরা পথভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু তাদের দেশপ্রেম খাঁটি সত্য বস্তু। আমাদের তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। লায়নসাহেব ও ইংরেজদের ধামাধরাদের কাছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো শোনাল এই উক্তি।

১৯১৬ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে বহু লোক সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। মালব্যজী এককোটি টাকা চাঁদা তুলেছিলেন। অধিকাংশ টাকা ছিল দেশীয় রাজ্যের রাজাদের। গান্ধিজীকে কিছু বলতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন 'এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তাতে যেন দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা জন্মায়। যেমন ভালবাসা বঙ্গের বিপ্লবীদের মধ্যে দেখা যায়।' রাজা রাজোয়াড়রা বক্তৃতা স্থল থেকে উঠে গেলেন।

এদিকে ক্রমে বিনা বিচারে প্রায় দু'হাজার লোক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাল রাজ্যরক্ষা-আইন এবং ১৮১৮ সালের তিন-আইনের কল্যাণে। আমরা Administration Report-এ লিখি—'ভাগ্য যা করেন ভালোর জন্য করেন। ভারতকে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র হতে হবে। তার শিক্ষা মন্দের ভিতর দিয়ে এসে যাচ্ছে। পাঁচ বছর অন্তর ইংরেজ বড়লাট পরিবর্তন করে। সমস্ত প্রদেশগুলিকে গুছিয়ে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অধীন করেছে অথচ প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রও বজায় রেখেছে। এর ফলে বিপ্লবীরা যখন গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলবে, দেশবাসী অবিসম্বাদে তা মেনে নেবে। আজ ইংরেজ আধা-সামরিক আইনের বলে দেশকে যেভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত করছে তাতে স্বাধীনতা অর্জনের সত্যিকার সংগ্রামে যে বিভীষিকার ভিতর দিয়ে দেশকে যেতে

হবে তার সাধনা এনে দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যলক্ষ্মীকে ধন্যবাদ—স্বাধীনতা-রথের মুখর ধ্বনি আমরা পূর্বাহ্নেই শুনতে পাচ্ছি। যার আসার আওয়াজে প্রাণ বিকল হল, তাকে দেখতে সর্বস্ব পণ কে না করবে ?'

প্রত্যেক বিনা বিচারে আটক আসামীর জন্য অন্ততঃ বিশজন নতুন ব্যক্তি সরকারের প্রতি বিরূপ হতে লাগল। এরা আটক বন্দীদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, কিছু-বা সাধারণ দেশপ্রেমিক মানুষ। দু'হাজার লোককে আটকে উসকানো হল প্রায় চল্লিশ হাজার লোককে। সবচেয়ে একটি বিশ্রী ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়ে এই ব্যথা বাড়িয়ে দিল। বাঁকুড়া জেলার ইঁদেশ গ্রামে সিন্ধুবালা নামে এক মহিলার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোয়। পুলিস গ্রামে গিয়ে দেখে এই নামে দুই মহিলা আছেন। তাঁরা আবার একবাড়ির লোক নন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট কাকে ছেড়ে কাকে ধরেন ঠিক করতে না পেরে দুজনকেই গ্রেপ্তারের হুকুম দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন একজন অন্তঃসত্ত্বা। তাঁদের হাঁটিয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বাঁকুড়া জেলে রাখা হয়। এ নিয়ে তীব্র আন্দোলন চলে। সেকালের বঙ্গীয় আইনসভায় অখিল দত্ত ও ফজলুল হক-এর বক্তৃতায় অগ্নি বর্ষিত হয়। তখন একজন সিন্ধুবালাকে ছেড়ে অন্যজনকে কিছুদিন আটকে রাখা হয়। প্রকৃত সিন্ধুবালার স্বামী দেশপ্রেমিক দেবেন ঘোষ ই. আই. রেলের তিলজলা কেবিনে কাজ করতেন। বিপ্লবী-বীর ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এঁর আশ্রয়ে ফেরারী আসামীদের রাখার একটি কেন্দ্র করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণ সাহা (কানাই সাহা) পরে ধরা পড়ে এবং সব খবর বলে দেয়। সিন্ধুবালার স্বামী গ্রেপ্তার হন, সিন্ধুবালার ভাগ্যেও দুর্ভোগ ঘটে।

কয়েকটি নেতৃস্থানীয় লোক নজরবন্দীদের সৈনিক বিভাগে ভর্তি করে নেবার জন্য দরবার আরম্ভ করেন ; ফোর্ট উইলিয়ামের কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা পাড়েন। সেনাপতি স্ট্রেঞ্জসাহেব মন দিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নিবেদন শোনেন। শেষে বলেন, 'এদের রাজভক্তির অভাবে এরা বন্দী। এমন লোক ত সৈন্যের মধ্যে নেওয়া যায় না। ইংরেজ সৈন্যদলে দুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকতে পারে, কিন্তু তারা রাজভক্ত।'

বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ সালে দুটি স্মরণীয় বক্তৃতা দেন—একটি কলকাতায়, অন্যটি ঢাকায়। ঢাকায় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে খোলাখুলিভাবে সদাচারের সার্টিফিকেট (good conduct certificate) দিলেন। বললেন, 'যুবকরা তাদের উদ্যম, উৎসাহের বিভিন্নমুখী পথ না পেয়ে রাজনৈতিক অনর্থপাতে মেতেছে। এমন অনেকে আছে যারা অসমসাহসিকতা প্রকাশের ক্ষেত্র খোঁজে। সামরিক বিভাগে জায়গা না পেয়ে রাজনৈতিক অবাঞ্ছনীয় দুরাচারের ভিতর দিয়ে তাদের সাহসিকতার দ্যোতনাকে চরিতার্থ করে।' রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা বিভাগ দেখে উল্লেখ করেন, 'এই কাজ কত

সুন্দর, কত মহৎ। যারা আত্মোৎকর্ষের জন্য ভ্রান্তভাবে রাজনীতিতে গেছে, তারা এখানে আর্ত ও রুগ্নের সেবার মাঝে কত বিশাল ক্ষেত্র পেতে পারত।'

রামকৃষ্ণ মিশনের উপর থেকে যে সন্দেহের দাগ মুছে গেল তাতে কে না খুশি হয়েছিল?

রামকৃষ্ণ মিশনকে মিছামিছি সন্দেহভাগী করে রাখা হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ বহু প্রয়াসে দোষ স্খালন করেন।

কারমাইকেল (লর্ড রোনাল্ডসে?) কলকাতায় শীতকালে বলেছিলেন, 'এই রাজনৈতিক গুপ্ত-সমিতিতে কয়েকটি বিভাগ আছে। কতকগুলি লোক মাথার কাজ করে, কতকগুলি হল দেহ, বাকিরা হাত-পা। এদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা খুব বিদ্বান, চরিত্রবলে খুব বলীয়ান এবং উন্নত। এমন লোকও আছে যে কখনও একটা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে ঘাঁটে নি। এদের সমর্থক ও ভক্ত বিস্তর।'

বাস্তবিক আমাদের এই বিকেন্দ্রিক সংঘে বহু শিক্ষিত লোক এই সময় ছিলেন। এ বিষয়ে সকেন্দ্রিক সংগঠনের দৃষ্টি সে সময় যথেষ্ট পড়ে নি। এই বিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার 'যুগান্তর' আখ্যা দেয়।

'যুগান্তর'-এর ইতিহাস খুবই গৌরবময়। ১৯১৩ সালে কাঁথির বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থে মনোরঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তখন ময়মনসিংহের দল এদের সঙ্গে একযোগে কাজ করত। ক্রমে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ-জোড়া সংস্থা গড়ে উঠল। বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ায় যতীনদাকে সর্বোপরি নেতা নির্বাচিত করা হল। এটির নাম সরকারী কাগজপত্রে 'যুগান্তর' দেওয়া হয়েছিল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে বাংলার লাট কেসিকে বারীন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখদের দ্বারা গঠিত 'দলের মধ্যে দলকে' (অনুশীলন'-এর মধ্যে আর একটা নামহীন দল বা নতুন দলকে) 'যুগান্তর' আখ্যা দিতে দেখা যায়। তাহলে মনের দিক থেকে 'যুগান্তর' দলের কৈশোর ও যৌবনের কল্পনা করা যেতে পারে। বারীনবাবুরা যা করেন সেটা মানসরাজ্যে একটা অসাধারণত্ব আনে। কিন্তু তার শক্তি, দৃঢ়তা, অপ্রতিহতকর কর্মচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তারও পরে। আর যেহেতু এই সংগঠনটি 'ঢাকা অনুশীলন' থেকে একেবারেই পৃথক—তাই এর নাম 'যুগান্তর' হয়ে যায়।

যদি এইরূপে পারম্পর্য ধরা যায় তবে এর নেতৃত্ব খুব উঁচুদরের ছিল স্বীকার করতে হবে। অলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন জগদ্‌গুরু শ্রীঅরবিন্দ, অমর বীর যতীন্দ্রনাথ এটির নেতৃত্বকে বিভূষিত করেছেন।

১৯১৭ সালে দু' একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। লর্ড কারমাইকেল বদলি হয়ে যান, আসেন লর্ড রোনাল্ডসে (বর্তমানে লর্ড জেটল্যান্ড)। লর্ড রোনাল্ডসে

ভাবগতিক দেখে নিজে আটক বন্দীদের কাগজপত্র দেখতে থাকেন। কলকাতার জেলে গিয়ে বন্দীদের দেখে আসেন। বাইরে হুড়ুম-দুড়ুম তখনও থামে নি। তিনি সিন্ধুবালাদের গ্রেপ্তারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। আরও বলেন, 'The sons of Bhadraloke have formed themselves into Guerilla bands which no government can look on with equanimity.—ভদ্রসন্তানরা গেরিলা দল গড়ে তুলেছে—কোনো সরকার নিরুদ্বিগ্ন মনে তা সহ্য করতে পারে না।' সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা—তা তিনি যে করে হোক করবেন। এরই কিছু পূর্বে চুঁচুড়াতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়ে যায়। সেখানে সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত বিনা বিচারে আটক রাখার তীব্র নিন্দা করেন। রোনাল্ডসেসাহেব সেদিকেও কটাক্ষপাত করেন। অখিলবাবু বলেছিলেন—সরকার যা করেছেন তা Massacre of the innocent—নির্দোষীদের ঝাঁকে ঝাঁকে হত্যা। এ নিয়ে সরকারী মহলে খুব হৈচৈ পড়ে যায়।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আঠারো জন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাজনীতিক শান্তি স্থাপনের জন্য একটা সংস্কারের খসড়া করেন। সেই পরিকল্পনাটি বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডসাহেবকে দেন, যাতে তিনি সেটি বিলাতে ভারত সচিবের কাছে পাঠান। বড়লাট সেটি পরীক্ষা করে বলেন যে, তিনি আরো ব্যাপক সংস্কারের জন্য ভারত সচিবকে লিখছেন। এই উপলক্ষে এক বক্তৃতায় বলেন, 'The Punjab, the martial province, could be restored to peace in three months' time. Whereas Bengal is continuing disturbances for three years. There must be something fundamentally wrong somewhere.—পাঞ্জাব ক্ষাত্রবীর্য-পূর্ণ প্রদেশ। তাকে তিন মাসে ঠান্ডা করা গেল, অ-ক্ষত্রিয় বাংলা তিন বছর ধরে অশান্তি করছে। শাসন পদ্ধতিতে কোথাও কিছু গলদ রয়ে গেছে।'

এরপর ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতে আসেন। তিনি বড়লাটের সঙ্গে নানা প্রদেশে ঘোরেন এবং বহুবিধ লোকের বক্তব্য শোনেন। কিছু একটা সংকল্প স্থির করে দেশে ফেরেন।

এই সময় জেলের জীবনে অসহনীয় কিছু কিছু ব্যাপার ঘটায় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে সর্বপ্রথম অনশন ধর্মঘট হয়। কিরণচন্দ্র মুখার্জী এটি সুরু করেন। তার মিটমাট হয়ে যায় সাত দিনে। তারপর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অনশন আরম্ভ হয়। এর মধ্যে কেউ কেউ বাহাত্তর দিন অনশনে থাকেন। এর মধ্যে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পঁচাত্তর দিন উপবাসী ছিলেন। এঁদের বিভিন্ন প্রদেশের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁদের দাবি শেষ অবধি মেটানো হয়।

তারপর অনশন ধর্মঘট হয় হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে চৌষট্টি দিন

অনশন চলার পর মীমাংসা হয়। রাজবন্দীদের সঙ্গে ব্যবহার যে ভালো করা হত না, সেরকম কথা আলিপুরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্নেল মুলভ্যানি পরবর্তী অনুসন্ধানকারী জেল কমিটিতে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন।

আমরা বন্ধুদের মধ্যে আবার অবস্থার পর্যালোচনা করেছিলাম। দেশে যে শক্তি জেগেছে তার লীলাভঙ্গীতে তিনটে পর পর অবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল। প্রথম পর্বে এসেছিল বিনা বাধার কর্মপ্রচেষ্টা। বাধা আসতে তা থেমে গিয়েছিল। এখানে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১০ সালের কথা বিশেষ করে ভেবেছিলাম। তারপরের অবস্থা এসেছে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়া। সেই অবস্থা তখন চলছিল। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এবার তৃতীয় দশা আসছে। এটা স্থায়ী হবে দীর্ঘকাল। প্রচণ্ড বাধাকে অগ্রাহ্য করে কাজ করতেই হবে। কর্মীদের নিজেদের অর্থনৈতিক সমস্যা নিজেদের পূরণ করতে হবে—আবার মরণ-পণ করে দেশের কাজে খেটেও যেতে হবে। এই সময় সতর্ক না হলে রাজনীতি অমার্জনীয় রূপে পঙ্কিল হয়ে উঠবে। জোর করে ট্যাক্স আদায় করার কোনো সমর্থনযোগ্য কারণ থাকবে না যদি নিজেদের খেয়ে বাঁচার জন্য ঐ টাকা খরচ হয়। তাছাড়া পরের স্কন্ধে ভর করেও বেশীদিন চলবে না। এটা রাজনীতির সাবালকত্বের অবস্থা। দুটো শক্ত জিনিষ একসঙ্গে করার দিন এসে পড়েছে। দেশের কাজ করা শক্ত জিনিষ; তার চেয়েও শক্ত হচ্ছে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা নিজেরা করে দেশের কাজ করা। অথচ সেই পরীক্ষাই আসছে। সেজন্য সবাইকে সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের তৎকালীন সঙ্গীদের আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বললাম। অবশ্য সর্বসময়ের জন্য যারা খেটে যাবে তাদের জন্য একটা ব্যবস্থাও চাই। সহানুভূতিসম্পন্ন এবং অর্থ-সামর্থ্যসম্পন্ন লোক দেখে দলে টানা দরকার। তাদের সেইভাবে চলতে হল। রোজগার ও কাজের একটা সমন্বয় করা হল। আমার সঙ্গে গা-ঢাকা দিয়েছিল যারা তাদের প্রত্যেককে রোজগারের জন্য খাটানো হতে লাগল। তাদের দিয়ে নুন ও কেরোসিন বিক্রি করানো হত, মুদীখানার দোকান করানো হত, হোটেলও করানো হয়েছিল। সুতোর ব্যাপারেও কাউকে কাউকে লিপ্ত করা হয়। মাথায় বোঝা নিয়ে দুরে দুরে এইসব জিনিষ বিক্রি করতে যেতে হত। তাছাড়া আরো কয়েকপ্রকারের দোকান ও কারবার করানো হয়েছিল। অতি কঠোর অবস্থার জীবনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। কেউ কেউ লাক্ষার ব্যবসা করল। আমি ওদের সঙ্গে তো ছিলামই, তাছাড়া ক্ষেত্র পেলে ডাক্তারি করতাম। এইরূপে ক্রমে আর্থিক সচ্ছলতা এল। তখন যারা অর্থনৈতিক সংকটে দূরে ছিল তাদের সাহায্য

পাঠানো হতে লাগল। আমি আমার সহকর্মীদের সম্বন্ধে খুব গৌরব বোধ করি। তারা প্রকৃত দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলেছিল। কাঠ কুড়িয়ে এনে রেঁধে শুধু লঙ্কা-পোড়া, নুন দিয়ে ভাত খেয়ে দীনাতিদীনের মতো জীবন নিয়ে বহুদিন সেই যুবকেরা সানন্দে দেশসেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল— 'ছোটখাটো সুখ-দুঃখ, কে হিসাব রাখে তার? তুমি যবে ডাকো মোরে—মা আমার, মা আমার!'

এদের কয়েকজনের নাম ব্যক্ত করে না গেলে ইতিহাসে ত্রুটি থাকে এবং আমি পাপ-লিপ্ত হয়ে পড়ি। সব নাম হয়ত আজ মনে নেই। তবু যতদূর পারি নামগুলি বলে যাই। ময়মনসিংহের সতীশ ঠাকুর, পৃথ্বীশ বোস, ক্ষিতীশ বোস, কুশাভাই (ভালো নাম কুলেন্দ্রচন্দ্র রায়), আর একজন ভালো কর্মীর নাম অশোক রায়; ফরিদপুরের গিরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী; কুষ্টিয়ার নলিনীকান্ত কর (যতীন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত অনুচর); নদীয়ার মন্মথ বিশ্বাস (অমরদার অনুচর, রাসবিহারীর সাথী এবং বসন্ত বিশ্বাসের ভাই); ময়মনসিংহের দীনেশ (আসল নাম বিনয়েন্দ্র রায়)। ছদ্মবেশের জীবনে নামও ছদ্ম থেকে গেছে অনেকের।

আর একটি ছেলে এসেছিল ভূপেনের সঙ্গে দৌলতপুর থেকে। সেও বরাবর চাপা থেকে গেছে। তার প্রস্তুতির দিনগুলি কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে গেছে; ছাই-চাপা আগুনের মতো সে দিন কাটিয়েছে আমাদের ভিতর। বহু কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কাজ তার মাথায় ছিল। ১৯৩০ সালের ড্যালহাউসি স্কোয়ার বোমার এবং চন্দননগরে চট্টগ্রামের বীরদের রাখার ভার সে নিয়েছিল—সে হচ্ছে রসিক দাস।

১৯১৬-১৭ সাল এসেছিল বহুবিধ ভাঙা গড়া নিয়ে—অনেক কিছু হারানো ও পাওয়া গিয়েছিল এসময়ে।

বসন্ত চাটুজ্যেকে সার্থক হত্যা করে 'অনুশীলন'-এর বীররা। এ ঘটনা ঘটে কলকাতায় ৩০শে জুন। এর ফলে 'যুগান্তর' দলের ওপর হাত আগেই পড়ল কলকাতায়। নরেন শেঠের বাড়ি হানা দিয়ে মায় বিছানা বালিশ পর্যন্ত নষ্ট করে এগারোজনকে ধরে নিয়ে যায়। নিত্য ধর-পাকড়ের খবর পাই। আমি সে সময়ে ময়মনসিংহে। দু'দিন আগে একটা বেড়াজাল পেতে পুলিস আমায়, নলিনী কর ও সুরেন ঘোষকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। অদৃষ্টের জোরে আমরা পার পাই। আমি ও নলিনী একটি পাট গুদামে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। খবরের কাগজে বসন্ত-নিধন প'ড়ে গদির বাবুরা—'কালী মাঈ কি জয়' বলে এমন চিৎকার করে উঠল যে বহু লোক জড়ো হয়ে গেল। উল্লাসের মাত্রা সেদিন ছিল এমনই।

এরপর মধু ও ক্ষিতীশ চৌধুরীকে ধরার পালা। তাদের ছদ্মবেশে সাজিয়ে

পুলিসের চেষ্টা ব্যর্থ করে আমরা রংপুরে চলে আসি। মধু যায় কাজের তাগিদে দিনাজপুরে। আমি তখন আশ্রয়হারা, চললাম কামাখ্যা। মতলব রেলে রেলে ঘুরে কয়েকটা দিন কাটাব। এর মধ্যে যদি একটা আড্ডা করে নিতে পারি ভালোই, নতুবা পকেটে ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড—তারই সঙ্গে গাঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়া যাবে। মধুর সঙ্গে ছিল নগেন চক্রবর্তী। মধু তার কার্যসূচীতে রেখেছিল দিনাজপুরের পর কলকাতা যাওয়া। আমি তাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলাম। কলকাতায় পুলিসের যেরকম শক্তি ও তৎপরতা, সেখানে যাওয়া মানে ধরা পড়া। একালে এক একটি বন্ধু ধরা পড়ে, মনে হয় পাঁজরার এক একটি হাড় খসে যাচ্ছে। মধু তার মিষ্টি হাসি দিয়ে আমায় একরকম নিশ্চিন্ত দিল যে, সে এমন সুবন্দোবস্তে থাকবে যে পুলিস তার কিছু করতে পারবে না।

কাউনিয়া জংশনে এলাম। এখান থেকে গাড়ি বদল করে দুজনরা দুটি বিভিন্ন দিকে যাব। ট্রেন ওঠার সময় দেখি নগেন মধুর দেহরক্ষা ছেড়ে আমার দেহরক্ষী হয়ে আমার কামরায় উঠে পড়ল। অবাক হলাম। এটা ঘটল কেন? সে বলল, সে মধুদার হুকুম পালন করছে মাত্র। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ কি! নিজের মতন করে শেষ নিশ্বাসটি ফেলারও অধিকার আমার নেই? দেশের সেবার নামে আমার স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু আর অবশিষ্ট রইল না। এমনই তো মরব না, মাথা খাটাব। একান্তই যদি কূল-কিনারা না পাই, দাদার শেষ আদেশ—জ্যান্ত ধরা দেবে না—মাত্র সেইটাই পালন করব।

শেষ পর্যন্ত পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে কামাখ্যায় এলাম। দুজনে এক পাণ্ডার বাড়িতে উঠলাম। খাতির যত্ন যথেষ্ট পেলাম। তার কাছ থেকে স্টেশনে ফিরে না গিয়ে অন্য দিক দিয়ে চলে যাবার পথ জেনে নিলাম। যেখানে যাই নগেন সঙ্গ ছাড়ে না। একদিন পকেটের তালুক মিলিয়ে দেখছি—দেখি ছোট্ট চিরুনি, ক্ষুদ্র আরশি, কাপড়ের গোল টুপি, এমনকি চার দানা কাবাব-চিনি যা সর্দির জন্য ব্যবহার করতাম—সব আছে। যেটি থাকলে সবই থাকে কেবল সেটি নেই। হারিয়েছে আমার মৌতাতের-রাজা ক্ষুদ্র কৌটায় পটাসিয়াম সায়ানাইড। কি হল? বিস্ময়! কেউ তো জানত না সেটি আমার সঙ্গের সঙ্গী। অবশেষে লজ্জা ছেড়ে ধরলাম নগেনকে চেপে—বলতেই হবে। এ হচ্ছে অনুরোধ নয়, আমার আদেশ। তখন সে স্বীকার পেল মধুদার আদেশে এমন কর্ম সে করেছে। মধুকে বলেছিল কুমিল্লায় পুলিন ঠাকুর। সে আমায় দলের জন্য বেঁচে থাকার মাহাত্ম্য অনেক শুনিয়েছিল। ফেরার দিন আকস্মিকভাবে মধুর সঙ্গে আবার কাউনিয়ায় দেখা। নগেনকে তাড়ালাম, তারা কলকাতা গেল।

এদিকে খরচের অংকে দেখি নরেন ঘোষচৌধুরী গেছে, মনোরঞ্জন গুপ্ত গেছে,

সুরেন ঘোষ গেছে, কিরণদা গেছেন, ভূপেন দত্তও গেল। মনে পড়ল ময়মনসিংহের সতীশ ঠাকুরের আবৃত্তি—

'একে একে খসে গেছে হৃদয়ের অস্থি কয়খানি,
দশ দিকে দশ ইন্দ্র হয়ে গেছে পাত—
তবু অরি, তবু অরি হই নি কাতর।'

আমি রংপুরের এক গ্রামে এলাম। ১৯১৭ সালে আমাদের দিক্‌পালদের মধ্যে ভূপেনের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। সে-সময় মাত্র সে, জীবন চ্যাটার্জী, কুন্তল চক্রবর্তী ও চারু ঘোষ বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পারত। বাকিরা তখন বসে গেছে। ঘোরাফেরা বিপদসংকুল। দিনে তো বটেই, রাত্রেও কম নয়। আমরা চন্দননগরে তাড়া খাই। সতীশ চক্রবর্তী, মন্মথ বিশ্বাসকে নিয়ে আমি ও নলিনী আসামের দিকে রওনা হই। তিলজলা কেবিনের দেবেন ঘোষের বাসায় 'অনুশীলন'-এর মস্ত লোক কৃষ্ণ সাহা, পরে অমরদা থাকতেন। ভূপেন ও কুন্তল পাহারা দিত। খিদিরপুর ডকের রামগোপাল দত্তের সাহায্যে অমরদাকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করছিল ভূপেন। ঐ হতভাগাই ভূপেনকে ধরিয়ে দেয়।

আমরা চন্দননগর ছাড়ি এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। ১৯১৭ সালে 'অনুশীলন'-এর সঙ্গে মিলন করে ফিরলাম। ভূপেন ধরা পড়ে বোধ হয় মে মাসে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বে বলেছি বিকেন্দ্রিক সংঘের কোনো নামকরণ করা হয় নি। অথচ সরকারী কাগজপত্রে এদের বলা হতে লাগল 'যুগান্তর পার্টি'। সকেন্দ্রিক সংঘের নাম চালু হল 'অনুশীলন সমিতি'। এই হল দুই প্রধান বিপ্লবী কেন্দ্রের জন্মকথা। বিকেন্দ্রিক সংঘের কাগজ ছিল 'যুগান্তর'। কলকাতায় ছিল তার প্রধান কেন্দ্র। এই যোগাযোগ হয়ত 'যুগান্তর' নামকরণে সাহায্য করেছে।

বিকেন্দ্রিক সংঘ এখন থেকে সরকারী দপ্তরে, 'যুগান্তর দল' বলে আখ্যাত হতে লাগল। এরপরে ১৯৩০ সালে বাংলায় যারা কাজ করেছে তারা 'অনুশীলন' না হলেই 'যুগান্তর' নাম পেয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনো একটি জেলে এক জায়গায় লেখা একটা গানের খানিকটা অংশ পাওয়া যায়—

'আবার আসিব, তোমারে সেবিব—ব্রত না সাঙ্গ হইলে,
কুঠারে কাটুক, বজ্রে বিঁধুক, ভাজুক তপ্ত তৈলে।
জগন্নাথের রথ যদি আসে, স্বরগে লইয়া যাইতে—
যাব না স্বর্গে, চাহি না মোক্ষ—তোমারে মুক্ত পাইতে ॥'

পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল গানটি বগুড়ার সর্ববরেণ্য নেতা, 'গণমঙ্গলের' প্রতিষ্ঠাতা যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের। তিনি দাদার কথা নিয়ে খেদ করে বলেছিলেন, 'তোরা মসলা পিষতে শালগ্রাম শিলাকে নুড়ির মতো ব্যবহার করলি ?' অর্থাৎ যতীন মুখাজীকে এইটুকু কাজের জন্য বার করা বা টেনে আনা সুবুদ্ধিসম্মত হয় নি। এ তো অপর কেউ করে যেত পারত।

দাদার জন্য মনে ব্যথা কার না হয়েছিল ? কিন্তু তিনি ভবিতব্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিলকের দ্বীপান্তর দণ্ড সম্বন্ধে অরবিন্দ যা বলেছিলেন, যতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাই খাটে—'Tilak wherever go you may, let your body perish with the canker of the bondage, the fire you have kindled in our hearts shall never be extinguished.' মূল্য তো দিতে হবে। হীরা কিনতে যাওয়া হচ্ছে, কাচের দামে তা মিলবে কেন ? যারা জনসাধারণের মধ্যে কাজের গুরুত্ব বুঝতেন না বা বুঝতে চাইতেন না, তাঁরা এর থেকে পরেও সেই পুরানো কর্মপদ্ধতিতে আস্থাবান ছিলেন। সময় নিজেই সব শেখায়।

যতীন্দ্রনাথের কিন্তু ভাবটা ছিল—

বিধি যদি আসি নিজে
বাধা দেন হেন কাজে—
নির্ভয়ে বলিব মোরা হেন বিধি নাহি চাই।'

এদিকে গান্ধিজী সরকারের যুদ্ধ কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন। রংরুট সংগ্রহ করতে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন এবং পূর্বাপর সঙ্গতি না রেখে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। কলকাতায় একবার এলেন এবং ব্যাপটিস্ট মিশনের বাড়িতে (কলেজ স্কোয়ার) এক সাধারণ সভায় অতিশয় কটূক্তি করে বাংলার বিপ্লবীদের নিন্দা করেন। এটা ঘটে খুব সম্ভবতঃ ১৯১৭-১৮ সালে—তিনি যখন ইংরেজের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য জোটাতে বেরিয়েছেন।

বিলাতের হাইকোর্টের জজ রাউলাটকে আনা হল। এক কমিশন তাঁর অধীনে তদন্ত করে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেবে—কী হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে এ অবস্থা যদি আবার আসে তাহলে কী করতে হবে। সারা ভারতের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাউলাট্ সাহেব এক রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৯১৯ সালে 'রাউলাট্ আইন' পাস হয়ে গেল। বিনাবিচারে বন্দী আটক, বিশেষ আদালতে বিচার, ধর-পাকড়—রাজ্য-রক্ষা আইনের মতো এইসবই তার ভিতর রইল।

গান্ধিজী নাগরিকের অধিকার এমনভাবে মথিত হতে পারবে দেখে বিচলিত হলেন। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে মনস্থ করলেন। ইতিমধ্যে 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারে'র রিপোর্ট বেরিয়েছিল। অমৃতসর কংগ্রেসে তিলক সদলবলে এটিকে প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব আনেন। গান্ধিজী সেই সংস্কার মেনে কাজ করতে রাজী হন। Inadequate, unsatisfactory—disappointing (যথেষ্ট নয়, তৃপ্তিপ্রদ নয়—নৈরাশ্যজনক) বলে তিলক এটিকে ত্যাগ করতে চান। গান্ধিজী বলেন, শুধু 'Disappointing' কথাটা বাদ দিয়ে দেওয়া হোক ; 'Inadequate, unsatisfactory' ব'লে আমাদের বিরক্তি প্রকাশ করা হোক। ওটা নিয়ে কাজ করতে বিরতি যেন না আসে। এইভাবে একটা আপোষনামা হয়। 'নৈরাশ্যজনক নয়' এইটি বাদ না দিলে গান্ধিজী সেই মাকাল ফল-রূপ সংস্কার নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ পাওয়া যাবে না ভেবেছিলেন।

ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের নামে মানহানির মোকদ্দমা করতে তিলক বিলাতে যান। 'Indian Unrest' পুস্তকে চিরোলসাহেব ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী সবরকম আন্দোলনের বিবরণ ও বিচার দিয়েছিলেন এবং চিতপাবন ব্রাহ্মণ তিলককে 'Evil genius (দুষ্টবুদ্ধি)' বলে চিত্রিত করেন। তারই মোকদ্দমা। এই ব্যাপার না হলে তিলক বিলাত যাবার ছাড়পত্র সম্ভবতঃ পেতেন না। তিনি ওদেশে গিয়ে ভারতের পক্ষের কথা লিখতে ও বলতে লাগলেন। গান্ধিজীর ডাক এল। তিনি—'I have lost all heart. The Rowlatt Act has taken away my earnestness.'—জবাব দিলেন। তাঁর সংস্কার নিয়ে কাজের উৎসাহ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাই বিলাতে গেলেন না। রাউলাট্ আইন উঠিয়ে দিতে হবে—তার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ

হল। তিনি মাদ্রাজের সালেম থেকে পরামর্শ দিলেন দেশব্যাপী একদিন হরতাল করতে। তিনি পাঞ্জাবে যাচ্ছিলেন। পাঞ্জাব-লাট ওডায়ার তাঁকে পাঞ্জাবে ঢুকতে দিল না। গুজব রাষ্ট্র হয়ে গেল তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। ইতিপূর্বে ১৯১৭ সালে গান্ধিজী বিহারে চম্পারন জেলায় নীলকরের অত্যাচার থেকে প্রজাদের বাঁচাবার জন্য আন্দোলন করতে যান। গুজরাটের খেড়া জেলায় খাসমহলে প্রচুর শস্য না হওয়া সত্ত্বেও খাজনার দায়ে প্রজাদের অস্থাবর সম্পত্তি সরকার ক্রোক আরম্ভ করায়, সেখানেও তিনি 'খাজনা দিয়ো না' ধর্মঘট করেন। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ে। পাঞ্জাবের ব্যাপারে জনসাধারণ খেপে ওঠে—শেষ পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ার-এর হুকুমে গুলী চলে। এমনি ক'রেই ভারতের রাজনীতিতে গান্ধিজীর প্রবেশ। বিপ্লবী আন্দোলনই প্রায় সাক্ষাৎভাবে গান্ধিজীকে ভারতের রাজনীতিতে আনে বললে অন্যায় হবে না।

১৯২০ সালে মনোরঞ্জন গুপ্ত আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে। মনোরঞ্জন চার বছর জেলে ছিল। আমি তখনও গ্রেপ্তার হই নি। মনোরঞ্জন বলে—সে জেলে ভেবে ঠিক করে যে পার্টির এখন নূতন কার্যপন্থা নেওয়া উচিত। বিনা অস্ত্রশস্ত্রে সে কাজ চলতে পারে। ভারত ব্রিটিশ শাসনাধিকার থেকে বেরিয়ে যেতে চায়—এইটাই হবে নতুন ধুয়া। জনসাধারণের মধ্যে খোলাখুলি ভাবে এ কথা প্রচার করতে হবে। তাদের টেনে আনতে হবে এইটার কার্যকরী রূপের মধ্যে। আমি এই মত সহজেই মেনে নিলাম। পরাধীন দেশে কোথাও কোথাও এই পথ অনুসৃত হয়ে ভালো ফল হয়েছে। চীনের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হাঙ্গেরিতে পিক্-এর নেতৃত্বে, আয়ার্ল্যাণ্ডে ও-কোনেল ও মিশরে অধুনা জগলুল পাশার অধীনে এই গোছের আন্দোলন হয়েছিল। আমি মনোরঞ্জনকে পুরোপুরি সমর্থন করলাম এবং গুপ্তপথ ছেড়ে সংঘ এবার প্রকাশ্য জীবন যাপন করবে এই পরামর্শ স্থির হল। ইতিমধ্যে অন্যান্য বন্ধুরা এই পথ নেওয়া স্থির করেছিলেন। আমি জানতাম স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিভঙ্গি ঢেউয়ের মতো শান্ত ও অশান্ত ভাবে নিজের পথ করে নেয়।

মনে পড়ে গেল বাংলার নীল আন্দোলন সম্পর্কে আমার লাঠিখেলার ওস্তাদের বাপের কথা। ১৮৬০ সালে কৃষকরা এই শান্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে জয়ী হয়েছিল। আমার লাঠিখেলার ওস্তাদের বৃদ্ধ পিতা ধর্মঘটের কথায় বলেছিল, 'বাবু, যুদ্ধু দু'রকম হতে পারে; লাঠি, বন্দুক, তলোয়ার, কিম্বা ধর্মঘটে।' কেশবানন্দ স্বামীও নীল আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। সুতরাং পথটা পরখ-করা—অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ১৮৪৫ সালে শিখরাজ্য প্রনষ্ট হলে কুকা বা নামধারী আন্দোলন এই শান্ত ভঙ্গিমায় হয় —তাও মনে পড়ল।

ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। 'সেভার'-এর সন্ধিতে তুর্কীর অঙ্গচ্ছেদের

চূড়ান্ত হল। এক হিসাবে ব্যবস্থা হল তুর্কীকে জীবন্ত সমাধি দেবার। ভারতীয় মুসলমান ভাইরা চঞ্চল হলেন। সহায়তা চাইলেন হিন্দুদের। গান্ধিজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করতে চাইলেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল। লালা লাজপত রায় তখন সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। তিনি বোম্বাইয়ে নেমে বলেন—খালি হাতে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাবেন। তিনিই সেবার কংগ্রেসের সভাপতি হন। সি. আর. দাশ আপত্তি করেন—তিনি তিলকের Responsive cooperation বেশী কার্যকরী মনে করতেন। বাংলায় বিপিনবাবু যে 'বয়কট্' ও 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বলতেন, গান্ধিজীর অহিংস-অসহযোগ তাছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক, ১৯২০ সালে ডিসেম্বরে নাগপুরে বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনে সি. আর. দাশ গান্ধিজীর মতে সায় দিয়ে ব্যারিস্টারি ছাড়েন। তাঁর ত্যাগের মহিমায় তিনি 'দেশবন্ধু' আখ্যা পেলেন এবং গ্রহণ করলেন বাংলার নেতৃত্ব। গান্ধিজী কংগ্রেস-গঠনবিধির পরিবর্তন করে ফেলেন। ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসনলাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য ঐ পুরাতন বয়ানটি বদলে লেখেন, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ, সম্ভবপক্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে—প্রয়োজন হলে সাম্রাজ্যের বাইরে।

সময়মতো আটক-আইনের বন্দীরা ফিরলেন। আমাদের দল ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল, কিন্তু সংঘের আপন প্রধান কেন্দ্র কংগ্রেসের বাইরে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে লাগল। হিংস কার্যসূচী বর্জিত হল বা মুলতুবি রইল। কিছু লোক 'মুলতুবি' কথাটায় খুশি হলেন। ব্যাপারটা হল—যার যাতে মন মানে। গান্ধিজীর সঙ্গে জুটে যাবার কিছু কারণ ঘটেছিল। আমরা ভেবেছিলাম ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল অবধি ধর্ষণ-নীতির ফলে দেশে যে অবসাদ এসে গিয়েছিল সেটা এতে কেটে যাবে ; যে 'স্বাধীনতা' কথাটা মন্ত্রের মতো গোপনে উচ্চারণ করতে হত, তা প্রকাশ্যে সাধারণ্যে বলা চলবে। যে 'জনসাধারণ'কে সঙ্গে পেতে চাওয়া হচ্ছিল—সে উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ হতে পারবে। তাছাড়া গান্ধিজীর কথা—'Had India a sword, I would have asked her to draw it. But as she had no sword—I ask her to adopt Non-violent Non-cooperation.—ভারতের অস্ত্রবল থাকলে তা প্রয়োগ করতে বলতাম। কিন্তু যখন তা নেই তখন অসহযোগ করাই যুক্তিযুক্ত।' সহিংস থেকে অহিংস প্রোগ্রামে যাবার একটা সেতু পাওয়া গেল। তিনি আরও বলেছিলেন, 'Non-violence may be accepted as creed or policy.—অহিংসাটা ধর্মভাবে বা রাজনীতির চাল হিসাবে নেওয়া চলতে পারে।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'I am out to destroy this satanic government.—আমি এই শয়তানী শাসনযন্ত্র ধ্বংস করতে বেরিয়েছি।' বিপ্লবীরাও তো তাই চেয়েছিল, ইংরেজের রাজ্যনাশ হোক।

উন্মেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বৈত-শাসনের (Diarchy) মণ্টেগ্-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হল। এতে দেশীয়দের জন্য হস্তান্তরিত কতকগুলি বিষয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার হাতেখড়ির ব্যবস্থা রইল। তাতে বাংলার মসনদে তিনজন মন্ত্রী 'জাতি-গঠনের' বিভাগ নিয়ে দিল্লিকা লাড্ডু চুষতে লাগলেন। মর্লি-মিণ্টো সংস্কারকে বিস্তৃত করে একজিকিউটিভ মেম্বারের অর্ধেক ভাগ ভারতবাসীকে দেওয়া হল। বাংলায় চারজন সভ্যের মধ্যে দুজন রইলেন দেশী। বাকী দুজন রইলেন শ্বেতাঙ্গ। আইন-শৃঙ্খলা রইল সাহেবদের হাতে। দৃশ্যতঃ সাতজন শাসন-পরিষদের মালিকের মধ্যে পাঁচজন রইলেন ভারতীয় এবং সবেমাত্র দুজন বিদেশী। ভোটের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে এতবড় আত্মসমর্পণ-যোগ আর কখনও হয় নি।

১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বিপ্লবীদের মধ্যে দু' একজন গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন রাজবন্দীরা সকলে মুক্তিলাভ করেছেন। সাতজন ফেরারী অবস্থায় থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদের নিয়ে হয়েছিল সমস্যা। তাঁদের কি করে বের করে সাধারণ জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে সেই প্রশ্নই সঙ্গীদের বিচার-বুদ্ধি তোলপাড় করছিল। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত অগ্রণী হিসাবে গান্ধীজির সঙ্গে এঁদের বিষয়ে আলোচনা করেন। গান্ধীজি পরামর্শ দেন এঁরা যেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবে এ-কাজ অতি কদর্য, আত্মমর্যাদা-হানিকর। সেজন্য তাঁর সুপারিশ তখন গ্রহণ করা হয় নি।

চন্দননগরের শ্রদ্ধেয় মতিবাবু এবার একটা নতুন ভূমিকা পেলেন। সাতজন 'নামকাটা সেপাই' দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সরকার বাহাদুরের সেগুলিকে আর চোখের আড় করতে মন সরছিল না। অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও সে গভীর জলের মাছগুলিকে বঁড়শিতে গাঁথতে না পেরে তাঁরা তাদের ডাঙায় তোলার অন্য ব্যবস্থা করলেন। মতিবাবুকে মাঝে খাড়া করা হল। তিনি গোপন-চারীদের মধ্যে একজনকে খবর পেঁছে দিতে পারলেন যে তারা ইচ্ছা করলে তখন বেরিয়ে আসতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন ব্রিটিশ সরকারের লোক এবং 'স্বদেশী সরকার' কায়েমের অভিলাষীদের মধ্যে একটা দেখাশুনা হয়ে যাওয়া। মতিবাবুর কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন অতুল ঘোষ। তিনি সে খবরটি নিজেদের অপর কেন্দ্রে বিবেচনার জন্য পাঠালেন। বিচার বৈঠক বসল। এখন আর আড়ালে আবডালে জীবন যাপন করার সার্থকতা ছিল না। পরাধীন দেশ বিদেশীর

(শাসকদের) সঙ্গে সংঘর্ষে নামে। গাছে না উঠতেই কাঁদি কারও ভাগ্যে ঘটে না। একটা ধারাবাহিক সংঘর্ষে আপাতঃ পরাজয়গুলির মধ্যে দিয়ে নৈতিক লাভ করতে করতে এগুতে হয় এবং ক্রমে দেশের মধ্যে খুব বড় একটা প্রভাব বিস্তার হয়ে যায়। কতকগুলি সংস্কারের পর সংস্কার হাতে এসে যায়। দেশে একদল লোক চিরদিনই থাকে যারা এতে প্রলুব্ধ হয় ও মজে। পূর্ণ স্বাধীনতার পূজারীরা এদিকে দৃক্‌পাতও করে না। নৈতিক জয় অবশেষে তাদের চেষ্টায় সর্বাঙ্গীণ জয়ে পরিণত হয়। সেদিক থেকে গত আন্দোলনের যা অবদান তা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর একটা নতুন সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অন্ধকার, অকৃতকার্যতা, ব্যর্থ প্রয়াস, হাট না জমতেই হাট-ভেঙে-যাওয়া, সর্বনাশ—এরই ভিতর দিয়ে স্বাধীনতার পথ পড়ে আছে। পুনঃ পুনঃ জয়লাভের চেষ্টা করে যেতে হবে। গভীর তমসা বিদূরিত হয়ে সুন্দর সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত তবেই দেখা দেবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠল সরকারী লোকেদের সঙ্গে দেখা হবে কিরূপে? দেখা করা যুক্তিসঙ্গত কিনা? দেখা যদি করতেই হয় তো, সেটা হবে কোথায়? দেখা করে কী ফলই বা হতে পারে?

কেউ বলল—আমাদের মন-মুখ এক। ওদের কি তাই? আমরা ফতুয়া পরি। সামনে-পিছন এক-কাপড়ে তৈরী। ওরা পরে ওয়েস্ট কোট। তার সামনেটা একরকম, পিছনটা আর একরকমের। ওদের সঙ্গে কখনও আমাদের মিল হতে পারে?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল একজন দেখা করবে। সাক্ষাৎকার হবে নিরপেক্ষ রাজ্যে (Neutral Territory-তে)।

মতিবাবুর মধ্যস্থতায় চন্দননগরে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। ব্রিটিশের দুটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসেন। তার মধ্যে একজন নেলসন্, আই. সি. এস. এবং অপর জন একজন বড় পুলিস অফিসার। নেলসন্ রাজনীতি বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন; অন্যজন পুলিসের অস্থায়ী ডি. আই জি.—নাম গল্ডি। বিপ্লবীদের তরফ থেকে গেলেন অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। উভয়পক্ষের কথাবার্তার সংক্ষিপ্তসার দাঁড়াল এই: বিপ্লবীরা চাইল—তাদের অতীত জীবন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারবে না। তারা স্বচ্ছন্দে যেখানে ইচ্ছা ঘুরাফিরা করতে পারবে। অপর নাগরিকদের মতো তাদের সাধারণ অধিকারগুলি অটুট থাকবে। সরকারপক্ষ প্রথম দাবি করেছিল অস্ত্রগুলি তাদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। তা না মানায়, কথা হল অস্ত্রগুলি এক জায়গায় রেখে দিতে হবে। জায়গাটি উভয়পক্ষের সম্মতি-সাপেক্ষ হবে। পরে সরকার সেখান থেকে ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে। বিপ্লবীপক্ষ তাতে রাজী হল না—অস্ত্রগুলি অতল জলে চলে গেছে। সুতরাং ও প্রশ্ন আর না তোলাই ভালো বলায় সরকার ও-কথা চাপা দিল। উভয়পক্ষ নিজ নিজ প্রধান কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাবে

বলল। কথা ছিল, এই আলাপে কোনো পক্ষের প্রতি অপরপক্ষের কোনোরূপ বাধ্য-বাধকতা আপাততঃ থাকবে না। অতুলবাবু দেখা করতে যাবার আগে 'Safe conduct' দিতে হবে, অর্থাৎ যাতায়াতের সময়ে পথে গ্রেপ্তার করা চলবে না এরূপ প্রতিশ্রুতি দাবি করা হল। তাতে স্বীকৃত হল ইংরেজ।

উভয়পক্ষেরই যাঁদের জানা দরকার তাঁরা সব কথা জানলেন। কিছুদিন বাদে বাংলা সরকার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দিল। ক্রমে সবাই প্রকাশ্য জীবনে ফিরে এলেন।

এঁরা এসে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। যুগান্তর দল সে আন্দোলনকে প্রাণের জিনিষ করে নিল। যাঁরা তখনও ভুল করে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় দু'বছর বাদে ভুল বুঝলেন—পরে এদিকে ফিরলেন।

১৯২১ সালের শেষদিকে ফিরে এলাম অজ্ঞাতবাস থেকে। বন্ধুবর সত্যেন মিত্র ইতিপূর্বে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে এসে দেশবন্ধুর নিজস্ব কর্মসচিব হন। তিনি আমায় বললেন, স্বদেশী-প্রচার বিভাগে যোগ দিতে। দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে এল।

১৯২২ সালে স্বদেশী বোর্ডের সভ্য হলাম। কুমারকৃষ্ণ দত্ত ছিলেন তার প্রধান কর্তা।

স্বদেশীর সময় জাপানী মোজা-গেঞ্জির কল আসে। কেউ তাতে কাজ করতে চাইত না, নতুন জিনিষ বলে। আমরা বিধবা মহিলাদের খোশামোদ করে কলে বোনার কাজ করতাম। তাতে হাত পাকালে দৈনিক আট-দশ আনা আয় হতে লাগল। যেমন দেখা গেল তাতে পেটের ভাত হয়—কলগুলি তখন আর গরীব, দুঃস্থ বিধবাদের হাতে রইল না। মোজা-গেঞ্জি শ্রমিকদের হাতে চলে গেল। ১৯২২ সালে সারাদিন চরকা কেটে কাটুনিরা পেত দু'আনা। তাতে পেটের ভাত হয় না। সেজন্য যাতে চরকা দ্বারা আট-দশ আনা আয় হয় তেমন চরকার সন্ধানে রইলাম। বারাসতের এক ব্যক্তি পায়ে-চালানো কলের চরকা আবিষ্কার করেন। তাতে দশ-বারো আনা আয়ের কাজ হতে পারার সম্ভাবনা ছিল। আমি বোর্ডের এক বৈঠকে পরামর্শ দিলাম যে, পেটের ভাত শ্রমিক যাতে পায় তেমন চরকার দরকার। কংগ্রেসের এক প্রদর্শনীতে পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে তার চরকা দেখাতে বলায়, বোর্ড তাতে চটে গেলেন। বললেন, মহাত্মাজীর ওতে আপত্তি আছে, ওটা কল। আমি বললাম, যুদ্ধের রীতি বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করে আমাদের চলা উচিত। পেটের ভাত না হলে কেউ চরকা ধরে থাকবে না। তাছাড়া শত্রুর যোগান ধ্বংস করে দেওয়া সমর-নীতি। ইংরেজের কাপড়ের ব্যবসা নষ্ট করতে হলে আমাদের বেশী সুতো কাটা প্রয়োজন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! অগত্যা আমি পদত্যাগ করলাম।

সুখের বিষয় ১৯৩০ সালে মহাত্মাজী এইরকম একটা চরকা-প্রদর্শনীর প্রস্তাব করেন এবং যে চরকাটি পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবে তাকে এক লক্ষ টাকা দেবার কথাও বললেন। আইন-ভঙ্গ আন্দোলন এসে পড়ায় আর কিছু হয় নি। পরে গৃহীত হল অম্বর চরকা।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন লোকের রাজভক্তির সুবিধা নিয়ে আন্দোলনকে ক্ষীণবল করার সরকারী চেষ্টা হয়েছিল এবারেও তার ব্যত্যয় হয় নি। প্রথমে ১৯২০ সালে কুইন ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক অব কনোট্‌কে আনানো হয়। তিনি মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের কথা বলেন। কিন্তু তাতে ফল ফলল না। আন্দোলন চাইছিল 'স্বরাজ'। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লর্ড রিডিং বুঝলেন মহারাণীর এই ছেলের রাজসিংহাসনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকায় রাজভক্তি ততটা জাগল না। তিনি এরপর আনাবার ব্যবস্থা করলেন যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে।

১৯২১ সালে শীতকালে প্রিন্স এলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রিন্সকে 'স্বাগত' জানাতে অনুমতি দিলেন না। ফলে যেখানে যখন যুবরাজ আসছিলেন লোকজনের সেখানে সেরূপ ভিড় হচ্ছিল না। বোম্বাই থেকে লক্ষ্নৌ পর্যন্ত এইভাবে কাটল। এমনকি রাজকুমার যেখানে যান সেখানেই দাঙ্গা বেধে উঠতে লাগল। এবার কলকাতার পালা। ওদিকে বিলাতের লোকেরা রিডিং-এর উপর অপ্রসন্ন হল। আগেই ভিক্টোরিয়ার পুত্র কনোট্‌কে নিয়ে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হতে হয়েছে, আবার প্রিন্সকে নিয়ে গিয়ে এরূপ হতমান করার কি দরকার? এরকম একটা বিরোধের সুর ইংলণ্ডে উঠায় লর্ড রিডিং প্রিন্সকে সশ্রদ্ধ সম্বর্ধিত করিয়ে দিতে ব্যগ্র হলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হল। মালব্যজী সুযোগ বুঝে কলকাতায় চলে এলেন। তিনি গান্ধীজির সঙ্গে কথা চালাতে লাগলেন। গান্ধীজি ছিলেন সবরমতি আশ্রমে। কলকাতার দুটি জেলে দেশবন্ধু ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে মালব্যজী সাক্ষাৎ করলে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁদের দু' জায়গা থেকে এক জেলে সরকার এনে দিল। মালব্যজীর কথা—গান্ধীজি বলেছেন স্বরাজ একবছরে এসে যাবে। বছর শেষ হতে চলল, স্বরাজ আসার নাম নেই। এটা নভেম্বর মাস। সতরোই নভেম্বর প্রিন্সের কলকাতা পৌঁছোনর কথা। এ সময় আইন অমান্য চলছিল। সরকার খুব কঠোর নীতিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মন দিয়েছিলেন। আন্দোলন বেশীদিন সবল থাকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। এই সময় যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial Autonomy) এনে দেওয়া যায় তাহলে গান্ধীজি পরে বলতে পারবেন—যতটুকু তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে ততটুকু ফল ফলেছে। সাফল্যের মতো সফলতার পরিপোষক আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং গান্ধীজি যদি তারপর বলেন আরো সাড়া দিলে পুরো স্বাধীনতা এসে

যাবে—লোকে অবহেলে ছুটে আসবে, কাজ ভালোভাবেই উদ্ধার হবে। প্রিন্সকে যদি সাধারণের দিক থেকে 'স্বাগত' করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে লর্ড রিডিং এতটা করতে রাজী আছেন। আর যদি তা না হয়, ব্যর্থতায় দেশ আরো ডুবে যাবে। মালব্যজী আমাদের কয়েকটি বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন; জানতে চাইলেন রাজনীতিক কী বন্দোবস্ত তারা মানতে রাজী আছে। ভূপেন দত্ত, অতুল ঘোষ ও আমি আলাপ করি মালব্যজীর সঙ্গে।

আমি বলি, কোনোরূপ বাক্যসম্বন্ধীয় কুসংস্কার আমাদের নেই। অর্থাৎ বাক্‌জালে আমরা আবদ্ধ নই। তখন মালব্যজী বলেন, 'কি হলে তোমরা রাজীনামা বা মিটমাট মেনে নেবে?' তখন বলা হল—আত্মকর্তৃত্ব, প্রাদেশিক কর্তৃত্ব, ঘরোয়া-রাজ, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতা—যা ইচ্ছা বলতে পারেন কিন্তু দুটো শর্ত পূর্ণ হলে আমরা তা মেনে নেব। সে হচ্ছে অর্থ ও সৈন্য—এই দুটি বিভাগে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে।

তাতে মালব্যজী আমায় বলেন—'You mischievous young man! What have you not said?—ওহে দুষ্ট ছোকরা, বলতে কি বাকি রেখেছ? এই দুটো হলেই তো পূর্ণ স্বাধিকার এসে যায়। আমি তোমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এদিকে ইংরেজের পিঠ ঝুঁকিয়ে দেবার মতো বল প্রয়োগ এখনও যে আমরা করতে পারি নি।' 'তবে আপনারা বর্ষীয়ানরা কথা বলুন। আমাদের ছেড়ে দিন'—ব'লে আমরা চলে আসি। মালব্যজীর যুক্তি দেশবন্ধু মানলেন—শ্যামবাবু গান্ধীজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গান্ধীজি চাইলেন প্রথমে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, পরে কথা হতে পারে। রিডিং করাচির রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়া বাকিদের মুক্ত করতে রাজী হলেন। করাচিতে রাজদ্রোহসূচক একটা তীব্র মন্তব্য করায় আলি ভ্রাতাদ্বয়, ডাক্তার কিচলু প্রভৃতি দু'বছরের কারাদণ্ড পান। গান্ধীজি জেদ ধরলেন এঁদের মুক্তি দিতে হবে। রিডিং গররাজী হলেন। ফলে আপোসের সম্ভাবনা গেল ভেঙে। দেশবন্ধু বিরক্ত হলেন। শ্যামবাবু ও দেশবন্ধুতে দেখা দিল পার্থক্য।

দেশবন্ধু বললেন তিনি জীবনে কখনও এমন বিদ্রোহী হন নি—এবার গান্ধীজির ভুল চালে যেমন হয়েছিলেন। তিনি বললেন—'এর নাম কি রাজনীতি?'

সরকার চণ্ডনীতি দৃঢ়তরভাবে চালাতে মনস্থ করল। মালব্যজী বললেন—গান্ধীজি ভুল করলেন। দূরে থাকায় অবস্থা ঠিক বিচার করতে পারেন নি। গান্ধীজির নির্দেশে 'করাচি রিজোলিউশন' কংগ্রেসের সবরকম প্রতিষ্ঠান থেকে খোলা সভায় পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে মাদারিপুরের পূর্ণ দাসের জেল হয় তিনবছর।

সরকারের ক্রুদ্ধ ভাব দেখে মনে হয়েছিল আমেদাবাদ কংগ্রেসে হয়ত গুলী চলবে।

গান্ধীজি আগেই বলেছিলেন (তখন অসহযোগ আন্দোলন তো চলছিলই) আইন-অমান্য আন্দোলনও করতে হতে পারে। বর্দোলি, নড়িয়াদ ও সুরাটের ব্যবস্থা দেখে এসে তবে অন্যেরা তা করতে পারে। কিন্তু বাংলার অপেক্ষা করা চলল না। আগের মতো মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন নিয়ে গোলমাল বাধল। আর বাধল 'কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'কে অবৈধ ঘোষণা করায়। দেশপ্রাণ বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে কাঁথি আইন-অমান্য করে জয়ী হল। এরই কাছাকাছি সময়ে মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় ও হুগলি জেলার আরামবাগেও আইন-অমান্য সুরু হয়। এদিকে দেশবন্ধু আপনার স্ত্রী, ভগ্নী ও একমাত্র পুত্রকে প্রথমেই জেলে পাঠিয়ে বাংলাকে স্বদেশপ্রেমের বানে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নিজেও চলে গেলেন জেলে।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে যাওয়া নিতান্ত দরকার বোধ করায়, যারা সদ্য মুক্ত হয়েছে সেইসব বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচনা উঠল। আমি সবাইকে সর্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলে কেউ কেউ প্রতিবাদের সুর তুলল। গান্ধীজি ব্যাপটিস্ট মিশন হলে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে যেসব অযথা, অসম্মান-জনক মন্তব্য করেছিলেন সেই কথা তারা ধরে বসল। আমি গান্ধীজির সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে দেখা করা অবশ্য প্রয়োজন মনে করলাম। আমরা কয়েক বন্ধু আমেদাবাদে গেলাম। যাবার আগে সাতকড়ি ব্যানার্জীকে অনুসন্ধান করতে বলি বিপ্লবীদের অভিযোগ সম্বন্ধে। অনুসন্ধানে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হল।

মালব্যজীর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে গান্ধীজি বললেন, 'The door is still wide open for negotiations.—আলোচনার দরজা খোলা আছে।' ব্রিটিশ সরকার কিন্তু তাতে কর্ণপাত করল না। তারা ততক্ষণে তাদের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

আমি গান্ধীজির সঙ্গে একান্তে দেখা করবার অনুমতি চাই। দেখা হল ঠিক একান্তে নয়। মহাত্মাজীকে বললাম যদি তিনি বাংলার কাজ চান তাহলে কর্মীদের ওরকমে মনে ব্যথা দিলে লোক পাবেন না। গান্ধীজি আমাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি বাবা গুরুদিৎ সিংকে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পরামর্শ যেমন দিয়েছিলেন তেমনি আমাদেরও দিয়েছিলেন। আমাদের সে পরামর্শ ভালো লাগে নি। আমরা এতে আত্মমর্যাদায় আঘাত বোধ করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সসম্মানে একটা নিষ্পত্তি অন্যরকমে হয়ে যেতে পেরেছিল। সে কথা তো কিছু আগেই বলেছি।

গান্ধীজির সঙ্গে সেদিনকার আলাপের সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করলে হৃদয়গ্রাহী হবে।

কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির বিশেষ কর্মী আমার পুরোনো বন্ধু অমর বোস আমার সচিব হয়ে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় স্থির করে আসেন। রাত্রি দশটার পর আমরা গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আহূত হই। ইতিমধ্যে গান্ধীজির 'স্বরাজ' কথাটা নিয়ে দেশকর্মীরা নিজ নিজ মন-মর্জি মতো ব্যাখ্যা করে চলেছিলেন। গান্ধীজি নিজে এটির জন্য কোনো সঠিক নির্দিষ্ট বা বিশদ ব্যাখ্যা দেন নি। শুধু বলেছিলেন সম্ভবপর হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে, অন্যথায় বাইরে হবে আমাদের স্বরাজের স্থিতি।

বোম্বাইয়ে পার্শীরা সঠিক লক্ষ্যটি জানবার জন্য তাঁকে নিজেদের মধ্যে একটি সভায় আহূত করেন। সেখানে মহাত্মাজী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে তাঁর ঈপ্সিত স্বরাজ বলে স্বীকার করেন।

এখানে আমার আর এক সংকট উপস্থিত হল। আমরা 'বিপ্লবী সংঘ'—বরাবর ইংরেজের সম্পর্কশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতাকে আমরা আমাদের লক্ষ্য করে এসেছি। গান্ধীজিকে প্রশ্ন করলাম—পার্শীদের কাছে যে কথা তিনি বলে এসেছেন তা কি সত্য? তিনি বললেন —'হ্যাঁ।' বললাম, পূর্ণ স্বাধীনতা একটা জাতির আদর্শ হতে পারে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে কেন তিনি আদর্শ মনে করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন—'আমি চাই না যে আমার দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। —I don't want my country to be at war with other nations' বুঝলাম স্বাধীনতা থাকলে আমরা নিজেরাও যুদ্ধ-ঘোষণা করতে পারি। আমাদের সে ক্ষমতা থাকা তিনি পছন্দ করেন না। এখানে কি করে তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া যায়? জিজ্ঞাসা করলাম, বিনা সংঘর্ষে কি তাঁর মনোমতো স্বরাজ আসবে? বললেন—'লড়তে হবে।' বললাম, ঐটি আনতে যখন ত্যাগ-স্বীকার ও ক্লেশ বরণ করতেই হবে, তখন আরো উচ্চে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। পরে বললাম, আপনি কি বিশ্বাস করেন খালি অহিংস উপায়ে আমরা উদ্ধার পাব? স্বরাজ আসবে? তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'হ্যাঁ।' তারপর বললাম, আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দকে মানেন? উত্তর হল—'নিশ্চয়। তাঁর লেখা থেকেও তো আমি প্রেরণা পেয়েছি।' তখন বললাম, তিনি অহিংসাকে নিন্দা করেছেন; বলেছেন বুদ্ধ ও চৈতন্যের অহিংসা ভারতে অবনতি এনেছে। গান্ধীজি বললেন—'তাঁদের অহিংসা ও আমার অহিংসা এক নয়। আমার হচ্ছে সবলের অহিংসা।'

এরপর আমি প্রশ্নের ধাঁজ বদলে ফেললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলে মানেন? মহাত্মাজী প্রসন্নভাবে উত্তর করলেন—'হ্যাঁ।' 'গীতা' তাঁর উক্তি বিশ্বাস করেন? 'হ্যাঁ।' অর্জুন তো সহিংস যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, অবতার-পুরুষ তাঁকে তাতে কিন্তু প্রবর্তন করেন। তাহলে

আপনি কি বলবেন অবতার-পুরুষ ভ্রান্ত? মহাত্মাজী বললেন, 'গীতার অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে।' আমি বললাম, শ্রীকৃষ্ণ তো অপর কাউকে তাঁর ব্যাখ্যাকারী করে যান নি। অপরে যে ব্যাখ্যা করবেন, সে তো হবে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা, নিজের কথা। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলে গেছেন। গান্ধীজি অল্পক্ষণ কী যেন ভাবতে লাগলেন।

একজন শিখ ভদ্রলোক বসে ছিলেন। অতর্কিতে প্রশ্নটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে বসলেন—'রাজপুত নারীরা কত বীরত্ব দেখিয়ে গেছেন। তাঁদের 'জহর-ব্রত' কি কম জিনিষ?' আমি বললাম, রাজপুত নারীদের সম্মান করি, তাঁদের কাছে মাথা নত করি। কিন্তু রাজপুত পুরুষরা কী ছিলেন—কাপুরুষ?

শিখ ভদ্রলোকটি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। আমি আরও বললাম—রাজপুত রমণীরা বীর রাজপুত পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনীই ছিলেন। তা বলে কি সারা দেশটাকে পুরুষহীন করে ফেলতে চান? আমি চাই পুরুষ থাকবে পুরুষের মতো।

তখন তিনি বললেন, 'নানকানাসাহেবে' শিখ পুরুষরা অল্পকাল আগে কী অসমসাহসিক বীরত্ব দেখিয়েছেন! তাঁদের অহিংসার তুলনা আছে?' ভাবলেন এইবার আমায় কাত করেছেন। আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে জবাব দিলাম, গুরু নানক তো অহিংস ছিলেন? 'হ্যাঁ।' 'গুরু গোবিন্দ শিখকে তলোয়ার ধরিয়েছিলেন এ কথার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। তাহলে তিনি কি অপকর্ম করলেন? তা যদি মনে করেন, এখনই এখানে, মহাত্মাজীর সামনে গুরু গোবিন্দকে নিন্দা করুন।' তিনি একেবারে দ'মে চুপ হয়ে গেলেন।

গান্ধীজি ডান হাতটি আমার পিঠের উপরে রেখে বারকয়েক ঠুকে দিলেন। বললেন, 'যদি আমার পন্থায় বিশ্বাস না কর, তাহলে সহানুভূতিসম্পন্ন দর্শকের মতো এটাকে দেখে যাও। বাংলাদেশে আমায় বাধা দিয়ো না।' আমি বললাম—বাধা? মোটেই নয়। আমি আপনাকে সাহায্য করব যে-পর্যন্ত-না আপনি ঠকে যান। সেদিন ঠিকমতো আমি তাঁকে বুঝলাম। তারপর বললাম, 'আপনি বোধ হয় একটি উন্নততর সভ্যতা জগতে আনার পক্ষপাতী?' 'হ্যাঁ।' 'তবে আপনি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ভারতে এ পরীক্ষা করতে এলেন কেন?' 'ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ পৃথিবীতে অতুলনীয়। এইখানেই আমার পরীক্ষা সার্থকতা লাভ করতে পারে। এখানকার সাফল্য সারা জগতে আপনার থেকে ছড়িয়ে পড়বে।' ভাবলাম এঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি একদিন অবধারিত। একসঙ্গে যতটা চলা যায়, যাওয়া হোক। আমি তাঁকে সেদিন থেকে আর ভুল বুঝি নি। গান্ধীজি সর্বপ্রথম সাধু, তারপর রাজনীতিক। বাংলার অসন্তুষ্ট বীর বিপ্লবীদের মনের বিরাগ দূর করবার অনুরোধ জানিয়ে সেদিনের বৈঠক শেষ করে আসি। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন লায়নসাহেবের

সভায় ও কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় তিনি বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কী ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। শেষে স্থির করলেন শীঘ্রই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তিনি ঐ কর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর মত বা মনোভাব লিখবেন। তাঁর কথা তিনি রেখেছিলেন। ১৯২২ সালের ১৬ই বা ১৭ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটি মনোরম বিবৃতি তিনি দিয়েছিলেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে।

বিপ্লবীদের মহাত্মাজীর সঙ্গে কংগ্রেসের কাজে জুটতে পরামর্শ দিয়েছিলাম—গান্ধীজির নেতৃত্বে জনসাধারণের মধ্যে যা আরম্ভ হয়েছে তাকে প্রগতিসম্পন্ন করতে। পাছে বিপ্লবীরা কংগ্রেসে গিয়ে আত্মহারা হয়ে যায় সেজন্য বিপ্লবী কেন্দ্রকে কংগ্রেসের বাইরে রাখা হয়। এ বিষয়ে আমরা সব বন্ধু একমত হই।

১৯২২ সাল। অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়ল। একবছরে স্বরাজ পাবার লোভে বা নেশায় যারা নতুন নতুন ছুটেছিল তাদের অধিকাংশের আশাভঙ্গ হল। ঘরের বাইরের দিকের যাত্রা থেকে ঘরমুখো রওনা হল বহু লোক।

এই সময় 'আত্মশক্তি' প্রকাশিত হল। সেইটি পার্টির কাগজ হোক চাইল কিছু লোক। তারা এইটে নিয়ে লেগে রইল। 'আত্মশক্তি' নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। জ্ঞান দাসের খাটুনি এর জন্য প্রশংসার যোগ্য। নতুন সংস্কার প্রবর্তিত হলে যাঁরা পূর্বে দ্বীপান্তরে গিয়েছিলেন (বারীনবাবুরা) তাঁরা মুক্ত হলেন। কিন্তু যাঁরা ১৯১৫ সাল থেকে যেতে আরম্ভ করেন, তাঁরা মুক্ত হলেন না। ১৯০৯ সালের 'রাজেন্দ্রপুর ট্রেন লুটের' আসামীও মুক্ত হন নি।

এঁদের মুক্তির জন্য চেষ্টা চলতে লাগল। স্যার হিউ স্টিফেনসন্ সে সময় বাংলা সরকারের হোম মেম্বার। আমি আন্দামানের বন্ধুদের জন্য এই সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সাহেব বললেন পুলিসের রিপোর্ট না পেলে তিনি আগে থেকে কিছু বলতে পারেন না। পুলিসকর্তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। এই অবকাশ বুঝে তিনি একটি প্রস্তাব করে বসলেন—'খেলাফত উপলক্ষে মুসলমানরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেছে মাত্র।—They call us Christians Kafirs and you Hindus also Kafirs. Let us therefore join hands.' মামলা দাঁড়াল সঙ্গীন। সাহেবের সহায়তা না পেলে দায়মলী বন্ধুরা মুক্ত হয় না। সাহেব চটলে সহায়তা করবে না। কিন্তু তাদের তো সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে হবে? মুক্তির কথা নিয়ে তাদের ছোট করার অধিকার কারুর নেই।

আমি উত্তর দিলাম, 'You have come to the wrong shop.' সাহেব পরে মণ্টেগু-ফোর্ড সংস্কারের গুণাবলী কীর্তন করলেন, 'সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ভারতবাসী। ইংরেজরা Hopeless Minority. এটাকে কেন তোমরা মেনে নাও?' আমি উত্তর

দিলাম, 'We may consider a proposal of alliance with equal status. Nothing else.' তারপর বিদায় নিলাম। তখন কে জানত অদৃষ্টের পরিহাস জ্বলজ্বল করছে? জেলের বাইরে যাদের অভিনন্দন করে নিয়ে আসব তারাই কয়েকদিন বাদে অভ্যর্থনা করে জেলের ভিতর আমাদের গ্রহণ করল। এদিকে খবর এল জেল থেকে দেশবন্ধু এরূপ বিরক্ত হয়েছেন যে তিনি শিবপুর বা খড়দহে গিয়ে বাস করবেন। সাধন-ভজনের জীবন যাপন করবেন। রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন। এ কথাটা হেমন্ত সরকার উপেনদাকে জানান। পরে দুজনেই আমার কাছে আসেন। এই খবরে প্রাণে বড় আঘাত দেয়। পরামর্শ করে স্থির হল দেশবন্ধুকে যদি জানানো যায় যে তাঁর কর্মীর অভাব হবে না, যাদের তিনি চেনেন তেমন অনন্যমনা কর্মীরা তাঁকে সমর্থন করবে, তাহলে তাঁর মত এখনও বদলাতে পারে। বলেছি, হেমন্ত সরকার উপেনদাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে দেশবন্ধুর খবর দেন। তাঁর মারফত দেশবন্ধুকে খবর দিই। জানা গেল তিনি অসহযোগ আন্দোলনের আর সবকিছুই বজায় রাখবেন—শুধু বদলাবেন কাউন্সিলে ঢোকার পদটা। তাঁর মনোভাব গোপন রইল না। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের পার্নেল-এর ধরনটাকে একটু রদ-বদল করে নিতে চান। ১৮৮৮ সালে পার্নেল আয়ার্ল্যাণ্ডে জমিস্বত্ব নিয়ে Passive Resistance সুরু করেন। আমার অধিকাংশ বন্ধুদের সম্মতি তাঁর দিকেই হল। 'আত্মশক্তি' জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নীতি নিয়ে চলছিল। অর্থনৈতিক উন্নতি অর্থে শুধু কিছু সংস্কার নয়। 'কৃষকের লাউয়ের মাচার ভাঙা খুঁটিটি বদলে দিলেই তারা কৃতার্থ হল এই ভাব নিয়ে কাজ করা ভণ্ডামি। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধিকার তাদের করায়ত্ত হওয়া চাই।...টাকাটা যদি মূলধন হয়, গতর-পাতটা কেন নয়? কলের মহাজন লাভের সব গুড়টুকু চুষে খাবে, গায়ে-খাটা পিঁপড়েটি বাদ যাবে কেন? ন্যায়তঃ মহাজনের সঙ্গে মজুরেরও লাভের অংশ সমানভাবে হওয়া চাই।...স্বদেশ মানে জনসাধারণের দেশ। স্বরাজ মানে নিজস্ব রাজ।'

'আত্মশক্তি'তে এই ধরনের লেখা হত। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে 'আত্মশক্তি' প্রথম বেরোয়। সম্পাদক: উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; কর্মসচিব: জ্ঞানদাচরণ দাস। উপেনদাকে অনুরোধ উপরোধ করে আমি সম্পাদক করি।

যাই হোক, ১৯২২ সালে দেশবন্ধু মুক্ত হয়ে এসে এমন এক বক্তৃতা দেন যে সেটা নিয়ে খবরের কাগজওয়ালারা তাঁকে অপ্রিয় সমালোচনা করে। একমাত্র সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' তাঁকে সমর্থন করে লেখে। সম্পাদককে তিনি ডেকে পাঠান এবং তাঁর কাছ থেকে সব সংবাদ পান। তিনি রাজনীতিতে থাকবেন—ছাড়বেন না, জানান।

ক্রমে স্বরাজ পার্টির পত্তন হয়। গয়া কংগ্রেসে ১৯২২-২৩ সালে তাঁর পক্ষে

কংগ্রেসের চার-আনা লোক, বিরুদ্ধে বারো-আনা। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আগেই পেয়েছিলেন। কর্মীদের আবেদন জানাতে বলায় তিনি রাজী হন। প্রতিনিধিরূপে সুভাষবাবু এসে দেশবন্ধুকে সমর্থনের প্রার্থনা করেন। দেশবন্ধুকে সহায়তা দেওয়া হয়। সচরাচর সাধারণ কর্মীদের ভাড়াটে দালালরূপে ব্যবহার করতে চান নেতারা। আমি তাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কর্মীদের কাছে দেশবন্ধুকে আবেদন করতে বলি। তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি নিজে আমাদের কেন্দ্রে আসতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্মানরক্ষার্থে প্রতিনিধি পাঠালে চলবে বলি। তিনি বাংলাদেশে জয়ী হলেন। পরে এলাহাবাদের মিটিং-এ অনিলবরণ রায়ের 'তিনমাসের আপোস প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এর ফলে পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তনবিরোধীরা একটা রাজীনামা বা রফা খাড়া করেন। শেষের ঘটনাটি ঘটে ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

দেশবন্ধু বাংলার কংগ্রেসের সর্বাধিনায়কের পদ ত্যাগ করলেন। তিনি তাঁর মত স্বাধীনভাবে প্রচার করতে মনস্থ করেছিলেন। তাঁর এই কাজটি শোভন হল। কোনোরূপে কংগ্রেসের সভাপতির পদ কামড়ে থেকে অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে কাজ করলে মানুষ হীন হয়। দেশবন্ধুর অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। বাংলায় ক্রমে দুটো কংগ্রেস কমিটি, দুজন সভাপতি ও দুজন সেক্রেটারি হলেন। মৌলানা আক্রাম খাঁ সভাপতি এবং ভূপতি মজুমদার সেক্রেটারি হলেন একটির ; শ্যামসুন্দরবাবু সভাপতি ও প্রফুল্ল ঘোষ সেক্রেটারি অপরটির। কিছুদিন এইরকম খাপছাড়া কংগ্রেসের কাজ বাংলায় চলেছিল। পরে দেশবন্ধুর দলটিই 'নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি'র স্বীকৃতি পায়।

এইবার একটা খবর প্রকাশ করে বলি। দেশবন্ধুর প্রতিনিধিরূপে সুভাষবাবু কথা কইতে এলে তাঁকে বলি—বর্ষীয়ানদের রাজনীতিক পন্থায় তরুণ হয়ে তিনি কেন ঢুকেছেন ? আলাপ-আলোচনায় প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি অঙ্গীকার করেন বিপ্লবী পন্থায় যোগ দিতে। আমরাও দেশবন্ধুকে আমাদের সমর্থনের অঙ্গীকার তাঁর মারফত পাঠাই। এরপর থেকে সুভাষবাবু ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার আদর্শে আস্থা ত্যাগ করেন। কংগ্রেস তো তখনো ঐ আদর্শ খোলামেলা ভাবে ত্যাগ করে নি ? তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যেতে লাগলেন। তারই ফলে তাঁকে ১৯২৪ সালে বিপ্লবীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার ও আটক রাখা হয়। ফলে তিনি আরো বেশি করে বিপ্লবীদের আপনার হয়ে পড়েন।

সুভাষবাবুকে আমার সঙ্গে মিলিত করার ব্যাপারে ভূপতি মজুমদার, জীবন চট্টোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল।

মহাত্মাজী জেলে থাকায়, পরিবর্তনবিরোধীদের সেদিন নেতৃত্ব করেন রাজা-গোপালাচারি। তাঁর তখন ভারী পসার-প্রতিপত্তি।

সত্যেন মিত্র এবং আমি ঐ সময়ে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। আমরা বেনারস থেকে এলাহাবাদে যাই। দুই জায়গাতেই সাক্ষাৎ করি কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ও কংগ্রেসীর সঙ্গে। কাশীতে সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও পণ্ডিত ভগবান দাসের সঙ্গে দেখা হয়। ভগবান দাস তখন দেশকে তৈয়ারি করার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিলেন। এঁদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে আলাপ করি। সমাজ ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি যা তাঁদের সম্মুখে রেখে কথা বলি তাতে তাঁরা খুব সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শিবপ্রসাদ গুপ্ত কিছু অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত হন।

আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমরা আমাদের নব্য-নীতি বা তখনকার নীতি বিজ্ঞাপিত করি। আমরা বলি, কংগ্রেসের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য দাবি খাড়া করা সম্বন্ধে কংগ্রেসকে অবহিত করা হবে আমাদের কাজ। কৃষকরা স্বাধীনভাবে তাদের জমির উন্নতি করতে পারবে। উঠ-বন্দী নিয়মের মতো কোনো অস্থায়ী জমি-পত্তনির নিয়ম থাকতে পারবে না, চষত জমি ও বসত জমিতে তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে, অন্যায় খাজনা দেবে না। জমির মালিক তারাই হবে। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ বড়। আমি যা প্রচার করছিলাম কাজে তা প্রমাণ করার সময় এসেছিল। বাঁকুড়া জেলায় আমাদের প্রায় একশো বিঘা জমি ছিল। সেই সময় সরকার সেটেলমেণ্ট শেষ করে আনছিলেন (তিন-আইনের সময়)। আমি যখন নিজে চাষ করব না, অন্য পেশা করব—তখন যারা প্রকৃত চাষী অথচ জমিহীন, সেইসব প্রজাকে ঐ জমি দিয়ে দিই। এতে আমার নব ভাবাদর্শের ও প্রচারের অধিকার জন্মাল মনে করলাম। এই কাজে ধনগোপাল আমায় সমর্থন করেছিল। জমিদার জমি না আগলে তার জমা বা গচ্ছিত টাকা নিয়ে কলকারখানা খুলুন। আমাদের দেশের ইতিহাসে জমির মালিক ছিল কৃষকরা। ইংরেজ আমলে জমিদার হয় মালিক। কত বড় অন্যায়! মজুররা গোলামের মতো অবস্থায় জীবন কাটাবে না। তাদের ক্লেশ দূর করার মতো আইন এখনই হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। খাটুনির সময়-সংক্ষেপ, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার অধিকার, বেশী ছুটির দিন, গর্ভবতীদের বিশেষ ছুটি, কাজে অকর্মণ্যদের বা বৃদ্ধদের পেন্সন ইত্যাদি থাকবে কংগ্রেসের কার্যসূচীতে। এর জন্য আমরা কাশী ও এলাহাবাদে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি পেয়েছিলাম। একটু পূর্বে বলেছি এলাহাবাদে সুবিখ্যাত দেশকর্মী শচীন সান্যাল আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁকে বাংলার প্রতিনিধি ব'লে এঁদের কাছে পরিচয় দিয়ে যেতে বললেন। তাই করা হল। কিন্তু কয়েকমাস বাদে তিনি যোগ রেখে চলতে পারলেন না।

'আত্মশক্তি' স্থাপনের পর মস্কো ও জার্মানস্থিত এম. এন. রায়ের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করি। নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের বদলে 'মানবেন্দ্র' নাম রাখে আমারই ভাই

ধনগোপাল। রায়কে বলি কংগ্রেসকে নিন্দা করে তারা যেন প্রচার না চালায়। এখনও কংগ্রেসকে আবশ্যক আছে। 'বুর্জোয়া সংগঠন' বলে ওরা কংগ্রেসকে জনচক্ষুর সম্মুখে খাটো করার প্রচেষ্টা করছিল। কর্তৃত্বপ্রিয়তা নিয়ে মানবেন্দ্র ও অবনী মুখার্জীর কলহ বাধে। গয়া কংগ্রেসের সময় অবনী গোপনে কলকাতায় এসে পৌঁছোয়।

১৯২১ সালের বড়দিনের সময় ভূপতি মজুমদার দেখে অবনী মুখার্জী তার ঘরে উপস্থিত। বিপন্ন আগন্তুক, নিরাশ্রয়; বিদেশ থেকে এসেছে। বললে, জার্মানিতে আলাপের ফলে সে দিলীপ রায়ের কাছে গিয়েছিল—সেখানে আশ্রয় মিলল না। আঘাত-খাওয়া প্রাণ ভূপতির সহানুভূতি পরদুঃখে উথলে উঠল। সে তাকে এনে একটি মেসে লুকিয়ে রাখল এবং আমায় জানাল অবনী মুখার্জী এসেছে। বিদেশের অনেক খবর এনেছে। তোমার দেখা করা উচিত। সে যাদুগোপালবাবুকে চায়। আমি ভূপতিকে বললাম দেখা করব। তবে তুমি জানিয়ে দেবে যাদুবাবুর সেক্রেটারি এসেছেন। যাদুবাবুকে ইনি খবর দিলে তিনি আসবেন। গেলাম ভূপতির সঙ্গে। দু'চার কথায় বুঝতে পারলাম সে এসেছে রায়কে উদ্বাস্তু করতে। সে এখানকার পার্টির স্থাপয়িতা বলে রুশিয়ায় সোভিয়েট কর্তাদের কাছে নিজের উচ্চস্থান করে নেবে। রায় ও রায়ের পত্নীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলল। ভূপতি সিঙ্গাপুর ফোর্টে বন্দী থাকার সময় একে জানত। সেইমতো সবাইকে জানিয়ে দিলাম। এই লোককে একটা ভুঁইফোড় দল লুফে নিল। তাকে বিদেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা হল। কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্ত তার ফিরে যাবার টাকা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন বলেন। সে যাবে ব'লে তৈয়ার, হঠাৎ খবর পেলাম সে ঢাকা চলে গেছে। 'অনুশীলন' তাকে নিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। অবনী 'অনুশীলন'-এর লোক আগে ছিল না। তার বাড়ি কলকাতায়। এখনকার কৈলাস বসু স্ট্রীটে। আমরা যখন 'অনুশীলন'-এর সভ্য, সে সময় আমাদের আরও অনেক সভ্য থাকতেন ঐ পাড়ায়। সেজন্য কলকাতা অনুশীলনের প্রভাব পড়ে তার উপর। সে জার্মানিতে গিয়ে কিছু টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা শিখেছিল। পরে বৃন্দাবনের প্রেম বিদ্যালয়ে যোগ দেয়। ১৯১৫ সালে এপ্রিলে জাপান যায়। ইতিমধ্যে 'কুমার' আবার এল। সে পূর্বে ঢাকা অনুশীলনের লোক ছিল। সে রায়ের লোক। সেও ঢাকায় জুটল। দুই কমিউনিস্টে খুনোখুনির জোগাড়। প্রতুল গাঙ্গুলীর জীবন হল বিপন্ন। নরেন সেন তাকে বাঁচান। অবনী পালিয়ে এল কলকাতায়। উত্তর-পাড়ায় গিয়ে অমরদার আশ্রয় নিল। তাকে টাকা দিয়ে জাহাজে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা হল। সে পালিয়ে মাদ্রাজ যায় ও সিঙ্গারভেলু চেট্টিদের সঙ্গে আমাদের নাম নিয়ে দল পাকায় (*Vide* Cawnpore Conspiracy Case)। ওদিকে নলিনী-

গুপ্ত ধরা পড়ল কলকাতায়। কানপুর মামলার আসামী হল। তারপর সে খুব অসুস্থ হয় এবং জেল থেকে খালাস নিয়ে জার্মানি চলে যায়। তার জেল-জীবন সম্বন্ধে ভালো কথা শোনা যায় নি।

অবনী সম্বন্ধে ভূপতির বিবৃতি ঃ 'অবনী জার্মানি থেকে ঘুরে এসে বৃন্দাবন প্রেম মহাবিদ্যালয়ে চাকরি নেয়। লড়াইয়ের সময় (১৯১৪-১৮) জাপানে সে ছিল এবং Indo-German Conspiracy-তে রাসবিহারী বসুর Tagore touch-টা থাকায় সংশ্লিষ্ট হয়। রেঙ্গুনে আটক হয়ে পরে সিঙ্গাপুরে যায় ১৯১৫ সালে। সেখানে স্বীকারোক্তি করে ও 'On parole prisoner' হিসাবে কুমুদ মুখুজ্যের সঙ্গে ফোর্ট-এর এক ঘরে থাকত। ১৯১৬ সালের গোড়ায় আমার মোকদ্দমার তদন্তের সময় পুলিস-সাহায্যে আমাকে Pump করবার জন্য আহূত হয়। আমাকে সে সব কথা ক্রমে বলে ও আমি 'কিছুই জানি না—কাউকে চিনি না' Attitude ('Military মেরামত' সত্ত্বেও) রাখতে পারি বলে আমাকে পুলিসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব কথা বলে। তারপর সম্ভবতঃ ১৯১৮ সালে Parole-এ City বেড়াতে গিয়ে জাপানী বন্ধুদের সাহায্যে উধাও হয়। ক্রমে রুশিয়া পৌঁছোয় ও রায়-এর Colleague হয়। তারপর রায়-এর সঙ্গে ঝগড়া হলে ১৯২২ সালে সে রায়-এর বিরুদ্ধে প্রচার করতে ভারতে আসে ও আমার ঘাড়ে চাপে। তুমি, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী সবাই ঝামাপুকুরে তার কথা শুনেছিলে (দাশগুপ্তদের প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এ)। তারপর আমাদের ছেড়ে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে অনেক খেলা খেলে। আমি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবার জন্য কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্তের কাছ থেকে টাকা আনি। সেই টাকায় সে মাদ্রাজ যায় ও মিছামিছা সিঙ্গারভেলু চেট্টির কাছে আমাদের নাম নিয়ে আসর জমায়। 'কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য় চেট্টির চিঠি To Bhupati Majumdar and Jiban Chatterjee কোর্টে পঠিত হয়। তখন আমরা সবাই মেদিনীপুর জেলে। অবনী Stormy-petrel হিসাবে রাজনীতিক ক্ষেত্রে উদিত হয়েছিল।

'অনুশীলন' খুব ঘটা ক'রে রং চড়িয়ে তার জীবনী লেখে। কারণ ঢাকায় সে 'অনুশীলন'কে লোভ দেখিয়ে বলেছিল রুশিয়ার সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দেবে। এর জন্য আমি 'অনুশীলন'-কর্তাদের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম।'

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় নি। তাদের মস্ত যুক্তি যে তারা অন্য একটি দেশের ইসারায় চলে। এদেশে যে-গণতন্ত্র সম্ভব তা হবে জাতীয়তার ছাপে। এই স্তরকে অতিক্রম করে যাওয়া বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী নয়।

১৯২২ সালে একবার রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন। ছুঁচোর সুসাহিত্যিক সুবোধ রায় সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে গেল কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কবি খুব খুশি

হলেন। কবির লেখাগুলি বনে-জঙ্গলে সর্বপ্রকার বিপদের মাঝে কি পরিমাণ যে আত্মিক খোরাক জুগিয়েছিল তা আর বলে শেষ করা যায় না। কবিকে সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্পর্কটি ছোট করব না। বললাম, তাঁর সম্বন্ধে তো আমাদের লুটের অধিকার জন্মে গেছে! কবি খুব হাসলেন। পরে এণ্ড্রুজ-সাহেবকে বললেন—'Andrews, I can understand these young men, I don't understand the other variety, the tame variety.' শান্তিনিকেতনে একবার যেতে আদেশ দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ কবিকে জাপানের Peasant King-এর গল্প শুনালেন, 'Well, we shall drive out poverty by the power of poverty' বেশ লাগল শুনতে।

যাব-যাব করে অনেকদিন কাটল। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছিল। সমবায়-প্রথায় গ্রামের কাজে আমি তখন এগিয়ে পড়ি। এ কাজটায় যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার ছিল। শেষে একদিন কয়েক বন্ধু একত্র হওয়ায় বেরিয়ে পড়া স্থির হল। কবে আবার এরকম যোগাযোগ জুটবে কে বলতে পারে? কবিকে আগে থেকে সংবাদ দিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। আমরা—সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, আশু দাস, অরুণ গুহ ও আমি ১৯২২ সালের মে মাসের এক বিকেলে যখন শান্তিনিকেতনে পেঁাছোই, তখন কবি সুরুলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কুটিরে একটি টুকরো কাগজে নাম লিখে রেখে এলাম। একজন লোক জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় থাকবেন? গেস্ট হাউসে?' আমরা বললাম, 'গাছতলায়।' খাবার ব্যবস্থা হল ছাত্রদের সঙ্গে। তখন গ্রীষ্মাবকাশ, ছাত্র খুব কম ছিল। রাত্রে আমরা খেতে বসেছি, কবি আলো ও লোক সঙ্গে নিয়ে এসে পড়লেন। তাঁর ডাক শুনে আমাদের ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থা। হাতের গ্রাস মুখে দেব, কি হাত ধুয়ে উঠে পড়ব, এই হল সমস্যা। কবি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিলেন। কোনোরকমে তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে নিয়ে আমরা ছুটে চললাম কবির কাছে। প্রণাম করতেই সাদরে প্রশ্ন করলেন, 'কখন এলে? আগে তো কিছুই জানতে পারলুম না! এরা তোমাদের থাকবার একটা জায়গা দিয়েছে?' উত্তরে বললাম, 'তার অপেক্ষা আমরা রাখি নি, জায়গা করে নিয়েছি।' কবি সহাস্যমুখে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?' আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, 'গাছতলায়।' কবি হো হো করে হেসে উঠলেন; বললেন, 'তুমি যে এইরকম একটা কিছু করে বসবে সে আমি আন্দাজ করে নিয়েছি।' তারপর বললেন, 'কাল অবধি বেশ হাওয়া ছিল। এতটা গরম ছিল না। তোমরা এলে—এদিকে আজই গরম পড়েছে।' কবি আমাদের গরমে কষ্ট হবে চিন্তা করতেও কেমন যেন কষ্ট পাচ্ছিলেন। সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের সুপ্রসিদ্ধ অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেদিন খুব গরম হয়েছিল। আমরা আসব আগে জানতে পারলে গান শোনার

ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারত। কবি জিজ্ঞেস করলেন, 'এর গান শুনেছ?' উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে না।' কবি খেদের সুরে বললেন, 'তবে আর কি শুনেছ?' রাতটা আনন্দে কাটল। সকালে তৈরি হয়ে নিয়ে কবির কুটিরে যাওয়া হল। এল্মহার্স্টের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এল্ম্হার্স্ট সুরুলে কৃষি বিভাগ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। কবি অনেক কথা বললেন—এ-কাল ও সে-কালের। দেশ কী ছিল, কী হয়ে গিয়েছে। তিনি বিপ্লবের একটা ব্যাখ্যা দিলেন। বিপ্লব মানে 'শূন্য' কোনোদিনও নয়—একটার জায়গায় আর একটা কিছু ভরে থাকবে। নিজেদের চেষ্টায় আত্মশক্তিতে জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলি গড়ে ওঠানোই 'বিপ্লব'। ভাঙা মানেই সেই জায়গায় আর একটা কিছু গড়ে তোলা। নিজেদের সংস্কৃতির যেগুলির সর্বজনীন দিক আছে তা বাঁচবেই। তাকে বাঁচিয়ে যাওয়া একটা তপস্যা।

তাঁর খুব ইচ্ছা আমি এসে তাঁর কাছে থাকি। আমি যা গঠনমূলক কাজ করতে চাই তা এখানে থেকে ভালোভাবে করতে পারা যাবে। তাঁর কাছে থাকলে সহজে বন্দী করতে পারবে না। এমনি তো সরকার বেশীদিন আমায় বাইরে কাজ করতে দেবে না, অকালে ধরে নিয়ে যাবে। এণ্ড্রুজসাহেব পরে জানালেন গুরুদেব খুশি হবেন তোমার যোগ দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি জানতে পারলে।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে যা যা দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য ছিল তা দেখে ও জেনে নিয়ে আমরা ফিরলাম। আসার দিন কবির কাছে বিদায় নিতে গেলে কবি মিষ্টভাবে আমাদের বিদায় দিলেন। প্রণাম করে আশীর্বাদ কুড়োতে কুড়োতে বার বার কবির খেদের কথা, 'তোমাদের কষ্ট হল, তোমাদের সেরকম আরামে থাকা হয় নি।'

আমি বললাম, 'আমরা খুব আনন্দে সময় কাটিয়েছি। কিন্তু যাবার সময় আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ নিয়ে ফিরছি।'

কবি যেন চমকে উঠলেন। অভিযোগের কারণ অনুমান করা কঠিন। তাই শশব্যস্তে বললেন, 'কি অভিযোগ?'

বললাম, 'আমরা কিছু যে লিখব তা বাকি রাখেন নি। যা লিখতে যাই, দেখি আপনি অনেক আগে থেকে খুব ভালো করে লিখে বসে আছেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের এমন করে বঞ্চিত করা কি ভালো হয়েছে?'

কবি হেসে লুটোপুটি হবার জোগাড়। একটু পরে হালকা বোধ করে বললেন, 'এই অভিযোগ!'

আমি আরো বললাম, 'তা নয় তো কি? যে জীবন আপনি যাপন করেন নি, আমরা করেছি—তাও লিখেছেন একেবারে বাস্তব করে। তাই আবার প্রণাম করি কবি, ঋষি ও দ্রষ্টাকে!' আবার প্রণাম করলাম।

কবি খুব খুশি হলেন। পুনরায় আশীর্বাদ করে হাসিমুখে বিদায় দিলেন।

বললেন, 'যদি লিখতে ইচ্ছে হয়—কবিতা লিখো না, সুবিধা করতে পারবে না।'

এণ্ড্রুজ এগিয়ে দিয়ে গেলেন খানিকটা। মনে করিয়ে দিলেন গুরুদেবের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সে-বিষয়ে। বললেনও, 'Tell Gurudev you will join, he will be glad.'

ব্যাপার হচ্ছে গুরুদেব একজন ডাক্তার চাইছিলেন। আমি কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপও করেছিলাম। তাঁদের মত হল না।

ধনগোপাল কিছুদিন বাদে আমেরিকা থেকে আসে। এলাহাবাদে জওহরলাল নেহরু তাকে কয়েকদিন আটকে রাখেন। তারপর সে শান্তিনিকেতনে যায়। কবি তার মারফত আবার আমায় ডেকে পাঠান। আমার কিন্তু আর যাওয়া ঘটে ওঠে নি।

আমরা তিন ভাই দেশের কাজে নেমে পড়ি। ক্ষীরোদগোপাল, আমি ও ধনগোপাল। তিনজনের মধ্যে আমি পরিকল্পনা করতাম, ওরা দুজনে সেটি কাজে লাগাত। আমাদের মধ্যে ক্ষীরোদগোপাল ছিল অদ্বিতীয়। বেজায় দুঃসাহসিক। বিপদে না মুষড়ে পড়ে বরং সে স্ফূর্তি বোধ করত। তার হাত চলত অসাধারণ রকম। কলকাতায় সে দুর্বৃত্ত ইংরেজ ঠেঙানোর আনন্দ পেত, শিকারে দু'হাতে সমানে বন্দুক চালাতে পারত। বর্মায় সে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিল। রেঙ্গুনে বিখ্যাত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিশেষ জানাশুনা হয়েছিল। সে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য শেষে মিক্‌টিলায় থাকত। ওখান থেকে বর্মার সীমান্তে কাজ করার সুবিধা ছিল। দুর্ধর্ষ পাঠান মাসিদ খান তাকে সাহায্য করত। শ্যাম থেকে ভোলানাথের সাংকেতিক চিঠি ওখানে আসত। তারপর বর্মা হয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছোত। ক্ষীরোদগোপাল জাভা সুমাত্রা ঘুরে এসেছিল। আজ আর সে নেই। তার স্মৃতি অহরহ আমায় আগের মতোই টানে। আমার মন বলে—সে-দিনের পরাধীন দেশের বিদ্রোহী, তোমায় প্রণাম করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে এমন একটি ঘোট পেকে উঠেছিল যে, যত কলকাতার সংবাদপত্র সব তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করে। সাধারণ পাঠক একটা জিনিষের দুটো দিক দেখতে না পেয়ে, যিনি যে কাগজ পড়তেন তার মতই নিজের মত করে বসতেন। অনেকেরই স্বাধীন মতগঠনের সুবিধা ছিল না। বিপিনচন্দ্র পালও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করলেন। এই উল্টোরথের উৎপত্তি হয়েছিল এইরূপে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথমটায় বিপিনবাবু দেশবন্ধুর সঙ্গে জুটলেন। তিনিও জেলায় জেলায় ঘুরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনে তিনি তাঁর দেওয়া বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রতিচ্ছায়া দেখছিলেন। গোল হল স্বরাজের রূপ বা অর্থ নিয়ে। বরিশালে ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বিপিনবাবু স্বরাজের ব্যাখ্যা করেন—ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্তশাসন। দেশবন্ধু স্বরাজের কোনোরূপ ব্যাখ্যা করতে তখনও নারাজ। গান্ধীজিও নাগপুরে (১৯২০ সালে) স্বরাজের কোনো ব্যাখ্যা দেন না। স্বরাজ অ-ব্যাখ্যাকৃত থাকায় গোড়ার দিকে আন্দোলনে সুবিধা হয়েছিল ঢের ও অনেকে জোড় বেধেছিল। স্বায়ত্তশাসন থেকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য ও সাধারণতন্ত্র—কর্মীরা যে যার ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। অজানা শক্তির সীমা নির্ধারিত করতে না পেরে বিদেশী শাসকরা কতকটা ঘাবড়েছিল। লর্ড রিডিং-এর 'গোল টেবিল বৈঠক' তখন তখনই বসাবার আকাঙ্ক্ষা এরই থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সে যাই হোক, বিপিনবাবু ১৯২১ আর ১৯২৩ সালের তফাত করেন। স্বরাজ একবছরে না হওয়ায় অ-ব্যাখ্যাকৃত 'স্বরাজের' ব্যবহারে যে মায়াজাল বিস্তৃত হয়েছিল, তার দিন এখন ফুরিয়েছিল। সুতরাং লোকজন সংগ্রহ নতুন করে করতে হবে। অহিংস প্রথায় শেষ পর্যন্ত একটা বোঝাপড়ার অবস্থা আসতে পারে। তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা হয় না। মসজিদের দূরত্বটুকু দেখিয়ে দিলে মোল্লাসাহেবের কুদরতের কদর থাকে না। সবাই তো জানে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত যাব বলে দৌড় আরম্ভ করলে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব তা থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা। লক্ষ্যটা বড় করলে, ঠিক লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোতে না পারলেও তার কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে। তিনি তাই লক্ষ্যটা বড় রাখতে চাইতেন। বিপিনবাবু বললেন, 'আমি দিতে চাই লজিক অর্থাৎ যুক্তি ও ন্যায়, তোমরা চাচ্ছ ম্যাজিক।' দেশবন্ধু চাচ্ছিলেন—Persistent and consistent obstruction in the Council ; সাধারণ প্রতিরোধের ইচ্ছা এই থেকে দেশে জাগে।

দেশবন্ধু নিজের কথা বোঝাতে কাগজের সাহায্য পাচ্ছিলেন না। কারণ তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির সঙ্গে স্বরাজ পার্টি করেছিলেন। সে সময় দেশবন্ধুকে বোঝাবার আবহাওয়া ছিল না। তখনকার কাগজওয়ালারা কখনও 'লজিক ও ম্যাজিক', কখনও বা 'জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আজ এতদিন জেলে' বলে মহাত্মাজীর দোহাই দিয়ে লিখতেন। দেশবন্ধুর তাই দেশ ছাড়ার যোগাড় হয়েছিল। দেশবন্ধু দায়ে পড়ে নিজের একখানি কাগজের প্রয়োজন অনুভব করলেন। 'ফরওয়ার্ড' নাম দিয়ে কাগজ বার করলেন। বললেন, ছ'মাসের মধ্যে তাঁর বিরোধী অধিকাংশ কংগ্রেসীদের তিনি নিজ মতে আনবেন। ছ'মাসও লাগে নি। তিন মাসেই সে সাফল্য তাঁর হয়েছিল। আমাদের বন্ধু মনোমোহন ভট্টাচার্য 'ফরওয়ার্ড' নামটির পরামর্শ দেন। রুশ-বিপ্লবী নেতা লেনিনের একটি কাগজের নাম ছিল 'ফরওয়ার্ড'।

সাম্রাজ্যবাদীরা মহাত্মাজীর প্রতিশ্রুত 'একবছরেই স্বরাজ' আন্দোলনকে বিফল দেখে আনন্দ করছিল। তারা এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় ভারত বহু বছর অবসাদ-হিমে ডুবে থাকবে, সেইটাই চাইছিল। কিন্তু এ আবার কোন্ ব্যক্তি তাদের সাধে বাদ সাধতে এল? অর্থাৎ দেশবন্ধু কাউন্সিলে গিয়ে মণ্টেগু-ফোর্ড সংস্কারকে নষ্ট করতে চাইলেন। সংস্কারের মোহ দূর করা ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। এখানকার লোক স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সরকারের শাসন চায়, এই অপকলংকটা ঘোচানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেজন্য যারা স্বরাজ পার্টি স্থাপনে সহায়তা করেছে তাদের উপর ব্রিটিশ সরকার গেল খেপে। জুলাই বা অগস্ট মাসের গোড়ায় জানা গেল কিছু লোকদের রাজবন্দী করা হবে।

১৯২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন মৌলানা আজাদ। পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তনবিরোধীরা উভয়পক্ষের বক্তব্য পেশ করলেন। পরিবর্তনকামীরা জিতলেন। যেদিন কংগ্রেস থেকে প্রতিনিধিরা কলকাতায় ফিরলেন সেইদিন শেষ রাত্রে কলকাতায় 'ছাঁকনি-জাল' পড়ল। সেদিনটা ছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর। কলকাতায় এগারো জনকে ১৮১৮ সালের তিন-আইনে গ্রেপ্তার করা হল—উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, যাদু-গোপাল মুখার্জী এবং 'অনুশীলন'-এর রবি সেন, অমৃত সরকার ও রমেশ চৌধুরী।

আমাদের গ্রেপ্তারের কারণগুলিরও একটা ক্রমবিকাশ দেখা যায়। বিপ্লবীরা একযোগে কাজ করতে না পারায় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চড়াতে সরকার সুবিধা পায়। বিপ্লবী দলগুলি নিজেদের সম্পর্কে আলাপে খুব সাবধানী, অন্য দল সম্বন্ধে আলাপে আলগা-আলগা। পুলিস এই ফাঁক থেকে সন্ধানের সূত্র সংগ্রহ করতে পারে। তার ফলে ক্ষতি সকলকারই।

১৯২১ সালে ইংরেজের যুবরাজের কলকাতা আসা উপলক্ষে আমাদের একটা সভা হয়। সেখানে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ যুবরাজকে জীবন্ত ফিরে না যেতে দেবার প্রস্তাব রাখেন। আমরা তা বাতিল করে দিই। আমরা গণআন্দোলনের নতুন রাস্তা ধরেছি—নিজেদের ভাঙা সংগঠন গড়ে তোলার সমস্যা মাথায় নিয়েছি। তাছাড়া ওরকম এক-আধটা হত্যাকাণ্ডে দেশ স্বাধীন হয় এই বিশ্বাস আমাদের ছিল না। সুতরাং ওরূপ কার্য করা হবে না এই সিদ্ধান্ত হয়। কিছুদিন বাদে জ্যোতিষবাবু আমাদের একটি পত্র দেন। তাতে তিনি বলেন—মহা সমারোহে পূজার জন্য অপেক্ষা তিনি করতে পারবেন না। অতঃপর তিনি ঘটে পূজা সমাপন করাই স্থির করেছেন। আমরা যেন সাবধানে থাকি। এই পত্রের পর তাঁর সঙ্গে আমরা আর কোনো যোগ রাখি নি। অবশ্য তিনিও যুবরাজের কেশ স্পর্শ করতে বা করাতে পারেন নি। তবে এইখানে একটা নতুন উপদলের উৎপত্তি হল। আমাদের সঙ্গে এদের কোনোই যোগ ছিল না। আমাদের মনোভাব ও কর্মপদ্ধতি স্বতন্ত্র রইল। নিজেদের কাগজে আমরা আমাদের মতবাদ লিখতাম। কিন্তু এও জানতাম এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টা করবে—নতুন উপদলের কৃতকর্মের জন্য আমাদের ধরবে। ওদের মোকদ্দমা চললে দৈনন্দিন সাক্ষ্যাদির বিবৃতি সংবাদ-পত্রে পড়ে লোকেও মনে মনে আমাদের ওদের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে। হলও তাই। শাঁখারীটোলা পোস্টমাস্টার-হত্যার মামলার সময় আমাদেরও ধরে। বরেন ঘোষ ঐ ব্যাপারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি করে। সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি দলীয় লোকেরা তাতে ধরা পড়ে। কিছু লোক কিছুদিন আমাদের ভুল বুঝলেও, পরে সত্যাসত্য কী তা অনুধাবন করতে সমর্থ হন। একটা মজার ব্যাপার হল। 'সারথি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক অনিলবরণ রায়। তিনি গান্ধীবাদী। তিনি বলতে লাগলেন, ওরা নির্দোষ হলে কখনও সরকার ধরত না—যদি তাঁকে ধরে তবে বিশ্বাস করবেন সরকার নির্দোষী লোকদেরও ধরে। ঐ সময় তিনি উৎকট গান্ধীভক্ত ছিলেন। গান্ধীজির মতো ছোট কাপড় কোমরে জড়িয়ে থাকতেন।

১৯২৪ সালে সুভাষবাবু, সত্যেন মিত্র, সুরেন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁকেও কিন্তু ধরল। সত্যেন মিত্র স্বরাজ পার্টির সেক্রেটারি, সুভাষবাবু করপোরেশনের বড় কর্মকর্তা, অনিলবাবু প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারি। এর মধ্যে তাঁর এইটুকু পরিবর্তন হয়েছিল যে গান্ধীজি জেলমুক্ত হলে তিনি কটিবাস ছেড়ে সাধারণভাবে কোঁচা-কাছা দিয়ে কাপড় পরতে আরম্ভ করেন। কি দোষে তিনি দোষী সে সন্দেহের ভিত্তি তাঁকে জানানো হয়েছিল—ঘরে আগুন লাগানো, ডাকাতি প্রভৃতির ষড়যন্ত্র নাকি তিনি করেছিলেন। যাই হোক, ধরা পড়ে তাঁর সরকারের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা

বদলালো ও ভুল ভাঙল। জেলে অনিলবাবু এলে, উপেনদা বলেছিলেন, 'কি হে অনিলবরণ—দেখলে তো কাছাটি দিয়েছ কি অমনি ধরেছে ?'

আমায় যে অপরাধের ফিরিস্তি দিয়েছিল তাতে লেখা ছিল, 'তুমি বিশ্ববিপ্লবে অংশ নিতে যাচ্ছিলে ; ভারতে বিপ্লবী সংঘ পুনরায় গড়ে তুলেছিলে ; রাজকর্মচারী হত্যায় তোমার মনের গোপন সম্মতি আছে'···ইত্যাদি। এর থেকে আমি একটা খাঁটি সংবাদ পেয়ে গেলাম। বুঝলাম রুশিয়ায় অবস্থিত এম. এন. রায়ের সঙ্গে গোপনে আমার চিঠিপত্র আদানপ্রদান সম্বন্ধে সরকার খবর পেয়ে গেছে। সুন্দর। যে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে পত্রালাপ হত সেখানেই দেখছি গলদ।

আমাদের একে একে লালবাজার পুলিস-অফিস প্রাঙ্গণে এনে আলাদা আলাদা প্রহরীর রক্ষণাবেক্ষণে কতকক্ষণ রাখা হয়। গোয়েন্দা বিভাগের (আই. বি.-র) স্পেশ্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যামফিল্ড যাদুগোপাল মুখার্জীর অন্বেষণে গাড়ির পর গাড়ি দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই বললেন 'Good morning. We have great admiration for you.—সুপ্রভাত, আপনার সম্বন্ধে আমাদের খুব উচ্চ ধারণা।' আমি জবাব দিলাম 'Is that the reason why I have been brought down here this morning ?—সেইজন্যই কি আমায় আজ সকালে এখানে আনা হয়েছে ?' সাহেব উত্তর দিলেন, 'Not exactly for that.—ঠিক সেজন্য নয়।' 'তবে কি আমায় অভিনন্দিত করার জন্য ?' 'Your splendid records draw our admiration জীবনে তোমার চমৎকার কৃতিত্বগুলি আমাদের তারিফের যোগ্য।' সাহেব তারপরই প্রশ্ন করলেন, 'But when did you return from Delhi ?—আপনি কবে দিল্লী থেকে ফিরেছেন ?' উত্তর দিলাম—'আমি তো দিল্লী যাই নি।' কোনো কারণে দিল্লীর কংগ্রেসে আমার যাওয়া ঘটে নি। সাহেব আবার বললেন, 'Did you not attend the Congress ?—আপনি কংগ্রেসের বৈঠকে যোগ দেন নি ?' আমি বললাম, 'না।' তখন সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'Are you not a member of the Swaraj Party ?' উত্তর দিলাম, 'নিশ্চয়। কিন্তু আপনার খবর কি অন্যরূপ ?' ফের সাহেবের উক্তি হল, 'Is not C. R. Das your leader ?—সি. আর. দাশ আপনার নেতা নন ?' আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করলাম, 'You have said so.—আপনি তো তাই বললেন।' বাস্তবিক জীবনে মরণজয়ী পূর্ণমানবকল্প যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্থান আমি আমার হৃদয়-দেউলে অপর কাউকে দিতে পারি নি। তবে স্বরাজ দলের নেতা হিসাবে দেশবন্ধু সে সময় আমারও নেতা হয়েছিলেন। আমিও তো স্বরাজ পার্টির দলভুক্ত ছিলাম।

তারপর সাহেব বললেন, 'কয়েকজন তো নিজ নিজ জীবনী লিখেছেন, আপনি

কেন লিখছেন না ?' 'আমার জীবনে অসাধারণত্ব কিছু নেই ব'লে।' চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব এনে তিনি বললেন, 'নেই আবার ? সত্যই আপনি লিখলে বড়ই মনোমদ হতে পারত।' বুঝলাম আমার অজ্ঞাতবাসের কিছু খবর এখনও কর্তাদের অজানা রয়ে গেছে। তাই এই ভণিতা।

তারপর বললাম, 'যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করে ফেলা হোক।' ব্যামফিল্ডের মুখ থেকে বেরুল, 'You will be detained for the present.—আপনাকে উপস্থিত আটক করে রাখা হবে।' এই বলে তিনি অন্তর্ধান হলেন।

তখন মনে হল প্রায় মাসাধিক কাল পূর্বে আমি জানতে পেরেছিলাম আমার অনেক বন্ধু বন্দী হবে এবং সেই হিসাবে সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলাম। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তও আলাদা করে এই ধরপাকড়ের সংবাদ আমায় পেঁছে দিয়েছিল। সাধুর নেই বাটপাড়ের ভয়। আমরা সে সময়ের করণীয় কাজ নির্ভয়ে করে চলেছিলাম।

এরপর আমাদের লালবাজার পুলিস-অফিসের দোতলায় নিয়ে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দল ভাগ করে পৃথক পৃথক ঘরে বসানো হল। এই পঙ্‌ক্তি-ভাগ আমার ভারী বিশ্রী লেগেছিল।

এই দিনের আগে 'ইংলিশম্যান' কাগজ স্বদেশীদের অর্থাৎ আমাদের বিরুদ্ধে দুটো বিষনিঃস্রাবী প্রবন্ধ লিখেছিল। কারণ—ভূপেন দত্তের বিশেষ উৎসাহে আমরা '৯ই সেপ্টেম্বর দিবস' পাঞ্জাব থেকে বাংলা অবধি পালন করি। ১৯১৫ সালে ঐ দিনে বালেশ্বর যুদ্ধে ইংরেজের দর্পী পশুবলের বিষদাঁত ভাঙতে বাংলার তরুণরা এক বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তাতে আত্মাহুতি দিয়ে নতুন পথের নির্দেশ রেখে চিরঅমর হয়ে যান। কলকাতার অনেকগুলি সংবাদপত্র ছবি ছাপিয়ে এই উৎসব-সমারোহে আমাদের সহযোগিতা করেন। 'ইংলিশম্যান' ইংরেজ-মহলের মনের ছাপ বহন করত। অতএব তৎকালীন সরকার এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হত। তবে সে-সবই বিধাতা-নির্ধারিত স্বাধীনতা-রথের অগ্রগতি রোধ করার নিষ্ফল প্রয়াস।

আমাদের একে একে লালবাজারে জমা করার সময় সবশেষে এসেছিলেন মনোমোহন ভট্টাচার্য। রবি সেন মনে করেন মনোমোহনবাবু সাংবাদিক হিসাবে বোধহয় ব্যাপারটা কী বুঝতে এসেছিলেন। মনোমোহনবাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সার্ভেণ্ট' কাগজের ম্যানেজারি করতেন—দেশবন্ধুর নতুন কাগজ বেরুলে তাতে চলে আসবেন এই ব্যবস্থা হয়েছিল। আগেই বলেছি কিছুক্ষণ লালবাজার প্রাঙ্গণে থাকার পর আমাদের দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল। উপরে উঠবার অবকাশে আমাদের মেশামেশি হয়ে যায়। রবিবাবু সাংবাদিক মনোমোহনবাবুর কর্তব্যে সাহায্যের জন্য

চলতে চলতে সুবিধা বুঝে এক ফাঁকে বলে দিলেন আমাদের হঠাৎ গ্রেপ্তারের খবরটা নিশ্চয় যেন সেই দিনের সন্ধ্যায় 'সার্ভেন্টে' প্রকাশ হয়।

উপরে কিছুক্ষণ উপবেশনের পর পুলিস কমিশনার টেগার্টের ঘরে একে একে ডেকে ১৮১৮ সালের তিন-আইনে আটকের হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হতে লাগল। আমার পালা আসতে আমাকেও টেগার্টের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। টেগার্ট বলল, 'আপনি ঘুরে ঘুরে আবার বিপ্লবী-সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, সেজন্য তিন-আইনে আপনাকে আবদ্ধ রাখা হল।' আমি বললাম, 'ধন্যবাদ।' তারপর টেগার্ট আমায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাপড়-চোপড় সঙ্গে এনেছেন? আমি বললাম, 'না।' টেগার্ট বলে উঠল—'হু'। তারপর জানাল এই আইনের নিয়মে জেল কর্তৃপক্ষকে আমার অভাব অভিযোগ জানাতে হবে। আমায় নিচে নামিয়ে জেলে নিয়ে যাবার কালো গাড়িতে অন্যদের সঙ্গে পোরা হল।

এইখানে আমায় আমাদের সংকল্পের কথা বলতে হয়। আমার তো স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র ধরা আছে—বিপ্লব চতুরঙ্গ। এর জন্য আমরা যথেষ্ট সংযম রক্ষা করে চলবার ব্যবস্থা রেখেছিলাম। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কোনো অনুমতিই কাউকে দেওয়া ছিল না। পাছে বেহিসেবী, বেতালাভাবে কেউ নিয়মভঙ্গ করে ফেলে সেজন্য 'সামরিক বিভাগ' আমি নিজের হাতে রেখেছিলাম। এখন শুধু কংগ্রেসের মারফত স্বাধীনতার বাণী বহন করে জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। কংগ্রেসে ঢুকেছিলাম আমরা, এ কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের একটা আলাদা বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ আড়ালে রাখা ছিল। কেননা তখনও তো কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করে নি। তার সঙ্গে তাই বিনা সংকোচে বিনা শর্তে মিশে যাওয়া চলে না। 'ছায়ায় ঢাকা স্বদেশী সরকার' (Shadow Cabinet) চালানো আমাদের আগের সাধনায় মকশ করা ছিল। এখন সেজন্য কোনো মুশকিল হল না।

এছাড়া দেশবন্ধু অনুরোধ করেছিলেন অন্ততঃ একবছর যেন দেশে সহিংস কোনো কাজ না সংঘটিত হয়। উপেনদা, অমরদা সে সন্দেশ বহন করে আনেন। বহুবাজার স্ট্রীটে চেরী প্রেস অফিসে বিপ্লবীদের সর্বদলের একটা সম্মেলন হয়। সবাই কথা দিই দেশবন্ধুর অনুরোধ রক্ষা হবে কিন্তু কাজের বেলায় শুধু আমরা কথা ঠিক রেখেছিলাম। উপেনদা আমায় এ কথা দু'তিনবার বলে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

যাক ও-কথা। সকলে গাড়িতে উঠছি—শেষকালে দেখা গেল রবি সেনের বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্র। ব্যাপার কি? যিনি আমাদের গোপন সংবাদ 'সার্ভেন্ট' কাগজে প্রকাশ করবেন সেই মনোমোহনবাবুও যে শেষ পর্যন্ত জেলগামী গাড়িতে ওঠেন।

এখানে অপ্রকাশিত তখনকার কিছু ইতিহাস বলা ভালো। অহিংস আন্দোলন দেশে এলে কি হবে, ব্রিটিশ সরকার সেটাকে মসীলিপ্ত করার জন্য ও বাংলায় ঐ আন্দোলনের প্রকৃত মেরুদণ্ডকে (যুগান্তর পার্টিকে) ভাঙবার জন্য কিছু অবিমৃষ্যকারী পুরাতন জেল-ফেরত লোককে দিয়ে মিথ্যা সহিংস দল গড়তে চেষ্টা করে। তাঁদের ফাঁদে কিছু নির্দোষ অথচ সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী লোক পড়ে যান। এদের অপকর্মে অপর সকলকে ধরপাকড়ের জালে আবদ্ধ করার সুবিধা হয়। বিলাতে অবসরপ্রাপ্ত কলকাতার পুলিস কমিশনার এই প্রথার কথা স্বীকার করেন। তাঁর নাম ছিল স্যার রেজিন্যাল্ড ক্লার্ক। তিনি বলেন, 'We use agent-provocateurs — আমরা ঘর-ভাঙানো চর নিযুক্ত করি।'

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ঠিকই বলেছিলেন যে ঘোষ ও সেন বিশ্বাসঘাতক হয়েছে—গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে জুটে ভালো কর্মীদের পায়ে শেকল পরাবার চেষ্টা করছে। তারা উগ্র সন্ত্রাসবাদী দল গড়ছিল। অবশ্য তাদের দুর্মতির কথা জানতে কিছু সময় লেগেছিল। এই কুখ্যাত লোকদের কুকীর্তি লিখে আজ আর সময় নষ্ট করব না। সেন চাটগাঁর প্রতিনিধি হয়ে কলকাতায় আসে, পূর্ণ দাসের সঙ্গে আলাপ করে নেয় ও পরে ভূপেন দত্ত, জীবন চ্যাটার্জী, বিপিন গাঙ্গুলী, সতীশ চক্রবর্তী ও জ্যোতিষ ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হয়। কথায় বলে, সমব্যবসায়ী দুই ব্যক্তির মিল হয় না। পুলিসের প্রিয়পাত্র হওয়ার রেশারেশিতে শেষ পর্যন্ত সেনের প্ররোচনায় ঘোষের লোক-দেখানো ব্যবসা—স্বদেশী কাপড়ের দোকানে বোমা পড়ে। ঘোষ খোলাখুলি গোয়েন্দার চাকরি নিয়ে উত্তরপ্রদেশে চলে যায়; সেনের স্বরূপও প্রকাশ হয়ে যায়। এই লোকটি পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীদের চন্দননগরের গুপ্ত আশ্রয়ের খবর টেগার্টকে দেয়। ড্যালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্টের উপর যে বোমা পড়ে তারও খবর পুলিসকে দেয়। অথচ একে নিয়ে কয়েকজন দলে টানাটানি করেছিল। সে দল অবশ্য আমাদের নয়।

আর একটা রহস্যময় কথা এখানে বলে নি। ১৯২০ সালে আমি গা-ঢাকা অবস্থায় চন্দননগরে অতুলের সঙ্গে একবার দেখা করতে আসি। সে এক রহস্যময়ী মাদাম দাসের কথা আমায় বলে। ইনি চন্দননগরে এসে বাসা করেছিলেন। তিনি নাকি কাশ্মিরী মেয়ে, কিন্তু মা নাকি ফরাসি। ইনি এসেছিলেন বিরাট শিকার করতে। এঁকে সন্দেহ না করে পারা যায় না। একেই তো ডামাডোলের বাজার। ঐ সময় তিনি এসেছিলেন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের খোঁজে। আমরা যখন জার্মানির সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কাজ করি, ঐ সময় মৌলানা আজাদও বসে ছিলেন না। তাঁকে রাঁচিতে ব্রিটিশ সরকার অন্তরীণ করে। কারণ ছিল। তিনি, ডাঃ কিচলু, আলি-ভাইয়েরা বৈদেশিক সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেন। কাবুলে যখন

মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকৎউল্লা প্রভৃতি এক অস্থায়ী ভারত সরকার স্থাপন করেন, সে সময় কিছু অস্ত্রশস্ত্র তুর্কী থেকে আফগানিস্তানে জমা হয়। অনেক টাকাও এর সঙ্গে ছিল। আমানুল্লার শ্বশুর তুর্কী ছিলেন। তাঁর সাহায্যে ঐ টাকা ও অস্ত্রাদি উপজাতিদের এলাকায় এনে রাখা হল। সেই টাকা ও অস্ত্র মাদাম বাংলায় আনতে চান। ১৯২২ সালে উপেনদা আমায় বলেন মৌলানাসাহেব ঐ টাকা আমাদের দিতে রাজী হয়েছেন। মাদামের সঙ্গে নাকি মৌলানাসাহেবের যোগ ছিল। যাই হোক, আমি অতুলকে সাবধান করে দিই। অজ্ঞাতকুলশীলদের বিশ্বাস করবার আগে দশবার ভাবতে হয়। অতুল একবার নাম ভাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দেখাও করে। পরে ভূপেনও আলাপ করে আসে। ভূপেন ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজি ও আরও কোনো কোনো নেতার সঙ্গে আমাদের বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করে আসে। আমি ভূপেনকে সাবধান করে দিই। অহিংস উপায়ে গণআন্দোলনে যোগ দিলে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। অস্ত্রশস্ত্রের ষড়যন্ত্রে হাত দেওয়া অন্যায় হবে। আমার এই মতে আমি দৃঢ় ছিলাম। মৌলানাকেও এই কথা জানিয়ে দিতে বলি। মৌলনা মুখে বলেন, তিনি অতঃপর এ বিষয়ে আর লিপ্ত থাকবেন না। কিন্তু কিছুদিন লিপ্ত ছিলেন মনে হয়। ফলে পূর্বোল্লিখিত সন্দেহের ব্যক্তি—ঘোষ এই ষড়যন্ত্রে ঢুকে পড়ে ও কিছু ভালো লোককে জড়িয়ে দেয়। ওদের কাজ তো ঐ রকমের। ফলে কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়ে যায়। ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্মচারীদেরও বিশ্বাস জন্মে যায় যে দেশে আবার সশস্ত্র বিদ্রোহ মাথা তুলেছে। আন্দামানের বন্ধুদের মুক্তির জন্য হিউ স্টিফেন্সনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করলে সে বলেছিল—বিপিন গাঙ্গুলী, গোপেন রায় প্রভৃতি আবার পূর্বেকার পথে চলার দল গড়ছে। এ অবস্থায় আন্দামানে কয়েদীদের খালাস দেওয়া যায় কি করে? আমি বিপিনদা প্রভৃতিকে খবরটা জানিয়ে দিই।

কম লোকই নিজে চিন্তা করে চলে। আগে ভেবে একটা পথ কেউ বের করে গেলে সেইটাই ধরে চলে বেশির ভাগ লোক। বারীনবাবুদের চিন্তার বাইরে মাথা ঘামাতে চাইত কম লোক। এরই পরিণাম দেশকে পেয়ে বসেছিল। সন্ত্রাসবাদ একটা অনভিপ্রেত বিষচক্র গড়েছিল। টাকার জন্য ডাকাতি। ডাকাতির ফলে পেছনে লাগত গোয়েন্দা পুলিস। পুলিসের কাউকে হয়তো বিপদ এড়াবার জন্য হত্যা করা হত। লাগল আরও পুলিসের ঝাঁক। যাকে বা যাদের ওরা চায় তাদের ফেরারী করতে হল। তাতে বাড়ল খরচ। ফলে আবার ডাকাতি। হয়ত বাধল মামলা, আরো খরচ-বৃদ্ধি। আবার পূর্বেকার ঐ চক্র। এতে দেশের কাজের চেয়ে টাকা উকিল-ব্যারিস্টারের পকেটে বেশি যেত। বহু ধনী লোক যাদের কাছে টাকা রাখা হত তার মধ্যে অনেকে বেশ একটা মোটা অংশ মেরে নিত। এজন্য এ

পথ গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা 'সারথি' পত্রিকায় লিখলাম। আমরা ও-কাজ তাই করি নি।

দেশবন্ধুর কাগজ 'ফরওয়ার্ড' অল্প পরেই বেরুবে এইরকম ব্যবস্থা ছিল। 'ফরওয়ার্ড'-এর মনোনীত সম্পাদক, ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার উপেনদা, ভূপতি ও মনোমোহন একই সঙ্গে জেলে ঢুকলেন। এইরূপে বাধা পড়ায় 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশিত হতে কিছু দেরি হয়ে গেল।

যে আন্দামান-প্রত্যাগত বন্ধুদের কারামুক্ত করার চেষ্টা করছিলাম, যাদের মুক্তি সম্বন্ধে সরকার তাদের মনোভাব মাসখানেকের মধ্যে জানাবে বলেছিল, আলিপুর জেলে এলে তারাই আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করল। তখন মনে হল অদৃষ্টের কি পরিহাস! উপেনদার কথাটা তখনও কানে বাজছিল। তিনি সেদিনের সে অপ্রত্যাশিত কারাবাসের কথা উপলক্ষে পথে বিশ্বকবির কথায় বলেছিলেন—

'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী...'

সেদিন বিকেলের দিকে আমাদের পাঁচজনকে মেদিনীপুর জেলে পাঠায়। আমরা পাঁচজন ছিলাম—অমৃতলাল সরকার, রবীন্দ্রমোহন সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র-কুমার দত্ত এবং আমি।

হাওড়ায় যখন আমরা সশস্ত্র পাহারায় পেঁছোই, হঠাৎ চোখে পড়ে উত্তরপাড়ার এক ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন। তাঁর নামটি আজ আর মনে নেই। রবি সেনের আফসোস তখনও কানে বাজছিল। আমার মনে সে কথা এল। তাছাড়া আমরা জানতাম আমাদের আটকানোর জন্য অছিলা খুঁজে মিছামিছি একটা বিবৃতি দিয়ে সরকার জানাবে যে আমরা কিছু অপকর্মে লিপ্ত ছিলাম। অপকর্ম এইজন্য বলছি যে, 'সারথি' ও 'আত্মশক্তি'তে আমরা পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। নতুন পথের পক্ষে আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হচ্ছিল। রাজনৈতিক ডাকাতি ও সরকারী কর্মচারী হত্যার মতো বিপ্লবাত্মক কার্যের প্রথম ভাগে মূল্য থাকলেও যৌবন অবস্থায় কর্মস্রোত পেঁছোলে তাকে ধরে থাকবার সার্থকতা নেই।

আমরা জানতাম আমাদের ধরা আর 'শাঁখারীটোলা পোস্টমাস্টার হত্যার মামলা' সমসাময়িক করাটা ছিল সরকারের ইচ্ছাকৃত, আমাদের অনর্থক একটা বদনাম দেবার অজুহাত। তাই আমরাও এর একটা কাটান স্থির করে নিলাম। ফন্দী করে আমাদের পাহারাকে এড়িয়ে উত্তরপাড়ার সেই ভদ্রলোককে ইসারায় কাছে ডেকে বলে দিই যেন 'সার্ভেণ্ট' কাগজে ছাপিয়ে দেন যে স্বরাজ পার্টিকে সাহায্য করছিলাম বলে আমাদের গ্রেপ্তার করেছে। ব্যামফিল্ড আমায় যে-সব প্রশ্ন করেছিলেন তাও জানিয়ে দিই অর্থাৎ স্বরাজ পার্টির লোক; সি. আর. দাশ নেতা, ইত্যাদি।

সরকার চাইছিল গান্ধীজির একবছরে স্বরাজ আনার অসহযোগ আন্দোলন বিফল

হওয়ায় দেশে যেন আরো অবসাদ আসে; নেতাদের প্রতি অনাস্থা গজায়। আমরা স্বরাজ দল গঠনে সহায়তা করি সরকারের ঐ দুষ্ট দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিতে। ময়মনসিংহের সুরেন ঘোষকে আমি বিশেষ করে নির্দেশ দিই যাতে দেশবন্ধু বাংলার কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়ী হন। নিজ আবাসস্থলে জয় না হলে নিখিল ভারতে জয়লাভ আরো কঠিন। আমাদের বিচার ঠিক হয়েছিল। দেশবন্ধু নিজ প্রদেশ ও সারা ভারতে জয়ী হলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর যা ভেবেছিলাম তাই হল। সরকারের মিথ্যা ইস্তাহার আমাদের কালিমা লেপন করেছিল। আবার ওদিকে 'সার্ভেন্ট' কাগজে সরকারকে মিথ্যাচারী প্রমাণ করে আমাদের কথা প্রকাশ করে দিয়েছিল।

আমাদের ধরার কারণ সরকার বাইরে যা প্রচার করে, ভিতরের কথা তার থেকে আলাদা ছিল। সে কথার উল্লেখ করছি। ইংরেজ অত জবরদস্ত শক্তি হয়েও কল্পনা করতে পারে নি যে আমরা বাইরের শক্তির সাহায্যে তার উচ্ছেদের চেষ্টা করতে পারি। জার্মান-ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে যাবার পর সে হুঁশিয়ার হল।

এদিকে আমাদের কাজের মধ্যে নতুন ধারা প্রবর্তন করা হল। এম. এন. রায় 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' 'প্রিসিডিয়াম' এবং কার্যনির্বাহিক সমিতির সদস্য হলেন। তিনি লেনিনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে গিয়ে দেখি কমিউনিস্ট প্রচারপত্র গুপ্তভাবে বিলি হচ্ছে। এম. এন. রায়ের পরিচালনায় এদেশে তাঁর গুপ্ত কর্মীরা মতবাদ ছড়াচ্ছিলেন। তাতে কংগ্রেসের শ্রাদ্ধ ছিল: কংগ্রেস মধ্যবিত্ত ও ধনীদের প্রতিষ্ঠান—ওর দ্বারা দেশের সেবার বদলে নিগড় শক্ত করে গড়ে উঠবে। কলকাতায় ফিরে কিছুদিন বাদে শুনি নলিনী গুপ্ত ('কুমার') রায়ের চর হয়ে বাংলায় এসেছে। এই লোকটিকে আমি ১৯১৩ সাল থেকে জানতাম। তার উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না। সে অন্য দলের কর্মী ছিল। ভূপেন ও জীবন এর সঙ্গে এবার নতুন করে পরিচিত হয়। এ লোকটি আবার জার্মানিতে ফিরে যায়। কমিউনিস্ট পত্রিকা 'Vanguard' যারা প্রচার করত তাদের মধ্যে মুজফ্ফর আহ্মদ ছিলেন। কুতুবুদ্দিন বলে একটি লোকের সঙ্গেও আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। Waterfront বা নৌপথে রায়ের সাথে খবরাখবর চলত। রায়ের সঙ্গে গোপনে চিঠিপত্র লেখা সুরু করি। সেইসব চিঠি এদের মারফত জীবন পাঠিয়ে দিত। ভূপতির সঙ্গেও রায়ের কংগ্রেসের পক্ষে ও বিপক্ষে লম্বা চিঠিপত্র চলত। ইতিমধ্যে উপেনদাকে আমি 'আত্মশক্তিতে' এনেছিলাম। আমার সঙ্গে মত ও পথ নিয়ে তাঁর কথা-কাটাকাটি হত। তিনি সে সময়ে রায়ের কাগজ পড়ে ঘোর কমিউনিস্ট; 'আত্মশক্তি' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সেইভাবে লিখতেন। তিনি বলতেন, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব একসঙ্গে ঘটাতে হবে। আমি বলতাম পরাধীন দেশে তা

হয় না। দু' ধাপে এ কাজ হবে। প্রথমে ইংরেজ তাড়ানো; তারপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সম্ভব। রায়কে প্রথমে এ কথা বলায় তিনি শোনেন না; বলে পাঠালেন তাঁর পূর্বে ইস্তাহারের কথা। আমি বলি দেশে যত ভেদাভেদ নতুন করে সৃষ্টি হবে ইংরেজের তাতে মঙ্গল। একে তো হিন্দু-মোস্লেম সমস্যা নিয়ে আমরা ভুগছি, তার ওপর শ্রেণীসংঘর্ষ এনে ফেললে আমরা নিজেদের মধ্যে ঝাগড়া-ঝাঁটিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ব। পরাধীন জাতির রাজনৈতিক মুক্তি প্রথম কাম্য। আমরা কাঁচামালের দেশ হয়ে থাকলে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ জোরালো থাকবে, তাতে শ্রমিকরা গোলাম থাকতে বাধ্য হয়। তাঁকে পার্টির তরফ থেকে আমরা একটা বিজ্ঞপ্তি লিখে পাঠাই। তারপর দেখি ট্রট্স্কি বলেছেন—'Our way to England is through India' পরাধীন দেশের স্বাধীন হওয়া আগে দরকার। এরপর উপেনদা থেমে যান। কিন্তু এই চিঠির খবর কোনোরকমে গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে। আমার সন্দেহ, চিঠি বিদেশে (অর্থাৎ বার্লিনে—তখন রায় জার্মানিতে) পেঁছে গেলে সেখানে ভবিষ্যৎ অনর্থের কেন্দ্র গড়ে উঠল। ব্রিটিশ সরকার, পাছে আমরা রুশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করি, এই ভয় করছিল। জার্মান-ষড়যন্ত্রের খ্যাতি আমাদের আগেই ছিল। তাই রুশ-ষড়যন্ত্রের ভয়ে ওরা ভীত হয়ে পড়ে।

যাই হোক, আমাদের গ্রেপ্তারে দেশবন্ধু খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি টাউন হলে প্রতিবাদ-সভা আহবান করলেন। অনেক অসুবিধা ভোগ ক'রে, ঘরে পরে গঞ্জনা সয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। দেশে একটা আন্দোলন আনা দরকার। ১৯২৪ সালে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে সে আন্দোলন সফল হয়ে উঠল। দেশবন্ধু ও স্বরাজ দলের গরিমায় দেশ তাজা স্পন্দন অনুভব করতে লাগল নবজীবনের।

আমাদের গ্রেপ্তারের পূর্বে দেশবন্ধুকে সাহায্য করা নিয়ে তখন গান্ধীজির একনিষ্ঠ অনুচর, দেশের অন্যতম নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে ডেকে অনেক করে বোঝান যাতে আমরা পরিবর্তনকামী নব্য দলটিকে সাহায্য না করি। তিনি বলেন, 'তোমরা বিপ্লবপন্থী। আইনসভা তোমাদের কাছে চিরবর্জনীয়। আইনসভা দিয়ে স্বাধীনতা আসতে পারে না। গান্ধীজির পথই ঠিক। কিন্তু চিত্ত ভ্রান্তপথে দেশকে নিয়ে যেতে বসেছেন। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে তোমাদের সায় দেওয়া উচিত হবে না।'

আমি প্রত্যুত্তরে বলি, 'বিপ্লব সর্বব্যাপক। বিপ্লবীরা আইনসভায় যাবে না। কিন্তু একটা কথা প্রণিধান করতে হবে—ভারতের স্বাধীনতা আসবে কিরূপে? সেটা ক্ষমতার হস্তান্তর হবে, না, ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে? আমি ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু ছিনিয়ে নিতে যে কাঠখড় পোড়ানো দরকার তার আয়োজন-নিয়োজন আমাদের হাতে উপস্থিত নেই। দেশবন্ধু যে পথে যাচ্ছেন

তাতে ক্রমবিবর্ধমান আকারে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে পারে। অসহযোগ তিনি ছাড়েন নি, শুধু আইনসভায় যাচ্ছেন। ওখান থেকে মন্দ আইন বা সরকারের মন্দ কাজকে বাধা দিয়ে বা নিন্দে করে দেশে ভাব জাগানোর কাজ সুন্দর চলতে পারে। একদিন সংস্কারে এতটা ক্ষমতা হাতে আসবে যে সেখান থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা আনা সহজ হয়ে যাবে।'

সেদিনে ঐখানেই শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি।

যাই হোক মেদিনীপুর জেলে আমরা তো অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দিনই এসে পড়লাম। জেলার আশা করেছিলেন আমরা পরের দিন পেঁছোব। সেজন্য আমাদের আহার্যের ব্যবস্থা ছিল না। ফাঁসির আসামীর ঘরের পাশে পাঁচটা সেলে আমাদের রাতে নিয়ে আটকানো হয়। রবিবাবু আমাদের মধ্যে ছিলেন জেলের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পাস। তিনি বললেন, 'দেখুন, কাল সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলে একসঙ্গে থাকার অনুমতি চাইবেন। জেলে বেশীদিন থাকতে হলে আলাদা আলাদা থাকার ফল ভারী খারাপ হয়।'

পরদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইয়ংসাহেব এলেন। আমাদের মধ্যে কে প্রফেসর, কে ডাক্তার জানতে চাইলেন। অন্যান্যদের নাম জিজ্ঞাসার পর আমাদের কী বলবার আছে জানতে চাওয়ায় রবিবাবুর উপদিষ্ট কথা পাড়া গেল। জেলারবাবুটি আমাদের এখান থেকে সরানোর প্রস্তাবে নানা অজুহাতে বিবিধ উপায়ে সাহেবকে 'না' বলতে চাইছিলেন—বাধা সত্ত্বেও সাহেব কিন্তু আমাদের একটা জায়গায় একত্রে থাকার হুকুম দিলেন।

দু'দিন পরে দার্জিলিং থেকে নামকরা দুষ্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল টমসন এল। আমরা একত্র একটা ওয়ার্ড-এ (বিশেষ স্থান) আছি দেখে চমকে উঠল। ইয়ং করেছে কি! সরকারের আদেশ প্রত্যেক রাজবন্দী পৃথক পৃথক থাকবে। কেউ কারও সঙ্গে মিশতে বা কথাবার্তা পর্যন্ত কইতে পাবে না। সে ইয়ংকে বলল—এরা 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনে'র লোক, অতি ভয়ানক—জেল থেকে পালাতে পারে। এদের কড়া নজর এবং আরো কড়া হেপাজতে রাখতে হবে।

ইয়ং সৈন্যবিভাগ থেকে নতুন এসেছিলেন। তিনি কয়েদীদের স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। তাই আয়ুর্বিজ্ঞানমতে এই রাজবন্দীদের একত্র রেখেছেন বলেন।—'I am responsible for their health. That's why I have put them in this ward.'

আমাদের ছাড়াছাড়ি করানো হল না। তবে পাহারা ডবল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'If the government are afraid of this half a dozen men then it is time for us to depart—সরকার যদি এই গুটিকয়েক লোকের ভয়ে ভীত হন, তাহলে আমাদের এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত।'

লোকটি আমাদের সঙ্গে প্রথম প্রথম ভালো ব্যবহার করছিল। মনোরঞ্জন গুপ্তের সর্দি হয়। সে একটা রুমাল চেয়েছিল। জেলার তাঁর সাহেবকে জানান। সাহেব একচোট জবাব দেন রুমাল দেওয়া যেতে পারে না। সরকারী তপশিলে ও-পদার্থটির উল্লেখ নেই। তাছাড়া রুমাল তো ভারতীয়দের জাতীয় পরিচ্ছদের অঙ্গ নয়। রুমাল সামান্য জিনিষ, কিন্তু এই উপলক্ষে অশান্তির সৃষ্টি হয়। আমি সাহেবকে বললাম, 'রুমাল ভারতীয়দের জাতীয় পরিচ্ছদের অঙ্গ নয় কে বলেছে? রুমাল কথাটা দেশী না বিলাতী?' আমার জানা ছিল ব্রিটিশ সেনার অফিসারদের শিক্ষার অঙ্গ হচ্ছে, যে দেশে যাবে সে দেশের ইতিহাস যতটা সম্ভব জেনে নেবে। বললাম, 'আপনি জানেন দিল্লীর দরবার খালি ইংরেজ আমলে হয় নি? মুসলমান আমল ও হিন্দু আমলেও হয়েছিল। সে-সব ছবি দেখেছেন?' ইয়ং বললেন, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেখেছেন।' 'ভীষ্মের চাপকানে পকেট কী রাখার জন্য? মুসলমানের ফতুয়ায় রুমাল লটকানো তার বাড়িতে দেখতে পান না?' তখন বললেন, 'আর আমায় বলতে হবে না। ভারতের সভ্যতা অতি পুরাতন।' জেলারকে হুকুম হয়ে গেল সবাইকে রুমাল সরবরাহ করতে। কিন্তু এ লোকটির একটা বীভৎস দিক ছিল। সেটা পরে প্রকাশ পেল। শীতকাল এল। শীতবস্ত্র সরবরাহ নিয়ে লাগল গোলমাল। ভূপতি এবং ভূপেন দত্ত নিয়েছিল আমাদের সংঘর্ষের মহড়া। সাহেব আমাদের একমাস করে নিভৃত সেলে বন্ধ রাখার শাস্তি দিয়েছিলেন।

সেলে বন্ধ আছি। শীতকাল। রাত প্রায় সাড়ে চারটেয় আমার প্রকোষ্ঠের সামনে হঠাৎ আলো দেখা গেল। অপূর্ব রণবেশে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও জেলার প্রহরী-পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত। জেলারকে বললেন, 'খুলে দাও।' আমার প্রকোষ্ঠের চাবি একজন প্রহরী খুলে ফেলল। তারপর সাহেবের আদেশ, 'বাইরে আসুন।' অবাক! এতখানি অন্ধকার থাকতে তলোয়ার ও রিভলবার কোমরে বেঁধে এরা কেন? কেনই-বা হঠাৎ বেরিয়ে আসতে বলছে? তবে কি আমার ফাঁসি হবে? শুনেছি ভোররাত্রে ফাঁসি হয়। এই ক'টা কথা ভাবতে খুব অল্প সময়ই লেগেছিল। ভেবেছিলাম—কই, কোনো বিচার তো হল না? পরক্ষণেই মনে হল প্রকোষ্ঠ ছেড়ে বেরুতে দেরি হলে হয়ত ওরা ভাববে—ভীরু বাঙালী। যেমনি এ কথা মনে হওয়া অমনি আমি বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমরা ওদের দেওয়া জামা-কাপড় সব ত্যাগ করেছিলাম। গায়ে একটা চাদর ছিল। কম্বলটা ঘরে ফেলে বেরিয়েছিলাম।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন, 'কাল রাত্রে খানাপিনার সময় লাটসাহেব আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তিনি আজ প্রাতে জেল পরিদর্শন করতে আসবেন। আপনার

সঙ্গে দেখা করতে চান। যদি কথা দেন লাটের প্রতি রূঢ় হবেন না, তাহলে আমি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি।'

শোভান আল্লা! তবে ফাঁসি-টাঁসি নয়। এ একেবারে অন্য পর্ব।

আমি বললাম, 'আমি জন্মেছি ভদ্রসন্তান হয়ে। কারুর প্রতি রূঢ় আমি হই না। তবে রূঢ়তা আমি সহ্যও করি না। কেউ যদি আমার প্রতি রূঢ় হয়, আমি তাকে মায় পাই-পয়সায় শোধ দিয়ে দিই। অতএব দেখছেন লাটের নিজের ব্যবহারের ওপর সব নির্ভর করছে।'

জেলারের প্রতি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ হল—এঁকে বেলা আটটার সময় অফিসে নিয়ে যেতে হবে।

অতঃপর আমায় আবার বন্ধ করা হল। এই সময় আমাদের অনশনব্রত চলছিল। একদিকে উপবাস, তারপর রাত জেগে বেড়াল তাড়াতে হত। হতভাগা পরম শত্রু। সে সাজানো খাবার খেয়ে যেত। জেল-কর্মচারীরা বলত, 'আপনার অমুক অমুক বন্ধু কিছু কিছু খাচ্ছেন, আপনি মিছে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন।' আমার মন বলত—'মিথ্যেবাদী'।

নিভৃত প্রকোষ্ঠে বন্ধ হয়ে কয়েকটা কথা মনে হল। ধনগোপাল ও তার স্ত্রী যখন ভারতে এসেছিল, লিটন-এর সঙ্গে তারা একদিন দেখা করতে যায়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে 'New Ideas in Education' নামে একটি সমিতি ছিল। ধনগোপাল ও লিটন তার সভ্য ছিলেন। সেই সূত্রে এঁদের পরিচয়। ধনগোপালের স্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'ড্যাল্টন পদ্ধতি'তে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ওদের মারফত লিটন আমায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আহ্বান জানান। এটা ১৯২২ সালের জুন মাসের কথা। সে সময় অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। আমি লিটন-এর আমন্ত্রণকে আমল দিই নি। পর্বত মহম্মদের কাছে না যাওয়ায় মহম্মদই পর্বতের কাছে এসে হাজির। আমি দেখলাম এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের বিরুদ্ধে নানা কথা বিকৃত করে কয়ে থাকবে। আমাদের দিককার কথা আমিও শুনিয়ে দেব।

সকালে সময়মতো সাক্ষাৎকার হল। ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি কামরায় প্রবেশমাত্র লিটন 'Good morning' ব'লে টেবিলের অপর পার্শ্বের চেয়ারখানি দেখিয়ে দিলেন। প্রথম কথা—আমাদের দুজনেরই একজন উঁচুদরের বন্ধু আছেন। মিস্ ম্যাক্লাউড-এর কথা মনে পড়ল।

'...কেন জেলে গোলমাল করছেন? জেলে দিয়েছে? সে তো নিজেরা বরণ করে নিয়েছেন। আপনারা পূর্বে যেখানে ছিলেন সে জায়গা আমি দেখে এসেছি। চমৎকার স্থান। আমারই থাকতে ইচ্ছে করে।' এরপর আমি আর থাকতে পারলাম

না, বলে ফেললাম, 'তবে আসুন স্থান-পরিবর্তন করে ফেলি।' লাট তখন বললেন, 'আমার শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরকম?' উত্তরে বললাম, 'এর থেকে খারাপ শাসনব্যবস্থা আমি কল্পনা করতে পারি না।'

সাহেবপুঙ্গবের মুখ লাল হয়ে গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ডেকে বললেন, 'এরা স্থির করেছে জেলের বাইরে ও ভিতরে সরকারকে বাধা দেবে (এটা হচ্ছে স্বরাজ-পার্টি সম্বন্ধে কটাক্ষ। পার্টির কর্তারা স্থির করেছিলেন, সরকারী যন্ত্রের ভিতর ও বাইরে থেকে বাধা দিয়ে তাকে অচল করা।) আপনি এদের সম্বন্ধে যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন আমার গভর্নমেণ্ট আপনাকে পূর্ণ সমর্থন করবে।' কথা শুনে আমার ভারী বিশ্রী লাগল।

লাট উঠে চললেন। আমায় বললেন তাঁর হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় হয়ে এল। তিনি কমিশনারসাহেবকে পাঠিয়ে দেবেন। ধরে নিলাম মিস্ ম্যাকলাউড লিটন-সরকার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করে থাকবেন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট লাটের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম তো আমি এবং লাট ছাড়া ঘরে কেউ ছিল না, পরে আমি যখন সুপারিন্টেন্ডেন্টের বীভৎসতার কথা তাঁকে বলি তখন কথা ভজাবার জন্য তাঁকে ডাকেন (সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে লাটের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়)। পরদার বাইরে গিয়ে লাট ইয়ংসাহেবকে বলেন, 'দেখছি, রাজবন্দীদের সঙ্গে ব্যবহার কিরূপ করতে হয় সে অভিজ্ঞতা আপনার নেই।' ইয়ং বলেন, 'আজ্ঞে না।' শুনতে পেয়ে বুঝলাম মামলা জিতেছি। সেইদিনই আমাদের নিভৃত প্রকোষ্ঠে বন্ধ থাকবার শাস্তি ঘুচে গেল। আমরা আবার আমাদের পুরানো স্থানে ফিরে আসি।

কমিশনার শ্রীজ্ঞান গুপ্ত আসেন; বলেন, 'কমিশনার হলে কি হবে—আমি বাঙালী। আপনারা মিটমাট করে নিন।'

ইয়ং অনেকগুলো ভালো কাজও করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'আপনারা স্বাধীনতাকামী। সেটা মরীচিকার পিছনে ছোটার সমান। এত ভাষা, এত জাত—তার ওপর হিন্দু-মুসলমান আছে। এতবড় বিস্তৃত ভূখণ্ড এক হতে পারে?' আমরা তাঁকে জবাব দিই যে, শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন বিলেতে আইরিশ, ওয়েল্স, স্কচ ভাষা ছাড়া ইংরেজী এক এক জেলায় এক এক রকম। তারা একজাতি হয়ে রয়েছে তো? তারপর আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিই। আমি ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন বরাবরই দেখতাম। বহু আগে তা বলেছি। ইয়ং শেষে বললেন, 'হিন্দু-মুসলমান কি এক হবে?' সে সময় মৌলানা মহম্মদ আলির যুগ। খেলাফতের হিন্দু-মুসলমান মিল জোর চলছিল। আমরা মৌলানা মহম্মদ আলির উল্লেখ করতেই সাহেব উগ্র হয়ে উঠলেন; বললেন, 'I know Mohammad Ali, I know

Shaukat Ali. If they get half a chance, they will chop off your heads —আমি মহম্মদ আলিকে জানি, আমি সৌকৎ আলিকে জানি। যদি তারা আধখানা সুযোগ পায়, তোমাদের কোতল করে ছাড়বে।'

কে জানত একবছর বাদে (১৯২৫ সালে) তাঁর কথায় আমল আসবে ? ১৯২৫ সালে সীমান্ত কোহাট জেলায় হিন্দুদের উপর ভারী অত্যাচার হয়। হিন্দু-মুস্লিম অমিল। সুতরাং গান্ধীজি ও তাঁর 'বড় ভাই' সৌকৎ আলি ছুটলেন তদন্ত করতে। তদন্তে গান্ধীজির মতে দাঁড়াল মুসলমানরা দায়ী। এই নিয়ে 'দুই ভাইয়ে' হয় মতান্তর। তার থেকে এল মনান্তর। ক্রমশঃ একে একে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় কংগ্রেস ছেড়ে মোস্লেম লীগমুখি হন। সেদিনের চারাগাছ আজ হিন্দু-মুস্লিম অমিলের মহামহীরুহ।

আমি নিজে হিন্দু-মুস্লিম মিল প্রার্থী। আমার ক্ষুদ্র জীবনে যেখানে যখনই ক্ষেত্র পেয়েছি মিলন রাখার চেষ্টা করেছি। আমার দৃঢ় মত এই দাঁড়িয়েছে, শুধু পরস্পরের তারিফে কাজ হবার নয়। মুস্লিমদের ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব না এলে উপায় নেই। দেশে তাড়াতাড়ি শিল্প-সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে। নিষ্কৃতির পথ সেই দিকে। ঐ পথে ধর্মান্ধতা ঘুচে যায়।

মেদিনীপুর জেলে এসে মনে হল স্বাধীনতা সংগ্রামে আরো এক-পা আমরা এগিয়ে চলেছি। বিপ্লবীর জীবনে জেল কষ্টিপাথরসদৃশ। পথভ্রষ্ট যে হই নি এটা তার নিদর্শন। রাজনীতিকের জীবনের স্বাভাবিক একটা অঙ্গ হচ্ছে কারাবাস। এটা যেন রাজনীতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা। মনে হল এই সেই জেল যেখানে ১৯০৮-১৯০৯ সালে রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত ইংরেজের রাজ্যোচ্ছেদের অভিযোগে একত্রে বাস করে স্থানটাকে পবিত্র করে গেছে। এর প্রতিটি ধূলিকণা যেন পবিত্র। স্বাধীনতার পথে মুক্তিকামীদের এটি একটি তীর্থক্ষেত্র। ঐ পুরাতন 'মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা'র কথা আমার মনে পড়েছিল। ১৯২২ সালে বরিশালে শঙ্কর মঠের উৎসবে যাই। সেখানে কথাপ্রসঙ্গে মহাপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেছিলেন, 'এপারে পূর্ববঙ্গ আর ওপারে মেদিনীপুর বরাবর স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে। মধ্যের বিজ্ঞজনেরা সাড়া দেন না।'

আগের বহু গৌরবের কথা ছেড়ে দিলেও সাম্প্রতিক একটি বিশেষ ঘটনা মনে পড়ে গেল। বীরেন্দ্র শাসমলের মতো নেতার কথা। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ১৯২১ সালের শেষ দিকে—অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পর আইন-অমান্য আন্দোলন হয়ত আনতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি যদি বিবেচনা করেন ওরূপ আন্দোলনের প্রয়োজন, তাহলে গুজরাটের আনন্দ, নড়িয়াদ ও সুরাটে নমুনা করে দেখাবেন। তারপর ঐ আদর্শে অন্যেরা অগ্রসর হবে। কিন্তু কাঁথিতে ইউনিয়ন

বোর্ড অগ্রাহ্য করে শাসমলের পরিচালনায় আইন-অমান্য আন্দোলন আগেই হয়ে গেল এবং সফলতা অর্জন করল। ঘাটালে ও আরামবাগে অনুরূপ আন্দোলন সাফল্য অর্জন করে। শাসমলের মতো গণনেতা আজ দেশে বিরল।

পরে শাসমল মেদিনীপুর জেলা-বিভাগের সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে জয়যুক্ত হন। শাসমল এ-যুগের একজন মস্ত কৃতকর্মা নেতা। গণআন্দোলনের জয় তিনি আমাদের চোখের সামনে দেখিয়ে গিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রকেশরী বীরেন শাসমলের নাম চিরস্থায়ী হোক !

১৩ই অক্টোবর ১৯২৪ সালে অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (দুজনেই M.L C.), সুভাষচন্দ্র বসু (Corporation-এর Chief Executive Officer), সুরেন ঘোষ, পূর্ণ দাস, প্রতুল গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিন গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখার্জী প্রভৃতি বহু লোককে তিন-আইন ও অর্ডিন্যান্সে আটকানো হল জেলে। এর মধ্যে অনেকেই—বিপিনবাবু, প্রতুলবাবু, সূর্য সেন—আগে থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। আঠারো জন তিন-আইনে ছিলেন। তাঁদেরও 'অর্ডিন্যান্স' হল। দেশবন্ধুর হাত দুটি ভেঙে দেওয়ার কাজ হল এতে। তিনি নিতান্ত একা পড়ে গেলেন। অতিরিক্ত মর্মবেদনায় ও খাটুনিতে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হল। ১৯২৫ সালে ১৬ই জুন তিনি দেহত্যাগ করেন।

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

—রবীন্দ্রনাথের এই ভাষায় যা কিছু সান্ত্বনা, নইলে সান্ত্বনার আর কিছু নেই।

গান্ধীজি এই সময় ঘটনাক্রমে বাংলাদেশেই ছিলেন। তিনি খবর শুনে বললেন, 'Unthinkable But God's Will be done.' তিনি স্বরাজ পার্টিকে রক্ষার জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকেই উপযুক্ত বিবেচনা করে তিন শিরোপায় ভূষিত করে গেলেন —প্রাদেশিক স্বরাজ পার্টির সভাপতি, বাংলা কাউন্সিলের (তখন এসেম্বলি'কে 'কাউন্সিল' বলত) প্রধান এবং কর্পোরেশনের মেয়র। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পাঁচবার মেয়র হয়েছিলেন।

কর্পোরেশনে স্বরাজ পার্টির ঢোকা শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনীতির পক্ষে অকল্যাণকর হয়েছে। বাংলার রাজনীতি তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে আর আত্মকলহে আমাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে নি। বাংলার যত নেতা আপনার এলাকা ছেড়ে এইদিকে চেয়ে থেকেছেন ও কলকাতায় থেকে সময় নষ্ট ও কার্যহানি করতে বাধ্য হয়েছেন। বহু ভালো লোকের দুর্নাম হবার কারণ এই কর্পোরেশনী রাজনীতি। বহু সুনামের জ্যান্ত কবর এখানে হয়েছে। যে পার্টি ফান্ড বা দলের ভান্ডারের আশায় এখানে যাওয়া

হয়েছিল তা নিষ্ফল হয়েছে। বাজারে রব উঠেছে ; 'পার্টি ফান্ড নয়, পকেট ফান্ড !'

১৯২৪ সালে ভূপেন দত্ত ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেল থেকে বর্মার জেলে স্থানান্তরিত হয়। তারা ওখান থেকে দেশকে যেভাবে সেবা করে তার তুলনা বিরল। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' ১৯২৫ সালে গোপনে তারা দেশবন্ধুর কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়। ইংরেজ বলছিল—সহিংস কাজ করতে যাচ্ছিল বলে বাংলার দুষ্ট লোকগুলিকে নজরবন্দী আইনে আটক করা হয়েছে। দেশবন্ধু বলছিলেন তাঁর স্বরাজ দলকে ধ্বংস করার ছল ছিল ওটা। মহাত্মাজী সত্য কী বুঝতে পারছিলেন না। ঐ জবানবন্দী পড়ে তাঁর মত দেশবন্ধুর দিকে ঘুরল।

তারপর আরো পরে ভূপতি মজুমদার, রবি সেন ও অমৃত সরকারকে মালাবারের ক্যানানোরে স্থানান্তরিত করা হয়। ভূপতির লেখা দুটি গান—'কে জানে সাঙ্গ হবে কোন্ দিনে, ভাই···' আর 'মোদের দেবী, সর্বনাশী' জেলে খুব গাওয়া হত।

একত্রে থাকতে থাকতে বন্ধুদের পরস্পর মনের ও মতের মিল খুঁজে পাওয়া গেল। 'একত্রে আমরা শক্তিসম্পন্ন ; দ্বিধা-ভাগে আমরা হীনবল'। এর থেকে লাভ পেয়ে যায় তৃতীয় পক্ষ, যারা ভারতের অগ্রগতির পরিপন্থী। সেইসব বুঝে মেদিনীপুর জেলস্থ বিপ্লবী নেতারা সবাই এক হয়ে কাজ করার ব্যবস্থা মেনে নিলেন। Word of honour দিলেন একত্র কাজ করার। আমাদের দিক থেকে নরেশ চৌধুরী ও আমি ; 'অনুশীলন'-এর হয়ে প্রতুল গাঙ্গুলী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। দিনকাল বেশ ভালোভাবেই কাটতে লাগল। সেদিন পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কেউ ছিল না। দুটি দলকে মেলানোয় এই নিয়ে আমার তৃতীয় এবং সফল প্রচেষ্টা। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে যা যা ঠিক হল তার মধ্যে রইল সামরিক ধাঁচে একটা দেশজোড়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা, সেটাই হবে প্রথম ও প্রধান কাজ। দ্বিতীয় কথা হল - 'এই সরকারকে মানি না (Non-recognition of the state)'—এই আন্দোলন। শেষের পরিকল্পনা জীবন চট্টোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত।

মেদিনীপুরে আমরা আঠারো জন একত্রে ছিলাম। বিপ্লবীদের সুখের সংসার। একি আর বেশীদিন টেকে ? আমাদের নানাভাবে বিভক্ত করে বর্মা ও ভারতের বিভিন্ন জেলে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ছাড়াছাড়ির পূর্বে আমরা কিছু খাঁটি কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলাম। আমি বলছি সংস্কারের দিক থেকে Public leader-রা ঠিক আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন না। এমন কিছু বলে বা লিখে ফেলতেন যাতে আমাদের কর্মীদের মনে খেদ উৎপন্ন হত। সেজন্য স্থির করলাম আমাদের লোকেরাই আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে লিখে বা ব'লে। লেখক গোষ্ঠী-করা স্থির করি। প্রথম লজ্জা ভাঙতে কে লিখবে ঠিক করা মুশকিল। কেউ কেউ বললেন,

'আমাদের লেখা হবে ছাইভস্ম।' আমি বুদ্ধি খাটালাম। হাতের লেখা একটা মাসিকপত্র বার করলাম। নাম দিলাম 'ভাঙা কুলো'। বাধ্যতামূলক হল সবাইয়ের তাতে লেখা। তার ফলে পরে কয়েকখানা বই প্রকাশিত হতে পেরেছিল: মদন ভৌমিকের 'আন্দামানের কথা', মনোরঞ্জন গুপ্তের 'আইরিশ বিদ্রোহের কথা', আমার 'ভারতে সমর-সংকট'—আরো কিছু কিছু বই।

১৯২৬ সালে জানুয়ারি মাসের গোড়ায় আমি কলকাতায় আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই। এখানে এসে দুটো নতুন জিনিষ নজরে পড়ল। যখন আমি আন্দামান-ফেরত কয়েদীদের ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করছিলাম তখন সরকারপক্ষ থেকে আমায় জিজ্ঞেস করা হয়, ওদের ছেড়ে দিলে ওরা যে ভালোভাবে দিন কাটাবে তার স্থিরতা কি? আমি বলি—আমরা তো স্বাধীনভাবে ঘোরাফিরা করছি, তাতে তো দেশটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় নি? ওরা এলেই বা এর ব্যত্যয় ঘটবে কেন? আমি কোনো দলাদলির ভিতর যাই নি। দুই দলেরই লোকের জন্য চেষ্টা করছিলাম। আমায় এরপর বলা হয় সবাইকে ছাড়তে পারি, কিন্তু নরেন ঘোষচৌধুরীর জন্য জামিন কে হবে? কাল বিলম্ব হতে না দিয়ে বলেছিলাম, 'আমি।' 'আপনি! আপনার জন্য এত টাকা খরচ করে সরকার আপনাকে ধরতে পারে নি, আপনি হবেন নরেনবাবুর জামিন!' আমায় এই কথা বলেছিল গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা কবুডেন। যে ব্যক্তি বাইরে গেলে সরকারের রাজ্য থাকবে না, সেই নরেন ইংরেজের জেলের মধ্যেই নিজের একটা রাজ্য রচনা করে বসে ছিলেন। ইংরেজের 'জেল-আইনে আমরা যা করলে হবে বেআইনী, তা করার দরকার হলে নরেনবাবুর শরণাপন্ন হলেই হল। জেলে যেন দুজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট—একজন সরকারী, অপরজন বেসরকারী। মেদিনীপুর জেলে ভূপতি মজুমদারের নাম হয়ে গেল মজাদারমশাই। খেলায়, দৌড়ঝাঁপে, সরকারের সঙ্গে কলহে যেমন অগ্রণী হাসতে ও হাসাতে ছিল আবার সেরা। জেলে কিছু সরষে ছড়িয়ে দিয়েছিল ও। অনেক সরষে গাছ হয়েছিল। হাওয়ায়-দোলা সরষে ফুল দেখে আমরা সুখভোগ করতাম। একদিন কোথা থেকে দুটি ঘুঘু সেই বাগানটায় এসেছিল। মজাদারমশাই চীৎকার করে বললেন, 'বেটাদের ভিটেয় সরষে বুনেছিলাম—এখন ঘুঘু চরিয়ে দিচ্ছি। এবার এরা যাবে।' তার ফল আলিপুরে এসে প্রত্যক্ষ করলাম বটে।

দ্বিতীয়টি যা নজরে পড়ল সেটি হল—'বিদ্রোহী দল'। আমরা জেলের বাইরে থাকতে যে কর্মপদ্ধতিতে বাধা দিচ্ছিলাম তা কিছু কিশোরদের পছন্দ হচ্ছিল না। আমরা জেলে আসতে তাদের দানা বাঁধতে সুবিধা হল। তাদের মধ্যে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'—দু'দলেরই ছেলে ছিল। 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা'য় তাদের নাম খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। বোমা ছোঁড়বার ঢের আগেই তারা সদলবলে ধরা পড়ে।

এদের সঙ্গে জেলে আমার খুব ভালবাসা হয়ে গেল। এদের সম্বন্ধে দু' একটা কথা পরে বলব।

১৯২১-২৪ সাল বাংলায় বিপ্লবীদের নতুন করে গোছগাছের সময়। কিন্তু বাংলাদেশটা ফ্রান্সের মতো। এদের অধিবাসীরা খুব বুদ্ধিমান। তবে একটু বেশী ভাবালু। এর ফলে পরস্পরের কলহে অগ্রগতির রথ যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেটা আমাদের মনে থাকে না। আত্মকলহে যে পরিমাণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি, সেই পরিমাণে আমরা ভারতের দরবারে আসন-হারা হচ্ছি। ১৯২৩-২৪ সালে বিপ্লবীরা যে পরিমাণে গোছগাছ করে নিতে পারত, তা পারে নি।

যে কালটা আমরা পর্যবেক্ষণ করছি সে-সময়ের প্রধান প্রধান খবর হচ্ছে বিপ্লবীদের দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গণআন্দোলনে যোগদান ও বিরুদ্ধাচরণ; স্বরাজ পার্টির উদ্ভব এবং বিরুদ্ধবাদীদের অনেকের তাতে যোগদান; গোপীনাথ সাহার আত্মাহুতি; সুরেন ঘোষ, পূর্ণ দাস, হরিকুমার চক্রবর্তীর চেষ্টায় সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে দেশবন্ধু কর্তৃক গোপীনাথ সাহার আত্মাহুতির উচ্চাদর্শে আস্থাস্থাপন ও প্রশংসাবাদ; 'বিদ্রোহী সংসদ' ও তাদের কার্যকলাপ; গান্ধীজির প্রতিবাদ (যে গোপীনাথ-সম্বন্ধীয় মন্তব্যে তিনি মর্মাহত হয়ে প্রতিবাদ করেন, ঠিক সেইরূপ সিদ্ধান্ত ১৯৩১ সালে ভগৎ সিং সম্বন্ধে করাচি কংগ্রেসে নিজে করেন। তিনি পরে যেখানে এসে পেঁছোন, সেথায় আগে কেউ এসে পেঁছোলে, তিনি মর্মাহত হন। এমন ঘটনা আরও আছে। দেশবন্ধু ও মতিলালের স্বরাজ দল স্থাপন তেমন একটি। আর একটি হচ্ছে—এ যুগের দধীচি যতীন দাসের অনশনে আত্মদান। যতীন দাসের অনশন ধর্মঘটকে তিনি হীনচক্ষে দেখেন)। সর্বশেষে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ; বাংলায় দ্বৈত-শাসনের অবসান।

আমাদের মনের কথা দেশবন্ধুর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, 'Swaraj shall be for the masses and must be won by the masses.—স্বরাজ হবে জনসাধারণের এবং তা প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের চেষ্টায়।'

অসহযোগ আন্দোলন এল ১৯২১ সালে। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যাঁরা এক হয়েছিলেন, সেই বন্ধুরা ('যুগান্তর'-এর শ্রেষ্ঠ অংশ) এতে যোগ দেন। অপর একদল পুলিন দাসের নেতৃত্বে একে বাধা দেন। একবছর বাদে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন—পুলিনবাবু ইংরেজ সদাগরের টাকা নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করায় নিন্দনীয় হয়ে পড়েন। তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচররা সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিয়ে তাঁর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯২২ সালে আমি করতে লাগলাম সমবায় সমিতি গঠন। জনগণের মধ্যে কাজ করার জন্য কয়েকটা আশ্রমও গড়ে উঠল। এতে ভূপেন দত্ত, কিরণদা প্রভৃতি অগ্রণী হন; মনোরঞ্জন গুহ,

অরুণ গুহ প্রভৃতি প্রথমবার জেল থেকে এসেই কাজ আরম্ভ করেন। রসিক দাসের মতো নীরব অথচ উঁচুদরের কর্মী এর থেকে ফুটে বেরুল। আমরা বিপ্লব-ছড়ানো সাহিত্যের বড্ড অভাব বোধ করতাম। মনোরঞ্জন এই বিষয়ে আমার সঙ্গে আগে কয়েকবার আলাপ করেছিল। সুখের বিষয় আমাদের মনের ইচ্ছাকে এই বন্ধুরা রূপ দিতে পেরেছিলেন। কিরণদার অবদান এই বিষয়ে অনন্যসাধারণ। 'সরস্বতী লাইব্রেরী' আর কিরণদা অচ্ছেদ্য। 'সরস্বতী লাইব্রেরী' বাংলাদেশে বিপ্লবীদের মনের খোরাক জুগিয়ে একটা অসাধারণ নাম করে নিয়েছিল। মনোরঞ্জনের মাথায় তিনবার তিনটে প্রেরণা আসে। প্রত্যেকটাই অতি মূল্যবান এবং আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিতে পেরেছে। একটা হচ্ছে—বিপ্লবী-সাহিত্য সৃষ্টি করা; দ্বিতীয়টা হচ্ছে—অস্ত্র ছাড়া জনসাধারণকে নিয়ে বিপ্লবী কাজে (বা বিদেশী সরকার নাশ করার কাজে) লিপ্ত হওয়া; তৃতীয়টা—ক্ষমতা-হস্তান্তরের মুখাপেক্ষীদের অতিক্রম করে ক্ষমতা ইংরেজের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা। মনোরঞ্জন বেশ চৌকশ লোক। মনে বড়, মাথায় বড়—সর্বদিকে অংশগ্রহণ করায় সক্ষম।

ধনগোপালের কাছ থেকে একবার টাকা আনিয়ে 'সরস্বতী লাইব্রেরী'কে রক্ষা করা হয়। আমরা মেদিনীপুর জেলে। মনোরঞ্জনের এক দাদা 'লাইব্রেরী' চালাতেন। অপর সবাই ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল। তিনি টাকার অভাবে দোকান বন্ধ হবার সম্ভাবনা জানান। আমি ধনগোপালকে টাকা পাঠাতে লিখি; সে তিনশো টাকা পাঠায়।

আমি যখন চাইছিলাম অন্ততঃ পাঁচবছর ধরে আমরা বিপ্লব সার্থক করবার গঠনমূলক কাজ করি, কিছু বন্ধু আমায় ভুল বুঝেছিলেন। এদের মধ্যে গোপেন রায় প্রধান। তিনি ইতিপূর্বে জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। গোপীনাথ সাহা ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে বিশেষ করে জুটেছিল। ভূপতি বিপ্লবের কাজ খুব সুন্দর বুঝত। কোনোদিন আমার এই বন্ধুটিকে গোঁড়ামি স্পর্শ করতে পারে নি। ১৯০৭-০৮ সালে 'সন্ধ্যা'-'যুগান্তর' কাগজ ছাপানোর কাজ, বিক্রি বা ফেরি করার কাজ থেকে আরম্ভ করে সাগর পাড়ি দেওয়া, অস্ত্রহাতে গেরিলাবৃত্তিতে, আবার অসহযোগ আন্দোলনে—যখন যেটা দিয়ে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে তাতেই পুরোভাগে থাকত। গোপীনাথ ভূপতির কাছ থেকে 'সরস্বতী লাইব্রেরী'তে এল। নামে অনিলবরণ 'সারথি' পত্রিকার সম্পাদক হলেও প্রকৃত সম্পাদক ছিল মনোরঞ্জন। গোপীনাথ এই কাগজের সম্পর্কেও কিছু কাজ পেয়েছিল। 'সরস্বতী লাইব্রেরী'তে কাজ করত বিনোদ চক্রবর্তী। সে ভেবেছিল আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছি। সে তার একটি গোপন পরামর্শের মণ্ডলী গড়ে তুলল।

তাতে গোপীনাথের প্রাণও সাড়া দিল। এদের এই পরামর্শ ও দল হ'ত আমাদের ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু এমন অপোক্ত ছিল এদের কাজ যে আমরা তো জানতে পারলুমই, সরকারও বেশ ভালোভাবে জেনে ফেলেছিল। হিউ স্টিফেন্‌সন-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলে একদিন তা আমি জানতে পারি। সেদিন আমার সঙ্গে শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার জে. চৌধুরীও ছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আন্দামান-প্রত্যাগত বন্ধুদের মুক্ত করা। হিউ স্টিফেন্‌সন বললেন, 'এদের কি করে মুক্ত করা যায় ? আবার তো গুপ্ত-সমিতি গড়ে উঠেছে।' চৌধুরীমশায় চমকে উঠলেন; তিনি বললেন—ও-বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। আমার দিকে স্টিফেন্‌সন চাইতে আমি বললাম যে তাঁকে ভুল সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন স্টিফেন্‌সন নাম করলেন বিনোদ চক্রবর্তী, গোপেন রায় ও বিপিন গাঙ্গুলীর। আমি ফিরে এদের সতর্ক করে দিই। কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের মত এই বন্ধুদের মনঃপূত হয় নি। ক্রমশঃ একটি বিদ্রোহী সংসদ গড়ে উঠেছিল। তাতে তরুণ ও অতরুণ নেতা ছিল। অতরুণ নেতাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও বিপিনদা আর তরুণ নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে কর্মী ছিলেন সন্তোষ মিত্র। গোপীনাথ আমাদের জানিয়ে দিয়ে এদের সঙ্গে ভিড়ে পড়েছিল। বড়ই অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও অসভ্য ভাবে পূর্বের আন্দোলন দলন করেছিল টেগার্ট। তার ওপর বিপ্লবীদের আক্রোশ স্বভাবতই ছিল। তার শাস্তিবিধানের চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু অদৃষ্ট বরাবর সুপ্রসন্ন থাকায় তাকে কেউ কিছু করতে পারে নি। বিপ্লবীদের অসমাপ্ত কাজের ভার নিজের ওপর তুলে নিয়েছিল গোপীনাথ। কিন্তু কাজের দিনে সে টেগার্ট ভ্রম করে এক নির্দোষী ব্যক্তিকে নিহত করে। নাম তার ডে। সে আহত হয়ে বার বার বলেছিল, 'আমায় কেন এমন করলে, আমায় কেন এমন করলে ?' গোপীনাথ হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায়। লালবাজারে টেগার্টের সামনে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। টেগার্টকে জীবন্ত দেখে সে চমকে ওঠে এবং তার ভুল ভাঙে। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়। বীরের মতো সে মৃত্যুকে বরণ করে। আপনার ভুলের জন্য সে অবশ্য অনুতপ্ত হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে তার মতান্তর হোক, কিন্তু সে ছেলে ছিল হীরের টুকরো। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি আমাদের দলের বন্ধুদের চেষ্টায় কংগ্রেস থেকে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মহৎ উদ্দেশ্যে চলতে গিয়ে যে-পথ সে নিয়েছিল তা ভ্রান্ত হলেও তার আত্মদানটা ছিল অকৃত্রিম ও উচ্চাঙ্গের। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশবন্ধু গোপীনাথের নামের সঙ্গে জড়িত মন্তব্য পাস করিয়ে নেন সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে। কলকাতা করপোরেশনেও এ-মর্মে একটি মন্তব্য পাস হয়। গান্ধীজি ১৯২৪ সালে জেল থেকে ফিরে কর্মক্ষেত্রে কর্মক্ষম হওয়ামাত্র স্বরাজ পার্টি ও গোপীনাথ-সংক্রান্ত মন্তব্য

—এই দুটিকে নিয়ে বেঁকে বসলেন। তাঁর চাপে পড়ে কলকাতা করপোরেশন তাঁদের মন্তব্য উঠিয়ে নেন। কংগ্রেসেও তার ছাপ পড়ে। এবার বিদ্রোহী সংসদের কথা বলি।

এদের কাজের জন্য অন্যরাও ভুগতে বাধ্য হলেন। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'-এর বহু লোক জেলে আবদ্ধ হলেন। সেটা কারই বা ভালো লাগে? সুতরাং এদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা বহু লোকেরই ছিল না।

আমি সহানুভূতি সহকারে এদের বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। মানব সমাজ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় সহজে যেতে চায় না। যাবার নতুন প্রস্তাবটা সন্দেহ জাগায় মনে। আস্থা চট্ করে আসতে চায় না। তারপর বিরুদ্ধ সমালোচনা হতে থাকে। তারও পর চলা আরম্ভ হয়। এজন্য নতুন অবস্থায় নিয়ে যাবার অগ্রদূতদের অনেক কিছু সইতে হয়। তারা সংখ্যায় থাকেও কম। পরে তাদের মতে সারা সমাজের মত মিলে যায়, যদি এর মধ্যে মন্দ কিছু না ঘটে। সমাজবিজ্ঞানে এই নৈসর্গিক নিয়ম চিত্রিত আছে।

১৯২২ সালে বৌবাজার চেরী প্রেসে আমাদের একটি ভালো আড্ডা জমত। একদিন আমাদের প্রয়োজনীয় আলোচনা সাঙ্গ করে ফিরছি, এমন সময় ময়মনসিংহের সুরেন ঘোষের এক সহকর্মী আমায় অপর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে কয়েকজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। সাক্ষাৎস্থলে ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত, প্যারী দাস ও ধরণী গোস্বামী। ওদের কথাটা আমি মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। 'সংঘবাদ' অপছন্দের জিনিষ নয়। আমাদের বন্ধু এম. এন. রায় ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির একজন বড় রকমের স্থাপয়িতা। এম এন রায়ের জার্মানি থেকে লেখা 'ভ্যানগার্ড', পরে 'অ্যাডভান্স গার্ড' আমি পড়তাম। তার সঙ্গে গোপনে আমাদের পত্রালাপ ছিল। সে খবর ওপারের দিক থেকে কেউ ফাঁস করে দেয়। ১৯২৩ সালে আমাদের গ্রেপ্তারের সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্রে যাই লিখুক, ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে এসে এক উচ্চপদস্থ অফিসার আমায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের অফিসে ডাকিয়ে নিয়ে যায়। তৎকালীন ডাকাতি, লাল ইস্তাহার প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের জড়ানোর কথা তোলায় সে ব্যক্তি বলে, 'চার্জ' কিছু দিতে হয়, তাই সরকারী কাগজে ঐ সব লেখা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে আপনাদের মস্তিষ্কের কাজকে আমরা ভয় করি। একবার তো আন্তর্জাতিক একটা মারাত্মক রকমের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। আবার যদি রুশের সঙ্গে সেইরকম একটা কিছু করে বসেন, তাই আপনাদের আটকানো।' অবশ্য সত্যই আমরা রুশের সঙ্গে যোগস্থাপন করছিলাম না। পায়সে মুখ পুড়লে দইয়ে ফুঁ দিয়ে খাবার মতো ব্রিটিশ সরকারের ভীত মনোভাব।

যাক্, কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলাপ করি। বুঝি ওরা একটা ভুল স্তর থেকে আরম্ভ করতে চায় ওদের কাজ। অর্থাৎ রুশ পরাধীন ছিল না; কাজেই সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের কর্মতালিকা ঠিক সঙ্গত হয়েছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকায় হলেও তাই বলতাম। পরাধীন ইটালি বা আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনীয় ছিল। বিপ্লবে ক্রমবিকাশ যিনি অস্বীকার করেন তিনি বিপ্লবী-বিজ্ঞানকে ভুল ভেবে বসেন। Colonial country বা কাঁচামালের পরাধীন দেশে আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনাই বিজ্ঞানসম্মত পথ। সেইজন্য আমার চোখে তখনকার কমিউনিস্টদের দুটো ভুল চাল হচ্ছিল। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা। এটা ভাবালুতা হতে পারে। কঠোর বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ। আর একটা ভুল—এর বহির্দেশের একটা শক্তির কাছে অন্তরের অনুরাগ বাঁধা দিয়েছিল, সেটা আমার দেশের পক্ষে মঙ্গলের নয়। দেশে সমসমাজবাদ বা সংঘবাদ আসুক, কিন্তু তা পরের অঙ্গুলিসংকেতে হবে কেন?

যাই হোক্, আমরা মেদিনীপুর জেলে থাকতে একটা মন্দ সংবাদ পাই। কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কিছু নতুন ও পুরাতনপন্থী রাজবন্দীরা গোয়েন্দা বিভাগের এক বিশেষ কর্মচারীর সঙ্গে গলায়-গলায় মেলামেশা করছে। এটা একটা মন্দ হাওয়া। এটাকে পাল্টানো চাইই। কিন্তু তা করতে গেলে আমাদের আলিপুরে বদলি হয়ে যেতে হয়। অথচ বদলি হওয়া তো সরকারের ইচ্ছাধীন।

'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের মিল সাধনের কথা আগেই বলেছি। আমার বন্ধুদের মধ্যে এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিল মধু (সুরেন ঘোষ) ও মনোরঞ্জন। আমি মনে করতাম—আমি যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর কিছু করতে নাও পারি, এই মিলিত দল করে দেওয়া হবে আমার শ্রেষ্ঠ অবদান।

'অনুশীলন'-এর অমৃত সরকার সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। আমার সঙ্গে ১৯১৭ সালে তাঁর আলাপ। তখন আমি একবার মেলাবার চেষ্টায় ছিলাম দুটি দলকে। 'অনুশীলন'-এর জিতেশ লাহিড়ী তাঁর একটি ঐতিহাসিক রচনায় সুন্দর বলেছেন, 'ঐ সময়ে যুগান্তরের মাথা থেকে গিয়েছিল, ধড়টা সরকার নষ্ট করে দিয়েছিল। অনুশীলনের মাথা নষ্ট করে দিয়েছিল। ধড়টা বেঁচে ছিল।' মেদিনীপুরে 'অনুশীলন'-এর এঁরা ছিলেন—অমৃত সরকার, মানুষ অতি চমৎকার। বেদান্তবাদী অর্থাৎ বিকারহীন। রবি সেন ছিলেন একজন প্রকৃত বীর। যতক্ষণ তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় নি ততক্ষণ তিনি তাঁর মতো চলেন। একবার যদি বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তাঁর মতো আন্তরিকতাপূর্ণ লোক চোখে পড়ে কম। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর অন্য নাম 'মহারাজ'। মহারাজ তো মহারাজ! হৃদয় অতি বিশাল। বাকি রইলেন প্রতুল গাঙ্গুলী। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। পড়াশুনো ছিল ভালোই। বাক্‌পটু,

হাস্যরসে বিভোর। সতীশ পাকড়াশী নিজেকে নিজে শিক্ষিত করতে সদাই সচেষ্ট। আমার 'ভাঙা কুলো'র নিয়মিত লেখক। লেখার ভাব ও ভাষা চমৎকার। ইনি যে কমিউনিস্ট হয়ে যেতে পারেন সে-সম্ভাবনা আমার চোখে সেদিনই ধরা দিয়েছিল।

'অনুশীলন'-'যুগান্তরের' মিলন আমার খেয়ালপ্রসূত ছিল না। ইতিহাসের চলার পথে, ১৯১০ সালে এবং পরে, একটা সর্ববঙ্গীয় বিপ্লবী দল দুই ধারায় 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তরে' বিভক্ত হয়ে যায়। আদি দল হল 'অনুশীলন'। 'অনুশীলন' নাম না নিয়েও কয়েক জায়গায় দল তৈরী হয়েছিল। এ-সবেরই মাথার উপরে ছিলেন মিত্তিরসাহেব। দলে লোক নেওয়ার কাজে বারীনবাবু আলাদা করে লোক সংগ্রহ করতেন—কিন্তু তখনও মাথার উপরে মিত্তিরসাহেব। অরবিন্দের অনুপ্রেরণা এদের মধ্যে বেশী কাজ করত এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। ১৯০৬ সালে এই দলের মধ্যে বারীনবাবুরা একটি 'দল' করেন। এই দলের সভাপতি হন শ্রীঅরবিন্দ। এটি গুপ্তদলের মধ্যে আর একটি গুপ্তদল। অবশ্য ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য ও পুনঃ পুনঃ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দুটো দলের মধ্যে মিল সম্ভব হয় নি। পুলিনবাবু ও বারীনবাবু প্রায় একসময়ে সহিংস কাজ আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত যাতে দুটো আবার মিলে যায় এই মনোভাব আমার ছিল এবং থাকাও স্বাভাবিক। পূর্বেই বলেছি ১৯১২-১৩ সালে আমাদের কয়েক বন্ধুর চেষ্টায় কথা এগোয়। আমাদের দিকে ছিলেন কামাখ্যা গুপ্ত, নগেন দত্ত, যতীনলোচন মিত্র প্রভৃতি। অপরপক্ষে অমৃত হাজরা। কিন্তু প্রকৃত মিলন সম্ভাবনার পূর্বে অমৃত হাজরা (শশাঙ্ক) রাজাবাজার বোমার মামলায় ১৯১৩ সালে ধৃত হওয়ায় সে-চেষ্টা ফলবতী হতে পারে নি। পুনরায় ১৯১৬ সালে আমার গা-ঢাকা অবস্থায় বরিশালে নতুন প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠের অন্তরীণ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ দুই দলের মেলার কথা বলেন এবং এও জানান যে যদি মিল না হয় তাহলে জানবেন আমাদের মন সংকীর্ণ। নইলে আমরা ঢাকা-অনুশীলনকে টেনে নিতে, পূর্বেকার এক দল আবার হতে পারি না কেন ? তাঁর কাছে উভয় দল তুল্য ছিল। উভয়ের লোকই পরামর্শ নিতে যেত। স্বামী আত্মানন্দ (অনুশীলনের লোক) তাঁর কাছে থাকতেন। স্বামিজী ও যতীন্দ্রনাথ আমার কাছে তুল্য ছিলেন। তাঁর কথাবার্তার ধাঁচ যতীন্দ্রনাথের মতো বীর্যবন্ত ছিল। চোখ বুজে শুনলে মনে হত যেন যতীন্দ্রনাথের কথা শুনছি।

১৯১৭ সালে দুই দল বল হারিয়ে বুঝে-শুঝে এক হয়েছিল। এরই ফলে আমি গৌহাটির বিপ্লবী আড্ডায় যাই। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেখানে থেকে যান।

আবার ১৯২০ সালে নেতারা জেল থেকে রেহাই পেয়ে বেরিয়ে এলে সব ব্যবস্থা

ভেঙে যায়। এরপর 'অনুশীলন' ভুল পথে চলে—গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে বাধা দেয়, গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে না। একবছর বাদে তাদের ভুল ভাঙে। তারা তাদের নেতা পুলিন দাসকে প্রকাশ্যভাবে পত্রিকাগুলির সাহায্যে নিন্দা ক'রে নিজেদের পৃথক নেতৃত্ব গঠন করে। পরে এরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল এবং দেশবন্ধুর কাছে আসনও পেয়েছিল।

যাই হোক, জেলে যখন কথা হল গণআন্দোলনের দ্বারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন দুটো আলাদা দল থেকে লাভ কি? বরং পরস্পরের সাহচর্যের অভাবে লোকসান হতে পারে। মেদিনীপুর জেলে উভয়পক্ষের লোক প্রায় আঠারো-জন ছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে ও উভয় দলের মধ্যে বহুদিন আলাপ-আলোচনার পর মিলন স্থির করেন। এঁদের এই মতিস্থিরতার পর আমি আমার কথা দিই। এখানে ঠকাঠকির কিছু ছিল না। উভয়ে মিলিত হলে সুরেশ দাসের 'কর্মীসংঘে'র আর প্রয়োজন থাকে না, তাই সেটা উঠে যায়। কেউ কাউকে ঠকিয়ে কর্মীসংঘ ভাঙে নি। এবার বড় আশা নিয়ে নতুন করে কাজে ঝাঁপ দেওয়া হল। আমরা জেলে থাকার কালে বন্ধুবর সুরেশ দাস দু'দলের কর্মীদের নিয়ে 'কর্মীসংঘ' গড়েন। কাজ ও ফল ভালোই হতে থাকে। প্রকাশ্য আন্দোলনের নেতারা কর্মীদের সমঝে চলতে থাকেন। হুকুম দিলে দাসগণ তাই তামিল করবে এ-ধারণা ক্রমশঃ বদলাতে বাধ্য হন। কর্মীদের একটা মর্যাদা ফুটে বেরোয়। 'কর্মীসংঘের' কাজ এদিক থেকে প্রশংসনীয় ছিল।

দুটো দল এক হলে নরেন সেন (এখন স্বামিজী) ও আমি যুক্তদল চালনার ভার পাই। কলকাতায় কংগ্রেস ১৯২৮ সালে হয়। এখানে উভয় দলের মধ্যে পুরানো রোগ আবার চাগান দেয়। বহু ছেলের সমাগম দেখে ছেলেধরার ঝোঁক দেখা দিল। তারপর কর্তৃত্বপ্রিয়তার দিক থেকেও দুর্বলতা প্রকাশ পেল। প্রমাণ হল—বন্ধুদের মুখ মেনেছিল, অন্তর মানে নি মিলন। একথা ক্রমে প্রকাশ পেল। সেই শ্মশানবৈরাগ্যই এদের কাল হল। দু'দল এক থাকায় এবং তাদের বিরোধিতার চাপে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজাধীনে স্বরাজ একবছরে না পেলে পূর্ণ স্বাধীনতা চাইবেন এই শর্ত দিয়ে রেজোলিউশন পাস করান।

যাই হোক, আমরা আলিপুর জেলের আবহাওয়া বদলে নিতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে সুবিধা এসে গেল। মেদিনীপুর থেকে আমরা কয়েকজন এলাম। আমি, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুর থেকেও কয়েকজন এসে গিয়েছিলেন। আলিপুরে ছিলেন নরেন সেন। তখন নাম হয়েছে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। বহরমপুর থেকে এলেন অমূল্য অধিকারী, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আমি আসার কয়েকদিনের মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটে। তখন আমার অন্য বন্ধুরা এসে পৌঁছোন নি। সেখানে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের বড় গোয়েন্দা বা বড়সাহেব গ্রীনফিল্ড এক একজনকে অফিসে ডেকে পাঠায়। সানন্দে ও আগ্রহে বিদ্রোহী সংসদের কয়েকটি যুবক তার সঙ্গে পর পর দেখা করতে যায়। পরে আমার ডাক আসে। আমি সাফ বলে দিই ঐ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া আমার পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করি। আমি যাব না। লোকটা ফিরে যায়। আরও কয়েকদিন পরে ইণ্টেলিজেন্স বিভাগের বড় গোয়েন্দা ভূপেন চট্টোপাধ্যায় জেল-অফিসে আসে। জেলার এসে সংবাদ দেয়। অমনি তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার উল্লাস পড়ে যায়। সেদিন সে কাউকে ডাকল না। দু'দিন পরে আবার এল এবং আমাদের থাকার জায়গায় (ওয়ার্ডে) এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি দেখা করতে নারাজ হলাম। সে চলে গেল। এবার আমি ওয়ার্ডে বলে দিলাম—এরূপ লজ্জাকর মনোবৃত্তি আমাদের ত্যাগ করতে হবে। এ হৃদয়-দৌর্বল্য চলবে না। নরেন সেন খুব খুশি হলেন। তিনি তো নিজে তেজীয়ান লোক এবং এইরূপ পরিবর্তন চাইছিলেন। এরপর মেদিনীপুর ও বহরমপুর থেকে বন্ধুরা আসায় নরক ভেঙে স্বর্গ সৃষ্টি হল।

পরামর্শ করে ঠিক হয় বিষিয়ে-যাওয়া জেলের হাওয়ার মধ্যে একটা ভালো জায়গা রাখতে হবে। সেখানে প্রাণ খুলে আলাপ করা যাবে। তাই দোতলায় আমি বেনে-মসলার দোকান খুললাম। অর্থাৎ যত রকম-বেরকমের লোককে আমার সঙ্গে থাকার জায়গা দিলাম। নীচের তলায় 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'-এর বাছা বাছা লোকেদের জায়গা করে দেওয়া হল। রাজনীতি আলোচনার প্রয়োজন হলে তা হত এইখানে। ওপরে পড়াশুনা, গান বা খোশগল্প চলত। পুলিসের অনুচর যারা হয়ে পড়েছিল তারা বিপদ গনল। আমার ভালোমানুষি তাদের পক্ষে ভালো হল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলতেন তিনি জেলের মালিক। অথচ জেলে যা ঘটে তা তিনি জানতে পারতেন না। গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে জানাত—তিনি অপ্রস্তুত হয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে অপ্রিয় ঘটনার কৈফিয়তও দিতে হত। অতএব সবাই সাবধানে থাকতেন।

সাধনমার্গ মাত্রেই দেখা যায় কোনো কোনো সাধকের স্খলন হয়েছে। এ পথেও তার ব্যত্যয় হয় নি। ভালো লোক অবস্থার ফেরে দুর্বল চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে ঠিক উলটো পথে গেছে। আমার একটা নিয়ম ছিল—ভালো লোক বলে যাদের জানি তাঁরা যদি দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করে ফেরেন বা বহুকাল গাটছড়া-কাটা হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের আবার নতুন করে পরখ করে তবে কাজে নিতে হবে। কেউ কেউ এর জন্য আমায় বলতেন অতিশয় সাবধানী। ব্যাপারটা ভাবাতিশয্যের বাইরে

নির্জলা কঠোর সত্যকে আশ্রয় করে চলার আগ্রহ মাত্র। একের দুর্বলতায় সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি যে বিনষ্ট হবার ভয় ছিল।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের জানাশোনা একজন ভালো কর্মী এক ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়। তার দীর্ঘ মেয়াদ হয়। প্রায় সাতবছর বাদে সে মুক্তিলাভ করে। তাকে ফেরার পর বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু তার কাজ করার আগ্রহ পূর্ববৎ দেখা যায়। কিছুদিন পরখ করে তাকে আবার কাজের মধ্যে নেওয়া হয়। এবার ১৯১৬ সালে তাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়। সে বলে সাংহাইয়ে অবনী মুখার্জীর সঙ্গে তার দেখা হয়। তারপর সে ওখানে গ্রেপ্তার হয়ে যায়। ১৯২০ সালে সকলের মুক্তির সঙ্গে সেও মুক্তিলাভ করে। ১৯২২ সালে সে আবার আমায় ধরে তাকে কাজে নিতে। তাকে বলি, আমরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি, অতএব পূর্বপথ পরিত্যক্ত হয়েছে। সে আমার কথা বিশ্বাস করে না। কিছুদিন বাদে বাদে আমায় পূর্বোক্তভাবে আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলত। তারপর সে নাম বদলে ইউ. পি. ও পাঞ্জাবে সরকারী গোয়েন্দা হয়ে যায়। কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় নাম নিয়ে সে কুকীর্তি করত। সকলেই সে কথা জানতে পারে।

তরুণ বিদ্রোহী যারা দক্ষিণেশ্বর মামলায় আসামী ছিল তাদের বিচারে সাজা হয়ে গেল। তাদের কিছু সহকর্মী রাজবন্দী হয়ে এসেছিল। উত্তরপাড়ার ছেলে ছিল অনেকগুলি। তাছাড়া চট্টগ্রামের সূর্য সেন, নির্মল সেন, চারুবিকাশ দত্ত, প্রতাপ রক্ষিত প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আসেন।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার কথা কিছু বলি। কলকাতার শোভাবাজার স্ট্রীটে এবং দক্ষিণেশ্বরে বাচস্পতি পাড়ায় কয়েকজন বিপ্লবী যুবক থাকত। পুলিসের গোয়েন্দা একটি ঘাঁটি বের করে ফেলে। ১০ই নভেম্বর ১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে যারা ধরা পড়ল তাদের নাম নিখিল ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জী, সুধাংশু চৌধুরী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী, অনন্তহরি মিত্র, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, রাখাল দে, হরিনারায়ণ চন্দ, রাজেন লাহিড়ী। এখানে তল্লাশিতে কিছু বিস্ফোরক পদার্থ, একটি বোমা ও একটি রিভলভার পাওয়া যায়। রাজেন লাহিড়ী ইউ. পি.-র কাকোড়ি ষড়যন্ত্রের পলাতক আসামী। এখানে বোমা-তৈরি শিখতে এসেছিল। শোভাবাজারে ধরা পড়ে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্ত চক্রবর্তী।

১৯২৬ সালের ৯ই জানুয়ারি মোকদ্দমায় দক্ষিণেশ্বরের নয়জনেরই সাজা হয়। হরিনারায়ণ চন্দকে নেতা মনে করা হত। রাজেন লাহিড়ী, হরিনারায়ণ চন্দ, অনন্তহরি মিত্রের দশবছর দ্বীপান্তর; নিখিল, রাখাল, ধ্রুবেশ ও বীরেনের পাঁচবছর এবং সুধাংশুর দুবছর মেয়াদ হয়। রাজেন লাহিড়ীকে ইউ পি-তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানের বিচারে তার ফাঁসি হয়। প্রমোদ এবং অনন্ত চক্রবর্তীর পাঁচবছর সশ্রম কারাবাস হয়।

একটা ঘটনা লক্ষণীয়। রাজেন লাহিড়ী কাশীর লোক, শচীন সান্যালের দলস্থ ব্যক্তি। সে এখানে এল কি করে? ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে মিরাটে ইউ. পি.-র বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত সম্মিলন হয়। সেখানকার সিদ্ধান্ত অনুসারে সে বোমা প্রস্তুত শিখতে এখানে আসে। ১৯২৩ সালে দিল্লী কংগ্রেসে শচীন সান্যাল উপস্থিত থাকে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পরিবর্তনবিরোধী মনোভাব (no-change policy) দেখে সে কংগ্রেসের উপর আস্থাহীন হয়ে পড়ে এবং পূর্বেকার সহিংস পথে আবার আগুয়ান হয়। দিল্লী ও বাংলার বাঙালী যুবকদের সঙ্গে সে পরামর্শে লিপ্ত হয়। শচীন 'অনুশীলন'-এর কিছু কিছু প্রভাবশালী সভ্যের সহানুভূতিতে কলকাতায় দল-পুষ্টি করতে আসে। দক্ষিণ কলকাতায় একটি বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। তাদের প্রধান ছিল সুশীল ব্যানার্জী, দেবেন বসু এবং যতীন দাস। 'অনুশীলন'-এর যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর, শচীন কর—শচীনের সঙ্গী।

১৯২২ সালে আমাদের সহকর্মী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে একটি প্রস্তাব আনেন। তিনি বলেন দক্ষিণ কলকাতায় একটি ঝাঁক আছে। তারা আমাদের সঙ্গে মিলতে চায়। তাদের একটি অনুরোধ, তারা যেন আগ্নেয়াস্ত্র-ব্যবহার শিক্ষা বজায় রাখতে পারে। আমি অসম্মতি জানালাম। বলে পাঠালাম আমরা এখন কংগ্রেসে যোগদান করেছি—Non-violence as policy—অহিংসাকে সাময়িক একটা নীতি বলে মেনে নিয়েছি। এসময় নিয়ম ভঙ্গ করা চলবে না। তাছাড়া গণশ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারলে বিপ্লব আসবে না। সাতকড়ির কথা তারা শুনল এবং কতকাংশে বুঝল। ফের বলে পাঠাল যে তারা অস্ত্র ব্যবহার করবে না, তবে সুবিধা ও সুযোগমতো সংগ্রহ করে রেখে দেবে। আমি এতেও রাজী হলাম না। বললাম, ইউরোপের শক্তিরা armed neutrality (সশস্ত্র পক্ষপাতহীনতা) করতে গিয়ে বরাবর ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের দিকের ঝোঁক এখন বন্ধ রাখাই নীতিসঙ্গত। এতে তাদের মন সায় দিল না। এই ঝাঁকটি হচ্ছে যতীন দাস প্রভৃতির। আমরা ধরা পড়ার পর ১৯২৪ সালে শচীন সান্যাল কলকাতায় আসে। তার ব্যক্তিগত নাম-যশ যথেষ্ট ছিল। তার সঙ্গে এরা যুক্ত হয়। 'অনুশীলন'-এর কিছু লোক এবং এরা শচীনের সঙ্গে থাকায় শচীন প্রথম সাদা ইস্তাহার প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়—'The object of the Association is to establish a federated republic of the states of India by an organised and armed revolution, that the final form of the constitution of the republic be framed and declared by the representatives of the people at the time when they will be in a position to enforce their decisions, that the basic principle of the republic shall be universal suffrage and the abolition

of all systems which make exploitation of man by man possible.' এটি সর্বসাধারণে বিতরিত হয়।

এরপর হরিদ্রাভ পত্রিকা (Yellow leaflet) প্রকাশিত হয়। এটি সভ্যদের মধ্যে প্রচারিত হত। দলের নাম হয় 'হিন্দুস্থানী সেবাদল'। শচীন এইসব কারণে রাজদ্রোহের অপরাধে সে দু'বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এরই ফেঁকড়া হিসেবে রাজেন লাহিড়ী দক্ষিণেশ্বর দলে মিশতে পায়।

আমি মেদিনীপুর থেকে রাজবন্দীদের ডাক্তার হয়ে যাই। আলিপুরে এসেও সেই কাজ করতাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা রাজবন্দীদের রাজ-মেজাজের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বন্দীদেরই একজনকে তাদের কাজে রেখেছিল। আলিপুরে এদের দেখা ছাড়া অন্যান্য কিছু রোগীও আমায় দেখতে হত। একদিন আমি জেল-হাসপাতালে সাধারণ কয়েদীদের দেখতে গেছি, সেখানে একটি অতি কম বয়সের ছেলেকে দেখি। নাম জিজ্ঞেস করতে বলে ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায়। 'কী মামলায় জেল হয়েছে?' 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায়।' আমার বুকটা ফেটে পড়তে চাইল। ধ্রুবেশ অমরদার অতি পরিচিত। আমি আমার সাধারণ পোশাকে। আর সে? সাধারণ কয়েদীদের পোশাকে। কী করেছে সে অপরাধ? আমি ও সে তো এক কাজের কাজী। কেন তাদের হেয় করবে ওরা? কী অধিকার আছে ঐ বঞ্চক বিদেশীদের? ঐ পরস্বাপহারীদের? বিদ্রোহে, ক্ষোভে, ক্রোধে মন গরগরিয়ে উঠল। খুঁজতে লাগলাম পথ, যাতে ওদের ঐ হীন অবস্থার উন্নতি করে দিতে পারি।

উপলক্ষ জুটতে খুব বেশী বিলম্ব হল না। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বোঝালাম এরা কী সুন্দর ছেলে। এ'দের নৈতিক-চরিত্রহীন কয়েদীদের পর্যায়ে কোনোমতে ফেলা চলে না। এদের কদর্য আহার দেওয়া চলবে না। পরনের পোষাকের ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া দরকার, থাকার জায়গা এবং গাত্র পরিষ্কার রাখার সুখ-সুবিধা দিতে হবে। তিনি বলেন, সরকারকে দরখাস্ত করে অনুমতি আনালে তিনি অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন। আমি জানতাম সরকার কী বস্তু। একটা হৃদয়হীন যন্ত্র মাত্র। তাঁকে নিয়ে লেগে রইলাম। তিনি আইনের বই দেখলেন—বললেন যে এরা শিক্ষিত। যদি ইউরোপীয় ঢঙে খাওয়া ও পোশাক নিতে রাজী হয় তাহলে সরকারকে না জানিয়েও তিনি এদের ইউরোপীয় বন্দী বানাতে পারেন। আমি কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের সম্মতি আনাই। এদের সঙ্গে কথা কই, এরা রাজী হয়। এদের ইউরোপীয় মর্যাদায় উন্নীত করা হল। অনেক সুখ-সুবিধা এরা পেল এবং আমাদের বাসস্থানের কাছে এরাও বাসস্থান পেল। সুধাংশু রায়চৌধুরী এদের সঙ্গে ছিল। সাহেবকে বলে তাকে চিত্রাংকনের রং, তুলি প্রভৃতি দেওয়াই। আজ সে একজন

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। আমাদের সঙ্গে ছিল চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। সেও আর একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।

আগেই বলেছি গোয়েন্দা বিভাগের দুর্বলতা-বিস্তারী প্রভাব আমরা বিদূরিত করি। ভূপেন চট্টোপাধ্যায় আর আমাদের বাসস্থানে আসত না।

রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে (নরেন সেন) বর্মায় বদলি করার চেষ্টা হয়। তাঁর শরীর অসুস্থ থাকায় অনেক তারিখ বাতিল করতে হচ্ছিল। এবার সরকার দৃঢ়সংকল্প। সেজন্য তাঁকে জেল-হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। সেদিন ঠিক হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ে ভূপেন চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ এসে উপস্থিত। ব্রহ্মচারীর অসুখ, তাই নাকি দেখতে এসেছিল। সেটা ১৯২৬ সালের মে মাসের শেষের দিক হবে।

ব্রহ্মচারী আমাদের বাসস্থানের পিছনের দরজা দিয়ে হাসপাতালে যান। ভূপেনবাবু সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ফিরে যাবার পথে দক্ষিণেশ্বরের আসামীদের দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয় এবং হাসপাতালে মারা যায়। পূর্বে ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে দেখলে এরা গাইত, 'তোমায় নেয় না কেন যম!'

বিষম ব্যাপার। পাগলা-ঘণ্টা বাজল আমরা সবাই বন্ধ হলাম। রাত্রে গোয়েন্দা বিভাগের বড়সাহেব লোম্যান নিজে তদন্ত করতে আসে। পরের দিন আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে এক একজন গোয়েন্দা কর্মচারী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। কিন্তু তাদের মোকদ্দমার সুবিধা হওয়ার মতো কিছু পায় নি।

ফিরিঙ্গী দুজন কয়েদী (যারা কিছুই চোখে দেখে নি) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আমাদের এখানে সাধারণ কয়েদী যারা ছিল তারাও কিনারা হবার মতো কিছু বলে নি। তাদের জেল-কর্তৃপক্ষ অনেক সাজা দেয়, তবু তারা অটল থাকে। একটি মুসলমান কয়েদীকে কয়েকজন বন্ধু বেত-বোনা শিখবার জন্য নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে আমাদের মধ্যে এনে রাখে। খালি সেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে নিজের মুক্তি লাভ করে। তরুণ বন্ধুদের আবার পদচ্যুতি হয়। পুনরায় সাধারণ কয়েদী।

মোকদ্দমায় আসামীপক্ষ সমর্থনের যোগ্য সবকিছু উপাদান আমরা গোপনে উকিলদের কাছে, বিশেষ করে ব্যারিস্টার এ. সি মুখার্জীর কাছে পাঠাই। তার ফলে অনেকের সুবিধা হয়। শেষ পর্যন্ত দুজনের ফাঁসি হয়। তারা—প্রমোদ চৌধুরী এবং অনন্তহরি মিত্র। অনন্ত এই নিধন ব্যাপারে একদম নিরপরাধ ছিল।* এই মোকদ্দমার সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানাই। আমরা যেখানে থাকতাম

* ১৯৬৪ সালে বন্ধুবর কালীচরণ ঘোষ সারা ভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের জীবনী সংগ্রহ করে বই ছাপাচ্ছিলেন। তিনি এপ্রিল মাসে রাঁচিতে আমার কাছে পাণ্ডুলিপি দেখাতে আনেন এবং বলেন, অনন্তহরি জেলওয়ার্ডারের ব্যাটন দিয়ে ভূপেন চ্যাটার্জীকে মারে। এই কথা তার সহকর্মীদের কাছে জেনেছেন।' —লেখক

তার নাম ছিল 'ছিকলিগেশন ইয়ার্ড' (Segregation Yard)। আমাদের ইয়ার্ডের পূর্বে কুড়িটি সেলযুক্ত দোতলা বাড়ির নাম 'ইউরোপীয়ান ইয়ার্ড'। আমাদের ইয়ার্ড থেকে দক্ষিণ দিকে একটি গলিপথ জেল-অফিসে গেছে। 'সিগ্রিগেশন' থেকে বেরিয়েই যে ইয়ার্ড পূর্বে পড়ে, সেইটিতে দক্ষিণেশ্বরের কয়েদীরা থাকত। তাদেরও পূর্বে বোমা-ইয়ার্ড। সেখানে আন্দামান-ফেরত নরেন ঘোষচৌধুরী প্রভৃতি থাকত।

ঘটনার দিন সিগ্রিগেশন ইয়ার্ড থেকে ভূপেন চট্টোপাধ্যায় যেই অফিসের পথে বেরিয়েছে—রামরাজ ওয়ার্ডারকে দিয়ে চাবি খুলিয়ে যুবকরা গলিপথে এসে চ্যাটার্জীকে আক্রমণ করে। লোহার ডাণ্ডা প্রমোদের হাতে ছিল। কিন্তু প্রহারের পূর্বে এটি অপর কারু হাতে ছিল।

মোকদ্দমায় রামরাজ ওয়ার্ডার বলে, 'আমাকে ঠেলে ফেলে চাবি কেড়ে নেয়। বুকে পা দিয়ে চেপে ধ'রে বাঁশি ছিনিয়ে নেয়। অনন্তহরির হাতে প্রথমে লোহার শাবল ছিল, পরে প্রমোদ সেটি নেয়।'

৯ই জুন বিশেষ আদালতে বিচার আরম্ভ হয়, দশজনেরই সাজা হয়। প্রমোদ, বীরেন, অনন্তহরির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। বাকী সাতজনের হয় দ্বীপান্তর।

হাইকোর্টে আপীল হয়। সুধাংশু, নিখিল, হরিনারাণ, বীরেন ব্যানার্জী, দেবীপ্রসাদ নির্দোষ সাব্যস্ত হয়। ধ্রুবেশ, রাখাল, অনন্ত চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। অনন্তহরি মিত্রের ফাঁসির রায় বাহাল থাকে।

প্রমোদ সম্বন্ধে দু'জনের দু'মত হয়। একজন বলেন দ্বীপান্তর যথেষ্ট, অপরজন বলেন ফাঁসিই ঠিক। এজন্য বিচারটি প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠানো হয়। প্রমোদেরও ফাঁসির হুকুম হল—১৯২৬ সালের ৯ই অগস্ট।

মোকদ্দমা চলার সময় এদের আমাদের থেকে বহুদূরে রাখা হয়েছিল। আমরা ভালো আহার্য এদের কাছে পাঠাতাম। জেলে ভারী কড়াকড়ি। কে পেঁছে দেবে? সেই যে বলেছিলাম, পাছে ইংরেজের রাজ্য কেড়ে নেয় সেইজন্য নরেন ঘোষচৌধুরীকে ওরা জেলে রাখাই সাব্যস্ত করেছিল। নরেন কিন্তু জেলে নিজ রাজ্য বিস্তার করে বসেছিল। তার সাহায্যে আমরা প্রয়োজনমতো ভালো খাদ্যদ্রব্য ঐ আসামীদের কাছে পাঠাতাম। জেলের পশ্চিম দিকে ছিলাম আমরা, মধ্যে নরেনেরা, পূর্বধারে আমাদের তরুণ বন্ধুরা। কিন্তু নরেনের দৌলতে খবরাখবর বজায় ছিল। তরুণদের সঙ্গে মতের মিল না থাকলেও মনের কুশলতা আমরা বজায় রেখেছিলাম।

এরপর এল অবধারিত ফাঁসির দিন। আমার অদৃষ্ট এমনই যে কয়েকবার বধ্য-ভূমির কাছে আমার থাকার জায়গা হয়েছিল—মেদিনীপুর, প্রেসিডেন্সি, দার্জিলিং এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আলিপুরে ফাঁসির ব্যবস্থার সূচনা দেখতে লাগলাম। মনে হতে লাগল আমাদের চোখের সামনে ফাঁসি দেবে—কি করে তা সইব? ওরা হয়তো

আমাদের রীতিমতো শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। 'তোদের দেশের সৈন্য—তোদের ভাইদের তোদের সামনে গলায় দড়ি দিয়ে লটকে দিলাম, কি করতে পারলি তোরা?' কী অসহায় অবস্থা সেদিন আমাদের!

এই জেল থেকে আমাদের বদলি করার জন্য আমরা সরকারকে লিখলাম। দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়ে এল। অনেক চেষ্টা করলাম—অন্য জেলায় না নিয়ে যায় ক্ষতি নেই, কলকাতার অপর জেলটায় না হয় নিয়ে যাক। না, কর্তারা তাতেও রাজী নন। বুঝলাম আমাদের হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়ে দেবে যে তারা নিগ্রহ-অনুগ্রহের মালিক। আমরা শুধু অসহায়তার পুঁটুলি।

ফাঁসির ঠিক কিছুদিন আগে কোনো এক কর্তার মানব-হৃদয়ের একটা তারে বুঝি কিছু ঝংকার লেগেছিল। আমাদের দুঃখ দূর করার জন্য এইটুকু অনুগ্রহ জানানো হল যে, ফাঁসির তারিখের পূর্বদিন অপরাহ্নে আমরা হাসপাতালে রাতটা কাটাতে পারব। পরদিন প্রত্যূষে ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর নিজেদের বাসস্থানে ফিরে আসতে হবে। কি কর্তব্য? এই অনুগ্রহটুকু গ্রহণ করব কি করব না হল সমস্যা।

আমাদের পরামর্শসভা বসল। অকস্মাৎ যেন এক দৈবী প্রতিভা আমাদের মাথায় খেলে গেল। আচ্ছা, আমাদের লোকদের পূর্বে ফাঁসি হয়ে গেছে—তারা কেমনভাবে ফাঁসির সম্মুখীন হয়েছিল? জেল-সেপাই (ওয়ার্ডার) বিশেষের মুখে শোনা কথায় বিশ্বাস করে তাদের বীরত্ব সম্বন্ধে মনে মনে অপরূপ ছবি এঁকে রেখেছি। স্বচক্ষে কেউ তো তা দেখি নি। প্রত্যক্ষদর্শীর ঐতিহাসিক আলেখ্যের মূল্য কত বেশী। নারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এইটুকু শুনে বললে, 'শুধু তাই নয়—মৃত্যুর সম্মুখীন বীররা যদি নিজেদের সহকর্মীদের অভিনন্দন পায়, সেটা আরো চিত্তজয়ী ব্যাপার হবে। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বোধ হয় নেই। আসুন আমরা তাই করি।' অতি সুন্দর পরামর্শ। ইংরেজ সরকার চেয়েছে আমাদের বুকে দুঃখের পেরেক ঠুকে অমানুষিক আনন্দ লাভ করবে। আমরা ঠিক তার উল্টোটা করে দেব। যখন আমরা আমাদের বীরদের শেষবারের মতো অভিনন্দন করব, তারা নিরুদ্দেশের পাড়িতে সোল্লাসে জয়লাভ করবেই। এমনিই তো তারা বীর। আমাদের অভিনন্দনে তাদের বীরত্ব শতগুণে বেড়ে উঠবে। ইংরেজ সরকারের পৈশাচিক আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হবে।

এই কথাই রইল। আমরা হাসপাতালে যাওয়ার অনুগ্রহ নিলাম না। রাত্রে একতলা ও দোতলার বন্ধুরা জেল-কর্তৃপক্ষকে ব'লে-ক'য়ে দোতলায় বন্ধ রইলাম। দুটি ফুলের তোড়া জোগাড় করে রাখলাম।

জেলের আইন ভেঙে সারারাত আমরা, নরেনরা, ফাঁসির আসামীরা এবং অন্য সকলে দেশপ্রেমোদ্দীপক গান ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করে রাখলাম—'তোমার জন্য হব ধন্য—ওদের বেত্রাঘাতে, কারাগারে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে...'

অতি ভোরে মশানভূমিতে আলো জ্বলে উঠল। তারপর এল সশস্ত্র কতকগুলি সেপাই। তারা বধ্যভূমির চারপাশে রাইফেলে সঙ্গিন লাগিয়ে দাঁড়াল। তারপর এলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আরও কয়েকটি লোক। এঁরা বোধ হয় সরকারের তরফ থেকে সত্যকার ফাঁসির সাক্ষী হতে এসেছিলেন। জল্লাদ ক্যারিক ও একজন ইউরোপীয় ওয়ার্ডার—এসে হাজির হল। জেলার বড় রায়নসাহেব ও আর একজন ইউরোপীয় ওয়ার্ডার মায়ের জন্য সমর্পিতপ্রাণ বীর দুটিকে নিয়ে আসছিল। প্রত্যেকের হাতদুটি পিঠ-মোড়া করে হাতকড়ি দিয়ে বাঁধা। অন্য ফাঁসির আসামীদের বাহু ধরে নিয়ে আসতে হয় বধ্যভূমিতে। তাদের পায়ে তখন তারা যেন চলতে পারে না— এমনই অশক্ত হয়ে পড়ে তারা মৃত্যুভয়ে। কিন্তু এরা সবাইকে অবাক্ করে দিয়েছিল। যারা আনতে গিয়েছিল, গতিবেগে তাদের পিছনে ফেলে অনেকটা যেন ছুটে-ছুটে আসছিল। মুখে অনবরত 'বন্দেমাতরম্', 'ভারতমাতাকি জয়', 'স্বাধীন ভারতকি জয়'। আর আমরা? আমরাও ক্রমাগত ধ্বনির পর ধ্বনির প্রতিধ্বনি দিচ্ছিলাম। কখনও ভাবোচ্ছ্বাসে বলে উঠছি 'চলেরে বীর—চলে', 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'। তাদের আনন্দোজ্জ্বল উল্লম্ফনযুক্ত গতি দেখে মনে হচ্ছিল যেন চিররহস্য যে-মৃত্যু তাকে ভেদ ক'রে তাদের প্রাপ্য বরণমালা পরার পাগল হয়ে এই অসাধারণ প্রেমিকেরা ছুটে চলেছে—মহামিলনভূমিতে, বধ্যভূমিতে নয়।

বীরেরা, না না—দেবতারা এল। ফাঁসির মঞ্চে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াল। মুখে অবিরাম 'দেশমাতার জয়', 'বিপ্লবের জয়'। দেখতে দেখতে বিপুল হর্ষে তাদের বুকগুলো ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেল। তাদের পা'দুটিতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হল, যেন তারা পা ছুঁড়তে না পারে। ফাঁসুড়ে এইবার তাদের মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা সাদা টুপী পরিয়ে দিল। যেন তারা না জেনে যায় কোন্ ব্যক্তি তাদের গলায় দড়ি দিয়েছিল। কারণ তাদের চোখমুখ যে ঐ টুপীতে ঢাকা থাকবে। তারপর গলায় দড়ির ফাঁস গলিয়ে কষে দিতে লাগল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চস্বর থেকে নিম্নস্বরে নেমে আসতে লাগল। শেষকালে মাত্র 'ব' শোনা গেল। আমরাও সময় বুঝে 'মাতৃভূমির সন্তানবীর, আবার আসিয়ো ফিরে' বলে ফুলের তোড়াদুটি তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। ফুল ছড়াতে লাগলাম। ততক্ষণে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোটের পকেট থেকে রুমাল তুলে ইঙ্গিত করতে, ফাঁসুড়ে ক্যারিক লেভার (ফাঁসিকলের লোহা) টেনে দিয়েছিল।

দেশের মানিকদুটি যেন ঝাঁপিয়ে অদৃশ্য হল অজানাকে জানার জন্য।...বন্দে-মাতরম্...

পরের পরের দিন বাংলা সরকারের দপ্তর থেকে জোর অনুসন্ধানের হুকুম এল, কেন আমাদের বধ্যভূমির কাছে থাকতে দেওয়া হয়েছিল?

গোয়েন্দা বিভাগের এই অসাধারণ কৃতী কর্মচারীর হত্যা নিয়ে সরকারী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য পড়ে যায়। আলিপুর জেলের তদানীন্তন প্রধানকর্তা মেজর মালেয়াসাহেবকেও আসামী-শ্রেণী করার কথা কেউ কেউ তুলেছিলেন। তাঁর এই কয়েদীদের সঙ্গে ঢিলে বা সদ্ব্যবহার সন্দেহ উদ্রেক করেছিল। তাঁর নিজের অধিকারে যতটা এদের সুখ-সুবিধে দেওয়া যায় তা তিনি এদের দিয়ে ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হিউ স্টিফেন্‌সন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের আদেশ দেন।

জেলে ও হাসপাতালে থাকাকালীন আমার সঙ্গে আমেরিকার কয়েকটি সজ্জন ও মহিলা দেখা করতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিস্‌ ম্যাক্‌লাউড। ইনি স্বামী বিবেকানন্দকে এবং অধুনা বেলুড় মঠকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। লর্ড লিটন মেদিনীপুর জেলে সাক্ষাৎকালে আমায় যে বলেছিলেন, 'We have a common friend.—আমাদের দুজনেরই একজন সাধারণ বন্ধু আছেন'—তিনিই এই মিস্‌ ম্যাকলাউড। আর্ল ব্রুন্টার আর তাঁর পত্নী ও কন্যা আসতেন। ইংলণ্ডের রিশ ডেভিস দম্পতির ন্যায় এঁরাও আমেরিকার সুবিদিত বৌদ্ধধর্ম-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর একজন এসেছিলেন মিসেস হ্যানলি, ইনি আমেরিকার এক বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রী—এসে উঠেছিলেন লিটনের লাটপ্রাসাদে। সেখান থেকে আসতেন আলিপুর জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

এই সাক্ষাতের ব্যাপারে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একদিন মিস্‌ ম্যাক্‌লাউড এসেছিলেন। আমাদের মধ্যে কি কথা হয় তাই শোনাবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন সর্বোচ্চপদস্থ কর্মচারী আর্মস্ট্রং। ধনগোপাল সেই সময় একবার ভারতে আসতে চাইছিল। আমার সম্মতির অপেক্ষা করছিল। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধে আমায় এখানে ধরতে না পেরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ভেবেছিল ওদের অত তাড়াহুড়ার ফলে ভারতে আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব—আমি অবশ্যই গোপনে আমেরিকায় গিয়ে থাকব। তাই তাদের বড় কর্মচারী ডেন্‌হ্যাম সেখানেও আমার খোঁজ-খবর আরম্ভ করে। আমেরিকা সরকারের অনুমতি নিয়ে বহু ভারতবাসীর গৃহে খানাতল্লাশি সুরু করে। ধনগোপালের বহু বিড়ম্বনা এদের হাতে হয়। আমার নামে মিথ্যা 'Violation of Neutrality Act' মামলা ক'রে extradition-এর ব্যবস্থা করে। এই দিন জেলে আমাদের কথাপ্রসঙ্গে ধনগোপালের ভারতে আসার কথা ওঠে। মিস্‌ ম্যাক্‌লাউড খপ্‌ করে আর্মস্ট্রংকে জিজ্ঞাসা করে বসেন, 'ধনগোপাল ভারতে এলে ধরা হবে কি ?' আর্মস্ট্রং বলেন—ধনগোপাল যে-কাজ আমেরিকায় ভারতের হয়ে করেছে তা হচ্ছে borderline জাতীয়। অর্থাৎ আইনের গণ্ডিতে প'ড়েও পড়ে না। তবে যখন সে বোম্বাইয়ে এসে নামবে তখন এখানকার

সরকার কী কর্তব্য ফিরে ভাববে। এই কথার পর আমি ধনগোপালকে ভারতে আসা বন্ধ রাখতে লিখি।

আর একদিন ব্রুণ্টাররা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেদিন একজন সাধারণ বাঙালীর পোশাকে একটি গোয়েন্দা ছিল। আর্ল ব্রুণ্টার তাকে গোয়েন্দার লোক বুঝতে পারেন নি। আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে দেশ-বিদেশের আলাপ সুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল, তবু কোনো ইংরেজ কর্মচারীকে না দেখে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কি স্বরাজ হয়ে গেছে? কোনো গোয়েন্দা উপস্থিত নেই যে, অথচ আমরা আলাপের পর আলাপ চালিয়ে যাচ্ছি?' আমি তাঁকে পাশের লোকটিকে দেখিয়ে দিলে তিনি ব্যাপারটা বুঝলেন। অর্থাৎ বেশী প্রাণ খুলে আলাপে অনবহিত হওয়া যে তাঁর ঠিক হয় নি সেটাই বুঝলেন। তিনি আমায় আলোচনা-প্রসঙ্গে সিংহলদ্বীপে একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টার কথা বলেন। কলকাতার বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপালের ভাই তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে অভিযুক্ত হন। পরে তিনি খালাস পান। ব্রুণ্টার বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য বহুদিন সিংহলে ছিলেন। উপরোক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে প্রশ্ন করেন, তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তিনি উত্তর দেন, 'আমি নাগরিকের কর্তব্য করছিলাম; সেও একটা তপস্যা।' বললেন—আমিও যেন ঐরূপ উত্তর দিই, যদি কেউ আমার জেলে যাপিত দিনগুলির সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জানায়। ভাবলাম, ব্রুণ্টার সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা দেশ-বিদেশের সঙ্গে না-পারি যুদ্ধঘোষণা করতে, না-পারি শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ থাকতে। আমাদের কোনো শক্তিই নেই। আমাদের রাজনীতি তবে আর কোথায়? যা করি তা ভারতের নাগরিকের কর্তব্যই বটে।

প্রমোদ ও অনন্তহরির ফাঁসির কয়েকদিন পরে মালেয়াসাহেবকে জেল-কর্তব্য থেকে অপসারিত করা হয়। বিগত মহাযুদ্ধের ফেরত কতকগুলি ঘর-ফেরা সৈনিক বিভাগের লোককে ভারত সরকার আই. সি. এস করে নেন। তার মধ্যে ছিলেন Tuffnel Barret, R. H. Hutchings, O. M. Martin প্রভৃতি। ব্যারেট-এর সঙ্গে আমার মেদিনীপুর জেলে সাক্ষাৎ হয়। হাচিংসকে আলিপুরের প্রধান কর্তা করে পাঠানো হল। বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হল রাজনৈতিক কয়েদীদের বাড়াবাড়ি নাশ করতে। অর্থাৎ তিনি আমাদের টিট করতে এসেছিলেন।

কর্মভার গ্রহণপূর্বক প্রথম দিনেই তিনি এসে স্বেচ্ছায় নিজের স্বরূপ খুলে ধরলেন। আমায় তিনি কেন জানি না ঘোঁটের পাণ্ডা ধরে নিয়েছিলেন। বোধ হয় পরস্পর বিরোধী-দলস্থ লোকগুলিকে একত্র নিয়ে চলার সংবাদ গোয়েন্দা বিভাগের লোক তাঁর কানে তুলে দিয়েছিল বা বাংলা সরকারকে দিয়েছিল। তিনি একটি ছড়ি বগলে করে এসে সকলের সামনে আমায় বললেন—'If you behave yourselves

properly you will enjoy the privileges. Otherwise you will have to fight me, and I am a most difficult person to fight.'—ভাবার্থটা হচ্ছে—'যদি তোমরা ভালোভাবে চল, এখনকার সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে, নতুবা আমার সঙ্গে টক্কর লাগবে। আমি বড় শক্ত লোক।'

মনে হল আমার বুকের ভিতর যেন খচ্ করে একটা ছোরা ঢুকে গেল। মনে মনে বললাম—আমার চেয়ে পশুবলে বলীয়ান বলে লোকটা দর্প দেখালো আজ। ভগবান, যেন এর দর্প চূর্ণ হয়! মুখে বললাম—আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না। গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতন সেই কথাগুলি সাহেব ঠিক ঠিক পুনরুল্লেখ করে চলে গেলেন।

সংঘর্ষ বাধতে দেরি হল না। হাচিংস্ নিজেই সেই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে বসলেন। একদিনের কথা। চৈতন্যদেব, ভূমেশ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, শচীন দত্ত, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণেরা রাত্রে গান করছিল। হাচিংস্ জেলের শৃংখলা পরিদর্শন করতে বেরিয়েছিলেন। দূরাগত সঙ্গীত তাঁর কাছে মনোরম না হয়ে হারাম হল। তিনি সিপাহী পরিবেষ্টিত হয়ে সঙ্গীত বন্ধ করতে কড়া আদেশ দেন। রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাওয়া হচ্ছিল। রাত তখন এগারোটা। রাত্রেই যুবকদের সঙ্গে বচসা হয়। পরদিন তিনি ফল দেখিয়ে দেবেন বলেন। আমি ওপরে ঘুমোচ্ছিলাম। সাহেবপুঙ্গব ওপরে এলেন। সাহেবের সবুট্ দুমদুম পদক্ষেপে আমার ঘুম ভেঙে যায়। অমন অসময়ে প্রভুর আগমন যে অমঙ্গলসূচক তা বুঝতে বাকী রইল না। পরদিন সাহেব কয়েকটি আইনের বই-সমেত সদলবলে এলেন। আমায় ডেকে গতরাত্রের বিবরণ জানালেন এবং জেল-আইনে কত কি সাজা আছে পড়ে শুনালেন। ইতিমধ্যে নীচে পেঁছেই গতরাত্রের অপরাধী যুবকদের কয়েকরকম শাস্তির বিধান তিনি করে এসেছেন জানালেন। জেলের আগেকার অশুদ্ধ ভাব এখন ছিল না।

আমি বললাম, 'আপনার বোঝার ভুল হয়েছে। যুবকরা ভগবানের স্তবপাঠ করে নিদ্রা যায়। এটা তাদের ধর্মসাধনের অঙ্গ। তারা অন্যায় কিছু তো করে নি। তাদের সৎজীবনের জন্য আনন্দ জ্ঞাপন না করে আপনি শাস্তি দিয়ে বসলেন?' সাহেব মানলেন না। আরও বললেন, 'এত রাত্রে ভগবানের স্তবস্তুতি চলবে না। মনে রাখতে হবে এটা জেলখানা।' আমি বললাম, 'আপনি আমাদের মনের সহজাত প্রবণতায় ধাক্কা দেবেন না। আপনি ভারতীয়দের জীবন-যাপন প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত নন, মনে হচ্ছে।' সাহেব বললেন—তিনি সব জানেন। কিন্তু জেলখানায় ভগবৎ স্তুতি বা অপর সঙ্গীত হতে দেবেন না। আমি বললাম, 'প্রতি রবিবারে অর্গান বাজিয়ে যে ইউরোপীয় কয়েদীরা গান করে—আমরা শুনি? ওটা

প্রার্থনার অঙ্গ বলে আমরা জানি। আপনি দেশী-বিলাতীর মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করতে চান বুঝি?' সাহেব কিছুতেই আমার কথা শুনতে রাজী নন। আমি বললাম, 'সাহেব, ভুল বুঝবেন না। আমরা আপনার দেশে আসি নি। আপনি আমাদের দেশে এসেছেন এবং যথেচ্ছাচার করতে চাইছেন। এর ফল ভালো হবে না।' সাহেব আমায় আর একবার আইনের ধারাগুলি মনে করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

পরদিনের কর্মসূচী আমরাও তৈরি করে রাখলাম। সাহেব সরকারী ব্যবস্থামতো রবিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকী দিনগুলি আমাদের বাসস্থানে আসতে আদিষ্ট ছিলেন। তিনি কিন্তু রবিবার ছাড়া আর কোনো একটা দিনও আসতেন না। সেই দিনগুলি আমরা টুকে রেখেছিলাম। এঁর পূর্বের কর্তার অনুমতি অনুসারে আমি লেখাপড়া করার জন্য পরদা দিয়ে ঘেরা একটা কামরার মতো করিয়ে নিয়েছিলাম। ঐ কামরায় আমি সকালে লেখাপড়ায় প্রবৃত্ত থাকতাম। সাহেব এলে কোনোদিন আমি বাইরে আসতাম, কোনোদিন বা সাহেব পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকে কথাবার্তা কয়ে যেতেন।

এইদিন সাহেব এলে একতলায় তাঁর সম্মানার্থে কেউ উঠে দাঁড়াল না। সাহেব খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কটমট করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। তারপর তাদের আর এক দফা শাস্তির কথা শুনিয়ে রাগে গরগর করতে করতে ওপরে এলেন। ওপরেও তাঁর অভ্যর্থনার সেইরূপ ব্যবস্থা। আমি আমার কামরা থেকে বেরুই নি। সাহেব আরো রাগভরে চারিদিক দেখে চলে গেলেন। খানিক পরে আমাদের সকলের শাস্তির হুকুম এল। এর মধ্যে রাজসাহির জিতেশ লাহিড়ীও পড়ে গেল। সে ঐ সময় মধ্যপ্রদেশের জেল থেকে চিকিৎসা করাতে বাংলায় বদলি হয়ে আসে। সে থাকত আমাদের এলাকায়, কিন্তু একটি পৃথক সেলে (জেলের পরিভাষায় 'ডিগ্রী'তে অর্থাৎ ছোট কুঠুরিতে)। তার দিকে না গিয়েই, তাকেও শাস্তি দেওয়া হল। এবার ভীমরুলের চাকে কাঠি দেওয়ার ফলটি ফলল।

সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকারী উচ্চপদাধিকারীদের কাছে আমাদের বক্তব্য আমরা লিখে জানালাম। একযোগে লিখল সকলে। আমি এবং জিতেশ পৃথক পৃথকভাবে লিখলাম। জিতেশ একদম নির্দোষী এবং রোগী মানুষ। বিনা অপরাধে যে-সাহেব শাস্তিবিধান করে, এমন পাগলের তত্ত্বাবধানে থাকতে তার মন সরে না। আমি লিখলাম, বাংলা সরকারের কোন্ কুলুঙ্গিতে আবার এক চেঙ্গিস খাঁ লুকোনো ছিল যে তাকে আলিপুর জেলে অভিযান করতে পাঠানো হয়েছে? তার কাছে দোষী-নির্দোষী নেই। একধার থেকে ধর্ষণ করে যাও, এই হল তার নীতি। তাকে কাজ করার জন্য মোটা মাইনে ও ভাতা দিয়ে আনা হয়েছে, না, কাজে ফাঁকি দেবার

জন্য সাধারণের অর্থে পোষা হচ্ছে? তিনি তো অমুক অমুক তারিখে কাজে আসেন নি। এরকম অপরাধজনকভাবে সাধারণের অর্থ তছনছ করার জন্য সরকারই সাধারণের কাছে দায়ী। আমার সঙ্গে দেখাও হয় নি, অথচ অন্যায় আচরণের অজুহাতে আমায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই মানুষটিকে ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে কারুর কল্যাণ নেই।

এর ফলে সাহেব এসে, আমাদের বাসস্থানের দরজায় যে আলাদা ভিতর-বাহিরে আসা-যাওয়ার লোকের জমা-খরচের খাতা থাকত একজন ইউরোপীয় ওয়ার্ডারের জিম্মায়, তাই পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। দেখলেন আমি যা লিখেছি তা সত্য।

সাহেব আরো দেখলেন তাঁর জেলে যা কিছু অন্যায় ঘটে সংবাদপত্রে সব প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি আমাদের এলাকায় ভারতীয় সেপাই সরিয়ে সমস্ত পাহারার কাজ ইউরোপীয়দের দ্বারা আরম্ভ করলেন। তবু সংবাদ চাপা থাকে না। এরপর তিনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক দিয়ে জেলের উচ্চপ্রাচীর ঘিরে রাখলেন। যে-কোনো সিপাহী বাজার যায় গোয়েন্দার লোক তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তবু খবর চাপা থাকে না।

একদিন সকালে আমায় জেল-অফিসে ডেকে পাঠানো হল। গোয়েন্দা বিভাগের বড়সাহেব লোম্যান এবং সরকারী দপ্তরের রাজনীতি বিভাগের সচিব মার্টিনসাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মার্টিন কথা সুরু করলেন। একখানা দৈনিক 'বেঙ্গলী' আমার হাতে দেওয়া হল। একটা জায়গায় নীল রঙের পেনসিল দিয়ে চৌহদ্দি দাগা ছিল। আমায় পড়তে বললেন। আমি পড়লাম। অর্থাৎ গতরাত্রিতে বজবজ থেকে এক ব্যক্তিকে চুপিসাড়ে জেলের একপ্রান্তে এনে রাখা হয়। আমাদের তালাবন্ধ করারও প্রায় তিন ঘণ্টা বাদে তিনি জেলে আসেন, অথচ তাঁর সংবাদ আজকের কাগজে প্রকাশিত হয়ে গেছে। মার্টিন ধরে বসলেন—কে এই সংবাদ পাঠিয়েছে? আমার জানা নেই বললাম। মার্টিন বললেন, 'ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার নয়। কেউ একজন মাথাওলা নায়ক ব্যতিরেকে এরকম দুঃসাধ্য কাজ হওয়া সম্ভব নয়।' আমি চুপ করে মাথা চুলকানোর ভান করলাম। সাহেব তাড়াতাড়ি উত্তরের দাবি করলেন। বললাম, 'ভেবে দেখলাম কেউ একজন লোক থাকা চাই যিনি জেলের ভিতর আসতে পারেন ও বাইরে যেতে পারেন। শুধু তাঁর দ্বারা এই কাজ সম্ভব।' মার্টিন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে সে?' আমি চাকিতে বললাম, 'এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—'

বলবামাত্র হাচিংস্ উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে ঘরে ঘুরতে লাগলেন। মার্টিন বললেন, 'আমরা আইন শিথিল করতে পারি না। আপনি শিক্ষিত লোক, আপনার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে পারি।' আমি বললাম, 'ওসব চালাকি চলবে না।'

মার্টিন গরম হয়ে উঠলেন। সুবিধা বুঝে ও সময় পেয়ে হাচিংস্ বললেন, 'এরা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমায় বলে কিনা চেঙ্গিস খাঁ!'

মার্টিন সুরে সুর মিলিয়ে বললেন, 'মুখুজ্যেমশায়ের সব অধিকার (Privileges) কেড়ে নেওয়া হোক।' হাচিংস্ বললেন, 'গভর্নমেণ্ট সে কথা আমায় লিখে হুকুম দিন।'

আমি বললাম, 'কী অসাধারণ অধিকার আমায় দেওয়া হয়েছে। যা সুখ-সুবিধা আমরা ভোগ করি তা আমার পূর্বগামী দেশভক্তদের রক্তদানে এসেছে। প্রয়োজন হলে আবার পূর্ণ মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি।'

অতঃপর আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে যে যার গন্তব্যস্থলে চলে গেলাম। পরদিন আবার হাচিংস্ আমাদের বাসস্থলে এসে বললেন—গতরাত্রে ফোর্ট উইলিয়ামে একটি উৎসবে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। লর্ড লিটন সব কথা শুনে আমাদের শাস্তির জন্য এই কয়েকটি অনুজ্ঞা জারি করেছেন—খানিক পরে সরকারী দপ্তর থেকে সেগুলি হুকুম হয়ে আসবে। আমায় লিটনের অনুজ্ঞা কয়টি দেখানো হল। পরে সময়মতো সরকারী হুকুমগুলি এসেছিল—আমাদের চিঠিলেখা বন্ধ, সংবাদপত্র পাঠ বন্ধ, আগে আগে তালা লাগানো হবে, লাইব্রেরী থেকে যে-সব বই দেওয়া হয়েছিল সব ফেরত নেওয়া হবে……ইত্যাদি।

পরের দিন থেকে গোরা পল্টনের পাহারা। হাচিংস্ কলকাতা দুর্গের গোরাদের বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি দু'দল সৈন্য আনালেন পাটনা-দানাপুর এবং ব্যারাকপুর থেকে। তারা যথাক্রমে শ্রপসায়ার-রেজিমেণ্ট ও প্রিন্স-অব-ওয়েলস ভলান্টিয়ার। তাদের সর্বোচ্চ অফিসারকে নিয়ে এসে আমায় চিনিয়ে দিলেন। বললেন, 'He is Doctor Mukherjee, considered by the Government to be the leader of these people. He is qualified to be an officer—ইনি ডাক্তার মুখার্জী—সরকার যাঁকে এইসব লোকেদের নেতা মনে করেন। ইনি অফিসার হবার যোগ্যতা রাখেন।'

এতে শাপে বর হল। এই গোরা সৈন্যরা আয়ার্ল্যান্ড ও মিশরে রাজনৈতিক কর্তব্য করে এসেছিল। আমায় যুদ্ধবন্দী-জাতীয় অফিসার ভেবে বসেছিল। তাতে আমায় একটু সমীহ করে চলত। একদিন একটি গোরা জেল-ধোবা আমাদের কাপড় নিতে এসে উপরতলায় এসেছিল। সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'May I smoke, Sir?—আমি কি ধূমপান করতে পারি?' আমি অবসর বুঝে সানন্দচিত্তে বললাম, 'With greatest delight—পরম আনন্দে ধূম পান করো।'

আর এক দিনের ঘটনা। একটা সরু গলিতে স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে সকালে আমায় আধঘণ্টা বেড়াতে দেওয়া হত। সঙ্গে একজন গোরা পাহারা থাকত। হুকুম ছিল

দু'ফার্লং (এক মাইলের এক-চতুর্থাংশ) আমি যেতে পারব। তারপর ফিরতে হবে। এই বিশিষ্ট দিনে এক নতুন গোরা সঙ্গে ছিল। আমি অল্প কিছুদূর অগ্রসর হলে 'Halt—halt—থামুন থামুন—' বলে চিৎকার করতে লাগল। আমি থামলে বলল, 'About turn—ফিরুন।' আমি ফিরলাম। আর না বেড়িয়ে আমার থাকার জায়গায় ফিরে গেলাম এবং অল্প পরে গোরাটির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে চিঠি পাঠালাম।

তদারক হল। তারপর গোরাদের বড় কর্মচারী এসে আমায় ধরাধরি করেন যেন অভিযোগ ফিরিয়ে নিই। সৈনিকটির ভবিষ্যৎ খারাপ হবে। তার Record—চরিত্রের ইতিহাস খুব ভালো। এবার কর্তব্যচ্যুতির দাগ লেগে যাবে। সে লোকটি এসে দুঃখপ্রকাশ করলে আমি অভিযোগ উঠিয়ে নিই। ওদের চক্ষে আমার দাম বাড়ল অনেক। ওরা সমীহ করে চলতে লাগল। তাছাড়া মতি নামক মেট্ সাহেবদের দুদিনে পটিয়ে ফেলল। দুপুর রাত্রে চা তৈরি করে খাওয়াতে লাগল। বড় বড় টোমাটো দেখিয়ে বলতে লাগল, 'সায়েব, টোমাটো খাবে? এতে লিবার (Liver) ভালো থাকে। আমাদের নরেশবাবু খেতেন।' সাহেবরা 'প্রাপ্তি-মাত্রেণ তু ভক্ষয়েৎ' করল। মতি কোনোদিন বলত, 'সায়েব, বেল খাবে? এতে কোষ্ঠ সাফ হয়।' বেল ভেঙে দিলে সাহেবরা খেয়ে ফেলত। মতিকে তারা সিগারেট খাওয়াতে লাগল। কী আশ্চর্য প্রকৃতির চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম—ব্যবহারিক সমন্বয়! মতি জানে না ইংরেজী; গোরারা জানে না বাংলা। ভাষা বাদ দিয়ে ভাবের আদান-প্রদানে ভালবাসা জমে উঠল। 'ভাষাবিহীন কণ্ঠ আমার, বুঝতে হবে অনুভবে'। গোরাদের সাক্ষাতে আমি কৃত্রিম গাম্ভীর্য ধারণ করলাম। একদিন মতির প্রশংসা করলাম। সে বললে, 'হবে না? তোয়াজে ভগবান বশ হয়, এরা তো মানুষ গো?'

দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন ভবেৎ। হঠাৎ আমাদের শাস্তিগুলি তুলে নেওয়া হল। একদিন সুপ্রভাতে লোম্যান ও মার্টিন আমাদের থাকার জায়গায় এসে উপস্থিত। মার্টিন বন্দীদের অভিযোগ-অনুযোগ কি জেনে একখানি কাগজে টুকে নিয়ে গেলেন। সুপারিন্টেন্ডেণ্ট যা হবার হয়ে গিয়েছে বললেন। শান্তি, সন্ধি, পরস্পরে সদ্ব্যবহার পুনঃস্থাপিত হল। দু'দিন পরে আমায় অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। মার্টিন জানালেন, ভারত সরকার প্রস্তাব করেছেন আমায় বিলেতে চলে যেতে হবে। আলিপুর থেকে সোজা বোম্বাই পাঠানো হবে। তবে, আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি এইভাবের ইঙ্গিত আমায় দিতে হবে। একেই বলে ধ'রে-বেঁধে প্রেম!

আমি দেখলাম এখনই যদি 'না' বলি, তাহলে ওদের ইচ্ছা জোর করে পূরণ করবে। আমি ইংরেজ চরিত্র জানতাম। যার মাথা থেকে এই কল্পনা বেরিয়েছে সে যদি বদলি হয়ে যায়, লম্বা ছুটিতে চলে যায়, অথবা উচ্চতর অপর কোনো পদ নিয়ে

গদি খালি করে—পরবর্তী ব্যক্তি এ ব্যবস্থাটা বদলে ফেলতে পারে। অফিসের বড়সাহেব সর্বদা ভাবে—সে প্রথমে একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রাখে, তারপর বড়সাহেব। তাই পূর্ববর্তী ব্যক্তির ব্যবস্থা প্রায়ই বদলে যায়। যদি বদলাবার মতো তেমন কিছু না থাকে, তাহলেও অন্ততঃ টেবিলের ওপরের তারিখ-দেখানো কার্ডটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এই হল জাতটার চরিত্র।

আমি তাই ভেবে বললাম, 'আমার জীবনে এতবড় একটা পরিবর্তন আসছে, আমায় একটু ভাবতে সময় দিন। ভেবে পরে আমি উত্তর দেব।' আমরা যে-সব কথা কইছিলাম, লোম্যান টেলিফোনে কাকে সেই কথাগুলো জানিয়ে যাচ্ছিলেন। মার্টিন খুব খুশি হয়ে বললেন, 'তা তো নিশ্চয়। বেশ, আপনি সময় নিন, পরে আমাকে সংবাদ দেবেন।' ওরা চলে গেল।

আমি থাকার জায়গায় ফিরে এলে সবাই আমায় ছেঁকে ধরলেন। এই সংবাদ তাঁরা নিতান্ত দুঃসংবাদ হিসাবে গ্রহণ করলেন। সবচেয়ে মর্মাহত হলেন চট্টগ্রামের সূর্য সেন। আমার চলে যাওয়া তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতির মতো ভাবতেন। সূর্যবাবু ও নির্মল সেন আমার সঙ্গে আমাদের দেশে পরবর্তী রাজনৈতিক কাজ কিভাবে চলা উচিত সেই প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করেন। আমি রাজনৈতিক ডাকাতি বন্ধ করায় খুব জোর দিই। ১৯১৫ সালে আমাদের পরিকল্পনা কি ছিল সব খুলে বলি। 'চক্রধরপুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' তাতে কেন রেখেছিলাম তাও জানাই। বিপ্লব চতুরঙ্গ ভুললে চলবে না। সূর্যবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নির্মল ও সূর্যবাবু আমায় বার বার অনুরোধ করেন যাতে আমি ইংলণ্ডে চলে না যাই।

প্রায় তিনমাস উত্তর দিই-দিচ্ছি করে কাটানোর পর মার্টিন এসে উপস্থিত। অনুযোগ করলেন, 'কই, কোনো উত্তর তো দিলেন না ?'

আমি জানালাম, 'সাহেব, স্বেচ্ছায় যেতে গেলে নিজের টাকায় যেতে হয়। আমার সে টাকা নেই। তাছাড়া বিলাতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় কি করব ভেবে ঠিক করতে পারছি না।' সাহেব বললেন, 'এ আর এমন কি শক্ত ব্যাপার ? আপনার টাকা না থাকে, সরকার যাবার ব্যয়ভার বহন করবে। বিলাতে আপনার প্রফেসাররা আছেন তাঁরা সাহায্য করতে পারবেন। লর্ড লিটন এখন বিলাতে আছেন। শিক্ষা বিভাগে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি। তিনি সুবিধে করে দিতে পারেন। অথবা Private Practice (ডাক্তারী ব্যবসায়) করতে পারেন, গবেষণা করতে পারেন, কিম্বা হাসপাতালে কোনো কাজ নিয়ে থাকতে পারেন। তাছাড়া আপনি আপনার কাকার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিতে পারেন।' আমি দেখলাম প্রাণ্ধ অনেক দূরে গড়িয়েছে। বললাম, 'আমার প্রফেসাররা ভারতে মস্ত লোক ছিলেন। বিলাতে তাঁরা কেউ নন। তাঁদের দিয়ে কিছু হবে না। আর লর্ড লিটন ? তিনি আমায় বিনা বিচারে জেলে পুরে

দিয়ে গেছেন। যিনি আমায় লোকচক্ষে হেয় করতে চেয়েছেন, আপনি কি ভাবতে পারেন আমি তেমন ব্যক্তির সাহায্য নেব? আমার কাকার কথা? আচ্ছা, আমায় আর একটু ভাববার সময় দিন।' সময় পেলাম। মার্টিন বলেছিলেন, 'লর্ড লিটনের উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। তিনি আপনাকে খুব সপ্রশংস চক্ষে দেখেন—শ্রদ্ধা রাখেন।'

এরপরে আমি হাচিংস্‌-এর কাছ থেকে ইসারায় জানতে পারি যে, প্রভুরা আমায় বিলাতে কেণ্ট প্রদেশের চক্‌ দ্বীপে রাখতে চান। বিলাতে আমি নানা কারণে যেতে চাই নি। প্রথমতঃ আমার রাজনৈতিক জীবনের অনেক অংশ তাতে বাদ পড়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এরা হয়তো অতি নীচ কাজ করবার ফন্দি করেছে—খাওয়া-পরার অভাবে ফেলে পেটের খবর বার করে নেওয়া। 'মুসলমানপাড়া বোমার মামলা'র আসামী এক ব্যক্তি মোকদ্দমায় খালাস পেয়ে বিলাত যায়। পরে সে এমন অবস্থায় পেটের সব কথা লিটনকে বলে। আমি ঐ কথা ভাবতে শিউরে উঠি।

এর মধ্যে ভূপতি মজুমদার আলিপুরে বদলি হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি। আবারও প্রায় মাসাধিক কাল কাটালাম। ফের মার্টিন এলেন। হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই, উত্তরের কি হল?' আমি বললাম, 'আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—ধন্যবাদ সহকারে আপনাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।' সাহেব সামান্যই প্রস্তুত ছিলেন আমার এই উত্তর শুনতে। আমাকে অনেক বোঝাতে লাগলেন। এই প্রস্তাব বাংলা সরকারের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। তাঁদের চেয়ে বেশী মাথাওলা লোক আছেন ভারত সরকারে। তাঁদের এই প্রস্তাব। লোম্যান এই প্রসঙ্গে আমায় বললেন—আমায় ভারতবর্ষে ছাড়া যেতে পারে না। যদি ইংলণ্ডে যাওয়া আমার মনঃপূত না হয় তাহলে আমি জার্মানি, রুশ, আমেরিকা বাদ দিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। আমি বললাম, 'ধন্যবাদ। এদিকটা তো আগে ভাবি নি। ভেবে দেখতে সময় লাগবে।'

ইতিমধ্যে আমার কাকাকে সংবাদ দিয়েছিলাম যে, যদি সরকারপক্ষ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাড়াবার কথা তুলে অর্থসাহায্য করতে বলে, তিনি যেন রাজী না হন। আমি জেল-জীবন আনন্দে কাটাচ্ছি। কোনো চিন্তার কারণ নেই।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। আমার কাকার কাছে কর্তারা লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমার বিলাত-যাত্রা সমর্থন করেন নি। টাকা দিয়ে সাহায্য করতেও অস্বীকার করেন।

দিন পনেরো বাদে মার্টিন আবার এলেন। বললেন, 'বাংলার প্রধান কর্তা মোবার্লিসাহেব বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি ধন্যবাদই দিলেন তাহলে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা চলে কি করে?' আমি উত্তর দিলাম, 'ইংরেজী আমার মাতৃভাষা নয়।

আমি সবচেয়ে ভদ্রভাষা প্রয়োগ করেছি। যদি মোবার্লিসাহেব এটি না বুঝে থাকেন তাহলে আমি নাচার।' মার্টিন চটলেন না। বললেন, 'আরো একটু ভেবে দেখুন। আমি আর একবার আসব।' তথাস্তু। আই. সি. এস.-দের মাথা-ঠান্ডা রাখাকে বলিহারি। হাসিমুখে সবরকম কথা শুনবে। হুংকার ছাড়বে না। তারপর হয়ত মাথা-কাটার হুকুম দেবে।

এদিকে আমার ছোট ভাইয়ের মতো, দেশের সুসন্তান জীবনলাল অসুস্থ হয়ে বর্মা থেকে ভারতে আসে। সে সেখানে বিদ্রোহ করে যে ইংরেজের ডাক্তারদের আর দেখাবে না। একমাত্র আমায় সে পরীক্ষা করতে দিতে পারে। আলিপুর জেল-হাসপাতালে আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। তার শরীরের অবস্থা ভারী খারাপ। আলিপুরের কর্তারা একটা রিপোর্ট চান। তার বুকের অবস্থার জন্য আমি তাকে ছোটনাগপুরের আবহাওয়ায় রাঁচিতে রাখা উচিত জানাই।

মার্টিন আবার এলেন। সঙ্গে লোম্যান। অফিসে আমায় ডাকা হল। মার্টিন বড় প্রসন্ন। বললেন, 'আপনার এক বন্ধু টাকা পাঠিয়েছেন। যাবার জন্য প্রস্তুত হোন। পোশাক নেই? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পোশাক তৈরি করিয়ে দিচ্ছি।'

মাথা ঘুরে গেল। টাকা পাঠিয়েছেন বন্ধু? আমায় মুক্ত দেখার জন্য তাঁর বুক ভেঙে পড়েছে! বন্ধু না শত্রু?

সাহসে ভর করে বললাম, 'ঠাট্টা করছেন?' মার্টিন হেসে বললেন, 'না, না, না। একদম সত্য। আন্দাজ করতে পারছেন—কে টাকা পাঠিয়েছেন?' বললাম, 'না।' 'প্যারিসে সম্প্রতি ইনি আছেন। এবার আন্দাজ করুন দেখি, কে?' ভেবে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। তবু ঠিক করতে পারলাম না এ শত্রুর কাজ কে করেছে?

এবার সাহেব নিজেই বললেন, 'আপনাদের উভয়পক্ষেরই বন্ধু মিস্ ম্যাক্লাউডকে লাট লিটন আপনার সংবাদ দেন। মিস্ ম্যাক্লাউড এই টাকা পাঠিয়েছেন।' লহমায় ভেবে নিলাম টাকা ফেরত দিলে সেই মহিয়সী মহিলা মনে ব্যথা পাবেন। কিন্তু নিলে আমার সর্বনাশ। এখন ফিরিয়ে দিই, পরে কোনোদিন দেখা হলে সব কথা বুঝিয়ে বললে তিনি অসন্তুষ্ট থাকবেন না। তিনি সত্যই আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন।

মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে দিলাম, 'Why this mean, nasty trick? I simply refuse to have anything to do with this money. This is reprehensible—এই নীচ, বিশ্রী খেলা কেন? আমি এই টাকা স্পর্শ পর্যন্ত করব না। এ ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণিত।'

আমার এই কৃত্রিম ক্রোধে কাজ হল। সাহেব বললেন, 'টাকা সময়মতো আপনি

ফিরিয়ে দিলে হবে। আমরা নিজেদের বন্ধুবান্ধবের কাছে ধার নিই। রাগ করছেন কেন?'

আমি বললাম, 'যা ইচ্ছে আপনারা ঐ টাকা নিয়ে করুন। আমার কাছে ও নিষিদ্ধ অর্থ। আমার ধার করার মন্দ অভ্যাস নেই।'

ওরা তো চলে গেল। আমার জেলের বন্ধুগণ সুখী হলেন। এর মধ্যে ভারত সরকারের বড়কর্তা পাঞ্জাব না যুক্তপ্রদেশের লাট হয়ে চলে গেলেন।

এরপর মার্টিন এসে শোনালেন আমায় বাংলায় থাকতে দেওয়া হবে না। পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের যে-কোনো জায়গায় আমি বাস করতে পারি। আমি আবার ভাববার সময় নিলাম।

এরপর অমরদা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ইনি মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'জীবনকে রাঁচি যেতে হবে—তার চিকিৎসা কে করবে? অত টাকা সে কোথায় পাবে? তোমায় তো এরা বাংলা-ছাড়া করছে। তুমি রাঁচি যাবার বায়না ধরো। তোমায় তুষ্ট রাখার জন্য ওরা তোমায় রাঁচিতে পাঠাবে। তাহলে জীবনেরও কাজ হয়ে যাবে।'

সেই পরামর্শমতো কাজ হল। আমি রাঁচি এলাম। কিন্তু এসে দেখি জীবন এখানে নেই। তাকে আলমোড়ায় পাঠিয়েছে।

একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। সাহেবদের সঙ্গে ব্যবহারে দেখেছি ওরা প্রথমটা ঘা দিয়ে দাবিয়ে দিতে চায়। কিন্তু যদি আঘাতের বদলে উপযুক্ত আঘাত পায়, ওরা বন্ধু বনে যায়। আমার এরূপ অভিজ্ঞতার কয়েকটি কারণ ঘটেছে। যাক্। হ্যাচিংস্ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর ভালো কাজের পরামর্শ হল। তার ফলে জেলে নিরক্ষরতা নিবারণের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া জ্ঞান বাড়ানোর জন্য লোক বুঝে ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে ইংরেজী ও বাংলায় বক্তৃতা আরম্ভ করা হয়। ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজী বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। গ্রাম্যজীবন, স্বাস্থ্য, কৃষি ও গৃহপালিত পশুসেবার বক্তৃতা বাংলায় হয়। আমি হ্যাচিংস্কে জেলে রেডিও বসাবার পরামর্শ দিই। কিন্তু আমার রাঁচি আসার সময় পর্যন্ত তা হতে পারে নি। হ্যাচিংস্ বাইরে থেকে উপযুক্ত বক্তা জোগাড় করে আনতেন।

বাংলা বক্তৃতায় শিক্ষা দিতে গিয়ে এক বিপদ হয়ে গিয়েছিল। কলেরা নিবারণের উপায়গুলি ছায়াচিত্রে দেখানো হচ্ছিল। কলেরার জীবাণু (Comma Bacillus) বাঁকা-বাঁকা; খালিচোখে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। মনের উপর ভালো ছাপ পড়বে বলে প্রায় চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ছাতার বাঁটের হাতলের মতো বাঁকা-বাঁকা পোকা দেখানো হয়। জলের সঙ্গে এই পোকা

উদ্বস্থ ক'রে লোক অসুখে পড়ে। বক্তৃতা শেষ হলে সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে খুলনাবাসী একজনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ব'লে ওঠে—'জেলের খোলে পুরিছে বলে কি আমাদের জন্তু পাইয়েছে! এতখানিডা লাঠি গিলে ফেলি—গলায় বাধি না, ঠাহর করতি পারি না?'

সে ভুল ভাঙাতে আমরা পথ পাই না।

রাঁচি পাঠাবার সময় আমার উপর হুকুম এল—Not to enter, reside, or inhabit in any part of Bengal—বাংলার সীমানা মাড়ানো চলবে না।

বিলাত-যাত্রার জন্য আমায় তৈরি করতে হাচিংস্ যে-সব চেষ্টা করছিলেন তার নমুনাস্বরূপ তাঁর একটি চিঠি এইখানে সংলগ্ন করে দিলাম। এই হাচিংস্ ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সরকারের খাদ্য সচিব হন—স্যার রবার্ট হাচিংস্।

Dr. Mukherjee,

Herewith a copy of the Western Gazette. I am also lending a copy of a book of Dorest which you may find interesting, many of the places mentioned in the Gazette are described in it. I have not a detailed map of Dorset here but I send one of the adjoining country of Hampshire showing the New Forest and Isle of Wight. From the symbols used on these maps you can with a little practice get an accurate idea of the nature of the country, its contours, the kind of trees to be found *i.e* whether conifers or deciduous and a variety of detailed information. The presence of Roman conquerors will be found very noticeable over name-ending of 'Chester' being the Roman 'Castra' meaning a permanent encampment.

Sd./ *Robert Hutchings*

১৯২৮ সালে আমি একবার কলকাতা যাবার অনুমতি পাই। বন্ধু নরেশ চৌধুরী খুব অসুস্থ হন। তাঁকে দেখতে যাবার উপলক্ষ হল। মনোরঞ্জন, ভূপেন, অমর ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে আলোচনায় আমি একটি নিজেদের সাপ্তাহিক কাগজ বের করার প্রস্তাব উঠাই। নিজেদের কথা নিজেরা না বললে দেশকে মর্মকথা জানানো যায় না। কাগজ বের করায় সকলের মত পাওয়া গেল।

মুদ্রণাদি কার্য আরম্ভ করার জন্য আমি দু'শো টাকা দিই। ভূপেনের সম্পাদনায় কাগজ প্রকাশ করা ঠিক হয়। বন্ধুরা মাথা খাটিয়ে নাম স্থির করেন 'স্বাধীনতা'। এই নামটি মনোরঞ্জনের দেওয়া। প্রচ্ছদপটে একটি সুন্দর

ভাবোদ্দীপক ছবি ছিল। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছিল একজন বন্দী সর্বশক্তিদ্বারা হাতের নিগড় ভাঙতে চেষ্টা করছে। তারই ফলে যেন কারাগৃহ ভেঙে পড়ছে। সর্বপশ্চাতে উদীয়মান নতুন সূর্য নতুন আলো বিকীর্ণ করছে। ভারী চমৎকার দৃশ্য। মনের বাঁধন ভাঙতে পারলে দেহের বাঁধন ভাঙা সহজ হয়ে আসে।

ভেবেছিলাম এইটি মিলিত পার্টির কাগজ হবে। 'অনুশীলন'-এর বন্ধুদের সম্মতি পাই। এর এক সংখ্যায় প্রতুল গাঙ্গুলী লিখিত 'বাংলার মা' অতি উঁচুদরের প্রবন্ধ ছিল। তখনকার দিনে নারী-প্রগতির যুগ আসে নি। অথচ আমাদের মা-বোনেরা কী দুঃসাহসিক কাজ না করেছিলেন! কত আন্তরিকতার সঙ্গে সহায়তা করতেন। সেই মা-বোনেদের মধ্য থেকেই তো আসেন ননীবালা দেবী—প্রথম নারী-রাজবন্দী; আসেন দুকড়িবালা দেবী—প্রথম সাজা পাওয়া মেয়ে কয়েদী; আসেন সিন্ধুবালা—প্রথম নির্যাতিত সন্দেহ-দাগী।

খোলাখুলিভাবে তরুণেরা নিজেদের কাগজে নিজেরা লিখছেন অনেকদিন বাদে। সুভাষচন্দ্র তখন দেশের কাজে দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়েছেন মাত্র। তাঁকে এগিয়ে দেওয়া হতে লাগল সবদিক দিয়ে। সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের সভাপতি করে দেওয়া হল বাংলাদেশে। অত কমবয়সে আর কেউ ইতিপূর্বে সভাপতি হন নি।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থির হয়। এই উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভার যুগান্তরদলের বিপ্লবী বন্ধুরা সবাই নিলেন। মেদিনীপুর জেলে থাকতে আমরা 'স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন' করব স্থির করেছিলাম। সুভাষ-বাবুকে জি. ও. সি. করা হল। সামরিক ধাঁচে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হল। এটায় একটা নতুন প্রবর্তনা দেওয়া হল। আজও সর্বত্র এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবক-দল খাড়া করা হয় কংগ্রেসের বৈঠক উপলক্ষে।

১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে পৌঁছোবার আগেকার ৪।৫ বছরের দু'একটা কথা আর একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিলে বোধ হয় সেই কংগ্রেসের আবহাওয়া বোঝা সহজ হবে।

১৯২৫ সালে আমেদাবাদ A.I.C.C. মিটিং-এ মহাত্মা গান্ধী (১৯২৪ সালে পেটে অস্ত্রোপচারের পর মুক্ত হন) কাউন্সিল-প্রবেশপরিপন্থী প্রস্তাব আনেন। দেশবন্ধু ও মতিলালজীকে পরামর্শ দেন কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে 'কাউন্সিল আন্দোলন' চালাতে। প্রস্তাব ভোটে গেলে মহাত্মার দিকে হয় ৭১ এবং দাশ-নেহেরুর দিকে হয় ৬৯ ভোট। দাশ-নেহেরু সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান।

মহাত্মা এই সামান্য তফাতের জিতকে জিত মনে করলেন না। তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তিনি চরকা, খদ্দর এইসব সংগঠনমূলক কাজ নিয়ে রইলেন। স্বরাজ পার্টির কাজ চলতে পথ ছেড়ে দিলেন। সেদিন গান্ধীজি ভাবেন

নি এই পন্থাই হবে তাঁর ভবিষ্যৎ পন্থা। দেশবন্ধুর দেহাবসানের পূর্বে দার্জিলিঙে গান্ধীজি দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। আলাপ-আপ্যায়নে উভয়ের মধ্যকার বিভেদ কার্যতঃ দূর হয়।

দেশবন্ধুর পর মতিলালজী স্বরাজ পার্টির নেতা হন। তাঁরই সময়ে পার্টির আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বাংলার দ্বৈত-শাসন চলতে পারছিল না। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ পার্টির জোর বাংলার চেয়েও কাউন্সিলে বেশি ছিল। সেখানে তাম্বেজী মতিলালজীর মত না নিয়ে, এমন কি না ব'লে-ক'য়ে ইংরেজ সরকারের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলারের পদ নিয়ে বসলেন। মতিলালজী কৈফিয়ত তলব করতে না করতে মধ্যপ্রদেশের নেতা ডাক্তার মুঞ্জে তাম্বেকে সমর্থন করলেন এবং স্বরাজ পার্টির সহ-সভাপতি কেলকার তারযোগে তাঁরও সমর্থন জ্ঞাপন করেন। মতিলালজী নিরুপায়। নিজেদের মধ্যে ভাঙন ধরল।

তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড বলেন, 'অসহযোগের ঊষর পথে না গিয়ে যদি সারা ভারতের সর্বজাতি মিলে একটা রাষ্ট্রবিধান গড়ে তুলতে পারে, তাহলে একটা সুপথ ধরা হবে।' নেহেরু-কমিটি বসল। সর্বদলের সম্মেলনে একটা স্বায়ত্ত শাসনের খসড়া তৈরি হল। তাদের প্রাদেশিক সবরকম গোলযোগ মিটে ভারতের কেন্দ্রীয় বৈঠকে মুসলমানদের শতকরা ত্রিশজনের জায়গা বিহিত হল। মুসলমানেরা তেত্রিশজনের জায়গার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নেহেরু-কমিটির একজন সভ্য সুভাষবাবুও ছিলেন। তিনিও রিপোর্টে নামসই করেন। ভারতের উন্নতির শত্রুপক্ষ শশব্যস্ত হয়ে উঠল; ইতিপূর্বেই মিস্ মেয়ো নাম্নী একজনকে ভারতে পাঠিয়ে সরকারী নথি, দলিল-দস্তাবেজ ও অন্যান্য কাগজপত্রের সাহায্যে একটা বই লেখাল। নাম 'মাদার ইণ্ডিয়া'। সেটি পড়লে ভারত সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা হয়। আন্তর্জাতিক সহানুভূতি যাতে ভারত না পায় সেই উদ্দেশ্যে বইটি লেখানো। মহাত্মা গান্ধীকে একখানা বই পাঠানো হয়েছিল। বইখানি পড়ে মহাত্মাজী মন্তব্য করলেন, 'এখানি একটি ড্রেন-ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট হয়েছে।' এই ঘটনা ১৯২৬ সালের। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সাধনার এত জিনিষ থাকতে নজর পড়ল গিয়ে কিনা যত নোংরামির ওপর!

আমেরিকায় ধনগোপাল মুখার্জী পুস্তকটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'A Son of Mother India Answers' (ভারতমাতার এক পুত্র জবাব দিচ্ছে) এই শিরোনামায় একটি বই লিখে উপযুক্ত উত্তর দিল। তারপর সে লিখল 'Visit India with Me' (আমার সঙ্গে ভারতে চলুন)। বই দুখানির খুব সমাদর হয়। তার অন্যান্য লেখায় ভারতের প্রতি আমেরিকার শ্রদ্ধা যথেষ্ট বাড়ে। তার 'The Face of Silence' পড়ে রোম্যাঁ রোলাঁ 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন' লেখায় ব্রতী হন। তিনি ধনগোপালের

বইখানি পড়ে পত্র লেখেন, 'Mr. Mukherjee, what can I do to make you immortal in Europe —মুখুজ্যে মহাশয়, আপনাকে ইউরোপে চিরজীবী করতে আমি কি করতে পারি?' ধনগোপাল উত্তর দেয়, 'Nothing for me. Please make Ramkrishna, Vivekananda well-known in Europe.—আমার জন্য কিছু প্রয়োজন নেই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে সুপরিচিত করুন।' মিস্ ম্যাকলাউড (যিনি স্বামিজীকে নানারূপে সাহায্য করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনেরও বহু উপকার সাধন করেন) বলেছেন—'After Vivekananda, Dhan has successfully interpreted India in America. His works are very popular.'

মিস্ মেয়োর উত্তরে লালাজী (লালা লাজপৎ রায়) লেখেন 'Unhappy India', আর কে. এল. গোবা লেখেন 'Uncle Sam'.

এই সময় রাজনীতিতে জওহরলাল নেহেরু পিতার মতের বিরোধিতা করছিলেন। যে পরিমাণ কাঠখড় পোড়ালে স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাবে তাতেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হতে পারে। অতএব বিরাটকে ছেড়ে ক্ষুদ্রের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার কি? জওহরলাল পিতাকে নিয়ে একবার ইউরোপ ঘুরে আসেন, রুশিয়ায়ও যান। সে ভ্রমণের কথা তাঁর লেখা 'Soviet Russia' বইয়ে বেরোয় পরে—১৯৩০-এর দিকে। কিন্তু ভ্রমণে জওহরলালের সঙ্গে ইউরোপের ভারতীয় বিপ্লবী ও ইউরোপীয় কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অগ্রগামী কর্মী ও ভাবুকদের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ হয়। মতিলালজীও বোধহয় বেশ একটু তাদের অনুকূল হয়েছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতিতে তাতে বেশ একটু স্বাধীনতাপন্থী চিন্তার স্পর্শ লাগে—পরে তা দেখতে পাই। কিছু পূর্বে জওহরলালের মতো মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারও ইউরোপ ঘুরে আসেন। তিনিও স্বাধীনতাপন্থী হন। স্থাপিত হল Indian Independence League। এখন যেমন Forward Bloc—তখন হয়েছিল Indian Independence League; আয়েঙ্গারজী তার সভাপতি, জওহরলাল সম্পাদক। সুভাষবাবু যদিও নেহেরু-রিপোর্টে সই করেছিলেন, পরে লীগে যোগদান করেন। তিনি হলেন যুগ্মসম্পাদক। বাংলায় লীগের সম্পাদক হরিদা—হরিকুমার চক্রবর্তী।

মতিলালজী কংগ্রেসে 'নেহেরু রিপোর্ট' পাস করানো প্রয়োজন মনে করেন। কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন মতিলালজী। বাংলা বিশেষ করেই তাঁকে চেয়েছিল। দেশবন্ধুর স্মৃতি তখনও জ্বলজ্বল করছিল। তাঁর অবর্তমানে তাঁর আসন অলঙ্কৃত যিনি করেছিলেন, বাংলার নজর স্বভাবতই তাঁর ওপর পড়েছিল। গান্ধীজি এই নির্বাচন সমর্থন করেন। সত্য কথা বলতে কি, মতিলালজীর ভিতর দিয়ে বাংলা দেশবন্ধুকে যেন ফিরে পাচ্ছিল।

মতিলালজীর মনের কথা তখন বাংলার যুবজনেরা জানত না। যাই হোক,

মতিলালজী 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' নিজে পাস করতে পারবেন না বুঝে গান্ধীজির শরণাপন্ন হন। গান্ধীজি শান্তিময় আশ্রম ছেড়ে আবার রাজনীতিতে এলেন। 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' এই পরিভাষাটি ইংরেজদের এবারকার একটি নতুন টোপ। এর আগে পর্যন্ত বলত Self-government—স্বায়ত্তশাসন।

এ. আই. সি. সি.-র শেষ মিটিং-এ আলোচনা হচ্ছিল—মতিলালজী চাচ্ছিলেন ডোমিনিয়ন স্টেটাস চেয়ে রেজলিউশন হোক। আপত্তিকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জওহরলাল। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও তাঁর লীগ তো বিরোধিতা করবেই। সে তো জানা কথা।

ভোটের আগের রাত্রে মহাত্মা গান্ধী, আয়েঙ্গার, জওহরলাল ও সুভাষবাবুকে ডেকে বোঝাতে লাগলেন। তিন লীগই মহাত্মার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন এবং কথা দিয়ে এলেন পরদিন সভায় তাঁরা তাঁদের বিরোধ প্রত্যাখ্যান করে নেবেন। চারদিকে রটে গেল এই যোগ-সাজসের কথা।

এরকম একটা আশংকা করেছিলেন আমার কোনো কোনো বন্ধু। তাই ভোটাভুটির বহু পূর্বেই হাওয়া বুঝে বন্ধুবর মনোরঞ্জন গুপ্ত টেলিগ্রাম পাঠালেন, 'তোমার কংগ্রেসে আসা দরকার।' মনোরঞ্জনের ডাক। যেতেই হবে। তখন আমার বাংলায় যাওয়ায় মস্ত বাধা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই বছর Indian Medical Association-এর জন্ম। তার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ঐসময় কংগ্রেসের কাছাকাছি হচ্ছিল। বাংলা সরকারকে পত্রে জানিয়ে দিলাম আমি কলকাতা যাচ্ছি—মেডিকেল সম্মেলন হচ্ছে।

কলকাতায় পেঁছে দেখি জওহরলাল মতিলালজীর বিরুদ্ধাচরণ করছেন রাজনীতির মূল সূত্র নিয়ে—পূর্ণস্বাধীনতা বনাম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। বড্ড ভালো লাগল। পরদিন সকালে শুনলাম গান্ধীজি রাতে ডেকে এমন বুঝানোই বুঝিয়েছেন যে Independence League-এর সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয় গান্ধীজির মতে মত দিয়ে ফেলেছেন। সেই রাতেই আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন পদত্যাগ ক'রে এ. আই. সি. সি-তে শরৎচন্দ্র বসুকে সভ্য করে দেন। ভরসা—তিনি আমাদের হয়ে কংগ্রেস সভাপতির প্রস্তাবকে বাধা দেবেন। তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন।

জওহরলালজী ভোটের দিন সভা থেকে অনুপস্থিত থাকেন। তাঁকে ডেকে পাঠানো হল। একটি চিরকুটে লিখে জবাব দিলেন—'I am happier away—আমি বাইরে বেশ আছি।' সুভাষবাবু দেরি করছিলেন। ডেকে পাঠানো হল। এলেন; বললেন—বি. পি. সি. সি.-এর সভাপতি হিসেবে কথা দিয়ে ফেলেছেন। এখন গান্ধীজির বিরুদ্ধে যাওয়া মুশকিল। আমি বললাম খোলা ভোটের ব্যবস্থা করতে। সুভাষবাবু আমার পাশে এসে বসেছিলেন; বললাম, 'আপনি বাংলার

বিপ্লবীদের প্রতিনিধি ; তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কথা দিয়ে ভুল করেছেন। এখন একমাত্র উপায়, আপনি প্রত্যেককে নিজ নিজ মত অনুযায়ী ভোট দেবার স্বাধীনতা দিন।' সুভাষবাবু অবস্থা বুঝলেন ও আমার কথামতো কাজ করলেন। গান্ধীজি জওহরলালের অনুপস্থিতির মহৎ কারণ জানিয়ে বাছা বাছা সুন্দর বিশেষণে তাঁকে অভিহিত করেন এবং একবছরের চরমপত্রের শর্তে তাঁকে সমর্থন করতে সম্মেলনকে অনুরোধ করেন। বিরোধী দলের পক্ষে নিম্বকার উত্তর দেন। তিনি বলেন—মাত্র সেদিনও তিনি ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ সালে লেখাপড়া ছেড়ে গান্ধীজির চরণপ্রান্তে বসে রাজনীতি শিখেছেন। এখনও গান্ধীজিকে অনুসরণ করেন। গান্ধীজি হিন্দুশাস্ত্রের উপকথার দোহাই দিয়ে জওহরলালের কর্মকে সমর্থন করেছেন। অতএব তিনিও হিন্দুশাস্ত্র থেকে এ বিষয়ে উত্তর দেবেন। দ্বাপরে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, কাপুরুষতা দোষে দুষ্ট তুমি। আধুনিক শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আধুনিক অর্জুনকে স্পষ্ট কথাটা না বলে ভালো ভালো বিশেষণের কুজ্ঝটিকায় আবরিত করে রাখছেন।

প্রথমদিনকার ভোটে মহাত্মাজী জেতেন। মহাত্মাজীর বিপক্ষে মাত্র ৩০।৮০ ভোট। শরৎচন্দ্র বসু বিরোধীদের 'অ্যামেন্ডমেন্ট' চালু করেছিলেন। সুভাষবাবু গান্ধীজির দিকে ভোট দেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাংলার প্রতিনিধিদের জে. এম. সেনগুপ্তের তাঁবুতে জড়ো করা হল। সদ্য আন্দামান-ফেরত মদনমোহন ভৌমিক, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহাশয়দেরও সেখানে আনা হয়েছিল। প্রশ্ন করা হয় তাঁরা কোন্‌টার জন্য দায়মালি হন—'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' বা পূর্ণ স্বাধীনতা ? তাঁরা বলেন—'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' কোন্ জানোয়ারের নাম তাঁরা জানেন না। বাংলা প্রথম থেকে স্বাধীনতার দাবি করে। 'স্বরাজ' কথা ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম উচ্চারিত হয়। ১৯০৭ সালে অরবিন্দ ব্রিটিশ শাসনের সম্পর্কশূন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ১৯২৩ সালে স্পেশ্যাল দিল্লী সেসনে বাংলার প্রতিনিধিরা 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাব আনেন। আজ বাংলা জগতে কি করে মুখ দেখাবে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে' জাতীয় আদর্শ বলে প্রকাশ করলে ? সুভাষবাবু বলেন—গতকাল গান্ধীজিকে যে কথা দিয়েছিলেন, সেটা দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে। তিনি সাধারণের সেবক। আজ সাধারণ যা বলবেন আগামীকাল তিনি তাই করতে প্রস্তুত। প্রকৃতপ্রস্তাবে কাউকে দোষী করা যায় না। গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব এত বিশাল এবং আন্তরিকতা এতই প্রবল যে দুজন ছাড়া তাঁর সামনে 'না' কেউ বলতে পারেন নি। দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন জিন্নাসাহেব।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বললেন, 'এমন করলে সুভাষ, তোমার জনসেবার

জীবনে দাগ পড়ে যাবে।' সুভাষবাবু বললেন, সেনগুপ্ত যেন তার জন্য না ভাবেন। সতীন সেন বললেন, 'সুভাষবাবু যদি ভুল ক'রে সেটা সংশোধনের সুযোগ খোঁজেন, তবে সেটা কেন তাঁকে দেওয়া হবে না ?' সতীনবাবুর কথা সকলে মেনে নিলেন। পরদিন কংগ্রেসে সুভাষ বিরোধী দলের নেতৃত্ব করে গান্ধীজিকে চমৎকৃত করে দেন। গান্ধীজি বলেন, এটা ঠিক হল না।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে যাই ঘটুক, মেদিনীপুর জেলে বসে মিলিত বিপ্লবীদল যে একটা নেতৃত্ব দেবার কথা ভেবেছিল—তাইই এখানে তরুণদের এই উচ্ছ্বসিত আবেগকে স্পন্দিত, কম্পিত করল। তা হল সতেজ, সজীব। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামরিক কায়দায় এইবার গড়া হল। পূর্ণ দাস, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন, হরিদা, প্রতুল গাঙ্গুলী, অরুণ গুহ, অমর ঘোষ, সুরেন ঘোষ, ভূপেন দত্ত, রবি সেন, হেম সেন, সত্য গুপ্ত প্রভৃতির কর্মপ্রতিভা এখানে সুন্দর বিকাশলাভ করে। বাংলার তরুণরা সত্যই দেশের কাজে একটা নতুন অবদান যোগালো। সংগঠন না হলে ১৯৩০-৩৪ সালের ঘটনাগুলি ঘটতে পারত কিনা সন্দেহ। এই ধাপ পরবর্তী ধাপের জমি তৈরি করে দিয়েছিল। এই দিনেই চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদের গৌরবময় যুদ্ধের এবং তার পরিপোষক পরবর্তী ঘটনাগুলির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এদিনের জয় ছিল যুক্ত-বিপ্লবীসংঘের জয়। গান্ধীজি একে সেদিন 'সার্কাস' বলে উপহাস করেন। একবছরে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি মানে নি। ১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজি নিজেই 'স্বাধীনতা' প্রস্তাব পেশ করেন। সেই থেকে শুধু 'স্বরাজ' না বলে, 'পূর্ণ স্বরাজ'কে কংগ্রেসের দাবি বলা হয়ে থাকে। এই বছরে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'য় ধৃত যতীন দাস অনশনে প্রাণ দেয়। এর ফলে ভবিষ্যতে কয়েদীর প্রতি ব্যবহার এবং গ্রাসাচ্ছাদনের উন্নতি হয়। ১৯২৮ সালের চরমপত্র ব্রিটিশের কাছে ১৯৪২ সালেও অনাদৃত হয়ে রয়েছিল। জাতীয় মর্যাদাহানিতে প্রতিটি অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় মরমে-মরা হয়ে আছে। আত্মসম্মানী হৃদয় যাদের আছে, তারা শক্তিসঞ্চয় ক'রে আর একবার চেষ্টা হয়ত করতে প্রস্তুত হবে।

১৯২৯ সাল ভালো কি মন্দ বাংলার রাজনীতির পক্ষে সে-প্রশ্নের উত্তরটা কম্পিত বক্ষে দিতে হয়। যতীন দাস এই সালে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়। খুব গৌরবের কথা। পূর্ণস্বরাজের দাবি নিয়ে কংগ্রেস দাঁড়ায়। খুব অভিপ্রেত। ছাত্রসংঘ, যুবকসংঘ সুভাষচন্দ্রকে নেতা স্বীকার করে নেয়। খুব আনন্দ ও আশার কথা। আমার বন্ধুদের প্রয়াস ও আগ্রহে সুভাষচন্দ্র দেশসেবার কাজে নেতৃত্বের ভূমিকায় এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু আসলে পাষাণ-প্রাচীর ভাঙবে যারা, সেই সংযুক্ত বিপ্লবীসংঘের অবস্থাটা কি হল ? তাদের মধ্যে কে কে এ. আই. সি. সি.-তে যাবে, কে কে বা বি. পি.

সি. সি.-তে বসবে এই প্রসঙ্গ হল কাল। কর্মীদের মধ্যে এই বিচার ও বাদাবাদি নিয়ে মতভেদ হল। তার থেকে এল মনোভেদ। সাজানো বাগান আবার শুকিয়ে গেল। বিপ্লবীরা আবার বিভক্ত হল দু'ভাগে।

শ্রদ্ধেয় নরেন সেন আমায় সংবাদ পাঠালেন—অমুক অমুক—দু'দলেরই লোক—মিলন ভাঙল। 'স্বাধীনতা' ছাড়া 'শঙ্খ' কাগজ বেরুল। সোজাসুজি বোঝা গেল দুটি দলের দুটি আলাদা-আলাদা মুখপত্র।

একদল রইল 'যুগান্তর পার্টি'—সুভাষবাবুকে নিয়ে। আর একদল গেল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে। কথা উঠল 'স্বাধীনতা' বনাম 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর যুদ্ধ। সেনগুপ্ত গান্ধীজির পুরো সমর্থক। সুভাষচন্দ্র ঠিক তা নন, নতুন উষার সূর্যের পানে তাঁর দৃষ্টি। প্রকৃতপ্রস্তাবে এসে গেল ছন্নছাড়া ভাইয়ে-ভাইয়ে লড়াই। রাজনীতি ডুবে গেল বিশ-বাঁও জলের তলে। ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল ছাত্রসমাজ হয়ে গেল দু'টুকরো। বড় ভাইদের কাছে ছোট ভাইরা শিখল কি—কে তার উত্তর দেবে ?

আমি 'মর্যাদার কথা'র মর্যাদা রাখাই স্থির করলাম। শপথ-বাক্য শিরোধার্য রইল। রাজনীতিতে আবর্জনা ও নোংরামি আসছে দেখে মিলমিশের জন্য আমার শেষ চেষ্টা করে দূরে সরে রইলাম। মধুর সম্পর্ক সকলের সঙ্গেই রাখলাম। অকাজ না করাটাই কোনো-কোনো সময়ে একটা ভালো কাজ। আপনাদের মধ্যে খেয়োখেয়ি আমি কোনোদিন 'রাজনীতি' বলে মনে করি নি। এটাতে তো আমরা চিরকাল দড়। কোন্ শত্রু এমন বদনাম দিতে পারে যে আমরা এটা পারি না ?

১৯২৯ সালের জুন মাসে আমার নিজের কলিজা দু' টুকরো করে এলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে মিলনের গ্রন্থি নিজ হাতে খুলে দিয়ে আসতে হল। নভেম্বর মাসে ভূপতি আমায় নিয়ে যায় মিলনের শেষ চেষ্টার জন্য। কিছু হল না। দোষী দু'দিকেই ছিল। জীবনে যা মূলসূত্র ধরেছি তাকে খুইয়ে আত্মঘাতী রাজনীতিতে অংশ নিলাম না। সাধের বাংলার কর্মক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। স্থির করলাম যে-দলই সাহায্য নিতে আসবে তাকেই সাধ্যমতো সাহায্য করব। নিরালম্ব স্বামিজীর মতো দু'দলেরই শুভাকাঙ্ক্ষী থাকব। বাস্তবিকই যুগান্তর ও অনুশীলন—দু'দলই পরামর্শ নিতে আসত। অনুশীলনের রমেশ আচার্য, মদন ভৌমিক ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীও এসেছিলেন।

গান্ধীজির লবণ-সত্যাগ্রহকে উপলক্ষ করে ১৯৩০ থেকে বাংলার বহু কংগ্রেস-কর্মীকে আটক-আইনে ৭।৮ বছর আটকে রাখা হয়। 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি'তে ১৯৩১ সালে রাজনৈতিক কয়েদী ছাড়ার শর্তের সময়ে কিন্তু এদের কথা কংগ্রেস-কর্তাদের মনে আসে নি। এই কথাটাই ১৯৩৮ সালে গান্ধীজি হিজলি জেলে

বিপ্লবী নেতাদের মুক্তির চেষ্টায় দেখা করতে গেলে, তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন—মহাত্মাজী যেন আন্দামান-ফেরত কয়েদীদের জন্য যে চেষ্টা করছেন তাই করে যান। এঁদের জন্য তাঁকে আর কষ্ট করতে হবে না।

১৯৩৮ সালে বাংলার লাট স্যার জন অ্যান্ডারসন হিজলি জেলে সুরেন ঘোষ ও প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করেন। তারপর ক্রমে রাজবন্দীদের মুক্তি আরম্ভ হয়। মুক্ত বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় স্বভাবতই আমি খুব প্রীত হই।

বাঙালী জাতির বীরত্ব ক্রমে বেড়েই চলল। মেয়েরা এবার রিভলভার নিয়ে কার্যক্ষেত্রে নেমে এলেন। প্রীতি ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার ও কল্পনা দত্তের কথা চিরস্মরণীয় থাকবে। শান্তি, সুনীতি কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে চরম শাস্তি দেন। বীণা দাস বাংলার লাট জ্যাক্সনের উপর গুলী চালান। ভাগ্যক্রমে লাট বেঁচে যান।

কল্পনা দত্ত ও প্রীতি ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামের কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন। প্রীতি তো পাহাড়তলিতে একটা সশস্ত্র অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ১৯৩০ সালে বাংলা সহিংস ও অহিংস দুই পন্থায়ই অন্যান্য প্রদেশ থেকে অধিকতর অগ্রসর হয়। এই সময়ে মনোরঞ্জন গুপ্ত ইংরেজের গুণ্ডামি দেখে মনে করেন—আর সহ্য করা নয়, যদি কেউ ঢিল ছুঁড়ে মারে সেও হবে সাধুবাদের যোগ্য। মাদ্রাজ থেকে তিনি বাংলায় এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। টেগার্টের ওপর বোমা পড়ে। উজ্জ্বলা দার্জিলিং-এ লাট অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার চেষ্টায় সহায়তা করেন। এদিকে মেদিনীপুরে তিনটি ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পরের পর নিহত হন—পেডি, ডগলাস, বার্জ। ঢাকায় ডুর্নোর ওপর গুলী চলে; তিনি আহত হন। পুলিসের কর্তা লোম্যান নিহত এবং হাড্সন আহত হন। রাজসাহি জেলের কর্তা লিউকাসও আহত হন।

অন্যদিকে মেদিনীপুরে তমলুক ও কাঁথি মহকুমা অসাধ্য সাধন করে। ইংরেজ সরকার যে বর্বরতা স্ত্রীলোকের উপর ও পবিত্র গৃহপ্রাঙ্গণে করেছে তার তুলনা কেবলমাত্র যুদ্ধে শত্রুর দেশ-আক্রমণেই শোনা যায়।

অ্যাটর্নি যতীন্দ্রনাথ বসু নরমপন্থী উদারনৈতিক দলের লোক। তিনি ঐখানকার (কাঁথির) ঘটনার অনুসন্ধানে গেলে তাঁকে আট্কে ফেলা হয় এবং ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। কাঁথির নারীদের বীরত্ব এ-যুগে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

১৯৩৭-৩৮ সাল। সুভাষবাবু গান্ধীজির আশীর্বাদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি, কিন্তু বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশের আস্থা তাঁর ওপর ছিল না। ফলে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মার্চ মাসে তিনি আমাকে একটা পত্রে এইজন্য ডেকে পাঠান। সুভাষবাবুর মুখে সব কথা

শুনে কিছু শর্তে আমি তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হই। বি. পি. সি. সি-র বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করতে অনুরোধ করি। বাংলার লোক হয়েছেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু বাংলায় নেই তাঁর সমর্থন—এটা বড় অশোভন অবস্থা। বাইরে তারা মুখ দেখাবে কি করে? দেখলাম দেশবন্ধু যে সুবিধা পান নি, সে সুবিধা এসেছে সুভাষবাবুর কাছে। দেশবন্ধুর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সুভাষবাবু এসময় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। এঁকে নিয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে। আমি বরাবর যুক্ত-সংগঠনের (United Front) পক্ষপাতী। আগের তুলনায় এখন নতুন দলও হয়েছিল কয়েকটা বেশী। সুতরাং সুভাষবাবুকে মাথায় রেখে তাদের মধ্যে কাজের জন্য একটা একতা (Working Unity) বা মিতালি খাড়া হতে পারে। ভ্রাতৃ-বিরোধ উৎকট না হলে কিছু প্রকৃত কাজ এগুতে পারবে। এজন্য তাঁকে বলা হয়েছিল—

(ক) তিনি যেন নিজের কোনো 'দল' দাঁড় করাবার চেষ্টা না করেন। তাঁকে ছেড়ে কেউ চলতে পারবে না। তাহলে দীর্ঘকাল তাঁর নেতৃত্ব বাংলায় কায়েম থাকবে।

(খ) প্রকৃত কৃষক-মজুর-বিপ্লবী কর্মীদের বিরোধী কোনো লোককে প্রদেশের সেক্রেটারি যেন তিনি না করেন। সুভাষবাবু এতে রাজী হন।

(গ) তিনি নিজে যখন রাষ্ট্রপতি, বাংলা প্রদেশের কংগ্রেসের সভাপতি নিজে না হয়ে অন্য কাউকে করা সুযুক্তি। তাঁর স্বাস্থ্যে ধাক্কা লাগবে কম। আর, 'রাজা সবাইকে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান'। এতে অপরদের যশের আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি হয়ে তাঁর দৃঢ় সমর্থকের সংখ্যা বাড়বে। সুভাষবাবু এ কথাও ভেবে দেখবেন বলেছিলেন। অবশ্য সুভাষবাবু বাংলার সভাপতি হতে পারেনই না—এমন শর্ত ছিল না।

সুভাষবাবু শর্তগুলি মেনে নেওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে তাঁর সমর্থক হলেন অধিকাংশরাই। একবছর কংগ্রেসের ভালো কাজ চলবে আশা করা গেল। এম. এন. রায় কলকাতায় ছিলেন। তিনিও বন্ধুজন। বাংলায় তাঁকে একবার ঘুরিয়ে নেওয়ার কথা চলছিল। আমি সবাইকে এবং রায়কেও বুঝিয়ে সে-বছরটা খালি রাষ্ট্রপতির বঙ্গ-পরিক্রমার বছর রাখা স্থির হোক, এই পরামর্শ দিলাম। কাজেও তাই হল। সকলেই সুখী হতে পারলেন।

আগেই বলেছি ১৯৬৩ সালে সুভাষবাবু কটক থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়তে আসেন। বর্তমান পি. এস. পি.-নেতা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মেডিকেল ছাত্র। তাঁর একটি জমায়েত ছিল, সেখানে সুভাষবাবু আসতেন। সুরেশবাবু আমায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল গঠন উপলক্ষে দেশবন্ধুর প্রতিনিধিরূপে আমাদের কর্মীদের সাহায্য প্রার্থনা করতে এলে

আমি তাঁকে পরামর্শ দিই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসতে। ১৯২৮ সালে বিপ্লবীরা তাঁকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে উন্নীত করেন। আমরা তাঁর উন্নতি ও কল্যাণকামী, তাই সুভাষবাবু মুশকিলে পড়ে সাহায্যের জন্য ডাক দিলে ছুটেছিলাম।

সুভাষবাবু আমায় যে পত্র লেখেন এখানে তার প্রতিলিপি দিলাম ঃ

Telephone : Park 59 — 38-2, Elgin Road, Calcutta
Tele. : Suvas Bose, Calcutta — 22. 3. 38

My dear Jadu Gopal Babu,

I have been longing to meet you for some time past. There are many things I would like to discuss with you. Sj. Suren Ghose is in Calcutta and he would also like such a discussion. Could you come to Calcutta for a few days ? I shall be very glad if you could come and shall be grateful.

I shall be here till the middle of April, but I shall be busy for 4 days from the lst April—in connection with the Working Committe's meeting.

Hoping to hear from you and with warmest regards.

Yours very sincerely,
Sd./ *Subhas C. Bose*

আমি কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের ব'লে-ক'য়ে সুভাষবাবুকে সারা বাংলার একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃতিলাভের ব্যবস্থা করে আসি। ঐ সময় এম. এন. রায় কলকাতায় ছিলেন। সুভাষবাবুকে বলি তাঁকেও সঙ্গে টেনে নিতে। দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ এবং একান্তে আলোচনার ব্যবস্থাও করিয়ে দিই। পরে শুনলাম ফল কিছুই হয় নি। সুভাষবাবু ও এম এন রায়ে মিলে-মিশে একসঙ্গে কাজ করার ব্যবস্থা হয় নি।

কথায় বলে—'তুমি যাবে বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে'। বাংলার দুর্ভাগ্য—সুভাষবাবু অযোগ্য মন্ত্রীর মন্ত্রণা, অথবা নিজের বুঝবার দোষে বহু পরীক্ষিত, পুরাতন বন্ধুদের শত্রু করে বসলেন। আর বন্ধু করলেন তাদের যারা তাঁর বন্ধু ছিল না। নিজের দলও করলেন। টাকা দিয়ে দলরক্ষা এক বিষম ব্যাপার। মোটা টাকার দরকার। সে টাকা যোগাড় করতে অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটে গেল। মধ্য কলকাতায় বিপিনদা জনপ্রিয় নেতা। তাঁর রাজনৈতিক জীবন অতি পুরাতন ও পবিত্র। রাজনীতির জন্য অনেক দুর্ভোগ তিনি ভোগ করেছেন। তিনি করপোরেশনের

কাউন্সিলার হতে চাইলেন। সুভাষবাবু তাঁর বিরুদ্ধে ধনী নটবর দত্তকে দাঁড় করালেন—সুভাষবাবুর দলের জন্য টাকার প্রয়োজন। বিপিনবাবু শক্ত লোক। তাঁর সঙ্গে সুভাষবাবু ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে নিলেন এই বলে যে, তাঁকে অলডারম্যান করা হবে। কাজের বেলায় দেখা গেল বিপিনবাবু বাদ গেছেন, অলডারম্যান হয়েছেন সুভাষবাবু নিজে। এ সময় মোস্লেম লীগের ইস্পাহানির বড় দাপট। তাঁকে তুষ্ট করা হচ্ছিল। ইস্পাহানি বিপিনদাকে চান না। নটবরবাবু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পদিনে মারা গেলেন ; বিপিনবাবু আবার কাউন্সিলার দাঁড়ালেন। সুভাষবাবু সে সময় জেলে। জেল থেকে তিনি বিপিনবাবুর বিরুদ্ধে আবেদন বের করলেন এবং একজন ধনীকে খাড়া করলেন। তাঁর দল বিপিনবাবুর বিরোধিতা সুরু করল। ফলে এই অসুন্দর ব্যাপারে বহু লোক মনে ব্যথা পেল, সুভাষবাবুর সমর্থকের সংখ্যায় ভাঙন ধরল। বিপিনবাবু জিতলেন—লোকে পায়ে হেঁটে, ট্রামে বাসে চড়ে গিয়ে বিপিনবাবুকে ভোট দিয়ে এল। বিপিনবাবু ছিলেন সুভাষবাবুর সমর্থক। তিনি সুভাষকে ছাড়লেন। এটা সম্ভবতঃ ১৯৪০ সালের ব্যাপার। বিপিনদাকে কেন্দ্র করে সুভাষ-বিরোধী দল দানা বাঁধতে লাগল।

এছাড়া অসময়ে বামমার্গী ও দক্ষিণমার্গীর ঝগড়া সুরু করে কংগ্রেসকে—দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে জোর দিয়ে লড়তে পারত তাকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল। পরে দেখা গেল যারা অত্যধিক উৎসাহিত করেছিলেন সেইসব সুসময়ের বন্ধুরা সুভাষবাবুকে অসময়ে ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। সুভাষবাবুকে পরের বছরের সভাপতি নির্বাচনের সময়েও আমি কলকাতায় থেকে আমার বন্ধুদের বুঝিয়ে ভোট দিইয়ে ছিলাম। শুধু তাই নয়, যাঁদের সাহায্যে সুভাষবাবু বি. পি. সি. সি.-তে প্রথম বছর কাজ করতে পেরেছিলেন এবং যাঁদের কংগ্রেস থেকে তাড়াতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, তাঁরাও অনুরুদ্ধ হলেন সুভাষবাবুকে ভোট দিতে। তাঁরা ভোটও দিলেন। সুভাষবাবুর জয়ের খবর পেয়ে আমি কলকাতা ছাড়ি। কংগ্রেসের নিখিল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ছাড়েন। সুভাষবাবু কংগ্রেস মেম্বারদের নির্বাচিত সভাপতি—তাঁকে কাজ করতে না দেওয়া অতীব গর্হিত। কংগ্রেসের সভ্যদের এতে অসম্মান বোঝায়। সুভাষবাবুর প্রতি সহানুভূতির বন্যা তখন বইছিল। তিনি যদি ত্রিপুরীতে মাত্র পদত্যাগ করে একটা বছর মেম্বারদের মধ্যে সংগঠন চালাতেন, পর বছর তাঁকে খোশামোদ করে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পথ পেতেন না কংগ্রেসের কর্তারা। যা হবার হল। এত বড় একটা মারাত্মক ভুলে বাংলার তথা সারা ভারতের যা ক্ষতি হল তা সহজে পূরণ হবার হয়। এই ভুল না হলে হয়ত তাঁকে দেশত্যাগী হতে হত না।

গ্রন্থের বন্ধু নরেন ব্রহ্মচারী (নরেন সেন) তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন যে দেশে

আর তিনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। বিদেশে গেলে হয়ত অসাধারণ কিছু করে উঠতে পারেন।

১৯৩৯ সালে অগস্ট মাসে রাঁচিতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেছিলেন। যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। সেই পরিস্থিতিতে আমার কী যুক্তি জানতে চান। আমি বলি—কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করুন। তাতে যদি ফল না হয়, তাহলে অসহযোগ আন্দোলন করা সমীচীন হবে। তিনি প্রশ্ন করেন, কংগ্রেস মন্ত্রীরা কেন পদত্যাগ করবেন? আমি এই কারণ দেখাই—মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা নেই, অথচ শান্তি-শৃঙ্খলাদি রাখার দায়িত্ব আছে। এরূপ অবস্থা বা দুর্বলতা জানা সত্ত্বেও দেশেরই বহু লোক তাঁদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু তাঁদের কাছে দাবি করছিল। মন্ত্রীরা তাদের তুষ্ট করতে না পারায় কংগ্রেসের ভিতরে বা বাইরে থেকে কংগ্রেসের দুর্নাম এরা রটনা ক'রে সাধারণ লোকের কাছে কংগ্রেসকে হেয় ও অপ্রিয় করে তুলেছিল। সাধারণকে নিয়ে কংগ্রেসের ক্ষমতা। পদত্যাগে মন্ত্রীদের দুর্নাম, তার সঙ্গে কংগ্রেসের বদনাম কেটে যাবে। পুরোনো কথা লোকে ক্রমশঃ ভুলে যাবে। আবার পবিত্রভাবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হতে পারবে। দ্বিতীয় কারণ—যুদ্ধের বাজারে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু কিছু লোক কিছু বলবে বা করবে। মন্ত্রীদের ঘাড়ে চাপ পড়বে তাদের গ্রেপ্তার করতে, লাঞ্ছিত করতে। সে কাজ করলে কংগ্রেস আরও অপ্রিয় হয়ে যাবে। মন্ত্রিত্বত্যাগ ও অসহযোগের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হবে, তাতে ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠলেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মন পাবার একটা অভূতপূর্ব অভিনব চেষ্টা করতে আসবে। সেইটেকে সুবুদ্ধি মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারলে ভারতের উপস্থিত লাভ হবে। তবে এটাও জানতে হবে যারা সত্যকার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চায় তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বাকি থেকে যাবে। সে যাই হোক, ভারত নিজের ঘরে প্রভু হতে চায়। প্রভুর পরিবর্তন চায় না। নিজেদের হাতে শক্তি এলে দেশে একটা মাতুনি লেগে যাবে। তাতে ফল ভালো হবে।

রাষ্ট্রপতি সব শুনে বললেন—'গান্ধীজি এই কথা বোধ হয় মানতে পারেন।'

বোধ হয় গান্ধীজি আগে থেকে এই ধরনের চিন্তা করছিলেন। যুদ্ধ লাগবার পর বড়লাটের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য সর্বপ্রথম যে ভারতবাসী আহূত হন তিনি মহাত্মা গান্ধী।

লাটপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে বিলাতের বড় গির্জা, রাজপ্রাসাদ, পার্লামেন্ট-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে—এ কল্পনা অসহনীয়। তিনি বিনাশর্তে ইংলণ্ডকে সাহায্যদানের পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি একা, তাই কংগ্রেসকে কথা কইতে বলে দেবেন।

কিছুদিন বাদে তিনি কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন মন্ত্রিত্ব ছাড়তে; তারপর যুদ্ধোদ্যমে অসহযোগ করতে। 'হাম না দেঙ্গে এক পাই—না এক পাই, না এক ভাই'—এর কারণ, কংগ্রেস যা চেয়েছিল বড়লাট সেই শর্তে রাজী হতে পারেন নি।

এত ঘটনার ঘন সন্নিবেশে ভুল হয়ে যেতে পারে যে আমরা কংগ্রেসে ১৯২১ সালে যোগ দিলেও স্বাধীনতাকামীরা যে-পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে না পারবেন যে কংগ্রেস প্রকৃতই স্বাধীনতা চায়—জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্যন্ত বিপ্লবীদের একটা আলাদা গুপ্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হবে। দুটি নেতৃত্ব অর্থাৎ কংগ্রেস ও গুপ্ত-সমিতির নিজস্ব নেতৃত্ব—মতান্তর বা গণ্ডগোল হলে বিপ্লবী কেন্দ্রের নির্দেশ সেখানে বলবৎ হবে। আমি ১৯২৯ সালের শেষদিকে বাংলার সক্রিয় রাজনীতি ছাড়লেও আমার নৈতিক প্রভাব পূর্বের মতো বলবৎ ছিল। বন্ধুরাই এটা বজায় রেখেছিলেন। আমি Adviser-General বা পরামর্শদাতা হয়েছিলাম। এ সময় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ দলীয় নেতৃত্বের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

আমি 'ভারতের সমরসঙ্কট' লিখি ১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে। মুক্ত হয়ে ১৯২৮ সালে ছাপাতে দিই। প্রথমে আমাদের সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'য় ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের কিছু আগে সরস্বতী প্রেস ও লাইব্রেরী থেকে পুস্তকাকারে বন্ধুরা, বিশেষতঃ অরুণচন্দ্র গুহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে নিশ্চিতভাবে আসছে, পক্ষরা কে কে হবেন এবং জাপান ভারতকে বিপন্ন করবে এসব কথা খোলসা করে লেখা হয়। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধুরা ঠিক আন্দাজ করেছিলেন যে কংগ্রেসকে একটা অভূতপূর্ব আন্দোলনে লিপ্ত হতে হবে। সে সময় দুটো আদেশজারীকারী কেন্দ্র থাকা অনুচিত হবে। অতএব আমাদের দলটির কেন্দ্র লুপ্ত করে দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে আমার নামে একটি ঘোষণা সংবাদপত্রগুলির মারফত প্রকাশ করা হয়—এটার লেখা আমার খানিকটা, অপর অংশ ভূপেন দত্তের—'যুগান্তর' একটা যুগ শেষ করেছে; আর সে দলের পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই।

কংগ্রেসে থেকে কংগ্রেসকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত করা এখন থেকে আমাদের বন্ধুদের কাজ হবে। পরাধীন দেশ বৈদেশিক অধীনতা দূর করার জন্য প্রথম প্রথম যে রাজনীতির অনুসরণ করে তা হয় ধর্মজড়িত রাজনীতি। তার প্রসাদে দেশ উদবুদ্ধ হয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়। তখন সময় আসে অর্থনীতি-প্রধান রাজনীতির। বড় যুদ্ধগুলি আপাততঃ ধ্বংসাত্মক হলেও তার পিছনে থাকে মানবসমাজের অগ্রগতির প্রচেষ্টা। নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলি ইউরোপে আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংসের পর ধ্বংস এনেছে। কিন্তু সেগুলির দ্বারা

সমাজের অগ্রগতির সুবিধাও হয়েছিল। মধ্যযুগের সমাজ ছত্রভঙ্গ হল। রাজা ও অভিজাতের সমাজে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপ ছিল তা ছিন্নভিন্ন হয়ে মধ্যবিত্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবিত্তদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে দলিত অবনমিত জনগণের হাতে, কৃষক-মজুরের হাতে রাজশক্তি আনার প্রথম উষার কাজ করেছিল। সেদিন শুধু রুশদেশ তার আস্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে আরো ব্যাপকভাবে প্রসারিত করবে। আগামী ঘটনার এই রূপ আমরা হৃদয়পটে ধরতে পেরেছিলাম। এই সময় স্বাধীনতাকামীদের যুদ্ধের সংগঠন মাত্র একটা থাকা অভিপ্রেত। বিপ্লবী 'যুগান্তর দল' সেই মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করার মানসে স্বেচ্ছায় আত্মলোপ করল। 'যুগান্তর'-এর আত্মলোপ নতুন যুগ আনবার জন্য।

বাংলার এই বিপ্লবী-দলের ঐতিহ্য এবং অবদান অসাধারণ। কত প্রতিভা-সম্পন্ন নেতা এর শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন, কত প্রতিভাশালী সভ্য এর অংক সুশোভিত করেছেন! নিরালম্ব স্বামী, শ্রীঅরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে যতীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নেতাদের তুলনা হয় না।

আবার যতীন্দ্রনাথের অন্তর্ধানে এটি একটি গণতান্ত্রিক নিয়মে চালিত প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। আমাদের মধ্যে কেউ নেতা ছিলেন না। আমরা কয়েকটি বন্ধুতে মিলে একে চালিয়েছি। গৃহনির্মাণের উপাদানগুলির মধ্যে সিমেণ্টের যে স্থান, বন্ধুদের মধ্যে আমার স্থান ছিল তেমনই। ভালবাসার রাজ্য। দেশসেবায় সবাই মেতে থাকতেন। কে হুকুম দিচ্ছে দেখার দরকার কেউ বোধ করত না। চাই শুধু স্বাধীনতার যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার কাজ। 'যুগান্তর' যুগান্তর আনার কাজে ভাবাদর্শ থেকেই গেল। এই হবে এর সার্থক পরিণাম। এর কার্যসূচীতে ছিল জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি—বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাহায্য ও তাদের সঙ্গে সৌহার্দ, এশিয়াবাসীদের সম্মেলন। এগুলিকে বাদ দিয়ে কোনো নতুন পরিকল্পনার আমদানি আজও চোখে পড়ে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে কয়েকটা বিষয় মনের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতের দৈনন্দিন জীবনে অনেকটা জায়গা ছিল যেন অসাড় অন্ধকার। সামাজিকতা ছিল, আমোদ-আহ্লাদ তখনকার মতো ছিল। হাসিতে একটা প্রাণ ছিল, হাসলে লোকের মুখ চোখ ভ্রূ তাতে ভাগ নিত। এসব ছিল, ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চাহিদা ছিল না। এটা না হলে যে জীবন অপূর্ণ থেকে যায় সে-বোধ তখনও তেমন জাগে নি। কৃষিপ্রধান সভ্যতার জীবনে ধীরে-সুস্থে দিনগুলি যেত।

অব্যক্তের ভিতর থেকে সময়ের গুণে ও ঘটনাবলীর চাপে ব্যক্ত হয়ে আসতে লাগল শিল্প-সভ্যতার গুঞ্জন, অভাব-অভিযোগের বৃদ্ধি, সামাজিক অসাম্যের চাবুকপ্রসূত মনের জ্বালা।

একদিকে নয় ক্রমান্বয়ে এটা-ওটাকে প্রতিকার ভাবতে ভাবতে শেষে সব ঝোঁকটা ন্যায্যতঃ এসে পড়েছে রাজনৈতিক অধীনতার ওপর। অনেকে আমায় প্রশ্ন করল —জাতিভেদ, পরদা-প্রথা, বিবাহে যৌতুক-প্রথা প্রভৃতি যা কিছু সমাজে মন্দ আছে তাকে দূর করার জন্য সমাজসংস্কারে তোমরা লাগ না কেন? মন দাও না কেন? আমি বলতাম, একমাত্র প্রাণদ রাজনৈতিক আন্দোলন জীবনের সর্ববিভাগে সর্বব্যাপী হতে বাধ্য। নিদাঘতপ্ত গাছপালা বর্ষাগমে কি শুধু একটা দিকের শেকড় দিয়ে রস টানে? গাছের গোড়া থেকে মাথার পাতাগুলি পর্যন্ত প্রতিটি শির রসে ভরে ওঠে। রাজনীতির বান তেমনি সমাজের সর্বদেহে সজীবতা, সুস্থতা আনবে। কাজেও তাই দেখা গেল—নারী-প্রগতি, দরিদ্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নপ্রচেষ্টা, সমাজসংস্কারের প্রয়াস প্রভৃতি কী সুন্দর ভাবে জেগে উঠছে।

রাজনীতির পীড়া যারা বোধ করল তারা আগেই এগিয়ে পড়ল। কিন্তু এটা খুব ব্যক্ত ঘটনা হলেও এর পিছনে কাকজ্যোৎস্নার মতন জাগছে অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং সামাজিক সংঘর্ষ।

রাজনৈতিক লড়াইয়ের সন্ধানী আলোয় বাকী দুটোর রং মিশে আছে। সংশ্লেষণে আলোর একটা রং—সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক। বিশ্লেষণে ধরা পড়ে তিনটে রং—রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

১৮৫৭ সালের পর ১৯২০ সাল পর্যন্ত একটা কাল ধরে বিচার করলে দেখা যায় যাঁরা সামাজিকভাবে উত্ত্যক্ত তাঁরা প্রথমে আসেন রাজনীতিতে। স্যার ফিরোজ শা মেটা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডবলু. সি. ব্যানার্জী, লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ এঁরা জ্ঞানে-গুণে উপযুক্ত হলেও সমসাময়িক সাহেব সহকর্মীদের কাছে বা

সাহেব-সমাজে নিজেদের সমান আসনে দেখতে পেতেন না। এখানে লাগল ধাক্কা। মার্টিন কোম্পানির স্যার আর. এন. মুখার্জীর কাছে শোনা গেছে, একদিন ইনি ও স্যার (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহ কোনো এক দেশীয় সামাজিক নিমন্ত্রণের পর সোজা ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যান। যেখানে ব্যান্ড বাজত তার কাছে কোনো ভারতবাসীকে যেতে দেওয়া হত না ; দেশী পোশাক পরা লোকেরা কিছুদূরে স্থাপিত বেঞ্চিতে বসতে পারতেন। যেদিনের কথা হচ্ছে সেদিন এই মাননীয় দুই ব্যক্তিকেও ব্যান্ডের দিকে যেতে দেওয়া হয় নি। এঁরা ফিরে এলেন এবং লর্ড রোন্যাল্ডশেকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন। ফলে ঐ তারতম্যের নিয়ম উঠে গেল। ভারতবাসীরা যতই সাহেব হোন—কলকাতা টার্ফ ক্লাবের মেম্বার হতে পারতেন না। রোন্যাল্ডশে এঁদের এই অভিযোগও দূর করেছিলেন।

এ ব্যাপারটা গড়িয়েছিল ঢের দূর। বড়লাট লর্ড রিডিং ও বাকিংহাম প্রাসাদ পর্যন্ত। সামাজিক উত্ত্যক্ততায় যদি মানুষ অতটা যায়, তাহলে তারা আর একটু এগুলেই রাজনীতিতে এসে পড়ে। ডবলু. সি. ব্যানার্জী দার্জিলিঙের কোনো সাহেবী হোটেলে, শোনা যায়, একটা অপ্রীতিকর ঘটনাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। এসেছিলেন রাজনীতিতে। সুরেন্দ্রনাথ যখন আই. সি. এস. হয়ে সিলেটে প্রেরিত হয়েছিলেন ছোট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে, তখনকার বড় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সামাজিক ব্যাপার নিয়ে লাগে টক্কর। তিনি চাকরি হতে বহিষ্কৃত হয়ে রাজনীতিতে দর্শন দিলেন। প্রায় পঞ্চাশের কিছু বেশী বছর আগে নতুন ব্যারিস্টার গান্ধীজির সঙ্গে সে সময়ের রাজকোটের রেসিডেন্টসাহেবের অপ্রীতিকর ঘটনা গান্ধীজিকে রাজনীতিতে আসার প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রতি পেশা বা ব্যবসায়ে কালাকে ধলা সমান হতে দিত না। যেন অব্যক্ত ভাষায় বলত—বামন হয়ে চাঁদে হাত ? কখনও বা বলত—First deserve, then desire.—আগে যোগ্যতা অর্জন করো, পরে সাধ মিটিয়ো।

নিজেদের দেশের সামাজিক বৈষম্যের ক্রিয়া কি কিছু নেই ? অবশ্য আছে। তাও আস্তে আস্তে অব্যক্ত থেকে ব্যক্তের রাজ্যে এসে জমেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীরা বহুসংখ্যায় এসে পড়লেন ১৯২০ সালের পরে। এখানে আছে স্বাদেশিকতা, সামাজিক সামঞ্জস্যের অভাবজনিত অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের আর্তনাদ। শেষেরটা ক্রমশঃ স্ফুটতর হয়ে উঠেছে। কৃষক-শ্রমিক এসে দাঁড়িয়েছে রাজনীতির দরজায়—প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হচ্ছে এখানে।

১৯২০ সালের আগে বাংলাদেশে রাজনীতির জন্য লাঞ্ছিতা মহিলার সংখ্যা ছিল অতি অল্প। বীরভূমের দুকড়িবালা দেবীকে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল দিয়েছিল তিন বছর সশ্রম কারাবাস। তাঁর বাড়িতে পিস্তল ও কার্টিজ পাওয়া গিয়েছিল।

বাঁকুড়ার এক সিন্ধুবালাকে ধরতে গিয়ে দুজনকে ধরে জেলে আনা হয়। একজনকে কিছুদিন বাদে ছেড়ে দেওয়া হয়, অপর জন কিছুদিন আটক থাকেন। বাংলার প্রথম রাজবন্দী শ্রীমতী ননীবালা মুখোপাধ্যায়। এঁদের কথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে।

কিন্তু এই ব্যক্ত নগণ্য সংখ্যা দেখে মনে করলে ভুল হবে যে মহিলারা রাজনীতিতে তেমন মন দিয়েও দেন নি। বিপ্লবীদের নাম-লেখানো মেম্বার হিসাবে তাঁরা অতি অল্পই ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী রাজনীতিকদের প্রতি স্নেহ, মমতা, সহানুভূতিতে অনেক কিছু করেছেন। তাঁদের মতি রাজনীতিতে ঘুরিয়েছে প্রধানতঃ সরকারের নির্যাতন-নীতি। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। এক পরিবারের মামাতো ও পিসতুতো ভাইরা করত রাজনীতি। পিসতুতো ভাই স্বদেশী লোক, এটা কতকটা জানা ছিল। মামাতো ভাইয়ের কথাটা ততটা জানা ছিল না। মামীমা ভাগনের আসা-যাওয়া ততটা পছন্দ করতেন না। পাছে ওর ছোঁয়াচ লেগে তাঁর ছেলেটিও 'খারাপ' হয়ে যায়। বজবজেতে কোমাগাটামারুর হানাহানির ফলে হঠাৎ কলকাতায় বেড়াজাল পড়ল ১৯১৪ সালে। মামীমার ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গেল। ভাগনেটি বাইরেই রইল। তাকে ধরে নি। এরপর মামীমা গেলেন বদলে। ভাগনে না গেলে ডেকে-ডেকে পাঠাতেন ; বলতেন—'তোমাদের শত্রু নিপাত যাক্!'

আর একটা উদাহরণ। একটি ভাই বার বার নির্যাতিত হচ্ছিলেন। বোনের মনের উপর পড়ল তার প্রভাব। একবার ভাইটিকে ধরতে পুলিস আসে। ভাই বেচারি তার মনের মতো 'রাজনীতি' যা করা যায় তাই তখন করছিলেন। পুলিস-সাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। বোনটি সেদিন মায়ের কাছে এসেছিলেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটা দুঃসহ হয়ে দাঁড়াল। তিনি সাহেবের কোটের পিছনটা ধরে দোতালায় তাঁর ছুটে-ওঠা আট্‌কে দিলেন।—'কী পেয়েছ সাহেব! বলা নেই কওয়া নেই, অন্দরমহলে যে একেবারে এসে ঢুকলে?'—বললেন বোনটি।

সাহেব এরকম কিছু প্রত্যাশা করেন নি। একটা এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়লেন যে, কী করবেন ভাবতে দু'মিনিট সময় গেল। পরে বললেন, 'আমায় ছেড়ে দিন। আমি রাজকার্যে এসেছি।' বোনের হাতের মুঠা ততক্ষণে আলগা হয়ে এসেছিল—সাহেব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠলেন। ভাই তার মধ্যে পগারপার।

এমনি করে মা, মাসি, মামী, খুড়ি, জেঠী, বৌদি, বোনেরা সংগঠিত হতেন। নারীদের নামলেখা সভ্য করা হয় নি। মেয়েরা তাহলে হয়তো অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন। কিন্তু তখনকার কর্মীদের পুরুষত্বাভিমান মেয়েদের বিপদের সামনে অতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইত না। যাই হোক, রাজনীতিতে মহিলাদের মন মুকুলিত হয়েছিল এইভাবে—এইসময়কার আন্দোলনে, লেখায় ও কাজে। দেশী কাপড় পরাই একটা মন বদলে দেবার মস্ত জিনিষ। স্বদেশী আন্দোলন সে

কাজটা খুবই করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল কলের শিল্প। এইটাই একটা এমন তীব্র শক্তি যে, মনের উপর রোলার চালিয়ে সামাজিক জীবনে বহু ঢিপিঢাপা ভেঙেচুরে সমান করে দেয়। ১৯২১ সালের জোরালো ফসলের দেখা তাই পাওয়া যায়।

১৯৩০-৩২ সালের গণআন্দোলনে নারী ও পুরুষের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। ১৯৪২ সালে নেতারা কাউকে কিছু বলার সময় বা সুযোগ পান নি। 'গণ' আপনি সাড়া দিল পুঞ্জীভূত যত অভিযোগের বিরুদ্ধে। আপাতদৃষ্টিতে একটা কেমন বেখাপ্পা গোছের ঘটনা বেরিয়ে পড়ল। গান্ধীজি তখন Class-collaborator—সর্বশ্রেণীর অস্তিত্বে আস্থাবান—জমিদার ও প্রজা দুই রাখতে চান। শ্রেণী-সংগ্রামের দিক থেকে যাঁরা জমিদার ধ্বংস করে কৃষককে মালিক করতে ও কিষাণ-রাজ গড়তে চান, সেই দলটি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত বিদ্রোহের আহ্বান দিলেন—কিষাণ কর্ণপাত করল না। ১৯৪২ সালে তাঁরা কিষাণদের যুদ্ধোদ্যমে যোগ দিতে ডাকলেন। আর গান্ধীজি বিদ্রোহের ডাক দেবেন বলেছিলেন। 'গণ' রবাহূত ছিল। তবু বিদ্রোহে তারা এল। আবারও দেখা যায় বিদ্রোহে এল কিষাণ, কিন্তু মজুর নয়। বম্বের ও আমেদাবাদের কয়েকটি কলের ও টাটানগরে 'তেরো দিনের হরতাল' বাদ দিলে, 'ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে' মজুররা মোটেই আসে নি বলা যেতে পারে। বোম্বাই-আমেদাবাদে মালিকরা কল বন্ধ করে দেয়। সেটাকে মজুরের ধর্মঘট বলে না। মজুররা গ্রাম থেকে এসেছে। কিষাণরা গ্রামেই থাকে। তবুও এরকম তফাত কেন হল? এ বিষয়টা অনুধাবনযোগ্য। ১৯৪২ সালের কথা বলছি।

এমনি দেখতে জিনিষটা দুরূহ। কিন্তু বিচার করে দেখলে কি পাওয়া যায়? কংগ্রেসের সন্দেশবাহীরা যে পরিমাণে গ্রামে বিরাজ করছে, শ্রমিক-ক্ষেত্রে তা নেই। এদেশে পঞ্চাশ লক্ষ লোক কলকারখানায় মজুরি করে। শ্রমিক ইউনিয়নে বিশ লক্ষের বেশী লোক নেই; ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নে আবদ্ধ হয় নি। যদি ধরা যায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলি যাদের দ্বারা চালিত তারা কংগ্রেসের বিরোধী, সেজন্য এখানে সাড়া পাওয়া যায় নি—তবু প্রমাণ হয় না, কেন ইউনিয়নের বাহিরের লোকেরা সাড়া দিল না। তাছাড়া ইউনিয়নের মধ্যে যারা, তারাই কতকাংশে সাড়া দিয়েছিল। টাটানগরে, বোম্বাইয়ে, আমেদাবাদে শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল। যাও-বা সাড়া মিলেছিল তা এইখান থেকে। ঝরিয়া কয়লা-ক্ষেত্রে বিশ বছর ধরে ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন হয়েছিল (শ্রমিকরা এই সময় কোনো ইউনিয়নের ধার ধারত না), কিন্তু এখানে কিছু সাড়াশব্দ ছিল না। অথচ মানভূমের গ্রামের দিক থেকে সাড়া ছিল। এর থেকে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায়, কংগ্রেস শ্রমিকদের মধ্যে কাজে তেমন মন দেয় নি। দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত অসম্পন্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা যে পরিমাণে গ্রামে বাস করে সে-পরিমাণে

শ্রমিক-ক্ষেত্রে নয়। এরাই কংগ্রেসের বা স্বরাজ আন্দোলনের মেরুদণ্ড। এরা বুদ্ধিজীবী, এরা শ্রমিকও—কায়িক ততটা নয়, যতটা বুদ্ধির।

আর একটা বিষয় পরিষ্কার হয়। কৃষকের ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের স্বার্থ বেশী কাছাকাছি। স্বরাজ হলে হাতেফিল এদের স্বার্থসিদ্ধির যে সম্ভাবনা এরা বোঝে, শ্রমিক তা বোঝে না বা বোঝে নি। দেড় কোটি জমিহীন ক্ষেতের মজুর আছে। তারা ভাবে স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে জমি পাবে। শ্রমিকরা রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে বেশী অজ্ঞান রয়ে গেছে।

১৯৪২-৪৭ সাল। বর্তমান ভারতে সামন্ততন্ত্র এবং কিঞ্চিৎ গণতন্ত্র অবস্থান করছে। তার উপর আছে সাম্রাজ্যবাদীর কাছে পরাধীনতা। এ অবস্থায় রাজনৈতিক অজ্ঞানতা স্বাভাবিক। আগামী রাষ্ট্রের রূপ কি হবে তার ইঙ্গিতও এর থেকে মেলে। সামন্ততন্ত্র ও মধ্যবিত্তের গণতন্ত্র এখনও পার হাওয়া বাকি থেকে গেছে। নেপোলিয়ন ইউরোপে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে কাজের একটা ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন। সামন্ততন্ত্র খতম করে দিয়েছিলেন। প্রায় একশো বছরের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে জগৎ প্রভাবান্বিত ছিল। তার চেয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে-যাওয়া বিপ্লব এসেছে রাশিয়ায়। তাদের প্রভাব এই যুদ্ধের পর আরো বাড়বে। অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বদিকে সে প্রভাব লোকে আদর করে নেবে।

১৯৪০ সালে মহাত্মাজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আহ্বান জানালেন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ কারাবরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আমার কাছে আশীর্বাদ চাইলেন। আশীর্বাদ দিলাম। এই যুদ্ধের পর ভারত স্বাধীনতার নিকটবর্তী হবেই এ-বিশ্বাস আমার এত দৃঢ় ছিল যে, মধুকে তারও ইঙ্গিত পত্রে দিলাম। বললাম, 'তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম—সকলই মনের ভ্রম'।

১৯৪১ সাল। ভূপেনের চিঠিতে আমন্ত্রণ এল—একবার কলকাতা যেতে হবে। সময় করে যাব বলে উত্তর দিলাম। ১৯৪১ সালের মে মাসের একটা তারিখও নির্ধারিত করেছিলাম। আমি পৌঁছাবার যে তারিখ ঠিক করেছিলাম ঠিক তার দু'দিন পূর্বে ভূপেনরা গ্রেপ্তার হয়ে গেল। বুঝলাম, বাংলার গোয়েন্দা বিভাগ চায় না যে আমাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ এবং বুদ্ধি-পরামর্শের বৈঠক বসে। ওরা চিন্তিত হয়েছিল। কারণ ঐ সময় আফ্রিকায় জার্মানরা জয়ের পর জয় লাভ করছিল। গোয়েন্দা বিভাগ সজাগ, পাছে আমরা একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করে বসি। যাই হোক, আমার যাওয়া হল না। কলকাতা ও কলকাতার বাইরে বহু বন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

এরপর ৬ই ডিসেম্বর আমি কলকাতায় যাই। এর পরের দিন জাপান ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—পার্ল-হারবারে আমেরিকার সর্বনাশ করে; সিঙ্গাপুরে ইংরেজের বিখ্যাত রণতরী প্রিন্স-অফ-ওয়েলস ও রিপালসকে ডুবিয়ে দেয়।

এশিয়াবাসীর মনে ভীষণ উল্লাসের আলোড়ন দেখা দিল। শৃঙ্খল চূর্ণ হবার পথ যে এল সে বিষয়ে অনেকে নিঃসন্দেহ হলেন।

বন্ধুদের মধ্যে যে ক'জন জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরা আমায় নিয়ে একটা আলোচনা সভা করলেন। পুরানোদের মধ্যে ভূপতি মজুমদার সে সভায় ছিলেন। আমরা সরস্বতী প্রেসে আলাপ জমিয়েছিলাম।

আমরা সময় বুঝে নিজেদের স্বাধীনতার কথাই ভাবছিলাম। জাপান যে বর্মা দখল করবে সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। ভারতেও সে উপদ্রব করবে। আমার মনে ১৯২৫ সালের (মেদিনীপুর জেলে) জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবের কথা উঁকিঝুঁকি মারছিল। সে বলেছিল—আমাদের একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হবে; সেটা হবে ব্রিটিশ রাজ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা (Non-recognition of the State)। আজ সেই সুসময় সমাগতপ্রায়।

সেজন্য আমরা সমাজসেবার কার্যক্রম নেওয়া ঠিক করলাম। কারণ এই ভাবে কাজ করলে এটির আবরণে বহু স্বেচ্ছাসেবক জোটানো যাবে এবং তাদের একটা বাহিনী গড়ে উঠবে। আমরা যে কাজ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছি তার জন্য বিস্তর লোকের প্রয়োজন।

তখন মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। আমরাও কংগ্রেসী ছিলাম। পরামর্শ স্থির হল মৌলানাসাহেবের সম্মতি নিয়ে বাংলায় 'নাগরিকরক্ষা সমিতি' (Citizen's Protection Committee) যেমন গড়ে তোলা যাবে তেমন অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সমিতি গড়ে তোলার সম্মতি মৌলানাসাহেব যেন দেন। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে উঠলে তাদের সাহায্যে দেশের বহু জায়গায় সময় বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা, শুশ্রূষা, প্রচার, দল গড়া সুরু হয়ে গেল। আমাদের পরামর্শ সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে আমি রাঁচি চলে আসি। এই পথ গ্রহণ না করলে ইংরেজ সরকার যে লোকসংগ্রহ করতে দেবে না, তা আমরা জানতাম। ভূপতি কলকাতায় সংস্থাটি গড়ে তোলে। সংস্থাটি বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশমতো কলকাতায় কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাইরের লোক নিয়ে 'Bengal Civil Protection Committee' গড়া হয়। ভূপতি সেক্রেটারি, ডাঃ কুমুদশংকর রায় মেডিক্যাল বিভাগের চেয়ারম্যান ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হন। কলকাতা ও হাওড়ায় ২৬টি ও বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বেচ্ছাসেবক কেন্দ্র গঠিত হয়। মূল কেন্দ্র ৪৮নং ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে (বিজয় সিংহ নাহারের বাড়ি) কুমার সিং হলে অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে হোরেস আলেকজাণ্ডারের 'কোয়েকার' পুরুষ ও নারী কর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা

পাওয়া যেত। সরকারী নিষেধ অগ্রাহ্য করে পার্কে পার্কে স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ অভ্যাস করানো হত। মৌলানা আজাদ কয়েকবার এই কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। পণ্ডিত জওহরলাল দক্ষিণ কলকাতায় ৩টি কেন্দ্র পরিদর্শন করে যান। লবণ, কোক-কয়লা ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য কয়েকটি জিনিষের আমদানি করার কাজও বি. পি. সি. সি. করত। করপোরেশন স্কুলের শিক্ষকরা ও নামমাত্র পকেট খরচ নিয়ে অনেক যুবক ডাক্তাররা চিকিৎসা, প্রাথমিক সাহায্য ও শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। বাংলার সকল জেলা ও কলকাতায় স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজারের অধিক হয়েছিল। ইংরেজ কলকাতা আক্রমণ হবার আগেই পালিয়ে যাবে ও শোন নদ পার হয়ে জাপানীদের বাধা দেবে—এই স্থির করেছিল এবং এই উদ্দেশ্যে Denial Policy বা Scorched Earth Policy নিয়ে বাংলায় নৌকা ধ্বংস করে দেয় ও বড় বড় কলকারখানা, হাওড়ার নতুন ব্রিজ, Power House—সর্বত্র 'মাইন' বসায়; যাতে সব একসঙ্গে উড়িয়ে জাপানীদের অগ্রগতি বিলম্বিত করতে পারে। এই শয়তানী চক্রান্তের ফলে দেশ যাতে রসাতলে না যায় সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ আসে ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলার, যাতে সুশৃংখলায় এবং সজ্ঞানে জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা করে অধিকার-বদল (Transfer of control) করবার সম্ভাবনা জেগে ওঠে। দিনের পর দিন দারুণ দুর্ভাবনার ভিতর দিয়ে বি. পি. সি. সি.-র কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হয়। দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার জন্য সকল স্তরের লোক এগিয়ে এসেছিল। রাঁচিতে নারাণচন্দ্র লাহিড়ী, প্রতুলচন্দ্র মিত্রকে সব কথা খুলে বলি। এখানেও একটা সাধারণ সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে রাঁচিতে একটি 'নাগরিকরক্ষা সমিতি' গড়ে তোলা হবে।

আমরা সত্বর সমিতি গড়ে ফেললাম এবং কংগ্রেস যে লোকের আপদ-বিপদের জন্য ভাবে এবং কিছু উপায়ও অবলম্বন করে তার প্রমাণ দিলাম। জনসাধারণের হৃদয় আমাদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সাড়া দিল। সবাই ভয়চকিত। ইংরেজ সরকার এই আকস্মিক বিপদে কিছু করছে না, কংগ্রেস কিছু করতে অগ্রসর—এটা বুঝতে কারু দেরি হল না।

১৯৪২ সালের জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধে এক সময় রাঁচির সিভিল সার্জন কর্নেল জন ডাক্তারদের নিয়ে একটা সভা করেন এবং সহযোগিতা কামনা করে কর্ম বিভাগ করে দিতে চান।

তিনি আমায় যখন কর্তব্য স্থির করে দিতে এলেন, আমি বললাম, 'আমি অন্যত্র বাগ্‌দত্ত।' সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'সরকারের পূর্বে কেউ এমন কাজ সুরু করেছেন—এ যে বিস্ময়ের ব্যাপার।' আমি বললাম, 'তাহলেও ঘটনা সত্য। কংগ্রেস নাগরিকদের রক্ষার কাজে আগুয়ান হয়েছে। মানব-সেবার কাজে আগেই

ডাক তাঁরা দিয়েছেন, সেইজন্য সেখানে আমি কাজ করব স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।'

কর্নেল জন উর্ধ্বতন রাজকর্মচারীদের কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন।

আমরা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে মন দিলাম। শহরে যত রকম লোক আছে সবরকম লোককে আহ্বান জানালাম। আদিবাসীরাও এগিয়ে এলেন। সবরকম লোকের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক কমিটি হল। সভাপতি রইলাম আমি। সাধারণ সেক্রেটারি হলেন শ্যামকিশোর শাহু। এঁরা স্বামী ও স্ত্রী গান্ধীজির অনুচর, ওয়ার্ধা আশ্রমে অনেকদিন ছিলেন।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলি গড়া হল। প্রত্যেক বিভাগের সেক্রেটারি স্বতন্ত্র। মাথায় রইল কার্যনির্বাহক কমিটি। তার অধীনে—(ক) আন্দোলন বিভাগ; (খ) লোকসংগ্রহ বিভাগ; (গ) প্রচার বিভাগ; (ঘ) চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিভাগ; (ঙ) অগ্নির উৎপাত থেকে রক্ষাকারী বিভাগ; (চ) সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগ; (ছ) অর্থ-সংগ্রহ বিভাগ; (জ) স্বেচ্ছাসেবক বিভাগ; (ঝ) যোগাযোগ-রক্ষা বিভাগ; (ঞ) বিপদকালে নতুন আশ্রয় খোলার বিভাগ।

নিজেরা বেসরকারী এ. আর. পি. গড়ে তুললাম। এই বিষয়ে যোগ্যতালাভের জন্য বিলাতের His Majesty's Stationery Office থেকে বহু পুস্তকাদি কিনে আনালাম। তাছাড়া বাংলা ও বোম্বাই থেকে কতকগুলি গেজেট আনাতে লাগলাম; বোম্বাইয়ের 'কংক্রিট্ জার্নাল' খুব কাজের হয়েছিল। এরোপ্লেনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা প্রথমে আসর দখল করি। গোরা সৈন্যরা ভদ্রপল্লীতে অভদ্র আচরণ আরম্ভ করে। তাদের লাম্পট্যের দাহনে তারা স্থান-কাল-পাত্র ভুলতে বসেছিল। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বাছা বাছা জায়গায় পাহারা দিত। কিছু গোরা ঠেঙানোও হত।

ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারী এ. আর. পি. গড়া হল। আমরা শ্রদ্ধানন্দ ট্রাস্টের মাইক্ পাই। সরকারের তা ছিল না। আমার নিজের স্টিরাপ পাম্প ছিল। সরকারের তা ছিল না। সরকার আমেরিকার মুখ তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। সময়ের গুণে একটা অদ্ভুত মনোভাব লোকেদের মধ্যে পরিলক্ষিত হল। তারা সরকারী সবকিছু ব্যবস্থার প্রতি সন্দিহান হল; আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীলতা প্রকাশ করতে লাগল।

জাপান যেমন সিঙ্গাপুর দখল করে বর্মামুখো হল—এখানে ইংরেজ সৈন্যদের জঙ্গলের যুদ্ধ শেখাতে আনা হল। দুর্দিন যদি হঠাৎ আসে তাহলে বোম্বাইয়ের দিকে পালাবার একটা নতুন রাস্তা ছোটনাগপুর থেকে তৈরিতে আগেই মন দিল। যাঁরা গভর্নমেন্টের খয়েরখাঁ তাঁরাই আমাকে আলাদা করে কাজ চালাবার জন্যে উপযাচক

হয়ে টাকা দিতে লাগলেন। খানবাহাদুর আর আলি, রায়সাহেব লছমিনারায়ণ এবং মাড়োয়ারী ধনী রাধা বুধিয়া আমায় সর্বপ্রথম টাকা দেন। তাঁরা পরিষ্কার বলেন, 'ইংরেজকে ভয়ে ভজি—টাকা দিয়ে সমর্থন জানাই। ওরা কি আমাদের রক্ষা করবে? যদি পারেন তাহলে আপনারাই বাঁচাবেন। ওরা সময় বুঝলে আত্মরক্ষার্থে পালাবে এবং পালাবার সময় লুটতরাজ করবে। আপনারা দেশপ্রেমিক, আপনারা ওতে বাধা দেবেন'। জনসাধারণও আমাদের অর্থ সাহায্য করেন।

আমরা বিকেন্দ্রিক সংগঠনে মন দিই। দলে দলে লোকে স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখাতে লাগল। আমরা পল্লীতে পল্লীতে স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য বেঁটে দিলাম। তাদের জমায়েত করে লোক-দেখানো হৈচৈ করলাম না; কিন্তু তাদের প্রস্তুতির শিক্ষা ভালোভাবেই চলতে লাগল। নিয়মানুবর্তিতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হল।

এর মধ্যে ক্রীপ্‌স্-প্রস্তাব এল এবং বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। মানুষের মন ইংরেজের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরূপ হল।

সরকারী হুকুমের ঠেলায় পেট্রোল পাওয়া দুরূহ। অনেক ট্রাক, বাস ও গাড়ি সরকার ছিনিয়ে নিচ্ছিল। তখনকার আইন এমনই ছিল। যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজনের কাছে কারও কোনো কথা খাটত না।

আমরা উর্দু, হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লোকশিক্ষার্থে আত্মরক্ষার নিয়মাবলী প্রচারপত্রে ছাপিয়ে সারা শহর এবং শহরতলিতে বিতরণের ব্যবস্থা করলাম। বিশিষ্ট ধনী খানবাহাদুর আর. আলি আমাদের গাড়ির অভাব বুঝে নিজের একটি স্টেশন-ওয়াগন দিলেন। শুধু গাড়ি নয়, কিছু তৎকালীন দুর্লভ পেট্রোলও দিলেন। সেই গাড়িতে মাইক্ লাগিয়ে আমাদের লোকেরা নগরের সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে এবং বিজ্ঞাপন বিতরণ করে বেড়াতে লাগল।

আর. এন. লাইন্‌স, আই. সি. এস. বিলাত থেকে বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ-বিদ্যা শিখে রাঁচিতে ঐ কাজের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি আমাদের এইরূপ মর্যাদাসম্পন্ন কাজের সংবাদ পেয়ে চটলেন। গাড়ি খানবাহাদুরের বাড়িতে ফিরে পৌঁছানোমাত্র অপেক্ষমাণ পুলিস সেই গাড়ি বাজেয়াপ্ত করল ভারত রক্ষা আইনের বলে।

আমি লজ্জায় ও ক্ষোভে খানবাহাদুরের সঙ্গে কয়েকটা দিন দেখা করতে পারলাম না।

পরে দলীয় একটা সভায় তিনি এসে বললেন, 'সরকার পূর্বে তাঁর দু'খানা গাড়ি নিয়েছিল, আবার এটাও নিয়ে গেল। যাই হোক, আপনারা তাতে দুঃখিত হবেন না। টাকার দরকার হলে লোক পাঠিয়ে দেবেন। কিছু দেব। ওরা কি আমাদের রক্ষাকর্তা? ওরা লুট করার মালিক।'

বোম্বাইয়ে অশোক মেটার নেতৃত্বে যে 'নাগরিক-রক্ষা সমিতি' গড়ে ওঠে তার

সঙ্গে নারায়ণ লাহিড়ী যোগস্থাপন করে এবং সেখান থেকে বহু প্রচারপত্র, ছবি প্রভৃতি আনায়।

আমরা বারী পার্কে (সাধারণ উদ্যান) আদিবাসী স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে আগুন নেভাবার একটা প্রদর্শনী করি। শহরের বহু লোক জমায়েত হন। সুশৃঙ্খল-ভাবে একটি সাজানো বাড়িতে আগুন লাগানো হল—অর্থাৎ শত্রুরা আগ্নেয় বোমায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। আদিবাসী স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই আগুন নেভাল। জনহৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হল।

লাইন্‌স্‌ ওদিকে আরো খাপ্পা হলেন। টাকা দিয়ে ভাঙাবার চেষ্টা করলেন আমাদের গুণী কর্মীদের। কিন্তু বিফলপ্রয়াস হলেন।

চীফ সেক্রেটারি একদিন আমায় ডেকে বললেন 'সব স্বেচ্ছাসেবক আপনাদের। ডেপুটী কমিশনার লোক পাচ্ছেন না। কিছু লোক ওদিকে যেতে দিন।' আমি শুধু বললাম, 'That is the measure of the Government's popularity—দেখতেই তো পাচ্ছেন সরকারের জনপ্রিয়তা কিরূপ?'

গোয়েন্দা বিভাগ বিচলিত হল। শুনল আমাদের স্বেচ্ছাসেবক আছে কিন্তু তাদের দেখা যায় না। সন্দেহের কথা।

শ্যামকিশোর বললেন, 'স্বেচ্ছাসেবকদের চরকা কাটার ব্যবস্থা নেই—বড় দুঃখের কথা।' আমরা জানালাম এ-কাজের কর্মীরা চরকা কাটে না।

এদিকে মে মাস এসে গেল। জাপান ক্রমশঃ বর্মা দখল করে নিল।

মিলিটারিদের রোজ দু'শো গোরুর গাড়ি দরকার। তারা ডেপুটী কমিশনারকে জানাল। তিনি হুকুম দিলেন এক ব্যক্তিকে। ইনি গ্রাম থেকে আগত গাড়ি ধরতে লাগলেন। বেশ কিছু 'আমদানি'র পথ হল। যে উৎকোচ না দেবে তাকে মিলিটারির কাছে সমর্পণ করা হবে; সে আর বাড়ি ফিরে যেতে পাবে না। বাড়ির লোকের উদ্বেগে দিন কাটবে। এরা শহরে চাল বিক্রি করতে আসত; ফেরার সময় গ্রামে কেরোসিন, নুন, দেশলাই প্রভৃতি নিয়ে যেত। গ্রাম ও শহরে জিনিষপত্রের একটা সুন্দর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চলে আসছিল।

ভয়ে গাড়োয়ানরা শহরে চাল আনা বন্ধ করল। গ্রামেও দেশলাই, নুন, কেরোসিন তেলের অভাব উৎকট রূপ ধারণ করল। জিনিষপত্রের আদান-প্রদানের ভারসাম্য ব্যাহত হল। তার ফলে নানারকম গুজব ছড়াতে লাগল। সারমর্ম হল—সরকারের অবস্থা খারাপ, আর চালাতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে লোক ছোটাছুটি আরম্ভ করল—'রক্ষা করুন, রক্ষা-সমিতি!' আমি ডেপুটী কমিশনারকে শহরের অবস্থা জানাই। তিনি আমায় ডেকে পাঠান। পরে ঠিক হয় মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাড়োয়ানরা ভাড়া পাবে; মিলিটারিকে গাড়ি

দেবে। গ্রামের গাড়িতে আর হাত পড়বে না। সরকারের উপর ক্রমবর্ধনশীল অনাস্থা সরকারের ভালো লাগছিল না।

শহর ও গ্রামের লোকের সংকট কেটে গেল। 'নাগরিক-রক্ষা সমিতি'র জনপ্রিয়তা স্থান পেল অতি উচ্চে।

এই অবকাশে ডেপুটী কমিশনার আমায় অগ্নি-আক্রমণে রক্ষার জন্য সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। আমি রাজী হই। রাজনীতিতে অসহযোগ মেনে চলতাম। সমাজসেবায় সে কথা ওঠে না। উভয়পক্ষ পারস্পরিক সহায়তায় কাজ এক্ষেত্রে করতে পারে। উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের সময় কংগ্রেস ও সরকার ১৯৩৪ সালে এভাবেই কাজ করে।

তিনি আমায় অনেক অনুনয় করে বলেন আমি যেন সরকারী কাজের ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিই। তিনি বলেন তাঁদের চেয়ে আমাদের সংগঠন সুষ্ঠু। তাঁরা কাজ ভাগ করে নিতে রাজী। আমরা এক্ষেত্রে প্রাধান্য হারাব না। সরকার, যাঁদের যেরকম যোগ্যতা আছে, তাই নিয়ে এগুবে। এই ব্যাপার নিয়ে চীফ ওয়ার্ডেন আমার বাড়িতে কয়েকদিন আসেন এবং কথাবার্তা চালান।

একটা মজার ব্যাপার ইতিপূর্বে ঘটে যায়। আমি একদিন একজন প্রাচীন কংগ্রেস নেতার মুখে শুনলাম, ডেপুটী কমিশনার আমাদের প্রতিষ্ঠানটি বেআইনী ঘোষণা করতে মনস্থ করেছেন। গোরুর গাড়ির ব্যাপারের পূর্বে এই ঘটনা। ডেপুটী কমিশনার স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে কাজ চালানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক আমরা পাই; সরকার পায় না। তাই নিয়ে 'নাগরিক-রক্ষা সমিতি'কে বেআইনী ঘোষণার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁরা টাকা দিয়ে লোক রেখে কাজ চালাতে বাধ্য হন। গোরুর গাড়ির ব্যাপার নিয়ে তাঁর সুর বদলে যায়। আমি স্পষ্টই বলেছিলাম—যত গুজব রাষ্ট্র হয়েছে তাই কি যথেষ্ট নয়? সরকার কি আরো বদনাম কিনতে চান?

তিনি মিলেমিশে কাজ চালানোর পক্ষপাতী হন এবং মিলনের কথা পাড়েন। তাঁর হয়ে চীফ ওয়ার্ডেন কয়েকদিন বাদে বলেন, লোকশিক্ষার ভার তাঁরা নেবেন। আমরা হাতে-কলমে কাজ করব। আমাদের গণের মধ্যে স্থান আছে। সরকারের তা নেই। কিন্তু সরকারের একটা প্রতিষ্ঠা আছে। আমরা যেন সেটা স্মরণের বাইরে রেখে না দিই। সরকার জনগণের মধ্যে ঢুকতে চায়। আমি জানতাম সেটা হবে বৃথা চেষ্টা।

তিনি বললেন, 'তাঁরা অনেক জিনিষপত্র সংগ্রহ করছেন এবং করেছেন। বিশেষজ্ঞ তাঁদের মধ্যে আছে। সরকারী যন্ত্র কত শক্তিশালী—তাঁরা সকেন্দ্রিক সংগঠন করেন। এদিকে গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের সম্বন্ধে গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহে উঠে-পড়ে লাগল। বহু নাগরিকের কাছে ঘোরাঘুরি সুরু করে দিল।

যাই হোক, চীফ ওয়ার্ডেন কথা চালাতে লাগলেন। তিনি বললেন, '...মত প্রচার করে ও শিক্ষা দিয়ে আমরা ওদের মন তৈরি করি। আপনারা আমাদের পিছু পিছু আসুন। আমাদের সরঞ্জাম যেখানে নেই সেখানে আপনারা স্থান পাবেন।' চীফ ওয়ার্ডেন শেষ পর্যন্ত ধরে বসলেন, আপনাদের সার্টিফিকেট নিতে হবে। তাতে লেখা থাকবে—যখন যেখানে ডাকা হবে তখন সেখানেই যেতে হবে। আমাদের সংগঠনের দিক থেকে আমি এরকম সার্টিফিকেট নিতে অস্বীকার করলাম। তিনি রাজ্যরক্ষা আইন দেখালেন—তাতে এরকম সার্টিফিকেটের কথা আছে। আমি বললাম—কংগ্রেসের অধীনে যে অনুষ্ঠান কাজ করবে, সেটি তো আপনাদের হুকুম-নামার অধীনে যাবে না। বড়জোর আমরা প্রবেশপত্র নিতে পারি। বিষয়টা একটু বোঝা দরকার। যেখানে বোমা পড়ে—ঘরবাড়ি তো নষ্ট হয়ই, মানুষও জখম হয়। এই অবকাশে কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস। গুণ্ডা-বদমায়েসরা লুটতরাজের সুবিধা করে নেয়। এইজন্য পুলিস বোমা পড়ার পর বোমায় ঘায়েল চত্বরটা ঘিরে থাকে। সরকারের পাস-ওয়ালা লোক ছাড়া অপর কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। আমাদের সেজন্য প্রবেশপত্র নেওয়া সঙ্গত মনে করেছিলাম। আমরা তো সেবার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, আপনার যা বলবার আমায় লিখে পাঠান। আমিও লিখে জবাব দেব। তিনি লিখলেন আরো দুখানা চিঠি। আমি শেষ চিঠিখানায় আর আলোচনা অচল জানিয়ে দিলাম—সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। এতেও সরকার চটল। কারণ কংগ্রেসের কাছে আমরা তাঁদের মাথা হেঁট করিয়ে দিয়েছিলাম। কংগ্রেসের নাগরিক-রক্ষা সংগঠনটি সর্ববিষয়ে সরকারী ব্যবস্থার চেয়ে অগ্রণী ছিল ও আকর্ষণ করেছিল জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের মহা চিন্তা—আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের হৈচৈ তারা দেখতে পায় না। অথচ স্বেচ্ছাসেবক যে আমাদের ছিল সে-খবর তারা রাখত। আগেই বলেছি আমরা বিকেন্দ্রিক সংগঠন গড়েছিলাম। কারণ জাপানীরা রাঁচি আক্রমণ করলে প্রথমেই টেলিফোন অফিস ধ্বংস করে দেবে। টেলিফোন চলে গেলে সকেন্দ্রিক সংগঠন কাজে বাধা পাবে। বিকেন্দ্রিকের সে বালাই নেই। জাপানীর প্রথম উদ্দেশ্য রাঁচি আক্রমণ নয়। প্রথম উদ্দেশ্য টাটানগরের কারখানা আক্রমণ। কিন্তু কারখানা বাঁচাবার জন্যেই দরকার রাঁচিতে সৈন্যসমাবেশ। সৈন্যদল এখানে রিজার্ভ থাকবে। টাটাস্থিত সৈন্যেরা লেগে যাবার পর তাদের সাহায্যে ছুটবে রাঁচিস্থিত সৈন্যেরা, এরূপ সম্ভাবনা সরকার বুঝত। ওদের কাছ থেকে সংবাদ বার করে নিয়ে আমরাও জানতাম। আর. এন. লাইন্স একদিন শহরময় ইস্তাহার ছাড়িয়ে দিল—যে-কোনো দিন জাপানীরা বোমার দ্বারা রাঁচি আক্রমণ করতে পারে। কত

লোক শহর ছেড়ে পালাল। এটা নিয়েও আমাদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল। কারণ আমরা সন্ত্রাস দূর করার কাজ করতাম। আর একটা সরকারী ইস্তাহার বেরুল—ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় প্রত্যেক সাইকেলের মালিককে থানায় সাইকেল রেজিস্ট্রি করে রাখতে হবে। এটি অনুধাবন করার বিষয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে আদত বিহার বা উত্তর-বিহার ছিল অগ্রসর, কিন্তু ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার ওপর জারি হল আইন। মনে পড়ে, মালয় দ্বীপে জাপানীরা সাধারণের সাইকেল নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল। জাপানকে এখানে সেই সুযোগ নিতে দেওয়া হবে না, এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মতলব (Denial Policy)। কিন্তু হঠাৎ বিহার সরকারের এ দুর্ভাবনা কেন? সরকারের জমা-করা সংবাদ থেকে জানতে পারলাম জাপানীরা বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে উড়িষ্যা-উপকূলে নামতে পারে। সেখান থেকে ময়ূরভঞ্জের গোরু-মহিষানিতে লোহার যে খনি আছে তা দখল করবে এবং টাটার কারখানা হাত করবে বা ধ্বংস করবে—তাই এই সতর্কতা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কাজ করছিলাম। এর মধ্যে জাপান সমগ্র বর্মা জয় করে নেয়। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক চেতনা ক্রমবিকাশে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯২১ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা কয়েছিলাম। তিনি তখন ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তিনি চাইছিলেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে পাস করাতে চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। তবে বাংলায় বিপ্লবীদের চেষ্টায় যে বিরুদ্ধ দাবি জেগে ওঠে তাকে ঠেকাবার জন্য মহাত্মাজী ব্রিটিশ সরকারকে একবছরের চরমপত্র দেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পাস হয়। মহাত্মাজী ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা আনার আন্দোলন করেন। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে বিলাতে 'গোল টেবিল বৈঠকে' গিয়ে চেয়ে বসলেন পূর্ণ স্বাধীনতার সারাংশ (Substance of Independence)। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধলে তিনি বিনাশর্তে ইংরেজকে সাহায্য করার পক্ষে ছিলেন। ১৯৪২ সালে মার্চ মাসে ক্রীপ্স্ যে প্রস্তাব আনেন তা দেখেই প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি যা চান ক্রীপ্স্ তা যোগাড় করে দিতে পারলেন না। ক্রীপ্স্ ইংরেজের প্রতি রুশের বিরূপ মন ফেরাতে সক্ষম হওয়ায় বাজারে তখন তাঁর প্রতিপত্তি অসাধারণ রূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই প্রতিপত্তির মহিমামণ্ডিত হয়ে তিনি ভারতে আসেন। বহু লোক আশা করেছিল তিনি সাফল্য লাভ করবেন। ফলে কিন্তু তার কিছু হল না। তিনি বিলাত হতে আনীত পরিকল্পনাটিকে আর একটু রুচিকর ও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেন। চার্চিল সরকার তা হতে দেন নি।

ক্রীপ্স্-প্রস্তাবে ছিল—যুদ্ধাবসানে ভারত ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

অংশীদার হয়ে থাকতে পারবে, অথবা যদি ইচ্ছা করে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। তবে যে-সব প্রদেশ ভারতের নতুন বিধানে যোগ দিতে চাইবে না তারা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আলাদা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। এই আশার কথায় বিশ্বাস করে সমগ্র ভারতকে ইংরেজের যুদ্ধোদ্যমে যোগ দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঠিকই জাতির তৎকালীন মনোভাবের সম্মান রক্ষা করেন। তারপর অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে ক্রীপ্‌স্‌-এর আলোচনা চলতে থাকে। কংগ্রেস বলে, এটা আমাদের দেশ এই কথা মনেপ্রাণে দেশবাসীকে অনুভব করতে দিন—নইলে লোকে সাড়া দেবে কেন? লোকের কাছে আমরা যুদ্ধোদ্যমে মেতে ওঠার সুপারিশ বা করব কি প্রকারে? অন্ততঃ দেশরক্ষা বিভাগটি আমাদের দেশের বেসরকারী লোকের দায়িত্বাধীন করে দিন। তাও হল না। তখন ক্রীপ্‌স্‌ কংগ্রেসকে আলোচনা ভঙ্গের জন্য মিথ্যা দায়ী করে বিলেতে ফিরে যান।

কংগ্রেস কি করবে এই চিন্তার সময় এল; সামনে কোনো উপায় ছিল না।

মার্চ গেল, এপ্রিল গেল, মে মাসে জাপান সমস্ত বর্মা দখল করে নেয়। বলতে গেলে বলা যায় জাপানী ভারতের একদম দ্বারদেশে উপস্থিত। ভারত-আক্রমণ তার পক্ষে আর কল্পনার বিষয় নয়। মহাত্মা গান্ধী এইবার শুভক্ষণ বুঝে 'ভারত ছাড়ো' রব তুললেন। জওহরলাল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেন। এলাহাবাদে যে কার্যকরী সভার বৈঠক হয় সেখানে জওহরলাল খুব বিগড়েছিলেন। তিনি পদত্যাগ করার কথাও বলেন। গান্ধীজি কেন 'বিনাশর্তে যুদ্ধে সাহায্য করা উচিত' থেকে 'ভারত ছাড়ো ইংরেজ' অবস্থায় এসে গেলেন? এটি উপলক্ষ করে তাঁর মনে কী কী তরঙ্গ উঠছিল তাও ভাববার কথা। বহুপূর্বে বলেছি এবং তাঁর সঙ্গে ১৯২১ সালে কথা বলে বুঝেছিলাম তিনি প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সাধু। নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্টে ব্যথিত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি চান মানুষকে উচ্চতর অবস্থার জীবে পরিণত করতে। একজন-দুজন ব্যক্তি সাধু হলে সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবার নয়। সমগ্র সমাজকে পরিবর্তন করা চাই। সেইজন্য তিনি মানুষে মানুষে বা দেশে দেশে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ সমাধানের নূতন উপায়ের উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। ভারতের সমস্যা ছিল অতি বৃহৎ ও উৎকট। যদি তাঁর উপায়ে এখানকার সমস্যা সমাধান হয়ে যায় তবেই বিশ্ব এটিকে গ্রহণ করতে পারে, নইলে নয়। ১৯২১ সালে 'একবছরে স্বরাজ আসবে'—তাঁর এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। ধুয়া উদ্ভাবনে (Slogan Manufacture) তাঁর সমকক্ষ আমাদের জীবনে অপর কাউকে দেখি নি। মানুষের প্রাণ-আকর্ষণের কী চমৎকার বাণী তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন। তাঁর দ্বিতীয় বাণী এল ১৯৩০ সালে—'হয় পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে ফিরব, নয়তো আমার মৃতদেহ মহাসমুদ্রে ভাসবে'—দেশবাসীর প্রাণে কী বিশাল সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু

এতেও কোনো কাজ হল না। সাইমন রিপোর্টে যতটা অধিকার দেবার কল্পনা ছিল, এই আন্দোলনের পরও তার পরিসর কোথায় বিস্তৃত হবে,না আরো সংকুচিত হয়েছিল।

গান্ধীজি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর শেষ প্রচেষ্টার সময় বুঝলেন। এইজন্য তাঁকে দুনো-মনো দেখা যায়। তাঁর সাধুভাব বিনাশর্তে সাহায্যের কথা তাঁর মনে জাগায়। কিন্তু তাঁর নতুন পথের পরীক্ষা—তাও যে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। তাঁর উপায় সুফলপ্রসূ, এটা প্রমাণ না করতে পারলে কে তাকে গ্রহণ করবে? সুতরাং এখানে ঘটনাস্রোত তাঁকে এ-বিষয়ে অবহিত ও বাধ্য করল। এজন্য এখন তাঁকে দেখি সুচতুর, সতর্ক সাধু। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে আকস্মিক জাপানী আক্রমণ ইংরেজকে বিপর্যস্ত করল। ক্রীপস্‌কে চার্চিল চাপে প'ড়ে পাঠান। নচেৎ 'রাজদ্রোহী অর্ধউলঙ্গ ফকিরকে সে থোড়াই কেয়ার্ করে। গান্ধীজি পরিষ্কার দেখতে পেলেন তাঁর উপায়ে যে ফল ফলে—এবার তা প্রমাণিত হবার সুযোগ ও সুবিধা ভগবান জুটিয়ে দিলেন। সেজন্য ক্রীপস্-এর কাছ থেকে আরো রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তির চেষ্টা করেন। এই প্রযত্ন খুবই সমীচীন। এটা না করলে তাঁকে জনপ্রিয়তা হারাতে হত। সে-যাত্রা সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। আবার কবে এমন সুবর্ণ সুযোগ আসবে তা কেউ বলতে পারত না। কিন্তু দু'মাস পরেই শেষ সুবিধা এসে হাজির। গোটা বর্মা তখন জাপানীর হস্তগত। ভারত সাগরে জাপানী রণতরী বিচরণ করছে। ইংরেজ রাজত্ব ভারত থেকে যায়-যায়। এ অবস্থায় 'ভারত ছাড়ো রব' তাঁর সারা জীবনের সাধনের প্রয়োজনে হৃদয়ের মধ্যস্থল হতে উত্থিত হল। তাছাড়া এটিও মুক্তিকামী জনসাধারণের মনের কথা। মহাত্মাজী জন-গণ-মনের উত্তাপের মাপকাঠি। মহাত্মাজীর উপায়ে ফল ফলে, এইটে জগৎসমক্ষে প্রমাণ করা মহাত্মার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস। ভারতের রাজনীতিকে এই পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে তিনি ব্যবহার করে আসছেন। পরীক্ষাগার ব্যতীত বৈজ্ঞানিক যেমন কাজে অগ্রসর হতে পারেন না, গান্ধীজিও ভারতে রাজনীতি না করে মনুষ্য-সমাজকে একটা উৎকৃষ্টতর সভ্যতা দিয়ে যেতে পারেন না। এই অন্তর্নিহিত সত্যটি ধরতে পারলে মহাত্মাজীর আন্দোলনের রূপগুলি আগে থেকেই ধরতে পারা যায়। অন্ততঃ আমরা সেইভাবে ধরতে পেরে এসেছি—কোনোবারেই আমাদের আন্দাজ ভুল হয় নি। আমরা ১৯৩৭ সাল থেকে বন্ধুমহলে বলে এসেছি যে, অতি শীঘ্র একটা বিরাট যুদ্ধ আসছে। তার ফলেই ভারত রাজনৈতিক উন্নয়ন লাভ করবে। সেইটাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলে চালাবার চেষ্টাও হবে। কিন্তু বিপ্লবীদের ভুললে চলবে না—সেটি হবে মাত্র এক ধাপ কম (Penultimate Stage) পূর্ণ স্বাধীনতা। এখান থেকে পূর্ণ স্বাধীনতায় পৌঁছানো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে এবং বিপ্লবীদের এবারকার মোহে মজলে তাদের সারাজীবনের সাধনা সিদ্ধির দ্বারদেশে এসে নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারা আগেকার রাজনৈতিক

সংস্কারগুলির (Concessions) বেড়া পার হয়ে চলে এসেছে ; এবারও এগিয়ে যাবার জন্য তাদের তুষ্ণী অবলম্বন করে বা দম ধরে থাকতেই হবে। তবে যাদের দম ফুরিয়ে এসেছে তারা এখানেই পড়বে। এটা হবে তাদের রাজনৈতিক মৃত্যু। মহাভারতের উপাখ্যানের পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের দৃষ্টান্ত ভুললে চলবে না। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চার ভাই আগেই পড়ে গিয়েছিলেন। স্বর্গে পেঁৗছোতে পারেন নি। মহাত্মাজীকে আমি বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে তুলনা করি। বিশ্বামিত্র মুনি সম্বন্ধে আমি এইরূপ একটা উপাখ্যান বাল্যকালে শুনেছিলাম। তিনি তপোবনের শান্ত জীবন ছেড়ে এসে হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যছাড়া কেন করলেন, এরই ব্যাখ্যা আমি শুনেছিলাম। রাজা হরিশ্চন্দ্র একসময় উদরী রোগে আক্রান্ত হন। বরুণদেবকে তুষ্ট করতে পারলে তবে তিনি রোগমুক্ত হবেন। অর্থাৎ তাঁর পেটের জল বেরিয়ে যাবে। এই বিপদে পড়ে তিনি বরুণের উদ্দেশে নিজের পুত্রকে অর্ঘ্য দেবেন সংকল্প করেন। আরোগ্য হলেন। কিন্তু পুত্র-বাৎসল্যে নিজের কথা রক্ষা করতে পারলেন না। দেবতাকে দত্তবাক্—সে মানসিক পূর্ণ করতেই হবে। তাই তিনি পরের একটি ছেলে, বিশ্বামিত্রশিষ্য দেবরাতকে এনে নরমেধ যজ্ঞ করেন। বড় জঘন্য কথা। বিশ্বামিত্র তো বিশ্বের মিত্র ছিলেন। প্রাণ কেঁদে উঠল তাঁর। রাজা হয়ে হেন অনাচার? রাজাকে যথোচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যহীন, স্ত্রী-পুত্র থেকে বিচ্যুত ও নগরান্তবাসীর ভৃত্য—শ্মশানবাসী করে ছাড়লেন। রাজ্যে কিন্তু তাঁর নিজের লোভ ছিল না, স্পৃহাও ছিল না। বরং রাজ্য হলে তপস্যার বিঘ্ন হয়। তাই হরিশ্চন্দ্রকে শুধরে তাঁরই হাতে রাজ্য পুনঃসমর্পণ করে শান্তিপূর্ণ দীন নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন।

গান্ধীজিও ইংরেজকে শোধরাতে চাইছিলেন। তাকে সত্যই তাড়ানো তাঁর কাছে প্রাণের জিনিষ হতে পারে না। কিন্তু ইংরেজরা শোধরাবার পথে যাচ্ছিল না বলেই 'ভারত ছাড়ো' বলতে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন তাঁর ধারণার সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। গান্ধীজির ইচ্ছামতো ভারতের চারিদিকে 'ভারত ছাড়ো' রব প্রচারিত হতে লাগল। মাননীয় রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারে ঘুরতে ঘুরতে রাঁচি এলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে আমরা সাধারণ সভা আহ্বান করলাম। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বহুসংখ্যায় সভাস্থলে একত্রিত হল। রাজেন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ থেকে প্রত্যেক ভারতীয় নর-নারী যেন মনে করে যে, ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে। স্বাধীন ব্যক্তির মতো তারা জীবন যাপন করতে থাকুক।' একসঙ্গে এতগুলি স্বেচ্ছাসেবক দেখে রাজপুরুষদের চোখ টাটাল। তারা মিছা ধরে নিল—এদের এতদিন দেখা যায় নি, তার মানে গুপ্ত-সমিতির কর্মপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছিল। পাপ মনে পাপ চিন্তা।

আমাদের মনে চিন্তা ছিল দেশবাসীর সেবার। সত্যই যদি জাপানী ঢুকে পড়ে

তাহলে পলাতক ইংরেজ যে বিশৃংখলা আনবে সেই অবসরে ক্ষমতা হস্তগত করতে হবে। সেজন্য স্বেচ্ছাসেবকের বিশেষ প্রয়োজন। জাপানীরা ভারতে প্রবেশ করবে, এ আমরা কিছুতেই সমর্থন করতাম না। জাপানীকে বাধা দেবার কথাই ভাবতাম। এদিকে ভূপতি মজুমদার কলকাতা থেকে বর্মার সীমানা পর্যন্ত লোক পাঠিয়ে খবর সংগ্রহ করতে লাগল। সে অগস্ট মাসের পাঁচ বা ছয় তারিখে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসে। আমরা পূর্ব থেকে একমত ছিলাম। এখনও পূর্বের মত বজায় রইল। রাজেনবাবুর সঙ্গে আমাদের কার্য-তালিকার আলোচনা করি। তাঁরও সমর্থন পাই। তিনিও বলেন, ইংরেজ সরকারের আইনের অনুমতি যেন না নেওয়া হয়। জাপানীরা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতে প্রবেশ করবে না—আমি এই কথা বলি। তারা বোমার উপদ্রব করবে। যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন জার্মানি উত্তর থেকে আফ্রিকায় ঢুকে পড়েছিল। ভারত সাগর দিয়ে জাপান যদি দক্ষিণ থেকে আফ্রিকায় প্রবেশ করে তাতে তাদের মতলব আরো ভালোভাবে হাসিল হতে পারার সম্ভাবনা ছিল।

১৯৪০-৪১ সালে পারস্য দেশের ক'জন সদাগরদের কাছ থেকে জানতে পারি পারস্যের জনসাধারণ ও বাদশা জার্মানি-অনুরাগী এবং ইংরেজ-বিরোধী। সুতরাং এশিয়ার এই জায়গাটা ইংরেজদের পক্ষে অত্যন্ত বিপদসংকুল। এই অবস্থায় জার্মানি ও জাপানের সাধারণ স্বার্থ হবে ইংরেজকে নিষ্কর্মা করে ফেলা। এশিয়াতে ইংরেজ প্রায় বেকায়দা হয়ে গেছে। আফ্রিকা থেকেও যদি হটে যায় তাহলে সে যুদ্ধ আর চালাতে পারবে না। ভারত একটা মহাদেশ বললেই হয়। এখানে সৈন্য ঢোকালে প্রায় দশলক্ষ জাপানী সৈন্য আটকে থাকবে। আগে থেকে চীনদেশে বিশলক্ষের চেয়ে বেশী সৈন্য আটকানো ছিল। চীন থেকে জাপান বেরুতে পারছিল না। আবার সেই মুশকিল কেন ডেকে আনবে ভারতে ঢুকে ? তার চাইতে আফ্রিকায় জোর দিলে সে দেশ আপনা-আপনি পাকা ফলটির মতো তার কোলে পড়ে যাবে। ভারতে যে ইংরেজ সৈন্য ছিল তারা না পেত বিলেত থেকে সাহায্য, না পেত নতুন লোক-সরবরাহ। এদেশের লোক তাদের দুর্দিনে নিজেদের সুদিন মনে করত নিশ্চয়ই। এইজন্য ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা কাড়ার কথা ভাবতে হয়েছিল। (১৯৪৫ সালে এইরকম অবস্থায় ইন্দোচীন ও জাভার লোকেরা নিজেদের স্বাধীন দেশ ঘোষণা করে।)

ভূপতির সঙ্গে দেখা হবার প্রায় মাসখানেক আগে গোপন সংবাদ পাই যে, আমার বিরুদ্ধে ভারত সরকার থেকে অনুসন্ধান চলছিল। এরূপ অনুসন্ধান সম্বন্ধে দু'একটা কথা সাধারণের অবগতির জন্য জানাই। ১৯৪১ সালে মে মাসে আমার বহু বন্ধু বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হন। ব্যাপারটা ঘটে এই ভাবে। বাংলায় যে বন্ধুরা

সুভাষবাবুর সঙ্গে কংগ্রেসের বাইরে চলে এসেছিলেন তাঁরা এবং যাঁরা একনিষ্ঠভাবে কংগ্রেস চালাচ্ছিলেন তাঁরাও ব্রিটিশ সৈনিক বিভাগের গোয়েন্দাদের বিষ নজরে পড়েন। কেননা ঐ সময়ে জার্মানরা মধ্যপ্রাচ্যে জিতেছিল। বিখ্যাত জার্মান সেনানী রোমেল-এর অধীনে জার্মান সৈন্যরা আফ্রিকায় অ্যালেকজান্দ্রিয়ার কাছে এসে পড়ে। পারস্যে বহু জার্মান বেসামরিক ঘাঁটি ছিল। পারস্য রাষ্ট্রশক্তি জার্মান-অনুরাগী ছিল। সেজন্য ভারতে সাবধান হবার দরকার পড়ে। সৈনিক বিভাগ বেসামরিক দিল্লী সরকারের কাছ থেকে তাদের সন্দেহভাগীদের খোঁজ চায়। দিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ (Central Intelligence Bureau) তাদের লিস্ট তো দেয়ই, তাছাড়া প্রাদেশিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে আরো সংবাদ সংগ্রহ করে দেয়। এরই ফলে বাংলার পুরোনো দাগী বিপ্লবপন্থীরা দলে দলে গ্রেপ্তার হয়ে যায়। আমি বাংলার বাইরে থাকায় আমার উপর চোট পেঁাছোয় একটু দেরিতে।

গোয়েন্দা বিভাগে 'A-list' বলে একটা পয়লা নম্বর দাগীর ফিরিস্তি তৈয়ারি ছিল। আন্দোলন সুরু হলেই এই লিস্টের দাগীরা আগে ধরা পড়ত। এটা একটা বাঁধাধরা নিয়ম। তাতে আমার নামও ছিল।

আমার নাম পূর্বকাজের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগে আগে থেকেই ছিল। আমার সংক্রান্ত কাগজপত্র সামরিক গোয়েন্দাদের হাতে এল—যখন Eastern Command-এর Headquarters (সামরিক পূর্ব-বিভাগের কেন্দ্র) রাঁচিতে আসে। জাপানীরা ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরে এই ব্যাপারটা হয়।

আমি নাকি জাপানীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাদের সাহায্য করার জন্য উদ্‌গ্রীব। কী দুর্বিষহ অপমানজনক ধারণা! বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালনার রীতি অবশ্য বহু পুরাতন। ইংরেজ আমলে এই পদ্ধতি অবলম্বনকারী অগ্রগামীদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার ধারণা ও নির্দেশ ছিল সদা সুস্পষ্ট। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধে আমরা জার্মানির সাহায্য নিতে গিয়েছিলাম। তার প্রথম শর্ত ছিল জার্মান সৈন্যকে কোনোদিন ভারতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমরা তাদের কাছ থেকে অর্থ, অস্ত্র ও দু'চারজন বিশেষজ্ঞ নেব। এর বেশি কিছু নয়। কারণ বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে দেশ স্বাধীন করার পরখ ভারতে তিনবার হয়ে গেছে। ফল সর্বদাই বিষময় হয়েছে। জয়চন্দ্র পাঠানদের ডেকে আনলেন। পৃথ্বীরাজ গেলেন, কিন্তু রাজ্য জয়চন্দ্রের হয় নি—হয়েছিল পাঠান সাম্রাজ্য। তারপর রাণা সংগ্রামসিংহ ও দৌলত খাঁ লোদী বাবরকে ডেকে আনলেন। ইব্রাহিম খাঁ লোদীর রাজ্যপাট গেল, কিন্তু হল মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন। তারপর ইংরেজকে ডেকে আনা হয়। কিন্তু দেশ তাতে স্বাধীন হয় নি;

হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—যাকে দূর করতে এত বেগ পেতে হচ্ছিল। এ অবস্থায় কে এমন ভ্রান্ত যে জাপানী সৈন্যকে ডেকে আনবে ?

যাক্। ঐ খবর শুনে বুঝেছিলাম মন্দবুদ্ধি-প্রণোদিত কোনো সরকারী চাকুরিয়ার উর্বর মস্তিষ্কমথিত মিথ্যাপ্রচার অকর্মণ্য গোয়েন্দা বিভাগ লুফে নিয়ে এই বিষ উদ্গার করেছিল। তারা সহজেই ভারত সরকারকে বোঝাতে পেরেছিল যে, যে ব্যক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে লোক যে জাপানের অনুরাগী হবে তাতে বিচিত্র কিছু থাকতে পারে না। খোঁজ আরম্ভ করল সারা ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের 'ক'-তালিকা বা 'A'-list-এর লোকদের। (বিহার প্রদেশের কথা। আমি রাঁচিতে বাড়ি করে বাস করায় বাংলার গোয়েন্দা বিভাগ আমার সম্বন্ধে যাবতীয় সমাচারের একটা কপি বিহারের গোয়েন্দা বিভাগকে দেয়। বিহার সরকার এর পূর্বে এত নিখুঁত সংবাদ আমার সম্বন্ধে জানত না।) এক কর্তার ঘুম ভাঙলে অপর কর্তারও ঘুম ভাঙে। ভারত সরকারের সঙ্গে বিহার সরকারও খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ করল। উভয়কে সচেতন করছিল সৈনিক বিভাগের গোয়েন্দা কর্তারা। তারা বেসামরিক সরকারের 'মন্দ বালকদের' তালিকা চায়। সংবাদ-সংগ্রহের ব্যাপারে সংবাদ সৃষ্টিও হয়। তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তাছাড়া শোনা যায় সরকারী এ. আর. পি-র যিনি মাথা তিনি বুদ্ধি, পরিকল্পনা ও কার্য-পরিচালনায় বার বার হেরে আমার বিরুদ্ধে অযথা রিপোর্ট দিয়েছিলেন।

রাজেনবাবুর রাঁচিতে আসার সংবাদে আমরা (কংগ্রেসের অধীন 'নাগরিক-রক্ষা সমিতি') আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের একটি সভা আহ্বান করি। সব মহল্লা-টোলার (পাড়ার বা ওয়ার্ডের) স্বেচ্ছাসেবকদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের জড়ো করি। সেই সভার বৈঠক আরম্ভ হলে আমাদের সেক্রেটারি নারায়ণচন্দ্র লাহিড়ী ও প্রতুলচন্দ্র মিত্র চিনতে পারেন দুজন গোয়েন্দা পুলিস তার ভিতরে আসনগ্রহণ করেছে। সুতরাং আমাদের কমিটির সভায় তাদের থাকতে দেওয়া হল না—এটা তো সাধারণ সভা ছিল না। আমি সভাপতি। সুতরাং অপ্রিয় কর্তব্যটি আমার আদেশে করা হল। ফল হল—তারা আজেবাজে সংবাদ সৃষ্টি করে রিপোর্ট করল। আমরা তিনজনই বাংলা সরকারের বিরাগভাজন জেল-ফেরত রাজনৈতিক কর্মী। এই ঘটনার পর এলোপাতাড়ি রিপোর্ট আমাদের নামে বানানো চলতে থাকে।

আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান দুই রাস্তায় হয়। এক গোয়েন্দা বিভাগ দিয়ে ; অপরটা সাধারণ শাসন বিভাগ দিয়ে। শুনেছি দ্বিতীয়টি এ. আর. পি.-র কর্তার রিপোর্টে রঞ্জিত ছিল। গোয়েন্দাদের কথা আন্দাজ করা যায়। আমার অতীতটাকে আমার বর্তমান করে নিয়েছিল। এখন যে যুদ্ধটা হচ্ছিল—সেটা দ্বিতীয় নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আমি ভূপতিকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমার অবস্থা। শীঘ্রই

গ্রেপ্তার হব, এ কথা বুঝেছিলাম। জুলাই মাসে জানতে পারি কংগ্রেস-আন্দোলন কী ভাবের হতে যাচ্ছিল। ভূপতি বোধহয় ৭ই অগস্ট ফিরে যায়। আমি ৯ই অগস্ট গ্রেপ্তার হই। ভূপতিও কলকাতায় ধৃত হয়।

পরে যখন সরকার অভিযোগের ফিরিস্তি (চার্জ) দেয়, তাতে বলেছিল আমি মেদিনীপুরের লোক; কংগ্রেসের সহিংস গুপ্ত আন্দোলনকে সাহায্য করছিলাম। আমি এমন এক প্রতিষ্ঠানের সভ্য যার উদ্দেশ্য ছিল বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো।

আমার গ্রেপ্তারের অল্প পূর্বে এক অতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁর বাসায় আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর স্ত্রী সংকটাপন্ন রোগে অসুস্থ তাই তাঁর চিকিৎসার্থে আহূত হই। পথে যেতে যেতে শুনি গান্ধীজি ও নিখিল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই সম্পর্কে কথা উঠলে ঐ রাজপুরুষকে বলি—সরকার ভীষণ ভুল ও অন্যায় করল। তিনি সরকারকে সমর্থন করলেন। আমি বললাম গান্ধীজি 'ভারত ছাড়ো' রবে শুধু তাঁর নিজের কথা বলেন নি, ভারতের জনমতকে প্রতিফলিত করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি গান্ধীজিকে সমর্থন করেন?' আমি বললাম—'হ্যাঁ, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সমর্থন করি। আজ যদি তাঁকে সমর্থন না করি তো কবে আবার করব?'

ঐখানে শুনেছিলাম তিন শ্রেণীর নেতাদের গ্রেপ্তার করা হবে। কংগ্রেসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা ছাড়া যাদের লোক মানে, লোকেদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা করেন তাঁরাও গ্রেপ্তারী লিস্টে আসবেন। তাঁর বাসা থেকে বাড়ি ফিরে দেখি পুলিস আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

১৯৪২ সালে নভেম্বর মাসে কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ সহ ছ'জনকে হাজারিবাগ জেল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করি।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বিহারের লাট হাজারিবাগ জেল পরিদর্শন করতে আসেন। এঁর নাম স্যার টমাস রাদারফোর্ড। ইনি আমায় অফিসে ডেকে পাঠান। প্রথম দর্শনে বলে উঠলেন, 'A friend and guide of the revolutionaries (বিপ্লববাদীদের বন্ধু ও পথপ্রদর্শক)।' ইনি চারমাস বাংলার লাটগিরি করে আমাদের সম্বন্ধে পুরোনো খবর জেনে আসেন। তারপর তিনি বললেন, 'যদি কথা দেন ঐ মারাত্মক পথ ত্যাগ করবেন এবং বাংলার বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ছাড়বেন তবেই আপনার মুক্তির কথা বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

মেজাজ ঠান্ডা রাখলাম অতি কষ্টে। বললাম—'সৎভাবে চলবার প্রতিশ্রুতি কে দেবে? আমি, না, সরকার? অসৎ কর্ম কে করেছে? সে তো সরকার। আমি

চাইব সরকারের কাছে সৎভাবে চলার প্রতিশ্রুতি। কে কাকে উৎপীড়ন করছে ?' লাটের মুখ গম্ভীর ও লাল হয়ে গেল। রুমাল দিয়ে কয়েকবার মুখ মুছলেন। আবার বললেন, 'ভেবে দেখুন। বাংলার বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে হবে।—You are to relinquish your relations with the revolutionary parties of Bengal.' আমি বললাম, 'আমায় কোনো বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন দ্বারা পদস্থ করে রাখে নি। আমার দেশপ্রেম-প্রণোদিত সুনির্দিষ্ট পথে আমি চলি। সুতরাং পদ পরিত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না।' লাট আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। বচসার ফলে চটাচটি হয়ে গেল।

অবশ্য প্রায় বছরখানেক আগে একটি সরকারী কর্মচারী বোর্ডের সামনে আমাদের একজন একজন করে হাজির করা হয়। সেই বোর্ডে ছিলেন ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনার, পুলিসের একজন ডি. আই. জি. এবং পাটনার গোয়েন্দা বিভাগের সবচেয়ে বড় ভারতীয় কর্মচারী। এই ডি. আই. জি. (টেনরুক) উত্তর বিহারে ১৯৪২ সালের আন্দোলন দমনার্থে ভীষণ বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল। ঘর-বাড়ি, শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মারধোর তো ছিলই।

ইনি আমায় প্রশ্ন করেন, 'আপনি সরকারের এ. আর. পি.-কে বাধা দিচ্ছিলেন কেন ?' আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ কথা হতেই পারে না। আমার কাছে সরকার সাহায্য চেয়েছিলেন। অগ্নিযুদ্ধ নিবারণে আমি সাহায্য করতে রাজী ছিলাম। রাজনীতিতে সরকারের সঙ্গে আমার অসহযোগ, সমাজসেবায় তো নয়। তবু তিনি বললেন—তাঁদের সংবাদ যে আমি সরকারী এ. আর. পি-কে নষ্ট করে দিতে চাইছিলাম!

তারপরে বললেন, 'মিলিটারির কাজে আপনি বাধা সৃষ্টি করছিলেন। মিলিটারি আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে।'

প্রশ্ন শুনে আমি তো অবাক। তাড়াতাড়ি চিন্তা করে নিলাম কোন বিষয় নিয়ে এমন কথা উঠতে পারে। তিনটি ঘটনা স্মরণে এল।

প্রথম ঘটনা—গোরা সৈন্যরা এসে লাম্পট্যের লেলিহান ইন্ধনে নারী-সংগ্রহার্থে ভদ্রপল্লীতে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে। সেজন্য আমি স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারায় নিযুক্ত করি। কয়েক জায়গায় গোরারা 'উত্তম-মধ্যমের' সম্বর্ধনা লাভ করে অর্থাৎ পিটুনি খায়। একটা গোরার কোমরবন্ধের উপর দিয়ে পেন্টেলুন ধরে ফেলা হয়। সে প্রাণভয়ে এমনি পিট্‌টান দেয় যে পেন্টেলুনের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে থেকে যায়। সেটি স্মারকরূপে রাখি।

দ্বিতীয় ঘটনা—একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটিতে ১৯৩৪ সাল

থেকে আমি ছিলাম। এটির সংস্থাপকদের মধ্যেও আমি একজন। যুদ্ধের বাজারে ভালো ভালো বাড়ি কৃচ্ছ্রসাধক সামরিক অফিসারদের জন্য দাবি করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। এই বালিকা বিদ্যালয়টিও মহাপ্রভুদের নজরে পড়ে। কর্তারা স্কুলকে উঠে যাবার নোটিশ দেন। স্কুল বসবার এরকম বাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বয়স্কা মেয়েরা কোথায় বদপল্লীর বাড়িতে পড়তে যাবে? গোরাদের লাম্পট্যের উৎসব তো চলছিলই। ঠিক এই সময় ডেপুটী কমিশনার অগ্নিযুদ্ধ নিবারণে আমার সাহায্যপ্রার্থী হন। এই সুযোগে আমি তাঁকে দিয়ে স্কুলের বাড়িটি ছাড়িয়ে নিই। এই ব্যাপারে কমিশনার লী আমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হন।

তৃতীয় ব্যাপার—গোরুর গাড়ি সরবরাহের কথা। তা আগে বলেছি।

এগুলি যদি মিলিটারির বিরুদ্ধাচরণ হয়, যুদ্ধোদ্যমে বাধা দেওয়া হয়—তাহলে আমার বলার কিছু নেই। এই অবস্থায় আমি যা করেছি কোন্ কর্তব্যপরায়ণ সজ্জন তা না করবে? আমি উত্তরে বললাম, 'আমার আচরণ সর্বদা সদাচারের বিধির মধ্যে অবস্থিত। এর জন্য সরকারের চটাচটির ধার ধারি না। মিলিটারির সঙ্গে আমার কোথাও সরাসরি গোলমাল ঘটে নি।' তারা স্থির করল আমায় রাঁচিতে ফিরে আসতে দিতে পারে না, কারণ এখানটা মিলিটারির একটা মস্ত আবশ্যকীয় কেন্দ্র। আমি হয়তো সৈন্যদের বিগড়ে দিতে পারি। বাহবা মজা! একদিন সরকার আমায় ভারতে ছাড়তে পারছিলেন না—বিলেত পাঠাচ্ছিলেন। তারপর হল—বাংলায় থাকতে দিতে পারেন না। রাঁচি এলাম। এবার রাঁচিতেও থাকতে দিতে পারেন না। ছ'মাস পরে জানালেন উত্তর বিহারে অন্তরীণ করতে রাজী আছেন। আমি বললাম, 'ঐ অনুগ্রহটি না করে এমনিই ধন্যবাদ নিন।' 'কেন?' 'আমি উত্তর বিহারে প্রেরিত ও অন্তরীণ হলেই আইন ভঙ্গ করব। তার ফলে জেলে আনতে হবে। সে কষ্টটা নাই-বা করলেন?' তখন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাঁচিতে আপনার নিজের বাড়ি আছে?' 'আছে।' চাল মাৎ। নারায়ণ লাহিড়ীর রাঁচিতে বাড়ি নেই বলে তাকে বহিষ্কার করার কথা তুলেছিল। সরকারপক্ষের 'রাঁচির চিন্তা' এত প্রবল হবার কারণ ছিল। জাপানীরা বর্মায় এসে যদি বাংলা আক্রমণ করে তাহলে তাদের অগ্রগতিকে ঠেকাতে। ইংরেজের তৎকালীন ক্ষমতায় কুলাচ্ছিল না। তারা বাংলা ছেড়ে পেছিয়ে আসা ঠিক করেছিল। বিহারে দেশরক্ষার দ্বিতীয় প্রস্থ ঠিক করে রেখেছিল—Second line of defence. আগন্তুক জাপানীর অসুবিধা ঘটাবার মানসে এই কারণেই বাংলাকে না খাইয়ে ১৯৪৩ সালে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোককে ইংরেজ সরকার মেরে ফেলে। (বহু পরে চার্চিল তাঁর 'আত্মকথা'য় এইরকম পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছেন।)

১৯৪১ সালের শেষে ভূপতি ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে 'নাগরিক-

রক্ষা সমিতি' স্থাপনের বুদ্ধিতে একটা পরম সন্তোষের কারণ আছে। বোম্বাইয়ের নাগরিক-রক্ষা সমিতি বারো হাজার স্বেচ্ছাসেবক করে। ১৯৪২ সালে মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতারা ধৃত হলেই ৯ই অগস্ট শহরময় প্রাচীরপত্র পড়ে যায় 'সরদার না থি, বাপু জেল মা' (গুজরাতী ভাষা—সরদারের সন্ধান নাই, বাপু জেলে)। জনগণের মনে আগুন ধরে গেল। নাগরিক-রক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা ছিলেন অশোক মেটা। এই স্বেচ্ছাসেবকরা প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং তার থেকে ভারতব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়। নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী বিহারের ডাঃ সত্যনারায়ণ জেলে এসে আমাদের এই সংবাদ দেন। তিনি এই বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। ডাঃ সত্যনারায়ণ ধরা পড়বার আগে বোম্বাই থেকে বাংলা পর্যন্ত আন্দোলনের গতি পর্যবেক্ষণ করতে সময় পেয়েছিলেন (এখন সত্যনারায়ণ পার্লামেণ্টের মেম্বার হয়ে দিল্লীতে আছেন। তিনি ১৯৫৭ সালে পার্লামেণ্টে দ্বিতীয়বার সদস্য হয়ে আসেন নি।)

১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধীজি মুক্ত হন। প্রায় বছরখানেক ভেবেচিন্তে, দেখেশুনে, বিবৃতির পর বিবৃতি দিতে দিতে শেষটিতে বলেন—১৯৪২ সালের আন্দোলন তাঁর ছিল না। তিনি কোনো আন্দোলন চান নি। শুধু বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার চেয়েছিলেন। ৪২-এর আন্দোলন অহিংস ছিল না—ছিল সহিংস, এইরূপ মতামত মহাত্মাজী প্রকাশ করেন।

১৯৪৫ সালে জুন মাসে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ মুক্তিলাভ করলে মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি বললেন—ঐ আন্দোলনে তারা গৌরবান্বিত। দেশের লোক যা করেছে তা না করলে ভারতকে জগৎ কাপুরুষের আবাসভূমি মনে করত।

রাজেন্দ্রবাবু বরাবর বলে এসেছেন (জেলের ভিতর এবং জেলের বাইরে)—তাঁর প্রদেশে যা কিছু ঘটেছে তার পুরো দায়িত্ব তিনি নিচ্ছেন।

পট্টভি সীতারামাইয়া তেমনি দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর প্রদেশের জন্য। 'কংগ্রেসের দায়িত্ব' বলে সরকার যে অভিযোগ এনেছিল তাতে অন্ধ্রপ্রদেশের কার্যসূচীর বিশেষ উল্লেখ আছে। পট্টভি বলেন, তিনি গান্ধীজির সঙ্গে পরামর্শ করে সে কর্মপদ্ধতি স্থির করেছিলেন। এই উক্তি গান্ধীজির অসন্তুষ্টির কারণ হয়। পট্টভিকে বাধ্য হয়ে এই ঘটনা পরে চাপা দিতে হয়।

আমি সরকারী গুপ্ত খবর বার করে নেবার একটা ভালো উপায় করতে সমর্থ হই ; ভূপেন দত্তকে জানাই, ১৯৪৬ সালে বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর তারা মুক্তি পাবে এবং তাই ঘটেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত মুক্তিপথে যতটা অগ্রসর হল (যাকে বহু লোক পূর্ণ স্বাধীনতা বলে চালাচ্ছে) তার গোড়া বেঁধেছে যে কারণগুলি তাদের নিরীক্ষণ করা উচিত। চারটি মূলীভূত নিমিত্ত এর গঠনে সাহায্য করেছে।

(ক) ইংরেজের ব্যবসাক্ষেত্র অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা : তাদের জীবন-যাপনের মান নীচু হয়ে যায় যদি ভারতে ব্যাপারীর বাজার বজায় না থাকে। ইংরেজ তা হতে দিতে পারে না। এইটা সবচেয়ে বড় কথা।

(খ) ১৯৪২ সালের আন্দোলন : এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—ভারতের গ্রামগুলি বহুল সংখ্যায় এই প্রথম রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করল। এর পূর্বে বড় বড় রাষ্ট্রিক অদলবদল হয়েছে। কিন্তু সেগুলি শহরের ওলটপালট। গ্রাম্যজীবন অবিচলিত, শান্ত, সুশৃংখলিত ভাবে চলে এসেছে। এই ধাক্কা ইংরেজকে বাস্তবভূমে নামিয়ে এনেছে সন্দেহ নেই। Anglo-Saxons are amenable only to one kind of logic—and that is the logic of physical force.—গায়ের জোরই একমাত্র যুক্তি যা ইংরেজ জাতকে প্রণিধানপরায়ণ করে।

(গ) I.N.A. : আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ আন্দোলন। নৌ-সৈন্যদের বিদ্রোহ, আকাশ-সৈন্যদের ধর্মঘট ইংরেজকে জানিয়েছিল যে তারা ভারতীয় সেনাবিভাগের উপর নির্ভর করে আর শাসন চালাতে পারবে না। আজাদ-হিন্দ্ সৈন্যদের দিল্লীর বিচারে দেশে যে জাগরণ হয় তা নেতাজীর ভারতাক্রমণের মতোই বড় কাজ করেছে।

(ঘ) রুশ ভীতি : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রুশ এক দিকে এবং ইংরেজ ও আমেরিকার অপর দিকে হবার সম্ভাবনা। জাপানীর অসুবিধা রুশের হবে না, পাঁচ হাজার মাইল থেকে আসতে হবে না ভারত আক্রমণ করতে। তার বাড়ি থেকে পাঁচিল টপকালেই ভারতের কাম্যভূমি। ভারত জাপানের কাছ থেকে কোনো ভাবাদর্শ নেয় নি। রুশ সে বিষয়ে ভাগ্যবান। সাংস্কৃতিক জয় (Cultural Conquest) সে করে রেখেছে। সমাজতন্ত্রবাদ এবং সংঘতন্ত্রবাদ ভারতের মজ্জায় প্রবেশ করে বসে আছে। জাপানের নিজস্ব কোনো দল ভারতে ছিল না। রুশের নিজস্ব দল 'কমিউনিস্ট পার্টি' এখানে বিরাজ করছে। ভারতবাসীরা নিজেদের দেশ রক্ষা করার কর্তব্য বোধ না করলে রুশকে ঠেকাতে তেমন মন দিয়ে লড়বে না। এইখানে ইংরেজ বিপর্যস্ত হয়ে নিজের দেশের এক-ষষ্ঠাংশের ভরণপোষণের বা বাঁচবার জন্য ভারতে ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য। অতএব রুশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে যাতে স্বেচ্ছায় ভারত রুশের দিকে না যায় সেইজন্য ভারতকে তুষ্ট করতে হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এ গরজের জন্য সিংহল ও বর্মাকেও মুক্তি দান করতে হয়েছে। ইংরেজ এতদিনে সুবুদ্ধির পরিচয় দিল।

অবশ্য এই যোগাযোগে ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে ভারতীয়দের হাতে এল। ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া এক পর্যায়ের জিনিষ নয়। হস্তান্তরিত হওয়ায় ধনী ভাইদের হাতে শক্তি সহজে চলে গেল। রাজনৈতিক মুক্তি এইভাবে এলেও অর্থনৈতিক বা সামাজিক মুক্তি বা সাম্য এখনও সংঘর্ষের বিষয় হয়ে রইল। সমাজের সর্বস্তরকে দারিদ্র্য-মুক্ত করতে হবে।

এ কথা তো সহজ বোধগম্য ছিল যে সামন্ততান্ত্রিক ও উচ্চ পর্যায়ের ভদ্রলোক-কর্তৃত্বের স্তর থেকে ভারতকে প্রকৃত গণতন্ত্রে যেতে হলে অনভিপ্রেত এই একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে না গিয়ে উপায় নেই। কারণ আমরা নিজ শক্তিতে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছিলাম না। কিন্তু এই অবস্থায় সন্তুষ্ট ও মুহ্যমান হয়ে থাকা প্রকৃত মুক্তিকামীদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। ক্রমবিকাশের সর্বশেষ সোপানে উন্নীত হওয়ার এখনও বাকি আছে। দেশের আত্মিক শক্তি অবশ্য তার গন্তব্যস্থলে সারা দেশকে টেনে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না। 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'। ক্রমিক অগ্রগতিতে আমরা পর্বতগাত্রে উঠেছি মাত্র, পর্বতচূড়ায় আরোহণ এখনও বাকি।

অনুপূরক পরিচ্ছেদ

১৯২৯ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি অসাধারণ সাল। এই সালে হিন্দু-মোসলেম মিলন প্রচেষ্টার একটা মস্ত চিহ্ন মুছে গেল। ১৯২৫ সালে কোহাটে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়। মুসলমানরা হলেন আক্রমণকারী, হিন্দুরা আক্রান্ত। শহরের মুসলমানরা কতটা এতে লিপ্ত ছিলেন এবং ব্রিটিশ-শাসিত এলাকার বাইরের লোক, সীমান্তপ্রদেশের লোক কতটা—এর আন্দাজ করা মুশকিল। বাইরের লোকেরা যে এসে আগুন লাগায়—লুট, খুন-জখম ও গুলী করার কাজ করেছিল সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সাক্ষ্য-প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গেছে। কেন এ হাঙ্গামা হল? হিন্দুরা কতটা দায়ী? এইসব ছিল অনুসন্ধানের বিষয়। মহাত্মাজী ও মোলানা সৌকৎ আলী দুটি ভাইয়ে গেলেন কারণ নির্ধারণ করতে। গান্ধীজি ও আলীভ্রাতৃদ্বয় নিজেদের ভাই বলে বুঝতেন এবং অকুণ্ঠায় এই পরিচয় দিতেন। গান্ধীজি এমনও বলতেন যে তিনি নিরামিষাশী আলীরা মাংসাশী—তবু তাঁরা মার পেটের ভাইদের চেয়ে কিছু কম নন। মৌলানা মহম্মদ আলী বলতেন, গান্ধীজির মতো এমন একটি ভালো লোক এখনও দীন ইস্‌লামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে কেন বিলম্ব করছেন, এইটাই আফসোসের বিষয়। গান্ধীজিকে ইস্‌লামে ধর্মান্তরিত করতে পারলে জীবনের একটা মস্ত কাজ তাঁর করা হবে। বড় ভাই সৌকৎ বলতেন—শোলার মতো হালকা, ক্ষুদ্রাকায় গান্ধীকে তিনি পকেটে ভরে নিয়ে বেড়াতে পারেন। কিন্তু গান্ধীর মতো বাহাদুর মানুষ তখন সারা হিন্দুস্থানে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। কোহাটের এই তদন্তের ফলে 'দুই ভাইয়ে' হল মতান্তর ও ছাড়াছাড়ি। গান্ধীজি দেখলেন মুসলমানদের দোষ। সৌকৎ আলী দেখলেন তাদের নির্দোষিতা। ঘরে ফাটল ধরল।

গান্ধীজি ভারতের রাজনীতিতে সাক্ষাৎভাবে আসেন বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে। এদের কাজের ফলে ১৯১৯ সালে 'রাউলাট আইন' পাস হয়। বিনা-সাক্ষ্যপ্রমাণে, বিনাবিচারে আটক আইনের কৃপায় কত লোকের নাগরিক অধিকার চলে যেতে পারে ভেবে গান্ধীজি আকুল হলেন। এই আইন তুলে দিতে হবে। আবেদন-নিবেদনে তা হবার নয় দেখে তিনি প্রথম রাজনৈতিক আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করলেন। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হতে না-হতে পাঞ্জাবে ভীষণ নিপীড়ন-নির্যাতনের পালা এসে গেল। গান্ধীজি পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে পারবেন না, এই আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হয়েছেন ভেবে জনসাধারণ খেপে ওঠে। পাঞ্জাবে

নানারূপ হাঙ্গামা সুরু হয়। সরকার চণ্ডনীতি গ্রহণ করে। সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্মমভাবে নির্দোষদের ওপর গুলী চালানো। বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতি বছর ওখানে মেলা বসে। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ জড়ো হয়ে থাকে। এবারেও তাই হল। এক-দ্বারবিশিষ্ট এই জায়গাটি। এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ ও নির্গমন করতে হয়। সেনাপতি ডায়ার একদল ফৌজ নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দাঁড়ালেন। গুলী চালানোর হুকুম দিলেন। মানুষ পালাবার পথ না পেয়ে গুলী খেতে খেতে, আত্মরক্ষার্থে হিতাহিত বিচার ভুলে একটি কুয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং জলে ডুবে মরল। বিস্তর লোক যেখানে সেখানে হতাহত হয়ে পড়ে রইল। আহতদের আর্তনাদে দিঙমণ্ডল মুখরিত হতে লাগল। পিপাসার জল এবং চিকিৎসা বিনা তারা মরতে লাগল। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে এখানকার বীভৎস ব্যাপারের বর্ণনা-পাঠে নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন হয়।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এ বিষয়ে খুব অনুসন্ধান করেন ও একটি রিপোর্ট লেখেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি বড়লাটের কাউন্সিলে তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় অমানুষিকতা ও বর্বরতাপূর্ণ ব্যবহারগুলি বিবৃত করেন। লাউণ্ডসসাহেবের সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ হয়। সরকার একটি 'ইনডেমনিটি বিল' পাস করেন। অর্থাৎ যে-সব কর্মচারী পাঞ্জাব সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তাদের বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা চলতে পারবে না, কোনোরূপ খেসারত তাদের কাছ থেকে আদায় হবে না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনিও এই আইনের বিরোধিতা করেন। যাই হোক, আইনটি পাস হয়ে যায়। গান্ধীজি তাঁর এক বেসরকারী বিবৃতিতে এই আইন সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 'কর্মচারীদের কী দোষ? প্রভুর হুকুম তামিল করাই তো তাদের কাজ।' এই বিবৃতির ফলে স্যার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট (তখনকার স্বরাষ্ট্র সচিব) কোনো প্রতিবাদ হলেই গান্ধীজির দোহাই দিতেন। গান্ধীজি তখন সরকারের সুনজরে। তাঁর এর আগের কর্মতালিকা ছিল ব্রিটিশের পক্ষপাতী। দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধে ও জুলুযুদ্ধে তিনি সরকারপক্ষকে সাহায্য করেছিলেন এবং 'কাইজর-ই-হিন্দ' পদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও তিনি ব্রিটিশের জন্য অনেক খাটেন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই 'পাঞ্জাব অত্যাচার' নিয়ে নিজের 'স্যার' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। বড়লাট চেমসফোর্ডকে লেখা তাঁর পত্রখানি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে…'The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a

rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. This disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote.

... ...

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand. shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings'

১৯১৯ সালে সেভার-এর সন্ধিতে তুর্কীর বাদশা ও নিখিল জগতের মুসলমানদের খলিফা বা শীর্ষস্থানীয় মাননীয় ব্যক্তিকে একটি খেলার পুতুলের সামিল করা হয়। তুর্কীর সাম্রাজ্য একদিন বিশাল ছিল। ইউরোপে স্পেন থেকে এশিয়া-মাইনর, আরব ও আফ্রিকা তাঁদের তাঁবে ছিল। ক্রমে তুর্কীর হাত থেকে খৃষ্টান-ভূখণ্ড বেরিয়ে যেতে লাগল। ইউরোপীয় তুর্কীতে রাজা ছিলেন মুসলমান, কিন্তু প্রজারা ছিল খৃষ্টান।

১৮৫৩ সালে রুশের জার প্রথম নিকোলাস ইংরেজের সঙ্গে তুর্কী সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা করেন যে—ইংরেজ নেবে মিশর, ক্রীট এবং খৃষ্টান জাতগুলি (যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া) স্বাধীনতা লাভ করবে কিন্তু রুশের তত্ত্বাবধানে থাকবে। ইস্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপল রুশের হবে। রুশ বড় হয়ে যাবে বলে ইংরেজ এ টোপ তখন গিলল না। ১৮৭৭ সালে বুলগারদের হত্যা করার অজুহাতে রুশ তুর্কীকে আক্রমণ ও পরাস্ত করে। এর ফলে সে পায় আর্মেনিয়ার কতকাংশ এবং রুমানিয়ার বেসারেবিয়া। যুগোস্লাভিয়ার কিছু কৃষক ১৮১৭ সালে বিদ্রোহ ক'রে আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে। সেই জায়গাটির নাম হয় সার্বিয়া। ১৮৭৮ সালে সার্বিয়া পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে গেল। তাদের হল একজন রাজা। ১৮৭৮ সালে বুলগেরিয়া আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৮৮৫ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। কিছু কর তুর্কীকে দিতে হত। ১৯০৮ সালে তুর্কীতে বিপ্লব হয়। তখন বুলগেরিয়া কর দেওয়া বন্ধ করল। ১৮২১ সালে গ্রীসে 'বন্ধু-সমাজ' (Association of Friends) তৈরী হয়। তারা শুভ সময়

বুঝে একদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসল। নিজেদের ব্যবস্থা-পরিষদ খুলল, একটি রাষ্ট্রবিধান খাড়া করল এবং সাধারণতন্ত্র স্থির করল। রুশ, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড তাদের সহায় হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হল তুর্কী। কিন্তু এই ত্রয়ী জোর-জবরদস্তি করে ১৮৩২ সালে গ্রীসে একজনকে রাজা বানিয়ে দিল। প্রথম রাজা হল জার্মান। তাকে তাড়িয়ে, আনতে চাইল ভিক্টোরিয়ার এক পুত্রকে। শেষ পর্যন্ত এলেন এক দিনেমার (Dane)। রুমানিয়া ছিল তিন ভাগে বিভক্ত। মল্ডেভিয়া এবং ওয়ালেচিয়া ছিল তুর্কীর অধীনে। ট্রান্সিলভেনিয়া এবং বুকোভিনা ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গারির অধীনে, বেসারেবিয়া চলে গিয়েছিল রুশের কবলে। ফরাসী বিপ্লবে মল্ডেভিয়া এবং ওয়ালেচিয়া মেতে উঠেছিল। ১৮৬১ সালে এরা মিলিত হয়ে গেল। ১৮৭৮ সালে লাভ হল পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯০৮ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গারি বসনিয়া-হার্শগোভিনা তুর্কীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। এই সালে আনোয়ার পাশার অধীনে নব্য তুর্কীদলের বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৯১২-১৩ সালে বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়ার কিছু অংশ যা এতদিন তুর্কীর অধীনে ছিল তা ছাড়িয়ে আনার জন্য গ্রীস ও সার্বিয়ার সঙ্গে মিলে বুলগেরিয়া যুদ্ধে নেমে পড়ল। প্রায় 'রুম' বা ইস্তাম্বুল পর্যন্ত তারা তুর্কীকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মিত্রদের মধ্যে লুটের মালের ভাগাভাগিতে ফের লাগল লড়াই। ১৯১৩ সালে বুলগেরিয়া সার্বিয়া ও গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তুর্কী ও রুমানিয়া গ্রীস ও সার্বিয়ার পক্ষ নিল। চারজনের সঙ্গে পারবে কেন? বুলগেরিয়া হারল। রুমানিয়া বুলগেরিয়ার উত্তরে ডবরুজা নিল। দক্ষিণে তুর্কী কিছুটা ফিরে পেল। বাকিটা সার্বিয়া ও গ্রীসের হল। ম্যাসিডোনিয়া চলে যাওয়ায় বুলগেরিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট রইল।

১৯১৪ সাল নাগাদ তুর্কীর অবস্থা শোচনীয় ছিল। ইউরোপে ইস্তাম্বুলের আশেপাশে কিছু জায়গা-জমি ছিল। আফ্রিকায় তার অঙ্গচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল—ফ্রান্স টিউনিস নিয়েছিল, ইটালি—ট্রিপোলি (লাইবিরিয়া) আর ইংল্যান্ড—মিশর। ১৯১৪-র যুদ্ধে ইংরেজের চক্রান্তে এশিয়ায় তুর্কীর সাম্রাজ্য বলতে যা কিছু ছিল—আরব, মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়াও তুর্কীর হাত থেকে চলে গেল।

ক্রমাগত দুর্গতি দেখতে দেখতে তরুণ তুর্কীরা স্বাদেশিকতামত্ত হয়ে ১৯০৮ সালে অন্তর্বিপ্লব ঘটায়, পুরাতন সুলতানকে তাড়ায় আর কায়েম করে নতুন সুলতান। তাদের জাত্যাভিমান, গৌরবান্বিত অতীত—মহিমাময় জীবনের পুনরুদ্ধারে তাদের ব্রতী করে। সব মিত্রকে দেখা ছিল ব'লে, তারা জার্মানির সঙ্গে সখ্যতা করতে বাধ্য হয়। তাদের সৈন্যবিভাগে জার্মান অফিসার এনে নতুন করে সমস্তটা গড়ে। ক্রমশঃ তুর্কী জার্মান অনুরাগী হয়; প্রতিশোধ কামনায় ১৯১৪ সালের

যুদ্ধে যোগ দেয় জার্মানির পক্ষে। এক জার্মান কোম্পানি ইস্তাম্বুল-বাগদাদ-পারস্যোপসাগর পর্যন্ত রেল-নির্মাণের ঠিকা পায়।

রুশ এই রেলের বিরোধী হল। তুর্কীর উপর জার্মানির মুরুব্বিয়ানা রুশ কি করে সহ্য করতে পারে? ইংরেজ দেখল এই রেলে জার্মানি পারস্য ও ভারতের বাজার তো পাবেই, তাছাড়া যুদ্ধ বাধলে চট করে ভারতে উপদ্রব সুরু করতে পারবে। ওই রেলপথও ১৯১৪ সালের যুদ্ধের একটা হেতু।

১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হলে প্যারিসে যে চূড়ান্ত সন্ধি হয় তার ফলে তুর্কীর অবস্থা একেবারে খুব খারাপ হয়ে যায়। মিশর ১৮৮৬ সালে নামে ইংরেজের হয়—এবার আলাদা হয়ে ইংরেজের প্রভাবে আসে। হেজ্জাজ বা মূল আরব স্বাধীন হল কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণে এসে গেল ইংরেজের। আর্মেনিয়া স্বাধীন হল, অন্ততঃ নামে। প্যালেস্টাইন আলাদা হল; এল ইংরেজের কবজায়। মেসোপটেমিয়াও (পরে নাম হল ইরাক) এল ইংরেজের অধীনে। সিরিয়া পেল ফ্রান্স। ইস্তাম্বুলের উত্তর ও পশ্চিমে থেস্ এবং এশিয়া-মাইনরের স্মার্না পেল গ্রীস। দার্দানেলিজ ও বসফরাস সংযোজক থেকে তুর্কীকে সামরিক সজ্জা হটিয়ে নিতে হল।

তুর্কীর এই দীনহীন দুর্দশায় ভারতের মুসলমানদের প্রাণ কেঁদে উঠল। ১৯১৭ সালে রুশের বিপ্লবে কমিউনিস্টদের বরাত খোলার পূর্বে একটা আন্তর্জাতিকতা জগতে ছিল। সেটা ইসলামের। সামাজিক গণতন্ত্রে (Social Democracy) জগতে ইসলাম একটা বিপ্লবী শক্তি ছিল এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। জগতের সব মুসলমান—ধর্ম ও কৃষ্টির দিক থেকে মক্কার দিকে চাইত। আর মক্কার ধ্বজাধারী ছিল তুর্কী।

ভারতে খেলাফত আন্দোলন সুরু হল। আলী ভাইরা তার মহড়া নিলেন এবং সাহায্যপ্রার্থী হলেন হিন্দুদের। এলাহাবাদে একটা সভা বসল। তিলক সাহায্য করতে সম্মত হলেন। তবে আন্দোলনের অগ্রভাগ নিতে হবে মুসলমান ভাইদের। অ্যানি বেসান্ট ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তিলকের কথার প্রতিধ্বনি করেন। গান্ধীজি আবার রাজনীতিতে এলেন খেলাফত উপলক্ষে। তিনি বললেন—অহিংস-অসহযোগ যদি মুসলমানরা মেনে নেন তাহলে তিনি নেতৃত্ব করতে রাজী আছেন। মৌলানা আজাদ আগে থেকেই 'তার্কে মোয়ালাৎ' প্রচার করছিলেন। তাঁর অসহযোগে গান্ধীজির অহিংসা যুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার হল না। এখন কথা উঠল শুধু 'খেলাফত' হলে হিন্দুদের বিশালতর সহায়তা পাওয়া যাবে কেন? গান্ধীজি জুড়লেন তাতে 'পাঞ্জাবের প্রতি অন্যায় আচরণ'। বিজয় রাঘবাচারিয়া বললেন, 'ওতে একটা প্রদেশের মন বেশী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্বরাজ না হলে এসব অত্যাচার-অবিচার থামবে না। কাজেই আন্দোলন করা হোক স্বরাজের জন্য।' তাই হল।

মতিলালজী প্রথমেই ওকালতি ছাড়লেন। একটা সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। বৎসরে দু'-আড়াই লাখ টাকার আয় ছাড়া চারটিখানি কথা! ক্রমে অনেকেই ছাড়লেন। দেশবন্ধু প্রথমে বাধা দেন। স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলে ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাবে, এ কথায় বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরে গান্ধীজির কথার গভীর মর্ম উপলব্ধি করে যোগ দিলেন। দেশব্যাপী হৈচৈ পড়ে গেল। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে এই অঘটন ঘটল।

এইদিক দিয়ে যেমন একটা কিছু গড়ল, অপর দিক দিয়ে তেমনি আর একটা কিছু ভাঙল। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে সেই অপ্রীতিকর দল-ভাঙাভাঙির পর ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থী মিললেন। জিন্না ছিলেন চরমপন্থী তিলকের সাথী। তিলকের আর এক সাথী ছিলেন ব্যাপ্‌টিস্টা, তিনি ছিলেন খৃষ্টান। জিন্নার পরামর্শে লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেস সর্বপ্রথম 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' করতে রাজী হয়। এটি হল 'মর্লি'-মিণ্টো ঘুষের' উত্তর। অর্থাৎ তাতে সাম্প্রদায়িক হিসাবে ইংরেজ মুসলমানদের যা ঘুষ দিয়েছিল, কংগ্রেস তার চাইতে দিল কিছু বেশী। ১৯২০ সালের মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারে ইংরেজ দিল আরও কিছু বেশী। দেশবন্ধু ১৯২৩ সালে দিলেন তার চাইতে আরও বেশী। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ দিল তার চাইতেও বেশী। এইবার চালে মাৎ হল কংগ্রেস। কংগ্রেসের ইংরেজের চেয়ে বেশী দেবার কিছু ছিল না। ঘুষ দেওয়া-দেওয়িতে কংগ্রেস হারল। জিন্নার কাছে গেলে তিনি বলেন—যা পাওয়া গেছে তার চাইতে আরো কিছু চাই; কংগ্রেস কোন পর্যন্ত দিতে পারে? স্বভাবতঃ কংগ্রেসের চেয়ে ইংরেজের দানশক্তি বেশী। এই চালে কংগ্রেস হারল। তোয়াজ পেয়ে পেয়ে জিন্নার প্রাপ্তির ক্ষুধা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি ১৯৪০ সালে দুই জাতি, দুই আলাদা রাষ্ট্র চেয়ে বসলেন।

কংগ্রেসের রাজনীতিতে এবার গান্ধীজির ক্রমোন্নতির ইতিহাস অনুধাবন করা যাক্। ১৯১৬ সালে চরমপন্থীদের সভ্যরা বেশী সংখ্যায় কংগ্রেস-অধিকারীদের মধ্যে যেতে পেরেছিলেন। বোম্বাইয়ের পনেরোটা আসন ছিল। তিলকের সমর্থকরা ভোটার ছিলেন বেশী। ভোটে একটা মিটমাটের আশায় নরমপন্থীরা গান্ধীজিকে তিলকের কাছে পাঠান। তিলক রাজী হলেন না। তিনি শুধু নিজের দলের কাছে ভোটে-হারা গান্ধীজিকে মনোনীত করে নেন। জিন্নার অসাধারণ আদর ও প্রতিপত্তি সেই সময় থেকে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস ভবনের নাম হল 'জিন্না হল'। মোসলেম লীগ ও কংগ্রেস এখন থেকে একই রকম রেজোলিউশান বা মন্তব্য পাস করতে লাগলেন। দুই প্রতিষ্ঠানের নেতারা দুটিরই অধিবেশনে যেতে লাগলেন। সাময়িকভাবে মনে হল ইংরেজ হারল চালবাজিতে। আলী ভাইয়েরা কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন না। তাঁরা

ছিলেন 'লীগী'। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে তুর্কীর অঙ্গচ্ছেদ হওয়ায় মহম্মদ আলী ও লক্ষ্ণৌয়ের ওয়াজির হোসেন বিলেতে ভারত সচিবের সঙ্গে দেখা করতে যান, যাতে তুর্কীর কিছু উপকার করতে পারেন। সেখানে সমাদর পেলেন না। তাঁরা হিন্দুদের বিরোধী নেতাদের (আগা খাঁ প্রভৃতিকে) মুসলিম লীগ থেকে সরালেন। বুঝেছিলেন হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত না হলে ইংরেজকে জব্দ করা যাবে না।

এইভাবে দিন যাচ্ছিল। গান্ধীজির খেলাফত-প্রোগ্রাম বা অহিংস-অসহযোগ জিন্না মানতে পারলেন না। ব্রিটিশরাজকে সোজাসুজি গুঁতো মারা জিন্নার পছন্দ হল না। জেলে গেলে জয় হবে এটাও তিনি মানতে পারেন নি। জিন্না এদিক থেকে গান্ধীজির কাছে সমাদর পেলেন না। ওদিকে সাধারণ মিঞা বা মিস্টার থেকে মৌলানা বানানো হয়ে গেল আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে। জিন্না মনে মনে বললেন, 'যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি! এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি ?' রাগ, গোসা, অভিমান, বিরাগ হবার কথাই তো। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের এত অনাদর! এর পরে মুসলমান নেতা বলতে আলী ভাইরা। জিন্না কংগ্রেসের কেউ তো রইলেন না, লীগেও 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে পড়লেন। ১৯২৪ সালে দিল্লী অধিবেশনে জিন্না লীগের সভায় প্রতিনিধিদের কিছু বলতে উঠেছিলেন—সমবেত শ্রোতারা তাঁকে কিছু বলতেই দিল না, চিৎকার করে বসিয়ে দিল। কারণ এই সময় আলী ভ্রাতৃদ্বয় সদ্য কারামুক্ত হয়ে এসেছিলেন ; তাঁদের জনাদর তখন অনেক। জিন্নার মর্মান্তিক হল এই দ্বিতীয় আঘাতটা। তিনি হিন্দুদের চোদ্দদফা শর্ত দিলেন, তা না মানলে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে একত্রে রাজনীতি করবে না। সেদিন অবশ্য সেটা কথার কথা ছিল। তবে এ'দুটি ঘটনা থেকে জানা গেল গান্ধী ও জিন্না কোনোদিন মিলতে পারবেন না। গান্ধীজিকে দেখলে জিন্নার বুকটা ফাটতে চায় ; আকর্ষণ না হয়ে দুজনের হয়ে যায় বিকর্ষণ। যতবার গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হয়েছে ততবারই ফল হয়েছে অননুকূল।

তারপর ঢের দিন হয়ে গিয়েছে। লর্ড বার্কেনহেড (তখনকার ভারত সচিব) বলেছিলেন—অসহযোগ নিষ্ফলা চেষ্টা ; সহযোগে সুফল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর আহ্বানে এল নেহেরু রিপোর্ট। সর্বদল সম্মেলনে সেটা পাস করানো দরকার। মতিলালজী গড়েছিলেন সর্বদলের সম্মিলিত একটা বিধান। ১৯২৮ সালের বড়দিনে কলকাতায় অধিবেশন হয় সর্বদল সম্মেলনের। কেন্দ্রীয় পরিষদে শতকরা তেত্রিশ-জন মুসলমান থাকবেন—এই দাবি এল। নেহেরু-বিধান দিচ্ছিল ত্রিশজন। তিন-জনকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চললো। শেষে সর্বদল সম্মেলন ভেঙে যায়। এই সময় কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসল পণ্ডিতজীর অধিনায়কত্বে।

১৯২৯ সালে জিন্নার প্রভাব লীগ ও মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে লাগল। মৌলানা সৌকৎ আলী তো চলে গিয়েছিলেনই, মহম্মদ আলীও কংগ্রেস থেকে সরলেন। এঁরা জাতীয়তাবাদী থেকে হয়ে গেলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী।

কংগ্রেস তবু ভাবছিল যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস এসে যায়—একটা রফা মুসলমানদের সঙ্গে করে নিতে পারবে। ১৯২৮ সালে ইংরেজকে তাই চরমপত্র দেওয়া হয়।

ইংরেজ চরমপত্রকে অনাদর করল। ১৯২৭ সালে ইংরেজ 'সাইমন কমিশন' ঘোষণা করেছিল। তাতে একটিও ভারতবাসী ছিল না। কংগ্রেস তাকে বয়কট্ করল। কমিশন যেখানে যায় সেখানে পুলিস লাঠি চালায়। এর থেকে বুঝতে হবে কেমন জনাদর লাভ করেছিল কমিশন। কমিশনের টিটকারির নাম হয়ে গেল 'লাঠি কমিশন'। বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাবে লাঠি চলে। মালব্যজী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার হন। পাঞ্জাবের লাঠিতে ঘায়েল হয়ে লালাজীর অকালমৃত্যু হল। কমিশন কালো পতাকা দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। দেশের লোকও হল ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ।

বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯২৯ সালের শেষাশেষি একবার বিলেত ঘুরে এলেন। তিনি জোর গলায় ঘোষণা করলেন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রতিষ্ঠিত করা। অল্প কয়েকদিনের জন্য নেতারা দিশেহারা হলেন। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার দিয়েছিল—Progressive realisation of responsible government—ক্রমে দায়িত্বশীল কর্তৃত্বলাভ। আর সে জায়গায় এসে যাচ্ছে ডোমিনিয়ন স্টেটাস। চোখ অন্ধ হয়ে গেল। তার চাইতে কান বধির হলে ছিল ভালো। মতিলাল, জওহরলাল প্রভৃতি সাতজন নেতা চরমপত্রের কাল শেষ হবার আগে এই নির্ঘোষ শুনে সম্প্রতি সে-সংস্কার আসছে কিনা সঠিক জানবার জন্যে একটি বিবৃতি প্রেসে দেন। সরকারপক্ষে কোনো উচ্চবাচ্য হল না। লাহোর কংগ্রেসে পৌঁছোবার আগে গান্ধীজি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আরউইন জানালেন ওটা হচ্ছে ইংরেজের সদিচ্ছা জ্ঞাপন মাত্র। তখনই দেবার নয়। ফলে লাহোরে কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বরাজ রেজোলিউশন পাস হয়ে গেল। গান্ধীজি নিজে উত্থাপন করলেন এ সিদ্ধান্তের প্রস্তাব।

ভালো ভালো বহু লোক ইতিমধ্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। মহাত্মাজীর কথায় থেমে থাকার লোক তাঁরা নন। কার্যতঃ ১৯৩০ সালে এপ্রিল মাসে আরম্ভ হল লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এদিকে বাংলার যুবকরা চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার দখল করল। সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে খুব যুদ্ধ হয়। চট্টগ্রাম তিনদিন ইংরেজের হাতছাড়া হয়ে অন্য চেহারা ধারণ করেছিল। ১৯৩১ সাল কতকটা শান্ত থাকে। তবু ঢাকা, কুমিল্লায়

শ্বেতাঙ্গ-বধ হয়। ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট ডার্নোসাহেব কোনমতে প্রাণে বেঁচে যান। মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট পেডি, ডগলাস ও বার্জ মারা পড়েন ছেলেদের গুলীতে। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, নির্মলজীবন ঘোষ প্রভৃতির ফাঁসি হয়। কুমিল্লায় ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সসাহেব মারা যান শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামে দুটি মেয়ের গুলীতে। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। টেগার্টের ওপরও কলকাতায় বোমা পড়ে। তিনি বেঁচে যান। ঢাকায় পুলিসের বড়সাহেব লোম্যান মারা যান গুলীতে, আহত হন হাড্সন। গ্রাস্‌বিসাহেবও ঢাকায় সামান্য আহত হয়েছিলেন। কলকাতায় সদাগরসাহেব ভিলিয়ার্স ও স্টেট্সম্যানের সম্পাদক ওয়াটসন আক্রান্ত হন। ওয়াটসন আহত হয়েছিলেন। ভিলিয়ার্সের কিছু হয় নি। এঁরা দু'জন ভারত ছেড়ে পালান। টেগার্টও সরে পড়েন। আলিপুরের জজ গার্লিক মারা যান। আততায়ী কানাই ভট্টাচার্য পুলিসের গুলীতে প্রাণ দেয়। কেউ কেউ বলে সে পটাস সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে। কলকাতায় সেনেট হলে লাট জ্যাক্সনের ওপর বীণা দাস গুলী চালায়। দার্জিলিঙে লাট অ্যান্ডারসনের ওপরও গুলী চলে (উজ্জ্বলা মজুমদার, ভবানী ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী প্রভৃতি ধরা পড়ে)—দুজনেই বরাত জোরে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান। জেল বিভাগের কর্তা সিম্প্সন কিন্তু মারা যান। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিনয় বসু, বাদল আত্মহত্যা করে। দীনেশের ফাঁসি হয়। এই সময়কার গুলী-চলাচালির দিনে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমানে অংশ নিচ্ছেন এই প্রথম দেখা যায়।

সরকার এই সময় হিংসাপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় অভিহিত করতেন। ভূপেন দত্ত ও মনোরঞ্জন গুপ্ত বাংলা সরকারের কাছে এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদলিপি জেল থেকে পাঠান। তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, যারা জাতীয় অবমাননার প্রতিবাদী হিসাবে পৃথিবীপরিজ্ঞাত একটা পথ নিয়েছে তাদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলা অন্যায়। এর পূর্বে ১৯২৪ সালে বিনাবিচারে আটক রাখা উপলক্ষে ভারত সচিবের কাছে জীবন চ্যাটার্জী ও ভূপেন দত্ত একটি বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন বর্মা জেল থেকে। পণ্ডিত মতিলাল তার কপি পেয়েছিলেন এবং সেটি তিনি প্রকাশ করে দেন। সাইমন রিপোর্ট বার হবার সময় শোনা যায়, যাতে সেটি সময়মতো ভারতে প্রচার হতে না পারে, তেমন প্রতিবিধানের পরিকল্পনাও নাকি বার হয়েছিল। এইজন্য মতিলাল নেহেরু একহাজার টাকা শরৎ বোসের হাতে দিয়েছিলেন। সে টাকা যাতে ভূপেন দত্ত পান তেমন নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি।

১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে ব্রিটিশ ও ফরাসী পুলিস এবং চট্টগ্রামের কয়েকটি যুবকের মধ্যে গুলী চালাচালি হয়। একজন যুবক (জীবন ঘোষাল)

মারা যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয় এই দুঃসময়ে। অবশ্য সরকারের উসকানি ও সহযোগিতায় সেদিন ঘটেছিল এই অনভিপ্রেত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা।

বাংলা সরকার পুলিস ও ফৌজের সহায়তায় সব জেলাগুলিকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সমর্থ হয়। এখন থেকে বাংলার বহু গ্রামে ফৌজ বাস করতে লাগল— বাংলা যেন পাঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের চেহারা ধারণ করল। যুবকদের মধ্যে নেতা সূর্য সেনের ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়। নির্মল সেন যুদ্ধে মারা যায়। কুমারী প্রীতি ওয়াদ্দেদার আত্মহত্যা করে। বহু লোকের দ্বীপান্তর হয়; গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল ছিলেন তাঁদের মধ্যে। স্যার স্ট্যানলি জ্যাক্সন লাট থাকাকালীন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বক্সা আটক ক্যাম্পে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেন। দার্জিলিঙে দেখা করেন লাটের সঙ্গেও। একটা রফা হবার কথা হয়। সূর্য সেনের ফাঁসি বন্ধ থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার কোনো ইংরেজের ওপর আক্রমণ হওয়ায় সব কথাবার্তা ভেঙে যায়। ফাঁসি হয়ে যায় সূর্য সেনের।

লালাজীকে মারার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে বিপ্লবীরা পুলিসসাহেব স্কটের জায়গায় সণ্ডার্সকে গুলীর আঘাতে নিহত করে। বহু পরে দিল্লীতে আইন পরিষদের অধিবেশনে সাইমনসাহেবের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিচিত্র উপায় অবলম্বন ক'রে দুজন যুবক বোমা নিক্ষেপ করে। তারা গ্রেপ্তার হল। তাদের নাম ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। ভগৎ সিংকে সণ্ডার্স-হত্যার জের টেনে পরে ফাঁসি দেওয়া হয়। বটুকেশ্বর দণ্ডিত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে।

যতীন দাস 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'য় ধৃত হয়ে কলকাতা থেকে পঞ্জাবে আসে। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরকেও প্রথমে এই ষড়যন্ত্রের মামলায় ফেলা হয়। তারা সাধারণ কয়েদীর ব্যবহারে প্রতিবাদ করে অনশন করে। অনশনরত অবস্থায় হাজতীদের সঙ্গে দেখা হয়। মোকদ্দমাধীনরা রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনশনে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত যতীন দাস প্রাণ দেয়। তার ফলে পরে সরকার রাজনৈতিক ও অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে 'A Class', 'B Class' ও 'C Class'-এর প্রবর্তন করেন। ১৯৩৭ সালে এইসব হিংসাপন্থীরা গান্ধীজির প্রশ্নের উত্তরে জানান তাঁরা পূর্বপথ পরিত্যাগ করেছেন। গান্ধীজি এঁদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রীরা বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এঁদের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে মুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন। বাংলার সকলে মুক্ত হন নি। সেখানে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা হয় নি।

মহাত্মা গান্ধীর মতো ইংরেজের বন্ধু পৃথিবীতে কম আছে। অথচ ক্রমে ক্রমে তাঁর রাজনৈতিক মত কেমন বদলে বদলে গেল। মহাত্মার নীতি মানবস্বভাবে

বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবের অন্তর্নিহিত সহজাত ভালো গুণ একদিন না-একদিন ফুটে উঠবে। হৃদয়ের পরিবর্তন ভালোর দিকে হবেই হবে—এই তাঁর বিশ্বাস। মানুষ থেকে আত্মাহীন শাসনযন্ত্রে তিনি পরিবর্তন আশা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বয়কট্-করা সাইমন রিপোর্টের উপর যখন প্রথম গোল-টেবিল বৈঠক বিলাতে বসল তখন মহাত্মা ভারতে আইন-অমান্য আন্দোলন করলেন। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন আপোস হয়। এটা বলতে হবে ব্রিটিশ কূটনীতিরই জয়। মহাত্মার জাত মারার জন্যে এই চাল—'যেই মুখে বলেছিলি চ্যাঙ-মুড়ী কানী, সেই মুখে বল এবার মা মনসারানী'। মহাত্মাজী স্বরাজ অর্জনের জন্য আইন-অমান্য আন্দোলন করেছিলেন, সাইমন সংস্কারের প্রস্তাব বয়কট্ করেছিলেন; অথচ আরউইনের সঙ্গে আপোসের পর গান্ধীজি দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে গেলেন দানরূপে 'স্বরাজ' আনতে। এই তো গেল কূটনীতির কাছে একটা পরাভব। এছাড়া তাঁকে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি না মেনে আর পাঁচজনের মধ্যে একজন ধরা হল। এখানে হল পরাভবের চূড়ান্ত। তদ্ব্যতিরেকে তিনি বার্দোলিতে অনুসৃত অত্যাচারের তদন্ত না হলে বিলাত যাবেন না বলেছিলেন। তদন্ত হল না। তিনি ডাক্তার আনসারিকে একজন মুসলমান প্রতিনিধি করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাতেও সফলকাম হলেন না। বিলাতে মজলিস বসার সময় একটা পরিকল্পনা তো এসেছিল যে, মুসলমানদের আলাদা নির্বাচনপ্রণালী না দিয়ে তাদের জন্য সব ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকটি আসন রিজার্ভ রাখা হবে। মহাত্মাজী তাতে রাজী হন নি।

প্রথম সম্মেলনে জিন্না আহূত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারে তিনি বাদ পড়লেন। আগা খাঁই দুবার মুরুব্বি রইলেন। পাঞ্জাবের সুকবি স্যার মহম্মদ ইকবাল—যিনি খেলাফত আন্দোলনে হিন্দু-মোসলেম একতার পাণ্ডা হয়েছিলেন, কত ভালো ভালো কবিতা লিখেছিলেন, 'হিন্দুস্তান হামারা' গানটি লিখেছিলেন, 'মন্দির ও মসজেদ' লিখেছিলেন—তিনি বিলাতেই ঐ সময় সুরু করলেন পাকিস্তান-আন্দোলন। হায়দরাবাদের ডাক্তার লতিফও একটা 'পাকিস্তানের পরিকল্পনা' দিলেন।

হিন্দু-মোসলেম যখন এক—গান্ধীজি ১৯২১ সালে একবছরে স্বরাজ আসবে প্রতিশ্রুতি দেন। স্বরাজ আসে নি। ১৯৩০ সালে বলেন—হয় তিনি যা চান (স্বরাজ) তাই নিয়ে ফিরবেন, নইলে তাঁর মৃতদেহ সাগরজলে ভাসবে। এর কোনোটাই হয় নি। প্রথমবারে, 'স্বরাজ' না এলে হিমালয়ে চলে যাবেন বলেছিলেন। যান নি। সাইমনসাহেব তাঁর রিপোর্টে যতটা আত্মকর্তৃত্ব ও অধিকার ভারতকে হস্তান্তর করার সুপারিশ করেন—১৯৩০-৩২ সালের মুক্তি-আন্দোলনে অধিকার তার চাইতে বাড়ানো যায় নি। বরং ১৯৩৫ সালের ভারত-আইনে সাইমনের

সুপারিশের চেয়ে কম অধিকার দেওয়া হয়। এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত হল দেশের সামনে।

গান্ধীজি ফিরে এলেন খালিহাতে। জিন্নার চোদ্দ শর্তের তেরো শর্ত তিনি মেনে নিয়েছিলেন, বাকি ছিল একটি শর্ত—অর্থাৎ প্রদেশরা মনে করলে অধিকাংশের ভোটে মূল কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারবে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসে হিন্দুদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আরম্ভ করিয়ে দিয়ে জিন্নাসাহেব কোথায় নিয়ে চলেছিলেন রাষ্ট্রের রথকে? ১৯৪০ সাল পর্যন্ত জিন্নার মতে মুসলমানরা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল। হঠাৎ এই বছর থেকে তারা একটা আলাদা জাতি হল এবং সেই মর্মে দাবি তুলল।

যুদ্ধ সুরু হলে মহাত্মা গান্ধী বিনাশর্তে ইংরেজকে সাহায্য করা উচিত মনে করলেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছোলেন যে ওরা চলে না গেলে ভারতের মঙ্গল নেই। কেন এ পরিবর্তন তাঁর চিন্তা-প্রণালীতে? তিনি বরাবর বলতেন হিন্দু-মোসলেম ঐক্য না হলে স্বাধীনতা আসবে না—আসতে পারে না। ১৯৪২ সালে বুঝলেন ইংরেজরা না গেলে হিন্দু-মোসলেম একতা আসতে পারে না। গান্ধীজির রাজনৈতিক মত ক্রমবিকাশের ধারায় এখানে এসে পৌছল। গান্ধীজিকে বুঝতে হলে সর্বদা মনে রাখতে হবে প্রথমে তিনি বিশ্বমানবপ্রেমিক, তারপর রাজনৈতিক। বিশ্বমানবপ্রেমটা তাঁর কাছে মুখ্য। রাষ্ট্রনীতি বা ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা গৌণ। তিনি জগৎকে একটা উন্নততর, উৎকৃষ্টতর সভ্যতা দিতে চান। সেটা দেবার আগে পরস্পরের বিরোধ মেটানোর তাঁর নতুন হাতিয়ারটি শানিয়ে, চালিয়ে ফলপ্রসূ প্রমাণ করে দিয়ে যাওয়া চাই। গান্ধীজি রাজনৈতিক চিন্তাশীল হিসাবে তিলক বা অরবিন্দের মতো স্পষ্ট ধারণার অধিকারী নন। দিনে দিনে অনেক আশাভঙ্গের পরে তাঁর রাজনৈতিক মতের অভিব্যক্তি হচ্ছে। যেটা রাজনীতিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল তা ফুটল পঁচিশবছরে।

পাকিস্তানের দাবি একটা প্রমাদস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশের রাজনীতিতে। মোসলেম লীগ এই দাবি চালাচ্ছে। ১৯৩৭-১৯৩৯ সালের আগে মোসলেম লীগ তেমন শক্তিশালী বা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রতিষ্ঠা বাড়ল জওহরলালের ভুল চালে এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে অনভিজ্ঞতার জন্য ১৯৩৭ সালে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব না থাকায়। মুসলমানদের যথেষ্ট সংখ্যায় কংগ্রেসী মতে টানতে না পারায় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি-অবস্থায় জওহরলাল 'Moslem Mass Contact'-এর (মোসলেম-গণ-সংযোগ) কার্যতালিকা বার করলেন। কাজ কেউ করে নি, কাজ হলও না কিছু; কিন্তু লীগ-বিরোধী মোসলেম নেতারা সন্ত্রস্ত হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিন্নার সঙ্গে মিলে গেলেন। ১৯৩৭ সালে বাংলায় ফজলুল হক সাহেব এবং পাঞ্জাবে স্যার

সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ নতুন অ্যাসেম্‌ব্লি নির্বাচনে মোসলেম লীগের উমেদারদের বেজায় পরাস্ত করে মন্ত্রিমণ্ডল গড়েন। লীগের প্রভাব তখনও কিছু ছিল না। জওহরলালের চালে এরা বানচালের মতো ছুটে এলেন জিন্নার কাছে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। জওহরলালের কর্মতালিকায় তাঁরা মোসলেম নেতা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা দেখলেন এবং জোর চালাতে লাগলেন বিরোধ। চৌধুরী মালিক খালিকুজ্জমানকে জওহরলাল এমন চটান চটালেন যে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে লীগে চলে গেলেন এবং তাঁর উদ্যমে যুক্তপ্রদেশে লীগ বাহুবিস্তার ও প্রভাব লাভ করল। জওহরলাল ভেবেছিলেন অর্থনৈতিক কর্মতালিকা গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক বিষ নষ্ট করবেন। কথাগুলি শুনতে হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু কার্যকরী হওয়ার মতো আবহাওয়া দেশে না থাকায় ফলপ্রসব করতে পারল না। জওহরলাল, আচার্য নরেন্দ্র দেও এবং এম. এন. রায়—কমিউনিজম বা সোশ্যালিজম-এর তিনটি উপযুক্ত প্রচারক, ব্যাখ্যাতা ও কর্মী। এঁদের কর্মক্ষেত্র যুক্তপ্রদেশ। কিন্তু এখানে যেরকম সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেড়েছে এমন আর কোথাও নয়। কানপুরের মজুর সংগঠনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আছে, অথচ মজুরদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা খুব হয়েছে। বোম্বাইয়েও তাই। তার মানে সরষের মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে বলে সরষে-পড়ায় ভূত ছাড়ছে না। জওহরলালের বিলম্বে জ্ঞান হল। তিনি 'Moslem Mass Contact' কথাটির বদলে শুধু 'Mass Contact' (গণসঙ্গ) কথা ছাড়তে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে বিষ চড়ে গেছে রাষ্ট্র-শরীরে।

জওহরলালের সর্বনেশে ভুল চাল হল ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ের নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর। জওহরলাল রাষ্ট্রপতি হবার আগেই এদেশে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন আসে এবং ১৫ই মে তারিখে হিন্দু-মোসলেম সমস্যা সমাধানের জন্য একটা পরিকল্পনা দেওয়া হয়। তাতে নিখিল ভারতের জন্য একটা বিধান পরিষদের কথা থাকে। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ উভয়েই তাতে সভ্য পাঠাতে পারবে কথা থাকে। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ উভয়ে সে প্রস্তাব গ্রহণ করে। জওহরলাল এই সংযুক্ত ভাবের বিধান সভা মেনে নেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি হন এবং সভা-জমকানো একটা বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন—কংগ্রেস এই পরিকল্পনা মেনেছেন বলে যে কথা উঠেছে, তা ঠিক নয়। কংগ্রেস যা মেনে নিয়েছেন—তা বিধান সভায় যাওয়াটাই। বিধান পরিষদে গিয়ে কংগ্রেস যা চায় তাই যদি না পাওয়া যায় (অর্থাৎ অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা) তাহলে তাকে পদাঘাত করে ভেঙেচুরে দিয়ে চলে আসবেন। আসর গরম রাখতে এ-কথা তাঁকে বলতে হয়েছিল। কংগ্রেস-সোশ্যালিস্টদের এবং অপর কংগ্রেসীদের সমালোচনা ঠাণ্ডা

করার প্রয়োজন তখন তাঁরা খুব বোধ করতেন। 'ভাজি ঝিঙে, বলি পটোল'—একটা চলতি কথাই তো আছে। এই বক্তৃতায় জিন্নাসাহেব মস্ত ছুতো পেয়ে গেলেন। কংগ্রেসীদের মন-মুখ এক নয় এই প্রমাণ তিনি দুনিয়ার দরবারে হাজির করলেন (১৯৫৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকার ডাক সংস্করণে মৌলানা আজাদের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। বিধান পরিষদকে লীগ রেজোলিউশন করে বর্জন করলেন। তারপর কংগ্রেসকে অনেকবার বলতে হয়েছে যে তাঁরা কোনোরকম মারপ্যাঁচ না রেখে যথাযথভাবে মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার সবটাই গ্রহণ করেছেন। গান্ধীজি, সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল, মৌলানা আজাদ বহুবার সাফাই দিলেন। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। জিন্না ও তাঁর লীগ কোনোরকমে বাগ মানলেন না।

লীগের দিক থেকে এরই ফলে এল ১৯৪৬ সালের অগস্ট মাসের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন। যার ফলে বীভৎসরূপে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় একবছর চলে। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, রাওয়ালপিণ্ডি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ভীষণ লোকক্ষয় হয়।

জওহরলাল বহির্বিভাগ বোঝেন চমৎকার। আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁর ভুলের পরিসীমা নেই।

[দ্রষ্টব্য ঃ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা ভারতকে তিন ভাগে ভাগ করে—'ক' মণ্ডলী, 'খ' মণ্ডলী, 'গ' মণ্ডলী। মুসলিমপ্রধান স্থানগুলি খ ও গ মণ্ডলীতে ছিল। খ=পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশ। গ= বাংলা ও আসাম। বাকী জায়গাগুলিও এমনি জিন্না চাইছিলেন। খালি আসামটা ফাউয়ে মেরে নিতে চেয়েছিলেন।]

১৯৪২ সালে কেন গ্রেপ্তার হলাম

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় আমি কলকাতা যাই। আমার অধিকাংশ বন্ধুরা মে মাসের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলেন। গোড়া থেকে সূত্রটা ধরিয়ে দেওয়া যাক্। ১৯২৭-২৯ সাল পর্যন্ত সংযুক্ত বিপ্লবী দল বাংলার বক্ষে বিচরণ করে, তারই পরাক্রম গান্ধীজি ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে অনুভব করেন। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে আমিই এই মিলনের সমাধি স্বচক্ষে দেখে আসি। যে সৌহার্দের বাঁধন আমি ১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে বেঁধেছিলাম, যে সৌধ গড়েছিলাম তা উভয়পক্ষের নেতৃস্থানীয় কয়েকটি বন্ধুর পরস্পর পরস্পরকে অপছন্দ করার ফলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার আদর্শবাদ টিকল না। উভয়পক্ষের আহবানে, আমার অনুরক্ত পরম বন্ধু ভূপতি মজুমদারের মিলন-প্রয়াসের শেষ চেষ্টার অনুরোধে আমি রাঁচি থেকে কলকাতা যাই। মিথ্যা হল সব যুক্তি-তর্ক, রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দাবি। আমি যে ইমারত গেঁথেছিলাম, আমায় তা নিজহাতে ভেঙে দিয়ে আসতে হল। পুরো গুরুত্ব উপলব্ধি করেই কথা দিয়েছিলাম, সংযুক্ত বিপ্লবী দল ছাড়া অন্য দল করব না। একমাত্র আমার বিবেক বা নৈতিক দায়িত্বকে অনুসরণ করলাম। অতি বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে বাংলার রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। যা ঘটল তার জন্যে দায়ী আমার নিজের দুর্ভাগ্য। যাঁরা ছাড়াছাড়ি হলেন তাঁদের সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা আজও পোষণ করি। লোক হিসাবে এঁদের ছাড়া আর কাকে ভালবাসব? এঁদের সততা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমার তপস্যা নিয়ে আমি অপেক্ষা করি। এঁদের আত্মকলহের ফলে সুভাষ-সেনগুপ্ত দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেল। যা ছিল অলক্ষ্যে শুধু সেইটাই ফুটে বেরুল। কলকাতা কংগ্রেসে সেনগুপ্ত গান্ধীজিকে সমর্থন করে গেলেন। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির কবলে পড়ে পুনর্বার মুক্ত হয়ে এলেন। গান্ধীজি চাইছিলেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। দেশের অগ্রগামী আত্মা চাইছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। সুভাষ প্রগতিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রতীক হলেন। সেনগুপ্ত সে-সময় এতটা প্রগতিসম্পন্ন রইলেন না। কিন্তু তখনকার দিনে বাংলার কোনো নেতা আপনার শক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। কর্মীরা ছিল বিপ্লবীদের সঙ্গে। সুতরাং দাঁড়াতে হলে এদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। দেশবন্ধুর স্বরাজ দল গঠনের সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব এটা তো স্বয়ংসিদ্ধ যে বিপ্লবীরা যাকে রাখে সে থাকবে, যাকে ফেলবে সে পড়ে যাবে। সুরেশ দাস আমাদের কারামুক্তির আগেই একটি সর্বদলের (বিপ্লবী) সম্মিলিত কর্মী সংঘ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর শক্তি তখনকার নেতারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা কারামুক্ত হলে মিলিত বিপ্লবী দল খুব শক্তির আধার হয়েছিল। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তাও দু'বছরের বেশী টেকে নি।

সুভাষ-সেনগুপ্তের দ্বন্দ্ব—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-কামীদের লড়াই ছিল উপরে উপরে। কিন্তু বিপ্লবীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু' নেতার সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন। সুতরাং এই সময়কার কলহ ঠিক ভাবাদর্শ-চালিত ছিল বলা চলে না। দুটি বিপ্লবী দলের ঝগড়া দু'জন প্রিয় নেতাকে অবলম্বন করে চলতে থাকে। ১৯৩০-৩২ সালে দু'বার 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' হয়। প্রথমবার গান্ধীজির নেতৃত্বে ও আহ্বানে। ১৯৩২ সালের আন্দোলন গান্ধীজির গোল-টেবিল বৈঠক উপলক্ষে বিলাতে উপস্থিত থাকাকালে জওহরলালের দ্বারা আরম্ভ হয়। প্রথমবার আরউইন গান্ধীজির সঙ্গে বোঝাপড়া করেন। দ্বিতীয়বার বড়লাট উইলিংডন গান্ধীজির অনুরোধ-উপরোধকে আমল দেন নি। তিনি গান্ধীজিকে দেখা করার সুযোগ কিছুতেই দিলেন না। তাই গান্ধীজি যোগ দেন আন্দোলনে।

১৯৩০ সালে কুমিল্লার কৃষ্ণদাস ছিলেন গান্ধীজির নিজস্ব সচিব। ইনি বাংলার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এসে কারারুদ্ধ হয়ে পড়েন। ইনি জেলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর রিপোর্ট বা বিবৃতি মহাত্মা গান্ধীর নিকট ডাক মারফত পেশ করেন। ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগ ডাকঘর থেকে সে চিঠিখানি হস্তগত করে। পরে ভারত সরকারের আইন সচিব নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সেটি প্রকাশ করে দেন। মনে রাখতে হবে ঐ সময় বাংলার বহু লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত বা অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন।

কৃষ্ণদাস বলেছিলেন—বাংলায় সুভাষবাবু বা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আসল নেতা নন, আসল নেতা বিপ্লবীদের দুটি দলে অবস্থান করেন। এক দলের প্রেরণা আসে রাঁচি থেকে, অপর দলের প্রেরণা-কেন্দ্র বাংলাদেশেই। সুভাষবাবু থাকেন 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত থাকেন ঢাকা অনুশীলনের সঙ্গে। পুলিস 'অনুশীলন' ছাড়া সবাইকে বলত 'যুগান্তর'। সে দিক থেকে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে যুগান্তর দল আবার সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হল। চট্টগ্রামের সঙ্গে ভূপেন দত্তের সংস্রব অস্বীকারের উপায় নেই। সূর্য সেনের সঙ্গে কথা ছিল ভূপেন দত্ত চট্টগ্রামে পৌঁছোলে ওখানকার কাজ আরম্ভ হবে। কিন্তু ভূপেনের যেতে দু'দিন দেরি হয়ে যায়। সূর্যবাবু নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট কর্মতালিকা বদলাতে পারেন নি। ভূপেন দত্তের অনুপস্থিতিতে 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান' হয়—যার গৌরবে গৌরবান্বিত সারা দেশ। গণেশ ঘোষরা কলকাতায় এলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে ভূপেন দত্তরা। ভূপেন আমার কাছে আসে; পরামর্শ ও কিছু অর্থ নিয়ে সে চলে যায়। রসিক দাসের মারফত চন্দননগরে থাকার ব্যবস্থাও করে। বিপদের সম্ভাবনায় চন্দননগরের বাসা বদলাতেও সে বলে। কিন্তু কী ক'রে জানি না বাসাটা বদলানো হয় নি। তার ফলে সর্বনাশ হয়ে যায়। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ প্রভৃতি ধরা পড়ে। শশধর আচার্য ও সুহাসিনী দেবীর দেশপ্রেম এই সময় পরাকাষ্ঠায় ওঠে। ১৯২৬-২৭ সালে সূর্যবাবু,

নির্মল সেন প্রভৃতি চট্টগ্রামের অনেকে আলিপুর জেলে আমার সঙ্গে ছিলেন। সূর্যবাবু আমার সঙ্গে বহু পরামর্শ করেন। ১৯১৫ সালে আমাদের গেরিলা যুদ্ধের প্ল্যান কী ছিল জানতে চাইলে আমি তা বলি। এই আলোচনায় চক্রধরপুরের অস্ত্রাগারে হানা দেওয়া এবং বি. এন. রেল-লাইন উপড়ে ফেলার ভার ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ছিল। কিন্তু অসময়ে হাট ভাঙল বলে কার্যতঃ কিছু হয়ে ওঠে নি। সূর্যবাবু ও নির্মলকে আমার খুব ভালো লেগেছিল।

ওখানে যা হবার হয়েছিল। আমার এক শুভার্থী আমায় সংবাদ দেন গোয়েন্দা বিভাগ (বিহার ও বাংলার) আমার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তাদের সংবাদ ছিল যে নির্মল সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী জামসেদপুর হয়ে রাঁচি আসবেন। আমি জানি না সত্যিই এরকম কিছু ভেবেছিলেন কিনা তাঁরা।

এই উপলক্ষে বাংলার দুই গোয়েন্দা এবং বিহারের এক গোয়েন্দা আমার বাসার নিকটে বায়ু-পরিবর্তনের নামে এসে ছদ্মবেশে অবস্থান করতে থাকে। নলিনী মজুমদার মহাশয়ও একদিন হঠাৎ রাঁচিতে এসে পড়েন। আত্মরক্ষার্থে সে সময় আমার একটি সংবাদ বিভাগ গড়া ছিল। ওদের অজ্ঞাতে আমি ওদের চলাফেরার সব সংবাদই পেতাম। আমি বাংলার বাইরে থাকায় সে-যাত্রায় আমায় গ্রেপ্তার করা হয় নি।

এই সময় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রামের এক যুবক পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। বহু জায়গা ঘুরে সে রাঁচিতে আসে। তার কোমরের কাছে চামড়ার নীচে একটি বন্দুকের গুলী প্রবিষ্ট ছিল। আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। তাকে গোপনে এক জায়গায় রেখে টাকা-পয়সা দিয়ে বাস-যোগে অন্যত্র সরিয়ে দিতেও পেরেছিলাম। তার নাম আজ ঠিক স্মরণ নেই।…রক্ষিত বা নন্দী বলেছিল।

শচীন সান্যালের সঙ্গী 'কাশী ষড়যন্ত্র মামলা'র সুরেন মুখোপাধ্যায় আবার ঢাকায় গিয়েছিল। সেও পুলিসের শিকার হয়, কিন্তু নানারকমে ফাঁকি দিয়ে সে রাঁচি আসে। তাকেও এখানের পুলিসের নজর থেকে বাঁচিয়ে সরিয়ে দিতে সমর্থ হই। এ ঘটনাটা বোধহয় ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সালের। শরৎ বোসের একটা চিঠি নিয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করে। ১৯৩৮ সালে পুজার সময় শরৎবাবু রাঁচিতে এসেছিলেন এবং আলোচনা করেন আমার সঙ্গে।

১৯৩৮ সালে আমার বন্ধুরা অবরোধ থেকে ফিরে আসেন। ১৯৩৯ সালে জানুয়ারি মাসে তাঁরা ভার নেন 'সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড' চালাবার। ঐ সালের সেপ্টেম্বরে আমার নামে একটা ঘোষণা দিয়ে যুগান্তর দল তুলে দেওয়া হয়। সে ঘোষণায় কংগ্রেসের অধীনে একটা কর্মতালিকাও দেওয়া ছিল। তার সার কথা হচ্ছে— গণআন্দোলনের পথে আমরা দেশে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনব। এই ঘোষণাকে উপলক্ষ করে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব নাজিমুদ্দিনসাহেব তাঁদের

সাপ্তাহিক 'Bengal Weekly'-তে তীব্র মন্তব্য করেন—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলছেন গণআন্দোলনের সাহায্যে দেশে স্বাধীনতা আনবেন। তার অর্থ একটা হিংসাত্মক লন্ডভন্ড। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতীত ইতিহাসটা কী বলে ?

উত্তরে আমি 'ফরওয়ার্ডে' লিখি—'A hosepipe against a volcano—দমকল নেভাবে আগ্নেয়গিরি'। গল্পচ্ছলে বলেছিলাম—এক ইংরেজ ও একটি আমেরিকান বেড়াতে বেড়াতে ইটালিতে উপস্থিত হন। বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরি দেখতে গিয়ে উভয়ের সামান্য আলাপ হয়। মার্কিন ভদ্রলোক বলেন, 'এই আগ্নেয়গিরির মতো জমকালো আপনাদের দেশে কিছু আছে ?' ইংরেজ ভদ্রলোক একটু থমকে গেলেন। হাজার হোক জাতে ইংরেজ। গর্বে ভরা। ফট্ করে উত্তর করে বসলেন, 'আগ্নেয়গিরি না থাক, আস্ত আগ্নেয়গিরি নিভিয়ে দেওয়া যায় এমন দমকল আমার দেশে আছে।' নিছক পাগলামি। ভাগ্যচক্রে ভারত স্বাধীন হবেই এবং সে স্বাধীনতা আসবে গণআন্দোলনের ভিতর দিয়ে। নাজিমুদ্দিনসাহেব এই উত্তরের আর প্রত্যুত্তর দেন নি।

Anti-Commintern Pact—জার্মান-ইটালির মিতালি এক ভোজবাজি—ইংল্যান্ড, ফ্রান্সকে অতর্কিতে আক্রমণ করবার সুযোগ নেবার জন্য। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে 'ফরওয়াডে' লিখি আর-একটা বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ছে। এতে একদিকে হবে জার্মানি-ইটালি-জাপান। ওরা রুশিয়াকে নিরপেক্ষ করে রাখবে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স আক্রান্ত হবে। ভারতের এবার সমূহ বিপদ। ভারতকে নিজ স্বার্থরক্ষার্থে সজাগ হতে হবে। আমাদের কর্তব্য ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করা।

পরে জার্মানি যখন আফ্রিকায় বেশ এগিয়ে পড়ে, সে সময় ব্রিটিশ সরকার সতর্কতা অবলম্বনের উপলক্ষে বাংলার বিপ্লবীদের প্রায় নির্মূল ক'রে জেলে পুরে ফেলে। প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিদেশী শক্তির (জার্মানি) সাহায্যে যেভাবে দেশ স্বাধীন করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১ সালে তাকে হুবহু অনুসরণ করলেন সুভাষবাবু। তিনি পালিয়ে জার্মানির সঙ্গে যোগস্থাপন করেন। এই কারণে ইংরেজ এই সময় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সামরিক বিভাগের গোয়েন্দাদের তাগিদে বাংলার পুরাতন বিপ্লবীরা কংগ্রেসের পন্থা নিলেও গ্রেপ্তার হন।

আমি ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় যখন যাই তখন জাপান ইংরেজ ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমি ১৯২৫ সালে 'ভারতে সমরসঙ্কট' লিখি। তাতে ভারতের সম্ভাব্য বিপদের কথা লিখেছিলাম। ঐ সময়ে তা ঘটতে সুরু করে। যে কয়জন বন্ধু ও কর্মী তখন বাইরে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়। আমরা দেখলাম জাপানের অভিযানে ইংরেজের হটে যাবার ভয় আছে। এই

উপলক্ষে ক্ষমতা হস্তগত করার কথা ভাবা দরকার। সেজন্য যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের প্রয়োজন। তাছাড়া বোমা-আক্রমণের সময়ে সেবার জন্যও আমাদের কর্তব্য রয়ে গেছে। ভূপতি মজুমদার, কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, জ্যোতিষ ভৌমিক প্রভৃতি সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ঠিক করি 'নাগরিক-রক্ষা সমিতি' গঠন করতে হবে। মৌলানা আজাদ সে সময়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। ভূপতিকে বলি মৌলানাসাহেবের সাহায্যে এই নতুন প্রতিষ্ঠানটিকে সারা ভারতব্যাপী করা হোক। তাতে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এই ধারণা কার্যকরী হয়েছিল।

৯ই অগস্ট এল। প্রদেশের কোথাও 'নাগরিক-রক্ষা সমিতি'র বাড়ি দখল করা হয় নি। রাঁচিতে এটি বেআইনী সংস্থা ঘোষিত হলে বাড়িটি পুলিস দখল করে নিল এবং অফিসে তালা লাগিয়ে দিল।

আমাদের একজন ভলেণ্টিয়ার শম্ভু তেওয়ারী কিছু পূর্বে বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিতে পড়তে চলে যায়। ৯ই অগস্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং কংগ্রেস বেআইনী সংস্থা বলে ঘোষিত হয়। কংগ্রেসকে কেন বন্ধ করে দেওয়া হল সে-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত সচিব কংগ্রেস কী ঘোরতর অপকর্ম করতে চেয়েছিল সে-সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে সংগৃহীত কংগ্রেসের কর্মসূচী বেতারে প্রকাশ করে দেন। সেই কর্মসূচী পাওয়ায় ছাত্র-যুবকরা কাজ আরম্ভ করে দেয়। তাতে রেল উপড়ে ফেলা, তার কাটা, থানা দখল করার কথা ছিল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেইসব জায়গায় আন্দোলন সুরু হল। রাঁচিতেও তাই হল। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকটি ফিরে এসে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তার কাটা প্রভৃতি সুরু করে। স্টেশন পোড়াতে গিয়ে দলবলসহ ধরা পড়ে। গোয়েন্দা বিভাগ তাকে ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে আমার নাম জড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু যুবকটি ফাঁদে পা দেয় নি। আমি তার কাছ থেকে আদ্যোপান্ত সব কথা জেনে শুনি।

দেশের পক্ষে এই আন্দোলন বড়ই হিতকর ও উপযোগী হয়েছিল।

বহু গান্ধীপন্থী নেতা এই আন্দোলনকে নিন্দা করতেন। তাঁদের দুঃখের অন্ত ছিল না যে অহিংসার জায়গায় সহিংস কার্যক্রম মাথা ঢুকিয়ে ফেলেছে। বিহারে আন্দোলন খুবই প্রবল হয়েছিল। বহু জায়গায় সরকারী রেল, ট্রাক, বাস যেতে পারত না। এরোপ্লেন থেকে দু'বার মেশিন-গানে বহু লোককে হতাহত করা হয়। বাংলার রানাঘাটে ভুল করে রেল-মজুরদের ওপর ঐভাবে গুলী বর্ষণ হয়। প্রতিশোধপরায়ণ ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিস বীভৎস বহু কাজ করে। ঘরে আগুন লাগানো, মাঠের ফসল পুড়িয়ে দেওয়া, মারধোর এবং ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও জেল

দণ্ড হতে লাগল। দু'টি বোন—১৮ ও ১৪ বছর বয়স, দলের নেতৃত্ব ক'রে এক জায়গায় থানা দখল করে নেয় আর সেখানে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয়। তারা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ এবং কংগ্রেস রাজ্যের আরম্ভের কথা দেশবাসীকে জানিয়ে দেয়। পরে বড়টির চোদ্দবছর ও ছোটটির দশবছর কারাদণ্ড হয়। তাদের ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা নষ্ট করে দেওয়া হয়। ছাপরার নেতা রামবিনোদের মেয়ে এরা। যাই হোক, জেলের গান্ধীপন্থী বন্ধুদের বলি, 'আপনারা ভুল বুঝছেন। এই আন্দোলন খুব ফলদায়ক হবে। ইংরেজ এই জাতীয় আন্দোলন বোঝে। আর আপনাদের জেলে আসতে হবে না। শীঘ্র ইংরেজরা একটা মিটমাট করে ফেলবে।' কেউ তাতে খুশি হলেন না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর কারও কারও সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা আমায় বলেন, 'আপনি আচ্ছা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন!'

নিবেদন

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে বিপ্লবীদের মনের কথা বা ধ্যানের কথা সময়াভাবে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। আমরা কী ভাবতাম, কী চিন্তা করতাম, কেমন আলোচনা চলত, তার থেকে কী সিদ্ধান্ত হত—ইত্যাদি বলা দরকার। এবার সে অভাব পূরণের কিছু চেষ্টা করব।

ভিতরকার কিছু কথা

॥ ১ ॥

১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলন জোর পায় মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী দিয়ে। কংগ্রেসকে ঐ আন্দোলনে সহায়তা করবার জন্য মহাত্মাজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বড়ই লাভজনক আইন-ব্যবসা ত্যাগ করে মহাত্মাজীর পথে পা বাড়ানোতে দেশব্যাপী ভারী সাড়া পড়ে গেল। ত্যাগের মোহিনী শক্তি অতুলনীয়। সারা ভারতে আন্দোলনে খুব জোর বাঁধল। সমুদ্র মন্থনে অমৃতের সঙ্গে যেমন হলাহল উঠেছিল, সেইরকম মিঃ জিন্নার মনে কিন্তু বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এরই থেকে।

ইংরেজ এই নবজাগ্রত দেশপ্রেমের বন্যার মোড় ঘুরিয়ে দিতে মনস্থ করল। তারা ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত রাজভক্তির মহাবন্যা বহিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে ব্যর্থ করার ব্যবস্থা করল। রাজা পঞ্চম জর্জের পুত্র প্রিন্স-অব-ওয়েলসকে (বর্তমানে ডিউক-অব-উইন্ডসর) ভারতে আনল। তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করবেন এমন কার্যসূচী তৈরি হল। সহযোগ দিয়ে অসহযোগকে চেপে মারার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু হাওয়া তখন ফিরেছে। মানুষের চিন্তার মোড় ঘুরে গেছে।

এইসময় বিপ্লবীরা অন্তরীণ, কারাবাস বা গা-ঢাকা অবস্থা থেকে মাত্র ফিরে এসেছেন। দেশে তখন দুটো দল ছিল—'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'। এদের উদ্ভবের কথা আগে বলেছি। সব লোক চিন্তা করে না। কেউ বা কারা চিন্তা করলে বাকিরা স্রোতে গা ঢেলে দেয়। এরই একটা নিদর্শন দেখা গেল। এই সময়ের কিছুসংখ্যক নবযুবকের মনে কিছু কিছু কণ্ডুয়ন বা আলোড়ন সুরু হয়েছিল। তাদের নতুন একটি ঝাঁক তখন ভূমিষ্ঠ হবার পথে। এদের কথা খুব কম লোক জানত। এরা দলে নতুন হলেও পুরাতনপন্থী।

এই সময় আমাদের একটা জরুরী বৈঠকের আবশ্যক বোধ হ'ল। অতুল ঘোষের

বাড়িতে সকলে মিলিত হওয়া গেল। সে আসরে অতুল ছাড়া অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সতীশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এবং আরো কয়েকজন ছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। আলোচনার বিষয় ছিল ইংরেজের রাজকুমারকে যদি বেঁচে-বর্তে আর দেশে ফিরে যেতে না দেওয়া হয় তো কেমন হয়? পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে, এই সময়ে এই কাজ সমীচীন হবে না।

ঢাকা অনুশীলন এবং বিপিন গাঙ্গুলীর দল আমাদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁরা ভাবলেন যে, আমরা পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। অবশ্য এঁরা প্রিন্স-বধ কার্যে যোগ দেন নি। আমরা জানতাম আমরা ঠিক পথই ধরেছি। ওঁরা ওঁদের ভুল পরে বুঝবেন এবং এই পথ গ্রহণ করবেন। হয়েছিলও তাই।

যাই হোক প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স কলকাতায় আসেন এবং বাহাল তবিয়তে দেশে ফিরে যান।

বিপিনদা একদিন আমায় একা পেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হে, 'গঠনমূলক কাজ' এসব তুমি কি করছ? আমাদের ধ্বংসাত্মক কাজ করে যাওয়ার কথা নয়?' আমি সে-সময় কয়েকটি গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

এরপর আন্দামান-প্রত্যাগত প্রথম বোমারু দলের কর্মীদের মধ্যে উপেনদার (বাঁড়ুজ্যে) সঙ্গে আমাদের মেলামেশা বাড়তে লাগল। তিনি ছাড়া ওঁদের দলের সকলেই রাজনীতিতে বিরতি দেখিয়েছিলেন। উপেনদা পণ্ডিচেরিতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করছিলেন। দেখলেন শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস নিয়ে ডুবে আছেন। তাঁরা রাজনীতিতে আবার ফেরার আশা দুরাশামাত্র।

পরে দেখেছি একমাত্র শ্রীঅরবিন্দকেই তিনি পরম শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, তিনি বুদ্ধিমত্তায় আকাশস্পর্শী। কিন্তু মনে একটা অভিমান গেঁথে গিয়েছিল যে, তিনি ও শ্রীঅরবিন্দ আর এক-কাজের কাজী থাকতে পারলেন না।

১৯২২ সালে 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। এটিতে আমি উপেনদাকে সম্পাদক করি। তিনি কিন্তু এমন কতকগুলি গান্ধী-প্রোগ্রাম বিরোধী লেখা লেখেন যে, আমায় মহা মুশকিলে পড়তে হয়। আমাদের কর্মীরা এই পথ ধরে চলেছিল। অথচ যাকে দলীয় কাগজ বলেছি তার লেখা শ্লেষে ভরা। উপেনদাকে বোঝালাম বর্তমানে এই-ই আমাদের দলীয় কর্মপন্থা। এর বিরুদ্ধে লেখা ঠিক হবে না। ভবী ভোলবার নয়। তিনি তাঁর কলম চালিয়ে যেতে লাগলেন। তবে আগের মতো অত খোলাখুলি নয়। হঠাৎ এমন একটা লেখা লিখে ফেললেন যে, বন্ধুবর মনোরঞ্জন গুপ্ত আমার কাছে এসে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তাকে নিয়ে উপেনদার সঙ্গে দেখা করলাম। অনেক আলোচনা হল। ফলে তিনি সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে বসলেন। বুঝলাম কোথায় তাঁর সংঘর্ষ বাধছিল। গান্ধীপন্থা

তাঁর পন্থা ছিল না। গান্ধীজি দেশকে অতীতকালে বা 'আদিকালে' নিয়ে যাবার স্বপ্নে বিভোর—এই তিনি ভাবলেন। আর একজন উপযুক্ত সম্পাদক চোখে ঠেকল না। তাঁকে তাই আবার বোঝালাম। তিনি এবার মানলেন। পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন। শ্রীঅরবিন্দের পর গান্ধীজির নেতৃত্ব তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। গান্ধীজির প্রচলিত পথে পূর্ণ স্বাধীনতা কিছুতেই আসতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ আরেক ঘটনা ঘটে গেল। এম. এন. রায়ের 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকা গোপনপথে বার্লিন থেকে আসছিল। তাতে কমিউনিস্ট মত প্রচার হত। উপেনদা দেখলেন গান্ধীজির নেতৃত্বে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা তো আসবেই না, সমাজ ও অর্থনৈতিক দুঃখকষ্টও ঘুচবে না। তবে আর ঐ মতকে সমর্থন দেওয়া কেন? তিনি আস্তে আস্তে রায়ের মতে নিজের মত মিলিয়ে ফেললেন।

ওদিকে যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালের ২১শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে দাঙ্গা হয়। মহাত্মাজী থামাতে না পেরে উপবাস করেন। ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারিতে গোরখপুরের চৌরিচৌরা থানার এক দারোগা এবং একুশজন কনেস্টবলকে ক্ষিপ্ত জনতা অগ্নিদগ্ধ করে। বারদৌলিতে গান্ধীজি মন্তব্য পাস ক'রে আন্দোলন বন্ধ করেন। গান্ধীজি ১৯২২ সালে ২৩শে মার্চ গ্রেপ্তার হয়ে জেলে চলে গেলেন। দেশ শোকাচ্ছন্ন। তাঁর এই জেল-যাত্রাটা উপেনদাকে সাময়িকভাবে ভিজিয়েছিল। আমি অবকাশ বুঝে উপেনদাকে ধরে বসলাম যে, গান্ধীজির প্রশংসায় তিনি যেন কিছু লেখেন। তিনি বললেন, 'তুমি লেখো। গান্ধীজির জীবনের খুঁটিনাটি আমি অত জানি না।'

গান্ধীজি আদালতে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে তাঁর রাজভক্ত জীবনের মোড় ফিরে যাবার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্যক্ত করেন। শেষে তিনি হয়ে বসেছেন রাজদ্রোহী। তাঁর পেশা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'I am a weaver and cultivator by profession.—পেশায় আমি তাঁতী ও চাষী।' এই কথাগুলি আমার হৃদয় খুব স্পর্শ করেছিল। ইনি বলেন কি! বিলেত-ফেরতা ব্যারিস্টার—কত শিক্ষাভিমানী হবার কথা। তাই আমি লিখলাম—No man spake like him বাইবেলে আছে যীশুখ্রীষ্টকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে সৈন্যরা একবার ফিরে আসে। তাঁর মুখের কথায় তারা এতই তৃপ্ত ও আবিষ্ট হয়েছিল যে, যখন উপরওয়ালারা জিজ্ঞাসা করল, 'শুধু হাতে ফিরলে কেন?' তারা উত্তর দিয়েছিল, 'No man spake like him.' সমস্তটাই অপ্রত্যাশিত। ধরাবাঁধা চালচলনের একেবারে উলটো যে!

ভাবটি আমি এইখান থেকে নিই। উপেনদা যখন লিখবেন না তখন আর কী করা যায়? অগত্যা লেখাটি 'আত্মশক্তি'তে দিলাম।

পরদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে গান্ধীজি সম্বন্ধে একটি অতিসুন্দর লেখা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চোখ জুড়াল, প্রাণ ঠাণ্ডা হল। আমার লেখাটি উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে উপেনদা তাঁর অসাধারণ মুন্সিয়ানা কলমের ডগায় ফুটিয়েছেন।

এই সালের কথা। একদিন আমরা কয়েকটি বন্ধু অতুল ঘোষের বাড়িতে এক-সঙ্গে মিলি। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে উপেনদা কথা তোলেন—রাষ্ট্রীয় ওলটপালট এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন একচোটে করা হবে তো? বলা বাহুল্য এই ভাবটি ছিল এম. এন. রায়ের লেখাগুলির উপজীব্য। এই কালে এম. এন. রায় ছিলেন বিষম কংগ্রেস-বিরোধী।

আমি বললাম, 'সে তো সম্ভব নয়। পরাধীন দেশে আগে আনতে হবে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব। তারপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন।' অনেক কথা কাটাকাটি হল। আমরা যে যার মতে অটল রইলাম, উপেনদা যে অসন্তুষ্ট তা বাইরে থেকে প্রকাশ পেল না। খুব চাপা লোক।

উপেনদার মনে নানারকম ঢেউ খেলে গেল। সে-সব ঢাকা দিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাদা আলাদা আলোচনা করতে লাগলেন। আমরা ভাবাদর্শে এক বলেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বাঁধন রইল অতি শক্ত। আমাদের চিন্তাপ্রণালী ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং কর্মতালিকা যুগোপযোগী। একে আঘাত করা যেত না।

(এই সময় সুভাষবাবুও উপেনদার আড্ডায় খুব যাতায়াত করতেন। সুভাষবাবু ক্রমে সুরেন ঘোষের দিকে ঢলে পড়েন। শেষে এমন দিন এসেছিল যখন সুভাষবাবু সুরেন ঘোষকে অতি উচ্চে স্থান দিতেন।)

এর থেকে বোঝা গিয়েছিল—জ্যোতিষ ঘোষ, উপেনদা ও বিপিনদার মন সেদিন কোন্ দিকে ধাওয়া করেছিল।

কয়েকদিন পরে এক সুপ্রভাতে খবরের কাগজে দেখলাম লেনিন বলেছেন, 'Our way to England is through India.—আমাদের বিলেত যাবার পথ ভারতের মধ্যে দিয়ে পড়েছে।* তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক মুলুককে প্রথমে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনতে হবে।

উপেনদার সঙ্গে দেখা হলে সংবাদপত্রের ঐ সংবাদের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'তুমি চিঠি লিখে রায়কে কি বুঝিয়েছ। তার থেকে সম্ভব ঐ উক্তির উৎপত্তি।' আমি বললাম, 'এই সিদ্ধান্ত ঠিক নাও হতে পারে। লেনিন কতবড় মাথাওলা লোক।

* কথাটা লেনিনের নয়, বলেছিলেন ট্রট্স্কি।

বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যা তাই আজ প্রকট করেছেন।' উপেনদা চুপ করে রইলেন। তিনি তখন জগৎ-বিপ্লবের চিন্তায় মশগুল।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, রায়ের সঙ্গে আমাদের গোপন পত্রালাপ চলত। রায় চাইতেন এক কোপে কাটা। আমি চাইতাম দুই কোপে। আগে ব্রিটিশকে তাড়ানো, তারপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। ভারতের বিপ্লবে একটা ক্রমবিকাশ আমার মনে সুস্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছিল। সারা জগৎ রাতারাতি কমিউনিস্ট হয়ে যাবে, এ কথা কদাচ সম্ভব হতে পারে না। বিভিন্ন দেশ সমাজবিজ্ঞানের হিসাবে বিভিন্ন স্তরে রয়েছে যে। এখন অনুধাবন করা যাক, রায়ের মত এরকম হয়েছিল কেন।

মেক্সিকোতে থাকাকালে বরোডিন-এর সঙ্গে রায়ের পরিচয় ঘটে এবং রায় বলশেভিকবাদী হন। বরোডিন আমেরিকা ও ইউরোপে ঘুরে ঘুরে কমিউনিস্ট পার্টি গ'ড়ে তুলছিলেন। ১৯২০ সালে রায় মেক্সিকো থেকে জার্মানিতে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা যে বার্লিন কমিটি* স্থাপন করেন, তিনি তার তৎকালীন সেক্রেটারি ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে মস্কো চলে যান। তৎকালে উৎকট গণবিপ্লবী বলশেভিকদের মধ্যে ছিলেন ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, রাডেক, বরোডিন, বুখারিন প্রভৃতি। এ'রা বিশ্ববিপ্লব চাইতেন।

এই রাডেক ও বরোডিন হন রায়ের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং তখন রায় এ'দের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবপ্রতিষ্ঠান অথবা কংগ্রেস এই দুটোর কোনোটাকেই চাইতেন না—কংগ্রেসের তো ঘোর বিরোধীই ছিলেন।

লেনিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস কামনা করতেন কিন্তু পরাধীন দেশগুলির ঘাড়ে কমিউনিস্ট-বিপ্লব চাপাতে চাইতেন না। সমাজ ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের ঠিক আনুপূর্বিক উপাদান ঐ পরাধীন দেশগুলিতে ছিল না। তাই তাঁর মত বা প্রতিপাদ্য (থিসিস্) ছিল যে, ঐ সব দেশ আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনুক। ভারতে এসময়ে সামাজিক দ্বন্দ্ব না বাধিয়ে বিপ্লবীরা একত্র হয়ে ভারত স্বাধীন করুক—এই ছিল লেনিনের দৃঢ় মত।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ (থার্ড ইন্টারন্যাশনাল) যারা হাত করে নিয়েছিল সে-ঝাঁকটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিল না। তারা লেনিনের সিদ্ধান্ত কায়দা করে ধামাচাপা দিয়েছিল। খোলাখুলি তাঁকে অমান্য করে চলার শক্তি কারও ছিল না। তবু তারা ইচ্ছামতো চলেছিল। তাই পতিতের মুক্তিকামী, বিশ্ববিপ্লবকারী সোভিয়েট রুশ ভারতকে কোনো সাহায্য করে নি।

* ১৯১৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঐ কমিটিকে ভেঙে দেওয়া হয়। তার আগের প্রায় তিন বছর কমিটির সম্পাদক ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। —সম্পাদক

মস্কোতে বরোডিন ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধিদের কোনো পাত্তাই দেন নি। তিনি বলতেন, অন্য দেশের কোনো দল তাঁরা মানবেন না। নিজেদের নির্বাচিত লোককে আন্তর্জাতিক সংঘের কর্মে বাহাল করতেন। আন্তর্জাতিক সংঘের কাছে দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস বিচার্য বিষয় ছিল না।

যাই হোক, ১৯২২ সালের মাঝামাঝি বা শেষ দিকে রায় নিজ অবস্থা খারাপ দেখে সাময়িকভাবে মত বদলান। ১৯২২ সালে কমরেড বেল্-এর সভাপতিত্বে মস্কো নগরীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে তার একটি কমিশন বসে। তাতে রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক একটি থিসিস্ দেন। এঁরা তিনজন তিন দলের নেতৃত্ব করেছিলেন।

কিন্তু এরই পর রায় বার্লিনে এসে 'ভ্যানগার্ড' পত্রের প্রচার সুরু করেন। এখন থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে তিনি রুশের টাকা পেতেন। কিছুদিন বাদে 'ভ্যানগার্ড'-এর ভারতপ্রবেশ ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করলে রায়মশাই নাম পালটে 'অ্যাডভান্স গার্ড' ভারতে পাঠাতে থাকেন। এই পত্রিকাগুলিতে কংগ্রেসকে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান বলে গালি দেওয়া হ'ত এবং ঘৃণা করতে শেখানো হ'ত; আমার বন্ধুদের, বিশেষ করে ভূপতি ও হরিদার কাছে চিঠিতে কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার কথা লেখা হত। ১৯২৩ সাল অবধি এই অবস্থা চলেছিল। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা গ্রেপ্তার হয়ে যাই। রায়ের লেখা আমাদের কাছে আর পৌঁছোতে পারে নি।

১৯২৭ সালে চীনে বরোডিন-এর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় রায়ের পতন হয়; এবং ১৯৩০ সালে জানাজানি হয় যে, তিনি 'কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল' থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। ১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে তাঁকে পার্টির মর্যাদা থেকে স্খলিত renegade বলে তাড়ানো হয়। অপরাধ এই যে, তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ব্রাণ্ডলার ঝাঁকের (Brandlar Group) সঙ্গে একযোগে কাজ করছিলেন। নতুবা তিনি লেনিনের সময় 'থার্ড কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল'-এর কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। সেই পদে থাকাকালে তিনি পূর্ব-বিভাগের প্রধান ছিলেন। ক্রমে স্ট্যালিন ঐ দলটিকে ধরে বসলেন এবং রাডেক প্রভৃতিকে শেষ করে ছাড়েন।

॥ ২ ॥

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নরেন ভট্টাচার্যকে 'সি. এ. মার্টিন' নাম দিয়ে আমি ব্যাটাভিয়াতে পাঠাই। মার্চ মাসে দলের সভ্য জিতেন লাহিড়ী আমেরিকা থেকে জার্মানি হয়ে বার্লিন কমিটির সংকেত (code) নিয়ে দেশে ফিরে আসেন; আমাদের ব্যাটাভিয়াতে লোক পাঠাতে বলেন। প্রশ্ন হল, কে যাবে। আমার বিশেষ বিভাগ

ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন। তাই আমি যেতে প্রস্তুত হই। রায় বাধা দিয়ে বলেন যে, তিনি যাবেন। তিনি বলেন, 'তুমি চলে গেলে সম্মিলিত দলকে মানিয়ে রাখা যাবে না। তার চাইতে আমি যাই।' কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সত্য ছিল। তিনি তাঁর কথাবার্তায় কোনো কোনো সময় এমন ভঙ্গী এনে ফেলতেন যাতে লোক চটে যেত। দুটো বড় দৃষ্টান্ত আজও আমার মনে পড়ে।

প্রথম ঘটনা ঃ রডার মশার পিস্তল সরিয়ে আনার পর রায়ের জিম্মায় আমি কুড়িটা পিস্তল রাখি। বরানগরে বিপিনদা একজনকে ১২টা পিস্তল রাখতে দেন। সে ব্যক্তি নিরাপদ স্থান ভেবে এক মন্দিরে ঠাকুরের পিছনে বাক্সবন্দী করে ঐগুলি রাখে। পুরোহিত জানতে পেরে ভয় পেয়ে যায় এবং অবিলম্বে ঐ অস্ত্রগুলি সরিয়ে ফেলতে বলে। কাজে কিছু হয় না। তখন ঐ পুরোহিত পিস্তলের বাক্স গঙ্গায় ফেলার সিম্ধান্ত করে।

এই সংবাদ রায় পান এবং অস্ত্রগুলি নিজের হেপাজতে সরিয়ে রাখেন।

এদিকে কিছু মশার পিস্তল নিয়ে 'মেদিনীপুর জমিদারি' নামক ইংরেজ কোম্পানির টাকা লুটের চেষ্টা হয় গড়বেতাতে। ওদিকে রডার মোকদ্দমায় অনুকূল মুখার্জী, গিরীন ব্যানার্জী প্রভৃতি কিছু লোক আসামী হন। যদি ঐ অস্ত্রের ব্যবহার হয় এবং ফুটে যাওয়া কার্টিজ (Discharged Cartridge) পাওয়া যায়, তাহলে আসামীদের পক্ষে মোকদ্দমার ফল খারাপ হতে পারে—এই বিপদ ভেবে বিপিনদা আমায় বলেন অস্ত্রগুলি তাঁর জিম্মায় যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমি রায়কে ঐ কথা বলি। তিনি অসম্মত হন এবং শেষ পর্যন্ত গঙ্গায়-ডোবা-সম্ভাবনার বারোটা কিছুতেই ফিরত দেবেন না বলেন। এই নিয়ে উভয়পক্ষের মনোমালিন্য অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হবার সম্ভাবনা হয়। এমন অবস্থায় আমি যতীনদা ও বিপিনদার মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করে দিই। ফল ভালোই হয়। বিপিনদা সদলবলে যতীনদার সঙ্গে মিলে যান। বেশ কিছু অস্ত্র যতীন্দ্রনাথের হাতে ছেড়ে দেন। সেগুলি তিনি সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেন।

বিপিনদা তো ফেরারী ছিলেন। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে যতীনদাও ফেরারী হয়ে যান। কলকাতায় দুজনকে একটা আশ্রয়ে রাখা হয়। রায়ও তখন ফেরারী। আমি প্রতি সন্ধ্যায় ওঁদের খোঁজখবর নিতে যেতাম। একদিন গিয়ে শুনি বিপিনদা না-ব'লেক'য়ে সকালে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। অনুসন্ধানে জানলাম, রায়ের কথা বলার রূঢ় ভঙ্গীই এর কারণ। বিপিনদাকে খুঁজে পেতে ধরে আনি। আবার যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। যতীনদা খুব মিষ্ট স্বভাবের লোক ছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ বরিশালের কর্মীরা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দর নির্দেশে চলে। তিনি জানতে চান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা ও গেরিলা যুদ্ধের প্ল্যান বা কার্যতালিকা।

তারা 'বাঘ'কে চায় কথা বলার জন্য। বাঘাযতীন তখন বালেশ্বরে চলে গেছেন। রায়কে আমি মর্যাদা দেবার জন্য বরিশালের বন্ধুদের বাসায় নিয়ে যাই। সন্ধ্যায় আবার তাঁর নিজের আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখি তুলকালাম ব্যাপার। সকলে ভীষণ চটে রয়েছেন। মনোরঞ্জন গুপ্ত খুবই অনুযোগ করলেন—যদি বাঘকে না পাওয়া গেল তবে আমি নিজে কেন কথা কইলাম না? আমি বললাম, 'বড় বাঘের জায়গায় ছোট বাঘকে এনেছিলাম। কিন্তু ব্যাপার কি?' মনোরঞ্জন বললেন, 'কথাগুলো কেমন ক্যাটকে'টে!' যাক্। পরে আমি স্বামিজীকে সব কথা খুলে বলি। তিনি প্রীত হন এবং ঐ কর্মতালিকা অনুমোদন করেন। কিছু ভালো উপদেশও দিয়েছিলেন।

এর থেকে বোঝা যাবে রায় কেন আমায় দেশ ছাড়তে নিষেধ করেছিলেন। এছাড়া আরও কয়েকটা বিচার ছিল—(ক) যাকে ইংরেজ গ্রেপ্তার করতে চায়, তাকে পেতে দেব না। এতে আমাদের নৈতিক জয় হয়। অর্থাৎ অতবড় শক্তিশালী রাজার জারিজুরি আমাদের কাছে খাটে না। তাতে দেশের লোক খুশি হয়। আমাদের সমর্থক ও সাহায্যকারীর সংখ্যা তো বেড়েই যায়, অধিকন্তু দলে বহু কর্মী আসে। (খ) ষড়যন্ত্র মামলা যাতে হতে না পারে সেটাও আমাদের কাম্য। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় লোকদের ধরতে পারলে ষড়যন্ত্র মামলা সফল হয়। এর মধ্যে উপর্যুপরি কয়েকটা ষড়যন্ত্র মামলা পাঞ্জাবে হয়ে গেল। বাংলায়ও ১৯০৮-১৯১০ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র, ঢাকা ষড়যন্ত্র, নাটোর ডাক-লুটের ষড়যন্ত্র, মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র, খুলনা ষড়যন্ত্র এবং হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা হয়। ফলে দেশে অবসাদ আসে। আমাদের কাছের ও দূরের সমর্থকরা দেবে গিয়ে আমাদের থেকে দূরে, বহু দূরে সরে-সরে যায়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, দলের শীর্ষস্থানীয়দের বাদ দিয়ে ষড়যন্ত্র মামলা হয় না।

তৃতীয়তঃ দলের মাথাদের ধরতে না পারলে এবং ষড়যন্ত্র মামলা না হলে লোকমানসে আমাদের আসন জমকে বসে। আশ্রয়দাতা, উৎসাহদাতা, লোকসংগ্রহকারী কর্মী, মাথাওলা বা শিক্ষিত মহলে জয়জয়কার হয়ে যায়। এটা পরম লাভ। এরই ফলে জনগণমনে আদরের স্থান হয়।

চতুর্থতঃ পাকা লোক কাজে থাকলে কাজের ধারাবাহিক পারম্পর্য বজায় থাকে এবং তাদের অভিজ্ঞতায় উন্নত ধরনের কাজ অগ্রসর হতে পারে।

এইসব চিন্তা করে ইংরেজের কবলের বাইরে রায়কে পাঠাতে সম্মত হই।

১৯১৫ সালে রাসবিহারী জাপানে গেলেন। জাপান তখন জার্মানির সঙ্গে বৈরিতা সুরু করে দিয়েছিল। চীনে জার্মানির সিংটাও জাপান দখল করে নেয়।

রাসবিহারীর দেশে থাকা তখন নিরাপদ নয়। সেইজন্য তিনি দেশ ছেড়ে বাইরে আশ্রয় নিতে চলে যান। পারলে, সেখান থেকে কাজ চালাবেন। রবীন্দ্রনাথের

জাপান যাবার কথা সংবাদপত্রে পড়ে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তিনি পি. এন. টেগোর নাম নিয়ে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজে চড়ে বসেন। রাসবিহারী দেশে খবর দেবার জন্য দুজন বাঙালীকে দূত স্থির করেন। একজন—ভূপতি ঘোষ। এই ব্যক্তি ১৯১৬ সালে আমার সঙ্গে ময়মনসিংহ গিয়ে দেখা করেন। অপর ব্যক্তি—অবনী মুখার্জী।

১৯১৫ সালের শেষদিকে ভূপতি মজুমদারকে আমরা নতুন ব্যবস্থা করার জন্য আমেরিকা পাঠাই। সে সিঙ্গাপুরে কাজ সেরে আমেরিকা অভিমুখে যখন জাহাজে যাচ্ছিল ইংরেজদের এক যুদ্ধজাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে এই জাহাজকে থামিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। ভূপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ও মামলায় ফেলার জন্য সিঙ্গাপুর কেল্লার ট্যাংলিন ব্যারাকে নিয়ে আসে। ভূপতি দেখে নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গী ফণী চক্রবর্তী সেখানে প্রায় আড়াইমাস আগে এসে মজুত হয়ে আছে।

ভূপতিকে আমরা সম্ভব হলে জাপানে যেতে বলেছিলাম এবং ওসাকার ঠিকানায় সংকেতবাণী (Code) দিয়েছিলাম। সিঙ্গাপুর ফোর্টে ভূপতির ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে। তবু তার মুখ থেকে 'আমি কাউকে চিনি না, কোনো কথা জানি না' ছাড়া আর কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় নি।

উত্তরপ্রদেশের শিবপ্রসাদ গুপ্তকে গ্রেপ্তার ক'রে সিঙ্গাপুর কেল্লায় আনা হয়। অবনীর কাছ থেকে শিবপ্রসাদের নাম পাওয়া গিয়েছিল।

॥ ৩ ॥

অ্যাগনেস স্মেডলি

ভারতে ভারতীয়দের মধ্যে অজ্ঞাত কিন্তু মনেপ্রাণে একেবারে ভারতবাসী, ভারতের স্বাধীনতাকামী—এমন দুটি রত্নকে ভারতমাতা পান। একজন ভগিনী নিবেদিতা—আইরিশ পাদরীকুলসম্ভাত, রুশ নিহিলিস্টদের রাজনৈতিক দর্শনে জীবনবেদ গড়ে-নেওয়া মানুষ। অপর জন সুদূর আমেরিকার শ্রমিককুলে জন্মগ্রহণকারিণী, মার্কিনী দেহে অপরূপ ভারতবাসিনী। ইনি শ্রদ্ধেয়া অ্যাগনেস স্মেডলি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে এঁর দেশপ্রীতি ও ভারতীয় স্বাধীনতাপ্রীতির কাহিনী পড়ি সংবাদপত্রের মারফত। তখন আমি গা-ঢাকা অবস্থায় দেশে বিচরণ করছিলাম। তাঁর সাহস, ধৈর্য, বীরত্ব ও ভারতার্থে আত্মত্যাগ এবং কারাভোগের কীর্তিকথা পড়ে রোমাঞ্চ হয়। পরে ধনগোপাল ও শৈলেন ঘোষের কাছে কিছু বিস্তৃত বিবরণ পাই।

তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সংবাদপত্রে লিখতেন, স্টেনোগ্রাফারের (শ্রুতলিখন

কার্যে ব্যাপৃতা কেরানী) কাজ করতেন। কলকাতার 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় অনেকে তাঁর লেখা দেখে থাকবেন।

১৯১৭ সালে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মিত্রপক্ষদের (ইংরেজ, ফরাসী ও রুশের) দিকে যোগ দেয়। যখন জার্মানির সৈন্য এবং মিত্র-ত্রয়ীর সৈন্য টলটলায়মান অবস্থায়, সেই সময় তাজা মার্কিন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করায় কাইজারের সৈন্যরা হেরে যায়।

আমেরিকা যতদিন নিরপেক্ষ ছিল ততদিন ভারতীয় বিপ্লবীরা মার্কিন ভূমিতে বীরদর্পে মাতামাতি করছিলেন। আমেরিকা জার্মান-বিরোধী হওয়ায় বহু ভারতীয় বিপ্লবী বন্দী হন এবং মামলায় আসামী হন। কিছু লোক মেক্সিকোতে পালিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এম. এন. রায়, ধীরেন সেন, হেরম্ব গুপ্ত ও শৈলেন ঘোষ।

জার্মানির সাহায্যে এঁরা মেক্সিকোতে ভালোই ছিলেন। কিন্তু ওখানে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি সুরু হয়। শৈলেন ঘোষ এবং এম. এন. রায় বাংলায় একই দলের কর্মী ছিলেন। সেজন্য একত্র থাকতেন। শেষে রায় তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলে শৈলেন সাঁতার কেটে রাও-গ্রাণ্ডে নদী পার হয়ে আমেরিকায় গ্রেপ্তার হন। ১৯১৭ সালে আমেরিকায় ষড়যন্ত্র মামলায় তারক দাস, শৈলেন ঘোষ এবং অ্যাগ্নেস স্মেড্লির চারবছর করে কারাদণ্ড হয়। এঁরা ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করেন। স্মরণ রাখতে হবে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে আমেরিকান মহিলা কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

খাওয়া-পরার অভাবের সময়ে স্মেড্লি নিজে খেটে টাকা এনে এঁদের খরচ চালিয়েছেন। কারামুক্ত হয়ে স্মেড্লি, শৈলেন ঘোষ, তারক দাস, সুরেন কর প্রভৃতি মিলে আমেরিকায় 'ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া' (ভারতবন্ধু) নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। তাঁরা একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ডি-ভ্যালেরা প্রভৃতি আমেরিকা-প্রবাসী আইরিশরা সহানুভূতিসম্পন্ন হন। তাঁদের পত্রিকা 'গেলিক আমেরিকান' ভারতীয়দের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বিশেষভাবে ভারতপ্রেমিক ছিলেন।

১৯২০ সালে স্মেড্লি বার্লিনে এসে ডাক্তার ভূপেন দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় কোন্ পন্থায় আবার কাজ চালানো যায় এই হয়েছিল চিন্তার বিষয়। জার্মানির কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্যের দিন তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। রুশে হয়েছিল নতুন বিপ্লব। ইংরেজকে সোভিয়েট রুশ শত্রু মনে করত। কারণ ইংরেজ, আমেরিকা, ফ্রান্স বলশেভিকদের ধ্বংস কামনায় অনেক অনিষ্টকর কাজ করেছিল। স্বভাবতঃ এদের ঘরে আগুন যাতে লাগে রুশও তার কামনা করত। রুশও জগৎজোড়া বিপ্লবের রোল তুলেছিল। সেজন্য ভারতের বিপ্লবীদের পৃষ্ঠপোষকদের পট-পরিবর্তন দেখা দিল। সবাই তখন নবতীর্থে যেতে উৎসুক। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব

প্রায় সওয়া-শতবর্ষ ধরে পরাধীন দেশগুলিকে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। তার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সুসমাচার শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তদের স্বাধীনতায় গিয়ে ঠেকেছিল। কিন্তু মস্কোর নব-সুসমাচার দুনিয়ার সমস্ত অনাথ-আতুরের প্রাণ স্পর্শ করেছিল এবং আজও সেই সুবাতাস বইছে।

এই সন্ধিক্ষণে এম. এন. রায় বার্লিনে আসেন, স্মেড্‌লিও আসেন। দত্তের সঙ্গে দুজনেই সাক্ষাৎ করেন। রায়ের তখন নতুন উৎসাহ। তিনি সারা ভারতকে 'কমিউনিস্ট' দেখতে চান। কিন্তু স্মেড্‌লির মনের অবস্থা ঠিক তা নয়। তিনি চাইতেন প্রথম ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। এইজন্য একমতের লোক ব'লে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মিল দৃঢ় হল। সকলেই মস্কো যাওয়া স্থির করলেন। এই ঘটনা ১৯২১ সালের। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ভারতীয় বিপ্লবীরা আর একমতের লোক নেই। কিছু লোক জাতীয়তাবাদী, অপর কিছু লোক কমিউনিজ্‌ম পছন্দ করে।

॥ ৪ ॥

[বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ রাসবিহারী বোসের জাপানযাত্রা ও যুগান্তর পার্টির বিপ্লবী সংসদের সীলমোহর সম্বন্ধে যতীন্দ্রলোচন মিত্রের চিঠি]

[ক]

২২।৬।৫৩

যাদুদা,

কলকাতার বাইরে থেকে ফিরে এসে তোমার পত্র পেয়েছি। আমি রাসবিহারীর সঙ্গে ৩।৪ বার দেখা করি কিন্তু বছর ও সময় ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না। যদি তুমি বছরটি লিখতে পার তবে সঠিক খবর শীঘ্রই দেব।

সীলটি সম্পূর্ণ আমার ডিজাইন এবং এ সম্বন্ধে তোমাকে সমস্ত শীঘ্রই বিশদভাবে জানাব। তুমি ঐ ডিজাইন approve করেছিলে। ঐ ডিজাইনই রাউলাট কমিটির রিপোর্টে ছাপা হয়েছে।*

লোচন

* রাউলাট রিপোর্টের ১১০ পৃষ্ঠায় এই সীলটি ছাপানো হয়েছে। —গ্রন্থকার

[খ]

২৮শে জুলাই ১৯৫৩

যাদুদা,

তোমার পত্র পাবার পর থেকেই শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় পত্র দিতে দেরি হল।

তুমি যখন গৌরীবেড়ের পিসির আশ্রয়ে বা সালিখার বাটিতে, সেই সময় রাসবিহারী কলকাতায় আসেন; কিন্তু তার আগে থেকেই ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের একজনকে রাসবিহারী সাজিয়ে চারিদিকে প্রচার করে যে, তোমার ও 'দাদা'র (যতীন্দ্রনাথ মুখাজী') সঙ্গে দেখা করতে চায়। উদ্দেশ্য তোমাদের ধরা। যাই হোক, এইজন্য অথবা সম্ভবতঃ তোমার শরীরও অসুস্থ থাকায় আমাকেই পাঠাও। সঙ্গে সিঁথির 'মাখন' ও হাওড়ার 'দত্ত' (মতি দত্ত) আমার সঙ্গে যায়। কুন্তলের ও হরিশের যাবার কথা ছিল, কিন্তু তোমাদের খবরাখবরের জন্য তাদের রেখে যেতে হয়।

দেখা হতে তুমি না আসার কারণ, অর্থাৎ আসল না নকল, শুনে হাসতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল চন্দননগরের 'শ্রীশবাবু'। এই নাম পরে জানি মেদিনীপুর জেলে। দেখা হয়েছিল শ্যামনগরের ঠাকুরদের ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে। তোমার উপর এদিকের সমস্ত ভার দিয়ে দাদাকে বালেশ্বরের দিকে পাঠানো হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে অর্থাৎ বাংলার (আসামের) সদিয়ার ও বর্মার ভেতর দিয়ে চীন, শ্যামের সমস্ত land route-এর প্ল্যান তোমার আদেশমতো করা হয়ে তোমার হাতে দেওয়া রয়েছে, ইউনিফর্মও তৈরি হয়েছে। দেশের ভেতরের সমস্ত Arsenal থেকে arms ও armoury কেড়ে নেবার ব্যবস্থাও হয়েছে।

আমার যতদূর মনে হয় রাসবিহারী বলেছিলেন প্রথমে জাহাজে বর্মা যাবেন, পরে সেখান থেকে জাপানে যাবেন। জার্মানি যাবার কথা একেবারেই বলেন নি। ৪।৫ দিন বাদে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি কিনা, স্থান এবং সময় পরে জানাবেন বললেন। পরে আমি চলে আসি এবং তারপর আর কোনো খবর আসে নি বা যদি এসে থাকে আমার জানা নেই।

হেরম্ব গুপ্ত সম্বন্ধে আমার কোনো কিছু জানা নেই বা অন্য কিছু মনে করতে পারছি না।

ব্যাটাভিয়া থেকে অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে তুমি নরেন ভট্চাজকে পাঠিয়েছ। গোয়ায় 'ভোলা' ও 'বিন্দা'কে (বিনয় দত্ত) পাঠিয়েছিলে এটা আমরা সকলেই জানতুম।

তখনকার দিনে Passport ছিল, কিন্তু কড়াকড়ি ছিল না। এই জন্য যখন 'ধোনা'কে (তোমার ভাই ধনগোপালকে) পাঠাও বা জ্ঞান মিত্তির, শৈলেন ঘোষ, নরেন ভট্টাচার্য—এরা কেউ কোনোরকম Passport বা Permit নিয়ে যায় নি।

ব্যবস্থামতো যে জাহাজে যাবে ঠিক হ'লে, সেই জাহাজ যেখানে mooring করা থাকত—রাত্রিতে নৌকায় করে নিয়ে গেলে উঠিয়ে নিত।

ঘোষণাপত্রগুলি তুমিই লিখে দিয়েছিলে। কিন্তু তোমার হাতের লেখা থেকে গোপনে ছাপানো হবার পর হাতের লেখা পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম ছিল। ছাপার পর সীল দিয়ে সকলের কাছে পাঠানো হয়েছিল। যখন President Wilson-এর যুদ্ধের ১৪ দফা বিবৃতি উদ্দেশ্য-ঘোষণা বেরোয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তোমার ঐ সম্বন্ধে উত্তর 'ঘোষণাপত্র' (Declaration) বেরোয়। সমস্ত খবরের কাগজওলাদের, দেশের ও বিদেশের সম্পাদকদের এই সমস্ত ঘোষণাপত্র পাঠানো হয়েছিল। পাছে গোয়েন্দা পুলিস সন্দেহ করে এইজন্য আমরা 'On His Majesty's Service'—কোণে 'Despatcher, Writers' Building', 'From Registrar, High Court, Calcutta'; 'Sun Life Insurance Company', 'Alliance Bank of Simla,' 'Port Commissioners, Calcutta'—এইরূপ অনেক নামের খাম গোপনে ছাপাই।

এই সমস্ত খামের জন্য এবং সমস্তই জেনারেল পোস্ট অফিসে ফেলা হ'ত বলে পুলিস কোনো খবর পায় নি। পরে যাদের কাছে পাঠানো হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থাৎ ইংরেজরা ঐ পত্র গোয়েন্দা অফিসে পাঠায়। যাক্। মাদ্রাজের জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও অ্যানি বেসান্টকে তোমার হুকুম অনুযায়ী পত্র পাঠানো হয়েছিল।

যে সীল রাউলাট কমিটিতে বেরিয়েছে ঐ সীল আমারই Design. একটা স্টীলের Dice দুটো পাটে High and long engraved. আর একটা H. D. Manna-দের ওখান থেকে রবার স্ট্যাম্প করানো হয়েছিল। সম্ভবতঃ পুলিস যুগলের বাটীতে বা কুন্তলের বোনের বাটীতে (নবকৃষ্ণ রাহা লেনের) ঐ রবার স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্পসহ ঘোষণাপত্র পায়। স্টীলেরটি প্রথমে হয় মিন্টের যে টাকার বা গিনির ডাইস কাটতো, তার কাছ থেকে 'কেনো' (বলরাম দে স্ট্রীটের কানাই) কাটিয়ে এনে দিয়েছিল। এইটি শিবপুরের এক জায়গায় থাকে। পরে আমরা Arrest হ'লে ক'টা Revolver ও Cartridge, ঐ Dice গঙ্গাগর্ভে যায়। যুগলের বাটীতে (বসে), আমার বাটীতে (বসে), কাঠমার বাগানের ত্রিলোচন মিস্ত্রীর কারখানার থেকে ঐ সমস্ত পত্র পাঠানো হত। (এই পত্রগুলি বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয়)

লোচন

[রাউলাট রিপোর্ট বলছে যে, এই সীলমোহর চন্দননগরে পাওয়া যায়। কুন্তল চক্রবর্তী একসময়ে চন্দননগরে আশ্রয় নিয়েছিল।]

পূর্বাভাস

[ক]

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের নানারূপ ঘাত-সংঘাত এবং দেশ-বিদেশের বহু সম্ভাব্য ঘটনাবলীর আলোচনা চলত। লোকে বলত প্রকৃতিদত্ত একটা দূরদর্শনের শক্তি কেমন করে যেন আমার ভিতর ক্রমশঃ ফুটে ওঠে। তার ফলে দলগত পরিকল্পনা করার বেশ একটা সুবিধা হত। অবশ্য তর্ক-বিতর্কের দ্বারা সেটাকে মঞ্জুর করিয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগত। যে ঘটনার ছাপ আমার মানসনেত্রে পড়ত সেটা কেউ কেউ মানতে চাইতেন না। অথচ পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, আমার আন্দাজ বা সিদ্ধান্ত ঠিক প্রতিপন্ন হয়েছে।

বন্ধুদের মধ্যে মনোরঞ্জন গুপ্ত আমায় একসময় এক পত্রে জানান যে, তিনি আমার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বা দূরদর্শিতা লক্ষ্য করে এসেছেন। যেটাকে দূরদর্শিতা বলছি, সেটা আমার একচেটিয়া ছিল না। অন্য বন্ধুদের ভিতরেও তেমন পূর্বাভাস ধরা দিয়েছে। আমি ১৯০৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আমাদের লোক পাঠিয়ে যে সম্পর্ক-স্থাপনে প্রয়াসী হই তাতে আমার সহায়ক হন তিনজন—সতীশ সেন, আশু দাস (পরে ডাক্তার) ও বিনয় দত্ত। আমরা চারজন ছাড়া অন্য কেউ বৈদেশিক বা পররাষ্ট্র বিভাগের খবর জানতেন না। আমাদের আদর্শ ছিল ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। বিশাল ভারতকে আমরা একটি মহাদেশ ভাবতাম।

এই কর্মবিভাগ গড়ে তোলার পূর্বে একটা অসাধারণ ঘটনা ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঘটে। ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীর দরবার হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি। দেশীয় নৃপতিগণ মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ইংরেজের রাজরাজেশ্বরের প্রতি আনুগত্য দেখাতে দলে দলে সমুপস্থিত হলেন। সবাই আদবের সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ বা বিশিষ্টরূপে সেলাম করতে করতে এগিয়ে সিংহাসন-উজ্জ্বলকারী পঞ্চম জর্জের সামনে উপস্থিত হয়ে আবার ঐ অবস্থায় আস্তে আস্তে পিছু হটে এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। দেবতাদের সামনে যেমন পিছু ফিরতে নেই, সম্রাটের সামনেও তেমনি।

ক্রমে একজনের পালা এল। তিনি গটগট করে এগিয়ে কাছে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে করমর্দন করে পিছু ফিরে চলে এসে নিজ আসন গ্রহণ করলেন। চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। এতবড় উপলক্ষে সেদিন সেখানে সেই বিরাট ব্যাপারের মাঝখানে ইনি কে প্রথাভঙ্গকারী নবনৃপতি!

সম্বর রাষ্ট্র হয়ে গেল যে তিনি বরোদার গাইকোয়াড় সয়াজী রাও। এতবড় বুকের পাটা! বায়স্কোপে সে ছবি দেখানো হতে লাগল।

রাজারাজড়ার ব্যাপার, আমাদের কিছু নয়। কিন্তু গাইকোয়াড়ের পৌরুষে আমরা খানিকটা প্রভাবান্বিত যে হই নি তা বলতে পারি না। সারা ভারত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল। ভাঙা দেউলে কে আবার নবারতির ঘণ্টা বাজিয়ে উৎসবের উল্লাস জাগিয়ে তুললেন? ইনি কে—যিনি এমন করে নিজের প্রতিষ্ঠা করে নিলেন? পুরোনো, কালিমা-মাখা রাজনৈতিক গগনে মরণ-মসী মুছে নবারুণ রাগ কোন শিল্পী ফুটিয়ে তুললেন?

বোধ হয় ১৯১২ সালে তিনি কলকাতায় এলেন। আমাদের বন্ধু, আজ অমরধামবাসী সতীশচন্দ্র সেন ভাবাতিশয্যে চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বসলেন; বললেন, 'আপনি ভারতের ভিক্টর ইমানুয়েল!' (ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির দ্বারা আনীত ইটালির স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল খুব বড় একটা অংশগ্রহণ করেছিলেন।)

নরেন্দ্র উত্তর করলেন, 'আপনাদের গ্যারিবল্ডি কোথায়?' (গ্যারিবল্ডি বিদ্রোহী ইটালির সেনানায়ক ছিলেন।)

অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে সতীশবাবু এই ঘটনার বিবরণী দিলেন। তখন আমরা গুপ্ত সমিতির কাজে মেতে আছি। সত্যিই তো আমাদের গ্যারিবল্ডি কে? কে তাঁর জায়গা নেবে? ১৮৭০ সালে ইটালি স্বাধীন হয়। মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের কথা। তাঁর প্রাণ-মাতানো শক্তি স্বভাবতঃ আমাদের চিন্তা ও ভাবরাজ্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা ঠিক বুঝেছিলাম বিপ্লবান্দোলনে তিনটি শক্তির খেলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যুক্তবেণী বা মুক্তবেণীর রূপে তার আগমন অবশ্যম্ভাবী। একটি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, একটি বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা এবং একটি সেনানায়ক ফুটে উঠবেন সেই অদৃশ্য শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এক ব্যক্তির প্রেরণা দেশে বিক্ষোভ, আদর্শ ও ভাবপ্রচার এবং আন্দোলন আনবে; আর এক ধুরন্ধর ব্যক্তি আয়োজনকে নিয়োজনে নিয়ে ফেলবেন, দেশ-বিদেশে নিজেদের কথায় পরদেশীদের সহানুভূতি ও সাহচর্য আকর্ষণ করে আপনাদের কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন। শুধু তাই নয়। দেশের সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিজেদের লোক নিযুক্ত করবেন। নিজেদের লোককে আবশ্যকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করে তার সুবিধা গ্রহণ করবেন। নিজেদের প্রতিষ্ঠানটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তুলবেন। নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা হবে তার প্রাণ। প্রথম ব্যক্তি আপামর জনসাধারণে মুক্তিমন্ত্র ছড়াবেন; লোকসংগ্রহ তার থেকে হবে। লোক-বাছাই করবেন দ্বিতীয় ব্যক্তি।

লোক-বাছাইয়ের কিছু নিয়ম আমরা করেছিলাম। কী কী গুণে বিভূষিত

হলে তাকে প্রথম শ্রেণীতে নেওয়া হবে—Sacrifice, inexhaustible energy and non-impulsiveness—(ক) আদর্শ-নিষ্ঠায় ত্যাগের চরম তপস্যা ; (খ) অদম্য কর্মশক্তি ; (গ) উচ্ছ্বাসবিহীনতা বা উচ্ছ্বাস-দমনে অপূর্ব সামর্থ্য—এই তিনটি বিচারকাঠিতে যে উত্তীর্ণ হবে সেই ক্রমে দলের উপরের ধাপে তার স্থান করে নিতে পারবে। নেতাদের মধ্যে এই গুণগুলি যত সহজ হবে, দল তত শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ বলে গণ্য হবে।

এত কড়াকড়ি কেন ? ধরা যেতে পারে যে, গুপ্ত সমিতি দেশের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় সামরিক বিভাগের মতো। কড়া আইন-কানুন হচ্ছে এর প্রাণ। প্রকাশ্য রাজনীতিতে এত ঝঞ্ঝাট নেই। ওটা মুক্তি-সংগ্রামে বেসামরিক বিভাগের মতো। অনেকটা বেসামরিক নাগরিক-গঠিত প্রতিরোধ-প্রতিষ্ঠানের ন্যায়।

পূর্বেই বলেছি শ্রীঅরবিন্দকে মনে হত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তিলককে ধুরন্ধর রাষ্ট্রনেতা। গ্যারিবল্ডির অভাব খুবই বোধ করছিলাম। কিন্তু ১৯০৭ সাল থেকে গুপ্ত সমিতি নিজেই গ্যারিবল্ডি গড়ে তোলার সাধনায় লিপ্ত ছিল। এরই অনুপ্রেরণায় বৈদেশিক বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। গ্যারিবল্ডি যে চাইই চাই। এই তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধানে মন ফিরতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম ১৯১৫ সালে আমাদের দেশে গ্যারিবল্ডির অভ্যুদয় হল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মধ্যে দিয়ে। বিদেশী এক প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বালেশ্বরের চষাখণ্ডের যুদ্ধে ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ এক সেনানায়ক রূপে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে শিখিয়ে গেলেন। নতুন এই দৃষ্টান্ত দেখে দেশের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠতে থাকল—নবভারত সেদিন এই পদাঙ্ক অনুসরণের প্রেরণায় উদ্বেলিত, উদ্‌বুদ্ধ।

এরই পরিণতিতে দেশ একদিন পেয়েছিল সূর্য সেনের অধিনায়কত্ব। আরো অনেক পরে, এই আদর্শের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সর্বশেষ অভিযান করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বর্মা-আসামের প্রান্তে এসে কোহিমার যুদ্ধে।

যা হোক, আমাদের যুগে সেই ১৯০৭ সালের কথায় ফিরে যাই। তখন বড় প্রশ্ন ছিল বিদেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে আমরা তাদের সহানুভূতি এবং হাতে-কলমে নানারূপ সাহায্য পেতে পারি। তাছাড়া ইংরেজের তাঁবেদার ভারতীয় সৈন্যদের যেন ভাগিয়ে আনলাম, কিন্তু তাদের পরিচালনা করবে কে ? তারা তো ইংরেজ সেনানীদের দ্বারা চালিত হতে অভ্যস্ত। নিজেরা চলতে পারবে না। অতএব বহির্জগৎ থেকে সেনানীর শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক আমাদের চাই। তার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব আমাদের মাথায় ছিল।

মেডিকেল কলেজে পাঠের সময় শবব্যবচ্ছেদকালে আমার যে জুড়িদারটি জুটেছিল সে ছিল অবাঙালী মিলিটারি ছাত্র। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোরূপ মিল ছিল না

ব'লে তারা আলাদা কাজ করত। তাদের কেউ সঙ্গী হিসাবে পেতে চাইত না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের একজনকে আমার জুড়িদার বানিয়ে দেওয়ায় আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। মন সর্বদা আত্মরক্ষার জন্য যেন সজারুর মতো কাঁটা উঁচিয়ে থাকত।

কয়েকদিন সে নিয়মিত আসতে লাগল। তারপর 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' হয়ে গেল। আমার হল মুশকিল। কলেজের নিয়ম দুজন ছাত্র শবের দুধারের দুটি অঙ্গের ওপর কাজ করবে; মড়া চিরে বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবে। প্রদত্ত কাজ সমাপ্ত হলে একত্রে পরীক্ষা দিতে হবে। তাতে পাস হলে তবে আবার নতুন পড়া অর্থাৎ নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের হুকুম পাওয়া যাবে। মিলিটারিদের পরীক্ষার অত বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কিন্তু একসঙ্গে কাজ সমাপন না করলে আমার পরীক্ষা নেওয়া হবে না। যেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি। এমনিতে মাইনে নেই, কিন্তু গরহাজির হলে উপর থেকে কোঁৎকা খেতে হয়। কাজেই লোকটির সঙ্গে একটা আপোস-নিষ্পত্তিতে আসতে হল। সে তার মন বাঁধা যেখানে, সেখানে চলে যেতে পারবে; তার অনুপস্থিতিতে তার কাজটাও আমি সেরে রাখব। আমাদের ছ'বছর পড়তে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটা পরীক্ষা দিতে হত। ওরা চার বছর পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এইভাবে দিন চলল। ভাব বেড়ে গেল। দুজনের দুজনকে ততটা খারাপ আর ঠেকত না। যেদিন সে আসত, আমায় তৃপ্ত করার জন্য কিছু গল্পসল্প শোনাত। এইরকমে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। যতটা মনে পড়ে তার নাম ছিল রোজার্স।

একদিন সে ব্রিটিশ-পদানত আয়ার্ল্যাণ্ডের দুঃখের অনেক কিছু জানাল। মনটায় আমার খটকা লাগল। লোকটা বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরের জল বার করে নেবার চেষ্টা করছে না তো? সাবধান হলাম। 'কান খুলে দাও, মুখ বুজে থাকো'—এই নীতি অবলম্বন করলাম।

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি তার টানের কারণ—তার মা আইরিশ, বাপ ইংরেজ। মায়ের দিকে টান থাকায় মাতৃভূমির টান এসে গিয়েছিল। যেমন ডি-ভ্যালেরা। ডি-ভ্যালেরার মা আইরিশ, বাপ স্পেনের লোক। দেশ থেকে মহাদেশের আলোচনা এল। ইউরোপের রাজনীতি এইভাবে এসে গেল।

সে বলল, 'একটা বিরাট যুদ্ধ আসছে; একদিকে ইংরেজ, অন্যদিকে জার্মানি।' শুনে খুশি হলাম। ইংরেজ জব্দ হবে তো? কিন্তু এই সুখটুকু বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। সে বলল, 'ইংরেজের সাহায্যে আসবে ফ্রান্স ও রুশ; প্রয়োজন হলে আমেরিকাও আসবে।'

হতভাগা! ইংরেজের এত সহায়কের নাম একসঙ্গে করলি? আর ভালো লাগল

না। কিন্তু সংবাদ-সংগ্রহ আমার কর্তব্যের মধ্যে ছিল। কান পেতে দিলাম। সে তার কথার সারবত্তা প্রমাণ করতে বলে ফেলল, কে এক মেজর বাউয়ার তাকে এ কথা বলেছে। সেই-বা কোথা থেকে জানল ? ইংরেজের সামরিক বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মেস্-এ।

এরপরই হাসপাতালে ডিউটি-পড়া সুরু হল। বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। খুব 'ডিউটিফুল' (কর্তব্যনিষ্ঠ) ছাত্র হিসাবে সুনাম রটে গেল। এই কালে হাসপাতালের ইউরোপীয়ান বিভাগে কাজ দিলে ছাত্ররা পাশ কাটাতে চেষ্টা করত। কারণ সেই একই। দেশী-বিলিতীতে খাপ খেত না। তারা আমাদের নিকৃষ্ট ভেবে সেইমতো আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করত। রুগী রোজাকে অশ্রদ্ধা করে।

আমি রুচিকর সংবাদের আস্বাদ পেয়ে যাওয়াতে সাহেবী বিভাগে বা ওয়ার্ডে ডিউটি স্বচ্ছন্দচিত্তে নিলাম এবং পর পর বহু আরজী ছাত্রদের হয়ে দীর্ঘকাল কাজ করেছিলাম।

এখানেও আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। দেখা গেল এখানে ফিরিঙ্গী ছাড়া আসল ইউরোপীয় বহু জাতের লোক আসত। ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান, বেলজিয়ান প্রভৃতি লোকও কিছু এসেছিল। এদের কাছ থেকে আমার মিলিটারি বন্ধুর কথার সমর্থন বেরিয়ে পড়ল। এক ইংরেজ আমায় 'গ্রাফিক' ও অন্যান্য বিলাতী কাগজে ছবিসহ যুদ্ধ-উদ্যমের বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়তে দেয়। Anti-aircraft (হাওয়াই-যুদ্ধের প্রতিরোধ) ব্যবস্থাটি সবচেয়ে নতুন মনে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে কিছুই আমি জানতাম না। ১৯১২ সাল। কলকাতায় সে সময় কিছু হাইল্যাণ্ডার সৈন্য ছিল—লোকে যাকে বলত 'ন্যাংটা গোরা'। তারা প্যাণ্ট না প'রে 'ফিলিবেগ' বা ছোট ঘাঘরার মতো একটা পোশাক পরত। তাদের একজন উচ্চপদস্থকর্মচারী—ক্যাপ্টেন হার্ডটাসেল—বিখ্যাত সার্জন বার্ড-এর চিকিৎসায় কেবিনে থাকতেন। গীতায় ঠিক বলেছে 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'। আমি প্রণিপাতটি বাদ দিয়ে পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা খুব লাভবান হলাম। ন্যাকা-বোকার মতো কথাবার্তা খুব সুবিধাজনক হত। তখন বলকান যুদ্ধ চলছিল। তুর্কীরা হারছিল। আমি তাদের খাটো করে কথা কই। ক্যাপ্টেন আমায় শুধরে দেন। তিনি বলেন, তুর্কীদের মতো অমন সুন্দর সৈন্য কম দেখা যায়। ওদের যুদ্ধ বিভাগের ব্যবস্থা খারাপ এবং অফিসাররা তেমন যোগ্য নয়। তিনি বলকান যুদ্ধের পরিস্থিতিটা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। সে সময় তুর্কীর বিরুদ্ধে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং গ্রীস লড়ছিল। পরে রুমানিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি বলেছিলেন—বলকান হচ্ছে ইউরোপের বারুদখানা; ভবিষ্যতে এইখান থেকে একটা বিরাট যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

আমেরিকা থেকে ধনগোপাল আমার বহু পত্রিকার অংশ বেছে-বেছে পাঠাত এবং

সেখানকার জনমত আমায় জানাত। সে আমেরিকায় থেকে আমার সহকারীর কাজ করত। ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, সাধনা ও সংস্কৃতিকে জগতের কাছে বরেণ্য করতে তার কৃতিত্ব অসাধারণ হয়েছিল।

১৯১৭ সালে আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দিলে জার্মানদের সঙ্গে ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের বড়সাহেব ডেনহ্যাম আমেরিকার পুলিসকে সাহায্য করতে যায়। ধনগোপালের বাড়ি ও জিনিষপত্রও খানাতল্লাসি করে। আমায় ভারতে ধরতে না পেরে ইংরেজ ভেবেছিল আমি আমেরিকায় চলে গেছি। আমেরিকার নিরপেক্ষ আইন-ভঙ্গের অভিযোগে আমার নামে এক মামলা আনে এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করে। ধনগোপাল এবং মিস্ ম্যাক্লাউড দুজনেই পরে আমায় এই কথা বলেন।

ধনগোপাল মাত্র ষোল বছর বয়সে আমেরিকা যায়। অতি শীঘ্রই বাড়ির সাহায্য ত্যাগ করে। স্বোপার্জনে লেখাপড়া শেখে এবং জীবনযাত্রা চালিয়ে যায়। দিনে লোকের বাড়ির বাসনপত্র মাজত, ঘরদোর সাফ করত এবং রাত্রে পড়ত। এই অবস্থায় অতি সহজে সে অ্যানার্কিস্টদের পাল্লায় পড়ে। তাদের নেতা ধনগোপালকে দলে নেবার পূর্বে বলে, 'কী বোকা লোক তুমি! ভারতবাসী হয়ে সাম্যবাদ বা সংঘবাদ শিখতে আমেরিকায় এসেছ? পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী ও সংঘবাদী (কমিউনিস্ট) হচ্ছেন একজন ভারতবাসী—গৌতম বুদ্ধ।'

অ্যানার্কিস্ট ধনগোপালের মোড় ফেরাতে আমায় অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল। দু'ভাইয়ে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হবার জোগাড় হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত আমার ভ্রাতৃপ্রেমের জয় হল। অ্যানার্কিস্টদের পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে ও লিখে তার এই সুপ্ত শক্তিদুটি সুন্দর জাগরিত হয়। আমাদের মতের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে আমি তাকে আমাদের পক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির দূতরূপে কাজ করতে নির্দেশ দিই। জীবনভোর সে সাফল্যের সঙ্গে তাই করেছিল।

১৯২৬ সালে কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মিস্ ম্যাক্লাউড আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে সি. আই. ডি.-র বিশেষ বিভাগের বড়কর্তা আর্মস্ট্রং আমাদের কথোপকথন শুনতে আসে। এই সময় ধনগোপাল দেশে একবার আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কথার মধ্যে ম্যাক্লাউড হঠাৎ আর্মস্ট্রংকে জিজ্ঞেস করে বসলেন—ধন যদি ভারতে আসে তাহলে তাকে কি ধরা হবে? সাহেব জবাব দেয়—তাঁর লেখা বা কার্যকলাপ দণ্ডবিধির দ্বারদেশ (Borderland) অবধি গেছে। তিনি বোম্বাই পৌঁছোলে সরকার নিজকর্তব্য নির্ধারণ করবেন। আমরা ধনগোপালকে সে সময় দেশে ফিরতে নিষেধ করি।

ধনগোপালের সব লেখাই বিদেশীদের ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

১৯২৬ সালে মিস্ মেয়ো 'মাদার ইণ্ডিয়া' লিখে জগতের সামনে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ধনগোপাল লেখে, 'A Son of Mother India Answers'—ভারতমাতার এক সন্তান উত্তর দিচ্ছে। পরে আর একটি বই লেখে, 'Visit India with Me'—আমার সঙ্গে ভারতে চলুন। দুরভিসন্ধিতে-ভরা প্রচারকদের সঙ্গে কেউ এসে ভারত দেখলে সে তো খালি দেখবে ভারত নোংরামিতে ভরা। সৎ লোকের সঙ্গে এলে তবে না ভালো দিকগুলি নজরে ঠেকবে?

তারপর ধনগোপালের 'Face of Silence' ভারতের যা কল্যাণ করেছে তার তুলনা হয় না। এই বইটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে লেখা। এটির আখ্যায়িকা ফরাসি মনীষী রোমাঁ রলাঁ শুনে (তাঁর ভগ্নী ইংরেজী জানতেন এবং পড়ে ভাইকে শোনাতেন) ধনগোপালকে পত্র লেখেন, 'মুখার্জী, তোমায় অমর করার জন্য কী করতে পারি বলো?' উত্তরে ধনগোপাল জানায়, 'আমার জন্য কিছু করতে হবে না। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে ইউরোপে পরিচিত করে দিন।' এরপর মহামনা ফরাসি লেখক ঐ সম্বন্ধে বই লেখেন। ধনগোপাল এবং রোমাঁ রলাঁর বইগুলি ইউরোপের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে—রুশ ভাষায়ও।

ধনগোপাল আমায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে লেখে এবং একটা মস্ত বধার কথা বলে।' সে লেখে আমেরিকার লোকদের কাছ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য সাহায্য চাইতে গেলে তারা বলে, 'তোমরা কারা? আমরা আইরিশ দেশ-হিতৈষীদের বুঝি। চীনা দেশ-হিতৈষীদেরও বুঝতে পারি। পারি না তোমাদের ভারতীয় দেশ-হিতৈষীদের। তোমাদের দেশে প্রতিবছর সারা দেশ থেকে প্রতিনিধির দল একজায়গায় একত্রিত হয় আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা ইংরেজের অধীনে স্বাধীন থাকবে (তখনকার কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাইত)। আরে, তোমরা তো অধীনে আছই। তার আবার এত জারিজুরি কেন? এদিকে আবার তোমরা বলছ যে, ইংরেজ তাড়াতে ভারতবাসীরা বদ্ধপরিকর। বলি, কোন্‌টা তোমাদের আসল রূপ? তোমরা কোন্ ভারতবাসী?'

আর একটা কথা। ক্যালিফর্নিয়ার শিখ মজুররা কম মজুরিতে কাজ করে। তাতে খাস আমেরিকাবাসী মজুরদের ক্ষতি করা হয়। মালিকরা তাদের উঁচুদরের মজুরি কাটতে চায়। তাছাড়া শিখদের মাথায় বড় বড় চুল, অকামানো গোঁফদাড়ি এবং আরো কিছু অভ্যাস তাদের আমেরিকার সমাজে মেশার অনুপযুক্ত করেছিল।

এই নিয়ে কয়বন্ধু পরামর্শ করলাম। আশু দাস এবং আমি কলকাতার বড়বাজারের গুরুদ্বারে যাতায়াত সুরু করি। কর্তৃপক্ষের কাছে সব কথা খুলে বলি। কী উপায় করা যায় তার একটা নির্দেশ চাই। ফলে শিখদের রীতিনীতি

বদলানোর ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। অবশ্য শিখদের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। এইসব ঘটতে ঘটতে ১৯১৩ সাল শেষ হয়ে আসে।

বৈদেশিক ব্যাপার নিয়ে আমরা ধীরেসুস্থে এগুচ্ছিলাম। এর মধ্যে সতীশ সেনের কাছে একটা খবর এসে যায় যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে লাগলে জার্মানিরা সাহায্য করতে পারে। খবরটা আসে সম্ভবতঃ অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাই ধীরেন সরকারের কাছ থেকে। তিনি তখন জার্মানিতে ছিলেন। যাই হোক, এ কথা তখন আমাদের চারজনের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সতীশ সেন, আশু দাস, বিনয় দত্ত এবং আমি—এই চারজন ছাড়া আর কাউকে এ-খবর জানানো হয় নি। জার্মানির সঙ্গে তাই যোগস্থাপনের প্রয়োজন হল।

আমরা ঠিক করেছিলাম বৈদেশিক সম্পর্ক বা বন্দোবস্ত বিভিন্ন দল বা বিভিন্ন প্রদেশের নামে হওয়া উচিত নয়। সমগ্র ভারতের জন্য একটা সংঘবদ্ধ বিপ্লবী-সভা কাজ করলে তাতে ভারতের মর্যাদা বাড়বে। এ দিকে আমরা প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলাম। ধনগোপালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ভারতের অনুকূলে লোকমত টেনে আনার কাজ ছেড়ে অন্যদিকে সে যেন মন না দেয়। এই বিভাগেরই যোগ্যতা তার ছিল। তার এইরূপ প্রচেষ্টায় বহু আমেরিকান ভারতবন্ধু হয়ে যান।

জার্মানির সঙ্গে সরাসরি যোগস্থাপনও প্রয়োজন। পাঞ্জাব ও বাংলা বিপ্লবতন্ত্রে অত্যন্ত অগ্রসর ছিল। পূর্বে বলেছি—লালা হরদয়াল যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বামী নিরালম্বের প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন। আম্বালার ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়ও নিরালম্বের অনুরক্ত ছিলেন। অজিত সিং, কিষণ সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদ একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। স্বামিজীর প্রভাব তাঁদের ওপরও যথেষ্ট ছিল। হরদয়াল আমেরিকায় 'যুগান্তর আশ্রম' স্থাপন করেন এবং রামচন্দ্র পেশোয়ারীর সাহায্যে 'গদর পার্টি' স্থাপিত হয়। আমাদের সভ্য সত্যেন সেনকে আমেরিকায় পাঠানো হয়। তিনি গদর পার্টির মেম্বার হন। জিতেন লাহিড়ী আমেরিকায় যান। আমাদের বন্ধু সুরেন করও ওখানে যান এবং বীরেন দাশগুপ্ত আমেরিকা হয়ে জার্মানি যান।

ধীরেন সরকারের সঙ্গে সতীশ সেন পত্রালাপ করেন। আমরা জানতাম 'যুগান্তর'-এর ডাক্তার ভূপেন দত্ত, তারক দাস আমেরিকায় আছেন। সময়ে ছাড়া-ছাড়া লোকেরা একত্রিত হয়ে যাবেন।

ভারতের তরুণেরা ছাত্ররূপে ইউরোপ, আমেরিকায় থাকাকালে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে একত্রিত হয়ে ভারতের রাজনৈতিক দূতের কাজ এবং যুদ্ধোদ্যমের আয়োজন সংসিদ্ধ করেছিলেন।

কত অসুবিধার মধ্যে দিয়ে বৈপ্লবিক আয়োজন চলেছিল। একে তো অস্ত্রগুপ্তির

সংহতি, তার আর্থিক অসচ্ছলতা। সেজন্য প্রথমে দুটি কেন্দ্র নিজ প্রয়োজনে গড়ে ওঠে। একটি আমেরিকায় হরদয়াল ও রামচন্দ্রের অধীনে গদর পার্টির ভিতর দিয়ে, দ্বিতীয়টি ছাত্রবন্ধুদের দ্বারা বার্লিনে।

জার্মানিতে বার্লিন কমিটি হবার পূর্বে আমেরিকার গদর পার্টি নিজেদের সিদ্ধান্তে পাঞ্জাবে লোক পাঠিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে বিপন্ন করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এরই ফলে ১৯১৪ সালে নভেম্বর মাসে আমেরিকার গদর পার্টি থেকে খবর আসে। গদর দলের পাঞ্জাবীরা দলে দলে দেশে ফিরে আসছিলেন।

সত্যেন সেন এবং পিংলে এই সংবাদ বহন করে আনেন। রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ যখন কাশীতে পরামর্শ করেন তখনও বার্লিন কমিটির দূত আমাদের কাছে পৌঁছান নি। ১৯১৫ সালের মার্চে বার্লিনের খবর জিতেন লাহিড়ী আনেন। জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের সরাসরি এই সংবাদ আমি যতীন্দ্রনাথকে দিই। তারপরে কেমন করে ইন্দো-জার্মান সম্পর্ক-স্থাপন, তার বিস্তার এবং ফলে বালেশ্বরের যুদ্ধ ও যতীন্দ্রনাথের মুষ্টিমেয় সৈনিক নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে আত্মদানের কাহিনী—পুস্তকে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

[খ]

চিন্তার অনন্ত আকাশপথে কালো মেঘের বুক চিরে যেন একঝলক আলো নেমে এল। এই ঘটনা বলছি—১৯৩৭ সালের ৫ই অগস্টের। বিশ্বের মানচিত্রটা সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছিল। প্রকৃতির ভিতর থেকে একটা নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস বিভিন্ন জাতকে আশ্রয় করে ফেটে পড়তে চাইছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সম্ভাবনা বুঝতে পারলাম। অথচ সে সময়ের ইউরোপের লীগ অব নেশন্স (জাতিগণের সমবায়), লোকার্নো চুক্তি প্রভৃতি এরূপ যুদ্ধ বাধার প্রতিকূলতা সূচিত করত। তখনও সুদেতেন জার্মান অঞ্চল—চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করে হিটলারকে উপহার দেবার প্রশ্ন জাগে নি। 'মিউনিক চুক্তি' হয় ১৯৩৮ সালে।

১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে বসে 'ভারতে সমরসংকট' নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। ১৯২৮ সালে এটি ছাপা হয়। এতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আভাস দেওয়া হয়েছিল। পক্ষগুলিও বর্ণিত হয়। চট্টগ্রাম, কলকাতা, মাদ্রাজ জাপানীদের দ্বারা উপদ্রুত হবে এই কথাও লেখা হয়। ১৯৩৭ সালে ৫ই অগস্ট বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা, তার নিকটবর্তিতা যেন কেমন করে বুঝেছিলাম। আরো বুঝেছিলাম যে এই যুদ্ধের ফলে ভারত মুক্ত হবে এবং জগতে উচ্চাসন লাভ করবে।

অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা 'ভারতে সমর সংকটে' বলাতে আমি দু'রকম সমালোচনার সম্মুখীন হই। একদল সমালোচক বলেন—এই ভদ্রলোকের চিন্তাপ্রণালী একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ। এক বিশ্বযুদ্ধেই জগতের সমস্ত শক্তিগুলি জর্জরিত। কারও সাধ্য নেই যে দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটায়। বুকে কারও দম নেই, বাহুতে বল নেই। তার ওপর ইনি বলেন জাপান ভারতে উৎপাত আরম্ভ করবে। ওদিকে যে সিঙ্গাপুরে ইংরেজ Naval Base স্থাপন করে বসে আছে! তার সামনে দিয়ে জাপানের ভারতে আসার কথা অলীক কল্পনামাত্র। লেখকের ওসব কথা 'কিছু নয়, কিছু নয়—অলীক স্বপন।'

দ্বিতীয় দলের সমালোচকেরা সমঝদার পর্যায়ের লোক মনে হয়েছিল। আবার বিশ্বযুদ্ধ লাগুক বা না-লাগুক, তাদের মতে লেখক-বেচারা বহু আয়াসে সামরিক তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং তার বিচার-প্রণালী প্রণিধানযোগ্য; একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

যাই হোক, ৬ই অগস্ট থেকে রাঁচিতে বন্ধুমহলে আমার নতুন তথ্যের প্রচার আরম্ভ করি। তার মধ্যে ছিলেন সমাজসেবী ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, শশিভূষণ ঘোষ, কালীশরণ মুখার্জী প্রভৃতি। পূর্বোক্ত দুজন আজ ইহধামে নেই। ১৯৩৮ সালে প্রায় আটবছর কারাবাসের পর সোদরপ্রতিম আমার বন্ধু সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ হিজলি জেল থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তিলাভ করেই রাঁচিতে আমার সঙ্গে মিলিত হন। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পরই প্রথম আমি তাঁকে আমার মনের কথা শোনাই। তাঁকে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে কথাগুলি মিলিয়ে নিতে বলি। তাঁকে বলেছিলাম, ভারতের বিপ্লবোত্থানের চিত্র আমি দেখে নিয়েছি।

পরে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায়, যতটা মনে পড়ে, ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে আগামী যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখি।

এম. এন. রায় ১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে রাঁচিতে আমার কাছে আসেন। তাঁকে যখন এ-কথা বলি তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন। এ কথা পূর্বে অন্যত্র বলেছি।

১৯৩৯ সালে বোধহয় জুলাই বা অগস্ট মাসে ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আগন্তুক যুদ্ধের পূর্বাভাস দিই। তাঁর সঙ্গে বহু আলোচনা হয়। সে কথাও ইতিপূর্বে লিখেছি।

১৯৪১ সালে ডিসেম্বরে আমায় কলকাতায় যেতে হয়। যেদিন রাঁচি ছাড়ি সেইদিন জাপান ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

কলকাতায় আমার সঙ্গে শ্রীমতী বীণা দাস ও কমলা দাশগুপ্ত সাক্ষাৎ করতে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি বলি বিলেতের চার্চিল-মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতের সঙ্গে মিতালি করবার জন্য দু'তিন মাসের মধ্যে দূত পাঠাবেন। সম্ভবতঃ শ্রীযুত ক্রিপস্ সেই সন্দেশবাহক হয়ে আসবেন। এ কথাও ফলেছিল। রুশের সঙ্গে ইংরেজের মিল করাতে পারায় ক্রিপস্-এর পসার-প্রতিপত্তি বেড়েছিল। তাই তাঁর কথা মনে

পড়ে। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত জেল থেকে আমায় অভিনন্দন-বাণী পাঠান। ক্রিপস্ সত্যই সশরীরে এসেছিলেন।

১৯৪২ সালে মে মাসে জাপানীরা বর্মা দখল করে নেয়। মাদ্রাজ-উড়িষ্যায় হাওয়াই জাহাজ এসে বোমা ফেলে। কলকাতা ছেড়ে লোক পালাতে আরম্ভ করে; পরে কলকাতায়ও বোমা ফেলে।

১৯৪২ সালে ৯ই অগস্ট মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে হাজারিবাগ জেলে যাই। তিন বছরের অধিকাংশ সময় হাজারিবাগেই কাটে।

সেখানে দেখি দুটো দল। গোঁড়া গান্ধীবাদীরা '৪২-সালের আন্দোলনকে নিন্দা করতেন। তাঁরা বলতেন—অহিংসার বিরোধী এই আন্দোলন। মহাত্মাজীর আন্দোলন এ নয়। তাঁরা বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজী কোনোও আন্দোলন সুরু করার আগেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। এই হিংসাত্মক আন্দোলনের ফলে জগৎসুদ্ধ লোকেরা ভারতের বিরোধী হয়ে যাবে। এতে ভারতের মুক্তির দিন পেছিয়ে যাবে।

অপর দল সেদিন, সংখ্যায় ভারী। তাঁরা অত নীতিবাগীশ ছিলেন না। তাতে ছিল সোশ্যালিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা দলহীন ছাত্র এবং কিছু অপেক্ষাকৃত কমবয়সী কংগ্রেসী।

যাই হোক, উভয় দলের প্রীতি এবং ভালবাসা পুরোমাত্রায় আমি লাভ করেছিলাম। অহিংসাবাদীদের আমি বোঝাতাম যে, এর ফল ভালোই হবে। কারণ অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতটা একটাই ন্যায় বা বিচারপদ্ধতি বোঝে—সেটা হল গায়ের জোর। The Anglo-Saxons are amenable only to one kind of logic—the logic of physical force. তাঁরা বুঝেও বুঝতেন না।

তাঁরা ভাবতেন আবার হয়তো জেলে আসতে হবে। আমি জোরের সঙ্গে বোঝাতাম, আর আসতে হবে না। এই শেষ আসা। এরপর দেশের মুক্তি।

১৯৪৫ সালের ২৮শে মে মুক্তিলাভ করি। ১৯৪৬ সালে বন্ধুদের আহ্বানে কলকাতায় যাই। সে-সময় সিমলা-শৈলে ব্রিটিশ মন্ত্রী-কমিশনের বৈঠক হচ্ছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের নিয়ে।

সরস্বতী প্রেসে আমাদের সভা বসেছিল। আমি বলেছিলাম এবার আসছে Penultimate Stage—শেষের একধাপ-কম মুক্তি। যুদ্ধ বিভাগের জল, স্থল, অন্তরীক্ষে সেনাপতি থাকবে ইংরেজ। এছাড়া অন্য বিভাগ থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তবে পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে এর পরে। কৃষ্ণান নামক এক মাদ্রাজী যুবক সুন্দর বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'তিথি? মাস? বছর?' আমি বলেছিলাম, 'আরো অল্প কিছুকাল অপেক্ষা করো।'

এরপর একদিন আমরা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্তের বাড়িতে একত্রিত হয়েছি—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের আহ্বানে আলোচনা পর্ব চলছিল। হঠাৎ শ্রীমতী দত্ত ঘরে এসে বিলাপের সুরে বললেন, 'এই নিন রেডিওর খবর—সিমলার পরামর্শ সভা ভেঙে গেছে। আবার সবাই জেল-যাত্রার জন্য তৈরি হোন।' আমি বললাম, 'আর কাউকে জেলে যেতে হবে না। সিমলা বৈঠক ভেঙেছে, ভারতের বরাত ভাঙে নি। ভারত জগৎসভায় ঠাঁই পেয়ে যাবেই।'

১৯৪৭ সালে ১৫ই অগস্ট, ভারত রাহুমুক্ত হল, কিন্তু ভাগ্যে মিলল অধীনে স্বাধীনতা—'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'। আমি এটা মানতে পারি নি। পরে কংগ্রেসকে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা সইতে হল। ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারি এল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থিভেদ

বাংলায় বিগত বিপ্লবান্দোলনের অনেকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বইগুলিতে পাঠের মতো অনেক কিছু আছে। জ্ঞাতব্য বিষয়ও যথেষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। তবু মানুষের মন—তথ্য দিতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি কম করা হয় নি। এখনও প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মী অনেকে জীবিত আছেন। তাঁদের সাহায্য যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য ভালোভাবে সাধিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ কেউ তা করেন নি। এইরকম জটিলতা দূর করার উদ্দেশ্যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করছি।

আসল গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে দুটো দল নিয়ে—'অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিবাদ মরেও মিটছে না'—এই কথা ক'টি আমায় এক সুযোগ্য ব্যক্তি জানিয়েছেন। প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে প্রথমে একটা বড় দল ছিল—'অনুশীলন সমিতি'। এরই ভিতর থেকে 'যুগান্তর'-এর উদ্ভব। কিন্তু 'যুগান্তর'-এর বিস্তৃতি হয়েছে অন্যান্য ঝাঁক বা উপদলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে। 'যুগান্তর' নাম নিয়ে দল চলে ১৯২০ সালেরও পর। নামটি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া। তাতে কিছুই যায়-আসে না। এই নামের প্রতি সশ্রদ্ধ অন্তরে নতি জানিয়েছেন বহু তেজোদীপ্ত সুধী, ত্যাগী, তাপস, বীর। 'যুগান্তর' নামটারই কেমন যেন একটা মন-মাতানো শক্তি ছিল। 'যুগান্তর' কাগজ থেকেই দলের নাম ঐ হয়েছিল।

এই নামটি যখন ব্রিটিশ সরকারী দপ্তর থেকে এসেছে তখন অতীতের দিকে সরকারী নজির ও নজরের কিছু প্রমাণ আছে কিনা দেখা উচিত। সৌভাগ্যবশতঃ তেমন একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল পাওয়া গেছে। ১৯৪৫ সালে বাংলার লাট ছিলেন আর. জি. কেসি। তিনি বড়লাট ওয়েভেলকে একটি পত্র লেখেন। সেটি 'স্বাধীনতা' নামক দৈনিক পত্রিকার পূজাসংখ্যায় প্রচার করা নয়। তাতে বারীনবাবুদের 'যুগান্তর'-এর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। সুতরাং কুলজি অনুসারে 'যুগান্তর'-এর জন্ম ১৯০৬-০৭ সালে ধরাই যুক্তিযুক্ত। 'যুগান্তর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্ম—মার্চ, ১৯০৬ সালে। এ যেন একটি বৈপ্লবিক গাছ থেকে স্তবকের পর স্তবক ফুটে-ওঠার কাহিনী। তেমন দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বলা অন্যায় হবে না—'অনুশীলন'-এর শাখা হচ্ছে 'যুগান্তর'। কিন্তু একথাও যথেষ্ট হল না। অনুশীলন নাম না দিয়ে কতকগুলি দল মিত্রসাহেবের অধীনে ছিল। তাছাড়া নামহীন অনেকগুলি দল ছিল। এগুলি নামতঃ সারা বাংলার বিপ্লব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেও বাইরে

ছিল। ১৯০৬ থেকে এই শেষোক্ত দলগুলির নেতা হন অরবিন্দবাবু। প্রথমে সবটা মিলে একটা দল ছিল। প্রকৃত অনুশীলন ও যুগান্তর আলাদা দল হয় ১৯২১ সাল থেকে। পরবর্তীকালে 'যুগান্তর'-এর প্রশাখা রূপে আকাশের দিকে বাহু বাড়িয়েছে চট্টগ্রামের অমর শহিদ সূর্য সেনের দল এবং ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেম ঘোষের দল বা বি. ভি.। অবশ্য অনন্যসাধারণ কর্মী মেজর সত্য গুপ্তের এই দলগঠনে কৃতিত্ব এবং অবদান অতুলনীয়।

ইংরেজ সরকার তাদের বহু বিবৃতি বা রিপোর্টে সূর্য সেনকে 'যুগান্তর'-এর একজন নেতা বলে উল্লেখ করেছে। এবার আর একটি জট খোলার চেষ্টা করি। বাঘাযতীন কোন্ দলের লোক ছিলেন? তাঁর মুখে শুনেছি তিনি যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামীর রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। এই ঘটনা ঘটে আনুমানিক ১৯০৩ সালে। কয়েকটি পুস্তকে বলা হয়েছে বারীনবাবু ১৯০২ সালে কলকাতায় দল করতে আসেন যতীন ব্যানার্জী আসার ছ'মাস পরে। সেটা ঠিক মনে হয় না। ১৯০৩ সালে হওয়াই স্বাভাবিক। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'তে বলেছেন—অরবিন্দ ও বারীন্দ্র একসঙ্গে ১৯০২ সালে মেদিনীপুরে দেখা দেন। তারিখ ভুলে হতে পারে। ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত পাটনায় বারীনবাবুকে হোটেল করতে দেখেন, তিনি ১৯০৩ সালের গোড়ায় কলকাতায় আসেন। বারীনবাবু তেমন সময় বা একটু পূর্বে বরোদা যান একথা তাঁর 'ভারতের বিপ্লব কাহিনী'তে লিখেছেন। বারীনবাবুর 'অগ্নিযুগে' আছে তিনি আহমেদাবাদ কংগ্রেসের পরে কলকাতায় আসেন। এই সময় শ্রীঅরবিন্দ, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন বিদ্যাভূষণের বাড়িতে আসেন। (যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে আখড়া খোলেন বা দল গড়েন তাও 'অনুশীলন'-এর সঙ্গে মিশে যায়। মূলতঃ একটাই বড় দল গড়ে উঠেছিল।) সে-সময়কার দলের লোক যতীন মুখার্জীর ছোটমামা ললিত চট্টোপাধ্যায় এই কথা লিখে গেছেন।

যশোহর জেলার মাগুরা অঞ্চলের 'অনুশীলন'-এর নেতা হীরালাল রায় বাঘা-যতীনকে 'অনুশীলন'-এর সঞ্চালক পি. মিত্রের কাছে নিয়ে যান। এর থেকে তিনি প্রধান দল বা 'অনুশীলন'-এর সভ্য হন। রাত্রে রাত্রে 'অনুশীলন সমিতি'র ৪৯নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের অফিসে আরো কিছু পুরোনো সভ্যের সঙ্গে তিনিও আসতেন। সতীশবাবুর মুখে এ কথা শোনা। তিনি ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' একটি উক্তিতেও এ কথা বলেছেন। হীরালালবাবু আমাকেও খুব স্নেহ করতেন। তিনি যে যতীন্দ্রনাথকে দলে ভিড়িয়ে দেন সে-কথা তাই জানা গিয়েছিল। এই জন্য 'অনুশীলন'-এর ছেলেরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল— যেমন নরেন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী, বীরেন দত্তগুপ্ত, জ্ঞান মিত্র প্রভৃতি। সামসুল আলমের হত্যা-ব্যাপারে জ্ঞান মিত্রও গ্রেপ্তার হয়েছিল। বোমার দল যখন

শ্রীঅরবিন্দের অধীনে গড়ে ওঠে তাতে যতীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। আমার কাছে তিনি বারীনবাবুদের ঝাঁকটিকে অগ্রগামী কর্মীমণ্ডলী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব এ কথা সত্য যে যাঁরা গোড়াকার 'যুগান্তর' হলেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়ঃ Anyhow the circuit was complete.—যেমন করে হোক ভৈরবদের চক্রটি ভরে উঠেছিল। দেশবন্ধুর কালে যেমন কংগ্রেসে Pro-changer and No-changer—পরিবর্তনকামী এবং অপরিবর্তনকামী দল একই প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'-এর বিবর্তন অনুরূপ ধারায় বিকাশলাভ করে। নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী দলের সম্মিলন দু'বার হয়। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের শেষে। সভাপতিত্ব করেন পি. মিত্র। এই জমায়েতে যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর কথা ঃ তিনি বর্ধমানের লোক। জন্ম হুগলির ত্রিবেণীর নিকট বাঘাটি গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। তাঁর পিতা চন্দননগরে বাড়ি করেন। সেই হিসাবে তিনি চন্দননগরের লোকও বটেন। চন্দননগরের রাষ্ট্রগুরু অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে চন্দননগরের কানাই দত্ত, মতিলাল রায়, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতি যে মধুচক্র গড়ে তোলেন তার সঙ্গে রাসবিহারীর যোগ ছিল। শ্রীশ ঘোষের কাকীমার বোনের ছেলে ছিলেন রাসবিহারী। সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' প্রকাশের পর মুরারিপুকুর বাগানে বারীনবাবুরা ১৯০৭ সালে যে বিপ্লবী-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন তার সঙ্গে রাসবিহারীর যোগ ছিল। ১৯০৮ সালে বারীনবাবুদের গ্রেপ্তারের সময় তাঁর লিখিত দু'খানা চিঠি ঐখানে পাওয়া যায়। সেজন্য তাঁকে বাঁচাবার অভিসন্ধিতে সোদপুরের শশীদা (শশিভূষণ রায়চৌধুরী) এবং 'যুগান্তর'-এর লেখক ও কর্মী প্রেমতোষ বসু পরামর্শ করেন। তার ফলে শশীদা রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর গৃহশিক্ষকের পদটি খালি করে রাসবিহারীকে দেন এবং রাসবিহারী ঠাকুরদের ছেলেদের সঙ্গে দেরাদুনে চলে যান। (জাপানে চলে যাবার আগে রাসবিহারীর ছদ্মনাম পি. এন. টেগোর-এর উৎপত্তি এইখানে।) তারও পরে ধূর্ততা করে গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ডেনহ্যামের চর সাজেন (অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পত্র দ্রষ্টব্য)।

১৯০৯ সালে কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে যখন 'শ্রমজীবী সমবায়' দোকানটি খোলা হয়—এইখানে বিপ্লবান্দোলনের যত ভবঘুরের দেখাসাক্ষাৎ ও পরামর্শের জায়গা হয়। এই সম্পর্কে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি উদ্ধৃত

৬, রামনিধি চ্যাটার্জী লেন, পোঃ উত্তরপাড়া। ৪. ৮. ৫৪

'শ্রমজীবী'র ইতিহাস লিখছি। ১৯০৫ সালে ৭ই অগস্ট স্বদেশী আন্দোলন

আরম্ভ হয়। সুরেনবাবু নেতা। তিনি আমায় উত্তরপাড়া থেকে হুগলি জেলায় কাজ করতে আদেশ দেন। অনুশীলন সমিতির সতীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তরপাড়ায় Field and Academy গড়ি। মুর্তাজাসাহেব শিক্ষা দেন—লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা, তলোয়ার-খেলা প্রভৃতি। 'শিল্প সমিতি' নামে এক দোকান করি, আর তাঁতের Factory করি। একটা Smithy করি। এই Smithy-টা করি উপেনের পরামর্শে—বোমার খোল করবার জন্য—অবশ্য তা করা হয় নি। ১৯০৭ সালের শেষাশেষি আমি মানিকতলার সঙ্গে যুক্ত হই। ১৯০৮ সালের শেষের দিকে 'শ্রমজীবী সমবায় লিঃ' হয়—বহুবাজারে Madan-এর এক নতুন বাড়িতে—ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী আর আমি দুজনে করি—অবশ্য 'শিল্প সমিতি'র ১২,০০০ টাকার মাল নিয়ে। এটা তখন স্বদেশী দোকান মাত্র। তারপর ঘোষ লেনে বাস করত সুধাংশু মুখোপাধ্যায় —ধনীর পুত্র—ক্ষীরোদের আলাপী। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় তাকে জুটিয়ে Bengal United Stores—Y.M.C.A.-র তলায় কেনা হল। (এইটিই বিখ্যাত 'শ্রমজীবী সমবায়' হয়ে যায়)। ক্ষীরোদ আর আমি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম—যেমন উপেন, হৃষিকেশ ছিল। তখন 'যুগান্তর' গোপনে ছাপাতাম আমরা অন্নদা কবিরাজের সঙ্গে মিলে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও ছিলেন। (১) তখন অরবিন্দের সঙ্গে, যতীনের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা। 'শ্রমজীবী' ক্রমশঃ ব্যবসার টাকা খরচ করতে লাগল বিপ্লবের জন্য এবং ক্রমশঃ রামচন্দ্র, যতীন, মতিলাল, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতি এলে ওটাকে একেবারে বিপ্লবের কেন্দ্র করে ফেললাম। আলিপুরের মোকদ্দমার সময় —'শ্রমজীবী' পূর্ণমাত্রায় বিপ্লবের কেন্দ্র—মতিলাল রায়ের চন্দননগরের কেন্দ্রের সঙ্গে, রাজাবাজারের শশাঙ্কের বোমা-তৈরির কেন্দ্রের সঙ্গে; (২) সুরেশের বোমা-তৈরির আড্ডার সঙ্গে সংযুক্ত (৩) Arms Smuggle করত রামচন্দ্র।

মানিকতলার বোমার Experiment করতে যাবার খরচ আমি দিই তোমার বৌদির গহনা বিক্রি করে উপেনের হাতে; ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর পাঠাবার খরচ দিই মিশরীবাবুর কাছ থেকে......ক্রমশঃ কলকাতার প্রধান বিপ্লবী কেন্দ্রগুলি যতীনের সঙ্গে যুক্ত হয় 'শ্রমজীবী সমবায়ে'। অবশ্য এর সঙ্গে 'আত্মোন্নতি'র সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ ছিল সতীশ সেনগুপ্তের মাধ্যমে। এই 'শ্রমজীবী'তেই মন্মথ, বসন্ত বিশ্বাস এসে জোটে—পোড়াগাছা স্কুল থেকে। ক্ষীরোদ ছিল হেডমাস্টার—তাদের নিয়ে 'শ্রমজীবী' মানুষ করে.........পরে রাসবিহারী এসে জুটল। যতীন, রাসবিহারী আর আমি রাসমণির বাগানে পঞ্চবটীর তলায় বসে সিপাহী বিপ্লবের পরিকল্পনা করি। তারপর যতীন কাশী যায়। বসন্ত তার আগে রাসবিহারীর সঙ্গে লাহোর চলে গেছে। 'শ্রমজীবী'র শেষ অঙ্ক হল যতীনকে বিদায় দেওয়া—নরেন ভট্টাচার্যকে বিদায় দেওয়া, —বিপ্লবের টাকা ভাঙিয়ে দেওয়া।

রাসবিহারীর সঙ্গে সম্বন্ধ পূর্ব থেকে ছিল—যখন প্রথমবার সে আসে। দ্বিতীয়বার এসে 'শ্রমজীবী'তেই যতীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—যতীন, সে আর আমি প্রথম রাসমণির পঞ্চবটীর তলায় মিলে বিদ্রোহের পরামর্শ হয়।...বিশ্বস্ত এক শিখ গেন্দা সিংকে 'শ্রমজীবী' দ্বারবান করে। ফোর্টের সঙ্গে সংযোগ করা হয়। রাসবিহারী শিখ ভাষা জানায় ফোর্টের সংযোগ করে ও বিদ্রোহের কথা বলে। কলকাতার ফোর্টে মনসা সিং ছিল।

টীকা : (১) ১৯০৮ সালে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে সারা ভারতে নূতন আইন পাস হয়—Newspapers (incitement to offences) Act. এরই ফলে প্রকাশ্য 'যুগান্তর' উঠে যায়। ১৯০৯ সাল থেকে 'শ্রমজীবী সমবায়' প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। (২) রাজাবাজার বোমার আড্ডা। ১৯১০ সালে পুলিনবাবু (পুলিন দাস) 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা'য় গ্রেপ্তার হন। তারপর ঢাকার কেন্দ্র কলকাতায় আসে। মাখন সেন তখন নেতা। তার কিছু বাদে প্রদীপ্তমেধা, প্রতিভাবান কর্মী নরেন সেন হন 'অনুশীলন'-এর নেতা। তাঁর প্রেরণায় শক্তিসম্পন্ন সহকর্মী, দলীয় কার্যে উৎসর্গীকৃত-জীবন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, ক্ষুরধার-বুদ্ধি প্রতুল গাঙ্গুলী, একাগ্রচিত্ত-কর্মী অমৃত হাজরা ও রবি সেন 'অনুশীলন'-এর জীবনে জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে অমৃত হাজরা চন্দননগরের মতিবাবুর সঙ্গে পরিচিত হন। একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল। 'শ্রমজীবী'র সঙ্গে সংস্রব এইখানে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে চন্দননগরের বোমা-শিল্পী মণীন্দ্র নায়েক ও বোমা-প্রস্তুতকারী সুরেশ দত্তের মধ্যে সম্পর্ক এইরকম সময়ে গড়ে ওঠে। (৩) সুরেশ দত্ত—১৯১২ সালে ইনি কলকাতায় বোমা তৈরি শিক্ষা দিতেন। নিজের মুখ ঢেকে বাছা বাছা শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখে এইসব কথা শুনেছি। (৪) বিপ্লবের টাকা ভাঙিয়ে দেওয়া—জাভা থেকে যে ড্রাফ্‌ট আসে সেটি সুরেশ দত্ত কলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে আনেন। সসৈন্য বিদ্রোহ—এই আদর্শ ছিল যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সম্ভবতঃ বাঘাযতীন এটি তাঁর কাছ থেকে পান। তিনি আলিপুর লাইনে দশম সংখ্যক জাঠ (10th Jats) সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। হাওড়া ষড়যন্ত্রের রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী এই গুপ্ত সংবাদ ফাঁস করে দিলে ঐ সৈন্যদল ইংরেজরা ভেঙে দেয়। সৈন্য বিগড়ে-দেওয়া যতীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবাদর্শ হতেও পারে। ১৯১০ সালে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' হয়।

এবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর কথায় আসা যাক্। নরেন ভট্টাচার্য একদিন আমায় বলে, 'দাদা, রাসবিহারী ও অমরদা একদিন পঞ্চবটীর তলায় বসে আলাপ-আলোচনা করেন। দাদার কথায় সবাই মেতে উঠেছেন—হঠাৎ তিনি বলে বসলেন রাসবিহারীকে

—'ফোর্ট-উইলিয়াম দখল করতে হবে। পারবে?' মন্ত্র-চালিতের মতো 'পারব' বলে রাসবিহারী সত্যই কেল্লা-অঞ্চলে গিয়ে এক হাবিলদারের সঙ্গে কথা কয়ে আসেন।' এখন দেখছি অমরদার উক্তি এই কথার সঙ্গে মিলছে। এটি ১৯১৩-১৪ সালের কথা।

আর একটা কথা মনে পড়ল। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে গার্ডেনরিচে মোটর-ডাকাতি হয়। ঐদিন যতীন্দ্রনাথ আমায় উক্ত কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা সম্পর্কীয় কিছু খবর নিয়ে C. M. S. বোর্ডিং-এ রাত্রে ডাকেন। আমার কথা শেষ হলে (অর্থাৎ কেউ ধরা পড়ে নি এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে) তিনি নতুন কথা কিছু আলোচনা করলেন। তারপর বলে বসলেন—ফোর্ট-উইলিয়াম (কলকাতার কেল্লা) দখল করতে পারি কিনা? আমি বললাম, 'কেল্লা-দখল কেমন করে হবে? আমরা যে সংখ্যায় অতি কম।' তখন বললেন, 'একখানা ইট খসাতেও পার না!' তাঁর কথায় মন্ত্রশক্তি ছিল। তাঁর সামনে অসম্ভব কিছু মনে হত না (এর বহু প্রমাণ আছে)। আমি উত্তরে বললাম, 'পারি।' তখন তিনি 'তাহলেই হবে' বলে হেসে বিদায় দিলেন।

এরপরে নরেন গার্ডেনরিচের টাকা নিয়ে ফিরে রাতটা বিপিনদার রঙ্গে আমাদের বাড়িতে কাটায়। সকালে দুজনে বিদায় নিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় যান। বিপিনদা ঠিক আশ্রয়-কেন্দ্রে পেঁছান। নরেন পেঁছোল না; পথে ধরা পড়ে। এ কথা অন্যত্র লিখেছি। যতীন্দ্রনাথ তাকে ছাড়াবার জন্য ব্যাকুল হন। প্রথমে লালবাজার থানা আক্রমণ করতে বলেন। চেষ্টা করেও সে কাজ হবার সুযোগ-সুবিধা না ঘটায় জেলখানা থেকে বের করে আনার কথা বলেন। জেল থেকে কত লোকই তো পালিয়েছে —১৯৩০-৩৮-এর মধ্যে 'যুগান্তর'-'অনুশীলন' দু'দলেরই লোক পালায়। (১৯৪২ সালে হাজারিবাগ জেল থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি ছ'জন পালান। তাঁদের আমি পালাতে সাহায্য করি।) সে অন্য কথা। যতীন্দ্রনাথ অতিহিসাবী কোনোদিনই ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভিন্ন তন্ত্রের লোক। দুর্দমনীর সাহস ছিল তাঁর কল্পনা ও চরিত্রের গঠনে। শেষে কথা উঠল জেলে গোলযোগ বাধাবার অথবা জেল থেকে কোর্টে আনার পথে ঐ কাজ করার একটা পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে গোপেন রায় বলেন, 'ভট্‌চাযি্যমশায়কে কোর্ট থেকে ছিনিয়ে আনা যেতে পারে। হাতে মশার পিস্তল এবং সঙ্গে মোটরগাড়ির ব্যবস্থা থাকলেই হল। গুলী চালিয়ে সর্ব আপদের শান্তি করা যেতে পারে।' তখন আমরা বলি, 'জামিনে খালাস করার চেষ্টা দেখায় দোষ কি?' প্রস্তাবটা এমনি নিরামিষ ছিল যে তখন এটাকে নিয়ে একটা হাসির রোল ওঠে। কিন্তু উকিলের পরামর্শে জানা গেল যদি কেউ নিজের উপর দায়িত্ব নেয় তাহলে জামানত হতে পারে। রাধাচরণ প্রামাণিককে এক গাড়োয়ান সনাক্ত করে। তার অব্যাহতির আশা ছিল না। তখন নেতা পূর্ণ দাসের অনুমতিক্রমে

রাধাচরণ নিজের ওপর সব ঝুঁকি নেয় এবং নরেন একহাজার টাকার জামিনে খালাস পায়। যতীন্দ্রনাথের কল্পনা ছিল অতিমানবের কল্পনা। পরে নরেনকে আমি কেল্লা-আক্রমণের কথা বলায় সে আমায় পঞ্চবটীতে যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক রাসবিহারীকে কেল্লা-আক্রমণের প্রস্তাব শোনায়। আমি এর পূর্বে ও-কথা জানতাম না।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন আলাদা থাকের মানুষ। আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তির বহু ঊর্ধ্বে এবং আমাদের সকলকে ছাপিয়ে। তাঁর প্রাণের আলোকশিখা যেন কোনও উচ্চলোক থেকে জ্বালিয়ে নিচে নামতেন।

এখন কতকগুলি জটিল প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানে মন দেওয়া যাক। রাউলাট রিপোর্টে ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছে—সমিতিগুলি ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে বেআইনী ঘোষিত হয়। এখানে পূর্ববঙ্গের (যেটি সে সময় পৃথক প্রদেশ হয়ে গিয়েছিল) সমিতিগুলির নাম দেওয়া আছে। আবার ১০৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঢাকার অনুশীলন সমিতি ১৯০৮ সালের শেষদিকে বেআইনী ঘোষিত হয়। কলকাতার 'আত্মোন্নতি' ও 'অনুশীলন' যে এই শেষোক্ত সময়ে উঠে যায় তা বেশ মনে আছে। আমার মনে হয় রিপোর্ট-লেখকের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ১৯০৯ সালের জানুয়ারিতে আর কোনো সমিতির উঠে-যাওয়া বাকি ছিল না।

এখন অমরদার চিঠিতে জানা যায় সশস্ত্র সৈন্য-বিদ্রোহের উদ্ভব কোথায়। যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক রাসবিহারীকে কেল্লা-আক্রমণের প্রস্তাব কী ইঙ্গিত করে? এই দু'জনের ব্যক্তিগত ও দলগত সম্পর্ক কী? ঢাকা অনুশীলনের সঙ্গে রাসবিহারীর সরাসরি যোগ থাকলেও এই বহুব্যাপী বিপ্লবের সময় কি তিনি ছেলে-ছোকরাদের ওপর ততটা নির্ভর করতে পারেন, যতটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যতীন্দ্রনাথের উপর? এটা ছিল যতীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ ভার। তার মানে এ নয় যে রাসবিহারী মনে করেছিলেন 'অনুশীলন' কিছু করবে না। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন দরকার হলে একমাত্র যতীন্দ্রনাথ সবাইকে মিলিয়ে নিয়ে কাজ চালাতে পারবেন। সুতরাং যতীন্দ্রনাথকে বাংলার বিশেষ ভার দেওয়া কারও স্বকপোলকল্পিত বেঠিক, বেআন্দাজী কথা বা কথার কথা নয়। নিছক খাঁটি সত্যকথা। যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সপ্তাহে একলক্ষ টাকা চাই বলেছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপার মাথায় রেখে। ভূপেন মুখার্জী, কেদারেশ্বর গুহ, সত্যেন সেন, পিংলে জার্মান সাহায্যের সম্ভাবনার কথা বহন করে আনেন মাত্র। সঠিক সংবাদ (স্থান, কাল, পাত্র সম্বন্ধীয়) আনেন জিতেন লাহিড়ী মার্চ মাসে। সুতরাং রাসবিহারী বা যতীন্দ্রনাথ সৈন্য-সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের যুক্ত চক্রান্তকারী। রাসবিহারী হাতের-পাঁচ ছেড়ে দূরে আগন্তুক জার্মান সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তবে এ কথা সত্য যে জার্মানির অস্ত্র-আমদানী প্রয়াস প্রচেষ্টা

স্বতন্ত্রভাবে হচ্ছিল আর এক বিভাগ দিয়ে। এটির কথা অতি গোপন রাখা হয়েছিল। সতীশ সেন, আশু দাস, বিনয় দত্ত ও আমি এই মন্ত্রগুপ্তিকে বুকের পাঁজর করে রেখেছিলাম। সৈন্য-সাহায্যে অভ্যুত্থান বিফল হল। বন্ধুরা যতীন্দ্রনাথকে আর কলকাতায় রাখা যায় না বোঝার পর তাঁকে বালেশ্বরে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। তিনি কলকাতার কাজ বন্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন না। কলকাতাকে কিছুদিন শান্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল—ততক্ষণে জিতেন লাহিড়ী বৈদেশিক সাহায্যের পাকা খবর এনেছিলেন। আমাকে দিয়েই যতীন্দ্রনাথকে কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা বলানো হয়। কেন তিনি যাবেন এইসব কারণ বলবার পর বিশেষ প্রয়োজনে উপস্থিত সে-কথা সব খুলে বলি। তিনি বুঝলেন ও বালেশ্বর যেতে রাজী হলেন।

আমাদের মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে আমি বলি কলকাতায় উপদ্রবজনক কাজ করলে ইংরেজের যে-পরিমাণ প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধের সাক্ষাৎ বা মুকাবিলা করতে হয়—মফস্বলে হলে আমাদের শক্তি কম প্রয়োগ করলে চলে এবং এতটা বিপন্ন হতে হয় না। তার উত্তরে তিনি বলেন, 'কলকাতা হচ্ছে বিপক্ষীয়দের মানসম্ভ্রম বা ইজ্জতের প্রধান কেন্দ্র। এখানে ওদের লাট থাকে, ফৌজ থাকে, শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ আছে, নিরস্ত্র এবং সশস্ত্র পুলিসের বহর আছে। এখানে কাজের মতো একটা কাজ মানে ওদের ইজ্জত ধুলায় ধূসরিত। এখানকার একটা প্রচন্ড আঘাত মফস্বলের আট-দশটা আঘাতের চেয়ে ফলপ্রসূ। তার ফলে মফস্বলে প্রবল উৎসাহে কাজ চলবে।' এর থেকে বোঝা যায় আমাদের সঙ্গে তাঁর ধারণার কত তফাত। তাঁর মতলবটা ছিল এইরূপ—'Smite the shepherd and the sheep will be scattered'—মাথায় আঘাত দিতে পারলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনি শিথিল হয়ে আসবে।

যতীন্দ্রনাথ আদেশ দিয়েছিলেন এই বছরে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবে না। সেটা আগামী সসৈন্য-বিদ্রোহের আশাতে। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে আবার প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের পরীক্ষা দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিনাকারণে এতগুলি ছাত্র বাড়িতে বা মেসে চুপ করে বসে থাকলে সন্দেহ জাগতে পারে। তার ফলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবার ভয় ছিল। এইজন্য সুশীল সেনের মতো অসাধারণ মেধাবী ছাত্র কোনোরকমে বি. এস-সি. পাস করে শুভার্থী অধ্যাপক, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

শ্যামের উকিল কুমুদ মুখার্জীর কথা নিয়ে কেউ কেউ অত্যন্ত গর্হিত ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এঁরা বলেন, শুধু কতকগুলি টাকার লোভে এই ধূর্ত ব্যক্তি কলকাতায় খবর পেঁছে দিতে রাজী হয় এবং জাভায় টাকা নিয়ে মার্টিন-এর সঙ্গে কলহ হওয়ায় সিঙ্গাপুরে এসে ইংরেজদের সব কথা জানিয়ে দেয়। না-হক ছেঁদো কথা—বিলকুল গলদ।

এই লোকটিকে ১৯১৩ সালে ভোলানাথ চ্যাটার্জী দলে আনে। ১৯১৫ সালের অগস্ট মাসে শ্যামে ধরপাকড়ে পড়ে যেমন আমেরিকা থেকে আগত সুকুমার চ্যাটার্জী, যোধ সিং, চিণ্ডিয়া সব কথা বলে দেয়, কুমুদও তাই করে। এদের আমেরিকায় 'সানফ্রানসিস্কো ষড়যন্ত্র মামলা'য় নিয়ে যাওয়া হয় ১৯১৭ সালে। ১৯১৭ সালের 'Sanfrancisco Chronicle' পত্রিকা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি, 'Henry S left Manila with arms and munitions, but its engines blew out and it was seized—ম্যানিলা থেকে 'হেনরি এস' নামক জাহাজ অস্ত্রসম্ভার নিয়ে রওনা হয়, কিন্তু তার ইঞ্জিন ভেঙে যায় এবং সেটিকে গ্রেপ্তার করা হয়।' এর সঙ্গে আরও বলা হয়েছে—'অধিকাংশ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছু সংখ্যার বিচার ইংল্যাণ্ডে হয়, কিছু সংখ্যার চিকাগোতে, বাকিদের এখানে।'

ফন পাপেন নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া থেকে এগারো গাড়ি অস্ত্রশস্ত্র কিনেছিলেন। 'অ্যানি লার্সেন' সান-ডিয়েগোয় গিয়ে মাল উঠায়। ৮ই মার্চ ১৯১৫ সালে জাহাজটি রওনা হয়। জাহাজটি প্রথমে সকোরো দ্বীপে যায়—মেক্সিকোর কাছাকাছি। সেখানে 'ম্যাভেরিক'-এর জন্য তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে। 'ম্যাভেরিক'-এর ভারত যাবার কথা ছিল। পানীয় জল এবং খাদ্যের অভাব ঘটাতে 'অ্যানি লার্সেন' ওয়াশিংটনের বন্দরে চলে আসে। এখানে শুল্ক বিভাগের প্রহরীরা জাহাজটিতে চড়ে বসে। রাজদূত ফন বার্নস্ডর্ফ মার্কিন সরকারকে জানান যে, অস্ত্রগুলি পূর্ব আফ্রিকার জার্মান সৈন্যদের জন্য কেনা হয়।

'ম্যাভেরিক' সকোরো দ্বীপে পৌঁছে জানতে পারে যে 'অ্যানি লার্সেন' পূর্বেই অপেক্ষা করে-করে চলে গেছে এবং হোকিয়াসে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। 'ম্যাভেরিক' বাটাভিয়া অভিমুখে চলে যায়। রামচন্দ্র পাঁচজন ভারতবাসীকে চাকর সাজিয়ে ঐ জাহাজে উঠিয়ে দেন। স্টার হাণ্ট এই জাহাজের—Purser (ব্যবস্থাপক কর্মচারী) পরে ইংরেজ কর্তৃক সিঙ্গাপুরে ধৃত হন। এখানে সাক্ষ্য দিতে তাঁকে আনা হয়।

সুকুমার চ্যাটার্জী তার সাক্ষ্যে বলে—সে সানফ্রানসিস্কো থেকে যায় ম্যানিলায়; সেখান থেকে অ্যাময়। তারপর যায় সোয়াটোতে, সেখান থেকে ব্যাঙ্ককে। তারপর যায় পাকোতে। তার হাতে সৈন্য গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত, সৈনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জর্জ পল বোয়েমকে পত্র পাঠানো হয়। হাসানজাদা বা যোধ সিংহের নামেও চিঠি সে নিয়ে যায়। সেই চিঠিগুলিতে জাভার অস্ত্র আমদানির কথা ছিল।

আর একটা সংবাদ এই বিচারে জানা যায় চীন সম্বন্ধে। লি ইউন হাং তখন চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬ সালে তাঁর নিজস্ব সচিব ছিলেন ডবলু. টি. ওয়াং। লি পূর্বে বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তিনি ভারত-বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ভারত-চীন প্রান্তস্থিত প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে

অস্ত্র যাতে ভারতে পৌঁছোয় এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। কিং সু চান এই কাজের ভার নিয়ে আমেরিকাস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছ হতে দক্ষিণ চীনে যাত্রা করেন। চীনে দক্ষিণ প্রদেশের শাসনকর্তাদের সঙ্গে এঁর জানাশুনা ছিল।

আর একটা কথা জানা যায়। মিলার নামক জার্মান—সুইডেনের অধিবাসী কল-চালকের পরিচিতিতে 'ম্যাভেরিক'-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন। মিলার-এর আসল নাম ছিল এইচ. সি. নেলসন।

শৈলেন ঘোষ এবং অ্যাগনেস স্মেড্‌লি ভারতের জাতীয় দলের বৈদেশিক দৌত্য করতে উপস্থিত আছেন বলে ঘোষণা করায় নিউইয়র্কে গ্রেপ্তার হন। স্মেড্‌লি এবং শৈলেন রুশদেশের ট্রট্‌স্কি এবং ব্রেজিল সরকারকে ভারতের সাধারণতন্ত্রের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে অনুরোধ জানান। এটিকে বলশেভিক সাহায্য-প্রার্থনা বলে মনে করা হয়। তাঁরা রুশের জনসাধারণের নৈতিক সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

আইরিশ দেশপ্রেমিকরা ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের মুখপত্র 'গেলিক আমেরিকান'-এর সহ-সম্পাদক জর্জ ফ্রীম্যানের সহায়তা অতুলনীয়। শৈলেন এবং স্মেড্‌লির চেষ্টা এদিকে ফলবতী হয়েছিল।

জাপানের কথা : ১৯১৪ সালে ৪ঠা অগস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯০২ সালের ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী ১৯২২ সাল অবধি স্থায়ী হয়। যুদ্ধারম্ভের অল্প পরেই জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং 'জার্মান-অধিকারে চীন ভূখণ্ড' (সিংটাও) যুদ্ধ করে দখল করে নেয়। এরই জন্য বীরেন চট্টোপাধ্যায় জার্মানিতে 'জাপান এশিয়ার শত্রু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। তার ফলে জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের উপর খুব খুশি হয়। তাঁকে অফিসে ডেকে পাঠায়।

এই পটভূমিকায় জাপানে থেকে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের কাজ কতটুকু চালানো সম্ভব ছিল বিচার করতে হবে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যুদ্ধারম্ভের অল্প পর থেকে জাপান নিরপেক্ষ দেশ ছিল না। সুতরাং জার্মানির তরফ থেকে জাপানকে ঘুষ দিয়ে হাত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হেরম্ব গুপ্ত 'চিকাগো ষড়যন্ত্র মামলা'য় ১৯১৭ সালে এ কথা পরিস্কার বলে। জাপানে তার প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়েছিল। ভারত এইভাবে বঞ্চিত হয়েছিল জার্মান সাহায্যপ্রাপ্তি থেকে।

এইবার কয়েকটা ঘটনা লক্ষ্য করতে হবে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নরেন ভট্টাচার্য (মার্টিন) বাটাভিয়ায় যায়। তারই অব্যবহিত পরে যতীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে অবনী মুখার্জী জাপান যায় (অবনীর ভাই, তপতীনাথের ১৮. ৫. ৬৫ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য। সেও এই কথা বলেছে)। অবনীর বাড়ী ছিল সুকিয়া স্ট্রীট, কলকাতায়। [আমাদের সভ্য লাড্‌লিমোহন মিত্রের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। এইজন্য

১৯২২ সালে সে যখন গোপনে কলকাতায় আসে, লাড্‌লির শরণাপন্ন হয়। লাড্‌লি ও অপর একজন সভ্য (পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর হন) প্রফেসর হরিশ্চন্দ্র সিংহ অবনীকে ভূপতি মজুমদারের কাছে নিয়ে যান।] ১২ই মে রাসবিহারী পি. এন. টেগোর নাম নিয়ে জাপানে যান। কেন জাপান যেতে হল? ডাক্তার ভূপেন দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' এক পত্রে 'কাশী ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী শচীন সান্যাল ও রাসবিহারীর সহকর্মী নলিনী মুখার্জী বলছেন, 'রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার বিশেষ চেষ্টা হওয়ায় তাহাকে জাপান হইতে কার্য করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়।'

একটি পুস্তকে বলা হয়েছে, 'রাসবিহারীকে রক্ষা করাই তখন দলের নিকট প্রধান প্রশ্ন হইল।...জাপান যাওয়াই ঠিক হইল।'...ইত্যাদি। আর এক জায়গায় আছে, 'তিনি নদীয়ায় পৌঁছোলেন—সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে জাপান চলিয়া যাওয়াই স্থির করেন। যাইবার জন্য শচীন, গিরিজা প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অনুরোধ করেন।'

অবশ্য আগ্নেয়গিরির ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাসবিহারী নির্ভয়, নিরাপদ আশ্রয় জাপানে পেলে ভারত-মুক্তিযজ্ঞে তাঁর কর্তব্যপালনে যে প্রবৃত্ত হবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাপানে সে সুযোগ তখন ছিল না। ব্রিটিশের মিত্র জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

তখনকার দিনে কলকাতা থেকে জাপান পৌঁছোতে প্রায় একমাস সময় লাগত। রাসবিহারী নিজে বলেছেন, তিনি ১২ই মে রওনা হন। অতএব জাপান পৌঁছান জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এদিকে জুনের গোড়ায় মার্টিন বাটাভিয়া থেকে টাকা পাঠায়; জুনের মাঝামাঝি ভারতে ফিরে আসে। আমার সঙ্গে কাপ্তেনপদায় সাক্ষাৎ হয় এবং বিশদভাবে সমস্ত আলোচনা হয়। কত বড় বাধা রাসবিহারী জাপানে পান! হেরম্ব এবং রাসবিহারী বহুদিন লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হন। হেরম্বের পক্ষে এরূপ জীবন অনভ্যস্ত, তাই সে গুপ্ত আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে আমেরিকায় ফিরে যায়। জাপানে জার্মান রাজদূত এবং বাণিজ্যদূত মুক্ত-স্বাধীন ছিলেন না। তাই তাঁরা ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। সেজন্য পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ চীনে রাসবিহারী ভাগ্যপরীক্ষা করতে যান। কে. জি. অশওয়া ৮ই অগস্ট ১৯৫৮ সালে যে বই প্রকাশ করেছেন—'The Two Great Indians in Japan', তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

'রাসবিহারী টোকিওতে ১৯১৫ সালের জুন মাসের গোড়ায় আসেন। তিনি সাংহাই-এ অস্ত্র ক্রয়ের জন্য যান। কিন্তু তিনি কিছু করতে পারেন নি।—He could do nothing there as China herself was in revolution. There

were many British defectives there.—চীনে তখন রাষ্ট্রবিপ্লব, বহু ব্রিটিশ গোয়েন্দা সেখানে ছিল।

তিনি টোকিওতে ফিরে এলেন এবং চীনের বিপ্লবী-নেতা সান ইয়াৎ সেন-এর সঙ্গে পরিচিত হলেন।

১৯১৫ সালের ২৭শে নভেম্বর হেরম্ব গুপ্ত, রাসবিহারী ও লালা লাজপৎ রায় ভারতের স্বাধীনতাকল্পে এক সভার আয়োজন করেন। বহু জাপানী তাতে যোগদান করেছিলেন। একটি হোটেলে সভা আহূত হয়। সেখানে জাপানী জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয় এবং জাপানী জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। লালাজী আবেগময়ী বক্তৃতায় জাপানী ভদ্রলোকদের হৃদয় উদ্বেলিত করে তোলেন। প্রত্যেক বক্তা ভারতের প্রতি ইংরেজের নিষ্ঠুরাচরণের তীব্র নিন্দা করেন। ব্রিটিশ রাজদূত ক্ষিপ্ত হয়ে জাপান সরকারের বহির্বিভাগের ওপর চাপ প্রদান করেন। বিপ্লবী দু'জনের উপর বহিষ্কারের আদেশ জারি হয়। লালাজী আমেরিকায় পালিয়ে যান। হেরম্ব ও রাসবিহারীকে পুলিসের বড়সাহেব অফিসে ডাকিয়ে পাঁচদিনের মধ্যে জাপান ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দেন। ১৯১৫ সালের ২রা ডিসেম্বর আদেশ পালনের শেষদিন। জাপানী সাংবাদিক ও জনসাধারণ এই নীচ, আত্মসম্মানহীন ব্যবহারের জন্য জাপান সরকারের উপর চটে যান। এক ব্যক্তি জাপানের 'স্বদেশপ্রেমিক সংঘের' সর্দার তোয়ামার সঙ্গে এই দুটি যুবকের পরিচয় করিয়ে দেন।

পুলিসের বড়কর্তা নিশিকুবে ২রা ডিসেম্বর এঁদের একটি জাহাজে চড়িয়ে জাপান পরিত্যাগের ব্যবস্থা করেন।

ওদিকে পয়লা ডিসেম্বর 'Nakamurya' নামক পাঁউরুটির ব্যবসায়ের মালিক আইজো সোমা এক বন্ধুর মারফত তোয়ামাকে খবর পাঠান যে তিনি ভারতীয় যুবক দুটিকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখবেন। তোয়ামা যুবকদের নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে আনেন। পিছনের দরজা দিয়ে পাশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে এঁদের জাপানীর পোশাকে (যাতে তোয়ামা এঁদের ভূষিত করেন) রুটি ব্যবসায়ীর দোকানে পাঠান। সেখানে সোমা স্বামী-স্ত্রী এঁদের শহর থেকে দূরে পাঠিয়ে লুকিয়ে রাখেন। যেখানে রাখা হল সেটি ছিল রুটি তৈরির কারখানা।

পরের দিন এঁদের না পেয়ে কর্তৃপক্ষের ঝাঁকে হৈচৈ পড়ে যায়। সারা টোকিওতে পুলিস ছড়িয়ে পড়ে। গোয়েন্দারা এই লুকোচুরির খেলায় হেরে যায়।

১৯১৬ সালের এপ্রিলে একটি ব্রিটিশ রণপোত সাগরবক্ষে একটি জাপানী জাহাজকে কামান ছুঁড়ে থামিয়ে তল্লাশি করে এবং সাতজন ভারতবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। জাপানের জাতীয় আত্মসম্মান এবং অভিমানে এবার যৎপরোনাস্তি আঘাত লাগল। সারা দেশে মহা হুলস্থুল পড়ে যায়। ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হল।

জাপান সরকার শেষ পর্যন্ত রাসবিহারী ও হেরম্বের বিরুদ্ধে যে বহিষ্কারের পরোয়ানা ছিল তা প্রত্যাহার করে। (এর ফলে প্রধানমন্ত্রী ওকুমার উপর বোমা-নিক্ষেপ হয়। তিনি প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু একটি পা কেটে ফেলতে হয়।) ১৯১৮ সালে জুলাই মাসে তোয়ামার পরামর্শে রাসবিহারীকে রক্ষার জন্য সোমাদের শিক্ষিতা কন্যা, বিংশবর্ষীয়া যুবতী তোশিকো রাসবিহারীর সঙ্গে বিবাহিতা হন। ১৯২৩ সালের ২রা জুলাই রাসবিহারী জাপানের নাগরিক অধিকার লাভ করেন।

রাসবিহারী ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল—এই কয়বছরে সতেরো বার বাসা বদল করতে বাধ্য হন। কারণ তাঁকে ইংরেজের চর ছেলেধরার মতো ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, এমনকি গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করার সম্ভাবনা ও ছিল।'

ভারতের প্রাণের-প্রাণ, বিপ্লবী-নায়ক রাসবিহারীকে রক্ষা তথা ভারতের স্বাধীনতা লাভের সহায়তাকল্পে তোশিকো কতবড় মহাপ্রাণতা দেখিয়েছেন—কৃতজ্ঞ অন্তরে ভারতবাসীরা তা যাবৎ-চন্দ্র-দিবাকর স্মরণ করবে। এই মহীয়সী মহিলার আত্মদানের তুলনা হয় না। জাপানীরা মেয়েদের বিদেশীকে বিবাহ-করা অত্যন্ত ঘৃণা করে। তার উপর তখনকার পরাধীন ভারত বা ইন্দোচীনবাসীকে বিবাহ নিতান্ত ঘৃণ্য ছিল। যে মেয়ে এরূপ বিবাহ করত তাকে সমাজে পতিতার অধম মনে করা হত। এ ছাড়া রাসবিহারী ঘরবাড়িহীন দরিদ্র ছিলেন।

সাংহাই-এ ফণী চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হয়। তার নাম তখন মিঃ সি. পেন। ফণী ও নরেন ভট্টাচার্য ১৫ই অগস্ট মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চাপে। তারা বাটাভিয়ায় যখন পেঁছোয় তখন অগস্ট বোধহয় শেষ। ওখান থেকে সাংহাই যেতে সম্ভবতঃ দশ-পনেরো দিন দেরি হয়েছিল। সে ওখানে প্রফেসর বিনয় সরকারের সঙ্গে এক-হোটেলে ছিল। তাকে গ্রেপ্তার করে সিঙ্গাপুরে আনা হয়। অক্টোবর মাসে সে সিঙ্গাপুরের ফোর্টে কয়েদ ছিল—এমন প্রমাণ আছে। ফণী চক্রবর্তী সাংহাই থেকে অস্ত্রপূর্ণ জাহাজে হাতিয়ার আনবে—এই উদ্দেশ্য ছিল।

অবনী গ্রেপ্তার হয়ে সিঙ্গাপুরে ফণীকে দেখতে পান। অতএব অবনী সেপ্টেম্বরের কোনো সময় জাপান ত্যাগ করেন মনে হয়। কারণ তিনি রেঙ্গুন পর্যন্ত পেঁছালে তাঁকে ইংরেজরা বন্দী করে এবং অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে আনে। (ভূপতি মজুমদার বলেন—অবনী রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার হন)। এর থেকে এই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রাসবিহারী জুন, জুলাই, অগস্ট মাস জাপানে কাটান এবং সেপ্টেম্বরে সাংহাই যান। তখন চীন থেকে অস্ত্রাদি সংগ্রহের কিছু সুবিধা ছিল—জাপান থেকে একেবারেই নয়। রাসবিহারী নিলসেন নামক জার্মানের বাড়িতে বাস করেন এবং কিছু পিস্তলাদি সংগ্রহ করে 'শ্রমজীবী সমবায়ে' অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। জাহাজ-বোঝাই অস্ত্রাদি প্রেরণের সুবিধা তখন

নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই ঠিকানা অবনীর নোট বই-এ ছিল। রাসবিহারী অবনীর মারফত ভারতে খবর পাঠান। অবনী নোট বই-সমেত ধরা পড়েন।

এবার কয়েকটি ঐতিহাসিক কথা বলি। অপর একটি রাজনৈতিক ইতিহাসে লেখা আছে—'রাসবিহারী বসু জাপানে পৌঁছিয়া চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট সংবাদ পাঠান। তাহা অবগত হইয়া গিরিজাবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দলের সহিত যোগদান করেন নাই।'

এই খবর আসতে কম করে অন্ততঃ ১৯১৫ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি হয়ে গিয়ে থাকবে। তখন কি কারও দলে যোগ দেবার কথা ওঠে?

রাউলাট রিপোর্টে দেখা যায়—'ম্যাভেরিক'-এর ব্যাপার বিফল হলে সাংহাই-এর কন্সাল জেনারেল আর দুটি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ রায়মঙ্গল ও বালেশ্বরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এই কন্সালের সঙ্গে হেলফেরিক-এর সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা তখনও অব্যাহত ছিল। মার্টিন বাটাভিয়ার জার্মান কন্সালকে জানিয়ে দেয় যে, রায়মঙ্গল অঞ্চল আর নিরাপদ নয়। তার চেয়ে হাতিয়া ও বালেশ্বরে অস্ত্র পাঠানো ভালো। এটি যতীন্দ্রনাথের দলের প্রযোজনার সঙ্গে খাপ খায়। এই পরামর্শের ফলে বন্দোবস্ত এইরূপ দাঁড়ায়— (ক) হাতিয়ার জাহাজটি সোজাসুজি সাংহাই থেকে আসবে এবং ডিসেম্বরের শেষাশেষি পৌঁছাবে। (খ) বালেশ্বরের জাহাজটি হবে জার্মানির সম্পত্তি। ডাচ বন্দরে তখন অবস্থিত সমুদ্রবক্ষের উপরে অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহ করবে। (গ) এছাড়া তৃতীয় আর একটি জাহাজ (জার্মানির যুদ্ধ-সংক্রান্ত পোত) আন্দামানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসবে—রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করবে। তাতে ভারতের এবং সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহী বন্দীরা মুক্তিলাভ করবে। একজন চীনাম্যানকে হেলফেরিক-এর সঙ্গে দেখা করে পিনাং-এ একটি বাঙালীকে, অন্যথায় কলকাতার এক ঠিকানায় একটি চিঠি পৌঁছে দিতে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পিনাং-এ পৌঁছোবার পূর্বে সিঙ্গাপুরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই বিষয়ে স্মরণ করতে হবে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় পিনাং যায় ১৯১১-১২ সালে। সেখানে একটি দল করে আসে। একজন বাঙালী কনট্রাক্টার এবং একজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন এই দলে। ভোলানাথের কাছে একথা আমার শোনা।

১৯১৫ সালের অক্টোবরে সাংহাই-এ দুজন চীনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সঙ্গে পাওয়া যায় ১২৯টি অটোমেটিক পিস্তল এবং ২০,৪৩০ টি কার্তুজ। জার্মান নিল্সেন তাদের ঐগুলি গোপনে কলকাতায় পৌঁছে দিতে বলেন। ঠিকানা ছিল অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রমজীবী সমবায়'। এটি যে রাসবিহারীর প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই। রাসবিহারী 'সমবায়ের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে কথা আগে বলেছি। অবনী ধরা পড়লে তার নোট বই-এ নিল্সেনের ঠিকানা পাওয়া যায়। তবে এ

কথা ধরে নিলে খুব একটা ভুল হবে না যে অবনী অক্টোবরে ধরা পড়ে।

একটা বিষয়—বিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের ধারণা কবে আসে সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯০৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ধরপাকড়ের পর পুরাতন 'অনুশীলন' এবং তার থেকে উদ্ভূত অরবিন্দ-বারীন্দ্রের দল ভেঙে যায়। আইন করে সব সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার। তখন ১৯০৮-১০ সালের মধ্যে সতীশ সেন, আশু দাস, বিনয় দত্ত এবং আমি দলগুলিতে জোড়াতালির ব্যবস্থা প্রথমে করি। পরে বুঝি এইভাবে কাজ চলবে না। আমাদের সঙ্গে নিখিল বঙ্গের কিছু কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কর্মী বা নেতাদের সাক্ষাৎ হত। আমরা সেই সময় নিরাপত্তার কথা ভেবে বিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সেইজন্য বরিশাল, ময়মনসিং, মাদারিপুর, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে ১৯১৪ সালে সকেন্দ্রিক সংগঠনের কায়দা আনয়ন বা স্থাপনের চেষ্টাও করি নি। এককেন্দ্রিক করার ইচ্ছা অত আগে আমরা ত্যাগ করেছিলাম। রংপুরের অবিনাশ রায় উত্তর ভারতে (কাশীতে), সিংহল ও বর্মায় দলের শাখা প্রসারিত করেন। শচীন সান্যালকে আশু লাহিড়ী কিছুদিন লুকিয়ে রাখেন। এঁরা 'যুগান্তর'-এর লোক।

অধুনা বিদেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, জার্মানিতেও একটি বিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অল্প পরে গড়ে উঠেছিল। লাইবক্লেক্ট, রোজালুক্সেমবুর্গ তার নেতা ছিলেন। সেই সংগঠনের নাম ছিল 'স্পার্টাকুস'। প্রয়োজন অনুসারে মানুষ মাথা খাটায়। সকেন্দ্রিক বা এক-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান যে দুর্বল হবেই এ ধারণাও ঠিক নয়। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলায় দু'রকম প্রতিষ্ঠানই জন্মগ্রহণ করেছিল।

আমেরিকায় ১৯১৭ সালে সানফ্রানসিস্কো এবং শিকাগোতে দু'টি ষড়যন্ত্র মামলা হয়। জার্মান-ভারতীয় ষড়যন্ত্র ছিল এই দুটির বিচার্য বিষয়। হেরম্ব গুপ্তকে জাপান থেকে বহিষ্কৃত করায় জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে আমেরিকা থেকে ডেকে পাঠায়। এটি নভেম্বর, ১৯১৫ সালের কথা। তিনি ডিসেম্বরে রওনা হন এবং জার্মানিতে পেঁছে আমেরিকার পূর্ণভারপ্রাপ্ত হন; ১৯১৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ফিরে আসেন। এম. এন. রায়ের (মানবেন্দ্রনাথ রায় নামটি আমার ভাই ধনগোপালের দেওয়া) সঙ্গে দেখা হয়। রায় 'ম্যাভেরিক' প্রভৃতির ব্যর্থতায় বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার সমূহ ক্ষতির কথা বলে। তাছাড়া জানায় যে রাসবিহারী তখন টোকিওতে অবস্থান করছেন। হেলফেরিক রায়কে চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। চক্রবর্তী বলেন তিনি কয়েকজন চীনা ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন। চীনা-সীমান্ত দিয়ে ভারতে অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা তাঁরা করবেন। রায়কে আরো বলেন যে, তিনি যেন বার্লিনে গিয়ে তুর্কীদের সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহ করে আফগান

সীমান্তে পাঠাবার চেষ্টা দেখেন। ডয়েট্‌সল্যান্ড নামক জার্মান সাবমেরিনে রায়কে পাঠাবার জল্পনা-কল্পনা চলে। কিন্তু পরের দিন রায় গ্রেপ্তার হয়ে যান। চক্রবর্তী বলেন—হরিশ্চন্দ্র নামক এক ব্যক্তি আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে অনেকেই সন্দেহ করেন।

২০শে ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে **'Sanfrancisco Call'** নামক সংবাদপত্র ছাপে—'The efforts of M. N Roy to secure passage on the Deutschland was disclosed—ডয়েট্‌সল্যান্ড নামক সাবমেরিনে এম এন. রায়ের যাবার চেষ্টা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।' এর পরে রায় গ্রেপ্তার হয়ে বাসায় ফিরতে পারে এবং সেই ফাঁকে মেক্সিকোতে পালায়।

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পত্র]

উত্তরপাড়া। ৪.৯.৫৪

……শেষাশেষি 'অনুশীলন' আর আমরা—যাদের 'যুগান্তর দল' বলে, তারা এক-যোগে কাজ করি।…রাসবিহারীর একটা গোপনীয় কথা হয়ত কেউ জানে না। যখন প্রথম রাসবিহারী দেরাদুন থেকে বা দিল্লী থেকে বাংলায় আসে, সে আসে চন্দননগরের সংবাদ দিতে ডেনহ্যামকে। সে সাহেবদের কাছে angel (দেবতা) বলে আদৃত ও সম্মানিত হত। সুতরাং ডেনহ্যাম তাকে বলে-কয়ে বাংলার, বিশেষ করে চন্দননগরের বিপ্লবীদের সংবাদ জোগাড় করে দিতে বলে। [সম্ভবতঃ এটি ১৯১০ সালের শেষ বা ১৯১১ সালের ব্যাপার। শ্রীঅরবিন্দ তখন পণ্ডিচেরী চলে গেছেন। সেইজন্য চন্দননগরের উপর বিশেষ ঝোঁক পড়ে থাকবে।] সেও ধূর্তামি করে কলকাতার সি. আই. ডি.-দের অফিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। এদিকে শ্রীশচন্দ্র ও মতিলালের সঙ্গে মেলামেশা করে। 'শ্রমজীবী'তে সে আসে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে এবং আমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হয়ে আমাকে তার এই গোপনীয় কথা বলে।……মতিলাল রায় তাকে অরবিন্দের আত্মসমর্পণ যোগের কথা শোনায়। সেবার সে কতকগুলি ভাঁওতা সংবাদ নিয়ে যায়। আমাকে সে সংবাদ দেয় যে C.I.D. একটা list তৈরি করেছে—দীর্ঘ—বহু লোককে exile (দেশান্তরী) করবে ব'লে। Baker সাহেব (তখন বাংলার ছোটলাট) মিশিরবাবুকে ডেকে পাঠায় জানবার জন্য। তাঁর সঙ্গে কথা কহে। কথা কহিবার দিন রাজা প্যারীমোহনকে বলে—তোমার ছেলে বড় impulsive (ভাবপ্রবণ)—ওকে একটু সামলে রেখো। যাই হোক, সেবার externment (দেশান্তরী করা) আর হল না। [এটা খুব সম্ভব ১৯১০ সালের কথা। বেকার-সাহেব ছোটলাট। ১৯০৯ সালে অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস প্রভৃতি নয়জনকে দেশান্তরী করা হয়। তারপরে এই রকম একটা গুজব উঠেছিল।]

রাসবিহারী ক্রমশঃ বিপ্লবীদের কথা নিয়ে পাঞ্জাবে একটু একটু করে কাজ আরম্ভ করে। আমীরচাঁদ…কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে 'শ্রমজীবী'তে দেখা করে। রামচন্দ্রের মাধ্যমে সুরেশ দত্তের সঙ্গে আলাপ করে যায়। রামচন্দ্র আর আমি উভয়ে একবার পাঞ্জাব ও রাজপুতনা যাই। রাসবিহারী দ্বিতীয়বার এলে যতীন, রাসবিহারী ও আমি দক্ষিণেশ্বরে মিলি। 'শ্রমজীবী'তে যে শিখ দ্বারবান ছিল, তার নাম ছিল প্রীতমেশ সিং। তাকে আমার বাবার জমিদারিতে কাকদ্বীপে প্রথম রাখি, পরে 'শ্রমজীবী'তে আনি, তার অপর নামটা তুমি লিখেছ (গেন্দা সিং)। সেইবার এসেই রাসবিহারী যতীনকে সঙ্গে করে কাশী যায়—শচীন সান্যালের সঙ্গে মিলিত করে। এখানে রাসবিহারী, গেন্দা সিং ও কেল্লার শিখকর্তা যে ছিল তার সঙ্গে যতীনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটায়। এটা ১৯১৩-১৯১৪ সালের মধ্যে। [তাহলে দেখা যাচ্ছে যতীন্দ্রনাথ দুবার কাশী যান। শেষবার ১৯১৪ সালের শেষ দিকে।]

যতীনকে যে বাংলার ভার রাসবিহারী নিতে বলে, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কি আছে? Mauser Pistol সরাবার পর থেকে যতীন বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা।

আমরা জেল থেকে ফিরে আসার পর 'কর্মীসংঘ' যখন হয় (১৯২৭-২৮) তখন 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দল একত্রে কাজ করছিল। '২৮ সালের কংগ্রেসে একসঙ্গে কাজ করতে করতে ওদের মনে হল যে ওদের প্রতি সুভাষবাবু ও 'যুগান্তর' দল অন্যায় করছে। আবার তারা ভিন্ন হয়ে গেল। 'কর্মীসংঘের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিল সুরেশ মজুমদার; উপেন ও আমি এসে যোগদান করলে আমি সভাপতি হই। সুরেশ দাস সম্পাদক থাকে।…

(১৯২৩ সালে) চেরী প্রেস যখন আমার হাতে, দেশবন্ধু এসে ধরলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর দলের (No-changer-দের) হাত থেকে তাঁর হাতে কংগ্রেস দিতে। আমরা একমত হয়ে তাঁকে কংগ্রেসের কর্তা করে দেবার পরই সব একসঙ্গে চলে গেলাম জেলে (১৯২৩-২৪)। '২৮ সালে 'কংগ্রেস-কর্মীসংঘ' তুলে দিলে মনোরঞ্জন, ভূপেন, মধু—সুভাষকে নেতৃত্ব দিয়ে।…এরপর থেকে সুভাষ-সেনগুপ্তের ভেদ হল।…

ইতি

অমরদা

আর একটু সংবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ঠা অগস্ট ১৯৪১ সালে আরম্ভ হয়। এরই অল্প পরে ধীরেন সরকার প্রভৃতি ভারতীয় ছাত্ররা আমেরিকার ভারতীয় ছাত্র প্রভৃতির কাছে এক অভিনব সন্দেশ আনেন—অর্থাৎ জার্মানির সশস্ত্র সাহায্যের সম্ভাবনা। সেই সংবাদপ্রাপ্তির পর প্রথম যেসব ভারতীয়রা আমেরিকা থেকে জার্মানি যান—তাতে ছিলেন বীরেন দাশগুপ্ত, হেরম্বলাল গুপ্ত, অখিল চক্রবর্তী, তারক দাস, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি।